দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

গ্রেগরী দেবোরিন

বিদেশী সাহিত্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬২

প্রকাশক :
মৈত্রাণী রায়চৌধুরী
বিদেশী সাহিত্য প্রকাশ
২০, শ্রীঅরবিন্দ সরণী
কলিকাতা-৫

প্রচ্ছদপট :
অরুণ গুপ্ত
রুশ গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ
The Second World War-এর বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক :
বাসব সরকার

মুদ্রাকর :
হীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুরেন্দ্র প্রেস
১৮৬।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৪

প্রথম খণ্ড

যুদ্ধের ভূমিকা

দ্বিতীয় খণ্ড

নকল যুদ্ধ

তৃতীয় খণ্ড

ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিস্তার

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রথম পর্ব

চতুর্থ খণ্ড

সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ : ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা

পঞ্চম খণ্ড

গুরুত্বপূর্ণ বিজয়

প্রথম খণ্ড

যুদ্ধের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায় ঃ আক্রমণকারী ও সহায়কবৃন্দ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কামানের গর্জন যেদিন থেমে গেল, সেদিনটা ছিল এগারোই নভেম্বর, উনিশ শ', আঠারো। ইউরোপের মানুষ সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। বুর্জোয়া লেখকরা চারদিকে সোচ্চার হয়ে ঢাক ঢোল পিটিয়ে ঘোষণা করলেন একটা নোতুন ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়েছে। শান্তির যুগ।

কিন্তু শান্তি সেদিনও ছিল না। নবজাতক সোভিয়েত রাষ্ট্র যা পুঁজিবাদের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হতে চলেছে, তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলতে লাগলো অব্যাহত। উইনষ্টন চার্চিল সোভিয়েত বিরোধী রণোন্মাদনায় যাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী, নেতৃত্বের আগ্রহে ঘোষণা করলেন যে বলশেভিকবাদকে "জন্মলগ্নেই রুদ্ধশ্বাসে হত্যা" করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশে নানা স্থানে চললো জাতীয় মুক্তি আন্দোলোনকে নৃশংসভাবে দমন করার ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশ যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে তখন ইউরোপের নেতৃস্থানীয় বুর্জোয়া রাষ্ট্রনেতারা লোকার্ণো সম্মেলনে ঘোষণা করলেন (অক্টোবর উনিশ শ' পঁচিশ) যে, অবশেষে যুদ্ধের কাল শেষ হয়ে শান্তির কাল সুরু হওয়ার যুগ-সন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত হয়েছে। যুগ-সন্ধিক্ষণ যে সেটা সত্যিই ছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই, তবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যুগ-সন্ধিক্ষণ, এই যা তফাৎ। সেই যুগসন্ধি অবসান ঘটিয়েছে এক ক্রমিক যুদ্ধ কাহিনীর, কিন্তু সূচিতও করেছে আরেক নোতুন শ্রেণীর। একচেটিয়া মুনাফার লোভে, লোকার্ণোর আলাপচারীরা নোতুন যুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব সুরু করে দিয়েছিলেন।

এক সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন নিবতেই, সমস্ত ইন্ধন দ্রুত সঞ্চিত হলো নোতুন এক ধ্বংসের প্রস্তুতিতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মোটেই কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার বিষয় নয়। পুঁজিবাদের সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উত্তরণ পর্বের যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, এটা ছিল তারই এক স্বাভাবিক পরিণতি। পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের একটা ফলশ্রুতি এটা, যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং লক্ষণীয় প্রকাশ ঘটলো মহান অক্টোবর বিপ্লবের সাফল্যকে কেন্দ্র করে বিশ্বের দুই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী সমাজব্যবস্থার বাস্তবতায় —যার একদিকে সমাজতন্ত্র অন্যদিকে পুঁজিবাদ। অক্টোবর বিপ্লব পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ অঞ্চল জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের যে বনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, তাকে ধ্বংস করে দিল। পৃথিবীর বাকী অংশ জুড়ে তখন রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র আর তাদের উপনিবেশ আর আধা উপনিবেশ। এই পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র অংশেই তখন ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মুক্ত হয়ে কয়েকটি দেশ স্বাধীন উন্নয়নের পথে পা বাড়িয়েছে।

সেদিন সাম্রাজ্যবাদ টিঁকে ছিল বলেই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অর্থনৈতিক কারণগুলোর অবসান ঘটতে পারে নি। সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত কারণ যা যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয় সেই অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবলুপ্ত করতে পারে নি। আর তা সম্ভবও ছিল না। যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা বরং এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে আরো গভীরে টেনে নিয়ে গেছে যার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিরোধ আরো তীব্র হয়ে উঠেছে। সারা পৃথিবী জুড়েই নোতুন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বীজ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও ব্যক্তিগতভাবে পুঁজিপতিদের মুনাফা শিকারের মধ্যে যে বিরোধ আছে, পুঁজিবাদের সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে তা হলো একটা মৌলিক, সমাধানের অতীত সমস্যা। পুঁজিবাদী দুনিয়া মাঝে মাঝে যে অর্থ নৈতিক সংকটের আঘাতে কেঁপে ওঠে তার মূলেও আছে এই বিরোধ। পুঁজিবাদী দেশগুলির সমাজজীবনে যে তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম চলে এ' বিরোধ তাকে ঘনীভূত করে তোলে। এই বিরোধই তাই আরো নানা কারণের সঙ্গে একজোটে পুঁজিবাদের অনিবার্য পতনকে বাস্তবে রূপায়িত করে।

উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা যে নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চালু রাখে, আধুনিক পুঁজিবাদের উৎপাদন ক্ষমতা তাকে অতিক্রম করে গেছে।

তারা আজ সমাজতন্ত্রের জন্য প্রস্তুত। সামাজিক উৎপাদন আজ পুঁজিতন্ত্রী দেশগুলির প্রত্যেকের সীমিত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে। সমগ্র বুর্জোয়া পৃথিবীর মধ্যে এর ব্যতিক্রম নেই কোথাও। বিশ্বজনীন ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদের রূপান্তর, পুঁজিবাদের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ নীতির ব্যাপক বিস্তার যাকে চালু রাখতে সাহায্য করছে বিরাট বিশ্ব-জোড়া বাজার—এরাই আজ সমগ্র উৎপাদনের চরিত্রকে সামাজিক ভিত্তিতে সংগঠিত করে চলেছে। কিন্তু উৎপাদনের এই সামাজিক ভিত্তি বাধামুক্ত নয়। তার সবচেয়ে বড় বাধা হলো পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মুনাকার লোভ—যা পৃথিবী জুড়ে এক তীব্র সংগ্রামের ভূমিকা রচনা করছে।

পুঁজিবাদের একচেটিয়া পর্ব্বের পূর্বে শোষণকারী বুর্জোয়া দেশগুলি উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়নে, সংগঠনে উৎসাহ দিত। আজ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে পৌঁছে তারা মানুষের প্রগতিতে বাধা দিচ্ছে। "পুরানো জাতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো, যাকে সংগঠিত না করে একদা সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সম্ভব ছিল না, আজ সেটি পুঁজিবাদের কাছে অসহনীয় হয়ে উঠেছে" একথা লিখে গেছেন ভি, আই, লেনিন। "পুঁজিবাদের কেন্দ্রীভূত শক্তি এতোই বৃদ্ধি পেয়েছে যে শিল্পের সমস্ত শাখা প্রশাখার উপর কোটিপতি শিল্পপতিদের একচ্ছত্র অধিকার, সিণ্ডিকেট, ট্রাষ্ট বা কোন সংগঠনের মাধ্যমে কায়েম হয়ে বসেছে এবং "পুঁজির প্রভুরা" গোটা পৃথিবীটিকেই নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে হয় নানা উপনিবেশ গড়ে, না হলে কোন দেশকে অসংখ্য অর্থ নৈতিক শোষণের বেড়া-জালে আটকে রেখে। একচেটিয়ার সম্প্রসারণশীলতা, পুঁজির বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন দেশের উপর অধিকার স্থাপন এবং তাদের উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তুলে কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনে অবাধ বাণিজ্য, প্রতিযোগিতাকে পিছু সরে যেতে হয়েছে। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কালে যে পুঁজিবাদকে জাতির মুক্তিদাতা বলে মনে হয়ে ছিল, সেই পুঁজিবাদই সাম্রাজ্যবাদী বিকাশের পর্বে জাতির সবচেয়ে বড়ো উৎপীড়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"১

বিদেশে পুঁজি রপ্তানী করা, দেশের বাজারে বিক্রয়ের অযোগ্য উৎপাদিত দ্রব্য বিদেশে বিক্রয়ের জন্তে বাজার দখল করা, কাঁচামালের আমদানীর পথ প্রশস্ত করার জন্য উপনিবেশ অধিকার, বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিদের ধ্বংস

করে, সমগ্র পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারে সচেষ্ট হওয়া এ সবই হলো পুঁজিবাদের সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনবোধ।

নিজেদের প্রভাবের সীমার মধ্যে সমস্ত রাজ্যের জন্যেই বৃহৎ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিরোধের অন্ত নেই। প্রভাবের সীমা নিয়ে তাদের ভাগ বাঁটোয়ারা তিক্ত সংগ্রামের মধ্যে আপেক্ষিক শক্তির গুরুত্ব অনুযায়ী স্থির হয়ে যাবে। কিন্তু শক্তির এই আপেক্ষিক গুরুত্ব স্বতই পরিবর্তনশীল। কারণ আধুনিক পুঁজিবাদের লক্ষণই হলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অসম উন্নয়ন। তারই অনিবার্য পরিণাম হলো সংগ্রাম পারস্পরিক বিরোধ, যার কারণগুলির একদিকে আছে পৃথিবীর বাজার দখল ও ও প্রভাব বিস্তারে জন্যে প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে নিয়ত পরিবর্তনশীল শক্তিগত পারস্পরিক সম্পর্কের অসম প্রকাশ। এ বিরোধের অনিবার্য পরিণামে যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

"পুঁজিবাদ" লেনিন লিখেছেন, "পৃথিবীর সম্পদকে কয়েকটি দেশের মধ্যে এনে জড়ো করেছে, পৃথিবীটাকেই ভেঙ্গে টুকরো করে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছে। তাই আবার যদি তাকে ভাগাভাগি করতে করতে হয়, আবার যদি সম্পদের সংগ্রহ কারো কাছে আবশ্যিক হয়ে ওঠে, তা হলে সেটা হতে পারে একমাত্র বর্তমানে যাদের আছে তাদের বঞ্চিত করে। একটি রাষ্ট্র অন্যকে ক্ষতি-স্বীকারে বাধ্য না করে আর তা পেতে পারে না। শুধু পশুশক্তিই এই দাবীর মীমাংসা করতে পারে—তাই পৃথিবীতে আধিপত্যকামী শকুনদের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য।"[২]

সাম্রাজ্যবাদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ একদল পুঁজিবাদী দেশের পরস্পর বিরোধিতার পরিণতি। এদের মধ্যে জার্মানীর ভূমিকাই মুখ্য। দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়ে জার্মানী, বৃটেন ও ফ্রান্সের ক্ষমতার ভিত্তিকেই দখল করতে চেয়েছিল। এরা তখনও রীতিমতো শক্তিশালী, তাই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ ধারনাও তাদের হয়েছে যে জার্মানীর অগ্রগতির হার তাদের অতিক্রম করে গেছে। তারা পিছিয়ে পড়ছে। যুদ্ধে জার্মানীর ঘটলো পরাজয় কিছুদিনের জন্যে তার অর্থ নৈতিক শক্তি নির্জীব হয়ে পড়ে রইলো। কিন্তু পরাজিত হলেও, ভার্সাই সন্ধির কঠোর শৃঙ্খলে বাঁধা থাকলেও, এটাও কারো অজানা ছিল না যে তার বিজেতা বৃটেন ও ফ্রান্সের চেয়ে বিজিত জার্মানীর

শক্তির বনিয়াদের জোর অনেক বেশি। মুখে স্বীকার না করলেও, এটা তাদের কাছে কষ্টকর হলেও অজানা ছিল না যে জার্মানীর বিরুদ্ধে তাদের যে জয়লাভ তা সম্ভব হয়েছে বহু কারণের যোগফলে, যাতে রাশিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য ভাবেই মুখ্য। যুদ্ধে রাশিয়া যদি যোগদান না করতো, বৃটেন ও ফ্রান্সের পরাজয় হতো অবশ্যম্ভাবী। তাই বিজেতা হয়েও তাদের নিরাপত্তার অভাববোধ গেল না, কারণ একটা প্রথম শ্রেণীর পুঁজিবাদী দেশ হিসেবে জার্মানীর অভ্যুদয় ছিল সুনিশ্চিত।

এই পটভূমিতে বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণী যে জার্মানীর অর্থনৈতিক ও তার পরিণতিতে সামরিক শক্তির পুনর্গঠনে সম্ভাব্য সমস্ত রকমের প্রতিকূলতা করবে, তা নিতান্ত স্বাভাবিক। কিন্তু তবু তারা যে পথ বেছে নিয়েছিল তা হল স্বতন্ত্র পথ, তাদের নিজেদের পুঁজিবাদী ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে এর মিল নেই। জার্মানীর সামরিক শক্তিকে পুনর্গঠন করার কাজে তারা সোৎসাহে হাত মেলালো। পশ্চিমী দেশগুলির এই নীতি যা হিটলারের জার্মানী ও ফ্যাসিস্ত ইটালীর সঙ্গে মিউনিক চুক্তিতে এসে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করেছে, তার সূত্রপাত ঘটে অনেক পূর্বে উনিশ শ' চব্বিশ, পঁচিশে।

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানতে তখন সমস্ত বুর্জোয়া সরকারই তৎপর। নিজেদের আন্তর্জাতিক ও জার্মানী সম্পর্কিত যে কোন নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রেই তাদের এই মনোভাব কার্যকরী হয়েছে।

নবজাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পর থেকে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে শক্তি প্রয়োগের কোন পরিকল্পনা পুঁজিবাদী দেশগুলি তখনও বর্জন করে নি। বরং যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সে একচেটিয়াপতিরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নোতুন সামরিক অভিযান সংগঠনের জল্পনা কল্পনায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করছে। এই অভিযানকে সফল করতে যে জনশক্তি প্রয়োজন, তারই জন্যে তাদের চোখ পড়লো জার্মানীর দিকে। কারণও ছিল তার অনেক। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সমরভিত্তিক উচ্চমানের শিল্প সংগঠনের সম্ভাবনা, বিরাট সেনাবাহিনী নিয়োগ ক্ষমতা, সামরিক ঐতিহ্য, শাসকশ্রেণীর বর্ব্বরতা ও যুদ্ধ স্পৃহা, এবং নিজের দেশ তথা পদানত দেশের মানুষকে জবরদস্তি অত্যাচারে, নিপীড়নে পঙ্গু রাখার ক্ষমতা, সবই ছিল একমাত্র জার্মানীর।

ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও ফ্রান্সের নীতি নিয়ামকরা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে জার্মানী ও জাপানকে কাজে লাগাতে লাগলেন। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মান ও জাপানের সামরিক শক্তি প্রয়োগের নীতি সফল হলে, তাদের দুটি উদ্দেশ্য সফল হবে—এক ঢিলে দুই পাখী মরবে—জার্মানী ও জাপানের সম্মিলিত শক্তি সোভিয়েতকে ধ্বংস করবে। আর সোভিয়েতের পালটা প্রতিরোধ ক্ষমতার আঘাতে জার্মানী ও জাপান, পশ্চিমের দুই শ্রেষ্ঠ পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী হীনবল হয়ে পড়বে।

এই চতুর পরিকল্পনা রচনার মৌল কৃতিত্ব আমেরিকার একচেটিয়াপতিদের। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের দু' চোখের বিষ। সুতরাং তার বিরুদ্ধে জার্মানী ও জাপানকে ব্যবহার করে ওদেরও সম্পূর্ণ খতম করে দেওয়াটা সঠিক নীতি বলেই তাদের ধারণা। এ' ব্যাপারে বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণীর মনে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, তা সরিয়ে দেওয়া হলো জোর করে। ওদিকে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থগত পারস্পরিক বিরোধে এই তীব্র সোভিয়েত বিরোধিতায় কিন্তু ভাঁটা পড়ল না মোটে। বরং বলা যায় যে দুই যুদ্ধের অন্তবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থগত বিরোধই ছিল পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যেকার সবচেয়ে বড় রকমের সমস্যা।

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের সোভিয়েত বিরোধী কার্যক্রমের সূচনা করলো ডাওয়েস্ পরিকল্পনা (Dawes plan) দিয়ে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিপুল মার্কিন দাক্ষিণ্যে জার্মানীর সমরভিত্তিক ভারী শিল্পের পুনর্গঠন।

কিন্তু চরম সোভিয়েত বিরোধী কার্যক্রম অনুসরণের উত্তেজনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী ভুলে গিয়েছিল যে জার্মানী ও জাপানের শাসক শ্রেণীর সাম্রাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ বলে কিছু থাকতে পারে। জার্মান সাম্রাজ্য বাদীরা সকলেই চেয়েছিল প্রতিহিংসা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার দিন থেকেই পরাজিত জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বের সূচনা করে। গুস্তাভ ক্রুপ, জর্মানীর সামরিক উৎপাদন প্রচেষ্টার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পপতি। তাঁর মতে ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে, নির্দিষ্ট মুহূর্তে সময় ও অভিজ্ঞতার বিন্দুমাত্র ঘাটতি না করে জার্মান সমরবাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার জন্যে

শিল্পোৎপাদনের বৈজ্ঞানিক ও বস্তুগত বনিয়াদ গড়ে তোলায়,"৩ এতটুকুও সময় নষ্ট করা হয়নি।

পশ্চিমের এই নীতির মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল তাকেই পুরোমাত্রায় কাজে লাগিয়ে স্বদেশের পুঁজিবাদী স্বার্থের সম্প্রসারণের জন্যে জার্মানীর পররাষ্ট্রনীতি রচনা করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুস্তাভ স্ট্রাসেমান। এই পররাষ্ট্রনীতিই জার্মানী ও তার পশ্চিমী সাহায্যকারীদের মধ্যে বিরোধের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে সুরু হওয়ার অনেক পূর্বেই পশ্চিম দুনিয়ার স্থানে স্থানে সৈন্য প্রেরণ শেষ করা হয়েছিল। একদিকে তখন জার্মানী, ইটালী ও জাপানে তারা চাইছে পৃথিবীটাকে নিজেদের অনুকূলে আবার ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিতে। তারাই রচনা করলো পররাজ্য আক্রমণের ভূমিকা। অন্যদিকে রইলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স, যার শাসকশ্রেণী গ্রহণ করলো ফ্যাসিস্ত পররাজ্য লোলুপতাকে প্রশ্রয়দান ও আন্তর্জাতিক বিরোধকে জটিল করে সংঘর্ষ বাধানোর নীতি।

নিজের স্বার্থের অনুকূলে রচিত কার্যক্রমের সীমানায় আবদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অনুসৃত নীতির মধ্যে যতো পার্থক্যই থাক না কেন, তাদের দু'টি স্বতন্ত্র সামরিক অবস্থা সৃষ্টিতে যে ভূমিকাই থাক না কেন, তারা চূড়ান্ত বিচারে ছিল একটিমাত্র স্বার্থ গোষ্ঠী—যার নাম হলো সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া ও পর রাজ্য গ্রাসের শিবির।

এদেরই প্রতিপক্ষ যারা তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহে। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের মুখপাত্র। তাই সোভিয়েত দেশ ও পুঁজিবাদী দেশগুলির অভ্যন্তরে শান্তি ও সামাজিক প্রগতির স্বপক্ষে যারা, সোভিয়েতের বন্ধু যারা সমর্থক যারা, তাদের নিয়ে গড়ে উঠলো শান্তির শিবির।

শান্তিস্থাপনের প্রচেষ্টায় সোভিয়েত নীতির মৌল ভিত্তি ছিল এই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে দেশ ও শাসনব্যবস্থা নির্বিশেষে সকলের যৌথ, মিলিত প্রচেষ্টাতেই শান্তি স্থায়ী হতে পারে। তাই সোভিয়েত ইউরোপের সাধারণ মানুষ ও তাদের শাসকশ্রেণীর কাছে আহ্বান জানালো আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে এই অনিবার্য যুদ্ধের মুখ থেকে সরিয়ে আনার জন্যে।

॥ দুই ॥

উনিশ শ' উনত্রিশের বিশ্বব্যাপী অর্থ নৈতিক সংকট পুঁজিবাদী দেশগুলির জীবনযাত্রায় ঘনিয়ে তুললো দারুণ বিপর্যয় আর জটিলতা। পুঁজিবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এই অভূতপূর্ব ধ্বংসাত্মক ও তীব্র সংকটের চাপে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। ফলে একদিকে যেমন ভার্সাই ওয়াশিংটন অক্ষরেখায় গড়ে ওঠা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে লাগলো টুকরো টুকরো হয়ে, তেমনি অন্যদিকে নোতুন বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিল পৃথিবীকে।

বিগত যুদ্ধের একটি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সূচনা মাত্রেই তা বিশ্ব-ব্যাপী হয়ে ছড়িয়ে পড়েনি। সেই পরিণতি তার এসে পড়লো উনিশ শ' উনচল্লিশ থেকে একচল্লিশের মধ্যে। যখন একের পর এক বৃহৎ শক্তিগুলি যুদ্ধে যোগদান করছে। কিন্তু এরই পটভূমি রচিত হয়েছে উনিশ শ' একত্রিশ থেকে উনচল্লিশের মধ্যে, যখন ঘটে গেছে যুদ্ধ একের পর এক।

যদিও এরা সবই ছিল এক অর্থে স্থানীয় যুদ্ধ, কিন্তু তারা সকলে মিলিতভাবে গড়ে তুললো এক যোগসূত্র যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্ভব করেছে।

উত্তর-পূর্ব চীনে উনিশ শ একত্রিশ সালে জাপানের আক্রমণে রচিত হয়েছে এর প্রাথমিক পর্ব, এবং উনিশ শ সাইত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সালের মধ্যে বিস্তৃত চীন-জাপানের সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে তা সেপ্টেম্বর উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে জাপানের আত্মসমর্পণের মধ্যে চরম পরিণতি লাভ করেছে। উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ ইটালীর আবিসিনিয়া দখল এবং উনিশ শ' তেতাল্লিশে তার পরাধীনতা বরণ এই যোগসূত্রেরই আরো দুটি স্তর। তেমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে স্পেনে উনিশ শ' ছত্রিশ সালে ইটালী জার্মানীর যৌথ হস্তক্ষেপ এবং উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে জার্মানীর বিনা সর্তে আত্মসমর্পণের মধ্যে), যা ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘোষণা করে। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই নতুন যুদ্ধের সংঘটন হয়েছে উনিশ শ' একত্রিশ থেকে উনিপ শ' পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, যার একাংশ জুড়ে—উনিশ শ' উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ। আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

এই পর্বের প্রাথমিক স্তরে যে সব যুদ্ধ হয়েছিল, তাদের প্রতিটিরই বৈশিষ্ট্য ছিল একান্ত নিজস্ব। বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতার মধ্যে তারা মিশে গেল যেদিন, সেদিন সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কিন্তু আরো প্রকট হয়ে লঠলো। সমস্ত যুদ্ধের সূচনা

করেছে ফ্যাশিবাদী দেশগুলি। তাদের লক্ষ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীকে উৎপীড়ন করে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিধ্বস্ত করে, সমস্ত মানুষের পায়ে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়ে, সমগ্র পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে নোতুন করে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়া। স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদের জঘণ্যতম প্রকাশ, এই ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধে, জাতীয় স্বাধীনতা, মুক্তি ও গণতন্ত্রের জন্যে মানুষকে অসম সাহসিকতার সঙ্গে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী এই যুগে যে "হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ নীতি" (Non-interference) ও "নিরপেক্ষ নীতি" (Neutrality) গ্রহণ করেছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পরোক্ষ ফ্যাশিস্তদের পররাজ্যলোলুপতাকে প্রশ্রয়দান, যাতে সমস্ত গণতান্ত্রিক জাতীয় মুক্তিকামী ও বৈপ্লবিক শক্তি এবং তাদের প্রতিভূ স্বরূপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্যাসিস্ত জহ্লাদদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু এই নীতিই সাম্রাজ্যবাদীদের দুই পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুললো। কারণ পশ্চিমের নীতির দুর্বলতাকে জার্মানী, জাপান ও ইটালী ব্যবহার করতে চাইলো যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে। যতদিন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের একচেটিয়াপতিরা বিশ্বাস করেছে যে ফ্যাশিস্ত শক্তিবর্গকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব ততদিন তারা নিজেদের স্বার্থের ক্ষতিকেও উপেক্ষা করে থেকেছে।

বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তারা পররাজ্য আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়া দূরে থাক সব রকমে সাহায্য, সমর্থন করেছে রসদ যুগিয়েছে। সে সময়কার সরকারী ও আধা সরকারী বিভিন্ন দলিল ও নথিপত্রে তার নজীর মিলবে। যে রকম উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, উনিশ শ' একত্রিশ সালে জাপান যখন উত্তর-পূর্ব চীন মাঞ্চুরিয়া দখল করে নিল, যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি হার্বাট হুভার যুক্তিতর্ক দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে জানালেন কেন তিনি জাপানকে সমর্থন করছেন (যদিও জাপানী আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল আমেরিকার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল)। মন্ত্রী সভার কাছে লিখিত এক বিবরণীতে তিনি জানালেন যে "প্রথমতঃ এটি হল মুখ্যতঃ চীন ও জাপানের মধ্যেকার একটা বিতর্কিত বিষয়। আমেরিকা কোন দিন শক্তি প্রয়োগ করে অন্য দেশের শান্তি বজায় রাখবে, সে কথা বলেনি।... ......যদি এমন হয় জাপান সরাসরি এসে স্পষ্ট করে বলে : আমাদের পক্ষে এ

সব সন্ধি চুক্তি মানা অসম্ভব হয়ে পড়ছে এবং আমরা একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে চীন ব্যর্থ হয়েছে। তাদের দেশের অর্দ্ধেক অংশ বলশেভিকদের প্রভাবাধীনে চলে গেছে, তারা রাশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতা করছে।...............আমাদের উত্তরে আছে, বলশেভিক রাশিয়া আবার পাশে চীনও যদি বলশেভিক হয়ে যায়, আমাদের স্বাধীনতা তাহলে বিপন্ন হবে। এমতাবস্থায় হয় নবম শক্তি চুক্তির (Nine Power Pact) স্বাক্ষরকারীরা এগিয়ে এসে চীনের অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপনের জন্য আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুক, নয়তো আত্মরক্ষার তাগিদে আমরা একাজ করতে বাধ্য হবো।......আমেরিকা নিশ্চয়ই যেমন এ ধরনের প্রস্তাব মেনে (জাপানকে সাহায্য করতে) অগ্রণী হবে না, তেমনি কোন আপত্তি ও (জাপানের আচরণে) করতে পারে না।" ৪

জার্মানীতে ফ্যাশিবাদের উদ্ভব দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পথে একটা নিশ্চিত পদক্ষেপ। তবুও যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণীর জার্মানীর এই যুদ্ধবাদী মনোভাবে উত্তরণকে কোন মতে বিরোধিতা করতে চাসনি। বরং ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁরা এই উত্তরণকে ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করেছেন। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের একচেটিয়াপতিরা হিটলারের দলবলকে জার্মানীতে নাৎসীরা ক্ষমতা দখলের অনেক আগে থেকেই নৈতিক সমর্থন ও বাস্তবে সাহায্য করেছে। এবং ক্ষমতা দখলের পর হিটলার চ্যান্সেলার হয়ে সে দেশের প্রগতিশীল মানুষদের বিরুদ্ধে যে অত্যাচার ও বর্বরতার নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন, তখন সেই সাহায্য সমর্থনের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আমেরিকা ও ইতিহাসবিদ্‌রা দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই ব্যাপারে আমেরিকা ও বৃটেনের রাষ্ট্রনেতারা একমত ছিলেন যে, "ইউরোপীয় মূল ভূখণ্ডের নেতৃত্ব করবে জার্মানী। ...এবং জাতীয় সমাজতন্ত্রকে সাম্যবাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড়াতে হবে।" ৫

কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন একচেটিয়াপতিদের সক্রিয় সাহায্যও সমর্থনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করলেও, হিটলার জার্মানীকে কোনমতে শুধু ইঙ্গ-মার্কিন নীতির হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে চাননি। জার্মান সাম্রাজ্যবাদের লক্ষ্য ছিল স্বতন্ত্র। সমগ্র পৃথিবীটার দখলি স্বত্বের পুনর্বণ্টন ছিল তার দাবী। তাই ইঙ্গ মার্কিন প্রতিযোগিতা ধ্বংস করাও ছিল তার একান্ত ইচ্ছা তারই ভিত্তিতে কেবল গড়ে উঠতে পারে এক বিরাট জার্মান ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য যাতে সমগ্র

পৃথিবীটাকে নিজের তাঁবে আনা সম্ভব হয়। তার সেই সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতির মূল লক্ষ্য ছিল তাই সোভিয়েত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে সোভিয়েতের মানুষদের পদানত' পরাধীন করে রাখা। কারণ তাহলেই জার্মানীর পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তারের পথ বাধাহীন হয়ে যাবে।

হিটলার তাঁর এই সোভিয়েতবিরোধী মনোভাব বেশ স্বেচ্ছাকৃতভাবেই গোপন রাখতে চাননি। জার্মান ফ্যাশিস্তদের কর্মসূচী, তাঁর "মেইন কাম্ফ" গ্রন্থে তিনি বেশ স্পষ্ট করে বলছেন :

"ইউরোপে যদি জমি, মাটি দখল করার কথা চিন্তা করা হয়, তাহলে তা করতে হবে রাশিয়ার কাছ থেকে। তাহলে আমাদের পূর্ব্ব সূরী টিউটন, অভিজাতদের মতোই আমাদের পথ বেছে নিতে হবে।"৬

নাৎসীরা নিয়মিতভাবেই তাদের সোভিয়েত বিরোধী নীতি প্রচার করতো যাতে ইঙ্গ মার্কিন একচেটিয়াপতিদের বিশ্বাস অর্জন করে। তাদের কাছ থেকে উত্তরোত্তর বেশি সাহায্য পাওয়া যায়। হিটলার তার ঘনিষ্ঠ পার্শ্বচরদের মধ্যে গর্ব্ব করে বলতেন :

"পুঁজিবাদের সঙ্গে খেলা আমায় চালিয়ে যেতে হবে, বলশেভিকবাদের জুজুর ভয় দেখিয়ে ভার্সাই শক্তিবর্গকে সব সময়ে এমন করে রাখতে নাৎসী জার্মানী হলো শেষ প্রতিরোধের দুর্গ। আমাদের সংকটকাল উত্তীর্ণ হয়ে, ভার্সাই শক্তি বর্গের প্রভাবমুক্ত হয়ে পুনরস্ত্রীকরণের সেটাই হলো একমাত্র পথ।"৭

হিটলারের অভীপসা পূর্ণ হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী এক চতুর রাজনৈতিক খেলায় নেমেছিলেন। তাঁদের প্রত্যাশার ছিল যে জার্মানীকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিম্বা কৌশলে নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যবহার করবেন। ফ্যাশিস্ত একনায়কদের বিভ্রান্ত করাটা তাঁদের কাছে নিতান্ত সহজ একটা ব্যাপার বলে মনে হয়েছিল। জার্মান কূটনীতিকরা বিভিন্ন দেশ থেকে স্বদেশে যে খবর পাঠাতেন তাতে বলা হতো যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ গভীরভাবে বিশ্বাস করে জার্মানী তার পররাজ্য আক্রমণের কর্ম্মসূচী কেবল পূর্ব্ব সীমান্তের দিকেই প্রয়োগ করবে। আর তাতে পশ্চিমের সাহায্য সুনিশ্চিত। আমেরিকা ও বৃটেনের সেনানায়করা হিটলারকে বন্ধুর মতো সুপরামর্শ দিয়েছিলেন যে কিভাবে একের পর এক সেই কর্মসূচী রূপায়ণ সম্ভব হবে বলে তাঁদের ধারণা। বৃটেনের সামরিক বিভাগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সুপারিশ করেন যে জার্মানী কাজ সুরু

করুক চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে, তারপর অষ্ট্রিয়া দখল করে পোল্যাণ্ড এবং সর্ব-শেষে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলা করবে। ৮

হিটলারের বিশ্ব বিজয়ের পরিকল্পনা ঘৃণ্য "জাতিতত্ত্বের" উপর বনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। তার মৌল ধারণা ছিল যে জার্মান জাতি "ঈশ্বর প্রেরিত"। সুতরাং অন্য জাতিকে পদানত করায়, তাদের নিশ্চিহ্ন করায় সংকোচের কোন কারণ নেই। শ্লাভগোষ্ঠীর মানুষদের পদানত করে, পৃথিবীর বুকে থেকে মুছে ফেলার চরম, ব্যাপক পরিকল্পনা জর্মানীর ছিল। এরই সঙ্গে তারা তীব্র প্রচার সুরু করলে জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে জাতিবৈর গড়ে তোলার জন্যে ফ্রান্স, পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে।

সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, নাৎসীরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিল আকস্মিকতা ও জমায়েত-এর উপর যাতে দ্রুত আক্রমণ ও দখল করা সম্ভব হয়। হিটলার তাঁর সেনাপতিদের বলেছিলেন যে শত্রুকে যদি কখনো আক্রমণ করতে হয় তাহলে মুসোলিনী যে কায়দায় করছেন তিনি সেভাবে কখনোই তা করবেন না। মাসের পর মাস এক দিকে আলাপ আলোচনা অন্যদিকে সমরায়োজন চালানো একেবারে অর্থহীন। আক্রমণ করতে হলে, তিনি চিরকাল সব কাজে যা করেছেন—আঁধার রাতে বজ্রপাতের মতো আবির্ভূত হবেন। ৯

জার্মান গুপ্তচর বিভাগ বিভিন্ন দেশে যে বিশ্বাসঘাতক শ্রেণী পোষণ করছিল জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের অনুগত ভৃত্য হিসেবে নাৎসীরা তাদেরই কাজে লাগানোর ফন্দী করেছিল। এদের উপর হিটলার অনেক ভরসা করেছিলেন। এমন কি গর্ব করে বলেওছিলেন : "শত্রুর দেশে আমাদের বন্ধু যাঁরা আছেন আমরা তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবো। এমন বন্ধু কেমন করে পাওয়া যায়, তাও আমরা জানি। মানসিক বিভ্রান্তি, বিচার, অনুভূতির দ্বন্দ্ব, দোদুল্যমানতা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতা এবং আতঙ্ক, এরাই আমাদের চরম হাতিয়ার।" সোৎসাহে তিনি ব্লীৎসক্রীগ ও পঞ্চম বাহিনীর কাযকলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন :

"কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষেরা তাদের নেতাদের হারাবে। সেনাবাহিনী আছে কিন্তু কোন সেনা-নায়ক নেই! সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা অদৃশ্য! তখন তা দেখে মানুষের

মনে যে বিভ্রান্তি আসবে তা এমনিতে কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সেখানে তখন যারা শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করতে আসবে, এমন সব মানুষদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে। সে শাসন ব্যবস্থা থাকবে আমার পথে।" ১০

মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়ে দেওয়ার জন্যেই নাৎসীরা ভিগির তোলে "সর্বাত্মক যুদ্ধের"। এ যুদ্ধ কেবল বিশ্ব বিজয়ের পদক্ষেপে নয়, এ যুদ্ধে সমর ক্ষেত্র ও পিছনে পড়ে থাকা দেশ, সেনাবাহিনী আর অসামরিক মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

হিটলারের জার্মানী যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে তখন অন্য দিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিশ্চিন্তে শান্তভাবে কাজ করে যেতে লাগলো নিজেদের প্রয়োজনে জার্মানীর সমরশক্তি ব্যবহার করার জন্যে। সন্দেহ নেই এরই মধ্যে থেকে থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই দেখা যায় ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল পত্রিকা ফর্টনাইটলী রিভিয়্যু উনিশ শ' তেত্রিশ সালে আতঙ্কিত হয়ে বলছে:

"এমন কি আজ ইউরোপের অর্থ নৈতিক দিক থেকে বিচার করলে জার্মানীই হবে সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ। কলাকৌশল, দক্ষতা ও যান্ত্রিক প্রস্তুতিতে তার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রেষ্ঠ। পৃথিবীর বাজার তারা সস্তাদরে জিনিস উৎপাদন করে ভরে দিতে পারে। ...সে শুধু মধ্য ইউরোপের কাছেই একজন প্রবল প্রতিপক্ষ অর্থ নৈতিক বিপদের কেন্দ্র নয়, সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির আশঙ্কাই হলো তাই। এবং তা আরো বেশি করে সত্যি গ্রেট ব্রিটেনের কাছে যে হলো তার প্রধান ক্রেতা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।" ১১

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক শ্রেণীর হিটলার জার্মানীর সঙ্গে "উন্নত সম্পর্ক" স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যে সুগঠিত প্রচার চলেছিল, তাতে ধীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কথা হারিয়ে যায়।

আমেরিকা ও বৃটেনের একচেটিয়াপতিদের কাছে জার্মানীর সাম্রাজ্যবাদীরা মানবিক সহৃদয়তা লাভ করেছে, তাতে বাস্তবিকই তাদের অভিযোগ করার মতো কিছু থাকতে পারে না। ফ্যাশিস্তদলের ক্ষমতা দখলের পর জার্মানী ও আমেরিকার একচেটিয়া কারবারীদের মধ্যে বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক যোগসূত্র আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। জার্মানীর সমর শিল্পোৎপাদনের সম্ভাবনা ও বিরাট

যুদ্ধাস্ত্র নির্মান প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে আমেরিকার সাম্রাজ্য বাদীরা কোন চেষ্টারই কসুর করে নি।

জার্মানীস্থিত মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধের বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও মোটর উৎপাদনের জন্যে দারুন পরিশ্রম করতে থাকে। নানা ধানের যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক দ্রব্যাদি আমেরিকা থেকে চালান আসে জার্মানীতে অব্যাহতভাবে। বিভিন্ন মার্কিন প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত নানা ধরণের সর্বাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, বিমানের ইঞ্জিন, যুদ্ধ বিমান ও রেডিয়োর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির নক্সা, নির্মাণ কৌশল ও প্রস্তুতির অনুমতি নাৎসী জার্মানীকে বিক্রয় করতে থাকে। সন্দেহ নেই যে মার্কিন সরকারের এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র কোন আপত্তি ছিল না। তাছাড়া জার্মানীকে রাসায়নিক রবার, রাসায়নিক গ্যাসোলিন ও বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের একচেটিয়া অধিকারদান ও অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বেরিলিয়াম এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের বিষয়ে সাহায্য করতেও তাদের বাধে নি।

বৃটেনের একচেটিয়াপতিরা তাদের মার্কিন সহযোগিদের চেয়ে এ ব্যাপারে বিশেষ পিছিয়ে থাকেনি। এ বিষয়ে তাদের মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা পূর্ণ পদক্ষেপ ঘটলো উনিশ শ' পঁয়ত্রিশ সালে যখন জার্মানীর সঙ্গে একটি নৌ চুক্তি সম্পাদিত হলো; এটা হলো ভার্সাই সন্ধির একটি দ্বিপক্ষীয় বিচ্যুতি। চুক্তি বলে জার্মানী সাবমেরিণ সমেত নৌবাহিনী গঠন করতে পারবে এবং তাতে সরকারের আর্থিক, বৈষয়িক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাহায্য আসবে বৃটেন থেকে। জার্মানীর যুদ্ধ প্রস্তুতি সুসংগঠিত করতে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরাও তাদের দায়িত্ব পালন করতে পিছিয়ে ছিল না।

এই সব আর্থিক ও বৈষয়িক সাহায্যদান ছাড়াও ইঙ্গ মার্কিন এবং ফরাসী শাসকশ্রেণী হিটলার জার্মানীকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন দিয়েছেন। তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একঘরে, কোণঠাসা করে রাখা।

নিজেদের দেশের মানুষের স্বার্থকে উপেক্ষা করে, ইঙ্গ মার্কিন ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা জার্মান একচেটিয়াপতিদের ক্রীড়নক হিটলারবাদকে পরিপুষ্ট করতে, ফ্যাসিস্ত সেনাবাহিনীকে সুসজ্জিত করতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে। নাৎসী পররাজ্য আক্রমণকারীদের অষ্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া দাবীকে

তারা সমর্থন করেছে, সোভিয়েত সীমান্তের দিকে তাদের ক্রমাগত এগিয়ে যেতে প্ররোচিত করেছে এবং সেই কারণেই ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার সমস্ত সোভিয়েত প্রস্তাব তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ফ্যাশিস্তদের ঘনায়মান আক্রমণ আশঙ্কাকে প্রতিরোধ করে রাষ্ট্রিক স্বার্থ সংরক্ষণ করার জন্যে কোন বুর্জোয়া রাষ্ট্র কোনদিন কোন সুসঙ্গত, দৃঢ়-নীতি গ্রহণ করেনি।

শান্তির স্বপক্ষে, ফ্যাশিস্ত যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় সোভিয়েত ইউনিয়ন চিরকালই একক সংগ্রামী।

কিন্তু পররাজ্যলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির যুদ্ধ পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্যে সেকালের একমাত্র সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েতের শক্তি, অন্যান্য দেশে শান্তির সংগ্রামী থাকা সত্বেও যথেষ্ট ছিল না। যদি সেদিন কয়েকটি পুঁজিবাদী দেশের শাসকশ্রেণী ও জনসাধারণের শান্তির সংগ্রামে শরিক হতে রাজী হতো, তাহলে হয়তো যুদ্ধকে এড়ানো সম্ভবপর হতো। নোতুন বিশ্বযুদ্ধের অংশের প্রতিহত করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন নানা দেশ ও সরকারের এক যৌথ প্রচেষ্টার প্রস্তাব করেছিলেন। ইউরোপে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনের সোভিয়েত প্রস্তাবের মৌল উদ্দেশ্য ছিল তাই।

কিন্তু যৌথ নিরাপত্তার সেই প্রস্তাব পররাজ্য আক্রমণকারী ও তাদের সহায়করা স্পষ্টতই ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করে। হিটলারের শাসন ব্যবস্থা সরকারীভাবে ঘোষনা করে যে তারা এই নীতি সমর্থন করে না এবং আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সব রকমের পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির তারা বিরোধী। তাদের কাছে অবশ্য এটাই প্রত্যাশিত ছিল। পররাজ্যলোলুপতাই তাদের যৌথ নিরাপত্তা প্রস্তাবের বিরোধিতার একমাত্র কারণ। কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেনের শাসকশ্রেণীও সরাসরি এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় এগিয়ে এলেন।

মার্চ উনিশ শ' পঁয়ত্রিশের শেষাশেষি বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন সাইমন এলেন বার্লিনে, হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। নাৎসী অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে গড়ে উঠলো যৌথ প্রতিরক্ষা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইঙ্গ জার্মান মোর্চা। দেশে ফিরে, হিটলারের মতামত সম্পর্কে সমর্থন সূচক মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন :

"হের হিটলার স্পষ্টতই বলেছেন, তিনি জানান, 'যে জার্মানী এমন কোন প্রাচ্য চুক্তিতে (Eastern Pact) রাজী নয়, যাতে সে পারস্পরিক সাহায্য দানের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশেষ করে জার্মানী রাশিয়ার সঙ্গে কোন পারস্পরিক সাহায্যদানের চুক্তিতে আবদ্ধ হতে রাজী নয়।.........তাছা ছাড়া প্রসঙ্গান্তরে আলোচনার সময় হের হিটলার পররাজ্য আক্রমণকারীকে সঠিকভাবে নির্দেশিত করার অসুবিধার বিষয়েও উল্লেখ করেন। যখন তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে এই ধরণের চুক্তিতে আবদ্ধ দেশগুলি যদি নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যদানে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তাতে তাঁর মন্তব্য কি, হের হিটলার জবাবে বলেন এই ধারণাটাই মারাত্মক।"১২

ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলি জার্মানী, বৃটেন ও আমেরিকার যৌথ চাপে পড়ে একে একে সোভিয়েতের যৌথ নিরাপত্তর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো। কিন্তু জনসাধারণের দাবীকে উপেক্ষা করতে না পেরে ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়া সরকার, উনিশ শ' পঁয়ত্রিশে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। এমন কি এঁরাও যদি পরবর্তীকালে আন্তরিকতার সঙ্গে চুক্তির সর্তাবলী পালন করে চলতেন, তাহলে নাৎসী আক্রমণকে প্রতিহত করার ব্যাপারে এই চুক্তিগুলি কার্যকরী হতে পারতো। কিন্তু সুরু থেকেই সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, ফ্রান্স ও চেকোশ্লোভাকিয়ার সরকার চুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে জাতিপুঞ্জকে (League of Nations) শান্তির যৌথ রক্ষক হিসেবে সক্রিয় করে তুলতে, যাতে ফ্যাসিস্তদের পররাজ্য আক্রমণ যা ততোদিনে সুরু হয়ে গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টারও কোন ফল হয় নি। জাতিপুঞ্জের প্রথম সারির সদস্য হিসেবে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার, আক্রমণকারীকে প্রতিহত করা দূরে থাক্, সব রকমে আক্রমণের পথ প্রশস্ত করতেই তৎপর ছিলেন বেশি। সোভিয়েত প্রস্তাবে জাতিপুঞ্জের ঔদাসীন্য এবং স্বেচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয় অসহায় ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহের সেটাই হলো মৌল কারণ। বরং সমস্ত রকমে পররাজ্যলোলুপতাকে প্রশ্রয়দানের কলুষে সে নিজেকে কলঙ্কিত করেছে, যা' শেষ পর্যন্ত ডেকে এনেছে তার অপমৃত্যু।

সমগ্রভাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংহতি স্থাপনের প্রচেষ্টাও তখন সফল হয়ে

ওঠেনি। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক আন্দোলন তখন দ্বিধা বিভক্ত। তাদের নেতৃত্ব করেছে দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রেটিক নেতৃবৃন্দ। যাঁরা ফ্যাসিবাদ ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টদের যৌথ ভূমিকা গ্রহণের সমস্ত প্রস্তাবকে নিয়মিতভাবেই বর্জন করে চলেছেন। আর এই সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে এমনই একটা সময়ে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে ঐক্যের দাবী যখন প্রবল হয়ে উঠেছে। সাধারণতন্ত্রী স্পেনকে মেহনতী মানুষ যে সাহায্য দান করেছে তা আন্তর্জাতিক মেহনতী মানুষের সংহতির একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত। স্পেনের রণক্ষেত্রে ফ্যাসিস্ত-দের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছেন চুয়ান্নটি দেশের মানুষ—দেশপ্রেমিক তাঁরা, যাঁদের মধ্যে আছেন কমিউনিষ্ট, সোস্যালিষ্ট, ক্যাথলিক, নানা পাতি বুর্জোয়া দলের সদস্য আর অসংখ্য নির্দলীয় লোক। তাঁরা জানতেন ইটালী জার্মানীর ফ্যাসিবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা তাঁদের নিজেদের দেশ, দেশের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা করছেন।

শান্তির আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠার জন্যেই সোভিয়েতের মানুষ সাহায্য করেছে ইথিওপিয়া স্পেনে ও চীনের সাধারণ মানুষের সংগ্রামে।

শান্তির স্বপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগ্রাম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু শান্তির স্বপক্ষে এই নিরন্তর প্রচেষ্টার পাশাপাশি অনন্যোপায় হয়ে সোভিয়েতের সমর বাহিনী ও সাধারণ মানুষ নিজেদের প্রস্তুত করে তুলেছে যে কোন অতর্কিত ফ্যাশিস্ত আক্রমণের জন্যে।

১। লেনিন: The National Liberation Movement in the East, মস্কো ১৯৫৭ পৃঃ ৯৮

২। ঐ: On Britain, মস্কো পৃঃ ৩৮৫

৩। The International Military Tribunal, ন্যুরেমবার্গ, ১৯৪৭, দ্বিতীয় খণ্ড. পৃঃ ২৮৮

৪। সারা আর. স্মিথ: The Manchurian Crisis, 1931-32, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, নিউইয়র্ক ১৯৪৮, পৃঃ ১৪৯-৫০

৫। রিচার্ড ডবলিউ ভ্যান অ্যালস্টিন: American Diplomacy in Action, ষ্ট্যান-ফোর্ড, ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৪৭, পৃঃ ৩৯৯

৬। মেইন কাম্ফ মিউনিক, ১৯৪২, পৃঃ ১৫৪.
৭। কুর্ট জি. ডাব্লিউ. লুডেককে ; I knew Hitler, নিউ ইয়র্ক ১৯৩৮, পৃঃ ৪৬৮.
৮। ষ্টাটগার্টে প্রকাশিত (১৯৪৯) একটি জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থ.
৯। এ. মুলার : Germany's War Machine. ১৯৩৬, পৃঃ ৩০
১০। হেরম্যান রাউশনিগ.: Hitler speaks. লণ্ডন ১৯৩৯, পৃঃ ৪৬,৪৭.
১১। The Fortnightly Review. জানুয়ারী ১, ১৯৩২, পৃঃ ৪৬, ৪৭.
১২। The Times, এপ্রিল ১০, ১৯৩৫.

দ্বিতীয় অধ্যায়

মিউনিক চুক্তি ও তার পরিণাম

একের পর এক পররাজ্য আক্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে জার্মানী আর ইটালী গড়ে তুললো বার্লিন রোম "অক্ষ"। সেটা হলো পঁচিশে অক্টোবর উনিশ শ' ছত্রিশ সালের কথা। ইউরোপের দেশগুলির বিরুদ্ধে তারা গ্রহণ করলো একটি যৌথ কর্মসূচী। এরই ঠিক একমাস পরে পঁচিশে নভেম্বর, জার্মানী জাপানের সঙ্গে এক সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। আর পরের বছরেই ইটালীও যোগ দিল সেই চুক্তিতে।

বিশ্ব বিজয়ের মূল লক্ষ্যটিকে আড়ালে রাখার জন্যে এবং সমকালীন ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসী শাসকশ্রেণীর আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় তারা এই সামরিক চুক্তির নামকরণ করলো "কমিণ্টার্ন বিরোধী" জোট। চুক্তির সরকারী ভাষ্যে স্পষ্টতই ঘোষণা করা হলো স্বাক্ষরকারীদের স্বদেশে ও বিদেশে কমিণ্টার্নের কার্য কলাপ প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্য। যদিও তার গোপন অংশে ঘোষিত করছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সমরায়োজনের যৌথ প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু চুক্তির এই নির্লজ্জ "কমিণ্টার্ন বিরোধী" আবরণ থাকা স্বত্বেও, এর মুখ্য কার্যকারিতা সফল হয়েছে প্রচুর। ফ্যাসিস্ত আক্রমণকারীরা এর আবরণের সুযোগে তাদের যুদ্ধের পরিকল্পনাকে সফল করে তুলেছে এবং এমনভাবেই যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে দেশে দেশে যাতে ক্রমান্বয়ে নোতুন রাষ্ট্র, পৃথিবীর নোতুন অঞ্চলে তা' বিস্তৃত হয়ে পড়তে পারে।

এলো উনিশ শ'. আটত্রিশ সাল—ইউরোপের যুদ্ধপূর্ব বছর। বিরাট, বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জুড়ে তখন লড়াই চলেছে। চীনের মানুষ অসমসাহসিকতায় সাম্রাজ্যবাদী জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে চলেছে। ফ্যাশিস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করার সংগ্রামে স্পেনের মেহনতী মানুষ লড়াই করছে। কিন্তু তা সত্বেও ইউরোপের বেশির ভাগ অংশেই তখনো শান্তি বিরাজ করছে।

বৃহৎ শক্তিবর্গ তখনো একে অন্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঞ্জা কষতে সুরু করেনি।

পুঁজিবাদের অসম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিকাশ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইন্ধন যুগিয়ে চলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালের মতোই জার্মানী অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকে বেশি অগ্রগতি সম্ভব করে তুলে দারুণ সাফল্যের সঙ্গে পৃথিবীর বাজারে ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থকে ব্যাপৃত করে চলেছে। আমেরিকার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন। মৌল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জার্মানী সমস্ত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে অগ্রনী। উনিশ শ' সাইত্রিশের শরৎকালের পর অবস্থাটা যেন চরমে গিয়ে পৌঁছতে চললো। একটা নোতুন অর্থনৈতিক সংকট আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্সের জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করতে লাগলো। অথচ তারই পাশাপাশি জার্মানী ইটালী ও জাপানের অগ্রগতি রয়ে গেল অব্যাহত। কারণ তারা অতদিনে তাদের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমরায়োজনের অঙ্গীভূত করে নিয়েছে।

ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা নীচের এই তালিকা থেকে বোঝা যায়:

পুঁজিবাদী দেশগুলির ১৯৩৭ সালের উৎপাদন[১]

	লৌহ মিলিয়ন টন হিসাবে	ইস্পাত মিলিয়ন টন হিসাবে	অ্যালুমিনিয়াম হাজার টন হিসাবে	মোটর হাজার সংখ্যা হিসাবে
জার্মানী ...	১৬	১৯.৪	১২৭.৬	৩৩১
বৃটেন ...	৮.৬	১৩.২	১৯.৩	৫০৪
ফ্রান্স ...	৭.৯	৭.৯	৩৪.৫	২২৭
ইটালী ...	০.৮	২.১	২২.৯	৭২

এই পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় লৌহ, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে জার্মানী, বৃটেন, ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রনী। বিশেষ করে অ্যালুমিনিয়ামের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দ্রব্যের উৎপাদনে তার অগ্রগতি রীতিমতো লক্ষ্যনীয়। রপ্তানী বানিজ্যের মোট পরিমাণে জার্মানী তখন ফ্রান্সকে

অতিক্রম করে, প্রায় বৃটেনের সমকক্ষ হয়ে এসেছে। এই সব অর্থনৈতিক কারণগুলিই যুদ্ধের সম্ভবনাকে ত্বরান্বিত করে তুললো।

ইঙ্গ মার্কিণ ও ফরাসী সরকার যথারীতি আন্তঃ সাম্রাজ্যবাদী বিরোধিতাকে প্রশমিত করার জন্যে জার্মানীর সমরলিপ্সাকে চালনা করতে চাইলেন পূর্ব দিকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা স্বত্বেও হিটলারের সাড়া এলো বেশ ধীর মন্থর গতিতে। স্বভাবতই তারা বেছে নিলেন ভিন্ন পথ। হিটলারের অভিযানকে নোতুন কোন দিকে, ভিন্ন মুখে প্ররোচিত করতে হবে। সুরু হলো এক দীর্ঘ গোপন বৈঠকের পালা। একদিকে তার পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিরা অন্য দিকে নাৎসী নায়কেরা। তখন নভেম্বর মাস, উনিশ 'শ সাঁইত্রিশ সাল।

বৃটেনের তদানীন্তন লর্ড প্রিভিসীল, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স, যিনি পরবর্তী কালে পররাষ্ট্র সচিব হয়েছিলেন মিলিত হলেন হিটলারের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ওবেরসাল্‌জ্‌বার্গ শহরে। প্যারীতে জার্মাণ রাষ্ট্রদুত ভেলজ্‌-শকের সঙ্গে বৈঠক বসলো ফরাসী মন্ত্রীদের। আর গেষ্টাপোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা সুরু করলেন চেকোশ্লাভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি বেনেস। এবং শেষতঃ হলেও কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এমন এক গোপন বৈঠক বসলো আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্‌কোতে। তাতে যোগ দিলেন আমেরিকার পক্ষে সাতজন প্রখ্যাত শিল্পপতি ও রাজনীতিক—দ্যু পঁ, ভ্যাণ্ডেনবার্গ, স্লোয়ান ইত্যাদি এবং অন্য দিকে দু'জন নাৎসী নায়ক ব্যারন ফন টিপ্‌লস্কার্চ ও ব্যারন ফন কিলিঙ্গার। সময়টা সেই নভেম্বর উনিশ শ' সাইত্রিশ।

এই সমস্ত আলোচনা বৈঠকে পশ্চিমী গণতন্ত্রের প্রতিনিধিরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন হিটলারের নীতির কেমন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তিনি জার্মানীর বিখ্যাত মানুষদের বশীভূত করেছেন। "বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে জার্মানী যে একটা শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি" 'হিটলারের এই দাবীর সোচ্চার সমর্থনে জার্মানীর চরম রাষ্ট্রাদর্শ সম্বর্দ্ধিত হলো। প্রাচ্য অভিযান সম্পর্কে হিটলারকে আভাসে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেওয়া হলো তাঁদের সম্মতি এবং বলা হলো তাঁকে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লো-ভাকিয়া, পোল্যাণ্ড বিজয় অভিযান পরিকল্পনা যেন তিনি ত্বরান্বিত করেন, যাতে জার্মানীর সমরায়োজন নোতুন দখলের সম্পদে পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং এমন কিছু সামরিক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ স্থান তাঁর পদানত হয় যা ভবিষ্যত অভিযানে

কাজে আসতে পারে। এই গোপন চুক্তিতে আমেরিকার একচেটিয়া কারবারী-দের হিটলারকে খুশি করার প্রচেষ্টা ছিল সবচেয়ে বেশি।

স্যান ফ্রান্সিস্কো বৈঠকে তাঁরা ও জার্মান প্রতিনিধিরা একমত হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে "রাশিয়া ও চীনের ভূখণ্ডে বিরাট বাজার সংগঠিত করার কাজে" জার্মানী ও আমেরিকা পরস্পরকে সাহায্য করবে। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে এটা ছিল দুই বিরাট সাম্রাজ্যবাদী দাবীদারের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীকে আপোষে ভাগ করে নেওয়ার একটা পরিকল্পনা। কিন্তু তদানীন্তন পরিস্থিতি, সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তুলে, এই সব পবিকল্পনার রূপায়ন ব্যাহত করে দেয়।

আমেরিকার নীতিনিয়ামকরা চেয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদীশক্তিদের নিয়ে এমন একটা সোভিয়েত বিরোধী মোর্চা গঠন করতে যাতে নেতৃত্ব থাকবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর যার চরম আঘাত হানার শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করবে হিটলারের জার্মানী। উনিশ শ' আটত্রিশ সালের জানুয়ারী মাসে ওয়াশিংটনে আমেরিকার প্রস্তাবিত পঞ্চশক্তি সম্মেলনের মূল রাজনীতি ছিল তাই। তাতে যোগ দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালী। মার্কিণ শাসকগোষ্ঠী এই সম্মেলনের মাধ্যমে ফ্যাশিবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সামরিক চুক্তি স্থাপনের কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিতে অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা বৃটেনের শাসকশ্রেণীর মনঃপুত ছিলনা। কারণ তাঁদেরও ছিল এক নিজস্ব চিন্তা। স্বভাবতই ওয়াশিংটন সম্মেলনের প্রস্তাব রূপায়িত হওয়ার কোন সুযোগই ছিল না। কিন্তু এই পরিকল্পনারই মৌন বক্তব্য কিছুকাল পরে কার্যকরী করা হলো মিউনিক সম্মেলনে, যদিও তখন অংশগ্রহণকারী শক্তিবর্গের মধ্যে কিছুটা রদবদল হয়ে গেছে।

অষ্ট্রিয়া দখলের উদ্যোগপর্বে হিটলারের জার্মানী কিছুটা বিবেকের তাড়নায় অস্বস্তিবোধ করছিল। নাৎসী নায়কেরা স্থির নিশ্চিত হতে পারছিলেন না যে এজাতীয় একটা পররাজ্য আক্রমনের দৃষ্টান্ত নিশ্চয়ই প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে স্থাপন করা যাবে না। জার্মানীর অষ্ট্রিয়া অভিযানের নামকরণ করা হয়েছিল অটো কার্যক্রম (operation Otto)। তাতে একথাও ভাবা হয়েছিল যে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তি প্রতিআক্রমণ করলে কি ধরণের সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ইঙ্গমার্কিণ কর্তারা নাৎসীদের এই ভয় সম্পর্কে যথেষ্ট

অবহিত ছিলেন। তাঁরা তৎপর হলেন হিটলারের আশঙ্কা দূরীভূত করতে আমেরিকার তরফ থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হার্বাট হুভারকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ইউরোপে পাঠান হলো। বার্লিনে তিনি সাক্ষাৎ করলেন হিটলার ও গোয়েরিংয়ে সঙ্গে। শলাপরামর্শ করে জেনে নিলেন জার্মানীর উদ্দেশ্য এবং আশ্বস্ত করে গেলেন নাৎসী নায়কদের যে জার্মানীর অভিযানে আমেরিকার আপত্তির কিছু নেই। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে হুভার জানান যে পশ্চিমী গণতন্ত্র যদি ফ্যাশিবাদের পূর্বমুখী অভিযানে কোন বাধা সৃষ্টি না করে, তাহলে জার্মাণী বা তার কোন অনুগামী রাষ্ট্রের পশ্চিমের বিরুদ্ধে লড়াই করার কোন বাসনা নেই।

বৃটেনের তরফ থেকে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন স্যার নেভিল হেণ্ডারসান। তিনি জার্মানীতে ইংল্যাণ্ডের রাজদূত। হিটলারকে তিনি স্পষ্টতই জানিয়ে দেন যে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ডানজিগে হিটলারী অভিযান অব্যাহত দেখতে বৃটেনের পূর্ণ সম্মতি আছে। বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন ঘোষণা করলেন যে ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রদের জাতিপুঞ্জের তরফ থেকে এমন কোন আশ্বাস দেওয়া অনুচিত যে তারা আক্রান্ত হলে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।৩

আরেকটি বক্তৃতায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে ক্ষুদ্র কোন রাষ্ট্রে আক্রান্ত হলে একমাত্র তখনই তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে পারে যদি তার কোন শক্তিশালী বন্ধুরাষ্ট্র রক্ষক হয়ে প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেয়।৪ সেখানে তিনি এই মন্তব্যই করেন যে অষ্ট্রিয়ার এমন কোন বন্ধু নেই।

এগারোই মার্চ, উনিশ শ' আটত্রিশ, জার্মাণ সৈন্য হুড় হুড় করে অষ্ট্রিয়া ঢুকে সমগ্র দেশটা অধিকার করে ফেললো। দু'দিন পরে ঘোষণা করা হলো অষ্ট্রিয়াকে জার্মানীর একটি পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ হিসেবে। এই পররাজ্য আক্রমনের বিরুদ্ধে কোন পুঁজিবাদী দেশের পক্ষ থেকে কোন আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদও করা হলোনা। বরং বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষ থেকে ত্বরায় এই একীকরণ (Anschluss) স্বীকার করে নেওয়া হলো। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েনায় রাষ্ট্রদূতাবাস বন্ধ করে, পরিবর্তে একটা বাণিজ্য দপ্তর (Consulate) খুললেন। মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল ওয়াশিংটনস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূত ডিয়েকশফের সঙ্গে এক দীর্ঘ বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা করলেন। রাষ্ট্রদূত বার্লিনে

প্রেরিত বিবরণীতে জানালেন যে "অল্প যে কয়েকটি প্রশ্ন তিনি (কর্ডেল হাল) আমায় করেছিলেন তাতে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আমাদের কাজের তাৎপর্য সম্পর্কে তাঁর পুরো ধারনা আছে।"৫ মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা অষ্ট্রিয়া দখলীকরণের প্রতিক্রিয়ায় জার্মানীকে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দ্রব্যের উৎপাদনের শিল্প অনুমতি দান করলেন। এমন কি ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর ক্যথলিক অষ্ট্রিয়া জবরদখলের বিরুদ্ধে ভ্যাটিক্যান থেকেও কোন প্রতিবাদ ধ্বনিত হলোনা।

নাৎসীদের অষ্ট্রিয়া দখলে সমর্থন জানিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠী মধ্য ইউরোপে জার্মাণীর একাধিপত্য স্থাপনে যে সহায়তা করলেন, তা তাঁদের জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর মাত্র। অষ্ট্রিয়া দখল নাৎসী জার্মাণীর সমর পরিকল্পনায় যে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাদান করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য তথ্য ও দলিল থেকে।

নভেম্বর উনিশ শ' তেত্রিশে গলিয়েটারদের (Gauleiter) এক গোপন সভায়, হিটলারের অভিযান-অধিনায়ক জোড্‌লের প্রদত্ত এক বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত করলেই এর প্রকৃষ্ট রূপ পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন: "অষ্ট্রিয়া দখলীকরণ (Anschluss) শুধুমাত্র একটি জাতীয় লক্ষ্যের পূর্ণতাসাধন নয়। এর ফলে আমাদের সামরিক শক্তি যেমন বর্দ্ধিত হয়েছে তেমন আমাদের অবস্থানের গুরুত্বও বাস্তবক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভূখণ্ড ভয়াবহ ভাবে জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রসারিত হয়েছিল (ফ্রান্সের দিক থেকে অবতরণের এক ক্ষেত্র, মিত্রপক্ষ বিশেষ করে রাশিয়ার পক্ষে বিশেষ ব্যবহারোপযোগী এক বিমান ঘাঁটি হিসেবে), কিন্তু পরে সেই চেকোশ্লোভাকিয়াই জার্মান ভূখণ্ডের দুই পাশে চাপের ফলে সাঁড়াশীর মধ্যে আটকে পড়েছে। তার সামরিক গুরুত্ব এমন সংকটপূর্ণ যে, পশ্চিমের কোন সামরিক সাহায্য কার্যকরীভাবে এসে পড়ার পূর্বেই যে কোন প্রবল আক্রমণের সামনে তার অনিবার্য পতন ঘটবে।"৬

অষ্ট্রিয়ার দখলীকরণ বাস্তবিকই আক্রমণোদ্যত জার্মাননীতির সামনে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে এক জার্মান "সাঁড়াশীর" মধ্যে আটকে ধরেছিল। সন্দেহ নেই এই পরিস্থিতিতেও সোভিয়েতের সামরিক সাহায্য তাকে অনেকাংশে দুর্দশামুক্ত করতে পারতো। সেই জন্যেই পশ্চিমী শক্তিবর্গ

অষ্ট্রিয়া দখলীকরণের পরে, কোন রকম সামরিক সংঘর্ষ ঘটে যাওয়ার পূর্বেই চেকোস্লোভাকিয়া জার্মাণীর হাতে তুলে দিতে তৎপর হয়ে উঠলেন।

অষ্ট্রিয়ার ভৌগোলিক অবস্থিতি জার্মাণী থেকে ইটালী, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া ও বলকান উপদ্বীপের অন্যান্য দেশে যাওয়ার পথে অষ্ট্রিয়া ছিল সেতুর মতো। দক্ষিণপূর্ব ইউরোপে পরবর্তীকালে সমস্ত জার্মান অভিযানে অষ্ট্রিয়ার সবিশেষ সামরিক গুরুত্ব বারেবারে প্রমানিত হয়েছে।

পরবর্তী কালের ঘটনাবলীর উপর অষ্ট্রিয়া দখলীকরণের প্রভাব সম্পর্কে দুজন মার্কিন ইতিহাসবিদ্ হাইনেস ও হফ্ম্যান মন্তব্য করেছেন:

"সমকালের আন্তর্জাতিক অরাজকতায় আন্সলাস (অষ্ট্রিয়া দখলীকরণ) একটি প্রথম শ্রেনীর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। চেকোস্লোভাকিয়াকে অন্যদেশের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত করে উপযুক্ত সময়ে পদানত করার বিশেষ সুযোগ এতে এসে পড়লো জার্মানীর কাছে। এরই ফলে জার্মানীর সীমান্ত বিস্তৃত হয়ে পড়লো সরাসরি বলকান অঞ্চলে এবং তার নোতুন পূর্বাঞ্চল প্রসারনীতি (Drang nachosten) কার্যকরী করার সুযোগ এসে গেল। ফলতঃ এই দ্বিবিধ সুবিধা পাওয়ার পরে জার্মাণী যে কৌশলে স্নায়ুযুদ্ধ এতোদিন চালিয়ে যাচ্ছিল, তা আরো দক্ষভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রলাভ করলো। তাছাড়া আন্সলাস্ ইটালীকেও অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে দিল জার্মাণীর সঙ্গে। মুসোলিনীর নিজের ইচ্ছামতো কাজের স্বাধীনতা গেল কমে।...শেষে একথাও বলতে হয় যে আন্সলাস বৃটেন ফ্রান্সের মর্যাদা ও শক্তির গুরুত্বকে ম্লান করে দিল।"[৭]

জার্মাণীর অষ্ট্রিয়া দখলের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সোভিয়েত সরকার যথা সময়েই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। বুর্জোয়া সরকারগুলির নিস্পৃহতার পথ পরিত্যাগ করে, তাঁরা সরকারীভাবে জার্মাণীর অভিযানের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে, সমস্ত পররাজ্য আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণের আবেদন জানান। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে, যা পরে সমস্ত সরকারের কাছে পাঠান হয়, সোভিয়েতের বৈদেশিক সম্পর্কের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বলেন:

"এবারে আক্রমণ ঘটলো একেবারে মধ্য ইউরোপে, যা শুধু আক্রমণকারী দেশের এগারোটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পক্ষেই নয়, সমগ্র ইউরোপের কাছেই নির্ভুলভাবে বিপদের গুরুত্ব উপস্থিত করেছে। আর শুধু ইউরোপ কেন, সমস্ত দেশের সামনেই সে বিপদ সমুপস্থিত। এতোদিন পর্যন্ত বিপদ ছিল শুধু ক্ষুদ্র

রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব কিম্বা আরো বেশি হলে তাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সামনে। কিন্তু তাদের এই অনিবার্য পরাধীনতা, বৃহদায়তন দেশের উপর উপর চাপসৃষ্টি ও তাদের উপর আক্রমনের পথ প্রশস্ত করবে।"৮

সোভিয়েত সরকার এও প্রস্তাব করলেন যে হয় জাতিপুঞ্জের কাঠামোর মধ্যে না হয়তো অন্য কোথাও বিভিন্ন রাষ্ট্রের, বাস্তব অবস্থার নিরিখে এখনই কার্যক্রম ঠিক করা উচিত। সমস্ত দেশ বিশেষত বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে তাঁরা আবেদন করলেন, "শান্তিরক্ষায় যৌথভাবে আত্মনিয়োগ করার জন্যে।"৯

বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর অধস্তন কর্মচারীদের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি জবাব পাঠাতে বিশেষ দেরী করেননি। তাতে বলা হলো যে বৃটিশ সরকার আক্রমনের বিরুদ্ধে যৌথ নিরপত্তার অবলম্বনের কোন আলোচনা অবান্তর বলে মনে করেন। কারণ ইউরোপে শান্তি রক্ষায় তার কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই।১০

বৃটিশ সরকারের এই প্রত্যাখ্যান লিপির মধ্যে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। যেকোন যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাতে অংশ গ্রহণেই বৃটিশ সরকার গররাজী ছিলেন, কারণ ফরাসী ও মার্কিণ সরকারের মতো তাঁদেরও নীতি ছিল হিটলারের সামরিক অভিযানে প্রশ্রয়দান। স্বভাবতই চেকোস্লোভাকিয়ার ভাগ্য ঘটনাবলীর আবর্তে অনিশ্চিত ভাবে ঝুলে রইলো।

॥ দুই ॥

অস্ট্রিয়া দখলের রেশ ভালো করে কাটতে না কাটতেই ইঙ্গ মার্কিণ ও ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী হিটলারকে নোতনতর অভিযানের জন্যে প্ররোচিত করতে থাকলো। ডেলি এক্সপ্রেস পত্রিকা অভিমত প্রকাশ করলো যে অষ্ট্রিয়ার আন্‌সলাসের ফলে অবস্থার কোথাও কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ হিটলারের অষ্ট্রিয়া অভিযানের পূর্বেও অষ্ট্রিয়া একটা জার্মাণ দেশই ছিল। পত্রিকার মতে, অন্য কোন বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে বৃটেনের নিজের কাজেই মনোনিবেশ করা উচিত, আর এই অন্য বিষয়ের মধ্যে চেকোস্লোভাকিয়ার ব্যাপারটিও আছে। বলা বাহুল্য একে রূপোর থালায় চেকোস্লোভাকিয়াকে হিটলারের পায়ে উপ-ঢৌকন দেওয়া ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। কিন্তু কথাটা যতো সহজে বলা যায়, কোন কাজ ততো সহজে করা সম্ভব নয়। সোভিয়েতের শান্তিনীতি,

চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের দেশপ্রেম বুর্জোয়া দেশগুলিতে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক জনমত, হিটলারের চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারেরর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তাই দেখা যায় চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নটি মীমাংসা হতে (হিটলারের অনুকূলে) বেশ কয়েকমাস সময় কেটে গেছে।

সুরুতে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা ভেবেছিল চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করতে সশস্ত্র অভিযান করতে হবে। হিটলার এই নির্দেশনামায় লিখেছিলেন, "অদূর ভবিষ্যতে সামরিক অভিযান চালিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে চূর্ণ বিচূর্ণ করতে আমি বদ্ধপরিকর।"১১ তারই জন্যে গ্রন (grun) পরিকল্পনা নামে এক অভিযানের কার্যক্রম স্থিরীকৃত হলো। প্রাগস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূতের হত্যাকাণ্ড এই অভিযানের অজুহাত হবে বলে মনে করা হয়েছিল।

কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষও নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম করতে বদ্ধপরিকর ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষনা করেছিলেন যে পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তির সর্তানুযায়ী তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়াকে প্রয়োজনীয় সমস্ত সাহায্য করতে প্রস্তুত। এতে ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের যুদ্ধস্পৃহা কিছু পরিমাণে প্রশমিত হয়ে পড়ে। এ' ব্যাপারে মুখোমুখি সশস্ত্র সংগ্রামের সম্ভাবনা নাৎসী নায়ক ও ইঙ্গ মার্কিণ ও ফরাসী শাসক শ্রেণীর মধ্যে তাদের রক্ষক কারো বিশেষ মনঃপুত ছিল না। পরিশেষে তাই গ্রুন পরিকল্পনা বাতিল করে, চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যার একটি অসামরিক "সমাধানের" পথ খুঁজে বের করার তোড়জোড় সুরু হয়ে গেল।

মার্কিণ, ইংরেজ, ফরাসী কুটনীতিবিদদের তখন আর ফুরসৎ নেই, জোর কাজ চলেছে : সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সামনার ওয়েলস ও ব্যাঙ্কর বার্ণাড বারুচ্ চললেন ইউরোপে। দু'জনেই তাঁরা হিটলারকে খুশি করার জন্যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিয়ে পড়লেন। সামনার ওয়েলস তো ফরাসী মন্ত্রীদের সতর্ক করে দিলেন তাঁরা যেন চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে জার্মানীর সঙ্গে কোন লড়াইয়ে জড়িয়ে না পড়েন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন এই যুদ্ধে আমেরিকা একটি সৈন্য বা এক পয়সা ঋণ দিয়েও সাহায্য করবে না। ইউরোপের দেশে দেশে মার্কিণ রাষ্ট্রদূতরা—তাদের মধ্যে পারীর উইলিয়াম বুলিট, লণ্ডনে জোসেফ কেনেডী এবং বার্লিনে হিউ উইলসন, সচেষ্ট হলেন কেমন করে হিটলারের পায়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে নতি স্বীকার করানো যায়।

এই সময়ে ফরাসী ও বৃটিশ সরকার একটি যৌথ প্রতিনিধিদল গঠন করে প্রখ্যাত হিটলার অনুগামী ইংরেজ কূটনীতিবিদ লর্ড র‍্যান্সিম্যানকে তার নেতৃত্বের ভার প্রদান করেন। চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যায় সমাধানের জন্য সুপারিশ করার ভার দেওয়া হলো এর উপর। প্রস্তাবগুলি ঘোষিত হতে কিন্তু বিশেষ দেরী হলো না। র‍্যান্সিম্যান প্রতিনিধিদল দাবী করলেন যে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদেতান অঞ্চল জার্মানীকে ছেড়ে দিতে হবে; চেকোশ্লোভাকিয়ায় সমস্ত ফ্যাশি-বিরোধী প্রচার বন্ধ করতে হবে; চেকোশ্লোভাকিয়ায় পারস্পরিক সাহায্য দান চুক্তি বাতিল করে দিতে হবে; এবং জার্মানীর অনুকূলে চেকো-শ্লোভাকিয়াকে একটি অর্থনৈতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে হবে।

র‍্যান্সিম্যানের সুপারিশগুলি আলোচনা করার জন্যে প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন দু'বার হিটলারের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে, প্রতিবারেই আরো কিছু বাড়তি সুবিধাদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রায় একই সময়ে বার্লিনস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত হিউ উইলসন চেক সরকারকে হিটলারের দাবী মেনে নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে সুরু করলেন। ইঙ্গ-মার্কিণ ও ফরাসী কূটনীতির যৌথ চাপে রাষ্ট্রপতি বেনেসের চেক সরকার গোটা দেশটাকে নাৎসীদের হাতে তুলে দিতে সম্মত হলেন। বুর্জোয়া চেক শাসকশ্রেণী নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামের জনপ্রিয় ফ্রন্ট গঠনের সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। শ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ায় ভয়ে, সোভিয়েতের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে আত্মসমর্পণের অবমাননার মধ্যে দেশ ও জাতিকে আহুতি দিতে তাদের বাধলো না। জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার এটা একটা চরম দৃষ্টান্ত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় ঐক্য রক্ষার সমর্থনে এগিয়ে এল দৃঢ়তার সঙ্গে। চুক্তির সর্ত অনুযায়ী চেকোশ্লোভাকিয়াকে সব রকমে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার আবার ঘোষনা করলো। চুক্তির বয়ানে বেনেসের পীড়াপীড়িতে স্বাক্ষরের সময় একটি বিশেষ সর্ত সংযোজিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে সোভিয়েত চেক চুক্তির সর্তাবলী যতোদিন ফ্রান্স, সোভিয়েত বা চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি তার দায়িত্ব পালন করবে, কেবল ততোদিনই কার্যকরী থাকবে। সেই চরম সংকটের মুহূর্তে যখন দেখা গেল যে ফ্রান্স তার দায়িত্ব পালনে আদৌ প্রস্তুত নয়, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন একথাও

ঘোষনা করলেন যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাহায্যদানের প্রশ্নে তাঁরা ঐ বিশেষ সর্তের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করছেন না। ফ্রান্সের ঔদাসীন্যে তাঁরা সাহায্যদান স্থগিত রাখতে চান না। সোভিয়েতের তরফ থেকে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হলো ফ্রান্স সাহায্য না দিলেও চেক সরকারকে তাঁরা সামরিক সাহায্যদানে প্রস্তুত। ঘোষনা করা হলো এমন কি বোয়ারের রুমানিয়া বা বেকের পোল্যাণ্ড ও যদি সোভিয়েত সৈন্যের গমনাগমনের অনুমতি না দেয় তাহলেও এই প্রতিশ্রুতি পালন করা হবে। অবশ্য সোভিয়েত সরকার শুধু এই টুকু দাবী করলেন, চেক সরকারকে তাঁরা মাত্র একটি সর্তে সাহায্য করবেন যে চেক সরকার নাৎসীদের প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত তারই জন্যে তাঁরা সোভিয়েত সাহায্যের অনুরোধ করেছেন।

শান্তিকামী মানুষের মনে সোভিয়েতের এই দৃঢ় বক্তব্য যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, সাম্রাজ্যবাদীরা চেষ্টা করলে তাকে বিনষ্ট করে দিতে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার শক্তি জাপানের শাসক শ্রেণীকে সোভিয়েত বিরোধী উস্কানি দিতে প্ররোচিত করলো। উনিশ শ' আটত্রিশ সালের গ্রীষ্মকালে জাপানী জঙ্গীবাদ লেক হাসানের কাছে সোভিয়েত ভূখণ্ডে সশস্ত্র অভিযান করে বসলো। আক্রমণের আসল উদ্দেশ্য ছিল প্রথমত সোভিয়েতের সামরিক প্রস্তুতি পরীক্ষা করে দেখা এবং দ্বিতীয়ত চেক সরকারকে প্রতিশ্রুত সাহায্যদানের প্রচেষ্টাকে দুর্বল করে দেওয়া।

কিন্তু হাসান অভিযানের ফল হলো একেবারে বিপরীত। সোভিয়েত সৈন্য জাপানী হানাদারদের চূর্ণ করে দিল। শেষে জাপ সরকার গোলমাল সৃষ্টি করে নিজেরাই যুদ্ধ বিরতির জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার তখন সংকটকাল সমুপস্থিত। হিটলারের দয়ার উপর যে তাকে শেষে ছেড়ে দেওয়া হবে তা আগেই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু বিশেষ কেউ তা জানতো না। একচেটিয়াপতিরা তাই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে শঙ্কিত হচ্ছিলেন। কারণ সাধারণ মানুষের ক্রোধের প্রকাশ তারা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাছাড়া ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি তখনো আসেনি। কারণ হিটলারের হাতে চেকোশ্লোভাকিয়া সঁপে দিয়েই কাজ শেষ হলো না। তারা চেয়েছিলেন চেকোশ্লোভাকিয়া দেশটাকে বিক্রী করে দিতে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে ইঙ্গ-মার্কিণ ও ফরাসী সরকার হিটলারকে চেকোশ্লো-

ভাকিয়া উপঢৌকন দিয়ে প্রতিদানে চেয়েছিলেন কিছু। সেটা হলো হিটলারের একটা প্রতিশ্রুতি। হিটলার তাঁর অভিযান পশ্চিম দিকে না চালিয়ে, শুধু পূর্ব দিকে চালাবেন।

হিটলারের সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির এই চুক্তিতে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীরা আবার সচেষ্ট হলেন নেতৃত্বের প্রত্যাশায়। মার্কিণ রাষ্ট্রপতির পর পর অনেক চিঠিতেই সেই উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করার মুখ্য ভূমিকা তখন পাকাপাকিভাবে ইংল্যাণ্ডের হাতে। আর কারো কাছে তা ছেড়ে দিতে তাঁরা একান্ত নারাজ। তাই মিউনিকে নাৎসীদের সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্সের যখন বৈঠক বসলো, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কোন আমলই দেওয়া হলো না।

হিটলারের সঙ্গে এই জঘন্য পাপাচারে গণবিক্ষোভ চাপা দেওয়ার জন্যে, ইঙ্গ-ফরাসী সরকার এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করলেন। দেশবাসীর মনে যুদ্ধের একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করা হলো। বৃটেনে, ফ্রান্সে লোক দেখানো সামরিক প্রস্তুতির একটা সাড়া পড়ে গেল। সংরক্ষিত সেনাবাহিনীকে আহ্বান করা হলো, বড়ো বড়ো শহরের পথে ঘাটে খোলা হলো বিমান-আক্রমণ-নিরোধক আশ্রয়কেন্দ্র, গ্যাস মুখোশ বিতরণ করা হলো জনগনের জন্যে এবং সুরু হলো নিষ্প্রদীপের মহড়া। এই প্রস্তুতির মূল লক্ষ্য ছিল লোককে এইটা বোঝানো যে হিটলারের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে চেকোশ্লোভাকিয়া দিয়ে আপদ শান্তি করা ভালো অথচ তখন আদৌ এই চরম সংকট উপস্থিত হয়নি। জার্মানী তখনো কোন বড়ো রকমের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত নয়। বরং সে নিজেই চাইছে সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়িয়ে চলত।

॥ তিন ॥

মিউনিকের বৈঠক বসলো সেপ্টেম্বরে মাসের শেষ দু'দিন নিয়ে। যোগদান করলেন চেম্বারলেন আর হ্যালিফ্যাক্স, দালাদিয়ের আর বোনেত, হিটলার আর রিব্বেনট্রপ এবং মুসোলিনী আর সিয়ানো। উদ্বোধনী ভাষণে হিটলার জানিয়ে দিলেন যে সম্প্রতি এক ক্রীড়াপ্রাসাদে তিনি ঘোষনা করেছেন যে পয়লা অক্টোবরের আগে জার্মাণ সৈন্য চেকোশ্লোভাকিয়া ঢুকবেনা। তাঁর কথা হলো এই বৈঠকের লক্ষ্য হচ্ছে কোন পক্ষেই অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার না করে চেক সমস্যার

সমাধান করা। নিজের উদ্বেগ চেপে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে, তিনি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে বৈঠককে আহ্বান জানালেন।

বৈঠকে হিটলারের পক্ষে ক্রীড়াপ্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতার উল্লেখ করাটা মোটেই আকস্মিক ঘটনা নয়। তিনি বলেছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়া হলো জার্মানীর "শেষ দাবী"। এই দাবী মিটে গেলেই তিনি পূর্বদিকে অভিযান সুরু করবেন। সুদেতান জার্মান সমস্যার মীমাংসার সময় হিটলার বলেছিলেন যে ইউরোপে আর কোন ভূখণ্ডের উপর তাঁর কোন দাবী নেই। অবশ্য তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে "ইউরোপ" বলতে তিনি শুধু পশ্চিম ইউরোপের কথাই বলেছেন। মিউনিক বৈঠকের আগেই ইঙ্গ-মার্কিন এবং ফরাসী সরকার ক্রীড়াপ্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতা সম্পর্কে সমর্থনসূচক মন্তব্য করেছিলেন। আটাশে সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্টে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের বক্তৃতায় তারই সমর্থন পাওয়া যায়।

বৈঠকে হিটলারের ক্রীড়াপ্রাসাদে প্রদত্ত বক্তৃতার উল্লেখ যথেষ্ট অনুমোদন লাভ করলো। চেম্বারলেন, দালাদিয়ের মুসোলিনী চট্ করে সম্মতি জানালেন তাঁদের। খোলাখুলি তাঁর বক্তব্য বলার জন্যে হিটলারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁরা মেনে নিলেন যে যাই হোক একটা কিছু খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের স্বীকার করলেন যে ফ্রাঙ্কো-চেক মৈত্রী চুক্তির সর্ত উপেক্ষা করে, চেক সরকারের সঙ্গে কোন রকম কথাবার্তা না বলেই তিনি জার্মানীর চেকোশ্লোভাকিয়া অভিযান অনুমোদন করেছেন। বৈঠকে চেম্বারলেন বেশ কয়েকবার ভাষণ দিলেন। তাঁর মতে চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপারে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি বৃটেন, ইঙ্গ-জার্মান মৈত্রীর দিকে একটা পদক্ষেপ বলে মনে করে। ইউরোপীয় রাজনীতির গতিতে আগামী দিনে এর প্রভাব অনস্বীকার্যরূপে দেখা দেবে।

মিউনিক চুক্তির পূর্ণবয়ান নিয়ে আলোচনা খুব দ্রুত সমাধা হয়ে গেল। চতুঃশক্তির স্বাক্ষর করতেও দেরী হলোনা মোটেই। দৃশ্যতঃ জার্মানী চেকোশ্লোভাকিয়ার কেবল সেই অঞ্চলগুলি পেল যেখানে জার্মান ভাষাভাষী সংখ্যালঘুরা বাস করে। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি হস্তান্তরিত হওয়ার পরিণাম হবে চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাভাবিক সীমান্ত ও সেখানকার সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জার্মানীর কুক্ষিগত হওয়া। চেক সরকার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস বা

স্থানান্তরিত, কোনটাই করতে পারবেন না। তাছাড়া পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরীর চেক ভূখণ্ডের উপর যে দাবী করে আসছে, তার মীমাংসার জন্যে চেকোশ্লো-ভাকিয়ার অভ্যন্তরে গণভোটের ব্যবস্থাও চুক্তিতে স্বীকৃত হলো। এই সব সর্ত পালন করলেই চেক সরকার তাঁদের "নোতুন সীমান্ত" রক্ষার আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি লাভ করবেন। কার্যতঃ মিউনিক চুক্তিতে চেক রাষ্ট্রের অবসান ঘোষিত হলো যাতে তার ভূখণ্ড জার্মানী, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারে।

বৈঠক শেষে যখন প্রতিনিধিবর্গ সভাকক্ষ ছেড়ে চলে গেছেন তখন চেক প্রতিনিধিদলকে ডেকে এনে দেখানো হলো স্বাক্ষরিত চুক্তিপত্র। ফরাসী মুখপাত্র তাদের মুখের উপর জানিয়ে দিলেন যে বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যা হবার হয়ে গেছে। এর বিরুদ্ধে আবেদন করে কোন রদবদল আর করা যাবে না। চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্যের উপর নেমে এলো যবনিকা।

পরদিন হিটলার ও চেম্বারলেন আবার আরেক বৈঠকে মিলিত হয়ে এক ঘোষণাপত্র জারী করলেন। তাতে বলা হলো যে তাঁদের দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধে যোগদান করবে না। এই ধরনের একটা ফ্রাঙ্কো-জার্মান ঘোষণাপত্রও আলোচিত হলো, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে তাতে স্বাক্ষর করা হয় আরো কিছুকাল পরে, ছয়ই ডিসেম্বর উনিশ শ' আটত্রিশ।

মিউনিক চুক্তির তাই দু'টি বিশিষ্ট লক্ষ্যণীয় দিক আছে। একদিকে হলো পশ্চিমী শক্তিবর্গের জার্মান সমরাভিযান পূর্বমুখী করে দেওয়ার উৎকণ্ঠা, যার জন্যে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হিটলারের দয়ার কাছে খেসারত হিসেবে তাঁরা বলি দিলেন। প্রত্যাশা এই যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াই না করে, জার্মানী লড়বে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে চেক ভূখণ্ড আত্মসাৎ করে জার্মানীর সমর শক্তি আরো জোরালো হয়ে উঠবে।

পশ্চিম ইউরোপে ফ্রান্সে হিটলারের সেরা গুপ্তচর ছিলেন অটো অ্যাবেৎস্। পশ্চিমের 'দেশগুলির বিরুদ্ধে জার্মান অভিযানের তিনি প্রস্তুতিপর্ব সমাধা করছিলেন তখন। রোজ নামচায় লিখেছেন তিনি, পূর্বদিকে যথেচ্ছ অভিযানের সুযোগ পাওয়ার জন্যেই হিটলার রাইন সীমান্তে স্থিতাবস্থা স্বীকার করে ছিলেন।'[১২]

মিউনিকের বিশ্বাসঘাতকতায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা খোলাখুলিভাবেই

তাঁদের উল্লাস প্রকাশ করলেন। জেনারেল মোটরের কর্তা, উইলিয়াম হাডসেন হিটলারকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা পাঠালেন। পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হালের মন্তব্য হলো, বৈঠকের ফলাফলে একটা "বিশ্বব্যাপী স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো।"[১৩] কেনেডী, বুলিট ও কারের কাছে তাদের যথার্থ "যোগ্যতাপূর্ণ" কাজের জন্যে অভিনন্দিত করে তারবার্তা পাঠালেন।[১৪] মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সামনার ওয়েলস, আমেরিকার শাসকশ্রেণীর মনোভাবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন :

যুদ্ধপূর্ব সেই বছরগুলিতে আমেরিকা সমেত পশ্চিমী গণতন্ত্রের দেশে দেশে, বড়ো বড়ো অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রতিভূরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হিটলার জার্মানীর মধ্যে কোন লড়াই বাধলে, তা তাঁদের স্বার্থের অনুকূল হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে এ যুদ্ধে রাশিয়া সুনিশ্চিতভাবে পরাজিত হবে আর তারই সঙ্গে নির্মূল হবে সাম্যবাদ। আর জার্মানীও যুদ্ধের ফলে এমনই দুর্বল হয়ে পড়বে যে যুদ্ধের পরে বহু বছর ধরে পৃথিবীর কাছে জার্মানী কোন আতঙ্ক উপস্থিত করতে পারবে না।" [১৫]

ঘৃণ্য মিউনিক চুক্তিকে তাই উপস্থিত করা হলো শান্তির স্বপক্ষে একটা চরম কৃতিত্ব বলে। বৃটেন ও ফ্রান্সে সামরিক প্রস্তুতির তোড়জোড় কমে এলো। সংবাদপত্র মিউনিকের "শান্তি প্রতিষ্ঠাতাদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। যদিও এই নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার পিছনে শান্তি রক্ষার কণামাত্র প্রচেষ্টাও ছিল না। এটা ছিল বরং নোতুন যুদ্ধের, আগামী যুদ্ধের প্রস্তুতি।

"মিউনিক চুক্তি" মার্কিন ইতিহাসবিদ হার্বার্ট ফিস লিখেছেন, "হিটলারকে চেকোশ্লোভাকিয়া ছিন্নভিন্ন করে দিতে কোন বাধা দেয়নি। এর পরে পড়ে রইলো পোল্যাণ্ড আর সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মান আক্রমণের সামনে একেবারে উন্মুক্ত।"[১৬] পশ্চিম জার্মানীর ইতিহাসবিদ মাইকেল ফ্রয়েণ্ড তাঁর Deutsche Geschichte গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে, "জার্মান সৈন্যের পদভরে যেদিন বোহেমিয়ার মাটী কেঁপে উঠেছিল, সেদিনই সারা পৃথিবীও উল্টে গিয়েছিল। ভার্সাই চুক্তির মূল বনিয়াদ সেদিন ধূলায় লুটিয়ে পড়লো। জার্মান রাইখের সামনে খুলে গেল পূর্ব অভিযানের পথ।"[১৭]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণী তখনো আশা করছেন যে জার্মানীকে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। ফ্যাশিবাদী

পররাজ্য আক্রমণের নীতিকে উৎসাহদানের পরিনতি ঘটলো মিউনিকে। চেকদেশের সাধারণ মানুষ যেন বিনিময়ের মুদ্রা, ইচ্ছামতো নাড়াচড়া করা যায়, বিলিয়ে দেওয়া যায়।

সমস্ত দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি মিউনিক চুক্তির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানালো। আগামী দিনের বিশ্বযুদ্ধের বিপদকে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে আহ্বান জানালো তারা মানুষকে।

উনিশ শ' উনচল্লিশের মার্চ মাসের মধ্যে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়া আত্মসাৎ করা শেষ করলেন। ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসী সরকার আবার তাড়াতাড়ি হিটলারের এই নোতুন নাৎসী আক্রমণ অভিযানকে অনুমোদন করলেন। পার্লামেন্টে বল্লেন চেম্বারলেন যে, চেকোশ্লোভাকিয়া করায়াত্ত করার বিষয়টিকে তিনি আদৌ পররাজ্য আক্রমণের অভিযান বলে মনে করেন না।[১০]

চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পরে হিটলার জার্মানীর সমরনৈতিক গুরুত্ব বেড়ে গেল। আর আরো শক্তি সংগ্রহ করলো তার সমরায়োজন। মাসখানেক পরে দেখা যায় গোয়েরিং মুসোলিনীকে সে কথাই বলছেন বিশদভাবে। চেকোশ্লোভাকিয়া দখল যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার ব্যাপারে বিশেষ সুবিধাজনক হবে সে কথাই তিনি জোরের সঙ্গে বলছেন। "চেকোশ্লোভাকিয়ার ভারী ধরনের অস্ত্রশস্ত্র" তিনি বলেন, "বুঝিয়ে দেয় যে মিউনিক চুক্তি সত্ত্বেও যদি গুরুতর যুদ্ধ বাধতো, তাহলে সেটা কি ভয়ানক বিপদের ব্যাপারই না হতো। চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরাট উৎপাদন ক্ষমতার মালিকানা জার্মানীর দখলে এসে পড়ায় যে অর্থনৈতিক সুযোগ এসেছে, তা অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই দুই অক্ষশক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর হবে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অক্ষশক্তির সামর্থ্য বৃদ্ধিতে তা প্রভূত সাহায্য করবে। তাছাড়া বৃহত্তর কোন যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়লে জার্মানীকে সেই দেশের থেকে কোন বিপদ আশঙ্কা করে এক ডিভিশন সৈন্যও তৈরী রাখতে হবে না।"[১১]

চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বপক্ষে সোভিয়েতের প্রচেষ্টা ছিল শান্তির স্বপক্ষে, ইউরোপের দেশগুলির জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা। একমাত্র সোভিয়েত সরকারই তাই সেদিন জার্মানীর চেকোশ্লোভাকিয়া জবর দখলে কোন অনুমোদন জানায়নি। অঠোরোই মার্চ, উনিশ শ' উনচল্লিশ জার্মান সরকারের নিকট প্রেরিত একটি লিপিতে তাই সোভিয়েত সরকার জানান যে বোহেমিয়াকে

রাইখের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার নীতি তাঁরা আইন ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মেনে নিতে পারেন না। শ্লোভাকিয়ার ক্ষেত্রেও সেই কথা কম বেশি প্রযোজ্য। সুতরাং জার্মান দখলদারী সৈন্যের চেকোশ্লোভাকিয়া অবস্থিতি যথেচ্ছ আক্রমণ ও সংঘর্ষ সৃষ্টির নিদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়ার জবরদখল পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে শক্তির আপেক্ষিকতাকে পরিবর্তিত করে দিল। বৃটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হিটলার জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব আরো প্রকট হয়ে উঠলো। নীচের তালিকা তা আরো ভালো করে বোঝা যাবে :

ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির উৎপাদনের পরিমাণ—১৯৩৯।[২০]

	লৌহ মিলিয়ন টন	ইস্পাত মিলিয়ন টন	অ্যালুমিনিয়াম হাজার টন	মোটর হাজার সংখ্যা
জার্মানী অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া ...	২০·১	২৩·২	২০০·০০	৪২০
বৃটেন ...	৮·৩	১৩·৮	২৫·০০	৪৯৩
ফ্রান্স ...	৭·৪	৭·১	৫০·০০	২৩৫
ইটালী ...	১·১	২·৩	৩৪·২	৭৭

এটা নিতান্ত স্বাভাবিক যে এই পটভূমিকায় জার্মানী ও তার পশ্চিমী প্ররোচকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলো। তা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স যথারীতি চেষ্টা করতে লাগলেন সোভিয়েতের স্বার্থের বিনিময়ে জার্মানীর সঙ্গে সেই দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলা যায় কিনা। সুতরাং ফ্যাসিবাদী পররাজ্য আক্রণের নীতি রইলো অব্যাহত।

তাই যেহেতু জার্মান ও ইটালীর সেনাবাহিনীর একাংশ স্পেনের ফ্যাশি বিরোধী মুক্তি সংগ্রামকে পর্যুদস্ত করার জন্যে আটকে ছিল, মার্কিণ, বৃটিশ ও ও ফরাসী সরকার তাদের ফিরিয়ে আনার জন্যে, স্পেনের যুদ্ধ শেষ করতে জার্মানীকে সাহায্য করতে লাগলেন। স্পেনের আইনতঃ প্রতিষ্ঠিত সাধারণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে, ইংরেজ ও মার্কিণ গুপ্তচররা একটা চক্রান্তের বেড়াজাল পাতলেন ম্যাড্রিদে। স্পেনের মুক্তি সংগ্রামকে পিছন থেকে

ছুরিকাহত করে তাঁরা সমগ্র স্পেনে রক্তের বিনিময়ে স্থাপন করতে সাহায্য করলেন ফ্রাঙ্কোর সন্ত্রাসবাদী ফ্যাশিস্ত সরকারকে। এর আগে বৃটিশ নৌবহরের ক্রুজার ডিভনশায়ার মির্নোকা দ্বীপের অদূরে সাধারণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে একটা আক্রমণে যোগ দিল।

পশ্চিমের এই প্রশ্রয়নীতির সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন হিটলার জার্মানী লিথুয়ানিয়ার ক্লাইপেদা দখল করে নিল। তারপর রুমানিয়াকে বাধ্য করলো তার সঙ্গে একটা অসম অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করতে যাতে সেই দেশটা হিটারের যুদ্ধমুখী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার লেজুড়ে পরিণত হয়।

ছয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' উনচল্লিশ ফ্যাশিবাদী ইটালী আলবেনিয়া আক্রমণ করলো। ধৈর্যের সঙ্গে আলবিনিয়ার মানুষ রুখে দাঁড়ালো তাদের। সেই প্রতিরোধ চললো সমগ্র দেশে ইটালীর অধিকার কায়েম হওয়ার পরেও। এবারেও সোভিয়েতের একক কণ্ঠেই শুধু ধ্বনিত হলো প্রতিবাদ, কারণ তার মতে এটা হলো বিশ্বযুদ্ধের দিকে এক নোতুন পদক্ষেপ।

চেকোশ্লোভাকিয়া দখল সমাপ্ত করে, জার্মানী হুহু করে বিজয় করলে বোহেমিয়া আর মোরাভিয়া। তারপর শ্লোভাকিয়া তৈরী করে দিল একটা তাঁবেদার সরকার। কয়েকদিনের জন্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাক্তন অঙ্গীভূত অঞ্চল ট্রান্সকার্পেথিয়ান ইউক্রেন সম্পর্কে জার্মানী ঠিক কি করতে চায় স্পষ্ট বোঝা গেল না। মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলিতে হিটলারকে উপদেশ দেওয়া হলো ট্রান্সকার্পেথিয়ান ইউক্রেনের সঙ্গে সোভিয়েত ইউক্রেন যোগ করে নিতে। যাতে হিটলারের একটি প্রচেষ্টাতেই চরম কাজ হয়ে যায়, সোভিয়েতের সঙ্গে বাধে জার্মানীর বহু প্রতীক্ষিত লড়াই।

প্যারীস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত উইলিয়াম বুলিট লিখলেন যে কালক্রমে জার্মানী "ইউক্রেন দখলের চেষ্টা করবে, কারণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সেটাই হলো শ্রেষ্ঠ গম উৎপাদন অঞ্চল। তা করতে গিয়ে জার্মানীকে এতো বিপুল বিস্তৃত আয়োজন করতে হবে যার চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তার থাকবে না। সে শেষে ভেঙ্গে পড়বে সেই চাপে। তেমনি জাপানও দখল করবে কিম্বা দখলের চেষ্টা করবে সাইবেরিয়া। তাতে তারও পতন ঘটবে শেষে। কিন্তু এভাবে রাশিয়াকে তার ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিতে পারলে বৃটেন ও ফ্রান্স তাদের নিজেদের দেশের উপর থেকে জার্মান আক্রমণের আশঙ্কা এড়াতে পারবে।"[২১]

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেস যুদ্ধবাদীদের এই চক্রান্তকে প্রকাশ করে দিয়ে জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে পার্টি ও জনসাধারণের দৃঢ়সংকল্প ঘোষণা করলো। হিটলারের জার্মানীর এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করার মতো দুর্বুদ্ধি সেদিন হয়নি। জার্মান সরকার ট্রান্সকার্পেথিয়ান ইউক্রেন ছেড়ে দিল হাঙ্গেরীকে। ফলে সোভিয়েতের সঙ্গে সংঘর্ষের সূচনা করার অজুহাত পরিত্যাগ করলো। কিন্তু এর ফলে হাঙ্গেরীর ফ্যাশিবাদীদের লোভের উপশম হওয়ায় গড়ে উঠল জার্মান হাঙ্গেরী মৈত্রী।

জার্মান সমর নায়কবৃন্দ ততোদিনে পোল্যাণ্ড আক্রমণের পরিকল্পনা শেষ করে ফেলেছেন। এর নাম দেওয়া হয়েছিল বাইস পতন পরিকল্পনা (Operation Fall Weiss)। হিটলার এটি অনুমোদন করেন এগারোই এপ্রিল উনিশ শ' উনচল্লিশে। এর লক্ষ্য ছিল অতর্কিত আক্রমণে পোল সেনাবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে নির্মূল করে দেওয়া। সিয়ানোর সঙ্গে এক আলোচনায় হিটলার বলেছিলেন পোল্যাণ্ডকে এমন ভাবে আঘাত করতে হবে যাতে দীর্ঘদিন যেন তার আর কিছু করার ক্ষমতা না থাকে।[২২]

"পোল্যাণ্ড যাতে সুশৃঙ্খলভাবে সৈন্য সমাবেশ করতে না পারে, তার জন্যে" বাইস পতন পরিকল্পনার কাজ সুরু করতে হবে, "অতর্কিতে পোল্যাণ্ড সীমান্তে রক্ষিত, যুদ্ধার্থে প্রস্তুত সাঁজোয়া বাহিনী ও মোটরবাহিত সৈন্যদের নিয়ে। পোল সীমান্ত সৈন্যদের উপর এক অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ ও বিস্ময় সুনিশ্চিত ভাবে আশা করা যায়, সেনাদলের অন্যান্য অংশকে ত্বরিত গতিতে যুদ্ধক্ষেত্রে এনে এবং পোল সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দিয়ে, বেশ বজায় রাখা যাবে। তাই সেনাদলের সমস্ত অংশকে দ্রুত অগ্রগতি ও শত্রুর বিরুদ্ধে নিরন্তর আক্রমণ চালিয়ে, সব সময়ে উদ্যোগ বজায় রাখতে হবে।"[২৩]

আক্রমণাত্মক অভিযানের শুরুতে পোল্যাণ্ড আক্রমণকে, জার্মানীর শাসকশ্রেণী বিশ্ববিজয়ের প্রথম ধাপ বলে মনে করেছিলেন। এর পর আসবে পশ্চিম ইউরোপের পালা। এগারোই এপ্রিল, উনিশ শ' উনচল্লিশে জার্মান সমরবিভাগের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থার প্রচারিত একটি নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল যে, পশ্চিমের গণতন্ত্রী দেশগুলির বিরোধিতার তীব্রতার নিরিখেই জার্মান সৈন্যবাহিনী গঠনের চরম নীতি ও লক্ষ্য নির্ণীত হবে। বাইস পতন এই প্রস্তুতিরই একটা সতর্কতামূলক কার্যক্রম।"[২৪] তাই দেখা যায় এপ্রিল

উনিশ শ' উনচল্লিশেই হিটলারের দল স্থির করে রেখেছে যে পোল্যাণ্ড আক্রমণ, পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটা "সতর্কতামূলক অংশ" ছাড়া আর কিছু নয়।

দীর্ঘদিন ধরেই জার্মানীর শাসকমহলে বিতর্ক চলছিল যে তার বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনা রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় কোথা থেকে কাজ সুরু করলে সুবিধা হবে। একচেটিয়া পুঁজিপতি ও যুদ্ধবাদীরা এ ব্যাপারে মোটামুটি একমত ছিলেন যে জার্মানীর বিশ্ববিজয়ের উচ্চাশার পথে সোভিয়েত ইউনিয়নই হলো প্রধান অন্তরায়। স্বভাবতই জার্মান নাৎসীরা পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকেই নিদারুণ ঘৃণার চোখে দেখবে। কিন্তু তারা এটাও জানতো যে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে কেবল জার্মান সৈন্যবাহিনীর চরম পরীক্ষা হবেনা, জার্মানীর সমস্ত শক্তিকে সেই পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হবে। নাৎসী নীতি নিয়ামকদের অধিকাংশই তাই বিশ্বাস করতেন যে বুর্জোয়া শিবিরের দুর্বল শত্রুদের বিনাশ করে জার্মানীর রাজ্য জয়ের মাধ্যমে যে শক্তি সঞ্চয় করবে, তাই নিয়ে প্রধান শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

জার্মান সরকারের রাজ্য জয়ের এই কার্যক্রমের পারম্পর্য নির্ভর করবে, জার্মানী তার শ্রেষ্ঠ শিল্পাঞ্চল রূঢ়ের (Ruhr) নিরাপত্তা কতোটা ও কিভাবে বজায় রাখতে পারছে তার উপর। সেনানায়কদের এক সমাবেশে হিটলার তাই বলেছিলেন:

"আমাদের সামনে বিরাট সমস্যা হলো রূঢ়। যুদ্ধের গতি রূঢ় দখলের উপর নির্ভর করবে। যদি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স বেলজিয়াম ও হল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ঢুকে রূঢ় পৌঁছতে পারে আমাদের সমূহ বিপদ ঘটবে। তাতে জার্মানীর প্রতিরোধ শক্তি পঙ্গু হয়ে যেতে পারে। পশ্চিমের প্ররোচনা ও প্রশ্রয়দানের নীতি যা চরম পর্যায়ে পৌঁছলো মিউনিকে, জার্মানীর সমরনেতাদের একথা একথা ভাবতে প্রেরনা দিয়েছিল যে এটা হলো পশ্চিমের দুর্বলতার পরিচয়। সুতরাং সহজে জয়লাভ করতে বিশেষ বাধা হবে না। এরই প্রমাণ পাওয়া যায় হিটলারের প্রথমে পোল্যাণ্ড ও পরে পশ্চিমের বিরুদ্ধে আঘাত হানার সিদ্ধান্তে, যা মিউনিকের পরে তারই একটা পরিণতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু জার্মানী ও তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের এবং পরস্পরের সামরিক

পরিকল্পনার অন্তর্দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্যবাদী জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যেকার বৃহত্তর অন্তর্দ্বন্দ্বের চাপে প্রভাবিত হয়েছিল। পশ্চিমের প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরাজয়কে হিটলার অনুগামীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সূচনাপর্ব বলে মনে করতেন। তার পোল্যাণ্ড আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দু'টি: প্রথম বৃটেন ও ফ্রান্সকে ইউরোপে তাদের একমাত্র মিত্রশক্তি পোল্যাণ্ড হতে দূরে রাখা এবং জার্মানীর পশ্চিমমুখী অভিযানে পিছনে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না থাকা: দ্বিতীয়তঃ সোভিয়েত দেশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের খুব কাছাকাছি একেবারে সোভিয়েত সীমান্তে উপস্থিত থাকা। নাৎসীরা চেয়েছিল বেশ আগে থেকেই সোভিয়েত সীমান্তে ঘাঁটি পেড়ে বসে থাকতে, যাতে পরবর্তী কালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণের সময় সেগুলি অগ্রগামী ও যুদ্ধের পরিচালনা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

॥ চার ॥

জার্মানী যখন হাঙ্গেরীকে ট্রান্সকার্পেথিয়ান ইউক্রেন ফিরিয়ে দিয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তাবিত অজুহাতটা নষ্ট করে দিল। বৃটেন ও ফ্রান্স তখনই বিপদের আশঙ্কায় প্রমাদ গুনেছে। তা' ছাড়া উনিশ শ' পঁয়ত্রিশের ইঙ্গ-জার্মান নৌ-চুক্তি এবং পোল্যাণ্ডের সঙ্গে উনিশ শ' চৌত্রিশের অনাক্রমন চুক্তিও বাতিল করে দিলে জার্মানী। মার্কিন দেশ, বৃটেন ও ফ্রান্সের সেরা রাজনীতিকেরা চঞ্চল হয়ে উঠলেন কাজের তাড়নায়। হিটলারের আসল অভিসন্ধি ধরা পড়ে গেল। কিন্তু তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এই পথ পরিত্যাগ করিয়ে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে একটি নোতুন আক্রমন পরিকল্পনা গ্রহণ করাতে হবে। পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীরা দৃঢ় প্রতিভাত হলেন, পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটিয়ে ফেলে, সমাজতন্ত্রী সোভিয়েতের সঙ্গে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে তার মীমাংসার জন্যে সোভিয়েত-জার্মান যুদ্ধের পথ প্রশস্ত করতে হবে।

মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটি পাঁচই এপ্রিল থেকে দশই মে, উনিশ শ' উনচল্লিশের অধিবেশনে আলোচনা করলেন, সম্ভাব্য বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার নীতি কি হওয়া উচিত। কমিটির অধিকাংশ সদস্যই মোটামুটি এই ধারনায় বশবর্তী ছিলেন যে বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার সুবিধা ঘটবে দারুন।

বক্তারা একথাই জোর দিয়ে বলতে চাইলেন যে সম্ভাব্য যুদ্ধে মার্কিন রাষ্ট্রের কোন অঞ্চল জড়িয়ে পড়ছে না। আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ষ্টিলওয়েল বলেন যে ইউরোপ ও এশিয়ায় যুদ্ধের সংকট যাই ঘটুকনা কেন, আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে বিপদমুক্ত থাকবে।

বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির আলোচনার পরেই সুরু হলো জাপ-মার্কিন আলাপ আলোচনা। তেইশে মে, উনিশ শ' উনচল্লিশে এই আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক হলে মিউনিক ধরণের একটা সম্মেলন ডাকতে হবে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানকে তাতে যোগদান করতে দিতে হবে।[২৬] উনিশ শ' উনচল্লিশের সারা গ্রীষ্মকাল ধরে মার্কিন ও জাপানী কূটনীতিকেরা এই সম্মেলনের প্রাথমিক কাজ চালিয়ে গেলেন। কিন্তু মার্কিন নীতিনিয়মিকরা শুধু সেখানেই থেমে না থেকে বিখ্যাত হিটলার অনুরাগী রাজনীতিবিদ ভ্যাণ্ডেনবার্গ ও হ্যামিল্টন ফিশকে পাঠালেন ইউরোপে, লণ্ডন সমেত পশ্চিম ইউরোপের রাজধানীগুলি ঘুরে আসার জন্তে। হ্যামিল্টন ফিশ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে তাঁর সফরের উদ্দেশ্য হলো, "চুক্তির বর্তমান অবস্থায় জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্স ও বৃটেনের এক পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে কোন পথের হদিশ পাওয়া যায় কিনা সেই আলোচনা সুরু করার" চেষ্টা করা।[২৭] চেষ্টা চললো আরেক দফা নোতুন এক মিউনিক চুক্তির ব্যবস্থা করতে, যেখানে জার্মানী সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান সুরু করতে রাজী থাকলে পোল্যাণ্ড তাকে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হবে।

এরই ফাঁকে জাপান নোতুন এক পররাজ্য আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়ে ফেললে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও তার নিজের শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে। হালখিন-গোল (Halkhin-gol) নামে এক জায়গায় জাপানী সৈন্য সোভিয়েত ও মঙ্গোলীয় জনগণতান্ত্রিক দেশ আক্রমণ করে বসলো। মঙ্গোলীয়ার সঙ্গে সোভিয়েতে পারস্পরিক সাহায্যদানের চুক্তিতে আবদ্ধ। উদ্দেশ্য ছিল জাপানের মঙ্গোলীয়া দখল করে বৈকাল হ্রদ অঞ্চলে একেবারে সোভিয়েত সীমান্তে উপস্থিত হওয়া। জাপানীর শাসকরা বিশ্বাস করেছিলেন যে জার্মানী সুনিশ্চিত সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করবে। সুতরাং সুবিধাস্থান দখল করে সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ও সাইবেরিয়ার ক্ষমতা প্রসারিত করার জন্তেই জাপান এগিয়ে গেল। জাপানের এই যুদ্ধ পরিকল্পনায় জাপানী সৈন্য যাতে বৈকাল হ্রদ অঞ্চলে উপস্থিত

হওয়ার জন্যে এগিয়ে যেতে পারে, তাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য রূপে বর্ণনা করা হয়েছিল ; কারণ এতে সোভিয়েত দেশের ইউরোপীয় ভূখণ্ড ও দূর প্রাচ্যের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই একটা বিপদ দেখা দেবে ।

মঙ্গোলীয় জনগণতন্ত্রী দেশের বিরুদ্ধে জাপানী অভিযান আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকেরা একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। ইউরোপে এক নোতুন মিউনিক পরিকল্পনা চালু করার পরিপূরক হিসেবে এশিয়াতেও একটা মিউনিক পরিকল্পনার প্রয়োজন এসে গেল। যুদ্ধবাদীরা একটা প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলন ডাকার মতলবে ছিলেন যেখানে চীনের কুয়োমিন টাঙ সরকারের নেতা হিসেবে আসবেন চিয়াং কাই-সেক।

কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনের পরিকল্পনা পরে ভেস্তে গেল। জাপ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্দ্বন্দ্বই তার কারণ। তার পরিবর্তে একটা চুক্তি, কার্যতঃ একটা প্রকৃত "পূর্বাঞ্চলীয় মিউনিক "চুক্তি সম্পাদিত হলো বৃটেন ও জাপানের মধ্যে। জাপানী পররাষ্ট্র মন্ত্রীও টোকিওস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়ে, তাঁদেরই নামে আরিতা ক্রেগী চুক্তি Arita-Craigie চালু হলো তেইশে জুলাই উনিশ শ' উনচল্লিশ। চুক্তিতে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিনিময়ে চীন দেশে জাপানের প্রভাব বিস্তারের অধিকার মেনে নেওয়া হলো। বৃটিশ সরকার চীনের স্থিতাবস্থা স্বীকার করে নিয়ে সেদেশে জাপানী দখলদারী সৈন্যের বিশেষ প্রয়োজনের দিকটা মেনে নিতে রাজী হলেন।

আলোচনার সময়ে হাচিরো আরিতা মস্কোয় অনুষ্ঠিত ইঙ্গ ফরাসী সোভিয়েত আলোচনার বিষয়ে উল্লেখ করেন। বৃটেনের "রাশিয়াকে সামরিক মৈত্রীর" মধ্যে টেনে আনার নীতির তিনি সমালোচনা করেন। তাতে ক্রেগী জবাবে বলেন যে ইঙ্গ-সোভিয়েত মৈত্রী কোন মতেই "দূর প্রাচ্যে প্রযোজ্য" হবে না।[২৮] একথা বলা হলো এমনই এক সময়ে যখন হালখিন গোলে দারুন লড়াই চলছে। বৃটেনের এই আশ্বাসবাক্যের তাৎপর্য কি তা এতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রাচ্যে তাই দেখা যায় মিউনিক সমর্থকরা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধানোর প্রচেষ্টায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু ইউরোপে ফ্যাশিবাদী জার্মানীকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত যেমন তরতর করে এগোবে বলে ইঙ্গ-ফরাসী রাষ্ট্রনেতারা ভেবেছিলেন তা হলো না। অবস্থা দেখে তাঁরা সোভিয়েতের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় রাজী হলেন। এটা অনেকটা

ক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করার জন্যেও করা হলো। ফাশিস্ত সাম্রাজ্যবাদীদের গগনচুম্বী ঔদ্ধত্য দেখে জনমত রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তাকে রুখতে চেয়েছিল। তাছাড়া এর উদ্দেশ্য ছিল হিটলারকে ইঙ্গ-ফরাসী ও সোভিয়েতের যৌথ শক্তির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভবনায় আতঙ্কিত করে তোলা এবং একই সঙ্গে এটাও প্রমাণ করা যে ফ্যাশিস্ত আক্রমণের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়ন একেবারে নিঃসঙ্গ। আসলে যেমন করে হোক জার্মানীকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামিয়ে দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। বৃটেন ও ফ্রান্স প্রত্যাশা করেছিল যে সোভিয়েতের ঘাড়ে এমন কিছু অঙ্গীকারের দায় চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে যাতে জার্মানীর সঙ্গে লড়াই অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরিবর্তে সোভিয়েতকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি বিশেষ নির্ভরযোগ্য করে না তুললেই হবে। অন্যদিকে জার্মানী যদি পশ্চিমের দিকে অভিযান চালায়, ইঙ্গ ফরাসী সরকার সোভিয়েতের সাহায্য পাবেন।

সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সুরু করার ইঙ্গ ফরাসী সিদ্ধান্ত আসলে হলো একটি দ্বিমুখী নীতিরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যাকে মিউনিক নীতিরই একটা নোতুন ছদ্মবেশ বলা যায়। জার্মানদের চোখের সামনে সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তির সম্ভবনাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে, ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থ প্রত্যাশা করেছিল জার্মানীর সঙ্গে সেইরকমের এক সুদূরপ্রসারী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে যাতে একদিকে পৃথিবীর বাজারে ইঙ্গ ফরাসী একচেটিয়া স্বার্থকে জার্মানী ব্যহত করবে না অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে এক আশু যুদ্ধে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

অপরপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন জার্মানীর আক্রমণাত্মক নীতির বিরুদ্ধে সবদেশের সরকার ও জনসাধারণের এক সম্মিলিত প্রতিরোধের মোর্চা গড়ে তুলতে। তাই সোভিয়েত সরকার বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে একটি কার্যকরী চুক্তি সম্পাদন করতে চেয়েছিলেন যাতে মধ্যে ও পূর্ব ইউরোপের নিরাপত্তা রক্ষিত হয় এবং কোথাও কোন আক্রমণ ঘটলে পারস্পরিক জরুরী সাহায্যের পরিমাণ ও ধরণ কি হবে তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকে।

সেকালের ঘটনাবলীর ধারা যাঁরাই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের কাছে সোভিয়েতের নীতি অত্যন্ত স্পষ্ট। ইঙ্গ ফরাসী নীতিও কোন মতে অস্পষ্ট নয়। পশ্চিমী শক্তিবর্গ, মাইকেল ক্রয়াণ্ড ব্যঙ্গসহকারে লিখছেন,

অসম্ভবকে সম্ভব করতে চেয়েছিলেন—মহাশূন্যের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ করবে জার্মানীর বিরুদ্ধে, জার্মানীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ার একমাত্র পথ পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে সৈন্য চলাচল করতে পারবে না। তাই ক্রয়াণ্ড বলেছেন, পশ্চিমী শক্তিবর্গ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনা ভেঙ্গে গেল, কারণ তা ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার আর সুযোগ ছিল না।[২৯]

সোভিয়েত সরকার দাবী করেন যে এই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি পারস্পরিকতা ও সমদায়িত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উচিত। ইঙ্গ ফরাসী প্রস্তাবে কোথাও যে কোন সম মর্যাদার ভিত্তিতে রচিত চুক্তির এই প্রাথমিক ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতির চিহ্ন ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বৃটিশ ও ফরাসী সরকারের আবরণ ছিল স্পষ্টতই দ্বি মুখী। সোভিয়েতের সঙ্গে কোন রকমের সুদূর প্রসারী চুক্তির কথা তাঁরা মনে চিন্তাও করেননি। রোজনামচায় চেম্বারলেন ঠিক এই কথাগুলিই লিখেছেন। মস্কো বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল একটাই, তিনি লিখেছেন, জার্মানীর উপর চাপ সৃষ্টি করে তাকে নোতুন এক চুক্তির আলোচনায় রাজী করা।[৩০]

মস্কো আলোচনায় জড়িত বৃটিশ ও ফরাসী কূটনৈতিক ও সামরিক মুখপাত্র-দের কাছে প্রেরিত নির্দেশনামায় এই বক্তব্যের উপরই জোর দেওয়া হলো। বাইশে মে উনিশ শ' উনচল্লিশ ফ্রান্সে প্রেরিত পররাষ্ট্র দপ্তরের এক গোপন স্মারকলিপিতে বলা হলো :

"সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোন একটা চুক্তি সম্পাদন করা আকাঙ্খিত বলেই মনে হয় যাতে পশ্চিমে আমরা আক্রান্ত হলে সোভিয়েতের সাহায্য পাই। সেটা শুধু যে জার্মানীকে দুই সীমান্তে লড়তে হবে সেই জন্যে প্রয়োজন নয়, তার মধ্যে এই কারণও আছে...যে যুদ্ধ যদি সুরু হয়, তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার মধ্যে জড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।"[৩১]

দেখা যায়, বৃটিশ ও ফরাসী কূটনীতিবিদরা বলছেন সোভিয়েতের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদন করার পথে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার আপত্তি বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পরে এর সঙ্গে যুক্ত করা হলো রুমানিয়া আর পোল্যাণ্ডের আপত্তি. যাদের সরকার আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের সাহায্য গ্রহণ করতে অসম্মত হয়েছে। রুমানিয়ার তদানীন্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রীগোয়ার গাফেন্‌কো

এ বিষয়ে তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন যে, "বাস্তবিক বৃটিশ সরকার পোল্যাণ্ডের এবং অল্পমাত্রায় হলেও রুমানিয়ার আপত্তি বিবেচনা করতে বাধ্য ছিলেন।" কিন্তু সেটাই এ ব্যাপারে সার কথা নয়। তিনি লিখেছেন, "পশ্চিমী শক্তিবর্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি জিনিস দাবী করছিলেন ; তা হলো পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়াকে তাঁরা যে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা জানিয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার সঙ্গে যুক্ত করে করে নিতে।"[৩২] কিন্তু সোভিয়েতের তরফ থেকে বৃটেন ও ক্রান্সের পারস্পরিক দায়িত্ব গ্রহণের কোন ইচ্ছা না থাকায়, এ ধরণের প্রচেষ্টা একপেশে হয়ে যেতে বাধ্য।

এমন কি ভ্যাটিক্যানও বৃটিশ ও ফরাসীদের উস্কানিদান নীতির পেছনে পুরোপুরি সমর্থন জানালো। পোপ দ্বাদশ পায়াস পোল্যাণ্ডের বিনিময়ে জার্মানীর সঙ্গে নোতুন এক মিউনিক চুক্তির জন্যে পশ্চিমীদের নীতির সমর্থন করলেন। উনিশ শ' উনচল্লিশের জুন মাসে তিনি পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত এক বিশেষ বাণীতে জার্মানীর দাবীর সামনে পোল্যাণ্ডকে নতি স্বীকার করার উপদেশ দিলেন। জনৈক অনুসন্ধিৎসুর মতে, "পায়াস মস্কোয় ইঙ্গ-ফরাসী সোভিয়েত চুক্তি আলোচনার সাফল্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। হোলী সীর (Holy See) আশঙ্কা ছিল যে দুই পশ্চিমী গণতন্ত্রের সঙ্গে সোভিয়েতের এই পরিকল্পিত মৈত্রীবন্ধন। ইউরোপের কূটনীতিতে তাকে একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দান করবে।"[৩৩]

সোভিয়েত সরকার নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে বৃটিশ ও ফরাসী সরকার তাকে যে ভূমিকা দান করতে উদ্যোগী হয়ে ছিলেন, তা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। উনত্রিশে জুন, উনিশ শ' উনচল্লিশ সালের প্রাভদা পত্রিকায় সোভিয়েতের বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকায় বলা হয়: "এই সব ব্যাপার থেকে দেখা যায় যে বৃটিশ ও ফরাসীরা সমতা ও পারস্পরিকতার ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোন চুক্তি করতে চায় না, যদিও প্রতিদিন তারা একথাই শপথের মতো বলে যাচ্ছে যে তারাও সমতা চায়। তারা যা চায় তা হলো সোভিয়েতের সঙ্গে সেই ধরনের চুক্তি সম্পাদন করতে, যাতে সোভিয়েতকে মজুরের মতো সমস্ত দায়িত্বভার তাদের হয়ে বয়ে দিতে হবে। আত্মসম্মান সম্পন্ন কোন দেশই এ ধরনের চুক্তিতে সম্মত হতে পারে না। কারণ নিজেকে অন্যের হাতের পুতুল হিসেবে তার স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সমস্ত কাজ

করতে রাজী না থাকলে কোন দেশ এ চুক্তিতে সম্মত হতে পারে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন যার শক্তি, সামর্থ্য, মর্যাদা পৃথিবীর মানুষের কাছে পরিচিত, এ ধরনের কোন চুক্তি সম্পাদন করতে পারে না।"

যাই হোক তা সত্বেও এই দুই পশ্চিমী সরকার যতোদিন পর্যন্ত না সমগ্র আলোচনার ধারাকে একটী অচলাবস্থায় নিয়ে যায় ততোদিন পর্যন্ত শুধু শান্তি রক্ষার প্রয়োজনে এবং তাদের ধারণা পরিবর্তিত হবে এই আশা করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যায়।

আসলে বৃটেন ও জার্মানী যে গোপনে আলাপ আলোচনা চালাচ্ছে এবং বৃটিশ সরকার মস্কোর আলোচনার চেয়ে এর উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করছেন, সোভিয়েত রাজধানীতে এ তথ্যটি ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত বৈঠকেরই মোড় ঘুরে গেল।

উনিশ শ' উনচাল্লিশের জুন থেকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত লণ্ডনে ইঙ্গ-জার্মান গোপন বৈঠক চলে। এই বৈঠকে বৃটেনের প্রতিনিধিত্ব করেন বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী রবার্ট হাড্সন ও নেভিল চম্বোরলেনের পরামর্শদাতা এবং বিশ্বস্ত অনুচর হিউ উইলসন। জার্মানী পাঠিয়েছিল তার বিখ্যাত নাৎসী বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ দূত হেলমুট ভোলথাট্নকে। সমগ্র আলোচনা কয়েকটি সম্ভাব্য মতৈক্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত লয়। বৃটেন ও জার্মানীর জন্যে "বাঁচার মতো জায়গার দাবীতে বন্ধুত্বপূর্ণ মীমাংসার হওয়ার কথা ছিল। একে পৃথিবীটাকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার নোতুন বাজার দখল ও বর্তমানের বাজারগুলির পূর্ণতর ব্যবহারের পরিকল্পনা। যার মধ্যে নিঃসন্দেহে রাশিয়া ও চীনের "বাজার" ও ধরা হয়েছিল এবং ইঙ্গ-জার্মান অনাক্রমন চুক্তি সম্পাদনের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। শেষোক্ত বিষয়টি ছিল কয়েকমাস পূর্বে পোল্যাণ্ডকে প্রদত্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ মাত্র কয়েকমাস পূর্বে, মার্চ, উনিশ শ' উনচল্লিশে বৃটেন এককভাবে পোল্যাণ্ডকে সেই নিশ্চয়তাদান করেছিল তারপর এপ্রিল মাসে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। শেষতঃ যদিও সেটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, ইঙ্গ-জার্মান বৈঠকে আলোচিত হয়েছিল হিটলার জার্মানীকে বৃটেনের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সাহায্যদানের প্রস্তাব, যার মধ্যে বিশেষকরে আছে জার্মানীকে বৃটেনের হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড ঋণ দেওয়ার কথা।

আলোচনার ধারাটি স্পষ্টতই ছিল সোভিয়েত বিরোধী। তদানীন্তন ইংল্যাণ্ডে জার্মান রাষ্ট্রদূত হার্বাট ফন ডার্কসেন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, হাড্‌সন তিনটি বিশাল অঞ্চলে—বৃটিশ সাম্রাজ্য, চীন ও রাশিয়ায়, ইঙ্গ-জার্মান যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা চালু করার একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাও খাড়া করেছিলেন। তিনি রাশিয়াতে "বিরাট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জার্মানীর অংশ গ্রহণের সুযোগ সম্ভবনার" উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন।[৩৪] সোভিয়েতের অর্থনৈতিক আস্থার দিকে জার্মানীর সম্প্রসারণবাদী উচ্চাভিলাষের লোভের আগুনে, হাড্‌সন ইন্ধন যুগিয়ে ছিলেন।

শ্রমিক দলের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব নাৎসীদের সঙ্গে এই ষড়যন্ত্রমূলক আলোচনা সমর্থন করেছিলেন। উনিশ শ' উনচল্লিশের জুলাই মাসের শেষাশেষি গোপন বৈঠক বসলো লণ্ডনে জার্মান দূতাবাসের পরামর্শদাতা থিয়োডোর কোরদৎ ও শ্রমিক নেতা চার্লস্‌ বাক্সটনের মধ্যে। শ্রমিক নেতা প্রভাবযুক্ত অঞ্চলে ভাগা-ভাগি করে নেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। তিনি কোরদৎকে বলেন জার্মানী যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে না আসে, তাহলে প্রতিদানে বৃটেন ও পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে জার্মান স্বার্থকে মেনে নেবে, কয়েকটি দেশকে নিরাপত্তা রক্ষার নিশ্চয়তার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা প্রত্যাহার করে নেবে, ফ্রান্সকে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পাদিত পারস্পরিক সাহায্য -দান চুক্তির আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে প্ররোচিত করবে এবং সোভিয়েতের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও বন্ধ করে দেবে।

আরো কিছু শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে বাক্সটনকে পূর্ণসমর্থন জানিয়ে-ছিলেন। শ্রমিক দলের সম্মেলনে বেভিন প্রস্তাব আনলেন যে "পৃথিবীর সম্পদ একত্রিত করে" জার্মানী, ইটালী ও জাপানকে সূর্য্যের আলোর স্থান দেওয়ার" (a place in the Sun) ব্যবস্থা করে দিতে হবে।[৩৫] আসলে এটি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে, পূর্ব ইউরোপের বিনিময়ে পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে নোতুন করে ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রচেষ্টা।

আগষ্ট উনিশ শ' উনচল্লিশে ডার্কসেন সাক্ষাৎ করলেন পররাষ্ট্র সচিব লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের সঙ্গে। হ্যালিফ্যাক্স তখন বলেন যে তিনি মিউনিক-উত্তর পৃথিবী বলতে ভেবেছিলেন সমগ্র ইউরোপে, প্রভাব থাকবে জার্মানীর তারই মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে থাকবে তার অগ্রাধিকার। আর বৃটেন থাকবে

তার সাম্রাজ্য আর ইউরোপ থেকে প্রশান্ত মহাসাগর আর দূরপ্রাচ্যে যাওয়ার সমুদ্রপথের কর্তৃত্ব নিয়ে।

এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে বৃটেন ও ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ এ ধরনের একটা কারবারী চুক্তি সমর্থন করবে না। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জর্জ বনেৎ, পারীতে জার্মান রাষ্ট্রদূত ভেল্জ্সেস্ক (Welzceck) কে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁর সরকার ফ্রান্সে সমস্ত সভা সমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দেবে, গণতান্ত্রিক অধিকার স্থগিত রাখবে এবং বেআইনী ঘোষণা করবে কমিউনিষ্ট পার্টিকে।

সোভিয়েতের সঙ্গে যৌথভাবে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় আদৌ যোগ না দিয়ে তখন বৃটিশ ও ফরাসী সরকার সচেষ্ট ছিলেন নাৎসী আক্রমণের লক্ষ্যটাকে পূর্বদিকে মোড় ঘুরিয়ে দিতে।—সোভিয়েতের সঙ্গে আলোচনা বানচাল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁদের অনেক দিন আগের থেকেই নেওয়া হয়েছিল। আশা ছিল এরই মধ্যে জার্মানীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। কিন্তু আশা চূর্ণ হয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদের তীব্র তীক্ষ্ণ অন্তর্দ্বন্দ্ব যে কোন অঞ্চলকে ভাগবাঁটোয়ারা করে নেওয়ার আলোচনায় এমনই প্রকটভাবে মাথা চাড়া দিল, তাকে কোন মতে আর অতিক্রম করা গেল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভার বৃটেন ও ফ্রান্স যে সমস্ত জার্মান উপনিবেশ নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা সেগুলির আবার দাবী করে বসলো। তার সঙ্গে চাই আরো নোতুন সব এলাকা। বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা কোন উপনিবেশই আর ছাড়তে রাজী নয়। প্রাক্তন জার্মান উপনিবেশ ও তার অন্তর্গত। তাই পরিবর্তে নানা রকমের আপোষ রফার কথা উঠলো, অন্য দেশ অন্য অঞ্চলের স্বার্থের বিনিময়। আলোচনার একস্তরে বৃটেনের তরফ থেকে প্রস্তাব এলো আফ্রিকায় পর্তুগালের উপনিবেশ-গুলি বৃটেন ও জার্মানী ভাগাভাগি করে নিতে পারে। কিন্তু জার্মানীর নাৎসী নায়কেরা তৃতীয় পক্ষের ছোট অধিকার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে রাজী নন। তাঁরা লোভাতুর চোখ দিয়ে বৃটেন ও ফ্রান্সের উপনিবেশ ও ডোমিনিয়নগুলির দিকে বারেবার তাকাতে থাকিলেন।

সাম্রাজ্যবাদদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বই হিটলার জার্মানীর সঙ্গে ফরাসী আপোষ রফার পথে চরম অনতিক্রম্য বাধা হয় দাঁড়ালো।

সোভিয়েতের সঙ্গে কোন চুক্তি সম্পাদনে ইঙ্গ-ফরাসী অস্বীকৃতি ইউরোপের রাজনৈতিক সংকটকে আরো বাড়িয়ে তুললো। সারা পৃথিবী যেন একটা বিরাট সামরিক বিপর্যয়ের কিনারায় এসে দাঁড়ালো। তখন দিকে দিকে কেবল একটি প্রশ্ন, জার্মানী কোথায় হানবে তার আঘাত। বিশ্ব রাজনীতির পটভূমিতে শক্তি-বর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের টানা-পোড়েনের উপর নির্ভর করছিল তা অনেকটা।

সোভিয়েতের সামনেও এসে পড়লো একটা কঠিন সমস্যা। তাকে বেছে নিতে হবে পক্ষ। হয় বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে তাকে নোতুন করে বোঝাপড়া করার জন্যে চেষ্টা করতে হবে, যা সে জানতো ব্যর্থ হতে বাধ্য, নয়তো তাকে জার্মানীর প্রস্তাবিত অনাক্রমন চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে। প্রথম পথ বেছে নিলে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফরাসী সরকারের প্ররোচনামূলক নীতির জন্যে অচিরে অনিবার্যভাবে চরম প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে সে জড়িয়ে পড়বে যুদ্ধে। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আক্রমণ আসবে তখন হয় জার্মানী নয়তো জাপানের তরফ থেকে। হালখিন গোলের সংঘর্ষ তারই একটা সতর্কবাণী। জাপানী সৈন্যরা সেখানে পর্যুদস্ত হলেও, জাপান সোভিয়েত বা জনগণতন্ত্রী মঙ্গোলীয়ার সঙ্গে কোন রকমের কোন চুক্তি করতে অস্বীকৃত হয়েছে। পরিস্থিতির গতির দিকে চোখ রেখে জাপান অপেক্ষা করে আছে, সুবিধা পেলেই জার্মানীর সঙ্গে একযোগে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তা ছাড়া সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জাপ-জার্মান যৌথ আক্রমণ ঘটলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তাতে সাহায্য সমর্থন করতে কোন না কোনদিক থেকে এগিয়ে আসবে। কারণ মিউনিকের পর থেকে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার এটাই হলো চরম লক্ষ্য।

আরো দেখা যায়, বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের প্রস্তুতি করে চলেছে। মধ্য প্রাচ্যে সৈন্য সমাবেশ করেছে তারা। উত্তর ইউরোপে সোভিয়েত বিরোধী নীতিকে তীব্র করে তুলেছে। উনিশ শ' উনচল্লিশের জুনমাসে বৃটিশ দেশরক্ষা বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়ালটার কার্কে ফিনল্যাণ্ড সফর করে গেছেন। সেখানে তিনি ফিনল্যাণ্ডের "রুশ নিশ্চয়তা দানের" প্রতিশ্রুতি প্রত্যাখ্যান করাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি ফিরে যেতে না যেতেই এলেন অ্যাডমিরাল প্লাঙ্কেট। এক বক্তৃতায় তিনি তো উপদেশ দিয়ে গেলেন "কামানের মুখ কোর্ণস্তাদের দিকে ঘুরিয়ে রাখো।"[৩৬]

এই পরিস্থিতিতে একমাত্র কাজ যা সোভিয়েত করতে পারে, তা হলো জার্মাণীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করা। তাতে অন্ততঃ কিছুটা সময় পাওয়া যাবে। আর তার সঙ্গে পাওয়া যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সরকারদের অসাধু চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার সুযোগ। সময়ের সুযোগ অতি প্রয়োজনীয়, কারণ তাতে দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে আরো দৃঢ় করে তোলা যাবে এবং একই সঙ্গে দুই সীমান্তে যুদ্ধের বেড়াজালে জড়িয়ে পড়তে হবে না। চুক্তিপত্র জার্মাণীর সোভিয়েত দেশ আক্রমণের পরিকল্পনাকেও আটক রাখবে। এবং যদি তা অমান্য করে জার্মাণী আক্রমণ করে তাতে আন্তর্জাতিক আইনের সুপরিচিত নীতির লঙ্ঘনকারী হিসেবে তাকে পৃথিবীর চোখে একটা রক্তপিপাসু আক্রমকারী বলেই চিত্রিত করবে।

সোভিয়েত জার্মাণ চুক্তিকে কেন্দ্র করে যে জঘন্য সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা ও অপপ্রচার করা হয়েছিল, তার অভিযোগের ভিত্তি হলো এই ধারণা যে চুক্তি সম্পাদনের পর থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পররাষ্ট্রনীতি বদলে ফেলেছে এবং ফ্যাশিবাদী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্যে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নীতিকে বর্জন করেছে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সোভিয়েতের পররাষ্ট্র-নীতি পরিবর্তিত হয়নি। তার লক্ষ্য ছিল মিউনিকে গড়ে ওঠা সোভিয়েত বিরোধী মোর্চাকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করা, কারণ সেটেই হবে শান্তির স্বপক্ষে সংগ্রাম। সেভিয়েত সরকার বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যথোপযুক্ত চুক্তি করে তা সফল করার চেষ্টা করেছিলেন। এবং যখন এই দুই দেশের সরকার আলাপ আলোচনা ফলপ্রসূ করার চেষ্টাকে বাণচাল করে দিয়েছে—কেবল তখনই সোভিয়েত সরকার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে সেই উদ্দেশ্য সফল করতে চেয়েছেন—তা হলো জার্মাণীর সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে।

জার্মাণ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী সোভিয়েতের সঙ্গে তার আশু সংঘর্ষ বাধানোর যে চেষ্টা করেছিলেন তাকে ব্যাহত করে, সোভিয়েত জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে সেই সংঘর্ষের দিনকে পিছিয়ে দিতে। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের ধারণা হয়েছিল যে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মতো প্রস্তুতি, জার্মাণীর তখনো হয়নি। এই যুদ্ধ সুরু করতে ইচ্ছা যতই প্রবল থাকুক না কেন, তার আশঙ্কা ও তাদের কিছুমাত্র কম ছিল না।

দশ বছরের জন্যে সোভিয়েত জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো মস্কোয় তেইশে আগষ্ট, উনিশ' উনচল্লিশ সালে।

সোভিয়েতকে কলঙ্ক-কালিমায় ঢেকে দেওয়ার জন্য সোভিয়েত জার্মান চুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের প্রতিক্রিয়া মহল উঠে পড়ে লাগলো। আর তার সঙ্গে যোগ দিল দক্ষিণ-পন্থী সমাজতন্ত্রী নেতারা। কিন্তু এখানে প্রসঙ্গতঃ প্রাক্তন মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সামনার ওয়েলস কি বলেছেন, তা উল্লেখ করলে বোধ হয় ভাল হবে। "বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে," ওয়েলস লিখেছেন, "এটা লক্ষ্য করা দরকার যে এই চুক্তি সোভিয়েত সরকারকে কিভাবে সুযোগের ব্যবহার করতে সমর্থ করে তুলেছিল, যা মাত্র দু'বছর পরে যখন সত্যি প্রত্যাশিত জার্মাণ আক্রমণ ঘটলো তখন অমূল্য বলে মনে হয়েছে।"[৩৭]

সোভিয়েত জার্মাণ চুক্তি জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিল। জাপ সরকার জার্মাণীর কাছে একটা আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়ে জানালেন যে এই চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি 'কমিন্টার্ণ বিরোধী চুক্তির সর্ত্ত ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিরোধিতা করছে।" জাপ-জার্মণ সম্পর্ক ফলে ক্ষুন্ন হয়ে পড়লো। মার্কিন দেশে জাপানী রাষ্ট্রদূত কেনসুকে হোরিনৌচি, পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হালকে জানালেন যে জাপান "মোটামুটি তার পররাষ্ট্র নীতি নোতুন করে রচনা করবে।"[৩৮] হিরানুমা মন্ত্রী-সভার পতন ঘটলো। এ বিষয়ে সরকারী বিবৃতিতে বলা হলো:

"জার্মান সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পরে ইউরোপে একটি জটিল ও অভাবিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এই পরিবর্ত্তনের জন্যে সরকার তাঁর অনুসৃত নীতি পরিত্যাগ করছেন। এখন নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নোতুন নীতি গ্রহণ করা দরকার।"

পনেরোই সেপ্টেম্বর তারিখে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও জনগণতন্ত্রী মঙ্গোলীয়া জাপানের সঙ্গে হালখিন-গোল সংঘর্ষের নিষ্পত্তি করে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

এর থেকে দেখা যে সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফল অনুকূলই হয়েছিল, যার কিছু প্রকাশ ঘটে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও নাৎসী নায়কদের হীন ও কুটীল কৌশলকে কোনমতেই ভুললে চলবে না। কারণ নাৎসীরা দীর্ঘকাল চুক্তির সর্ত্তাবলী পালন করতে আদৌ

আগ্রহী ছিল না। যতোদিন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযান প্রস্তুতি যথেষ্ট নয় বলে তাদের মনে হয়েছে। কেবল ততোদিনই এই চুক্তির প্রয়োজনীতা ছিল তাদের কাছে।

ঠিক সেই কারণের জন্যেই সোভিয়েত জনগণ ও সেনাবাহিনীর সজাগ প্রহরা ও দ্রুত প্রস্তুতিতে ছেদ পড়েনি কোন দিন। কারণ এ চুক্তিতে বিশ্বাস করার মতো, নির্ভর করার মতো কিছুই ছিল না।

১। বিভিন্ন দেশের প্রদত্ত পরিসংখ্যান।

২। মার্কিন কংগ্রেসের দলিল, আগষ্ট ২০, ১৯৪২ পৃঃ A ৩৩৫৪-৩৬

৩। টাইমস পত্রিকা ২৩ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮

৪। পার্লামেন্টের বিতর্ক, কমন্স সভা, ৭ই মার্চ, ১৯৩৮, পৃঃ ১৫৬৫

৫। জার্মান পররাষ্ট্র নীতির দলিল (১৯১৮—১৯৪৫), জার্মান পররাষ্ট্র দপ্তরের মহাফেজখানায় প্রাপ্ত, সিরিজ D, প্রথম খণ্ড, লণ্ডন ১৯৪৯, পৃঃ ৫৮৩

৬। আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিবরণী, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৪১৯

৭। সি, জি, হাইনেস ও আর, জে, এস, হফ্‌ম্যান: The origins and Background of the Second world war, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৪৩ পৃঃ ৪২৮

৮। মস্কোয় প্রকাশিত একটি সোভিয়েত গ্রন্থ, ১৯৪৮, পৃঃ ১০৪

৯। ঐ, পৃঃ ১০৫

১০। ঐ, পৃঃ ১০৬

১১। আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিবরণী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৩

১২। জার্মান ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ, ১৯৫১, পৃঃ ৯৪

১৩। কর্ডেল হাল: The Memoirs, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৫

১৪। ঐ, পৃঃ ৫৯৬

১৫. সামনার ওয়েলস: The Time For Decision, নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডন ১৯৪৫, পৃঃ ৩২১

১৬। হার্বার্ট ফিস্: Churchill Roosevelt Stalin, The war they waged and the peaee they Sought. লণ্ডন ১৯৫৭, পৃঃ ৪.

১৭। জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থ, ১৯৬০, পৃঃ ৬২৩

১৮। টাইমস পত্রিকা, মার্চ ১৫, ১৯৩৯.

১৯। আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিবরণী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৭০-৭১,

২০। বিভিন্ন দেশ কর্তৃক প্রদত্ত শিল্পগত পরিসংখ্যান।

২১। The Secret Diary of Harold L. Ickes. নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৪, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫১৯.

২২। আঃ সামরিক আদালতের বিবরণী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩০

২৩। ঐ, চতুর্থ খণ্ড, ৪২৪

২৪. ঐ. পৃঃ ৪২৪

২৫। Nazi Conspiracy and Aggression. তৃতীয় খণ্ড, ওয়াশিংটন ১৯৪৬, পৃঃ ৫৭৮

২৬। Hearings Before the Jt. committee on the Investigation of the Pearl Harbour Attack, ওয়াশিংটন, ১৯৪৬, পৃঃ ৪১৩২, বিংশতি খণ্ড,

২৭। নিউ ইয়র্ক টাইমস, আগষ্ট ১৬, ১৯৩৯

২৮ Papers Relating to the Forign Relations of the U. S. Japan 1931-1941 ওয়াশিংটন. ১৯৪৩, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২

২৯. জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থ. ১৯৫৬, পৃঃ ৭৯.

৩০। কাইলিং : The life of Neville Chamberlain, পৃঃ ৪০৯-১০.

৩১। উডওয়ার্ড ও বাটলার সম্পাদিত Documents on British Foreign Policy 1919-1939. তৃতীয় সিরিজ. পঞ্চম খণ্ড. লণ্ডন ১৯৫২ পৃঃ ৬৪৬

৩২. ত্রীগোয়ার পাকেস্কো রচিত ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ. পারী ১৯৪৬ পৃঃ ১৭১, ১৭২

৩৩. ক্যামিল এম. সিয়ানফাররা : The Vatican and the War নিউ ইয়র্ক ১৯৪৫, পৃঃ ১৭০-৭১.

৩৪। হার্বার্ট ফন ডার্কসেন : Moscow, Tokyo, London, Twenty years of German Foreign Policy. লণ্ডন ১৯৫১, পৃঃ ২৩৮

৩৫। হ্যারী পলিট : "After South Port" লেবার মান্থলী, ২১ খণ্ড 4 সংখ্যা ১৯৩৯

৩৬। এইচ. বি. এলিস্টন : Finland Fights. বোষ্টন ১৯৪০, পৃঃ ১৬২

৩৭। সামনার ওয়েলস : The Time For Dicision. পৃঃ ৩২৪.

৩৮। Peace and War, U. S. Foreign Policy 1931-1941 ওয়াশিংটন ১৯৪৩, পৃঃ ৪৮১

দ্বিতীয় খণ্ড

নকল যুদ্ধ

তৃতীয় অধ্যায় : পোল্যাণ্ডের সামরিক বিপর্যয়

সোভিয়েতের উদ্যোগে জার্মানীর পূর্বমুখী অভিযান রোধ

ইঙ্গ-ফরাসীদের মিউনিক নীতি যার লক্ষ্য ছিল ফ্যাশিবাদী জার্মানীর আক্রমণকে পশ্চিম থেকে পূর্ব্বমুখে সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া তা উদ্দেশ্য সফল করতে না পেরে বরং পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে হিটলারের অভিযান শুরু করার সংকল্পে প্ররোচনা দিল।

বিশ্ববিজয়ের উদ্দেশ্যে রচিত জার্মান সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনায়, বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে জয়লাভের কথা ধরা হয়েছিল। তেইশে মে, উনিশ শ উনচল্লিশ সালে, হিটলার তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, "ইংল্যাণ্ড আমাদের শত্রু ... ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ, আমাদের জীবন মরণের সংগ্রাম ... জার্মানীর সমস্ত উদ্যোগ আয়োজনের পিছনে প্রেরণাদাতা হলো ইংল্যাণ্ড ...।"[১] কিন্তু যুদ্ধ করতে গিয়ে হিটলারের সমরনায়কেরা স্থির করলেন যে সুরু করতে হবে পোল্যাণ্ড দিয়ে।

এক্ষেত্রে, পোল্যাণ্ড আক্রমণের পটভূমি হিসেবে জার্মানীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে, মিউনিক অনেকটা সাহায্য করেছে। "বৃটেন ও ফ্রান্স দায়বদ্ধ হয়েছে," হিটলার তাঁর সঙ্গী সাথীদের বলেন, "কিন্তু তারা কেউই তা পালন করতে চায় না।... মিউনিকে আমরা ওই দুটো ঘৃণ্য কীট চেম্বারলেন, দালাদিয়েরকে দেখেছি। ওদের আক্রমণ করবার সাহস নেই।—যদি সত্যিই আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা খারাপ হয়, তাহলে তারা অবরোধ ছাড়া আর কিছুই করবে না।"[২]

বাইশে আগষ্ট, উনিশ শ' উনচল্লিশ। ওবেরসাল্‌জ্‌বার্গে এক সামরিক বৈঠকে বসে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণের শেষ নির্দেশ দান করলেন। "পোল্যাণ্ডের ধ্বংস আমি দেখতে পাচ্ছি।" তিনি বললেন, "কোন বিশেষ স্থানে, সীমারেখায়

উপস্থিত হওয়াটা আমাদের লক্ষ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য হলো সমস্ত প্রতিরোধ শক্তিকে চুরমার করে দেওয়া।...যুদ্ধ সুরু করার মতো একটা প্রচারের যোগ্য কারণ আমি ঠিক করে দেব। চিন্তা করার দরকার নেই তা গ্রহণযোগ্য কি নয়। বিজেতাকে কেউ পরে জিজ্ঞাসা করতে আসবে না যে সে সত্যিকথা বলেছিল কি না। যুদ্ধ সুরু করতে, যুদ্ধ আনতে যা দেখতে হয় তা কারণের যথার্থতা নয়, জয়লাভের সম্ভবনা।"[৩]

পোল্যাণ্ড আক্রমণের কূটনৈতিক প্রস্তুতি জার্মানী সুরু করে উনিশ শ' উনচল্লিশের বসন্তকাল থেকে। বাইশে মার্চ্চ হিটলার দাবী করে বসলেন পোল্যাণ্ডের কাছে ড্যানজিগ (দানস্ক) তাঁকে দিতে হবে। এবং শুধু তাই নয়। পোলিশ করিডর ভেদ করে জার্মানীর অধিকারে একটি করিডর দিতে হবে, যাতে জার্মানী থেকে মোটর ও রেলপথ সরাসরি বিস্তৃত হ'তে পারে পূর্ব্ব প্রাশিয়া পর্য্যন্ত। হিটলার এই টোপ এমনই এক সময়ে ফেললেন যখন মস্কোয় অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইঙ্গ ফরাসী সোভিয়েত বৈঠক। সাধারণভাবে সমস্ত আবহাওয়াতে রয়েছে অনিশ্চয়তা।

তারপরে যেমন দেখা গেল চেম্বারলেন ও দালাদিয়ের সোভিয়েতের সঙ্গে কোন পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদন করতে রাজী নয়, জার্মান সাম্রাজ্য বাদীদের সাহস বেড়ে গেল। জার্মান সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র পোল-বিরোধী প্রচার সুরু হয়ে গেল।

তিরিশে আগষ্ট, উনিশ শ' উনচল্লিশের রাত্রে জার্মানী ডাগজিগ ও পোলিশ করিডর দাবী করে এক লিপি প্রচার করলো। সেটাই চরমপত্র। পোল্যাণ্ড সরকার বার্লিনস্থ পোল রাষ্ট্রদূত জোসেফ লিপস্কিকে নির্দ্দেশ দিলেন, জার্মান সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সুরু করতে। কিন্তু কোন জার্মান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হ'লো না। তাঁরা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অসম্মত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করলেন যে জার্মানা পোল্যাণ্ডের সরকারী প্রতিনিধির প্রতীক্ষায় আছে। যদি তিনি না আসেন, তাহলে জার্মানী এটাই ধরে নেবে যে পোল্যাণ্ড সরকার বিষয়টির শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় অসম্মত।

এরই পাশাপাশি চললো উস্কানিদানের প্রচেষ্টা। জার্মানীর কয়েদখানা থেকে বেছে বেছে অপরাধীদের বের করে এনে পোল সামরিক বাহিনীর পোষাকে

তাদের সজ্জিত করা হলো। তারপর তাদের আদেশ দেওয়া হলো সীমান্তে গ্লেইবিৎস শহর তারা যেন "আক্রমণ" করে[৪]—তাহলে সেটাই হবে আক্রমণ সুরু করার একটা "প্রচার যোগ্য অজুহাত" যার কথা হিটলার তাঁর, বাইশে আগষ্টের বক্তৃতায় বলেছিলেন।

পয়লা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' উনচল্লিশ। ভোর ৪-৪৫ মিনিটে জার্মান সৈন্য পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলো। যুদ্ধরত সেনাবাহিনীর উদ্দেশে প্রচারিত একটি ঘোষণায় হিটলার বল্লেন :

"পোল্যাণ্ড সরকার অস্ত্রবলের সাহায্য বিষয়টির মীমাংসা করতে চায়।... রাইখের সীমান্তের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে তার আর কোন আগ্রহ নেই।...এই উন্মাদের আচরণকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে, এখন থেকে শক্তি প্রয়োগ করা ছাড়া আমি আর গত্যন্তর দেখছি না।"[৫]

ততোদিনে জার্মানীর যুদ্ধযন্ত্র যথেষ্ট সুসজ্জিত, প্রস্তুত হয়ে গেছে। চুয়াল্লিশ ডিভিসন বাছাই করা দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী, যার মধ্যে ছিল পাঁচটি প্যানসার ও ছ'টি মোটর বাহিত ডিভিসন, একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো পোল্যাণ্ডের উপর। আরো দশ ডিভিসন সুসজ্জিত সৈন্য তৈরী রাখা হলো সংরক্ষিত বাহিনী হিসেবে। আর স্থলবাহিনীর সাহায্যার্থে রইলো দু'হাজার জঙ্গী বিমানের এক শক্তিশালী বাহিনী।

যেদিন আক্রমণ সুরু হলো, তখনো পোল্যাণ্ড তার সামরিক প্রস্তুতি সুরু করে নি। তার সেনাবাহিনীর সামর্থ তখনো শান্তিকালীন সীমায় সীমিত। তার পরিমাণ সর্বসাকুল্যে তখন তিরিশ ডিভিসন সৈন্য, বারোটি অশ্বারোহী বাহিনী আর মাত্র চারশ' সেকেলে ধরণের জঙ্গীবিমান। এরই একটা বিরাট অংশ আবদ্ধ আছে আবার পূর্ব সীমান্তের নিরাপত্তা বিধানে। পশ্চিম সীমান্তে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য আরক্ষা ব্যবস্থাই নেই। অথচ তার শিল্প-কেন্দ্রের বেশিরভাগই রয়েছে ওয়ারশ'র পশ্চিমে সেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ত্রিকোণাকৃতি অঞ্চলে যা জার্মান-পোল্যাণ্ড সীমান্তের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পোল্যাণ্ডের শাসকশ্রেণীর "পশ্চিমমুখীনতা" যা পূর্ব সীমান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি প্রত্যক্ষভাবে শত্রুতা করে যেতো, তারই মারাত্মক কুফল এবার ফলে যেতে লাগলো। পোল্যাণ্ডের শিল্পব্যবস্থা জার্মাণ সমরবাহিনীর আক্রমণের মুখে একেবারে অরক্ষিত হয়ে রইলো।

জার্মাণ জঙ্গী বিমানের আঘাতে পোল্যাণ্ডের বিমানবাহিনী কয়েকদিনের মধ্যেই চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গেল। পোল্যাণ্ডের রেলপথ বোমার আঘাতে এমনই বিধ্বস্ত হলো যে সমরবাহিনীর পরিচালনা পোল্যাণ্ড সরকারের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মাণ আক্রমণ এগিয়ে চললো ধাপে ধাপে। সাতই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সীমান্তরক্ষী বাহিনী নাৎসী আক্রমণের চাপে ভেঙ্গে পড়লো পিছনের সাহায্যকারী সেনাদলও সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আর যা কিছু তখনও ধ্বংস হলো না, তারা নেতৃত্ববিহীন হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। জার্মাণ ডিভিসন পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো ত্রিমুখী ধারায়—উত্তরে পূর্ব প্রাশিয়া পশ্চিমে পূর্ব জার্মাণী এবং দক্ষিণে শ্লোভাকিয়া দিয়ে। ত্রিমুখী ধারা মিলিত হলো সঙ্গমে—ওয়ারশ' নগরীকে ঘিরে অবশিষ্ট পোল সৈন্য যেখানে ঘাঁটি করেছে। আটই সেপ্টেম্বার এক জার্মাণ প্যানসার বাহিনী ওয়ারশ'র একটা শহরতলী দখল করে নিল। এবং উনিশে সেপ্টেম্বার এখানে ওখানে কিছু খণ্ড বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ছাড়া সমগ্র পোল্যাণ্ড জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর পদানত হলো। পোল্যাণ্ডের পতন সম্পূর্ণ হয়ে গেল।

পোল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্যের প্রধান কারণ ছিল তার জন-বিরোধী, দুর্নীতিপরায়ণ, মূলতঃ ফ্যাশিবাদী শাসক শ্রেণীর চরিত্রের মধ্যে নিহিত। শহরে, গ্রামে মেহনতী মানুষের চরম দারিদ্র্য, তাদের রাজনৈতিক শক্তিহীনতা, অবদমনের পাশাপাশি চলেছে জমিদার, দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের অবাধ ক্ষমতার ব্যবহার। এর সঙ্গে মিলেছে ইউক্রেনীয়, বাইলোরুশিয় প্রভৃতি জাতীয় সংখ্যালঘুদের নির্যাতন। সেনাবাহিনী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগহীন শুধু শাসক শ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক তারা। পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রনীতির মূল্য লক্ষ্য হয়েছে সমস্ত সোভিয়েত বিরোধী নীতি ও কার্যক্রমে অকুণ্ঠ সমর্থন ও প্রশ্রয়দান এবং সম্ভব হলে তাতে যোগদানের ইচ্ছা। পোল্যাণ্ডের জাতীয় স্বার্থের পক্ষে পরিপন্থী এর চেয়ে আর কোন কাজ হতে পারতোনা। এরই প্রমাণ পাওয়া যায় মিউনিক আপোষকারীদের সঙ্গে তাদের চুক্তি থেকে, নাৎসীদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের মধ্যে। তাই দেখা যায় প্রখ্যাত হিটলার-পন্থী কর্ণেল বেক রচনা করছেন তার পররাষ্ট্র নীতি যার মুল লক্ষ্য হলো সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোণঠাসা, একঘরে করে

রাখা। শান্তিরক্ষায় যৌথ দায়িত্ব ও সহযোগিতার সোভিয়েত প্রস্তাব তাই প্রত্যাখান করতে তাঁর বাধেনি।

পোল্যাণ্ডে ফরাসী রাষ্ট্রদূত লিও নোয়েল তাই লিখেছেন, "কার্যতঃ বেক ফুয়েরারের নীতিকে সে সময়ে অতি মূল্যবান সমর্থন জানিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা যৌথ প্রচেষ্টা চলতে লাগলো। লীগ অব্ নেশন্‌সের যৌথ প্রতিরক্ষা, বহুমুখী পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি প্রভৃতি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে রাইখের সমস্ত প্রচেষ্টাতেই পোল্যাণ্ডের কূটনীতিকরা সমর্থন জানিয়েছেন।"[৭]

সেপ্টেম্বারের সেই মর্মান্তিক একাকীত্বের দিনগুলি পোল্যাণ্ডের অনুসৃত নীতিরই প্রত্যক্ষ ফল। পোল্যাণ্ডের সরকার জনগণের জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করেছিলেন। শাসক চক্রের নৈতিক ও রাজনৈতিক মান বলে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। দুর্নীতি আর মুনাফাবাজীর পাঁকে তারা তখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত। দেশব্যাপী একটা বর্বর সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করে কোনমতে তারা ক্ষমতাকে আঁকড়ে ছিল, তাই দেখা গেল প্রথম দিকের সামরিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তারা পালিয়েছে দেশ ছেড়ে, জনসাধারণ আর সেনাবাহিনীকে একেবারে ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে।

সরকার ও সমর নায়কদের এই বিশ্বাসঘাতক পলায়নীবৃত্তি সেনাবাহিনী ও সাধারণ মানুষের মনে আনলো বিভ্রান্তি। কিন্তু তবুও সেনাবাহিনীর কিছু অংশ আর অসামরিক মানুষ প্রকৃত বীরত্বের সঙ্গে রুখে দাঁড়িয়েছিল নাৎসী আক্রমণকে। কুত্‌নো (kutno), রাদমের (Radom) যুদ্ধই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মোদলিন দুর্গ লড়াই চালিয়ে গেল তিরিশে সেপ্টেম্বার পর্যন্ত। পোল্যাণ্ডের একমাত্র বন্দর গিদিনিয়ায় (gdynia) নৌ-সৈন্যের প্রতিরোধ চললো আরো বেশি দোসরা অক্টোবর পর্যন্ত। কমিউনিষ্ট আর প্রগতিশীল শ্রমিকদের নেতৃত্বে, ওয়ারশ'র মানুষ শহরের প্রতিরোধ ভেঙ্গে ঢুকে পড়া এক প্যানসার ডিভিসনকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। অবরুদ্ধ, আধভাঙ্গা ওয়ারশ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেল তিরিশে সেপ্টেম্বরের দিন পর্যন্ত। যতক্ষণ না তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গেল।

চরম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পোল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ দেখালো তাদের শক্তি আর একাগ্রতা।

পোল্যাণ্ড দখল করে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা পোল্যাণ্ডের জনসাধারণকে তাদের ন্যূনতম মানবিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত করলো। বিকৃত করে দিল তারা পোল্যাণ্ডের জাতীয় সংস্কৃতি। তাদের চরম লক্ষ্য পোল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে সক্রিয় অংশটুকু ছিল, তাকে নির্মূল করে দেওয়া। হিটলার নিযুক্ত পোল গভর্ণর-জেনারেল হান্স ফ্রাঙ্ক একটা নারকীয় নির্দেশনামা জারী করে জানালেন দেশের মধ্যে যেখানে যেখানে এই অগ্রগামী, সক্রিয় অংশ আছে তাকে নির্মূল করে ফেলতে হবে এবং দেখতে হবে কালক্রমে নোতুন কালের মানুষ যারা তাদের মধ্যে এরা যেন কোন মতে মাথা তুলতে না পারে। তাই পুলিশের "কাজের চাপ" না বাড়িয়ে এদের ব্যবস্থা করার জন্য তিনি পথ বাৎলে দিলেন। জার্মান কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে কিছু পোল জনসাধারণকে ধরে রাখলে. "তাদের পরিবারের লোকদের খবর দেওয়া নেওয়ার ব্যাপারে কিছু লেখালিখির ঝামেলায় পড়তে হবে।" তার চেয়ে বরং যেখানে তাদের পাওয়া যাবে সেখানে "একেবারে সহজ কায়দায়" শেষ করে দিতে পারলে আর এসব করতে হবে না। তাই অধীনস্থ লোকদের প্রতি আদেশ হলো তারা যেন সেই কাজটাই করে। নাৎসী আক্রমণে পোল্যাণ্ডের ষাটলক্ষ মানুষকে প্রাণ দিয়ে তার মূল্য দিতে হয়েছে।

আক্রমণ শেষে জার্মানী পশ্চিম ও উত্তর পোল্যাণ্ডকে নিজের রাজ্যের এলাকাভুক্ত করে নিল। আর বাকী অংশ একজন জার্মান গভর্ণর জেনারেলের শাসনাধীনে রাখা হলো, যার সদরদপ্তর হবে ক্রাকাউয়ে।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোবল এতেও ভাঙ্গেনি। তীব্র ঘৃণা আর ধিক্কারে পোল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিক মানুষ নাৎসী বর্বরতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। দখলদারী শাসন কর্তৃপক্ষের আদেশ তারা মানতে অস্বীকার করেছে। পোল্যাণ্ডের বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে দেখা দিয়েছে প্রতিরোধ বাহিনী—পার্টিজানদল।

॥ দুই ॥

পোল্যাণ্ডে নাৎসী আক্রমণের পরে, তার "মিত্র" পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ?

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে পোল্যাণ্ডের মিত্র ছিল না। কিন্তু

পোল্যাণ্ডের রাজনীতিতে তার প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সোভিয়েতের যৌথ নিরাপত্তা বিধানের প্রস্তাব পোল সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পেছনে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা ছিলেন বিশেষ ভাবে দায়ী। আমেরিকার নীতি নিয়ামকেরা ইউরোপে যুদ্ধের খবরে তাদের উল্লাস বিশেষ এমন কিছু চেপে রাখার চেষ্টাও করেননি। উনিশ শ' সাইত্রিশ সাল থেকেই মার্কিণ অর্থনীতিতে তীব্র সংকটের ছাপ এসে পড়েছিল। যুদ্ধ ব্যবসাবানিজ্যর সম্প্রসারণের যে সুনিশ্চিত সুযোগ উপস্থিত করবে, মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের কাছে সেটাই হলো প্রত্যাশার বিশেষ কারণ। ইউরোপে একটা ব্যাপক যুদ্ধ আমেরিকার অর্থনীতির সামনে যে বিরাট সম্ভবনার পথ খুলে দেবে, মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি সেকথা ঘোষণা করতে কোন দ্বিধা করেনি। যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এর ফলে স্বভাবতই যে বিশেষ সুবিধা পাবে, সেটাই ছিল তাদের বক্তব্য। আমেরিকার ব্যবসায়ী মহলে প্রশ্ন ছিল শুধু এইটা যে যুদ্ধ কতোদিন চলবে। নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন মন্তব্য করে যে, যদি শান্তির ললিত বাণী বৃহৎ শক্তিবর্গের মন টানে, তাহলে আমেরিকার ব্যবসায়ী স্বার্থ বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে বলেই অর্থবিদদের ধারণা। সংবাদপত্রটি একথাও জানায় যে আমেরিকার অর্থনীতি একটা দীর্ঘকালব্যাপী সর্বাত্মক সংগ্রামের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রস্তুত হয়েছে।

যুদ্ধকালীন চাহিদার তাগিদে, আমেরিকার অর্থনীতি বাস্তবিকই ঊর্দ্ধমুখী হলো। আমেরিকার কমিউনিষ্ট পার্টির স্বর্গতঃ সভাপতি উইলিয়াম জেড ফস্টার অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

'বিশুদ্ধ' পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তখন পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। উনিশ শ' উনচল্লিশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্কর ছায়া যখন পড়তে সুরু করলো, তখনই আমেরিকার শিল্পোৎপাদন, যুদ্ধের সরবরাহের ঢালোয়া চাহিদায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো, আবার তার প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল।"[৮]

আমেরিকার একচেটিয়াপতিদের উল্লাসের আরেকটি সমান গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল এই সুদৃঢ় বিশ্বাস যে প্রথম মহাযুদ্ধের মতো এবারেও তারা সুরুতে যথারীতি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলবে এবং যুদ্ধের এমনই এক স্তরে যোগ দেবে যাতে যুদ্ধকালীন সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসায় ও যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর কাজে তারা যথারীতি নিজেদের স্বার্থ গুছিয়ে নিতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে তাদের পরিকল্পনা

যে পুরো সাফল্য অর্জন করতে পারেনি সেকথা স্মরণ করেই তারা প্রস্তুত হলো এবারে বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনাকে সফল করার জন্যে। আটাশে অক্টোবর, উনিশ শ' উনচল্লিশে ইয়ং মেন'স ক্রীষ্টিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে জাতীয় পরিষদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জন ফস্টার ডালেস প্রায় এই কথা-গুলিই বলেছিলেন।[৯] সিনেট সদস্য বোরা (Borah) এই কথারই পুনরুক্তি করেন।[১০] নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর প্রতিনিধি অ্যানে ও' হেয়ার ম্যাক্‌কর্মিক্ লিখলেন যে "কিন্তু ওয়াশিংটনের একটা কথা যুদ্ধের মোড় এধারে ওধারে অনেকখানি এখন ঘোরাতে পারে।"[১১]

তেসরা সেপ্টেম্বার, উনিশ শ' উনচল্লিশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারীভাবে নিরপেক্ষতা ঘোষণা করলেন।

সাম্রাজ্যবাদী শাসক মহলের উল্লাসের জোয়ারে কেবল একটাই মাত্র বাধা পড়েছিল। তাঁরা স্পষ্টতই বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এই জন্যে যে জার্মাণী তখনো পর্যন্ত কেন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করছে না। সংবাদপত্রেই শুধু জার্মাণীর এই আচরণের নিন্দা করা হয়নি, ইঙ্গ ফরাসী বৈমানিকরা জার্মাণীর উপরে যে ইস্তাহার ছড়িয়েছিল তাদের বয়ানেও ছিল এই একই কথা। এই রকমই একটা ইস্তাহারের শিরোনামায় লেখে হয়েছিল "বলশেভিবাদ নিপাত যাক্!" এবং অভিনন্দন জানানো হয়েছিল হিটলারকে "সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডের প্রধান নেতা" হিসেবে। ইস্তাহারে আক্ষেপ করে আরো বলা হয় যে, "আজ সেই প্রধান নেতা কি অবশেষে দেখা যাচ্ছে না যে তিনি মস্কোর সঙ্গে আপোষ করে ফেলেছেন।"[১২] বলশেভিকবাদ বিরোধিতার পবিত্র কর্তব্যে হিটলার যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, সেই অভিযোগ আনলেন চার্চিল।

কিন্তু আমেরিকার তুলনায় বৃটিশ ও ফরাসী সরকারের সমস্যাগুলি ছিল অনেক বেশি জটিল। কারণ নাৎসী আক্রমণ ঘটলে পোল্যাণ্ডের নিরপত্তা বিধানের জন্যে তাঁরা ছিলেন "দায়বদ্ধ"। চেকোশ্লোভাকিয়ার সংকটে তাঁরা যেভাবে দায় দায়িত্ব এড়াতে পেরেছিলেন, এক্ষেত্রে তেমনটি করা সম্ভব ছিল না। তাঁদের নিজেদের দেশেই জনমত তাতে ক্ষমা করবে না।

তাছাড়া তাঁরা এ ব্যাপারেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন যে হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের লক্ষ্য তাঁদের দেশেও প্রসারিত। এবং পোল্যাণ্ডের বিষয়টির একটা নিষ্পত্তি হলেই জার্মানরা পশ্চিমের দিকে মুখ ফেরাবে। তাই মার্কিণ সরকারের

সঙ্গে এক জোটে তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন হিটলারের লক্ষ্যকে পূর্বে, সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঘোরাতে।

বৃটিশ ও ফরাসী সরকার দাবী করলেন যে জার্মানী পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তার সমস্ত আক্রমণ বন্ধ করে দিক। তা করলে, তারা এটাও জানিয়ে দিলেন, জার্মান সৈন্যের পূর্ব দিকে অভিযানে যদি পোল্যাণ্ডের ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে গতায়ত করতে হয়, তাহলে তাতেও কোন আপত্তি থাকবে না।

পোল্যাণ্ড সমস্যার সমাধানের জন্যে মুসোলিনী মিউনিক ধাঁচের এক সম্মেলনের প্রস্তাব করলেন দোসরা সেপ্টেম্বার। অনুরূপ প্রস্তাব এলো ফ্রাঙ্কোর-স্পেন থেকে। কিন্তু ততোদিন নাৎসী সরকার পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে মনস্থির করে ফেলেছেন। স্বভাবতই এসব প্রস্তাব উপেক্ষা করলেন তাঁরা। জার্মানীর এই উপেক্ষা বৃটেন ও ফ্রান্সকে বাধ্য করলো যুদ্ধ ঘোষণা করতে তেসরা সেপ্টেম্বার তারিখে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সরাসরি সমরাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার বাসনা তখনো তাঁদের ছিল না। বরং তাঁরা এটাই ভেবেছিলেন যে শুধু যুদ্ধ ঘোষণা করাটাই হিটলারকে নিবৃত্ত করার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

সে কারণেই তাঁরা পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করার পবিত্র শপথ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চুপ করে রইলেন। অবিচলিতভাবে তাঁরা দেখলেন নাৎসীরা পোল্যাণ্ড ধ্বংস করে ফেললো। লণ্ডনে পোলাণ্ডের সামরিক মিশনের সমস্ত আবেদন উপেক্ষিত হলো।

ইঙ্গ ফরাসী শক্তির এই চালটা সূক্ষ্ম হলেও, ফলটা মারাত্মক হলো। নাৎসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণী জার্মানীর বিরুদ্ধে কোন পাল্টা আক্রমণ সুরু করলেন না। এমন কি বলবার মতো কোন সামরিক প্রস্তুতি ও দেখা গেল না। তাঁদের যুদ্ধ ঘোষণা হলো, একটা "যুদ্ধের ভান" মাত্র, যেখানে সামরিক তৎপরতা নেই কোথাও এতোটুকু। পশ্চিম সীমান্তে এই স্তব্ধতা নাৎসীদের শুধু এইটুকু বোঝানোর জন্যেই বজায় রাখা হলো যে সেদিক থেকে তাদের কোন আশংকার কারণ নেই। তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নির্দ্বিধায় কাজ সুরু করতে পারে।

যেখানে সংগ্রাম নেই অথচ যুদ্ধের ঘোষণা আছে, তারই নাম "নকল যুদ্ধ"। ফরাসী ফ্যাশিবাদী জঁা ইবারনেগারে (Ybarnegaray) এর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন :

"যখন আকাশে বোমারু বিমান বোমা ফেলে না ; যেখানে পর্বত প্রমাণ গোলাবারুদ জমিয়ে রেখেও কামান গর্জে ওঠে'না ; বিরাট বিরাট সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখানে ওখানে মাঝে মাঝে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ছাড়া আর কিছু না করে একে অন্যকে নিরীক্ষণ করে ; স্পষ্টতই যুদ্ধের কোন উদ্যোগ তাদের মধ্যে দেখা যায় না এবং যখন গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা সীমান্ত পরিদর্শনে এসে কামানের গর্জনে অভিনন্দিত না হয়ে, "স্বাগত" নির্দেশনামা দেখে যায় এবং আমার বিশ্বাস হয়তো বা তাদের সম্মানে গাওয়া জাতীয় সংগীত শুনে যায়, তখন তাকেই বলে নকল যুদ্ধ।"[১৩]

ফরাসী সমর অধিকর্তাদের নির্দেশে কেবল একটা প্রতীক যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হলো —কয়েকটা দায় সাড়া গোছের আক্রমণ করা হলো এমন সব জায়গায় যাদের গুরুত্ব একান্তভাবে স্থানীয়। তাতে জার্মাণ সীমান্তে দুটো জায়গা ফরাসীদের দখলে এলো, যা দেখে বোঝা গেল যে জার্মাণরা এতে বিশেষ কোন বাধাই দেয় নি। তার কিছু পরেই মূল সীমারেখা বরাবর সুসজ্জিত শীতকালীন ঘাঁটিতে অপেক্ষা করার অজুহাতে, জার্মাণ সৈন্যের কোন পাল্টা আক্রমণ ছাড়াই ফরাসী বাহিনী সরে আসলো।

বৃটিশ ও ফরাসী বিমানবহরের কাজ হলো শুধু ছকবাঁধা পর্যবেক্ষণ পরিক্রমা করে বেড়ানো আর "ইস্তাহার আক্রমণ" চালু রাখা, যাতে শপথ ভঙ্গকারী হিসেবে হিটলারের বিরুদ্ধে প্রকাশ পেয়েছে তাঁদের ক্ষোভ। জার্মান বিমান-বহর পাল্টা গোটাকতক সামুদ্রিক অভিযান চালালো, কিন্তু তাকেও বিশেষ সক্রিয় দেখা গেল না।

নৌবহরের সক্রিয়তা বরং অনুপাতে ছিল অনেক বেশি। বৃটেন বেশ রীতিমতো ধাক্কা দিয়েই তাদের কাজ সুরু হলো। যুদ্ধ ঘোষণার পরে ইংল্যাণ্ডের বন্দরের দিকে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের পথে অনেক অস্ত্র শস্ত্রহীন বাণিজ্য জাহাজ জার্মাণ ডুবো জাহাজের আক্রমণে সলিল সমাধি লাভ করলো। ইউ-সাতচল্লিশ নামের একটা জার্মান ডুবো জাহাজ স্ক্যাপা ফ্লো নামের প্রধান নৌবহরের মধ্যে নোঙর করে থাকার সময় ঢুকে পড়ে, বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ "রয়াল ওক"কে ডুবিয়ে দিল। ব্রিষ্টল চ্যানেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে আরেকটা জার্মাণ ডুবো জাহাজ বিমানবাহী জাহাজ "কারেজিয়াস"কে ও জলমগ্ন করে দিল। "বেলফাষ্ট" আর "নেলসন" নামে দুটি ক্রুইজার মাইনে ধাক্কা খেয়ে জখম হয়ে কোন মতে ফিরে

এলো বন্দরে। মেরামত করে আবার চালু করা হলো তাদের। একটা ছোট্ট যুদ্ধ জাহাজ গ্রাফ স্পী'কে বৃটেনের নৌ প্রহারারত বাহিনী দক্ষিণ অতলান্তিকে আটক করে ঘায়েল করে দেওয়ায়, তার নাবিকেরা বার্লিনের নির্দেশ মতো জাহাজটা চুরমার করে নিজেরাই ডুবিয়ে দিল।

উনিশ'শ উনচল্লিশের শেষে বৃটিশ ও ফরাসী সেনাবাহিনীর মোট ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ালো সৈন্য ও পদস্থকর্মচারী নিয়ে চোদ্দ শ' তেত্রিশ। ফ্রান্সে বৃটিশ অভিযানকারীদের মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিল মাত্র তিনজন মানুষ।[১৪]

বৃটেনের যুদ্ধের জন্য শিল্পোৎপাদনকে ধীরে ধীরে তখন উপযুক্ত করে তোলা হচ্ছে। ফ্রান্সে যুদ্ধোৎপাদনের হার কিন্তু কমে গেল, এই জন্যে যে তার অনেক দক্ষ শ্রমিককে কারখানা থেকে ছাড়িয়ে এনে যুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই সামরিক প্রস্তুতি, অন্য একদিক থেকে সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত। ফরাসী সরকারের প্রত্যাশা ছিল যে তাহলে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক সক্রিয়তাকে খর্ব করে দেওয়া যাবে। ওধারে ফরাসী যুদ্ধোৎপাদন যখন আপ্রাণ চেষ্টা করছে তার সেনাবাহিনীর স্বাভাবিক ও সঙ্গত চাহিদাকে কোনমতে পূরণ করার জন্যে অন্যদিকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা তখনো শত্রুর সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যবসা বাণিজ্য। বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গের মধ্যে দিয়ে আকরিক লোহা, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও অন্যান্য জিনিসপত্র যথারীতি চালান যাচ্ছে জার্মানীতে। ফরাসী বাণিজ্যিক স্বার্থের কাছে তাদের নিজেদের স্বার্থটাই ছিল তখনো মুখ্য, আর সে হিসাবে যুদ্ধ একটা রীতিমতো লাভজনক ব্যবসা।

কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণীর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রধান পরিচয় এটা ছিল না। তা দেখা যায় দক্ষিণপন্থী সোস্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে যোগসাজসে তারা যখন ফরাসী প্রতিরোধের মূল শক্তি, তার রাজনৈতিক মেরুদণ্ড স্বরূপ পপুলার ফ্রন্টকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই ফ্রান্স যুদ্ধে যোগদান করলো একটা বিভ্রান্তির মধ্যে, যখন দেশটাই নিজেদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে কারণ ফরাসী সরকারের সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হলো জার্মান যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নয়, তার নিজের দেশের মানুষ, বিশেষ করে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে, যাদের পিছনে ছিল পনের লক্ষ্য ভোটদাতার সমর্থন। তাই দেখা গেল একদিকে যখন কমিউনিষ্টদের গলাটিপে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, অন্যদিকে তখন হিটলার অনুগামী আবেৎজ্ ও দ্য ব্রিয়ঁর (de

Brinor) লোকেদের বিনা বাধায় জঘন্য ফরাসী জনবিরোধী কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে।[১৫]

যুদ্ধ সুরু হওয়ার অল্পকাল পূর্বে পারীস্থিত জার্মান রাষ্ট্রদূতকে ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী বনেৎ জানিয়েছিলেন যে ফ্রান্সে নির্বাচন স্থগিত রাখা হবে। সভা আহ্বান করা বে-আইনী ঘোষণা করে দেওয়া হবে, বিদেশী সমস্ত প্রচার দমন করা হবে এবং সবই করা হবে এমন করে এমন করে যাতে "কমিউনিষ্টদের ব্যাপারটা সমঝে দেওয়া" যায়।[১৬] হিটলারের এতে আনন্দিত না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। ফরাসী সরকার তখন ফ্রান্সের দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গেই লড়াই চালাচ্ছিলের। আর তারই মাধ্যমে নাৎসীদের কাছে আত্মসমর্পন করার পথ প্রশস্ত হয়ে উঠছিল। ফরাসী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টিই তখন ফ্যাসীবাদী জার্মাণীর বিপদের সামনে দেশ ও দেশের মানুষকে রক্ষা করতে রুখে দাঁড়াতে দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছিল। পঁচিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চল্লিশ, মরিস তোরে বলেন :

"কিন্তু এতোসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, হিটলার যদি যুদ্ধ সুরু করেন তাহলে এটা তাঁকে জনিয়ে দিতে চাই যে জাতি সমূহের শান্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা-রক্ষার সংগ্রামে তিনি দেখতে পাবেন তাঁকে রুখে দাঁড়িয়েছে ঐক্যবদ্ধ ফরাসী জাতি, যার প্রথম সারিতে থাকবে কমিউনিষ্টরা।"[১৭]

কিন্তু ফরাসী কমিউনিষ্টদের এই দেশপ্রেমিক মনোভাবের জবাব দিলেন ফরাসী সরকার দমননীতি চালিয়ে। দালাদিয়ের সরকার এরপরই কমিউনিষ্ট পার্টিকে বে-আইনি ঘোষণা করলেন ছাব্বিশে সেপ্টেম্বার উনিশ শ' উন-চল্লিশ তারিখে। এর পরই এল একটার পর একটা প্রতিক্রিয়াশীল নীতি। ফ্যাশিপন্থী আইন : যে সব মিউনিসিপ্যালিটিতে কমিউনিষ্টরা নেতৃস্থানীয় ছিল তা ভেঙ্গে দেওয়া হলো ; কমিউনিষ্ট ডেপুটিদের গ্রেপ্তার করা হলো এবং এমন সব কাজ সুরু হলো যার বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টরা যেন সামান্যতম আইনগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না পারে।

কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে তাদের সংবাদপত্রও বে-আইনি করে দেওয়া হলো কমিউনিষ্ট ডিপুটিদের পার্লামেন্টারী সুযোগ সুবিধাগুলি রহিত করে দেওয়া হলো। এপ্রিল, উনিশ শ' চল্লিশে ফরাসী শাসকশ্রেণী ডিক্রীজারী করলেন যে, যে সমস্ত ফরাসী নাগরিককে কমিউনিষ্ট প্রচারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহ

করা হবে, তাদের শাস্তি মৃত্যু। জাতির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে যে সব গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এলো, তাদের সবকটি বে-আইনী করে দেওয়া হলো। যে সব মানুষ জাতীয় অধিকারের কথা বললেন, কিম্বা প্রতিবাদ জানালেন প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে, তাঁদের আটক করা হলো জেলখানায় কিম্বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। যুদ্ধের প্রথম ছয়মাসে দু'হাজার সাত শ' আটাত্তর জন কমিউনিষ্ট পরিষদ সদস্য ও মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলারের সভ্যপদ বাতিল হয়ে গেল। একশ' একষট্টিটি সাময়িকপত্র এবং ছয়শ' উনত্রিশটি শ্রমিক সংগঠন বন্ধ করে দেওয়া হলো।

খ্যাতনামা ফরাসী কমিউনিষ্ট ফ্লোরিম বঁতে (Folrimond Bonte) লিখেছেন : "উনিশ শ' উনচল্লিশে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। যা রইলো তা হচ্ছে প্রতিক্রিয়ার এক নায়কত্ব, যার সরকার, দেশের মানুষের শত্রুর পায়ে দাসখৎ লিখে দিয়ে, যুগ যুগ ধরে ফরাসী সাধারণতন্ত্রীরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের যে অধিকারগুলি অর্জন করে ছিলেন তা ধ্বংস করে দিতে লাগলো। তখন আর পার্লামেন্ট বলে কিছু রইলো না, যা রইলো একদল অনুগত ভৃত্যের সভা যারা ভিশী সরকারের সেই বৃদ্ধ শয়তানের পদলেহন করে হিটলারের দানবীয় অনুচরদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশ্বঘাতকতা করতে প্রস্তুত।"[১৮]

এরই মধ্যে একদিকে যখন ফরাসী সরকার সোভিয়েত বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে পুরোদমে, দেশের কমিউনিষ্টদের নির্যাতিত করছে, অন্যদিকে জার্মাণী তখনই চরম প্রস্তুতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ফ্রান্সের উপর সর্বাত্মক সংগ্রামে। লাক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম, ও নেদারল্যাণ্ডসের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে ফ্রান্স আক্রমণের জন্য প্রস্তুতির আদেশ হিটলার জারী করলেন নয়ই অক্টোবর, উনিশ শ' উনচল্লিশে।

উইলহেলম কাইটেলের অধীনে জার্মাণ সমর পরিষদ আক্রমণের একটা পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী রচনা করলো। যুদ্ধের আগুন তখন অব্যাহত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রায় সমস্ত বৃহৎ শক্তিবর্গ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো।

জার্মাণ ফ্যাশিস্তরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু করলেও তারা, বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের একটা ঘৃণ্য, বর্বর, লুণ্ঠনকারী অংশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই সাম্রাজ্য-বাদী সমাজ ব্যবস্থাই কোটি কোটি মানুষকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে। আরো

সহস্রকোটির ঝরিয়েছে চোখের জল আর ঘটিয়েছে রক্তপাত, ধ্বংস করেছে মানুষের বহু-যুগের সম্মিলিত সাধনার ফল তাদের জাতীয় সম্পদ আর সংস্কৃতি।

যুদ্ধের প্রথম দিকে, অর্থাৎ উনিশ শ' উনচল্লিশের সেপ্টেম্বর থেকে সুরু করে হিটলার যেদিন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করলো সেদিন পর্যন্ত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছিল দুই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের মধ্যে যুদ্ধ। তার একদিকে ছিল জার্মানী, ইটালী আর জাপান অন্যদিকে বৃটেন ফ্রান্স আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রথম মহাযুদ্ধের মতো এই যুদ্ধেরও মূল কারণ ছিল বাজার আর কাঁচামাল দখলের প্রচেষ্টা যাতে পুঁজিবিনিয়োগের সুযোগ যায় বেড়ে, কায়েম হয় বিশ্বব্যাপী আধিপত্য। তাই সুরুতে এটাও ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধ। কিন্তু জাতীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে ওঠায় এবং জনগণের ফ্যাশি বিরোধী আন্দোলনের চাপে ধীরে ধীরে জার্মানীর বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিণতি লাভ করলো ফ্যাশি বিরোধী যুদ্ধে। হিটলার জার্মাণীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে একটা ফ্যাশি বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপদান করতে চরম সাহায্য করলো।

ততোদিনে প্রশান্ত মহাসাগরেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠেছে। যদিও তখনো পর্যন্ত তারা সরাসরি সামরিক সংঘর্ষের পথে যায়নি।

ইউরোপের যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সরকারীভাবে ঘোষিত নিরপেক্ষতা নীতিকে সুদূরতম কল্পনাতেও আমেরিকার প্রকৃত নীতির প্রতিফলন বলে মনে করার কোন ছিল না। কারণ প্রথম থেকেই মার্কিন শাসকশ্রেণী, বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রধান অন্তরায় দেখে, মার্কিণ সরকার ইঙ্গ-ফরাসী শাসকদের সঙ্গে একত্রে সোভিয়েত বিরোধী কুৎসা রটনায় সক্রিয় হয়ে যান। তারই পাশাপাশি চলে এমনই এক "মারাত্মক অস্ত্র" নির্মাণ প্রচেষ্টা, যাতে সমস্ত বিষয়ে উদ্যোক্তার ভূমিকা সহজেই চলে আসে আমেরিকার আয়ত্তাধীনে। মার্কিণ রাষ্ট্রপতির এক বিশেষ আদেশের ভিত্তিতে স্থাপিত হয় আনবিক শক্তি কমিশন। একুশে অক্টোবর, উনিশ শ' উনচল্লিশে, কমিশন তার প্রথম অধিবেশনেই আণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। যুদ্ধ দপ্তর বহু পরিমাণ অর্থও এই কাজে ব্যয় করতে সম্মত হয় এবং তারপরেই ওকরিজে

(Oak Ridge) রাষ্ট্রপতি আণবিক অস্ত্র নির্মাণ কেন্দ্র স্থাপনের আদেশ দেন।

সন্দেহ নেই যে হিটলার জার্মাণীর মতো, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটিশ ও ফরাসী সরকারের যুদ্ধে যোগদানের চরম উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যলোলুপতা ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। সমস্ত দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিই তাই এই আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রকাশ করে।

জনসাধারণের ইচ্ছা, অভিব্যক্তি ও বুর্জোয়া শাসক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের মধ্যে যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে তার প্রকাশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স সব দেশেই দেখা যায়। আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যে তাই দেখা যায় প্রগতিশীল মানুষেরা যখন প্রাকৃতিক ও মানবিক সমস্ত শক্তি সংহত করতে চাইছেন, তখন তাঁদের শাসক শ্রেণী হিটলার জার্মাণীর সঙ্গে সোভিয়েত বিরোধী ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে সচেষ্ট। সাধারণ মানুষ যেখানে সংহত শক্তির প্রকাশ দেখতে চায়, দেখতে চায় সক্রিয় প্রতিরোধকে, সেখানে শাসকশ্রেণীর আসে দীর্ঘসূত্রী মনোভাব। আর এখানেই শেষ নয়, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলে, তাকে চরম আঘাত হানার সংগ্রামে যখন কমিউনিষ্টরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করছে, তখনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক শ্রেণী কমিউনিষ্ট নিপীড়ন, নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছেন। নকল যুদ্ধের গতি প্রকৃতির প্রকৃত বিচারে এই অন্তর্দ্বন্দ্বই ছিল তার আসল স্বরূপ।

॥ তিন ॥

জার্মাণীর পোল্যাণ্ড অভিযান ও পূর্ব সীমান্তের দিকে দ্রুত ধাবমান নাৎসী সৈন্যবাহিনীর তৎপরতা দেখে বোঝা গিয়েছিল যে পরবর্তী কোন সোভিয়েত বিরোধী আক্রমণের সূচনা করার জন্যে হিটলার জার্মাণী সোভিয়েত সীমান্তে সুবিধা মতো জায়গা দখলে বিশেষ আগ্রহী। পোল্যাণ্ডে সাফল্যের উন্মাদনা ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের প্ররোচনায়, হিটলার যে সোভিয়েত বিরোধী অভিযান সুরু না করে স্থগিত রাখবেন, তার কোন নিশ্চয়তাই ছিল না। তাই পোল্যাণ্ডের ঘটনাবলী সোভিয়েতের পক্ষে চরম বিপদের সংকেত হয়ে দাঁড়ালো। তখন দ্রুত সক্রিয়তায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।

সেপ্টেম্বর উনিশ শ' উনচল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন যথাযোগ্য প্রতিরোধ

ব্যবস্থা গড়ে তুললো। কয়েকটি সামরিক অঞ্চলে সংরক্ষিত সেনাদলকে সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিতে বলা হলো এবং সৈন্যবাহিনীকে ও প্রয়োজন মতো নানা অঞ্চলে নোতুন করে ছড়িয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু বিপদের তুলনায় শুধু এটাই যে যথেষ্ট ছিল না, তা নিতান্ত স্পষ্ট। জার্মাণীর পূর্বমুখী অভিযানের গতিরোধ করতে হবে। নাৎসীদের সোভিয়েত সীমান্তে কোনমতেই পৌঁছতে দেওয়া যাবেনা। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে পোল শাসকদের বিশ্বাসঘাতক নীতি পোল্যাণ্ডের যে সমস্ত নিপীড়িত পশ্চিম ইউক্রেনীয় ও বাইলোরুশীয় সংখ্যালঘুদের ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়েছে তাদেরও রক্ষা করা যায় কিভাবে। সোভিয়েতের মানুষ তাদের এইসব হতভাগ্য ভাইদের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকতে পারে না।

সেইজন্যেই, মুক্তি সাধনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে সোভিয়েত সেনাদল পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বাইলোরুশিয়া অভিমুখে যাত্রা সুরু করলো, আর লাভ করলো সেইসব অঞ্চলের নিপীড়িত মানুষের সাদর অভিনন্দন।

হিটলারের পূর্বমুখী অভিযানের পথ বন্ধ হয়ে গেল। তিনি থেমে পড়লেন।

উনিশশ' ঊনচল্লিশের সমগ্র অক্টোবর মাস ধরে, এইসব সগু মুক্তদেশে জনগণের প্রতিনিধিসভায় গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। জনগণের ইচ্ছার স্বতঃপ্রকাশে, প্রতিনিধিসভাগুলি করলো নিজ নিজ এলকায় সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে অনুরোধ এলো তাদের পক্ষ থেকে যেন পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বাইলোরুশিয়াকে সোভিয়েত জাতি-গোষ্ঠীর শরিক করে নেওয়া হয়। সর্বোচ্চ সোভিয়েত তাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করলেন। যথা নিয়মে পশ্চিম ইউক্রেন আর পশ্চিম বাইলোরুশিয়া ইউক্রেনীয় ও বাইলোরুশিয়া সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

পোল্যাণ্ডে জার্মাণ অভিযান, সোভিয়েত দেশকে বাল্টিক সাগরের উপকূল অঞ্চল থেকেও সম্ভাব্য আক্রমণের আওতায় এনে ফেলে। বাল্টিক সাধারণতন্ত্রী দেশগুলির বুর্জোয়া শাসনব্যবস্থার হিটলারকে প্রতিরোধ করার কোন শক্তিই ছিল না। বরং অন্যদিকে দেখা গেল পোল্যাণ্ডে হিটলারের সাফল্যে এই সব দেশে হিটলারের সমর্থকরা রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তাই এই বিপদের আশংকাই তখন প্রবল হয়ে উঠলো যে তারা স্বেচ্ছায় হিটলারের

তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে, সোভিয়েত দেশ আক্রমণের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে কাজ করতে পারে। সেই জন্যেই সোভিয়েত সরকার বাল্টিক সাধারণতন্ত্রী দেশগুলির কাছে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির প্রস্তাব করে পাঠালেন।

তাদের জনগণের সমর্থন, অনুমোদন লাভ করায় সোভিয়েত প্রস্তাবে সেই সব দেশের শাসকশ্রেণীও সমর্থন জানালেন। চুক্তি স্বাক্ষরে অগ্রণী হলো এস্তোনিয়া, আটাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' উনচল্লিশ। তারপর অক্টোবরের পাঁচ তারিখে লাত্‌ভিয়া ও দশই অক্টোবর লিথুয়ানিয়ার সঙ্গেও চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এইসব চুক্তির সর্তানুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাল্টিক সাধারণ-তন্ত্রী দেশগুলি সম্মত হলেন যে অন্য কোন ইউরোপীয় শক্তিদ্বারা আক্রান্ত হলে বা আক্রমণের সম্ভবনা দেখা দিলে তাঁরা একে অন্যের সাহায্যার্থে অগ্রণী হবেন এবং সেই সাহায্যে সামরিক বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত। এস্তোনিয়া ও লাতভিয়া সোভিয়েত নৌ, বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীকে নিজেদের দেশে সামরিক ঘাঁটি ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হলো আর লিথুয়ানিয়া একটি স্থানই ছেড়ে দিল সোভিয়েত স্থল-বাহিনী ও বিমান-বহরের ঘাঁটি নির্মাণের জন্যে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বাল্টিক সাধারণতন্ত্রগুলির নিরাপত্তা বিধানে এইসব চুক্তিগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ-ঘাঁটি হিসেবে রূপান্তরিত হওয়ার আশংকা থেকে এইসব দেশগুলি মুক্ত হলো। সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সরে আসলো অনেকখানি পরিমাণে পশ্চিমদিকে। এবং বরফ মুক্ত বাল্টিক সাগরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সোভিয়েত নৌবহর পেল ঘাঁটি গড়ে তোলার সুবিধা।

এবারে এলো সোভিয়েত-ফিন সীমান্তে নিরাপত্তা বিধানের সমস্যা। ফিনল্যাণ্ডে জার্মাণ ফ্যাশিবাদী ও ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রজ্যবাদীরা প্রাণপণে সোভিয়েত বিরোধী সমরায়োজন গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিল। লেলিনগ্রাদ ও মুরমানস্ক রেলপথের উপর আক্রমণের ভিত্তিভূমি হিসেবে ফিনল্যাণ্ডকে তারা গড়ে তুলেছিল। ফিনরা দীর্ঘকালীন অভিযানের উপযোগী একটা রীতিমতো শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা গঠন করে, তার নামকরণ করেছিল ম্যানারহাইম লাইন। ফিনল্যাণ্ডের দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তে সামরিক গুরুত্বসম্পন্ন রেলও মোটর পথ নির্মিত হয় যা সোভিয়েত সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। স্বভাবতই এই

পরিপ্রেক্ষিতে, ফিন সীমান্ত থেকে মাত্র বত্রিশ কিলোমিটার দূরে লেলিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে উঠলো।

ফিনল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তখন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে একটা দীর্ঘ-মেয়াদী আক্রমণের প্রস্তুতিতে রত। লেলিনগ্রাদ থেকে উরাল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করাই তাদের উদ্দেশ্য। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় সেই বছরে ফিন সরকারের বাজেট নীতিতে যাব মূল ঝোঁকটাই ছিল স্পষ্টতঃ সামরিক।

বারোই অক্টোবর উনিশ শ' উনচল্লিশে সোভিয়েত সরকার ফিন সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা সুরু করেন। আলাপ আলোচনা এগোতে থাকে মার্কিন সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রভাধীনে, যার নজীর আব কোথাও নেই। ফিন প্রতিনিধিদলকে প্রদত্ত উপদেশ নির্দেশের মধ্যে হেলসিঙ্কিতে হয়েছিল যার সূত্রপাত, তা অব্যাহত রইলো আলোচনার সমস্ত স্তরে। মস্কোয় যখন এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে লাগলো তখন ফিন প্রতিনিধিদল মার্কিন রাষ্ট্রদূতবাসকে তার প্রতিটি স্তরে এ সম্পর্ক যথারীতি সমস্ত খবরাখবর দিয়ে তাদের কাছে থেকে "পরামর্শ" নিতে লাগলেন। যেদিন এই আলাপ আলোচনা সুরু হলো সেইদিন মার্কিন রাষ্ট্রপতির একটি তারবার্তা এসে পৌঁছলো সোভিয়েত ও ফিন সরকারের কাছে। রাষ্ট্রপতি সেই তারবার্তায় আশাপ্রকাশ করলেন যে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে না যাতে ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি এম, আই, কালিনিন রুজভেল্টের তারবার্তার জবাবে জানালেন যে, যে সোভিয়েত সরকার উনিশ শ' সতেরো সালেই ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে তার, নিরাপত্তা বিধানের জন্যে সোভিয়েত ফিন সহযোগিতার সম্পর্ক সুদৃঢ় করা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। হিটলার জার্মাণীর প্রতিক্রিয়াও হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও ফরাসী সরকারের মনোভাবের অনুরূপ। হেলসিঙ্কিতে জার্মাণ মন্ত্রী ফিন সরকারের কাছে দাবী জানালেন যে তাঁরা যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যে কোন চুক্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।'[১]

সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যাণ্ডের কাছে প্রথমে উত্থাপন করেন পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তির প্রস্তাব। কিন্তু ফিন শাসকশ্রেণী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় পুনরায় প্রস্তাব করা হলো যে ফিন সরকার যদি তাঁদের সীমান্ত

করেলিয়ান যোজকের উত্তরে সরিয়ে নিয়ে যান, তাহলে সোভিয়েত সরকার ক্ষতিপূরণ বাবদ সোভিয়েত কারেলিয়া থেকে পরিত্যক্ত অঞ্চলের দ্বিগুণ ভূখণ্ড ফিনল্যাণ্ডকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছেন। সোভিয়েত প্রস্তাবে আরোও বলা হলো যে দিন ফিন উপসাগরের প্রবেশ মুখে সামান্য ফিন ভূখণ্ড সোভিয়েত সরকার সাময়িকভাবে নৌ-ঘাঁটি নির্মাণের জন্যে ইজারা দিতে ফিন সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন। ফিনল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে এই প্রস্তাবগুলি কোন মতেই ক্ষুন্ন করেনি। কিন্তু প্রত্যুত্তরে প্রতিক্রিয়াশীল ফিন সরকার সমস্ত আলাপ আলোচনা ভেঙ্গে দিলেন।

ম্যানারহাইম, ট্যানার ও রাইটির নেতৃত্বে ফিন প্রতিক্রিয়ার শক্তি বরং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নানাধরণের প্ররোচনামূলক নীতি গ্রহণ করতে লাগলো। সোভিয়েত সীমান্তে বেশ বড়ো ফিন সৈন্যবাহিনী সমাবেশ করা হলো। লেলিনগ্রাদের কাছে সোভিয়েত সেনাদলের উপর বোমাবর্ষণও করা হলো। বাইরে থেকে সাহায্য লাভের সুদৃঢ় প্রত্যাশার জন্যেই তারা এই আক্রমনাত্মক কাজে বিরত হলো না। ম্যানারহাইম তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ঠিক এই ধরণের প্রত্যাশার কথাই অনেক অভিজ্ঞ রাজনীতিক ও সাংবাদিকের মুখে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য এমানুয়েল সেলার বলেন: "ফিনল্যাণ্ডকে আমরাই নেতৃত্ব দিয়ে অগ্রণী করে দিয়েছিলাম।"[২০] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের মতো বৃহৎ শক্তি-বর্গের সমর্থন ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না থাকলে, চল্লিশ লক্ষের ও কম জনসমষ্টি নিয়ে ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে সোভিয়েতের আঠারো কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে কোন প্ররোচনামূলক কাজে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না।

সোভিয়েত ফিন যুদ্ধ সোভিয়েতের দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ কঠিন কাজই ছিল। রণাঙ্গনের প্রকৃতি কোন বড়ো রকমের সামরিক তৎপরতার উপযোগী ছিলনা। বহু সংখ্যক হ্রদ ও গভীর অরণ্যানী নানাদিক থেকে অভিযান চালানোর পথে সৃষ্টি করেছিল অন্তরায়।

তার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডকে প্রদত্ত বিদেশী সাহায্যও অবস্থাকে আরো জটিল করে তোলে। আর সে সাহায্য শুধু অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ উপকরণেই সীমিত ছিল না।

সোভিয়েত ফিন যুদ্ধ সংঘটিতে করেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীরা তাকে একটা ব্যাপক সাধারণ সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হয়। মার্কিণ ইতিহাসবিদরা লিখেছেন যে এই যুদ্ধের সম্ভবনাকে "একটা ঈশ্বরদত্ত সুযোগ বলা যেতে পারে।"[২১] সাম্রাজ্যবাদীরা মনস্থ করলেন এবার লীগ অব. নেশনস্‌কে কাজে লাগাতে হবে।

নয়ই ডিসেম্বর তারিখে, লীগের বড়ো পাণ্ডা ইঙ্গ ফরাসী প্রতিনিধিরা, পরিষদের একটা জরুরী অধিবেশন আহ্বান করলেন। এগারোই তারিখে সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করা স্বিকৃত হয়ে রইলো।

কিন্তু যুদ্ধ সুরু হয়ে যাওয়ার জন্যে এতো অল্পসময়ের মধ্যে এই সভার অধিবেশন আহ্বান করা সম্ভব ছিল না। লীগ সদস্যের মাত্র একটি অংশই এতে উপস্থিত থাকতে পারেন। পরিষদের সদস্যদের তুলনায় সাধারণ সভার চেহারাটা একটু ভিন্ন ধরনের। এখানে ইঙ্গ ফরাসী সমর্থনে নির্বাচিত তিনটি সদস্যরাষ্ট্র, তাদের নির্দেশক্রমেই ভোটদানে প্রস্তুত ছিলেন। এর স্বাভাবিক পরিণতি হলো এই যে, সোভিয়েত সরকার লীগের সাধারণ সভা ও পরিষদ থেকে প্রতিনিধি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হলেন।

চৌদ্দই ডিসেম্বর তারিখে পরিষদ, সোভিয়েত ইউনিয়নকে "আক্রমণকারী" ঘোষণা করে, লীগ অব্‌ নেশনসের সদস্যপদ থেকে "বহিষ্কৃত" করলেন। পরিষদের পনেরজন সদস্যের মধ্যে মাত্র সাতজন যাদের মধ্যে ইঙ্গ-ফরাসী চক্রান্তে নির্বাচিত তিনজন সদস্যও ছিলেন "বহিষ্কারের" পক্ষে ভোট দিলেন।

সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান তাস মন্তব্য করলেন "সম্মিলিতভাবে আট কোটি নব্বই লক্ষ মানুষদের দেশ বৃটেন ও ফ্রান্স, তিন কোটি আশী লক্ষ মানুষদের দেশ বেলজিয়াম, বলিভিয়া, ইজিপ্ট, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ও ডোমিনিক্যান সাধারণতন্ত্রের সহায়তায়, আঠারো কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে "বহিষ্কৃত" করলো।"[২২]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লীগ অব্‌ নেশন্‌সের আনুষ্ঠানিক অর্থে সদস্য না থাকলেও মার্কিণ কূটনীতিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে "বহিষ্কার" প্রচেষ্টায় অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এবং প্রধানতঃ আমেরিকার উদ্যোগেই বলিভিয়া ও ডোমিনিক্যান সাধারণতন্ত্র প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করেন।

লীগ অব্ নেশন্স্ এইভাবেই জাপানী, ইতালী ও জার্মাণ আক্রমণকারীদের পরোক্ষ সমর্থন, সাহায্য ও প্ররোচনায় ফিন শাসকশ্রেণীর সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধকে সরাসরি অনুমোদন ও সমর্থনের মাধ্যমে নিজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করলো। একে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষরদান করা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি মন্তব্য করলো লীগ অব্ নেশন্সের মৃত্যু ঘটেছে। জেনেভায় প্রশস্ত, বিরাট প্রাসাদে আজ তার প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লীগ অব্ নেশন্স থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বহিষ্কারের কূটচালের অন্তরালে প্রতিক্রিয়ার শক্তি ফিনল্যাণ্ডকে প্রদত্ত সাহায্যের পরিমানকে দ্বিগুণ করে দিল, যাতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে একটা সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত করা যায়। প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলি আশা প্রকাশ করলো যে এবারে হিটলার জার্মাণী তার সামরিক শক্তিকে সংহত করবে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত ঘটনাবলী এমনভাবে ঘটবে যাতে এই লক্ষ্যের অভিমুখে একটা সম্মিলিত মোর্চা গড়ে ওঠে। মার্কিন সমর বিষয়ক পর্যবেক্ষক ও মন্তব্যকারী হ্যানসন বল্ডউইন মন্তব্য করলেন যে হিটলারের কাজের মধ্যে হয়তো দেখা যাবে এমন কিছু যা বিস্ময়কর। কারণ হিটলার সোভিয়েত দেশ আক্রমণের এই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইতে পারেন।

এরপর ফিনল্যাণ্ড অভিমুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বৃটেন ও ফরাসী অস্ত্রশস্ত্র অজস্রধারায় চললো অব্যাহত গতিতে। হার্বাট হুভারের নেতৃত্বে একটা ফিনল্যাণ্ড কমিটি গঠিত হলো। মার্কিন সরকার ফিনল্যাণ্ডকে এক কোটি ডলার ঋণদান করলেন, যার বিনিময়ে নামমাত্র মূল্যে ফিনিল্যাণ্ডকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হলো। আমেরিকার ব্যাঙ্কগুলির তরফথেকেও ফিনল্যাণ্ডকে ঋণ দেওয়া হলো।[২৩] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশে স্বেচ্ছাসেবকরা ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সেনাদলে নাম লেখাতে আরম্ভ করলো। বৃটিশ শ্রমিক দলের একটি নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেনের আশীর্বাদ নিয়ে ফিনল্যাণ্ড সফরে এসে, ফিনদের "জয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার" উপদেশ এবং সেই প্রচেষ্টায় অধিকতর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন।

লীগ অব্ নেশন্সের প্রস্তাবকে কাজে লাগিয়ে সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে

সরাসরি অভিযান সুরু করার প্রস্তুতিতে বৃটেন ও ফ্রান্স ও তৎপর হয়ে উঠলেন। তাই উনিশ শ' চল্লিশের পনোরই মার্চ তারিখে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে একযোগে দ্বিমুখী আক্রমণ সুরু করার পরিকল্পনা রচিত হলো। তার একটি ক্ষেত্র হবে ফিনল্যাণ্ড, অপরটি মধ্যপ্রাচ্যের বাকু অঞ্চল। সিরিয়া ও ইরাকে এই অভিযানের জন্যে ইংরাজ ও ফরাসী সৈন্য সমাবেশ করা হলো। ফরাসী সরকারের নির্দেশক্রমে জেনারেল গ্যামেল্যাঁ তুরস্ক, ইরাক, রুমানিয়া, গ্রীস, যুগোশ্লোভিয়া নিয়ে একটা বিরাট বিস্তৃত আক্রমণের কর্মসূচী প্রস্তুত করলেন। এই প্রস্তুতি-পর্বের প্রত্যক্ষ অধিনায়ক জেনারেল ওয়েগাঁ লিখেলেন : "আমার কর্তব্য আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি, তাহলো সোভিয়েতের ঘাড় ধরে ভেঙ্গে দেওয়া, তা সে ফিনল্যাণ্ড বা অন্য যে কোন জায়গাতেই হোক না কেন।"[২৪]

মধ্য প্রাচ্য থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রস্তুতিপর্ব উনিশ শ' উনিচল্লিশের গ্রীষ্মকালেই সুরু হয়ে যায়। অন্যদিকে তখন বৃটেন ও ফ্রান্স সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওয়েগাঁ তাঁর সমর কার্যালয়ের প্রধান দপ্তর বেইরুটে এসে পৌঁছলেন পয়লা আগষ্ট, উনিশ শ' উনচল্লিশে।

বৃটিশ ও ফরাসী সরকার উত্তর দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্যে আরেকটি বিশেষ অভিযাত্রী সেনাদল গঠন করলেন। সুইডেন ও নরওয়ের মধ্য দিয়ে তাদের অভিযান সুরু হবে। মার্চমাসে বৃটিশ সরকার সুইডেন ও নরওয়ের কাছে তাদের রাজ্যের অভ্যন্তর দিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীর অভিযান চালু করার অনুমতি চেয়ে অনুরোধ করলেন।

জানুয়ারী মাসের গোড়াতেই সোভিয়েত সরকার সুইডিশ ও নরওয়ে সরকারের কাছে এক বিবৃতিতে জানান যে, তাঁদের আচরণ তাঁদের ঘোষিত নিরপেক্ষনীতির পরিপন্থী এবং এইভাবে যদি তা চলতে থাকে তাহলে সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্কে "অবস্থা অনাকাঙ্খিত জটিলতা সৃষ্টি করে, স্বাভাবিক সম্পর্ককে ব্যাহত করবে।"[২৫] পররাষ্ট্র দপ্তর সুইডেন ও নরওয়ের সঙ্গে যে সমস্ত চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা হয়েছে তা প্রকাশ করে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে "সুইডিশ ও নরওয়ে সরকারের মনোভাব অত্যন্ত মারাত্মক। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত শক্তিবর্গ তাঁদের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে যোগদান করার জন্যে চাপ দিচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা যথাযথ দৃঢ়তা অবলম্বন

করছেন না।"[২৬] সোভিয়েতের এই সতর্কবাণী সুইডিশ ও নরওয়ের সরকারদের, ইঙ্গ-ফরাসী সেনাবাহিনীর অভিযান সুরু করার পথ দাবী করে যে অনুরোধ বার্তা প্রেরণ করা হয় তার জবাব পাঠাতে বিলম্ব করতে প্রণোদিত করে।

কয়েকটি বিশেষজ্ঞ মহলের সঙ্গে যুক্ত বৃটিশ ও ফরাসী সংবাদপত্র সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রায় অনুরূপ সংবাদ প্রকাশিত করে। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে লে তেম্পস'র (Le Temps) কথা। পত্রিকাটি বলে: "প্রথমেই একটা ইঙ্গ-ফরাসী নৌবহরের উচিত হবে উত্তর মেরু সাগরের দিকে যাত্রা করে মুরমানস্ক অবরোধ করা।......তারপর ইঙ্গ-ফরাসী স্থলবাহিনী পেটসামোতে অবতরণ করে ফিন সেনাদলের সঙ্গে যোগ দেবে।......ফিনল্যাণ্ডে হস্তক্ষেপের সঙ্গে বিরাট সোভিয়েত সাম্রাজ্যের অপর কোন একস্থানে শক্তিশালী আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে হবে। এই ধরণের অভিযানের সবচেয়ে উপযোগী লক্ষ্য হবে কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল। কারণ মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের সহজ পাল্লার মধ্যে হওয়ায় তা অনধিগম্য নয়।"[২৭]

আমেরিকার শাসকশ্রেণী তখন উত্তরোত্তর ইউরোপের দেশগুলির বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে চলেছে। ফলতঃ প্রথম ঋণের পর আরো কয়েকটি ঋণদান করা হলো ফিনল্যাণ্ডকে। পররাষ্ট্র-দপ্তরের সহকারী সচিব সামনার ওয়েলসকে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে পাঠানো হলো রোম, বার্লিন, প্যারী ও লণ্ডনে। দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি-জোটের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ওয়েলস মার্কিণ সরকারের নির্দ্দেশ মতো একটা সাধারণভাবে ব্যাপক সোভিয়েত বিরোধী মোর্চায় তাদের যোগদানের বিষয়ে বোঝাপড়া করতে চেষ্টা করলেন।[২৮] মার্কিণ সরকার তখন একটা নোতুন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিজোটের নেতৃত্ব করতে প্রস্তুত। কিন্তু পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব তার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব শুধু দুই বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিজোটের মধ্যেই ছিল না, ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থের মধ্যেও তা প্রকট হয়ে উঠছিল। মিউনিক চুক্তিকালীন মনোভাব অনুযায়ী বৃটেন সাম্রজ্যবাদীদের মধ্যে এমন কোন বোঝাপড়ায় পক্ষপাতী ছিল না যেখানে মুখ্য ভূমিকা থাকবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেন ও ফরাসী সরকার সকলেই সোভিয়েতের সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের শান্তি স্থাপনের বিরোধী ছিলেন। আটাশে ডিসেম্বর ফিন সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে একটা যুদ্ধবিরতি চুক্তি করার জন্ম মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ

করেন। আমেরিকার জবাব ফিনদের প্রত্যাশা এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে কোন মীমাংসায় পৌঁছাবার মনোভাবকে ধূলিসাৎ করে দিল।[২৯]

ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' চল্লিশে সোভিয়েতের শক্তি ম্যানারহাইম লাইনকে ভেঙে ফেলতে সক্ষম হলো। মার্চের গোড়াতেই সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ভিইপুরীকে পাশ কাটিয়ে বরফ ঢাকা ফিন উপসাগর অতিক্রম করে শহরটিকে অবরোধ করে এবং ভিইপুরী ও হেলিসিঙ্কির মাঝামাঝি জায়গায় উপনীত হয়। তারপর সেখান থেকে সোজা উপস্থিত হয় ফিন রাজধানীতে। ফিন সরকার তখন সুইডেনের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠাতে বাধ্য হলেন। ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সরকার তখনও দাবী করেছেন যে ফিনল্যাণ্ড সংগ্রাম চালিয়ে যাক্। লর্ড অব অ্যাডমিরাল্টি হিসাবে চার্চিল প্যারীতে এসে বৃটিশ সরকারের নির্দেশক্রমের দালাদিয়েরে সঙ্গের একযোগে ফিন সরকারের প্রতিনিধিকে জানান যে এখন যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা সম্পূর্ণ অর্থহীন কারণ পশ্চিমী শক্তিবর্গের অভিযান সুরু হতে আর বেশী দেরী নেই। এবারে আর নরওয়ে, সুইডেনের কাছে অনুমতির জন্যে অনুরোধ করা হবে না। সৈন্যবাহিনীকে যাতায়াতের সুযোগ দিতে আদেশ করা হবে।[৩০] দালাদিয়ের হেলসিঙ্কিকে জানিয়ে দিলেন যে ফিন সরকার যেন সোভিয়েতের শান্তির প্রস্তাব গ্রহণ করতে অসম্মত হয়। "আমি আবার আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি" তিনি লিখে পাঠান, "আমরা সাহায্য পাঠাতে এখনই প্রস্তুত। বিমানগুলি আকাশে ওড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। সৈন্যবাহিনী অভিযান শুরু করার জন্যে তৈরী হয়ে আছে।"[৩১] মার্কিণ সরকার ঘোষণা করলেন যে, "মধ্যস্থতা করা বা সরাসরি জড়িয়ে পড়া ছাড়া, তারা আর যে কোন সাহায্য করতে প্রস্তুত।"[৩২]

ফিন যুদ্ধপরিষদ সাতই মার্চ তারিখে সমস্ত বিবৃতিগুলি পর্যালোচনা করে, সোভিয়েতের শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত করলেন। বারোই মার্চ, উনিশ শ' চল্লিশে সোভিয়েত ফিন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের নীতি নিয়ামকরা এতে যে নিতান্ত অখুশি হলেন তা বলা বাহুল্য। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন সংবাদপত্রে লেখা হলো:

"সোভিয়েত ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদে, সরকারী মহল মর্মাহত হয়েছেন।"[৩৩]

সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে গেল। স্বাক্ষরকারীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে

অস্ত্রপ্রয়োগ না করতে স্বীকৃত হলেন এবং কোন পরস্পরবিরোধী শক্তি-জোট বা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে অসম্মতি জানালেন। উনিশ শ' কুড়ি সালের শান্তি চুক্তির অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিনল্যাণ্ড ঘোষণা করলো যে উত্তর মেরু সাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে কোথাও কোন ডুবোজাহাজ বা বিমান বহর রাখা হবে না, সেখানে যা থাকবে তাহলো নির্দিষ্ট টনের যুদ্ধ জাহাজ মাত্র। সোভিয়েত ফিন সীমান্ত লেলিনগ্রাদ থেকে একশ' পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো, ফলে ভিইপুরী সমেত কারেলিয়ান যোজক, ভিইপুরী উপসাগর ও অন্তর্বর্তী সমস্ত দ্বীপগুলি সোভিয়েতের এলাকার অন্তর্গত হয়ে গেল। লাদোগা হ্রদের উত্তর ও পশ্চিম তীরভূমি সোভিয়েত দেশের অঙ্গীভূত হলো। মুরমানস্ক শহর ও রেলপথের নিরাপত্তা, মেরকৃজারাভি্র পূর্বাঞ্চল, কুওলাজারভি্ শহর ও রাইবাশি এবং স্রেদনী উপদ্বীপের প্রাক্তন ফিন অঞ্চল সোভিয়েত ভূমির অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় রক্ষিত হলো। সর্বশেষে ফিনল্যাণ্ড, ফিন উপসাগরের প্রবেশমুখে হাঙ্কো উপদ্বীপ ও সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জগুলি সোভিয়েত সরকারকে নৌবহরের ঘাঁটি স্থাপনের জন্য তিরিশ বছরের ইজারা দানে সম্মত হলো।

শেষ হলো সোভিয়েত-ফিন যুদ্ধ। দিনের পর দিন পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। কিন্তু তাতেও তাদের নীতি পরিবর্তনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

চার্চিল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে দশই জানুয়ারী, উনিশ শ' চল্লিশ, একটা জার্মাণ জঙ্গীবিমান বেলজিয়ামে অবতরণ করতে বাধ্য হয়। বিমানে জার্মাণ বাহিনীর জনৈক মেজর ছিলেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো ও তাঁর সমস্ত কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হলো। তা পরীক্ষা করে দেখা গেল বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আক্রমণ করার পূর্ণাঙ্গ ও প্রকৃত কর্মসূচী রয়েছে।[৩৪] কিন্তু এই ঘটনা, যুদ্ধের ইতিহাসে যা একটা দুর্লভ সৌভাগ্যের পরিচায়ক, তাতেও পশ্চিমী শাসকশ্রেণীর কোন নীতিগত পরিবর্তন সূচনা করলে না।

জার্মাণীর প্রতিপক্ষরা, জার্মাণ মিত্র ইটালীর কাছ থেকেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ লাভ করলেন, যে তখন একটা দ্বিমুখীনীতি অনুসরণ করে চলছিল। দোসরা জানুয়ারী, উনিশ শ' চল্লিশে ইটালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাউন্ট সিয়ানো, রোমস্থিত বেলজিয়াম রাষ্ট্রদূত ক্যারশোভ স্তু স্তত্তেরগেমকে গোপনে সংবাদ প্রেরণ করলেন যে, বেলজিয়াম আক্রমনের জন্যে জার্মাণী প্রস্তুত হচ্ছে।[৩৫]

কিন্তু বৃটিশ ও ফরাসী নেতাদের তাতেও কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। বরং প্রতিক্রিয়াশীল ইঙ্গ-মার্কিন ও ফরাসী সংবাদপত্রগুলি ক্রমাগত এই আশা প্রকাশ করতে লাগলো যে, "এবারে হিটলার হয়তো তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পূর্বমুখী অভিযানে পরিচালিত করতে পারেন।"[৩৬] বৃটিশ ও ফরাসী সরকার তাঁদের সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধপ্রস্তুতি বাতিল করে দিলেন না। মার্কিন সূত্রের খবরে দেখা যায় যে মিত্রপক্ষ "তাঁদের সাফল্যের সম্ভাবনাপূর্ণ পরিকল্পনাগুলি স্থগিত রাখতে উৎসাহী ছিলেন না। তাঁরা কেবল নোতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে তাদের রদবদল করে নিলেন মাত্র।"[৩৭]

চার্লস দ্য গল তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন :

"কোন কোন মহল শুধু এই কথাই ভাবছিলেন কেমন করে রাশিয়াকে আক্রমণ করা যায়......বাকুতে বোমাবর্ষণ বা ইস্তাম্বুলে অবতরণ করা যায়, রাইখের বিরুদ্ধে কোন কিছু করার দিকে তাদের কোন নজর ছিল না।"[৩৮]

বৃটিশ সমর নেতারা উনিশ শ' একচল্লিশের জুনমাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বাকুতে বিমান আক্রমণের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে চাননি।

আমেরিকার নীতিও এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়নি। উনিশ শ চল্লিশের বসন্তকালে পররাষ্ট্র দপ্তরের বিশেষ প্রতিনিধি, ইলফোর্থস্ বার্লিনে এলেন, আগের বছরে ওয়েলস যে কাজ সুরু করেছিলেন তারই অনুসরণ করতে। বার্লিনে তিনি ঘোষণা করলেন যে, তিনি এখানে এসেছেন, "জার্মাণ রাষ্ট্র-নায়কদের সঙ্গে শান্তির পথ আলোচনা করতে।"[৩৯]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বৃটিশ ও ফরাসী সরকার এবং সরকারী বুর্জোয়া ইতিহাস-বিদ্‌রা আজো পর্যন্ত সেদিনের ঘটনাবলীর যথার্থ ও বাস্তবসম্মত মূল্যায়ন করতে অস্বীকৃত হন। একথা প্রশ্নাতীত যে সোভিয়েতের আচরণ সেদিন তার মানুষদের মৌল স্বার্থের সঙ্গে একান্তভাবে সঙ্গতিসম্পন্ন ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানীর পূর্বমুখী অভিযানের পথরুদ্ধ করে, তাকে সৈন্য অপসরণ করতে বাধ্য করেন। সেদিন যদি তার নীতি ও কার্যক্রমের যথার্থ স্বীকৃতি মার্কিন, বৃটিশও ফরাসী সরকারের নীতির প্রতিফলিত হতো, যদি তা তাদের সমর্থন লাভ করতো, তাহলে কি পূর্ব, কি পশ্চিমে নাৎসী আক্রমণ. ইউরোপে যুদ্ধ সুরু হওয়ার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে পরাস্ত হয়ে যেতো।

কিন্তু পশ্চিমী রাজনীতিকদের বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত বিরোধী ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনার সঙ্গে এই কর্মসূচী সেদিন কোনমতেই সঙ্গতিপূর্ণ গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি।

১। আর. ডবলিউ. কুপার : The Nuremberg Trial. নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৭, পৃঃ ৫৯

২। একটি পোলিশ গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৩।

৩। International Military Tribunal. তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩২-৩৩।

৪। একটি জার্মান গ্রন্থ, ১৯৫১, পৃঃ ৫১।

৫। I. M. T. তৃতীয় খণ্ড. পৃঃ ২৫৭।

৬। জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ডার্মষ্টাডে প্রকাশিত মিটলারের গ্রন্থের ভিত্তিতে প্রদত্ত, ১৯৫৬।

৭। লিও নোয়েল রচিত ফরাসী গ্রন্থ, ১৯৪৬, পৃঃ ১৬৭।

৮। উইলিয়াম জেড ফষ্টার : The Twilight of World Capitalism. নিউ ইয়র্ক ১৯৪৯, পৃঃ ৩৮।

৯। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা, অক্টোবর ২৯, ১৯৩৯।

১০। ঐ, ডিসেম্বর ২, ১৯৩৯।

১১। ঐ, অক্টোবর ৯, ১৯৩৯।

১২। এই সমস্ত ইশতেহারের সংখ্যাগুলি সোভিয়েত মহাফেজখানার সংরক্ষিত হয়েছে।

১৩। ফ্লোরিম বঁতে : ফরাসী গ্রন্থ মস্কো, ১৯৫১. পৃঃ ১১২।

১৪। জে. এফ. সি. ফুলার : The Second World War, 1939-1945. লণ্ডন ১৯৪৮, পৃঃ ৫৫।

১৫। ফ্লোরিম বঁতে : ঐ পৃঃ ৩৬।

১৬। ঐ, পৃঃ ১২২।

১৭। ঐ, পৃঃ ৩৬-৩৭।

১৮। ঐ, পৃঃ ৩৯।

১৯। জার্মাণ পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত দলিল, D সিরিজ, লণ্ডন ১৯৫৩, পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৮২৯।

২০। Congressional Record, ৮৬ খণ্ড, ১৩ অধ্যায় পৃঃ ৫২২-২৩।

২১। ল্যাঙ্গর ও গ্লিসনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৭৭।

২২। ইজভেস্তিয়া, ডিসেম্বর ১৬, ১৯৩৯।

২৩। Documents on American Foreign Relations, July, 1940. সম্পাদনা : লেপার্ড জোন্স ও ডেনিস জেরায়স, বোষ্টন, ১৯৪০, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৯১-৯২, বিশ্বশান্তি সংস্থা প্রকাশিত।

২৪। জেনারেল দ্যগোল : স্মৃতিকথা, তৃতীয় খণ্ড, প্যারী ১৯৫৭, পৃঃ ১৯৯।

২৫। সোভিয়েত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৮৩।

২৬। ঐ, পৃঃ ৪৮৭।

২৭। Le Iemps, জানুয়ারী ১০, ১৯৪০।

২৮। জার্মাণ গ্রন্থ, জুরিখ, ১৯৪৬, পৃঃ ১৩৬।

২৯। ল্যাঙ্গর ও গ্লিসন, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৯৭।

৩০। E. Maseerg, অসলোয় প্রকাশিত গ্রন্থ, ১৯৫৩, পৃঃ ২১৪।

৩১। জন, এইচ্, উত্তরিনেন: Finland and World War II 1939-1944. নিউ ইয়র্ক পৃঃ ৭৮।

৩২। ল্যাঙ্গর ও গ্লিসনের পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৪০১।

৩৩। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন মার্চ, ১৩, ১৯৪০।

৩৪। চার্চিল: The Second World War প্রথম খণ্ড লণ্ডন, ১৯৪৯ পৃঃ ৫০১।

৩৫। ফরাসী ইতিহাস বিষয়ক পত্রিকা, অক্টোবর ১৯৫৫, ২০শ সংখ্যা পৃঃ ১০-১১।

৩৬। নিউ রিপাবলিক, মে ২০, ১৯৪০।

৩৭। ল্যাঙ্গর ও গ্লিসন পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০৪

৩৮। চার্লাস গুগল: স্মৃতিকথা, ১৯৪০-৪২, প্যারী ১৯৫৪ পৃঃ ২৬।

৩৯। জুরিখে প্রকাশিত জার্মাণগ্রন্থ, পৃঃ ২০৮।

চতুর্থ অধ্যায়

ফরাসী ট্রাজেডী

ইউরোপের যুদ্ধ তখন সাত মাস ধরে চলছে। এই অন্তর্বর্তীকালের মধ্যে বৃটেন ও ফ্রান্স সম্ভাব্য জার্মান-ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে যথেষ্ট প্রস্তুতি করতে পারতেন। কিন্তু সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে তাদের শাসকশ্রেণী এমনই আত্মমগ্ন ছিলেন যে অন্যদিকে নজর দেওয়ার তাঁদের ফুরসৎ হয় নি। তাদের যুদ্ধোৎপাদন শিল্পগুলির উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল না। অন্যদিকে অস্ত্রশস্ত্র ও সমরোপকরণ যা কিছু উৎপাদিত হলো, তার বেশির ভাগই পাঠিয়ে দেওয়া হলো ফিনল্যাণ্ডে।

জার্মাণী এই সুযোগের করলো চরম সদ্ব্যবহার। উনিশ শ' উনচল্লিশ-চল্লিশের সমস্ত শীতকাল ধরে জার্মাণী তার সংরক্ষিত বাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুললো, গঠন করলো তাদের নানা স্তর, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করলো তাদের—যাদের মধ্যে আছে প্যানসার ও বিমানবাহিনী। আর এদেরই পাশাপাশি চললো যে সব দেশে আক্রমণ সুরু করা হবে সেখানে পঞ্চম বাহিনী গঠনের কাজ, যারা রাতের পর রাত রচনা করে গেল হিটলারী আক্রমণের নানা ধরণের পরিকল্পনা।

আগষ্ট উনিশ শ' আটত্রিশ থেকে জার্মাণীর সমর-নায়কেরা গেল্বের পতন (হলুদ পরিকল্পনা operation yellow) নাম দিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযানের খসড়া রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। একে কার্যকরী করতে গেলে বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও আক্রমণ সুরু করতে হবে। নয়ই অক্টোবর উনিশ শ' উনচল্লিশ জার্মাণ সামরিক হাই কমাণ্ড আদেশ জারী করলেন এই প্রস্তুতির জন্যে যে এবার পশ্চিম রণাঙ্গনের উত্তরাংশে লাক্সেমবার্গ, বেলজিয়াম এবং নেদারল্যাণ্ডের কাছে সীমান্ত অতিক্রম করে আক্রমণ সুরু করতে হবে।"[১] নির্দেশনামায় আরো বলা হলো যে এই অভিযান "অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আরম্ভ করে দ্রুততার সঙ্গে শেষ করতে হবে।" তেইশে নভেম্বর

উনিশ শ' উনচল্লিশে হিটলার নাৎসী সর্বোচ্চ সমর-নায়কদের এক বৈঠকে বললেন যে, "বেলজিয়ান ও ডাচদের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করায় কিছুই যায় আসে না, কারণ আমরা জয়লাভ করার পর কেউ আমাদের সে কথা জিজ্ঞাসা করতে আসবে না।"[২]

হিটলারের নৌবহরের অধিনায়ক অ্যাডমিরাল রীডার প্রস্তাব করলেন যে, হলুদ পরিকল্পনার কাজ সুরু করার আগে ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করে নিলে সুবিধা হবে। তাঁর মতে জার্মাণ অভিযানকারী সৈন্যবাহিনীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত বলে, এই দুটি দেশ নৌযুদ্ধে একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে। আর তাছাড়া স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার লৌহখনিগুলির প্রয়োজনীয়তাও জার্মাণীর কাছে যথেষ্ট।

রীডারের প্রস্তাবে সাগ্রহ সম্মতি দেওয়া হলো। জন্ম হলো আরেকটি পরিকল্পনার—বেসেরুবাং বা বেসের খেলা। জার্মাণ স্থলবাহিনীর হাই কমাণ্ড ডেনমার্কের সীমান্ত অতিক্রম ও একই সঙ্গে নরওয়েতে সৈন্য অবতরণের আদেশ দিলেন। নির্দেশনামায় আরো বলা হলো যে এই অভিযান যথাসম্ভব দ্রুত সুসম্পন্ন করতে হবে এবং তার জন্যে যথাসম্ভব শক্তি সন্নিবেশিত করতে হবে। যদি নরওয়েতে শত্রুপক্ষ কোন রকমে প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে, তাহলে পাল্টা কার্যক্রম চালু করতে হবে অবিলম্বে। এবং সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো জার্মাণীর এই অভিযান নির্দেশনামার মতে, উত্তরের দেশগুলি ও পশ্চিমী শত্রুদের হকচকিয়ে দিয়ে একেবারে অতর্কিতে সুরু করতে হবে।[৩]

নয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' চল্লিশে বেসেরুবাং পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হলো। জার্মান সৈন্য ডেনমার্ক আক্রমণ করলো। ডেনমার্কের রাজা ও তাঁর সরকার স্থির করলেন বাধা দেওয়া নিরর্থক। সুতরাং কোন প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করে সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া হলো। তারই মধ্যে জার্মাণ পরিবহন ব্যবস্থা নরওয়ের সমস্ত বড়ো বড়ো শহরেই জার্মাণ-সৈন্য অবতরণ করিয়ে দিয়েছে। নরওয়ের মানুষ কিন্তু দারুণ প্রতিরোধ গড়ে তুললো। ওসলোর উপকূলরক্ষী গোলন্দাজবাহিনী দশ হাজার টন জার্মাণ ক্রুজার ব্লুশারকে ডুবিয়ে দিল। উপকূলের নানা জায়গায় চলতে লাগলো তীব্র সংগ্রাম। কিন্তু নরওয়েতে হিটলারের অনুচররা সাধারণ মানুষের যুদ্ধোদ্যমকে ব্যাহত, পঙ্গু করে দিতে লাগলো।

মেজর ভিদ্‌কুন কুইসলিং ছিলেন তখন নরওয়ের যুদ্ধমন্ত্রী। সেদেশে হিটলারের সবচেয়ে বিশ্বস্ত প্রধান অনুচর এজেন্ট। আজকে তাঁর নাম বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিশব্দ হয়ে গেছে। কুইসলিং মানেই বিশ্বাসঘাতক। সমগ্র নরওয়েতে জার্মাণ গুপ্তচরে ভরিয়ে দিতে সাহায্য করলেন তিনি হিটলারকে। ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে দলে দলে হাজির হলো জার্মাণ গুপ্তচর। জেনারেল ফলকেনহোর্স্ট (Falkenhorst) এলেন একজন পোষাক ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ওসলোতে। পরে নরওয়ের জার্মাণ সৈন্য অবতরণ করলে তিনি গ্রহণ করলেন তাদের পরিচালনার ভার।

বৃটিশ সরকার জার্মাণীর নরওয়ে বিজয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে সেই জন্যে বৃটিশ সৈন্যও অবতরণ করেছিল। কিন্তু জার্মাণ সৈন্যের হাতে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। অল্পদিনের মধ্যেই জার্মাণী সমগ্র নরওয়ে দখল করে নিল। যুদ্ধের গতিতে এটা একটা মস্তো বড় লাভ। জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর পশ্চাৎ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সম্পূর্ণ নিরাপদ। নরওয়ে সুইডেনের সঙ্গে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা বাধাহীন বিপদমুক্ত। এবং আরো যা' লক্ষ্যনীয় তাহলো বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায়, নৌ ও বিমান-বহরের আক্রমনের জন্যে তাদের দখলে এসেছে নোতুন অগ্রবর্তী ঘাঁটি।

হিটলারের ডেনমার্ক ও নরওয়ে বিজয় আরেকবার প্রমান করলো যে বিশ্ববিজয় ছাড়া আর তাঁর কোন অন্য লক্ষ্য নেই। জাতির অধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন যে হিটলারের কাছে একেবারে মূল্যহীন সেটাও আরেকবার প্রমানিত হলো। মিউনিক নীতির পিছনে যে কি মূর্খতা, ভ্রান্ত প্রত্যাশা ছিল তা একেবারে প্রকট হয়ে উঠলো। ফলে হিটলার পশ্চিম ইউরোপকে যুদ্ধের আগুন থেকে ছেড়ে দিতে পারেন তার সমস্ত প্রত্যাশাই একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

মিউনিক নীতির ব্যর্থতাকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ডে দেখা দিল একটা রাজনৈতিক সংকট। মিউনিকের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা নিভিল চেম্বারলেনকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলো। দশই মে তারিখে উইনস্টোন চার্চিলের নেতৃত্বে গঠিত হলো নোতুন মন্ত্রীসভা। ততোদিনে ওদিকে বিজয়ী জার্মাণ সৈন্যবাহিনী বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ ও নেদারল্যাণ্ডে ঢুকে পড়েছে কিন্তু তবু চার্চিল তাঁর রোজনামচায় লিখলেন :

"পাঠকের কাছ থেকে সেই সত্যটুকু আমি সরিয়ে রাখতে পারি না, যে সেই রাতে যখন তিনটের সময় আমি ঘুমাতে গেলাম, তখন মনে অনুভব করেছিলাম একটা গভীর স্বস্তি। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটি পরিচালনার কর্তৃত্ব আমার হাতে এসেছে।...তাই কখন সকাল হয় তার জন্যে উৎকণ্ঠিত বোধ করলেও, আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। কোন সুস্বপ্নেরও প্রয়োজন ছিলনা আমার। বাস্তব যা, ঘটনা যা, তা তো স্বপ্নের চেয়ে প্রিয়।"[৭]

কিন্তু যে বাস্তব সত্তা সুস্বপ্নের চেয়ে চার্চিলের কাছে শ্রেয় বলে মনে হয়েছিল, তা ছিল রক্তের ছোঁয়ায় কলঙ্কিত, অভাব্য এবং অপ্রতিরোধ্য, এককথায় চরম সংকটের ছবি। বৃটেনে তখন নাৎসী আক্রমনের সম্ভাবনা ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

ফ্রান্সেও মিউনিক নীতি ও নওয়েের বিপর্যয় নিয়ে চলেছে তখন তুমুল বিতর্ক। বিরোধ বাধলো প্রধানমন্ত্রী রেইনোঁ (Reynaud) ও দালাদিয়েরের মধ্যে, যিনি তখন যুদ্ধমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছিলেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো এই যে মিউনিকের ব্যর্থতার জন্যে তাঁরা দু'জনেই সমান দায়ী। ফলে একটা দারুণ দিশেহারা মনোভাব নিয়ে ফরাসী সরকার জার্মাণ আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

দশই মে ভোর সাড়ে পাঁচটায়, বেলজিয়াম, লাক্সেমবার্গ ও নেদারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একযোগে জার্মাণ অভিযান সুরু হলো। তারই ফলে চললো ফ্রান্সের উপর একটা চাপ সৃষ্টি। সমস্ত অনাক্রমণ চুক্তি হিটলার একেবারে পদদলিত করে এগিয়ে গেলেন।

ফলে যা দাঁড়ালো তাতে দেখা গেল যে ইঙ্গ ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রীড়নক হওয়ার কোন বাসনাই জার্মাণীর ছিলনা। এবং অন্যদিকে জার্মাণ নীতির প্রচণ্ডতার কাছে বৃটেন ও ফ্রান্স নতি স্বীকার করতে বাধ্য হতে হতে লাগলো। তারা হয়ে গেল জার্মাণীর শিকার। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্বিরোধ মূর্ত হয়ে উঠলো চরম সংকটের মধ্যে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোনঠাসা করার নীতি নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী সরকার শান্তিকামী রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত প্রতিরোধ গভীব সম্ভাবনাকে বানচাল করে দিয়েছিলেন। তাই এখন জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের আক্রমণের প্রচণ্ড চাপের সামনে তাঁরাই কোনঠাসা মিত্রহীন হয়ে পড়লেন।

বাহাত্তর ডিভিসন সৈন্যকে নামিয়ে দিলেন রণাঙ্গনে নাৎসী সমর পরিষদ। সংরক্ষিত রইলো আরো সাতচল্লিশ ডিভিসন। সীগ্‌ফ্রীড লাইন বরাবর সমাবেশ করা হলো আরো সতেরো ডিভিসন সৈন্য। এই মোট একশ' ছত্রিশ ডিভিসন জার্মাণ সৈন্যের মোকাবিলা করতে দাঁড়ালো একশ' তেত্রিশ ডিভিসন মিত্রপক্ষীয় সেনাদল। যাদের মধ্যে ছিল একানববুই ডিভিসন ফরাসী সৈন্য, দশ ডিভিসন বৃটিশ, বেলজিয়ামের বাইশ ডিভিসন, হল্যাণ্ডের নয় ও পোলদের এক ডিভিসন সৈন্য।[৫] সংখ্যাতাত্বিক বিচারে শত্রুপক্ষের পরস্পরের শক্তি প্রায় সমান তাছাড়া অস্ত্রশস্ত্র সাজ সরঞ্জামেও জার্মাণীর বিশেষ কোন শ্রেষ্ঠতা ছিলনা। কেবল বিমান বহরেই ছিল জার্মাণীর সবচেয়ে বড়ো সুবিধা।

জার্মাণ অভিযান পরিকল্পনার মৌল ভীত্তি ছিল বিস্ময়ের উপর প্রতিষ্টিত। শত্রুপক্ষের মানসিক প্রস্তুতির অভাব এবং দ্রুত অগ্রগতি এই দুই অনুকূল অবস্থাকে জার্মাণী কাজে লাগাতে তৎপর ছিল। এবং তারই সঙ্গে বিরোধী পক্ষের নানা জাতির সেনাদলের মধ্যে অভিযানগত সামঞ্জস্যহীনভাকে জার্মানী কাজে লাগাতে চেষ্টা করবো।

লাক্সেমবার্গ পার হয়ে ফ্রাঙ্কো বেলজিয়ান সীমান্ত দিনান্ত (Dinant) ও সেডানের মাঝামাঝি আর্দেনেসে জার্মাণ সৈন্য মূল অভিযানের ভূমিকা নেবে তাই স্থির হলো চূড়ান্তভাবে। সেনাদলের 'এ' বিভাগ সুরু করবে সেই আক্রমন আর তার নেতৃত্ব করবেন কর্ণেল জেনারেল ফন্‌ রাণ্ডষ্টেড্‌ (Rundstedt) অভিযান তারপর পরিচালিত হবে উত্তর পশ্চিম দিকে চ্যানেল উপকূলেরদিকে, যাতে বেলজিয়ামে সমস্ত শত্রু সৈন্য সমাবেশকে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বংস করা যায়। সীমান্তের যুদ্ধ মুখোমুখি কোন একস্থানে সীমান্ত করে শত্রু সৈন্যের বাঁদিকটা ঘুরে তাদের ঘিরে ফেলতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডানদিকে একেবারে পিছনে গিয়ে হাজির হতে হবে। জার্মাণীর যুদ্ধ পরিচালনার এটাই হলো মূল ছক।

সেনাদলের "এ" বিভাগের শক্তি ছিল বাহান্ন ডিভিশন। তার মধ্যে নয় ডিভিশন প্যানসার। এর প্রধান আক্রমণভাগ রচনা করবে জেনারেল ফন ক্লেয়িষ্টের (Kleist) পাঁচ ডিভিসন সাঁজোয়া বাহিনী আর পাঁচ ডিভিসন মোটরবাহিত সৈন্য।

সেনাদলের "বি" বিভাগের কাজ হবে বেলজিয়াম ও নেদারল্যাণ্ড ঢুকে যতোদূর সম্ভব বেশি সংখ্যক শত্রু সৈন্যকে আটক করে রাখা। এতে থাকবে

তিনটি প্যানজার ডিভিসন সমেত সাতাশ ডিভিসন সৈন্য। আর নেতৃত্ব করবেন কর্ণেল জেনারেল ফন বক (Bock)।

যুদ্ধের প্রথম দিনে, দশই মে'তে, বকের সেনাদল প্রচণ্ড চাপ দিয়ে মাস (Maas) ও অ্যালবার্ট ক্যানাল অতিক্রম করে উপস্থিত হলো বেলজিয়ামের সুরক্ষিত অঞ্চলের লীজের (Liege) কাছাকাছি। দখল করে নিল তারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলো ফরাসী সৈন্য রীতিমত বেশি সংখ্যায় আর বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী। তারই মধ্যে রাণ্ডষ্টেড্ লাকেসমবার্গ পার হয়ে সেডানে ফরাসী বাহিনীর মুখোমুখি হাজির হয়েছেন।

পনেরই মে তারিখে ডাচ্ সেনাদল আত্মগোপন করলো। সেইদিনেই জার্মাণ সৈন্যরা জেনারেল কোরাপের (Corap) নেতৃত্বে নবম ফরাসী বাহিনী বিধ্বস্ত করে দিল। এবং তারই সঙ্গে সেডান ও নামুরের মধ্যে নব্বুই কিলো-মিটার অঞ্চল জুড়ে শত্রু সৈন্য সমাবেশ ভেদ করে এগিয়ে গেল।

জেনারেল ক্লেয়িষ্টের সেনাদল সেই ছত্রভঙ্গ শত্রু সীমান্তের মধ্যে দিয়ে তীব্র বেগে এগিয়ে গেল প্রথমে দক্ষিণ পশ্চিমে প্যারীর দিকে। ফরাসী কর্তৃপক্ষ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। সেনাবাহিনীর জেনারেল ও ফরাসী পার্লা-মেন্টের উভয় কক্ষের সভাপতির উপস্থিতিতে মন্ত্রীসভার এক বিশেষ বৈঠকে ফরাসী বাহিনীর সবাধিনায়ক মরিস গ্যামেলাঁ যুদ্ধ পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে জানালেন যে সেই রাত্রেই (ষোলই মে) জার্মাণ সৈন্য প্যারী ঢুকে পড়বে কিনা তিনি বলতে পারেন না।

কিন্তু তারই মধ্যে ফরাসী শাসক শ্রেণীর মনে আত্মসমর্পনের কথাটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আত্মসমর্পণ, পরাজয় স্বীকারের প্রবক্তারা একে একে এসে ঢুকছেন মন্ত্রীসভায় সরকারের মধ্যে। দশই মে'তে এলেন জাঁ ইবার নেগারে আর লুই ম্যারী। মন্ত্রীসভায় সহকারী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন মার্শাল ফিলিপ পেতাঁ, আঠারো তারিখে। গ্যামেলাঁকে পদচ্যুত করে জেনারেল ওয়েগাঁকে বসানো হলো সর্বাধিনয়কের পদে। গ্যামেলাঁর পদচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ জেনারেলদের মধ্যে বহু ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হলো। চৌদ্দই মে'তে বৃটিশ সরকার, উত্তর ফ্রান্স থেকে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য অপসারনের সম্ভাবনার কথা ভেবে, জাহাজ মালিকদের উপর আদেশ জারী

করলেন যে তিরিশ থেকে একশ ফিট লম্বা সমস্ত মোটর চালিত জলযান যেন তাঁরা সমর বিভাগের হেপাজতে ছেড়ে দেন।

জার্মাণীর দক্ষিণ পশ্চিমমুখী অভিযান নাৎসীদের সক্রিয়তাবে কিছু পরিমানে ব্যাহত করে ফেলবার উপক্রম করলো। অপেক্ষাকৃত অল্প সৈন্য নিয়ে ক্লেয়িষ্ট শত্রুপক্ষের সৈন্য সমাবেশের অভ্যন্তরে যে সরু একটা অংশে পথ করে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যার উত্তরে দশলক্ষ ও দক্ষিণে বিশ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ হয়েছে। যদি তারা সামান্য একটুখানি নড়ে চড়ে বসতো নিজেদের মধ্যেই, তাহলে সেই সামান্য সংখ্যক জার্মাণ সৈন্যের কামার শালায় নেহাইয়ের উপর হাতুড়ীর ঘায়ে কোন জিনিষের যে দশা হয়, সেই দশা হতো। অবস্থা বুঝে ক্লেয়িষ্ট লক্ষ্য পরিবর্তন করলেন। ষোলেই মে' লাওয়ে (Laon) পেঁছিনো সত্বেও, ক্লেয়িষ্ট দিক পরিবর্তন করে সোজা চল্‌লেন উত্তর পশ্চিমে, একেবারে চ্যানেল উপকূলের দিকে। সেখানে পেঁছিতে সময় লাগলো মাত্র কয়েকটা দিন একুশে মে। পরবর্তীকালে এই ঘটনা প্রসঙ্গে ফিল্ড মার্শাল এরউইন রোমেল লিখেছেন।

উনিশ শ' চল্লিশে ফ্রান্সে আমাদের মাত্র দশটি প্যানসার ডিভিসন যুদ্ধজয় সম্পন্ন করেছিল। ইঙ্গ ফরাসী সামরিক নেতৃত্বের শ্লথতাই তাদের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।"৬

অশ্বক্ষুরের আকারে অগ্রসরমান নাৎসী সেনাদল উনপঞ্চাশ ডিভিসন মিত্র পক্ষীয় সৈন্যকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল চ্যানেল উপকূলের দিকে। তাদের মধ্যে ছিল বাইশ ডিভিসন বেলজিয়ান, নয় ডিভিসন বৃটিশ ও আঠার ডিভিসন ফরাসী সৈন্য। পচিশে মে রাজা লিওপোল্ডের আদেশে বেলজিয়ান সৈন্য আত্মসমর্পণ করলো। জার্মাণ অশ্বক্ষুর চাপ দিতে দিতে আয়তনে ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো। পূর্বদিকে তারা দখল করে নিল ওয়েষ্টেণ্ড (Ostend) আর জীব্রুগী (Zubrugge), আর পশ্চিমে বুলো (Boulogne) আর ক্যালে। চারদিক থেকে ইঙ্গফরাসী সৈন্য এসে জড়ো হলো ডানকার্কে। সামনে তাদের চরম সংকট একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশংকা। কথা ছিল শেষ আঘাত হানাবে ক্লেয়িষ্ট আর গুদেরিয়ানের সাঁজোয়া বাহিনী।

কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই চরম আঘাত হাণার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলো। চব্বিশে মে হিটলার চার্লসেভিলেতে রুণ্ডষ্টেডের সামরিক কার্যালয় পরিদর্শন

করতে এসে, ক্লেয়িষ্টকে ক্ষান্ত হওয়ার আদেশ দিলেন। তিনি জানালেন ফ্রান্স পদানত হলে তিনি বৃটেনের সঙ্গে শান্তির জন্য কথাবার্তা চালাতে চান। তাই ডানকার্কে তাদের নিশ্চিহ্ন করে না দিয়ে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার কূটনৈতিক প্রস্তুতি করতে চান।

পরবর্তী কালে রুণ্ডস্টেড প্রসঙ্গতঃ বলেছেন :

"আমি যদি আমার ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারতাম, তাহলে ডানকার্কে ইংরেজরা অতো সহজে নিস্তার পেত না। কিন্তু স্বয়ং হিটলারের প্রত্যক্ষ আদেশে আমার হাত বাঁধা হয়ে পড়লো। উপকূলে প্রাণভয়ে ভীত ইংরেজরা যখন কোনমতে জাহাজে উঠছে অপসারিত হওয়ার জন্যে, আমি তখন বন্দরের বাইরে দূরে চুপচাপ বসে আছি। নড়বার হুকুম নেই। সর্বোচ্চ সমর পরিষদের কাছে আমি সুপারিশ করে পাঠালাম যে আমার পাঁচটি প্যানসার ডিভিসনকে এখনই শহরে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হোক। পলায়নপর ইংরেজদের ওখানেই নিশ্চিহ্ন করে দিই। কিন্তু ফুয়েরারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট আদেশ এলো যেন কোন অবস্থাতেই আমি আক্রমণ সুরু না করি। এমন কি আমায় স্পষ্ট নিষেধ করে দেওয়া হলো যে ডানকার্কের দশ কিলোমিটারের মধ্যে আমি যেন কোন সৈন্য না পাঠাই। শহরের বাইরে সেই দূরত্বে বসে স্থাণুর মতো আমি দেখতে লাগলাম পলায়নপর ইংরেজদের। আমার পদাতিক বাহিনী আর ট্যাঙ্কগুলো কর্মহীন হয়ে বসে রইলো সেই নিষেধের জন্যে।"[১]

তিনদিকে ঘিরে ধরা ইংরেজ সৈন্যদের অপসারণের আদেশ দিলেন বৃটীশ সরকার। কিন্তু জাহাজের ব্যবস্থা তেমন না থাকায় সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র ফেলে রেখে আসতে বলা হলো। সেনাদলের বেশিরভাগ অংশ এতে রক্ষা পেয়ে গেল। আর নাৎসীরা হস্তগত করলো প্রচুর সামরিক উপকরণ।

দোসরা জুনের মধ্যে তিনলক্ষ আটত্রিশ হাজার সৈন্য আর অফিসারদের সরিয়ে আনা হলো চ্যানেল পার হয়ে। তার মধ্যে নব্বুই হাজার ফরাসী সৈন্যও ছিল।

ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযানের প্রথম পর্ব এইভাবে শেষ হলো। অভিযানের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হওয়ার মধ্যে এলো দিন কয়েকের যতি। ফরাসী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে সেই সময়টা কাজে লাগানো যেত। ফরাসী জনসাধারণের জার্মাণ অভিযানকে প্রতিহত করার মতো ক্ষমতা ছিল। যা

তাদের দরকার ছিল, তা হলো। এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার মনোবৃত্তির অবসান ঘটিয়ে, সংগ্রামের সঠিক উদ্দেশ্যের ধারণা। দেশের প্রতিরক্ষায় তাদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি ফরাসী সরকারের কাছে মুক্তির এই পরিকল্পনা পেশ করলেন। কয়েকটি দাবীর ভিত্তিতে সেই কর্মসূচী রচিত হয়েছিল। সেগুলি ছিল: এই যুদ্ধকে মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে জনযুদ্ধে পরিণত করতে হবে, পার্লামেন্টের কমিউনিষ্ট সদস্য ও কমিউনিষ্ট পার্টির ধৃত সদস্যদের মুক্তি দিতে হবে, মুক্তি দিতে হবে হাজার হাজার শ্রমিককে যাদের কয়েদখানায়, কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আটক করে রাখা হয়েছে: সমস্ত বিদেশী চরদের গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে, জনগনের একটা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গডতে হবে জনগণের হাতে এবং প্যারীকে গড়ে তুলতে হবে সেই সংগ্রামের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি হিসেবে।

রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টিই এই ধরণের একটা কর্মসূচী রচনা করেছিলেন। এরই মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় জাতির সুদৃঢ় মনোভাব। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক, জার্মাণীর চর আর পরাজয়ী মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের নিয়ে গঠিত সরকার, সেই কর্মসূচী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলো।

জার্মাণ অভিযানের প্রথম পর্ব শেষ হতেই দুই পক্ষের সৈন্য সংখ্যার আপেক্ষিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে বদলে গেল। বিপুল বিরাট জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর যার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এ পর্যন্ত ছিল নিতান্ত সামান্য, মোকাবিলা করতে দাঁড়াল ছেষট্টি ডিভিসন ফরাসী সৈন্য।

জার্মাণ আক্রমণের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হলো পাঁচই জুন। ফরাসী সৈন্যরা লড়াই চালালো যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে। কিন্তু উপর মহলের বিশ্বাসঘাতকতা, সামরিক অধিনায়কদের শ্লথগতি, অস্ত্রশস্ত্রের স্বল্পতা যুদ্ধের গতিকে তাদের প্রতিকূলে নিয়ে যেতে লাগলো ক্রমাগত। নয়ই জুন জার্মাণ সৈন্য আবার ফরাসী সমাবেশে ফাটল ধরিয়ে এগিয়ে গেল। এবার তাদের গতি পশ্চিম দিকে।

এরই মধ্যে ফরাসী সরকারের মধ্যে আত্মসমর্পণপন্থীদের শক্তি আরো বেড়ে গেছে। দশই জুন তারিখে তাই সরকার প্যারী পরিত্যাগ করে পালিয়ে গেলেন তুরে (Tours)। তার পরাজয়ী মনোবৃত্তি প্রকট হয়ে উঠলো।

অনেকদিন থেকেই ফ্রান্সের কোন কোন অঞ্চল ও কিছু ফরাসী উপনিবেশের

উপর ফ্যাশিস্ত ইটালীর লোলুপদৃষ্টি পড়েছিল। কুখ্যাত বার্লিন-রোম অক্ষে যোগদান করার সেটা ছিল তার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। ইউরোপে যুদ্ধ যখন সুরু হয়ে গেল, তখন ইটালী সুযোগের অপেক্ষায় বসে রইলো। কিন্তু জার্মাণ জেনারেলরা যখন ক্রমাগত ফ্রান্সের মধ্যে ঢুকে পড়ছে, তখনই ইটালীর শাসক-শ্রেণীর হাবভাব ক্রমেই যুদ্ধবাদী হয়ে উঠতে লাগলো।

ইটালীর সংবাদপত্রগুলি বৃটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তুতির জন্যে জনমত গড়ে তুলতে লাগলো। ইটালীর সামরিক শক্তি নিয়ে আত্মস্তুরি উক্তি প্রকাশিত হতে লাগলো ক্রমাগত। চৌঠা মে, উনিশ শ' চল্লিশে, রোমের তেভরে (Tevere) পত্রিকা লিখলেন :

"আদ্রিয়াতিক কোন মতেই শত্রুপক্ষের নৌবহরের যুদ্ধদৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে না। কারণ সহজেই ওত্রান্তো প্রণালীর কাছে এর প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়া যাবে, যেমনটি দেওয়া যায় ক্যালে বা স্কাগারেকে। ইটালীর অন্যান্য সাগরগুলি, ফরাসী সীমান্তের লিওরিয়ান উপকূল থেকে লিটিয়া পর্যন্ত এই পনের শ' কিলো-মিটার অঞ্চল, যার মধ্যে আছে কর্সিকা, সার্দিনিয়া, প্যান্তেল্লেরিয়া ও সিসিলী, একশ' একুশটা ইতালীয় ডুবোজাহাজ আটকে রাখতে পারে। তিরহে-নিয়ান কে তো অন্তর্দেশীয় সাগরই বলা যায়। সেখানে শত্রুপক্ষ কোন অগ্রগতি করতে চাইলে তাকে চরম আঘাত হাণার জন্যে ইটালীর নৌবহর সহজেই ছ'টি যুদ্ধজাহাজ, তেত্রিশটি ক্রুজার, একশ' আঠারোটি ডেষ্ট্রয়ার ও বাষট্টিটি মাইন-সুইপার সমাবেশ করতে পারে। তা' ছাড়া ইটালীর শক্তিশালী বিমান বহরের নানা সাহায্যদানের ঘাঁটি, যাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত কারণ পিছনে তাদের কেউ নেই। সেই পশ্চাৎভাগ রক্ষা করছে আল্পস সীমান্তে আশী লক্ষ বেয়নেট যা ইটালী যে কোন সময়েই নামাতে পারে রণাঙ্গনে।"

ইটালীর সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বাস করেছিল যে ইঙ্গ-ফরাসী গোষ্ঠীর নাভিশ্বাস উঠেছে। তাই তাদের প্রত্যাশা ছিল যে ফ্রান্সের পতন ঘটলে ভূমধ্যসাগরে শক্তির আপেক্ষিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হবে। তাদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার এটাই ছিল তখনকার কারণ, এতে সহজেই বেশ কিছু লুটের ভাগ পাওয়া যাবে। যুদ্ধে যোগদানের পূর্বমুহূর্তে ইটালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিয়ানো তুরস্কের রাষ্ট্র-দূতকে জানান যে পাঁচ হাজার বছরেই মাত্র একবার এই ধরণের সুযোগ আসে। তাই সুযোগ যখন এসেছে, ইটালী তা হাতছাড়া করবে না। সিয়ানো ঘোষণা

করেন, মাত্র দিন চল্লিশেকের মধ্যেই এ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। ইটালীর সাম্রাজ্য-বাদীদের সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যুদ্ধ বেশিদিন চলবে না। আর মুসোলিনী স্বয়ং ঘোষণা করেছিলেন এটা হবে "ছয় সপ্তাহের যুদ্ধ"।

ইটালীর ফ্যাশিস্ত শাসকশ্রেণীর এই মদগর্বী দম্ভোক্তি তার সেনাদলের যথার্থ প্রস্তুতির ঘাটতি ও মনোবলের নিম্নমানকে চাপা দিয়ে রেখেছিল। কারণ ফ্যাশিস্ত শাসনের লোভের খোরাক জোটাতে তারা নিজেরা মাশুল দিতে রাজী ছিল না। ইটালীর মিত্রপক্ষের মতে, "ইটালীর সশস্ত্র বাহিনী সবদিক বিচার করলে ছিল একটা অকেজো হাতিয়ার, যাকে এ পর্যন্ত শুধু রাজনৈতিক ধাপ্পাতে কাজে লাগানো হয়েছে॥"[৮]

কিন্তু তাহলেও, দশই জুন ইটালী যুদ্ধে যোগ দিয়ে ফ্রান্সের অসুবিধার পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দিল। মঁ ব্লঁ্যা থেকে ইটালীর সেনাদল অভিযান সুরু করলো ভূমধ্যসাগরের দিকে। ইটালীর বত্রিশ ডিভিসন সৈন্যের বিরুদ্ধে ফরাসীরা কোনমতে ছয় ডিভিসন অ্যালপাইন সৈন্য সমাবেশ করতে পারলো।

নাৎসী সমর পরিষদের সঙ্গে ইটালীর সৈন্যদের মোটামুটি এই ধরনের একটা বোঝাপড়া হয়েছিল যে দক্ষিণ পূর্ব ফ্রান্সের চ্যাম্বেরী শহর পর্যন্ত এগিয়ে তারা জার্মাণ-বাহিনীর সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে। কিন্তু সে যোগাযোগ আর সম্ভব হলো না। ফরাসীরা সংখ্যায় অল্প হয়েও অধিক সংখ্যক ইটালীর সৈন্যদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই চালিয়ে পথ আগলে রইলো। অনেক কষ্টে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী ফরাসী গ্রীষ্মাবাস মেঁতোঁ (Mentone) সীমান্ত শহর, ইটালীর দখলে এলো।

তুরের দশ মাইল দূরে, একটা দুর্গের মধ্যে বসে বারোই জুন ফরাসী সরকার সমগ্র পরিস্থিতির পর্যালোচনা সুরু করলেন। যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে ফরাসী-বাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওয়েগাঁ তাঁর বিবরণী পেশ করলেন। তাঁর বর্ণনায় বলা হলো অবস্থা চরম হতাশাপূর্ণ। যা করা দরকার তা হলো দ্রুত আত্মসমর্পণ। কারণ পরে দেরী হলে "সামাজিক প্রতিক্রিয়া" যে মোটেই অনুকূল হবে না, সে সম্বন্ধেও তিনি সকলকে সতর্ক করে দিলেন। জেনারেল জানালেন যে প্যারী থেকে একটা খবর পেয়েছেন তিনি। সেখানে চলেছে অরাজকতা। আর ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির প্রধান কর্তা মরিস তোরে নাকি ঘোরাফেরা করছেন এলিসী (Palais de l'elysee) প্রাসাদে।

সে কথায় আভ্যন্তরীণ বিষয়কমন্ত্রী জর্জেস মঁদেল টেলিফোন করলেন প্যারীর প্রিফেক্ট লাঁজেরোঁর কাছে। প্রিফেক্ট জানালেন ওয়েগাঁ মিথ্যা ভাষণ করেছেন। প্যারীর অবস্থা শান্ত।

কিন্তু ওয়েগাঁর ভীতি প্রদর্শনের ফল ফললো। পাছে প্যারীর শ্রমিকশ্রেণী ও কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে যুদ্ধটা একটা জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের আকার নেয়, তাই সরকার ভীত হয়ে প্যারী পরিত্যক্ত শহর ঘোষণার সিদ্ধান্ত করলেন। প্যারী রক্ষার জন্যে আর কিছুই করা হবে না। আরো স্থির হলো যে ফ্রান্স যে আত্মসমর্পণ করছে সে ব্যাপারটা বৃটিশ সরকারকেও জানিয়ে রাখা দরকার।

পরদিন প্যারীকে প্রতিরোধবিহীন উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হলো। জার্মাণ সমর পরিষদকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে ফরাসী সৈন্যরা তাদের রাজধানী রক্ষার জন্যে লড়াই করবে না। ফরাসী সরকার ঘোষণা করলেন এই নীতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে "প্যারী রক্ষার মধ্যে বিশেষ কোন সামরিক তাৎপর্য নেই।" প্যারীস্থ সেনাদলের নেতৃত্ব করছিলেন তখন জেনারেল দেঁত। তাঁর ফ্যাসিবাদী মনোভাব সর্বজনবিদিত। তাঁকে ক্ষমতা দেওয়া হলো যে সরকারের ঘোষণার বিরোধিতা করে কোন নাগরিক বা সৈন্য কেউ যদি কোথাও কোন প্রতিরোধের চেষ্টা করে, তাহলে যেন গুলী চালানো হয়।

ফরাসী সরকারের এই বক্তব্য যে প্যারীর কোন সামরিক গুরুত্ব নেই; তারই মধ্যে রয়েছে চরম বিশ্বাসঘাতকতার আভাস। সামরিক বিচারে প্যারীর গুরুত্ব চিরকালই ছিল অপরিসীম। আঠারো শ' সত্তর-একাত্তরের ফ্রাঙ্কো-প্রাশিয়ান যুদ্ধে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তা বারেবারে প্রমাণিত হয়েছে। রাজধানী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে মোট জনসংখ্যা ছিল এক কোটি বিশ লক্ষ। এর মধ্যে তিরিশ লক্ষ ছিল শ্রমিক। ফ্রান্সের ইঞ্জিনীয়ারিং যুদ্ধশিল্পের কেন্দ্রস্থল প্যারী। তাছাড়া সমগ্র ফ্রান্সের যোগাযোগ ব্যবস্থার কেন্দ্রেও আছে প্যারী। অনেক দিন আগে গত শতাব্দীতে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ লিখে ছিলেন, "ফ্রান্সের ভর কেন্দ্র দেশের কেন্দ্রে আর্লিয়াঁর কাছে লয়ারে নেই। আছে দেশের উত্তরে সীনের তীরে প্যারীতে। অভিজ্ঞতায় বারে বার প্রমাণিত হয়েছে যে প্যারীর পতন মানেই হলো ফ্রান্সের পতন।

তাই ফ্রান্সের সীমান্তরক্ষার সামরিক গুরুত্ব বহুলাংশে নির্ভর করে প্যারীকে রক্ষা করার ব্যবস্থার উপরে।"[৯]

ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব সরকারকে জানিয়ে দেন যে, ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের সামনে প্যারী পরিত্যাগ করাকে তাঁরা দেশদ্রোহিতা বলেই মনে করবেন, এবং প্রস্তাব করেন যে ফ্রান্সের হৃদয় মস্তিষ্ক, তাঁর সর্বস্ব প্যারীকে রক্ষা করার জন্যে তাঁরা নাগরিক বাহিনী গঠন করবেন।[১০]

প্যারীকে উন্মুক্ত শহর ঘোষণা করে দেওয়ার অর্থই হলো ফ্রান্সের আত্ম-সমর্পনের পথ পরিস্কার রাখা। রাজধানীতে প্রতিরোধ সুরু হলে, সমগ্র দেশ হয়তো ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতো। ফরাসী সেনাদলের ও অনেক অফিসারের সাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়ে দিল যে শত্রুর পথরোধ করে দাঁড়াতে ফ্রান্সের মানুষ আজো সক্ষম। কিন্তু শাসকশ্রেণীর সেটা অভিপ্রেত ছিল না মোটেই। জনৈক মার্কিন সাংবাদিক ফ্রান্স থেকে প্রেরিত এক বিবরণীতে মন্তব্য করেছেন যে বৃহৎ ফরাসী পুঁজিপতিরা পপুলার ফ্রন্টের চেয়ে হিটলারের অধীনে বসবাস করা শ্রেয় বলে মনে করতো। তিনিই লিখেছেন ; "পরাজয়ের চেয়ে বিজয়ের সম্ভাবনাতেই তাদের ভয় ছিল বেশি।"

ফ্রান্সে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বুলিট, নাৎসীদের সঙ্গে ফরাসী সরকারের আত্ম-সমর্পনের সর্তাদি নিয়ে মধ্যস্থতা করলেন। চোদ্দই জুন নাৎসী বাহিনী প্যারী প্রবেশ করলো।

ওদিকে তুরে বসে ফরাসী সরকার বৃটিশ মন্ত্রিসভার তিন নেতা...উইনষ্টন চার্চিল, হ্যালিফ্যাক্স ও বিভারব্রুকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন।

বৃটিশ সরকার দেখলেন ফ্রান্সের এই দুর্গতিকে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাঁরা চাইলেন ফ্রান্সের সমস্ত উপকরণ উপনিবেশ, নৌবহরকে নিয়ন্ত্রিত করতে, যার ফলে কার্যত, ফ্রান্স ইংলাণ্ডের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। উনিশ শ' চল্লিশের ষোলই জুন, বৃটেন, ফরাসী সরকারের কাছে একটি ফ্রাঙ্কো বৃটিশ ইউনিয়ন গঠনের প্রস্তাব করে পাঠালেন।

দৃশ্যতঃ এই পরিকল্পনায় ইউনিয়নের দুই সদস্য বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে মর্যাদার সমতা রক্ষিত হবে। কিন্তু তদানীন্তন অবস্থায় এর নেতৃত্বের ভার অনিবার্যভাবে গিয়ে পড়বে বৃটেনের হাতে।

ফ্রাঙ্কো বৃটিশ ইউনিয়ন প্রস্তাবের মৌল ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে বৃহৎ শক্তি

হিসেবে ফ্রান্সের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাই ফরাসী "ঐতিহ্য" হাতছাড়া করে ফেলতে বৃটেনের সরকার কোনমতেই চাইছিলেন না।

পল রেঁয় বৃটিশ প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। কিন্তু ফরাসী মন্ত্রিসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ এবং বিশেষ করে পেতাঁ, জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের কাছে আত্মসমর্পণ করাই বিধেয় বলে মনে করলেন। তাঁদের আদর্শ হলো "ইংরেজদের অধীনে থাকার চেয়ে নাৎসীদের অধীনে থাকা ভালো।"[১১]

ফরাসী সরকার দুই উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন—একদল চায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পন করতে, অন্যদল জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের দাসত্ব করতে প্রস্তুত। সেখানে তৃতীয় উপদল ছিল না যারা চায় ফ্রান্সের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্বের জন্যে সংগ্রাম করতে। জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার গভীর পঙ্কে ফরাসী শাসকশ্রেণী কতদূর নিমজ্জিত হয়েছিল, এর চেয়ে তার বড়ো প্রমাণ আর হয় না।

মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সমর্থন জানালেন আত্মসমর্পণের প্রস্তাবে। পরদিন সতেরই জুন রেঁয় পদত্যাগ করলেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন ফিলিপ পেতাঁ। ক্ষমতা হাতে নিয়েই পেঁতা বেতারে ঘোষণা করলেন যে দেশ "যুদ্ধ বন্ধ করেছে" এবং তিনি "প্রতিপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে তাঁরা আমাদের সঙ্গে কোন সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে সম্মত আছেন কিনা।" পেঁতার বেতার ভাষণ তখন যুদ্ধমান ফরাসী সেনাদলের মনোবলের শেষ অবশেষটুকু হরণ করে নিল।

॥ দুই ॥

আঠারোই জুন হিটলার ও মুসোলিনী মিলিত হলেন মিউনিকে, ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের সর্তগুলি আলোচনা করার জন্যে। কিন্তু বৈঠকে অক্ষ শক্তির মধ্যেকার গভীর মত পার্থক্যই প্রকাশিত হয়ে পড়লো। মার্কিন সরকার উদ্যোগী হলেন যদি ফ্রাঙ্কো জার্মাণ যুদ্ধের থেকে কিছু সুবিধা করে নেওয়া যায়। সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা জার্মাণ ও ইটালী সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন তাদের আত্মসমর্পণ দাবীর সর্তাদি জানতে।[১২] কিন্তু অক্ষ শক্তিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধ প্রত্যাখান করলেন। ফলে তাঁদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে শত্রুতা, প্রতিকূলতা ছিল তাতে আরো ইন্ধন এসে পড়লো।

একুশে জুন, উনিশ শ' চল্লিশে, নাৎসীরা সতর্কতার সঙ্গে মহড়া দেওয়া

একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে ফরাসী মুখপাত্রদের হাতে যুদ্ধবিরতির সর্তগুলি প্রদান করলো। আটই নভেম্বর, উনিশ শ' আঠারো সালে মার্শাল ফোশ (Foch) যে রেলের কামরায় জার্মাণ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যেমনটি ব্যবহার করেছিলেন এবারে সর্তগুলি ফরাসী প্রতিনিধিদলকে দেওয়ার সময় উইলহেলম কাইটেল, হিটলারের উপস্থিতিতে সেই কামরায় তাদের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার করলেন। শুধু তাই নয় রেলের কামরাটিকে তার প্রাক্তন স্থান কম্পেইনে নিয়ে গিয়ে এই পর্ব উদ্‌যাপিত হলো।

পেঁতা সরকার যুদ্ধবিরতির যে সর্তগুলি কোন রকমের ইতস্ততঃভাব না রেখে মেনে নিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, সমগ্র দেশে যুদ্ধ এখনই বন্ধ করে দিতে হবে, সমস্ত ফরাসী সৈন্যকে অস্ত্রত্যাগ করতে হবে। ফরাসী সরকার "শৃঙ্খলা" রক্ষার জন্যে যেটুকু সামরিক শক্তি রাখা প্রয়োজন মনে করেন, তা ছাড়া সমস্ত স্থল, নৌ ও বিমানবাহিনী এখনই ভেঙ্গে দিতে হবে। সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্কধ্বংসীকামান, জঙ্গী বিমান, পদাতিক বাহিনীর সাজসরঞ্জাম, ট্র্যাক্টর ইত্যাদি যে কোন মুহূর্তে কাজে লাগবার অধিকার জার্মাণীর থাকবে। স্থল ও উপকূল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নক্সা ও অন্যান্য খবরাখবর ও অস্ত্রশস্ত্র, মাইন-ফিল্ড ও নৌ প্রতিরক্ষার খবর দ্রুত জার্মাণীকে দিয়ে দিতে হবে।

যুদ্ধবিরতির সর্তে জার্মাণ বাহিনী কর্তৃক ফ্রান্সের একটা বৃহৎ অংশ অধিকার ও দখল করার কথা বলা হলো, যেখানে দখলদার সৈন্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে হবে ফরাসীদের। এই দখলদারী এলাকা জেনেভা, দোলে, শ্যালোঁ, প্যারা-লে-মঁইয়েল, মুলাঁ, বুর্জেস এবং ভিয়াস প্রভৃতি অঞ্চলের পূর্ব দিয়ে প্রসারিত হয়ে তুরের কুড়ি কিলোমিটার পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর তাদের দক্ষিণ সীমা আঁজুলেমে থেকে ম-ঁ-মার্স হয়ে সা-জা পিয়েজ দ্য পোর্ট পর্যন্ত যে রেলপথ বিস্তৃত আছে তারই সমান্তরাল হয়ে থাকবে।

তার মানে হলো ফ্রান্সের সমগ্র শিল্পাঞ্চল দখলদারী সৈন্যের অধিকারে থাকবে। নাৎসীরা ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তাদের আঞ্চলিক দাবীর চূড়ান্ত মীমাংসা আপাতত মুলতুবী রেখে শুধু অ্যালশাস লোরেন অঞ্চল রাইখের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। তাদের ভবিষ্যৎ সামরিক কর্মসূচীর রূপায়নের জন্যে প্রয়োজন ছিল ছিল ফরাসী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করা। ফরাসী যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের

শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ রইলো তাদের দখলে যেখানে যুদ্ধপূর্ব কালে সমগ্র দেশের শতকরা আটানব্বুই ভাগ লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন হতো।

অবশ্য প্রশ্ন করা যেতে পারে. পরবর্তীকালে যেমন সমগ্র ফ্রান্সই নাৎসীরা দখল করে নিয়েছিল, সুরুতেই তারা তা করলো না কেন? কারণটা তার হলো এই যে, ফ্রান্সে একটা ক্রীড়নক সরকার স্থাপন করে, জার্মাণী ফরাসী উপনিবেশ ও নৌবহরের উপর অধিকার কায়েম করার চেষ্টা সুবিধাজনক হবে বলে মনে করেছিল। এ ধরনের একটা সরকার না থাকলে জার্মাণীর শত্রুরা আগেই সে সব দখল করে নিত। যুদ্ধবিরতি চুক্তির আট নং ধারায় বলা হয়েছিল:

ফরাসী নৌবহরের একাংশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে ফরাসী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে ফরাসী সরকারকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে, সেগুলি ছাড়া বাকী সব যুদ্ধ জাহাজকে ফিরিয়ে আনতে হবে বন্দরে হয় জার্মাণী, নয় ইটালী বা উভয়ের নির্দেশমতো তাদের বিশেষ ব্যবহার করতে হবে কিম্বা বাতিল করে বন্দরেই বাঁধা থাকতে হবে।"[১৩]

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি। চুক্তিতে কেবল একটা বলা হয়েছিল যে "শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত না হওয়া পর্যন্ত তা চালু থাকবে। এই চুক্তি অনুযায়ী যে সব দায়িত্ব পালনে ফরাসী সরকার সম্মত হয়েছে, তা পালন না করলে জার্মাণ সরকার তৎক্ষণাৎ এটি বাতিল করে দেবে।"[১৪]

সমস্ত বিষয়গুলি ফ্রান্স, ইটালীর যুদ্ধবিরতির সর্ত মেনে নেওয়ার পর কার্যকরী করা হবে।

বাইশে জুন এই অবমাননাকর সর্তেই ফরাসী প্রতিনিধিদল জার্মাণীর সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদন করলেন।

ওদিকে ফ্যাসিস্ত ইটালীর নেতারা ফ্রান্সকে নিজেদের দাবী জানানোর জন্যে অধীর আগ্রহে আক্ষেপ করছিলেন। জার্মাণ সংবাদপত্রগুলির প্রতিধ্বনি করে ইটালীর সংবাদপত্রেও, ফরাসী জাতির সঙ্গে সমস্ত ব্যবহার কঠোর মনোভাব গ্রহনের জন্যে রব তুলছিল। তেইশে জুন, তেভেরে পত্রিকায় লেখা হলো:

"ফ্রান্সকে দয়া দেখানো হবে না। তার আচরণের যোগ্য পুরস্কার স্বরূপ আমাদের জুতো কি তার মাথায় বহন করা উচিত নয়? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফ্রান্স এইভাবে নতজানু হয়ে থাক।"

ইটালীর সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী, ফ্রান্কো জার্মাণ যুদ্ধবিরতি চুক্তির চেয়েও আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। তাতে বলা হলো সমস্ত ফরাসী উপনিবেশ ও অছিভুক্ত এলাকায় যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করতে হবে। অসামরিক এলাকা গঠন করতে হবে যেখানে থাকবে ইটালীর দখলদারী সৈন্য। যুদ্ধবিরতির মুহূর্তে মূল ফ্রান্সে ইতালীর সৈন্যবাহিনী যেখানে আছে সেখান থেকে তারা এগিয়ে যাবে আরো পঞ্চাশ কিলোমিটার এবং তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়াতে সিরিয়া সীমান্ত থেকে পেছু হটে আসতে হবে আড়াইশো কিলোমিটার দেশের অভ্যন্তরে। ফরাসী সোমালীল্যাণ্ডের উপকূলবর্তী অঞ্চল অসামরিক করে দিতে হবে, সরিয়ে নিতে হবে ফ্রান্সের নৌ ঘাটি যার মধ্যে আছে তুলোঁ, বাইর্জাতা ও ওরান। জিবুতী ডক ও বন্দর ব্যবহার করার একচ্ছত্র অধিকার লাভ করবে ইতালী এবং জিবুতি আদ্দিস আবাবা রেলপথের ফরাসী অংশটি তাকে ব্যবহার করতে দিতে হবে প্রয়োজন মতো।[১৫]

যুদ্ধবিরতিতে ফ্রান্সের মূল ভূখণ্ডে ইটালীর রাজ্যবিস্তারের দাবী বিশেষ কিছু ছিল না। ফ্রান্সের কাছে মুসোলিনী যে স্যাভয়, কর্সিকা নাইস ও টিউনিসিয়া দাবী করেছিলেন, তাতে হিটলার আপত্তি করেন। এই সব লোভনীয় সম্পদ মুসোলিনীর ভোগে লাগুক, জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা তা সমর্থন করতে প্রস্তুত ছিলনা। তাছাড়া ফ্রান্সে একটা ক্রীড়নক সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা জার্মাণীর ছিল, যার অর্থ হলো ফ্রান্সের অস্তিত্ববিলোপে বিলম্ব হওয়া।

এবিষয়ে ইটালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাউন্ট গলিয়াজ্জো সিয়ানো তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন :

"মুসোলিনীকে দেখলাম অসন্তুষ্ট। দুচে চরমপন্থী। তাঁর ইচ্ছে ছিল সমগ্র ফরাসী অঞ্চল দখল করে নেওয়া এবং ফরাসী নৌবহরের আত্মসমর্পণ দাবী করা। কিন্তু তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে তাঁর মতামতের আলাপ আলোচনায় পরামর্শগত মূল্য ছাড়া আর কিছুই নেই।"[১৬] কারণ হিটলার সেগুলি শুনতে বিন্দুমাত্র রাজী ছিলেন না।

ফরাসী সরকার ইটালীর যুদ্ধবিরতীর সর্ত মেনে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করলেন চব্বিশে জুন। জার্মাণ যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরী হলো পরের দিন থেকে। সংগ্রাম শেষ হয়ে গেল।

যুদ্ধবিরতির সর্তগুলি ফরাসী জাতির মাথায় নিদারুণ কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে

দিল। আত্মঅবমাননায় ফ্রান্স জর্জরিত হয়ে গেল। তার জাতি অধিকার পদদলিত, অপবিত্র করে দেওয়া হলো। জার্মাণ দখলভুক্ত অঞ্চলে ফরাসী জনসাধারণকে সহ্য করতে হলো নাৎসী শাসন অনির্দিষ্টকাল ধরে। আর গায়ে গতরে পরিশ্রম করে জুগিযে যেতে হলো দখলকারী সৈন্যের ব্যয়ভার। ফরাসী যুদ্ধবন্দীদের কাজ করতে হলো বিজেতাদের কল্যাণে জার্মানীতে। ফ্রান্সের অস্ত্রশস্ত্র সব এসে পড়লো শত্রুদের হাতে।

তার চেয়েও যা মারাত্মক তা হলো যুদ্ধবিরতির সর্তে ফ্রান্সের দুর্দশার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে উঠলো না। মূল ফান্স ও ফরাসী উপনিবেশ থেকে পেঁতা জার্মানীকে খাদ্যদ্রব্য, কাঁচামাল ও জ্বালানী সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। ফলে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ যখন ক্ষুধা শৈত্যে কষ্ট পেতে লাগলো তখন তাদেরই চোখের সামনে দিয়ে তাদেরই দেশের সম্পদ সারে সারে মালগাড়ী বোঝাই হয়ে চালান যেতে লাগলো বিজেতাদের দেশ জার্মানীতে। যুদ্ধের প্রযোজনীয় দ্রব্যাদি ফরাসী কলকারখানায় উৎপাদন করার অবাধ অধিকার পেযেছিল জার্মানী। সেখানে ফরাসী শ্রমিকরা কাজ করতে লাগলো তাদের বিজেতাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্যে। লক্ষ লক্ষ ফরাসী মানুষকে চালান দেওযা হলো জার্মানীতে, যুদ্ধোৎপাদন কেন্দ্রে দাস শ্রমিক হয়ে কাজ করার জন্যে।

জার্মাণ শ্রমিক শ্রেণীর প্রগতিশীল অংশ যুদ্ধবিরতির এই সর্তাবলীর বিরোধিতা নিন্দা না করে পারেনি। উনিশ শ' চল্লিশের জুলাই আত্মগোপনকারী জার্মাণ কমিউনিষ্ট পার্টি, নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করলেন :

"জার্মান শ্রমিকশ্রেণী কম্পেইনে চুক্তির তীব্র প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করছে। কোনদিনই তারা একে সমর্থন জানাবেনা। জামাণ শ্রমিক শ্রেণী জানে যে এই চুক্তি জার্মাণ জাতির গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের মূলে আঘাত করেছে। তারা ফ্রান্সের মেহনতী মানুষকে জানাচ্ছে তাদের ভ্রাতৃত্বের সংহতিবোধ এবং ঘোষণা করছে তাদের এই সুদৃঢ় মনোভাব যে মহান ফরাসী জাতির প্রতি এই বর্বরোচিত আচরনের প্রতীক কম্পেইনে শান্তিচুক্তির বিরুদ্ধে তারা কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে সংগ্রাম করবে।"[১১]

এই প্রস্তাব সর্বহারা মেহনতী মানুষের আন্তর্জাতিকতার একটা শ্রেষ্ঠ-প্রকাশ।

ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টিও একটি অনুরূপ ঘোষনা করলেন। ইটালীর কমিউনিষ্টরা বললেন :

"আমাদের দেশ ইতালীর ফ্যাশিস্ত বুর্জোয়া শ্রেণীরও যেমন ক্রীতদাস হতে চায় না, তেমনি চায় না বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের তাঁবেদার অনুগত শরিক হতে। তারা যেমন জেলখানার রক্ষী হতে চায় না তেমনই অন্য দেশের মানুষকে ক্রীতদাস বানিয়ে তাদের পরিচালনা করতেও নারাজ। ফ্রান্সের ভাইদের ক্রীতদাসে পরিনত করতে তাদের কোন আগ্রহ নেই। আমরা, কমিউনিষ্টরা ঘোষনা করছি যে ইটালীর মানুষ জার্মাণ ও ইটালীর সাম্রাজ্যবাদ ফরাসী জন সাধারনের উপর যে ঘৃণ্য যুদ্ধবিরতীর সর্তাবলী চাপিয়ে দিয়েছে, তাদের কোন দিন স্বীকৃতি দেয়নি। কোনদিন স্বীকৃতি দেবেও না।"[১৮]

ফ্রান্সের এই জাতীয় বিপর্যয়ের কারণ কি? তার মূল কারণ হলো যুদ্ধ পূর্ব ও যুদ্ধের সুরু হওয়ার পরেও তার শাসকশ্রেণীর অনুসৃত বিশ্বাসঘাতকতার নীতি। মিউনিকে তাঁরা যে নীতি নিয়েছিলেন, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যে নীতি তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তারই অনিবার্য পরিনতি হলো ফ্রান্সের আত্মসমর্পন। ফ্রান্স, যেখানে সরকার, দেশপ্রেমিক মানুষদের নিপীড়িত করেছে, বেআইনী করে দিয়েছে তাদের সংগঠন, যে দেশটা নিজের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে নানা ভাগে জগতের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ছিন্ন, কোথাও বন্ধু, মিত্র কেউ নেই তাদের শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করা হলো পুরনো শত্রুর দয়ার সামনে। তাই ফ্রান্সের বিপর্যয় হলো তার সাধারণ মানুষের বিপর্যয়। তার ব্যাঙ্কার ও বৃহৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীর স্বার্থের কাছে জাতীয় স্বার্থ উপেক্ষা, তাচ্ছিল্যের বস্তু, যাদের কাছে মুনাফার সুযোগ থাকলে হিটলারের আঁতাত হতেও কোন বাধা ছিল না। ফ্রান্সের সেই "দুই শত পরিবার" জনগণের ক্ষমতাকে সীমিত রাখার জন্যে জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতেও কুন্ঠিত হয়নি। তাই দেশের মানুষের হাতে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার ছেড়ে না দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ শ্রেয় মনে করেছিল।

ফরাসী পুঁজিপতিরা হিটলার জার্মাণীকে ফরাসী শিল্প পুরো ব্যবহার করতে সাহায্য করতে লাগলেন। ফ্রান্সের দখলীকৃত অঞ্চল দখলদারী কর্তৃপক্ষ ও শিল্পপতিদের মধ্যে বেশ "সহযোগিতা" চলতে লাগলো। টমাস কেরনান নামে একজন প্রখ্যাত মার্কিন ব্যবসায়ী সমকালীন ফ্রান্সে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে

বলেছেন যে নাৎসীরা "ধূর্ততার সঙ্গে সমগ্র দখলীকৃত ফ্রান্সকে একটি বিরাট শিল্পগত, বৈষয়িক ও কৃষিগত উৎপাদনের ক্ষেত্র হিসেবে" কাজে লাগাতে লাগলো।[১৯] আর সফলও হলো তারা একাজে। কেরনান লিখেছেন "সামরিক বিজয়কে তৎক্ষণাৎ একটা মুনাফা অর্জনের, লাভের কেন্দ্র হিসেবে কাজে লাগানোর অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে অর্থবিদরা যুদ্ধপূর্বকালে যা বলতেন তারা তা সম্ভব করে তুললো।"[২০]

অদখলীকৃত ফ্রান্সে নাৎসীরা সাহায্য সমর্থনের জন্যে নির্ভর করলো পেতাঁ সরকারের উপর। মার্শাল পেতাঁ সদর দপ্তর হিসাবে বেছে নিলেন একটা ছুটি কাটাবার জায়গা, ভিশীকে। এখানে দশই জুলাই উনিশ শ' চল্লিশ সমবেত হলেন কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য দেশ প্রেমিক সদস্যবাদে ফরাসী পার্লামেন্টের ডেপুটিরা। চরম আনুগত্যের সঙ্গে তাঁরা ফরাসী রাষ্ট্রের কবর খুঁড়ে তাকে সমাধিস্থ করলেন। প্রস্তাব নেওয়া হলো ফরাসী সাধারণতন্ত্রের বিলোপ সাধনের। সাধারণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার বদলে পেতাঁর নায়কত্বে গঠিত হলো একটি সামরিক একনায়কত্ব। তাঁর ভূমিকা অনুযায়ী কাজ করতে পেতাঁর বিশেষ বিলম্ব হলো না। এক ভাষণে তিনি বললেন:

"আমরা, ফিলিপ পেঁতা, ফ্রান্সের মার্শাল, দশই জুলাই উনিশ শ' চল্লিশের সাংবিধানিক আইনের পর্যালোচনায় ঘোষণা করছি যে আমরা ফরাসী রাষ্ট্র-প্রধানের কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করছি। তাই আমরা আদেশজারী করছি; পঁচিশে ফেব্রুয়ারী আঠারো শ' পঁচাত্তরের সংবিধানিক আইনের দুই নম্বর ধারা এতদ্বারা বাতিল করা হলো।"[২১] এই ঘোষণা ফ্রান্সের সংবিধান ও মানবিক অধিকারের ঘোষণার ক্ষেত্র প্রযোজ্য।

সন্ত্রাসবাদী ভিশী একনায়কত্বের লক্ষ্য ছিল ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিরোধ আন্দোলনকে ভেঙ্গে দেওয়া এবং ফ্রান্সের অদখলীকৃত অঞ্চলকে জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা।

ফরাসী বুর্জোয়া শ্রেণী তখন একটা জটিল রাজনৈতিক খেলায় মত্ত হয়েছিল। হিটলারের উপর একদিকে নির্ভর করে থাকলেও, তারা চেষ্টা করতে লাগলো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক শ্রেণীর সমর্থন লাভ করতে। পেঁতা সরকার জার্মাণদের অগোচরে একজন প্রতিনিধি পাঠালেন লণ্ডনে, উনিশ শ' চল্লিশের অকটোবর মাসে। তাঁর নাম লুই রোগিয়েরা। রোগিঁয়ের সাক্ষাৎ

করলেন স্যার উইলিয়াম ক্যাডোগ্যান, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও উইনষ্টোন চার্চিলের সঙ্গে। আঠাশে অক্টোবর এই আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটি ভদ্রলোকের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। সেই চুক্তিতে বলা হলো যে অদখলীকৃত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে নৌ-অবরোধ বৃটেন শিথিল করবেন, ভিশী সরকারের প্রতি তখনো আনুগত্যশীল উপনিবেশগুলিতে দ্য গলের দখল কায়েম করিতে বিলম্ব করা হবে এবং পেঁতা সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারের ধারাকে কিছুটা নরম করা হবে। প্রতিদানে পেঁতা সরকার বৃটেনের বিরুদ্ধে হিটলারী আক্রমণে জার্মাণীকে সাহায্যদানে বিরত থাকবেন ফরাসী নৌবহরকে জার্মাণীর নাগালের বাহিরে রাখা হবে, আফ্রিকায় ফ্রান্সের যুদ্ধ ঘাঁটিগুলিও অনুরূপভাবে জার্মাণ সৈন্য ব্যবহারের সুযোগ বঞ্চিত হবে। যে সমস্ত উপনিবেশ দ্য গলের অধীনে আছে তাদের উপর কোন দাবী করা চলবে না এবং যে দিন বৃটেনের পক্ষে ফ্রান্সের মাটিতে বিরাট সৈন্য বাহিনী অবতরণ করানো সম্ভব হবে সেইদিনই ফ্রান্সকে হিটলার বিরোধী সংগ্রামে সামিল হতে হবে।[২২]

রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁর ঘনিষ্ঠ পরামর্শদাতা অ্যাডমিরাল উইলিয়াম লিহাইকে পেঁতা সরকারের কাছে রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাঠালেন। লিহাইয়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চরম সাফল্য লাভ করলো ছাব্বিশে ফ্রেব্রুয়ারী উনিশ শ' একচল্লিশ সালে. যেদিন জেনারেল ওয়েগাঁর সঙ্গে মার্কিণ কূটনীতিবিদ্ মার্ফির একটা গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তির সর্ত্তানুযায়ী উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক বিষয়ে নানা সুযোগ সুবিধা দানের বিষয়ে পেঁতা সরকার সম্মত হলেন। বিনিময়ে এইসব উপনিবেশ ও অনধিকৃত ফ্রান্সে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নানা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল, তৈয়ারী জিনিষপত্র ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে সম্মত হলো।

ফ্রান্স পরাজয় স্বীকার করার পর জেনারেল দ্য গল লণ্ডনে ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি গঠন করলেন। সাতই জুলাই চার্চিল ও দ্য গলের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো যেখানে দ্য গলকে বৃটেনে একটা সশস্ত্র ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করার অধিকার দান করা হলো। বৃটিশ সরকার এই বাহিনীকে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুত হলেন। জেনারেল দ্য গল এই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। অবশ্য তাঁকে ইংরেজদের নির্দেশমতো কাজ করতে হবে। একটা অসামরিক শাসনব্যবস্থার কাঠামো

গড়ে তোলার জন্যেও তাঁকে সম্মতি দেওয়া হলো। বৃটিশ সরকার দ্য গলের সামরিক ও অসামরিক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করতে স্বীকৃত হলেন। এরই ফলে দ্যগলের সমস্ত কাজই বৃটিশ সরকারের সর্বোচ্চ শাসক গোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো।

নিজের ইচ্ছে ও দ্য গলের পক্ষে কাজ করতে গিয়ে বৃটিশ সরকার তেসরা জুলাই, উনিশ শ' চল্লিশে ওরানস্থিত ফরাসী নৌবহর দখল করার চেষ্টা করলেন এবং দিন কয়েক পরে আলেকজান্দ্রিয়াতেও অনুরূপ চেষ্টা করা হলো। কয়েকটি ফরাসী জাহাজ বশ্যতা স্বীকার করলো। কয়েকটির উপর বোমাবর্ষণ করা হলো। ডুবেও গেল কয়েকটি। উনিশ শ' চল্লিশের সেপ্টেম্বরে বৃটিশ সরকার ও দ্যগল যৌথভাবে গুরুত্বপূর্ণ ফরাসী নৌঘাটি ডাকার আক্রমণ করে, সেখানকার জাহাজগুলি দখল করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। কিন্তু কালক্রমে অনেক ফরাসী উপনিবেশই দ্য গলের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিল।

ফ্রান্সের জনগণ বিশ্বাসঘাতক বশ্যতাস্বীকারকারীদের চেষ্টায় হার মানতে বাধ্য হলেও সংগ্রাম করতে লাগলো প্রকৃত জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে। সেই সংগ্রামের পুরোভাগে এগিয়ে এলো ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি। দশই জুলাই, উনিশ শ' চল্লিশে এর কেন্দ্রিয় কমিটি মরিস তোরে ও জ্যাক দুক্লোর স্বাক্ষর সম্বলিত একটা ইশ্‌তেহার প্রচার করলেন। সেই ইশতেহারে বলা হলো; "ফ্রান্স অপমানিত হয়েছে, দখলে গেছে শত্রুদের, পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করছে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত ফ্রান্স ফিরে পেতে চাইছে তার স্বাধীনতা মুক্তি। আমাদের এই মহান জাতি কিছুতেই দাসত্ব করবে না। ফ্রান্স আরেকটা উপনিবেশ হয়ে থাকতে চায়না কারো। জনকয়েক ভৃত্যের দাসসুলভ আচরণের কাছে যারা যে কোন কাজ করতেই প্রস্তুত তাদের কাছে মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ফ্রান্স নতি স্বীকার করবে না। পরাজিত সেনানায়ক, ব্যবসায়ী আর কলঙ্কলিপ্ত রাজনীতিবিদ্‌দের প্রচেষ্টায় ফ্রান্সের হৃত গৌরব ফিরে আসবে না। জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি সম্ভব করে তুলতে পারে জনসাধারণ। তাদের উপরই সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। ফ্রান্সের পুনরুজ্জীবন, মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামের কেন্দ্র বিন্দু হবে একাগ্র, উদার, আত্মবিশ্বাসী, সাহসী ফরাসী শ্রমিকশ্রেণী।[২৩]

ইশ্‌তেহারে ফরাসী সাধারণ মানুষকে আহ্বান জানালো মুক্তি আন্দোলনে

শরিক হতে। এই উদার আদর্শের আহ্বানে, ত্যাগ ব্রতে তারা সাড়া না দিয়ে পারেনি। তাদের সম্মান রক্ষায়, বিবেকের ডাকে যেমন সাড়া তারা দিত, এই সংগ্রামের ডাকেও তাদের সাড়া এলো তেমনি।

১. আন্তর্জাতিক সামরিক আদালত, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২২৮-২৯
২. ঐ, পৃঃ ৭৯
৩. কুর্ট টিপলস্কার্চের জার্মাণ গ্রন্থ, বন ১৯৫৬, পৃঃ ৫৫
৪. উইনস্টোন চার্চিল : The Second World War, ১ম খণ্ড, লণ্ডন ১৯৪৯, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৬৭
৫. জার্মাণ জেনারেল ষ্টাফের সামরিক মহাফেজখানা হইতে সংগৃহীত।
৬. ফরাসী রচনা ১৯৫৪
৭. মিল্টন শূলম্যান : Defeat in the West. লণ্ডন ১৯৪৭, পৃঃ ৪২-৪৩
৮. কুর্ট টিপুলস্কার্চ, ঐ, পৃঃ ৯৮
৯. ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের জার্মাণ ভাষায় মূল রচনা, ষ্টাটগার্ট, ১৯১৫, পৃঃ ৩৫
১০. ফ্লোরিম বর্তে, পূর্বোল্লিখিত রচনা, পৃঃ ৩৪১
১১. টিপলস্কার্চ, ঐ, পৃঃ ৯০
১২. Documents on American Foreign Relations, দ্বিতীয় খণ্ড, বোষ্টন ১৯৪০, পৃঃ ৯০.
১৩. নিউ ইয়র্ক টাইমস, জুন ২৬, ১৯৪০.
১৪. ঐ.
১৫. ঐ.
১৬. The Ciano Diaries, 1939-1943, হিউ গিবসন সম্পাদিত, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬, পৃঃ ২৬৫
১৭. অটো বিনজার, জার্মাণ গ্রন্থ, বার্লিন ১৯৫৫, পৃঃ ১৭৫
১৮. ইতালীয় ভাষায় প্রকাশিত দলিল, Rinascita, সংখ্যা ২, ১৯৫৪, পৃঃ ১৯১
১৯. টমাস কেরনান : Report on France, লণ্ডন ১৯৪২, পৃঃ ১৫.
২০. ঐ, পৃঃ ৬৭.
২১. র‍্যাফেল লেমকিন : Axis Rule in Occupied Europe, ওয়াশিংটন ১৯৪৪, পৃঃ ৪০৫.
২২. লুই রোগীয়ের : ফরাসী গ্রন্থ, প্যারী ১৯৫৪, পৃঃ ৩০-৩১.
২৩. মরিস তোরে : ফরাসী গ্রন্থ, প্যারী ১৯৬০, পৃঃ ১৯৬

পঞ্চম অধ্যায়

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণের পর

ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ বৃটেনকে সংকটের মধ্যে এনে ফেললো। তখন জার্মাণীর মুখোমুখী বৃটেন একা। তাকে লড়াই করতে হবে সম্পূর্ণ নিজ সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে। ইংরেজ শাসকশ্রেণীর কাছে তা একটি নোতুন ব্যাপার, কখনো করেনি তারা সে কাজ। এটা তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বাইরের সাহায্য না পেলে সে জার্মাণীর চাপ সহ্য করতে পারবে না। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, চার্চিল ও তাঁর সরকার সময় পাওয়ার জন্যে সমস্ত ঘটনাবলীকে এমনভাবে পরিচালনা করতে লাগলেন যাতে সে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

যুদ্ধপূর্ব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে ইংরাজ শাসকশ্রেণী যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, বৃটেনের সংকট হলো তারই যথার্থ পরিণতি। খ্যাত-নামা মার্কিণ রাজনীতিবিদ হ্যারল্ড এল. ইক্‌ফেস্‌, বৃটেনের নীতি সম্বন্ধে আলোচনায় মন্তব্য করেছেন :

"কোন আশাপোষণ করার বিন্দুমাত্র কারণ না থাকলেও বৃটেনের আশা ছিল যে রাশিয়া ও জার্মাণীর মধ্যে লড়াই বাধিয়ে দিয়ে সে নিরাপদে দূরে সরে থাকতে পারবে। কিন্তু নিজের জালেই সে নিজে আটকে পড়লো, আর সেই জন্যে সমস্ত জগতের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি হারালো।"[১]

ফ্রান্সের পতনের পর নাৎসীরা প্রত্যাশা করেছিল যে বৃটেন অস্ত্র পরিত্যাগ করবে, না হলে অন্ততঃ শান্তির জন্যে সচেষ্ট হবে। কিন্তু তার সাড়া এলোনা বৃটেনের কাছ থেকে। সুতরাং জার্মাণ সমরপরিষদ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা সুরু করলেন। আক্রমণের কর্মসূচীও তৈরী হয়ে গেল যথাসময়ে। তার ব্যবহারিক নাম দেওয়া হলো সীলোয়ী (Seelowe) পরিকল্পনা বা সমুদ্র সিংহ পরিকল্পনা। একে জোরদার করার জন্যে রচিত হলো আরো দুটি পরিকল্পনা, স্পেন-জার্মাণ যৌথভিত্তিতে জিব্রাল্টার দখলের জন্যে ইসাবেল এবং পর্তুগালের বিরুদ্ধে ফেলিক্স পরিকল্পনা।

তখন সামরিক পরিস্থিতি বহুলাংশে জার্মানীর অনুকূল। ডানকার্কের পর, বৃটেন কার্যতঃ প্রতিরোধ শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। উত্তর ফ্রান্সে শত্রুর কাছে যে পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র তাকে পরিত্যাগ করে আসতে হয়েছে, তা তখনো সংগৃহীত, উৎপাদিত হয়নি। যুদ্ধের প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি হচ্ছে না। বৃটেনের যা কিছু সুবিধা তা হলো তার শক্তিশালী নৌবহরে। নৌশক্তির ঘাটতি জার্মাণী পূরণ করার চেষ্টা করলো বিরাট বিমানবাহিনী আর দূরপাল্লার উপকূলরক্ষী গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে।

ফ্রান্সের উত্তর ও পশ্চিম উপকূলে নাৎসীরা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ঘাঁটি নির্মাণ করে ফেললো। চ্যানেলের তীরে গড়ে ওঠা বিমানবন্দর আর বিমান অবতরণক্ষেত্র প্রস্তুত করে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তার বিমানবহর ব্যবহারের সুবিধা করে নিল। ফ্রান্সের বন্দরগুলি রূপান্তরিত হলো জার্মাণ নৌঘাঁটিতে। সেখানে জার্মাণীর ডুবো জাহাজ, নৌবিমান বাহিনী এবং অন্যান্য আক্রমণের প্রস্তুতি চললো। ফলে বাধা পেতে লাগলো বৃটেনের জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা ব্যবস্থা। বৃটেনের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য সম্পর্কে চার্চিলের মনে কোন উচ্চাশা ছিল না। তেইশে এপ্রিল, উনিশ শ' চল্লিশে হাউস অব কমন্সের এক গোপন অধিবেশনে তিনি স্বীকার করলেন যে, "উনিশ শ' চল্লিশে লাখ দেড়েক বাছাই করা সৈন্য অভিযান সুরু করলে, আমাদের দেশে দারুণ বিপর্যয় দেখা দিত।"[২]

হয়তো সে অবস্থায় কোন বৃটিশ পেতাঁর আবির্ভাব ঘটতে বিলম্ব হতো না। দ্য গল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন সে সময় বৃটেনের ওয়াকিবহাল মহলের লোকেরা "রাজনীতিবিদ, বিশপ, লেখক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নাম নিয়ে কানাকানি করতেন, যারা জার্মাণীর অধীনে থেকে দেশ শাসন করার জন্যে, জার্মাণীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাতে প্রস্তুত।"[৩]

ষোলই জুলাই, উনিশ শ' চল্লিশে জার্মাণ হাই কমাণ্ড, হিটলারের স্বাক্ষরযুক্ত ষোল সংখ্যক নির্দেশনামা প্রচার করলেন। তাতে বলা হয়েছিল :

"যেহেতু ইংল্যাণ্ড তার হতাশাব্যঞ্জক সামরিক অবস্থা সত্বেও কোন রকম আপোষ আলোচনা চালাতে এ' পর্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাই আমি ইংল্যাণ্ড অভিযানের জন্যে প্রস্তুতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং প্রয়োজন হলে তা করা হবে। এই অভিযানের সবচেয়ে বড় কারণ হলো জার্মাণীর বিরুদ্ধে

সম্ভাব্য যুদ্ধের ঘাঁটি হিসেবে গ্রেট বৃটেনকে ব্যবহার করতে না দেওয়া। এবং তার জন্যে প্রয়োজন হলে এই দ্বীপ দখল করে রাখা হবে।"[8] সীলোয়ী পরিকল্পনায় বলা বলা হয়েছিল প্রথম পর্যায়ে ত্রিমুখী অভিযান এবং পরে বৃটেন থেকেই সেই অভিযান পরিচালনার কথা।

নির্দেশনামা অনুযায়ী নাৎসীরা অভিযান উপযোগী ছোট জাহাজ নির্মাণের কাজে লেগে গেল। মাসখানেকের মধ্যেই একশ' আটষট্টিটি সৈন্যবাহী জাহাজ, উনিশ শ' দশটি রণতরী, চারশ উনিশটি শক্তিশালী ছোট জাহাজ এবং ষোল শ' মোটর বোট ইউরোপের উত্তর তীরে জমায়েত করা হলো। পরবর্তী সতের সংখ্যক পয়লা আগষ্টের নির্দেশনামায় হিটলার বৃটেনের বিরুদ্ধে সামগ্রিক আক্রমণ ও প্রচণ্ড জলযুদ্ধ সুরু করার আদেশ জারী করলেন। জার্মাণীর বৃটেন দখলীকরণ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল প্রতিরোধক্ষম সমস্ত মানুষকে হত্যা করে, বাকী লোকদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকে বৃটেনকে জার্মাণ উপনিবেশে পরিণত করা। দেশের সমস্ত সম্পদকে সরিয়ে দিতে বাইরে। এই নিপীড়ন ও শাস্তিমূলক পরিকল্পনা চেয়েছিল বেশ কিছু ইংরেজকে বিদেশে চালান করে দিয়ে অবশিষ্ট মানুষের সংখ্যা হত্যার নানা ফিকিরে ক্রমাগত কমিয়ে আনতে।

কিন্তু এরই মধ্যে জার্মাণীর শাসকচক্র ও সামরিক নেতারা আক্রমণের মূলে ধারাকে পশ্চিম থেকে পূর্ব সীমান্তে সরিয়ে আনার জন্যে প্রস্তাব সুরু করলেন ফ্রান্সের পরাজয় ও পতন জার্মাণীর যুদ্ধ ক্ষমতার অর্থনৈতিক বনিয়াদকে অনেক শক্তি যুগিয়েছিল। পরপর অনায়াস জয়লাভে জার্মাণ শাসকশ্রেণীর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল অনেক। তাঁরা প্রায় সুনিশ্চিত ছিলেন যে যাতেই হাত দেবেন, তা আয়ত্ত করতে তাঁদের বেগ পেতে হবেনা। সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনাকে তাঁরা এতোদিন স্থগিত রেখেছিলেন। এবারে সেটাই পেল প্রাথমিক গুরুত্ব ও মর্যাদা। যদিও নাৎসীরা এটাও জানতো নিঃসন্দেহে সোভিয়েতের সম্পদের পরিমাণ প্রচুর, এবং তার উপকরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে দিনের পর দিন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্তিত্বই সেদিন বৃটেনকে হিটলারী আক্রমণের বর্বরতার চাপ থেকে রক্ষা করেছিল। উইলিয়াম জেড, ফষ্টার তাই লিখেছেন: "লাল ফৌজ সম্পর্কে হিটলারের মনে যে ভীতি ছিল, শুধু সেটিই বৃটেনকে নাৎসী আক্রমণের জয়োল্লাস থেকে রক্ষা করেছে।"[৬]

॥ দুই ॥

সেই সময়ে সোভিয়েত সরকার নিজ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে তোলার জন্যে সাফল্যের সঙ্গে পর পর কয়েকটি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ব্যপৃত ছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া এবং এস্তোনিয়ার পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদিত হলেও (যার ফলে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে) এই তিনটি বাল্টিক দেশের আন্তানাস স্মেতোনা কার্লিস উলমানিস ও প্যাটসের ফ্যাশি অনুগামী শাসকচক্র তাদের সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তের নীতি পরিত্যাগ করেনি।

পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তি অনুযায়ী বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি সমস্ত সোভিয়েত বিরোধী জোট থেকে দূরে সরে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। কিন্তু সোভিয়েত বিরোধী বাল্টিক সামরিক আঁতাত পুনর্গঠিত করে তারা এই চুক্তির সর্ত ভঙ্গ করলো।

ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে বাল্টিক দেশগুলির ফ্যাশিপন্থীরা খুব আশান্বিত হয়ে উঠেছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল কোন দিন না কোন দিন সোভিয়েত-জার্মাণ যুদ্ধ বাধবে। ডিসেম্বর উনিশ শ উনচল্লিশ এবং মার্চ উনিশ শ' চল্লিশে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার শাসকশ্রেনী দু'টি গোপন সোভিয়েত বিরোধী বৈঠকে মিলিত হন। এরই পাশাপাশি চলে জনমতকে সোভিয়েত বিরোধী করে তোলার প্রচেষ্টা। বুর্জোয়া ল্যাটভিয়ার রাষ্ট্রপতি উলমানিস, দশই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' চল্লিশে, সেনা বাহিনীর উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে আগতপ্রায় "সংকটের মুহূর্তে' উপযুক্তভাবে প্রস্তুত থাকার জন্যে আহ্বান জানান। মার্চমাসে ফ্যাশিস্ত সংগঠন লিথুয়ানিয়ার সৌলীদের (Sauly) আহুত এক কংগ্রেসে বুর্জোয়া লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রপতি স্মেতোনা, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সক্রিয় হওয়ার জন্যে সমবেত মানুষকে আহ্বান জানান। স্লাভদের সম্পর্কে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্য স্পষ্টই প্রমাণ করে যে এই সবের প্রেরণা, উৎসাহ যোগাচ্ছে নাৎসীরা।

পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তি অনুযায়ী লিথুয়ানিয়ায় যে সোভিয়েত সামরিক সংস্থার অংশ বিশেষ স্থাপন করা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে নানা প্ররোচনামূলক

কাজ অনুষ্ঠিত হতে লাগলো পর পর। লিথুয়ানিয়ার সরকার সোভিয়েতের সেনাদলের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে বহু নিজ দেশের নাগরিককে গ্রেপ্তার ও শাস্তিদান করতে লাগলেন।

চোদ্দই থেকে ষোলই জুনের মধ্যে সোভিয়েত সরকার লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ার সরকারের কাছে পর পর কয়েকটি স্মারকলিপিতে পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তির ব্যতিক্রম ও সর্ত ভঙ্গের বিষয়গুলি উল্লেখ করে, কয়েকটি অত্যন্ত সঙ্গত দাবী পেশ করলেন। সেই দাবীগুলির একটি ছিল পূর্বোক্ত চুক্তি অনুযায়ী বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিতে সোভিয়েত সৈন্যরক্ষার পরিমাণবৃদ্ধি করতে হবে যাতে চুক্তির সর্তগুলি প্রকৃষ্টভাবে পালিত হয়। সোভিয়েতের দাবী স্বীকার করে নেওয়ায় পনের থেকে সতেরই জুনের মধ্যে সোভিয়েত সৈন্য বাল্টিক দেশগুলিতে প্রবেশ করলো।

ছাব্বিশে জুন, উনিশ শ' চল্লিশে সোভিয়েত সরকার বেসারোবিয়া ও উত্তর বুকোভিনার বিষয়ে রুমানিয়া সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সোভিয়েতের স্মারকলিপিতে বলা হলো যে "বর্তমানের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অতীত থেকে যে সমস্ত সমস্যা অমীমাংসিত হয়ে আছে তাদের সমাধানের প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করে তুলেছে।"[৭] উনিশ শ' আঠারো সালে রুমানিয়ার শাসকশ্রেণী যেদিন বিশ্বাসঘাতকতা করে বেসারেবিয়া দখল করেন, সেই থেকেই অমীমাংসিত হয়ে আছে। পূর্বের অবস্থায় বেসারেবিয়ার পুনঃস্থাপনের প্রশ্নটি "বুকোভিনার সেই অংশটির সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট সমর্পনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যার অধিকাংশ অধিবাসী সোভিয়েত ইউক্রেনের মানুষের সমভাষী সমজাতিগত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও একই ঐতিহ্যের ইতিহাসে লালিত।"[৮] তা ছাড়া বুকোভিনার সাধারণ মানুষ সেই উনিশ শ' আঠারো সালেই সোভিয়েত ইউক্রেনের সঙ্গে সংযুক্তির জন্যে মত প্রকাশ করে। কিন্তু আঁতাতের হস্তক্ষেপের ফলেই তা কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি।

রুমানিয়ার সরকারকে সোভিয়েতের এই ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করতে বাধ্য করা হলো। অটাশে জুন বেসারেবিয়া ও উত্তর বুকোভিনাকে রুমানিয়ার বোয়ার শাসনমুক্ত করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া হলো।

এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি এই

তিন দেশের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর ফ্যাশিবাদী মনোভাবকে সীমিত, সংযত করে রাখলো। এখানকার জনসাধারণ স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ করলো। তাদের পার্লামেন্টে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠার সংকল্প পুনর্ঘোষিত হলো। সর্বোচ্চ সোভিয়েতের কাছে তাঁরা আবেদন করলেন সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের অংশ হিসেবে তাদের গ্রহণ করতে। উনিশ শ' চল্লিশে আগষ্ট মাসের গোড়ায় রাশিয়ার সর্বোচ্চ সোভিয়েত এই অনুরোধ রক্ষা করলেন।

পূর্ব ইউরোপের এই সব ঘটনাবলীতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন বিব্রত, বিরক্ত হয়ে উঠলেন। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে সুরু করলেন তাঁরা এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বন্দরে বাল্টিক দেশগুলোর কোন জাহাজ এসে পৌঁছলে আটক করতে লাগলেন তাদের ওই সব দেশের "স্বার্থরক্ষার" অজুহাতে। আমেরিকার ব্যাঙ্কে এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার যে স্বর্ণ সঞ্চিত ছিল তাও আটক করা হলো মার্কিণ সরকারের আদেশে।

কিন্তু তা সত্বেও একথা দৃঢ়ভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায় যে ওই সব দেশের জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থের অনুকূলে, দেশের মানুষের সামগ্রিক ইচ্ছার প্রকাশ হিসেবেই ওখানকার ঘটনাবলী ঘটে যাচ্ছিল। হিটলারী আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্যেই সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পশ্চিম দিকে যতোটা সম্ভব অগ্রবর্তী করে রাখা হচ্ছিল। উনিশ শ' একচল্লিশের জুলাই মাসে সোভিয়েত সরকারের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে উইনস্টোন চার্চিল স্বীকার করেছিলেন যে "শত্রুকে অগ্রবর্তী পশ্চিম রণাঙ্গনে সৈন্য সমাবেশ ও যুদ্ধরত করে, সূচনাপর্বের সুযোগ সুবিধা ক্ষয় করে ফেলবার মাধ্যমে যে সামরিক সুবিধা তাঁরা লাভ করেছেন, "তাঁর গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছেন। এবং একথাও স্বীকার্য যে এতে বৃটেনের উপর সামরিক চাপ পরিবর্তিত হয়ে যায়। সোভিয়েতের নীতি তাকে রক্ষা করে। সোভিয়েতের এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জার্মাণীর বৃটেন অভিযান পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়। সেই সময়কার ঘটনাবলীর পর্যালোচনা করে, জেনারেল জোড্‌ল উনিশ শ' তিপান্ন সালে বলেন :

"অভিযানের সমস্ত খুঁটিনাটি তৈয়ারী হয়ে গেলেও আমরা বৃটেনে অবতরণ করতে সাহস করিনি। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ স্থগিত থাকায় মুহুর্তে, বৃটেনের

বিরুদ্ধে অভিযানে জড়িয়ে পড়ে জার্মাণ সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনার মুখে ঠেক দেওয়ার দায়িত্ব নিতে কেউ প্রস্তুত ছিলেন না।"[১০] যে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মাণী তার শক্তি সমাবেশ করেছিল, সেই সোভিয়েতের চরম শক্তিই হিটলার জার্মাণীকে বৃটেন অভিযান করতে নিবৃত্ত করলো।

সমকালের ঘটনাবলী আবার প্রমান করলো যে সোভিয়েত ইউনিয়নই হলো শান্তির স্বপক্ষে শ্রেষ্ঠ শক্তি। কিন্তু বৃটেনের নীতি তাতে বিশেষ পরিবর্তিত হলো না। তার সোভিয়েত বিরোধিতা চললো অব্যাহত। বৃটেনের প্রগতিশীল শ্রেণী সরকারের আত্মঘাতী জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নীতির কঠোর সমালোচনা করলেন।

বার্ণাড শ এই ঘটনায় মন্তব্য করেছিছেন: বিগত বিশ বছর ধরে আমরা রাশিয়া ও তার শাসকশ্রেণীকে চরম কালিমায় লিপ্ত করেছি তাঁদের বিরুদ্ধে চরম কুৎসা রটনা করেছি। আমাদের শাসক শ্রেণীর অধিকাংশই পুঁজিবাদী বলে জার্মাণীর সঙ্গে একযোগে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে রাশিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার চেয়ে আর কিছুই বেশি কাম্য বলে মনে করেন না। ঠিক যেমন বিসমার্ক থেয়ার্সের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্যারী কমিউনকে ধ্বংস করেছিলেন আঠারো শ' একাত্তর সালে। যতোদিন আমাদের মন্ত্রিসভার চেহারাটা এই রকম থাকবে, ততোদিন রুশ সরকারের পক্ষে আমাদের বিশ্বাস করা অসম্ভব। এবং সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো এই যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যিনি উনিশ শ' কুড়ি সালে শ্বেত জেনারেলদের অভিযানে অর্থ যুগিয়েছিলেন, তিনি রাশিয়ার বৃটিশ শত্রুদের মধ্যে একেবারে প্রথম সারির মানুষ।"[১১]

॥ তিন ॥

বৃটেনে অভিযানের পূর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সিদ্ধান্ত করে নাৎসী সমরনায়কের এই আক্রমণের সময়টাকে তাদের সামরিক প্রস্তুতির চরম লক্ষ্যের আবরণ স্বরূপ ব্যবহার করতে চাইছিলেন। কিন্তু এখন তাঁদের কাজের আরেকটা নোতুন লক্ষ্য এসে গেল। প্রথমতঃ এটিকে সোভিয়েত আক্রমণের আবরণ হিসেবে কাজে লাগানো যাবে। ন্যুরেমবার্গ বিচার সভায় অ্যাডমিরাল রেইডার বলেছিলেন যে "যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে নাৎসীবাদ।"[১২] আমেরিকা ও বৃটেনের সরকারী প্রচার যন্ত্র এটাকে

টেন দখলের যুদ্ধ বলে প্রচুর হৈ-চৈ করে সেই প্রতারণার সাহায্য করেছে। ার শক্তিবৃদ্ধি করেছে। উইনষ্টোন চার্চিল নিরলস উৎসাহে সেই ধারণাকে ্যারো বদ্ধমূল করেছেন। তিনি দাবী করলেন যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে নাৎসী াভিযান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কারণ রাজকীয় বিমানবহর জার্মাণ বিমান • াক্রমণকে ব্যাহত করে নাৎসীদের অবতরণে বাধা দিয়েছে। কিন্তু পরে ার্চিল স্বয়ং যথাযথভাবে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, "রাশিয়ার বিরুদ্ধে ামরিক সমাবেশ করার বিষয়টি চাপা দেওয়ার জন্যে হিটলারের পক্ষে বৃটেনের পর সমানে বিমান আক্রমণ চালানোটাই ছিল সোজা পথ।"[১৩]

বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জে জার্মাণ বিমান আক্রমণের অন্য উদ্দেশ্য ছিল সেখানকার ানগণকে ভয়ে অভিভূত করে তাদের শাসক শ্রেণীর সঙ্গে একটা সমঝোতার পথ ্রশস্ত করা। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করেছিলেন যে উভয়ের পক্ষে ্বিধাজনক পূর্বমুখী অভিযানের কোন পরিকল্পনায়, বৃটেনের একচেটিয়াপতিরা াদের সহযোগী হবে। ফ্যাসিস্ত দলে হিটলারের সহকারী রুডল্‌ফ হেস, এই ্দেশ্য নিয়েই উনিশ শ' চল্লিশের জুলাইয়ে একবার ম্যাসিদ ঘুরে এসেছিলেন। ্খানে থাকার সময়ে তিনি আলাপ আলোচনা করেন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত ও উইণ্ড- রের ডিউকের সঙ্গে। ডিউক সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠালেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ংল্যাণ্ডের রাজা ও উইনষ্টান চার্চিলের কাছে যেন তাঁরা শান্তির জন্যে উদ্যোগী ন।[১৪]

কিন্তু সেদিন বৃটেনের সাধারণ মানুষ হিটলারের জার্মাণীর সঙ্গে কোন ালাপ আলোচনায়, সন্ধিতে চুক্তিমত রাজী ছিলনা।

এরই মধ্যে জার্মানী যোগাযোগ স্থাপনের সাজসরঞ্জাম চ্যানেলের কূলে জমা রতে সুরু করেছে। কিন্তু স্থলবাহিনীকে সেইদিকে না পাঠিয়ে পাঠিয়েছে র্বদিকে পোল্যাণ্ডে। সোভিয়েত সীমান্ত থেকে অল্প দূরে তাদের সমাবেশ রা হচ্ছে। ভন্ বকের (Von Bock) সেনাবাহিনীকে জুলাই মাসের শেষে াঠানো হয়েছে পোজ্‌নানের দিকে। টিপলস্কার্চের মতে, "এটাই হলো োভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য সমাবেশের প্রাথমিক পর্ব ার স্বরূপ বোঝা গেল ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে। আর এই সমাবেশ ঘটতে টতে লাগলো অনেক সময়ের ব্যবধানে, যতোটা সম্ভব কারো নজরে না

পড়ে।[৩৫] জার্মাণ সৈন্যবাহিনীকে গড়ে উঠতে লাগলো নোতুন ডিভিশন, তৈরী হতে লাগলো সোভিয়েত আক্রমণের নানা সামরিক পরিকল্পনা।

নয়ই আগষ্ট, বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রথম বড়ো রকমের, বিমান আক্রমণের সুরুতে, নাৎসী সমর পরিষদ আউফবাউওস্ট (Aufbaust) নামে এক নির্দেশ-নামা জারী করলেন। সামরিক অভিযানের পিছনকার প্রস্তুতিই ছিল এই নির্দেশনামার বক্তব্য, সেখানে করতে হবে রেলপথের মেরামতি ও উন্নতিসাধন, মোটরপথ নির্মাণ, সেতুনির্মাণ, সৈন্য ব্যারাক, হাসপাতাল, বিমান অবতরণক্ষেত্র ও ডিপো নির্মাণ প্রভৃতি কাজ।

উনিশ শ' চল্লিশের নয়ই আগষ্ট থেকে উনিশ শ একচল্লিশের এগারোই মে পর্যন্ত, জার্মাণ বিমানবহর সমানে আক্রমণ চালিয়ে গেল ইংল্যাণ্ডের শহরগুলির উপর। তাদের সবচেয়ে প্রচণ্ড আঘাত নেমে এলো লণ্ডন, কভেন্ট্রি, ও বার্মিং-হামের উপর। অসামরিক ক্ষয়ক্ষতিই তাতে হলো সবচেয়ে বেশি। ফ্যাশিস্তদের এই নৃশংস বর্বর অভিযান ক্ষিপ্ত করে তুললো ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষকে, লৌহ কঠোর করে তুললো তাদের যুদ্ধের শেষ পরিণতি দেখার সিদ্ধান্তকে। বৃটেনের সাধারণ মানুষের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া যতো দিন গেল ক্রমেই অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগলো। তাদের উদ্যম যেন বাড়তে লাগলো ক্রমাগত। বৃটেনের মানুষকে ভয়ে আতঙ্কে অভিভূত করে ফেলতে জার্মাণীর সমস্ত প্রচেষ্টাই দারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। বরং তাদের আক্রমণ বৃটেনের মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা ও ইচ্ছাকে ইস্পাতের মতো দৃঢ় করে দিল। ফ্যাশিবাদের প্রতি তাদের ঘৃণা, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় তাদের অনমনীয় সংকল্প, এবং সেই উদ্দেশ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মানসিক দৃঢ়তা, এই সব মিলে গিয়ে সমকালের ঘটনাবলীকে প্রভাবিত করতে লাগলো।

বিমান আক্রমণের পাশাপাশি, জার্মাণ সমর পরিষদের আদেশে ডুবোজাহাজ আর যুদ্ধ জাহাজ বৃটেনের চারপাশে গড়ে তুললো সামুদ্রিক অবরোধ। অবরোধের দায়িত্ব প্রথমে ছিল পাঁচটি ক্রুইজারের উপর। পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিল ছোট ক্রুইজার অ্যাডমিরাল শীর (Admiral Scheer) এবং দুটি যুদ্ধজাহাজ, স্কার্নহোর্ষ্ট (Scharnhorst) আর গ্নেইসেনাউ (Gneisenan)। উনিশ শ একচল্লিশের বসন্তকালে অবরোধকারী নৌবাহিনীকে আরো শক্তিশালী করা হলো নোতুন বড়ো ক্রুইজার প্রিন্স ইউজেন (Prince Eugen) এবং

জার্মাণীর সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধজাহাজ বিসমার্ককে (Bismarck) যুক্ত করে দিয়ে। সর্বত্র প্রচণ্ড আঘাত আসতে লাগলো বৃটেনের জলযানের উপর। জার্মাণ ডুবোজাহাজ আর যুদ্ধজাহাজের যৌথ আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে পরতে লাগলো তারা, ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পেতে লাগলো দিনের পর দিন। নাৎসীরা দাবী করতে লাগলো উনিশ শ' চল্লিশের জুন থেকে পরের বছরের জুন মাস পর্যন্ত এই বারো মাসে তাদের ডুবোজাহাজ নষ্ট করেছে বৃটেনের তিরিশ লক্ষ টন জলযান, আরো দশ লক্ষ টন বিনষ্ট হয়েছে যুদ্ধজাহাজ আর বিমানের আঘাতে।

কিন্তু বৃটেনও সুরু করলো পাল্টা আক্রমণ। ফরাসী বন্দর ব্রেস্তে (Brest) রাজকীয় বিমানবহর অবরোধ করলো স্কার্নহোর্ষ্ট আর গ্নেইসেনাউকে। ছাব্বিশে মে বৃটিশ ক্রুইজার হুড (Hood) জার্মাণ নৌবহরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জলমগ্ন হওয়ার পূর্বে প্রচণ্ড আঘাত হানলো যুদ্ধজাহাজ বিসমার্কের উপর। তিন দিন পরে বৃটিশ নৌবহর ব্রেস্ত বন্দরের চারশ' মাইল পশ্চিমে জলমগ্ন করলো বিসমার্ককে। জার্মাণ নৌবহরের কাছে এটা ছিল একটা মর্মান্তিক ক্ষতি।

বৃটেনের পরাজয়ের সম্ভাবনায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সেই সময়ে অত্যন্ত আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। বৃটেনের আত্মসমর্পণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তায় একটা গভীর সংকট ডেকে আনবে। মার্কিণ সরকারের উদ্বেগের মূল কারণ ছিল বৃটিশ নৌবহরের ভবিষ্যৎ। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট চার্চিলের কাছে এই আশ্বাস চাইলেন যে কোনমতেই বৃটিশ নৌবহরকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হবে না। তাঁর প্রথম এই জাতীয় অনুরোধ আসে উনিশ শ' চল্লিশের জুলাই মাসে। কিন্তু মার্কিণ একচেটিয়া কারবারীরা মুনাফার এই সুযোগ নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাতে কসুর করলেন না।

মার্কিণ শাসকরা পশ্চিম গোলার্দ্ধে নিজেদের অবস্থান সুরক্ষিত করতে সুরু করলেন। লাতিন আমেরিকার সাধারণতন্ত্রী দেশগুলির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠক বসলো হাভানায়, উনিশ শ' চল্লিশের বাইশে-তেইশে জুলাই। তার পরিণতি হলো লাতিন আমেরিকার দেশগুলি মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী শৃঙ্খলে আরো দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে গেল। সরকারীভাবে আলোচনা স্থচীর অন্তর্গত বিষয়গুলি ছিল নিরপেক্ষতা, পশ্চিম গোলার্দ্ধে শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা।[১০] কিন্তু এসবের পিছনে ছিল এই সব দেশের অর্থনীতি, সেনা-

বাহিনী ও বৈদেশিক নীতির উপর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব কায়েম করা ও ল্যাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে বৃটিশ প্রভাবের অবসান ঘটানো। উনিশ শ' চল্লিশের আঠারোই আগষ্ট নিউইয়র্কের সন্নিকটে ওগডেনসবার্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হলো, তারই সাহায্যে মার্কিণ সাম্রাজ্য-বাদীরা কানাডার সমগ্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করলো।

ডানকার্কের পরে বৃটেনে অস্ত্রশস্ত্রে যে মারাত্মক ঘাটতি দেখা যায় তাকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের উপর চাপ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে লাগলো। মার্কিণ সরকার বৃটেনের প্রয়োজনীয় সমস্ত অস্ত্রশস্ত্রই সরবরাহ করতে সম্মত হলেন, কিন্তু সেই সম্মতির সঙ্গে যোগ করা হলো কতকগুলো সুদূরপ্রসারী দাবী। প্রতিদানে বৃটেনকে দিতে হবে তার সর্বাধুনিক কারিগরী কলাকৌশল ও গবেষণার ফল এবং অতলান্তিকের গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাটির অধিকার। চার্চিল সরকার মার্কিণদের এই সর্ত মেনে নিলেন। "যখন উইনষ্টোন চার্চিল বুড়ো আঙুল তুলে সর্বত্র গর্বভরে বলে বেড়াচ্ছেন যে জার্মাণীর বিরুদ্ধে তাঁরা একাই সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন ঠিক সেই সময়েই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একেবারে পদানত হয়ে আত্মসমর্পণ তিনি কেমন করে করলেন সেই তত্ত্ব বোঝা ভার।"[১৭]

বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্কের এই সূত্রে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত কাজ গুছিয়ে নিল। সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের সঙ্গে লাভ হলো তার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—রাডার যন্ত্র, বিমানের ইঞ্জিন ১৮২০ ইত্যাদি।[১৮] বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী আর. এইচ. ফাউলার আণবিক গবেষণায় বৃটিশ ও ফরাসী-বিজ্ঞানীদের সমস্ত তথ্যাদি নিয়ে হাজির হলেন মার্কিণ দেশে সরকারী নির্দেশে। কিছুদিন পরে আরেকজন বৃটিশ পদার্থবিজ্ঞানী জর্জ প্যাজেট থমসন, ইউরেনিয়াম বোমা তৈয়ারী পরিকল্পনার একটা কাঠামো পেশ করলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে যার সঙ্গে ছিল প্লুটোনিয়াম প্রস্তুত প্রণালীর রিএ্যাক্টর গঠনের তথ্য। ইউরেনিয়াম—২৩৫ উৎপাদনের একটি গ্যাস নির্গমনকারী যন্ত্র নির্মাণের চূড়ান্ত বৃটিশ পরিকল্পনাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হাতে এসে পোঁছলো।

দোসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে একটি চুক্তির মাধ্যমে অতলান্তিকে বৃটিশ নৌঘাটিগুলি নিরানব্বই বছরের জন্যে বিনা ভাড়ায় আমেরিকাকে লীজ দেওয়া হলো। এইভাবে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিমান ও নৌঘাটিগুলি এসে

পড়লো আমেরিকার নিয়ন্ত্রণের অধীনে। অতলান্তিক মহাসাগরে শক্তির ভারসাম্য রীতিমতো ঝুঁকে পড়লো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুকূলে।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড, বারমুডা, বাহামা, জ্যামাইকা, সেন্ট লুসিয়া, ত্রিনিদাদ, অ্যান্টিগুয়া ও বৃটিশ গিয়ানার সামরিক ঘাটিগুলি এসে গেল আমেরিকার দখলে। সাফল্যের এই ব্যাপকতায় মার্কিণ দেশের নেতৃবৃন্দ হকচকিয়ে গেলেন। কংগ্রেসে প্রেরিত এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বললেন : "পশ্চিম গোলার্দ্ধের কাছে নিরাপত্তা বিধায়ক এইসব ঘাটিগুলির গুরুত্ব, মূল্য অপরিসীম। আমাদের দেশ দীর্ঘ দিন ধরে তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এসেছে।...সেই কারণে আমি বর্তমান সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের দখল করেছি।"[১৯]

চুক্তিতে আরো বলা হলো কোন অবস্থাতেই বৃটেন তার নৌবহরকে আত্ম-সমর্পণ করতে বা শক্তিহানি ঘটতে দেবে না। সাগর পেরিয়ে প্রয়োজন মতো সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলের নিরাপত্তারক্ষায় তাদের ব্যবহার করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

কিন্তু এতো দিয়ে প্রতিদানে বৃটেন পেল কি? সর্বসাকুল্যে পেল পঞ্চাশটি ডেষ্ট্রয়ার আর পশ্চিম গোলার্দ্ধে বৃটেনের স্বার্থরক্ষায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি। মার্কিন নেতারা যথারীতি নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করলেন। বৃটেনকে তাঁরা যে পঞ্চাশটি ডেষ্ট্রয়ার দিলেন তাদের বাতিল করে দেওয়ার ঠিক ছিল অকেজো হয়ে পড়ার জন্যে। আমেরিকার বুর্জোয়া অনুসন্ধানকারীর দল আজো পর্যন্ত সেদিনের নেতৃবৃন্দের দক্ষতার প্রশংসায় উল্লসিত বোধ করে। মরিস ম্যাটলোফ্ ও এডুইন স্নেল লিখেছিলেন :

"এই ক্ষমতা তিনি (মার্কিণ রাষ্ট্রপতি) পশ্চিম গোলার্দ্ধে দীর্ঘকালীন বৃটিশ ঘাটিগুলি ব্যবহার অধিকারের বিনিময়ে পঞ্চাশটি পুরানো ডেষ্ট্রয়ার দিয়ে বৃটেনকে রাজী করিয়ে চরম দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিলেন।[২০] অবিশ্যি এইগুলি ছাড়া উনিশ শ চল্লিশের শেষে বৃটেন পেয়েছিল নয়লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার রাইফেল আর চুরাশি হাজার মেশিনগান। আমেরিকার একচেটিয়া কারবারী-দের কাছে এই অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানীও ছিল চরম লাভজনক। বৃটেন এর দাম দিল নগদ টাকায়, তার বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল আর স্বর্ণ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার থেকে। ফলে পরিণামে বিদেশে তার পুঁজি লগ্নী করার ক্ষমতাও গেল কমে।

উনিশ শ' একচল্লিশের গোড়ার দিকে বৃটেনের টাকাকড়ির অবস্থা খারাপ

হয়ে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিণ একচেটিয়া কারবারীরা যুদ্ধকালীন প্রতিযোগীতাবিহীন ইংল্যাণ্ডের বাজারে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের রপ্তানীর এই মহা লাভজনক সূত্রটি ধরে রাখতে চাইলো। তাছাড়া জার্মাণীর আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত ফ্রান্সকে দেখে, মার্কিণ দেশের আশংকা আরো বেড়ে গেল। বৃটেন ও অন্যান্য দেশগুলি নাংসী আক্রমণ প্রতিহত করুক এটাই ছিল তাদের ইচ্ছা তারই ফলশ্রুতি হলো মার্কিণ সরকারের লেণ্ড-লীজ কর্মসূচী (Lend lease Scheme), যাতে রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হলো সেই সব দেশকে উৎপাদিত দ্রব্য ও অন্যান্য জিনিষ দিয়ে সাহায্য প্রদানের ক্ষমতা যাদের প্রতিরক্ষা তিনি মনে করবেন "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন"। লেণ্ড-লীজ আইন কংগ্রেস সভায় গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর লাভ করলো এগারোই মার্চ, উনিশ শ' একচল্লিশ সালে। কর্মসূচী চালু করতে কংগ্রেস ব্যয়-মঞ্জুর করলেন সাত শ' কোটি ডলার।

এইভাবে উনিশ শ' চল্লিশের শেষার্দ্ধ আর একচল্লিশের প্রথম ভাগে গড়ে উঠলো ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি জোট। বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একত্র হলো জার্মাণী ও জাপানের কাছে তাদের উভয়ের সমান বিপদের আশংকায় এবং পৃথিবীর বাজার থেকে জার্মাণী ও জাপানের প্রতিযোগিতাকে অবসান করার সমান ইচ্ছার প্রয়োজনের তাগিদে। কিন্তু আমেরিকার মতলব ছিল আরো সুদূর প্রসারী। কেবলমাত্র জার্মাণী ও জাপানের বাজার পুনর্বণ্টনের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ না রেখে তার লক্ষ্য ছিল বৃটেনের বাজার ও পুনর্বণ্টন করা। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে ডরোথী থমসন সেই ধরণের মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছিলেন যে সমগ্র অ্যাংলো সাক্সন দুনিয়ার সংহতি সাধনের স্বপ্ন তিনি দেখছেন, কারণ সেই সংহতিতে কার ভূমিকা অগ্রগণ্য হবে সে বিষয়ে তাঁর মনে কোন অস্পষ্টতা নেই। সেই অ্যাংলো সাক্সন সংহতির কেন্দ্রভূমি হবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কারণ সেখানেই সমাবেশ ঘটেছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে শ্রেষ্ঠ সামরিক ও নৌশক্তির শ্রেষ্ঠ শিল্পবিকাশ ও কারিগরী জ্ঞানের।

মিউনিক নীতির অনিবার্য, স্বাভাবিক ও মারাত্মক পরিণতির ফলে বৃটেনের আন্তর্জাতিক মর্যাদার এই ঘাটতি, তখন প্রকট হয়ে উঠেছে। এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই সেই পরিস্থিতির চরম সদ্ব্যবহার করেছে, নিজের চরম স্বার্থ সিদ্ধির প্রেরণায়। ইঙ্গ-মার্কিণ জোটে তার নেতৃত্বের দাবী তখন অবাধ, অপ্রতিরোধ্য,

দুর্বার বেগে এগিয়ে গেল সে, পিছনে পড়ে রইলো বৃটেন অমর্যাদায় "ছোটতরফ" হিসেবে।

॥ চার ॥

ইউরোপের যুদ্ধ প্রশান্ত মহাসাগরের জটিলতাকে আরো জটিল করে তুললো। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের তোড়জোড় করেছিল বেশ কিছুকাল ধরে। প্রথম মহাযুদ্ধের মতো এবারেও তারা তাদের উচ্চাভিলাষী বিজয় অভিযান সুরু করতে উদগ্রীব অনুকূল পরিবেশের মধ্যে। জাপানের শাসক গোষ্ঠীর মনের কথা প্রকাশ করে, জাপানী দৈনিক পত্রিকা হোচি লিখলো তেইশে ডিসেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে :

"ইউরোপের সামরিক সংঘর্ষ জাপানের পক্ষে একটা স্বর্গীয় আশীষের মতো যা তাকে সাহায্য করবে। কিন্তু তা বলে এই স্বর্গীয় আনুকূল্য চিরদিনই থাকবে মনে করে বসে থাকা হবে মূর্খতার নামান্তর মাত্র। জাপান চেষ্টা করবে হয় এই সুবাতাসকে জোরদার করতে না হলো শেষ করে দিতে সম্পূর্ণ ভাবে।" পাঁচ দিন পরে হোচি আবার ঘোষণা করলো :

"পূর্ব এশিয়ায় যে নোতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজ আমরা আগেই সুরু করেছি, এই যুদ্ধ এনে দিয়েছে তাকে প্রশস্ত করার চাবিকাঠি। এই অর্থেই আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যে এই যুদ্ধ শক্তি সঞ্চয়ের দ্বারা শত্রুক্ষয়ের যুদ্ধে পরিনত হোক।"

নেদারল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পরাজয় এবং আত্মসমর্পণের ফলে সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের উপনিবেশ ইন্দোনেশিয়া ইন্দোচীন পড়ে রইলো শক্তিহীন, প্রভুহীন অবস্থায়।

চিরকালই তার রবার, কয়লা, লোহা, দস্তা, টিন, সোনা রূপার সম্পদের জন্যে ইন্দোচীন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রলুব্ধ করে এসেছে। কিন্তু এখন যা জাপানকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করলো তা হলো ইন্দোচীনের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অবস্থিতি। তার বন্দরগুলি দাক্ষণ দিকে সমুদ্রের বুকে ঝুঁকে আছে অনেকখানি, জাপানের পক্ষে সেই প্রলোভন জয় করা শক্ত। ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ মালয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অভিযানে সেগুলি হবে সুন্দর সামরিক ঘাটি।

তেইশে সেপ্টেম্বর 'উনিশ শ' চল্লিশে জাপান ইন্দোচীনে তার সেনাবাহিনী নিয়ে আসার জন্যে ভিশী সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি করলো। হিটলার জার্মাণীর আনুকূল্যেই এটি সম্ভব হয়েছিল। কারণ হিটলার তাঁর মিত্রপক্ষ জাপানের সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তুলতে চাইছিলেন। ইন্দোচীনের জনসাধারণ এতোদিন ধরে যারা ফরাসী মালিকদের ঔপনিবেশিক দাসত্বে অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে বসবাস করেছিল, তাদের বিকিয়ে দেওয়া হলো আরেক নোতুন প্রভুর কাছে, নৃশংসতায়, অত্যাচারে যে কারো চেয়ে কম যায় না।

জাপান তখন ইন্দোনেশিয়ার রবার, তৈলখনি, লৌহ ছাড়া অন্যান্য খনিজ পদার্থ এবং কয়লা সম্পদের দিকে উদগ্রলালসায় লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে। ইন্দোনেশিয়া সামরিক গুরুত্বের এক যোগসন্ধিতে অবস্থিত। জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করতে পারলে বৃটেন ও ফ্রান্স দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। সিঙ্গাপুরের গুরুত্বহানি ঘটবে। সিঙ্গাপুরের পূর্বদিকে সমগ্র বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল জাপানী অভিযানের সামনে অরক্ষিত হয়ে পড়ে থাকবে। ইন্দোনেশিয়া দখল করে জাপান উপস্থিত হবে একেবারে ব্রহ্মদেশ ও ভারতের দ্বারপ্রান্তে। আর ফিলিপাইনের প্রবেশপথ হয়ে যাবে অবরুদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের ভবিষ্যতও অন্ধকারাচ্ছন্ন। শুধু এই কারণের জন্যই ইন্দোনেশিয়ায় জাপানের দাবী বৃটেন ও আমেরিকার চরম প্রতিকূলতার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দ্রুত পরিবর্তিত হতে লাগলো।

ইঙ্গ-মার্কিন জোটের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধের আশংকা তখন ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে।

কিন্তু জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সামরিক শক্তি তখনও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ব্যাপৃত। স্বভাবতই শক্তি সংগ্রহ ও পুনর্বিন্যাস করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করতে জাপানের তাই আরো কিছু দিন সময় লেগে গেল। ইউরোপেও যেমন, দূর প্রাচ্যেও তেমনই, পররাষ্ট্র আক্রমণের প্রধান অন্তরায় হয়েছিল সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন।

জাপানী অভিযানের দ্বিতীয় বাধা ছিল চীনের সঙ্গে তার সংঘর্ষ। যাতে জাপানের সামরিক শক্তির বেশ একটা বড়ো অংশ তখন আটকে আছে। জাপানের শাসনকুল চাইলেন সেই যুদ্ধ দ্রুত সমাধা করে ফেলতে। চীনের

অধিকৃত অঞ্চল তাই তাঁরা গঠন করলেন বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী ওয়াংচিং ওয়েই'য়ের অধীনে এক ক্রীড়নক সরকার। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল যে চীনের জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীর একটা অংশ যারা যুদ্ধের দুর্বিপাকে পড়ে আতংকগ্রস্ত হয়েছে এবং জনগণের কার্যকলাপ যাদের আরো শংকিত করে তুলছে, তারা নিশ্চয়ই এই "সরকারের" প্রতি আকৃষ্ট হবে। তারই সঙ্গে জাপান চেষ্টা করতে লাগলো চীনের যুদ্ধ অবসান করার জন্যে তার মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির সাহায্য নিতে। কুওমিন্টাং সরকারের কাছে জাপানের শান্তি স্থাপনের প্রয়াস ইটালী ও জার্মাণীর সুপারিশ লাভ করলো।

চিয়াংকাইশেকের ইতস্তত ভাব দেখে, মার্কিণ সরকার প্রমাদ গুণলেন। ওয়াশিংটনস্থিত চীন রাষ্ট্রদূতকে তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে জাপানের সঙ্গে চীনের কোন আলাপ আলোচনায় তাঁদের কোন অনুমোদন নেই। চীন জাপানের যে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে এই মর্মে সুনিশ্চিত আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত চীনকে আর কোন ঋণ দান করা হবে না। আমেরিকার রাজনৈতিক চাপ ও জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে চীনের জনগণের দৃঢ় সংকল্প, এই দু'য়ে মিলে চিয়াং কাইশেককে জাপানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করলো।

কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রে এরই জন্যে নিজেদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করার সুদূরতম ইচ্ছাও জাপানী শাসকশ্রেণীর মনের কোণে ছিল না। তাঁরা দেশের অর্থনৈতিক শক্তির পূর্ণ সমাবেশের উদ্দেশ্যে, জাতীয় অর্থনীতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে কায়েম করলেন যাতে কাঁচামালের ভোগ ব্যবহার, বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কমিয়ে আনা যায়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে "নোতুন অর্থনৈতিক কাঠামো" নামে চালু করা হলো।

জাপান শুধু মাত্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধেই সমরায়োজন করলো না। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণও তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু হাসান হ্রদ ও হালখিন গোলের যুদ্ধে সোভিয়েতের কাছে তার যে শিক্ষা হয়েছিল, তাতে নাৎসী জার্মাণীর পূর্বে সোভিয়েত আক্রমণ তার অভাবিত ছিল। কিন্তু তার প্রস্তুতি এর মধ্যে চলতে লাগলো পুরোদমে। জাপানী সমর পরিষদের হাতে উনিশ শ' চল্লিশেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা পূর্ণ অনুমোদিত ও প্রস্তুত ছিল।

জাপানের আক্রমণ প্রচেষ্টা সুরু করার সময় এমনভাবেই ঠিক করা হলো যেন জার্মাণী ও ইটালীর অনুরূপ প্রচেষ্টার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য থাকে। ফলে এই তিন আক্রমণকারী তাদের কাজের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

সাতাশে সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে জার্মাণী, জাপান আর ইটালী বার্লিনে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। চুক্তির প্রস্তাবনায় বলা হলো যে এই ত্রিশক্তি "বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া ও ইউরোপীয় অঞ্চলে, তাদের মৌল লক্ষ্যের সিদ্ধিতে এক নোতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে পরস্পরকে সাহায্য করতে, সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবে।"[২১]

তারপর চুক্তির বিভিন্ন ধারায় বলা হলো :

"১। ইউরোপ এক নোতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় জাপান, জার্মাণী ও ইটালীর নেতৃত্বের ভূমিকাকে স্বীকার করেছে এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

২। পূর্ব এশিয়ায় এক নোতুন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায়, জার্মাণী ও ইটালী, জাপানের নেতৃত্বের ভূমিকাকে স্বীকার করছে এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।

৩। উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টায় জার্মাণী, জাপান ও ইটালী পরস্পরকে সাহায্য করতে, সহযোগিতা করতে সম্মত। যদি বর্তমানে ইউরোপীয় যুদ্ধ বা চীন-জাপান যুদ্ধে লিপ্ত নয় এমন কোন শক্তির দ্বারা এই ত্রিশক্তির কোন এক শক্তি আক্রান্ত হয়, তাহলে তারা পরস্পরকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকছে।

... ...

৫। জার্মাণী, ইতালী ও জাপান ঘোষণা করেছে যে চুক্তির উল্লিখিত সর্তাবলী তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার যে রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে তাকে কোন মতে ব্যাহত করছেনা।"[২২]

বার্লিন চুক্তি ছিল প্রাক্তন "কমিন্টার্ণ বিরোধী মৈত্রীর" একটা সম্প্রসারণ মাত্র। কিন্তু এবারে চুক্তিতে অংশগ্রহণকারীরা তাদের স্বরূপ প্রকাশ করা সঙ্গত মনে করলেন। বিশ্ববিজয়ের উদ্দেশ্যকে গোপন রাখতে কোন আর প্রয়োজন মনে করলেন না তাঁরা, আর সেই উদ্দেশ্য সফল হলে কেমন করে সাম্রাজ্য বণ্টন করা হবে চূড়ান্তভাবে তা জানাতেও কোন দ্বিধা রইলো না তাঁদের। ইউরোপে দাবী জানালেন জার্মাণী ও ইটালী, আর এশিয়ায় জাপান। বিন্দুমাত্র সংকোচ না

করে তাঁরা জানালেন তাঁদের "নোতুন ব্যবস্থা" প্রতিষ্টার লক্ষ্য, যার প্রকৃত তাৎপর্য হলো বিজিত দেশগুলির উপর ঔপনিবেশিক দাসত্ব কায়েম করা।

বার্লিন চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। চুক্তির পঞ্চম ধারায় বাগ্‌বিন্যাস যাই থাক না কেন, তার আসল উদ্দেশ্য তাতে চাপা থাকলো না, তদাণীন্তন জাপানের প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কোনোয়ে (Prince Konoye) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে প্রকাশিত তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন যে বার্লিন চুক্তি ছিল "তখনকার চালু ত্রি-পাক্ষিক কমিন্টার্ণ বিরোধী চুক্তিকে প্রধানত সোভিয়েত বিরোধী একটা সামরিক মৈত্রীতে রূপান্তরিত করা।"[২৩]

তাদের পারস্পরিক বার্লিন চুক্তির দায়িত্ব পালনের জন্যে জার্মাণী ইটালী ও জাপান নিজেদের যুদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ আলোচনা চালাতে লাগলেন। ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' একচল্লিশে রিবেনট্রপ জার্মাণীর পরিকল্পিত সোভিয়েত আক্রমণ সম্পর্কে জাপানীদের অবহিত করতে গিয়ে জানালেন যে "এর ফলে হবে জার্মাণীর চরম জয়লাভ ও সোভিয়েত শাসনের অবসান।"[২৪]

কিন্তু বার্লিন চুক্তির লক্ষ্য শুধুমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই ছিল না। এমন কি কমিন্টার্ন বিরোধী চুক্তির চেয়েও খোলাখুলিভাবে এটা ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন বিরোধী। এই সবদেশের শাসকশ্রেণীর প্রতি এটা ছিল একটা নোতুন আঘাত, যা সঙ্গে সঙ্গেই মিউনিক নীতির প্রবক্তাদেরও আঘাত করেছিল। তাই বার্লিন চুক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের রাজনীতিকদের সচকিত করে তুললো। উনত্রিশে ডিসেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে রুজভেল্ট এক বেতার ভাষণে বললেন যে, "জেমস টাউন ও প্লিমথ রকের ঘটনার পর থেকে আমাদের মার্কিণ সভ্যতা এমন বিপদের সামনে আর কখনো পড়েনি।"[২৫] সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সামনার ওয়েলস বললেন যে "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মানুষ তাদের দেড়শ বছরের স্বাধীন জীবনে এর চেয়ে বড়ো কোন বিপদের মুখোমুখি কখনো হয়নি।"[২৬]

পরিস্থিতির চাপে মার্কিণ রাজনীতিকেরা বৃটেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হলেন। মার্কিণ নৌ সচিব কর্ণেল ফ্রাঙ্ক নক্স বললেন যে বৃটেন যদি আক্রমণের এই জোয়ার প্রতিহত করতে না পারে তাহলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এমন এক লুটেরা দলের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বে "যাদের সবচেয়ে বড়ো বিজয় সাফল্য হবে যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংস সাধন।"[২৭] ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির প্রথম রণকৌশল-গত পরিকল্পনা উনিশ শ' চল্লিশের নভেম্বরের মধ্যেই সম্পূর্ণ করে রাখা হলো

তাতে স্পষ্ট করে বলা হলো, বৃটেনের প্রতিরক্ষা মার্কিণ দেশের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই কারণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের পরাজয়ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধনের বিরুদ্ধে আপ্রাণ চেষ্টা করবে।[২৮]

উনিশ শ' চল্লিশে অক্টোবর মাসের সুরুতেই মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব হাল, ওয়াশিংটনস্থিত বৃটিশ ও অষ্ট্রেলিয়া রাষ্ট্রদূতদ্বয় যথাক্রমে লোথিয়ান ও কেসীর মধ্যে আলাপ আলোচনার পরিণতিতে স্বাক্ষরিত এক ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তিতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যৌথ প্রচেষ্টার কথা স্বীকৃত হলো। সিঙ্গাপুরের নৌঘাটি এবং অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের বন্দরগুলি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দিতে বৃটেন স্বীকৃত হলো। প্রতিদানে যুক্তরাষ্ট্র অষ্ট্রেলিয়া থেকে ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে সৈন্য পাঠানোর সাহায্য করতে এবং প্রশান্ত মহাসাগরে একটি বড়ো নৌবাহিনী মোতায়েন রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। আলোচনাকারীরা ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে চীনদেশে সামরিক দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্যে একটা সরাবরাহ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সিদ্ধান্ত নিলেন।

উনিশ শ' চল্লিশের জুলাই মাসে জাপানকে সন্তুষ্ট করার জন্যে বৃটেন তিন মাসের জন্য বার্মারোড বন্ধ করে রেখেছিলেন। এখন সেই পথ আবার উন্মুক্ত করে দেওয়া হলো।

বার্লিন-চুক্তি তার স্বাক্ষরকারীদের পারস্পরিক স্বার্থবিরোধিতার অবসান ঘটাতে পারেনি। জার্মাণ সংবাদপত্রগুলি ঘোষণা করলো যে জার্মাণী ফ্রান্স ও নেদারল্যাণ্ড দখল করে, তার জয়ের অংশ এই দুই দেশের উপনিবেশগুলি, জাপানীদের হাতে তুলে দিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। জাপানের সঙ্গে মৈত্রী সুদৃঢ় করতে, জার্মাণী বার্লিন-চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বে তাকে ইন্দোচীন দখল করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে ইন্দোচীন সম্পর্কে এটাই চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। জার্মাণীর সাম্রাজ্যবাদীরা, প্রথম মহাযুদ্ধের পরে প্রশান্ত মহাসাগরে জার্মাণীর অধিকৃত যে সব অঞ্চল জাপানের অধীনে চলে গিয়েছিল, সেগুলি প্রত্যার্পণের দাবী জানালো। এদিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের অভিযান সাফল্য লাভ করলে শুধুমাত্র পূর্ব এশিয়ায় আবদ্ধ হয়ে থাকার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় ছিল না।

জাপ-জার্মাণ স্বার্থের পরস্পর বিরোধিতার মূল কারণ ছিল এই যে, দুটি রাষ্ট্র, জার্মাণী ও জাপানের প্রত্যেকেরই বিশ্ববিজয়ের পরিকল্পনা ছিল। তারই

অনিবার্য পরিণামে উভয়ের স্বার্থের মধ্যে সংঘাত বেধে উঠলো। ফ্রান্স সম্পর্কে ইটালীর যে মতলব ছিল তা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় সেও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু তা সত্বেও ইটালীর সাম্রাজ্যবাদীদের আশা ছিল যে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে তাদের আকাঙ্খা পূর্ণ হবে।

॥ পাঁচ ॥

ফ্রান্স ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার পরে, সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লো আফ্রিকায় ও সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। ইটালীর সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য ছিল একটা বিরাট উপনিবেশ গড়ে তোলা। বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক দুর্বলতা তাদের সাফল্যের পথ প্রশস্ত করে দিল।

ইতালীয় বাহিনী বৃটিশ সোমালীল্যাণ্ড দখল করে কেনিয়া পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সুদানে প্রবেশ করে এবং কাসালা ও গাবাট দখল করে তারা সুদানের রাজধানী খার্তুমের বিপদ ঘনিয়ে তুললো। উনিশ শ' চল্লিশের সেপ্টেম্বরে ইটালী উত্তর আফ্রিকায় দারুণ বেগে আক্রমণাত্মক অভিযান সুরু করে দিল। মার্শাল গ্রাৎসিয়ানী লিবিয়া সীমান্ত অতিক্রম করে তার সেনাদলকে মিশরে প্রেরণ করলেন এবং সিদিবাররাণীর দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু এই অভিযান বেশি অগ্রসর না হয়ে আটকে পড়লো। সেনাদল তখনো পশ্চিম মরুভূমিতে প্রবেশ করার পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

এদিকে আফ্রিকায় ইতালীয় বাহিনী যখন নোতুন অভিযানের প্রস্তুতি চালাচ্ছে তখন ইটালী সরকার দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে জার্মানীর উপর টেক্কা মারার জন্যে বিশেষ প্রস্তুতি না করেই একটু বেশি আত্মসচেতন হয়ে নোতুন অভিযানে মেতে উঠলেন। উনিশ শ' চল্লিশের গ্রীষ্মকালে হিটলার যখন ফ্রান্সের উপর প্রসারোন্মত মুসোলিনীর লোভী থাবাটা চেপে ধরেছিলেন তখন থেকেই ইটালীর সাম্রাজ্যবাদীরা বলকান অঞ্চলে একটা ঘরোয়া যুদ্ধের মহড়া দিতে সুরু করেছিল।

আটাশে অক্টোবর উনিশ শ' চল্লিশে এথেন্সে ইটালীর মন্ত্রী গ্রীক পররাষ্ট্র সচিবকে রাত দু'টোয় ডেকে এনে একটা চরমপত্র দিলেন। চরমপত্রে বলা হয়েছে যে ইটালী সরকার "গ্রীক সরকারকে তাঁদের নিরপেক্ষতারক্ষা ও ইটালীর নিরাপত্তার জন্যে, গ্রীসের কয়েকটি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল বৃটেনের সঙ্গে

তাঁদের যুদ্ধ চলাকালীন সমস্ত সময়ের জন্যে, ইটালীর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক দখল করতে দেওয়ার অনুরোধ করছেন।[২৯] তিন ঘন্টার মধ্যে গ্রীক সরকারকে মতামত জানাতে হবে। আসলে এটা ছিল একটা নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। কারণ ততক্ষণে ইটালীর সৈন্যবাহিনী অধিকৃত আলবেনিয়া থেকে গ্রীসের উপর আক্রমণ সুরু করে দিয়েছে। গুদেরিয়ান (Guderian) বলেছেন যে তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর সম্মতি না নিয়ে যে তাঁর মিত্রদেশ ইটালী গ্রীস আক্রমণ করেছে, সে খবর হিটলারের কাছে পোঁছলো আকস্মিকভাবে।[৩০]

ইটালীর প্রত্যাশা ছিল যে প্রধানমন্ত্রী মেটাক্সাসের ফ্যাশিবাদী সরকার বিনা প্রতিরোধে এটা মেনে নেবে। সন্দেহ নেই যে মেটাক্সাসের ইচ্ছেও ছিল তাই। গ্রীক সৈন্যাধ্যক্ষেরা পরবর্তী নানা বিবৃতিতে তার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় সেনানায়ক কাটসিমোথসের বক্তব্য :

"মেটাক্সাসের সরকার সীমান্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা করেছিলেন। আমাকে আদেশ দেওয়া হলো আরাথসে (থেসালীর একটি নদী) পশ্চাদাপসরণ করে আসতে। তা যদি করা হতো, তাহলে যুদ্ধে পরাজয় সেদিনই হতো। কিন্তু সীমান্তে যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীর ইচ্ছাই এক্ষেত্রে বেশি জোরালো হলো।[৩১]

গ্রীসের কমিউনিষ্ট পার্টি, যার নেতারা তখন বন্দী ছিলেন ইটালীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে জনগণের কাছে আন্তরিক আবেদন জানালেন। কমিউনিষ্ট পার্টির আবেদনে বলা হয়েছিল :

"মুসোলিনীর ফ্যাশিবাদ পিছন থেকে হীনভাবে, জঘন্য ভাবে গ্রীস আক্রমণ করেছে, এই দেশকে পদানত করে দাসে পরিণত করতে। আজ আমরা গ্রীসের জনগণ আমাদের মুক্তি, সম্মান ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছি। এ যুদ্ধ অত্যন্ত কঠোর, অত্যন্ত নৃশংস ভয়াবহ হবে। কিন্তু যে জাতি বাঁচতে চায় তাকে বিপদের কথা, ক্ষয়ক্ষতি ত্যাগের কথা চিন্তা না করেই লড়তে হবে।"[৩২]

কমিউনিষ্টদের আবেদনে যা বলা হয়েছিল গণআন্দোলনের চাপে পড়ে সরকার তাই মেনে নিতে বাধ্য হলেন। গ্রীক সেনাদলের সঙ্গে ইটালীর ফ্যাসিস্তদের সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল। অসীম বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে তারা

গ্রীসকে শত্রুমুক্ত করলো এবং যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে গেল আলবেনিয়ায় যেখানে থেকে প্রথমে আক্রমণ সুরু হয়েছে। আলবেনিয়ার গেরিলা বাহিনী গ্রীক সৈন্যদের সাহায্য করতে লাগলো। ফলে আলবেনিয়ার সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে কয়েকটি শহর যেমন আর্গিরোকাস্ত্রো ও কোরিৎসা এবং আড্রিয়াতিকের তীরে পোর্ট সারান্দা থেকে ইটালীর বাহিনী সরে যেতে বাধ্য হলো।

গ্রীসের জনগণের এই সংগ্রামের সুযোগ খুব তাড়াতাড়ি কাজে লাগাতে তৎপর হয়ে উঠলো বৃটেন। শ্রমিকদলের ডেলী হেরাল্ড পত্রিকায় তাদের মনোভাব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হলো। তাতে বলা হয়েছে :

"আমাদের কাছে……গ্রীসের এই বাধ্যতামূলক যুদ্ধে যোগদান দারুণ সুযোগ এনে দিয়েছে। সেটা হচ্ছে—যদি আমরা দ্রুত তা কাজে লাগাতে সচেষ্ট হই—একটা আক্রমণাত্মক ঘাঁটির সুযোগ যেখান থেকে, ইটালীর খুব কাছে থেকে, তাকে আক্রমণ করা যায়।"[৩৩]

তেরোই নভেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশ খুব ভোরে বৃটেনের নৌ ও বিমানবাহিনী ত্তেরাস্তোয় ইটালীর নৌবহরের উপর আক্রমণ সুরু করলো। বন্দরে অবস্থিত ইটালীর ছ'টি জাহাজের মধ্যে তিনটি এই আক্রমণে অকেজো হয়ে পড়লো। দু'টি ক্রুইজার ক্ষতিগ্রস্ত হলো সাংঘাতিক। এর ফলে ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধের গতি গেল বৃটেনের অনুকূলে এবং আফ্রিকায় বিরাট আক্রমণের প্রস্তুতিতে তাকে সাহায্য করলো অভাবিত রূপে।

কিন্তু বৃটিশ আক্রমণের ভাগ্য নির্দ্ধারণ করেছিল গ্রীস ও আলবেনিয়ার দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রাম, যার ফলে ইটালীর যুদ্ধ পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটছিল বারে বারে। নয়ই ডিসেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে, ইতালীয়দের হতচকিত করে বৃটিশ সৈন্য উত্তর আফ্রিকায় আক্রমণ সুরু করলো। এগারোই ডিসেম্বর তারিখে তারা সিদিবাররাণী পুনরধিকার করে লিবিয়ায় প্রবেশ করলো। অল্পদিনের মধ্যেই বেনগাজীর নৌঘাটি সমেত সিরেনাইকা দখল করে নিল তারা। তারপর আবার স্বল্পবিরতির পর বৃটিশ আক্রমণ সুরু হলো আবিসিনিয়া, ইরিত্রিয়া, ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড, বৃটিশ সোমালিল্যাণ্ড, সুদান ও কেনিয়ায়। ছ' মাসের বেশি চললো এই যুদ্ধ অবিরাম এবং শেষ ইতালীয় সৈন্যকে দূর করে দিয়ে এ অঞ্চল থেকে ঘটলো তার পরিসমাপ্তি। উনিশ শ' একচল্লিশের গ্রীষ্মকালের মধ্যে, ইটালী তার সাম্প্রতিক অধিকৃত ইথিওপিয়া

সমেত পূর্ব আফ্রিকার সমস্ত উপনিবেশ থেকে সরে আসতে বাধ্য হলো পরাজিত হয়ে।

বিশে মে, উনিশ শ' একচল্লিশে "আবিসিনিয়ার সহকারীরাজ প্রতিনিধি" ডিউক ডা' আয়োস্তার নেতৃত্বে পরিচালিত ইটালীয় অভিযাত্রীবাহিনীর অবশেষটুকু, আবিসিনিয়ার আম্বা আলাগী'তে আত্মসমর্পণ করলো।

এই সময়ের সমস্ত পর্বেই, উনিশ শ' চল্লিশের অক্টোবর থেকে উনিশ শ' একচল্লিশের মার্চের মধ্যে জার্মাণী ইটালীকে কোনমতে কোন সাহায্য করেনি। বরং স্বেচ্ছায় সাহায্য দান বন্ধ রেখেছিল। হিটলার চেয়েছিলেন যে ইটালী তার গোঁয়ার্তুমির ফল নিজে একাই ভোগ করুক। তা ছাড়া তাঁর অপেক্ষা করার আরেক উদ্দেশ্য ছিল সেই মুহূর্তের জন্যে যখন হতমান দুর্বল ইটালী তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তিনি তাঁর সর্তে তাকে সাহায্য করবেন। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও মধ্য প্রাচ্যে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার আর অন্ত ছিল না। হিটলারের অনুচররা সেই শুভ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষমান ছিলেন, যেদিন তাঁরা সৈন্যবাহিনী পাঠাতে পারবেন দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, তুরস্ক পার হয়ে ইরাণ ও ইরাকের তৈল সম্পদ করায়ত্ত করার জন্যে, মিশর ও সুয়েজ খাল দখল করে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারবে ভারতের দ্বারদেশে।

॥ ছয় ॥

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার জন্যে জার্মাণীর যুদ্ধ পরিকল্পনায় দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের গুরুত্ব অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। নাৎসীদের আশা ছিল যে প্রস্তাবিত অভিযানের প্রয়োজনীয় রসদ, খাদ্য, কাঁচা মাল ও লোকজন পাওয়া যাবে এখান থেকে এবং সোভিয়েতের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে এর মধ্যে দিয়ে সহজেই যোগাযোগের সেতু রচনা করা যাবে। সোভিয়েতের সঙ্গে সম্ভাব্য যুদ্ধে জার্মাণ সমর পরিষদের হাইকমাণ্ড অভিযাত্রী বাহিনীর দক্ষিণ পাশ যতোটা নিরাপদ ও সুরক্ষিত করা যায় তার জন্যে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

উনিশ শ চল্লিশের আগষ্টের পর থেকে হিটলারের কূটনীতিকেরা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বলকানের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও তাদের শাসকদের রাজ্যপ্রসারের ইচ্ছার মধ্যে যে পরস্পর বিরোধিতা আছে

তাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। যেমন উদাহরণতঃ বলা যায় যে, হাঙ্গেরীকে দলে টানার জন্যে তাঁরা হাঙ্গেরীতে জমিদার ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে উত্তেজিত করে তুলতে লাগলেন ত্রিয়ানন চুক্তির বিরুদ্ধে। যার ফলে হাঙ্গেরীর ভৌগোলিক সীমানা কিছুটা কমে গিয়েছিল। ভিয়েনা বৈঠকে ইটালী ও জার্মাণী হাঙ্গেরী ও রুমেনিয়ার মধ্যে "মধ্যস্থকারীর" ভূমিকা নিয়েছিল। "ভিয়েনার মধ্যস্থতা বৈঠক" শেষ হলো তিরিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চল্লিশে, যার ফলে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে রুমেনিয়া ট্রানসিলভেনিয়া অঞ্চলের পঁচিশ লক্ষ অধিবাসী সমেত একাংশ হাঙ্গেরীকে প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হলো। জার্মানী রুমেনিয়ার শাসকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ সোভিয়েত ভূমির একাংশ দান করার প্রতিশ্রুতি দিল। ইতিমধ্যে জার্মানীর গুপ্তচররা চেষ্টা করতে লাগলো যাতে রুমেনিয়ার শাসনক্ষমতা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে চরম যুদ্ধবাদী কোন ব্যক্তির নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। সেই ব্যক্তি হলেন আয়োন আন্তোনেস্কু (Ion Antonescu)। তাঁর সম্মতি নিয়ে জার্মাণ সৈন্য রুমেনিয়া প্রবেশ করলো সাতই অক্টোবর, উনিশ শ' চল্লিশে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, জার্মাণীর তদানীন্তন মিত্রদেশ বুলগেরিয়া তার রাজ্যের একাংশ হারায়। ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মে দক্ষিণ দোবরুজা (Dobruja) যে দেশের সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত ছিল, তা না করে দিয়ে দেওয়া হলো রুমেনিয়াকে। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে তৎপর হলো। সাতই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে রুমেনিয়া দক্ষিণ দোবরুজা বুলগেরিয়াকে প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই দক্ষিণ দোবরুজা বুলগেরিয়ার অন্তর্ভুক্তিকরণের পক্ষে মত দিয়ে এসেছে। কিন্তু হিটলারের প্রচারযন্ত্র সেখানে সমস্ত বিষয়টি জার্মাণীর কৃতিত্বের পরিচয় বলে সোচ্চার হয়ে উঠলো।

বুলগেরিয়ার ইতিহাসের এক সংকটময় মুহূর্তে, সোভিয়েত ইউনিয়ন স্লাভ গোষ্ঠীর এই সৌভ্রাতৃত্বমূলক দেশের স্বাধীনতাকে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হলো। সোভিয়েত সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে সেই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের জন্যে এলাকা বণ্টনের প্রস্তাবে আলাপ-আলোচনা প্রত্যাখ্যান করে, জার্মানীকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে তার নীতি দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

অন্যদিকে দু'বার সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব এলো বুলগেরিয়া সরকারের কাছে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যদানের চুক্তি স্বাক্ষর করার জন্যে। কিন্তু দু' বারই জার্মাণীর চাপে পড়ে বুলগেরিয়া সরকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সোফিয়াস্থিত মার্কিণ ও বৃটিশ কূটনৈতিক প্রতিনিধিবর্গ বুলগেরিয়া সরকারকে সোভিয়েত প্রস্তাব বর্জন করার পরামর্শ দিলেন।

আঠারোই নভেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে বুলগেরিয়ার জার বোরিস হিটলারকে বশম্বদ ভৃত্যের মতো স্মরণ করিয়ে দিলেন যে "বলকানে জার্মাণীর একজন অনুগত বন্ধু আছে, তাকে নিশ্চয়ই আপনি পরিত্যাগ করবেন না।"[৩৪]

জাতির প্রতি এটা একটা চরম বিশ্বাসঘাতকতা, যা পরিণামে জার্মাণ-আক্রমণকারীদের লোভের সামনে বুলগেরিয়ার মানুষদের বলি দিল।

বুলগেরিয় কমিউনিষ্ট নেতা জর্জি দিমিত্রভ বলেছেন: গত কয়েক দশক ধরে বুলগেরিয়ার জাতীয় অবমাননা ও বিপর্যয়ের একটা মৌল কারণ হলো তার জাত্যাভিমান এবং বলকানে প্রভুত্ব বিস্তারের নীতি ও আদর্শ, যার একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রতিবেশী দেশের মানুষদের উপর আধিপত্য বিস্তার। কয়েক বছর ধরে এই ধারণাকে কেন্দ্র করেই বুলগেরিয়ায় ফ্যাশিবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে ফ্যাশি-বাদের প্রসারে এটা এক উর্বর মাটীর কাজ করেছে। জার ফার্দিনান্দ ও জার বোরিসের অধীনে জার্মাণ অনুচররা বুলগেরিয়াকে বিকিয়ে দিয়েছে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদের কাছে, তাকে গড়ে তুলেছে আমাদের মুক্তিদাতা ও পশ্চিম এবং দক্ষিণের মিত্রদেশগুলির বিরুদ্ধে একটা সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার হিসেবে।"

দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের পথ প্রশস্ত করে জার্মাণী এগিয়ে এসেছে তাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে। বিশে নভেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে হাঙ্গেরী যোগ দিয়েছে বার্লিন চুক্তিতে। তাকে তেইশে নভেম্বর অনুসরণ করেছে রুমেনিয়া ও পরের দিন শ্লোভাকিয়া।

বুলগেরিয়ার অভ্যন্তরে চলেছে তখন তীব্র সংগ্রাম। জনসাধারণের সমর্থন প্রকাশিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি। জার বোরিসের নেতৃত্বে হিটলারের অনুচররা সংখ্যায় বেশি না হলে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ছিল তাদের হাতে। জনগণের সমর্থনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা তাই চাইলেন যতো দ্রুত সম্ভব জার্মাণ সেনাদলকে দেশের মধ্যে টেনে আনতে।

জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্যে জার্মাণ সৈন্যদল বুলগেরিয়া প্রবেশ

করলো ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে। আঠাশে ফেব্রুয়ারী তারিখে তারা বিমানঘাঁটি রেলষ্টেশন ও সীমান্ত রক্ষার কেন্দ্রগুলি দখল করে. জার্মাণ সৈন্য ডিভিসন আসার পথ সুগম করে দিল। আর পয়লা মার্চ, উনিশ শ' একচল্লিশে বুল-গেরিয়া বার্লিন চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো।

এবারে পালা এলো যুগোশ্লাভিয়ার। পঁচিশে মার্চ, উনিশ শ' একচল্লিশে যুগোশ্লাভিয়া এই আক্রমণকারীদের জোটে যোগদান করলো। হিটলারের পর-রাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ "পবিত্র গাম্ভীর্যে ঘোষণা করলেন", যে জার্মাণী সব সময়ে যুগোশ্লাভিয়ার সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব সম্মান করবে, রক্ষা করবে।" তিনি আরো ঘোষণা করলেন যে: "অক্ষশক্তির সরকারগুলি এই যুদ্ধ চলা-কালীন সময়ে কখনো যুগোশ্লাভ সরকারের কাছে এই রাষ্ট্র বা তার কোন রাজ্যের মধ্যে দিয়ে সৈন্য চলাচলের অনুমতি দাবী করবে না।"

আগাগোড়া এই ঘোষণা, বিবৃতিতে ছিল মিথ্যার বেসাতী। যুগোশ্লাভিয়াকে তার স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব হতে বঞ্চিত করে স্বীয় স্বার্থের একটা অনুগত যন্ত্রে পরিণত করার উদ্দেশেই জার্মাণী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল।

আক্রমণকারীদের দলে যুগোশ্লাভিয়ার এই অন্তর্ভূক্তিতে দেশে বিক্ষোভ যেন ফেটে পড়লো। যুগোশ্লাভিয়ার শ্লাভ গোষ্ঠীর মানুষেরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই পরাধীনতার, বিদেশী শাসনের মর্ম খুব ভালো করে জানতো। তাই তারা শ্লাভ জাতির দীর্ঘদিনের শত্রু, জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সমস্ত চুক্তিরই ছিল ঘোরতর বিরোধী।

একটি নোতুন রাজকীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো সেখানে, যা যুগোশ্লাভিয়ার বার্লিন চুক্তিতে যোগদানের বিষয়টি অনুমোদন করলো না। কিন্তু তাই বলে চুক্তি বাতিলও করা হলো না। সেই সরকার জার্মাণীকে অনুরোধ উপরোধ করতে থাকলেন যুগোশ্লাভিয়ার স্বাধীনতা অব্যাহত রাখতে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে অন্যান্য বিষয়ে জার্মাণীর দাবী তাঁরা মানতে রাজী। দোসরা এপ্রিল তারিখের এক লিপিতে যুগোশ্লাভ সরকার জার্মাণীকে জানালেন যে, "পরিস্থিতির বর্তমান মুহূর্তেও জাতীয় স্বাধীনতা ও অখণ্ডত্ব ক্ষুণ্ণ না করে, যুগোশ্লাভিয়া তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখার জন্যে সব রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত।"[৩১]

কিন্তু পনেরোই মে, উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ-

করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতি ততোদিনে প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ায়, জার্মানী যুগোশ্লাভিয়াকে তার নিজ ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে তখন বদ্ধপরিকর। জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে বিদ্রোহী দেশের অস্তিত্ব মেনে নিতে হিটলার রাজী ছিলেন না। তাই সাতাশে মার্চ, উনিশ শ' একচল্লিশে যেদিন নোতুন যুগোশ্লাভ সরকার গঠিত হলো হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রেখে একযোগে গ্রীস আক্রমণ ও যুগোশ্লাভিয়া অধিকারের নির্দেশ দিলেন।

সাতাশে মার্চ, উনিশ শ' একচল্লিশে জার্মাণ সমর পরিষদের এক বৈঠকে হিটলার বলেন :

"আগামী মারিতসা কার্যক্রমের (Operation Maritsa) পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষ করে বারবারোসা পরিকল্পনা (Barbarossa Plan) কার্যকরী করার সময়ে, যুগোশ্লাভিয়া একটা অত্যন্ত অনিশ্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক ও সামরিক অর্থে সেই দেশের বাস্তব অবস্থা ও আমাদের সম্পর্কে তার ধারণা জানাবার অনুকূল সুযোগ এসে উপস্থিত হয়েছে।......তাই বারবারোসা পরিকল্পনাকে চার সপ্তাহের জন্যে পিছিয়ে দিতে হবে।"[৩৮]

হিটলারের উদ্দেশ্য ছিল যুগোশ্লাভিয়ার সৈন্যবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে তার রাষ্ট্রীক অস্তিত্বকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া।[৩৯]

এরই মধ্যে জার্মাণ আর ইতালীয়ানদের সম্পর্কে আরেক দফা নোতুন এক পরিবর্তন এসেছে। ইতালী দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জার্মানীকে সাহায্যের জন্যে অনুরোধ করেছে। জার্মানী সুযোগ বুঝে জানিয়েছে তার সর্ত : সেনাদলের নেতৃত্বভার ছেড়ে দিতে হবে জার্মানীর হাতে আর জার্মাণ সৈন্যকে ঢুকতে দিতে ইতালীতে। মুসোলিনী পিছু হঠতে বাধ্য হলেন। ততোদিনে জার্মানী ভূমধ্যসাগরের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে রীতিমতো। সেখানকার পরিস্থিতিকে অনুকূলে নিয়ে যেতে হবে তার, নইলে তার পরিকল্পনা কার্যকরী করা যাবে না।

নাৎসী সামরিক নেতৃত্বে পেঁত্যা সরকারের প্রদত্ত তিউনিসিয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চলের ব্যবহার অধিকার পেয়ে, জেনারেল রোমেলের নেতৃত্বে বেশ কয়েক ডিভিসন সৈন্য পাঠালেন লিবিয়াতে। সেটা হলো মার্চ, উনিশ শ' একচল্লিশের কথা। তখন থেকে উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় সৈন্যদের নেতৃত্বে ও আদেশদানের ক্ষমতা এলো পদচ্যুত গ্রাৎসিয়ানীর পরিবর্তে রোমেলের হাতে। উনিশ'

শ' একচল্লিশের একত্রিশে মার্চ রোমেলের সৈন্যবাহিনী আক্রমণ সুরু করলো। অল্পদিনের মধ্যেই লিবিয়ার শাসনক্ষমতা চলে গেল তাঁর হাতে। এর ব্যতিক্রম হয়ে রইলো কেবল তোব্রুকের সুরক্ষিত অঞ্চল, যেখানকার বীর সেনাদল অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে আগলে রাখলা তাদের ঘাঁটি। জুন মাসের মধ্যেই রোমেলের সেনাদল এগিয়ে গেল সোল্লাম (Sollum) আর সিদিবাররাণীর মাঝ বরাবর স্থানে। সেখানে থেমে যাওয়ার কারণ হচ্ছে ততোদিনে হিটলার জার্মাণী আক্রমণ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে ফ্যাশিস্ত বুটের নীচে একের পর এক দেশগুলির পরাজয় বরণ করা দেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের স্বাধীনতারক্ষায় স্বীয় কর্মপ্রচেষ্টাকে মোটেই পরিত্যাগ করেনি। জার্মাণ সৈন্য বুলগেরিয়া প্রবেশ করলে, তেসরা মার্চ. উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত সরকার বুলগেরিয়া সরকারকে একটি লিপিতে জানালেন যে, "এই ব্যাপারে তাঁরা বুলগেরিয়া সরকারের নীতি সমর্থন করতে পারছেন না, কারণ তাঁদের মনোভাব শান্তির বনিয়াদকে মোটেই শক্তিশালী করে না, এবং বুলগেরিয়া সরকার চান আর নাই চান, এতে যুদ্ধ আরো ব্যাপক হয়ে বুলগেরিয়া সরকারকে তাতে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য করবে।"[৪০] সোভিয়েতের এই বিবৃতি বুলগেরিয়ার শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ প্রকাশ করে স্পষ্টই জানিয়ে দিল বুলগেরিয়ার মেহনতী মানুষের প্রতি সোভিয়েতের মানুষের সহানুভূতি।

হাঙ্গেরীকে সোভিয়েত সরকার এতোকাল সোভিয়েত যাদুঘরে সংরক্ষিত আঠারো শ' আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ সালের হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের পতাকা উপহার দিলেন। চব্বিশে মার্চ, উনিশ শ' একচল্লিশে ম্যাগীয়ারোরস্যাগ (Magyarorsag) এর উপর সম্পাদকীয় মন্তব্যে বললেন :

"হাঙ্গেরীর পূর্বস্থিত বৃহৎ শক্তি হাঙ্গেরীয় মুক্তি সংগ্রামের পতাকা উপহার প্রত্যার্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রাশিয়ার জনগণের পক্ষে রাশিয়ার সরকার হাঙ্গেরীর জনগণের জাতীয় বিপর্যয়ের দিনে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। এই পতাকা প্রত্যার্পণ যা একটা পবিত্র ঐতিহাসিক ঘটনা, হাঙ্গেরীর মানুষকে মুক্তিসংগ্রামের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে।"

হিটলারের কুঠার যখন যুগোশ্লাভদের মাথার উপর আঘাত হানতে উদ্যত হলো, তখন সোভিয়েত সরকার এই সৌভ্রাতৃত্বমূলক শ্লাভ গোষ্ঠীর মানুষদের প্রতি

ঘোষণা করলেন তাঁদের বন্ধুত্ব। পাঁচই এপ্রিল, উনিশ শ' একচল্লিশে হিটলার জার্মানীর চরম বিশ্বাসঘাতকতায় যুগোস্লাভিয়া আক্রমণের মাত্র কয়েকঘণ্টা পূর্বে মস্কোয় স্বাক্ষরিত হলো একটি সোভিয়েত-যুগোস্লাভ বন্ধুত্ব ও অনাক্রমণ চুক্তি।

ছয়ই এপ্রিল ভোর বেলায় জার্মাণ জঙ্গীবিমান যুগোস্লাভিয়ার রাজধানীর উপর বর্বরের মতো আক্রমণ চালালো। হাজার হাজার মানুষ নিহত হলো এই বিমান আক্রমণে যদিও তার স্বপক্ষে কোন সামরিক কারণ কিছুই ছিল না। এটা ছিল নিছক একটা জঘন্য সন্ত্রাসবাদী কাজ।

শত্রুপক্ষের ছাপান্ন ডিভিসন সৈন্য একযোগে আক্রমণ করলো যুগোস্লাভিয়া (তার মধ্যে অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া থেকে এসেছে জার্মাণ সৈন্য, আর তাদের সাহায্যার্থে হাঙ্গেরী ও ইতালীর ডিভিসন)। যুগোস্লাভিয়ার মানুষ এই আক্রমণের তীব্রতা হয়তো দীর্ঘদিন সহ্য করতে পারতো, কিন্তু সার্বিয় বুর্জোয়াদের শাসনের মারাত্মক প্রতিক্রিয়া তখন দেখা দিতে সুরু করেছে। সেখানে প্রতি-রক্ষার কোন ব্যবস্থাই তখন নেই। সৈন্যদলের অস্ত্রসজ্জা নিতান্ত সেকেলে ও দুর্বল। কৃষিসমস্যার কোন সমাধান হয়নি দেশে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক মানুষদের উপর চলেছে নির্যাতন, আর বিশ্বাসঘাতক যারা তারা অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ। এরই যোগাযোগে দেখা দিল দ্রুত সামরিক বিপর্যয়। এদিকে সাধারণ মানুষ আর সৈন্যবাহিনী যখন চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিরোধের সংগ্রাম তখন অন্যদিকে যুগোস্লাভ সরকার দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন কায়রোয়।

আঠারোই এপ্রিলের মধ্যে সমস্ত দেশটা দখল করে নিল নাৎসীরা। যুগো-স্লাভিয়ার বুকে নেমে এলো চরম দুর্দিন। তার মানুষদের উপর নাৎসীরা চালালো পাশব অত্যাচার। সারা দেশে সমর্থ যুবক, সৈন্য আর অফিসারদের খুঁজে বের করার জন্যে চললো অবাধ নরহত্যা। কোথাও ধরে তাদের পাঠানো হতে লাগলো কনসেনট্রেসন ক্যাম্পে। কিন্তু নাৎসীদের বেড়াজাল ছিঁড়ে দশ হাজারেরও বেশি মানুষ পালিয়ে গেল পাহাড়ে, জঙ্গলে। দখলকারী সৈন্যদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে, ধীরে ধীরে তারা যোগ দিল পার্টিজানদের মুক্তি সংগ্রামে।

যুগোস্লাভিয়া দখল করে হিটলার জার্মানী বিজিত সম্পদের ভাগ বাঁটোয়ারায়

মন দিলেন। উত্তরে স্লোভেনিয়া জার্মান রাইখের অন্তর্ভুক্ত করা হলো। জাগ্রেবে রাজধানী করে ক্রোয়াশিয়ায় গঠন করা হলো এক রাজতন্ত্র। তার রাজা হলেন একজন ইতালীয় ফ্যাশিবাদী নেতা ডিউক স্পোলেতো (Spoleto)। কিন্তু যুগোস্লাভ পার্টিজানদের ভয়ে এই হঠাৎ বনে যাওয়া রাজা ইতালীতে থাকাই বেশি পছন্দ করলেন। তাঁর জায়গায় হিটলারের দীর্ঘদিনের ভাড়াটে গুপ্তচর গুণ্ডা আন্তে পাভেলিক (Ante Pavelic) রাজ্য চালাবার ভার পেল। ইতালীর সঙ্গে "অখণ্ডতা ও সহযোগিতার" এক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে ক্রোয়াশিয়া স্পষ্টতই তার উপনিবেশে পরিণত হলো। তাছাড়া আরো কিছু বাড়তি পাওনা হলো ইতালীর মন্তিনেগ্রো আর দালামাশিয়ার এক বিরাট অংশ। বুলগেরিয়ার ফ্যাসিস্তরা পেল আলবেনিয়া সীমান্ত পর্যন্ত যুগোস্লাভিয়ার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল। ড্যানিয়ুবের একটা বাঁকে হাঙ্গেরী লাভ করলো প্রশস্ত এক অঞ্চল ভোয়ভোদিনা (Voivodina) আর বাশ্‌কা (Bachka)। আর যুগোস্লাভিয়ার অবশিষ্ট অঞ্চল নিয়ে গঠিত হলো হিটলারের প্রতিনিধি, যুগোস্লাভিয়ার কুইসলিং মিলান জর্জ নেদিকের (Milan George Nedic) অধীনে আরেকটি "রাষ্ট্র" নাম তার সার্বিয়া।

বিজিত যুগোস্লাভিয়ার ভাগ বাঁটোয়ারায় একটা জিনিস প্রমাণিত হলো যে হিটলারের "দাক্ষিণ্যের" উপর নির্ভর করে থাকলে প্রভুর উচ্ছিষ্ট কিছু অনুগত জনের কপালে জুটতে পারে। আর সেই জন্যেই যুগোস্লাভ পার্টিজানদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী, অনিশ্চিত দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে শক্তিক্ষয় না করে, নাৎসীরা তার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে গেল তাদের ইতালীয়, হাঙ্গেরীয় ও বুলগেরিয় তাঁবেদারের উপর।

ছয়ই এপ্রিল তারিখে যুগোস্লাভিয়ার উপর আক্রমণ সুরু করার সময়ে একযোগে হিটলারী অভিযান নেমে এসেছিল গ্রীসের বিরুদ্ধে। সে দেশেও শাসকশ্রেণী ও সামরিক নেতারা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পেছপা হলেন না। আশাতীতভাবে রীতিমতো কিছুকাল প্রতিরোধে সক্ষম জেনারেল জর্জ কোলাকোগ্‌লুর (George Cholacoglu) নেতৃত্বে সুসজ্জিত সৈন্যদল এপিরাসে (Epirus) অস্ত্রসম্বরণ করলো। পরে এই জেনারেলই এথেন্সে এক ক্রীড়নক সরকারের নেতা হয়ে বসলেন। নাৎসীরা বাণের জলের মতো হু হু করে ঢুকে পড়লো গ্রীসে, আর বৃটিশ অভিযাত্রী বাহিনী তেমন কোন সংঘর্ষের

সামনে না এসেই ছেড়ে চলে গেল দেশ। এপ্রিল মাস শেষ হতে না হতেই সমগ্র গ্রীস হিটলারের শাসনের অধীনে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে চলে এলো।

সেই সময়টা সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদী শাসন জাঁকিয়ে বসেছে। কিন্তু দেশ জয়ের ফল তাদের প্রত্যাশিত হলো না। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের ঘৃণা তীব্র হয়ে উঠতে লাগলো। সুরু হয়ে গেল দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ। 'স্থানীয় প্রতিরোধ সংগ্রামের তীব্রতা নাৎসীরা যতোটা কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য এসব স্থানে সংগ্রহ করবে ভেবেছিল, তার পরিমাণ দিল কমিয়ে। দক্ষিণ গ্রীসে লুফ্‌টবাফে (Luftwaffe) গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি করায়ত্ত করলেও, ইতালীর নৌবাহিনী যে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল তাতে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে তাদের প্রাধান্য কোন মতেই প্রতিষ্ঠা করা গেল না।

জার্মাণী চেয়েছিল তার সামরিক ঘাঁটিগুলিকে আরো দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের এমন সব অঞ্চলে সরিয়ে নিয়ে যেতে, যেখান থেকে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের সঙ্গে তার সামুদ্রিক যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে। হিটলার তাই স্থির করলেন ক্রীট (Crete) দখল করতে হবে। এই অভিযানের সাফল্যের একটা বড়ো মনস্তাত্বিক প্রভাব ছিল বৃটেনকে তাহলে দেখানো যাবে যে সামুদ্রিক বাধা জার্মাণ সেনাদলের অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে পারে না। স্বভাবতই এতে ভীত, আতঙ্কিত বৃটেন তার মিউনিকপন্থীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চাইতে পারে। যার ফলে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাকে একটা বোঝাপড়ায় আসতে হবে।

ক্রীটের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু হলো বিশে মে, উনিশ শ' একচল্লিশে জার্মাণ ছত্রীবাহিনী বিমানবন্দর দখল করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবহরে সৈন্যদল আর অন্যান্য যুদ্ধের উপকরণ এসে পৌঁছতে লাগলো সেখানে। সৈন্যবাহী জাহাজ হাজির হতে লাগলো তার বন্দরে। দশ দিনের মধ্যে ক্রীট বিজয় সমাপ্ত হলো।

জার্মাণ সরকার ভূমধ্যসাগরের অপর তীরে নিজেদের অভিযানের প্রতি সমর্থনসূচক মনোভাবসম্পন্ন দেশ থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করছিলেন। সিরিয়া ও লেবাননে পেতঁ্যার প্রতিনিধি ফ্যাশিপন্থী জেনারেল দেন্তজ্ (Dentz) জার্মাণদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু বৃটিশ ও দ্য গলের সেনাদল আটই জুন তারিখে তাঁকে আক্রমণ করে, অল্পদিনের মধ্যেই এই দুই আরব দেশ দখল করে নিল। ফলে মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য বিস্তারের জার্মাণ আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিস্যাৎ হয়ে গেল।

এর কারণ ছিল দু'টি। প্রথমতঃ ইতালীয় নৌবহরের ক্ষয়ক্ষতি ভূমধ্যসাগরে ফ্যাশিবাদী শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। দ্বিতীয়তঃ মধ্যপ্রাচ্যের আরব জনসাধারণ নাৎসী পররাজ্য আক্রমণকারীদের প্রতি শক্রভাবাপন্ন ছিল। তাই দ্রুততার সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে জার্মাণ গুপ্তচরদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্যে ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আরব দেশগুলির উপর নিজেদের অধিকার জোরালো রাখার প্রয়াস পেল।

*　　*　　*　　*　　*

যুদ্ধের গোড়াতে হিটলার জার্মাণী সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় মহাদেশ পদানত করেছিল। একের পর এক ইউরোপীয় দেশগুলি নাৎসীদের পররাজ্যলোলুপতার বলি হতে থাকে। কোথাও তাদের শাসকশ্রেণী দৃঢ়তার সঙ্গে নাৎসী লুঠেরাদের প্রতেরোধ করার জন্যে, আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে সত্যি সচেষ্ট হয়নি। জার্মাণরা অনায়াসেই তাদের পদানত করেছে। বরং বলা যায় যে নাৎসী সৈন্যবাহিনী বিনাযুদ্ধে প্রায় সমগ্র ইউরোপের প্রভু হয়ে বসেছে।

এই বিপর্যয়ের মৌল কারণ ইউরোপের দেশে দেশে শাসকশ্রেণী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সুগভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব, বৈরী মনোভাব। জনগণ চেয়েছে আক্রমণকারীদের রুখে দাঁড়াতে। চেয়েছে তারা তাদের জাতীয় স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে, মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক হতে। কিন্তু বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর মনে আক্রমণকারী নাৎসীদের চেয়ে নিজের দেশের সাধারণ মানুষের সম্পর্কে আতঙ্ক ছিল বেশি। স্বাধীনতা, গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করার জন্যে ফ্যাশি-বিরোধী যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে তাদের আগ্রহ স্বভাবতই খুব বেশি থাকতে পারে না। তারা যা চেয়েছিল তা হচ্ছে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, নিজ নিজ দেশের জনগণের বিরুদ্ধে, ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে একটা সমঝোওতা। তাই তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যের একটা বড়ো অংশ জুড়ে ছিল জার্মাণ আক্রমণের ধারাকে পূর্বমুখী করে দেওয়া, সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা। ইউরোপ আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলির কাছে হিটলার জার্মাণী শত্রুর চেয়ে সমশ্রেণীস্বার্থের বন্ধু বলেই মনে হয়েছিল বেশি।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের নবতম প্রকাশ হলো দ্বিতীয়

উনিশ শ' চল্লিশের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে যুদ্ধের চরিত্র ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগলো। ইউরোপের পদানত দেশগুলিতে দেশপ্রেমিক মানুষেরা ফ্যাশিস্ত বিজেতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে লাগলো। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে জনগণের ফ্যাশিবাদী আক্রমণ প্রতিহত করার সংকল্প দিনের পর দিন সুদৃঢ় হয়ে উঠতে লাগলো। সরকারের উপর এই জনপ্রিয় ধারণার প্রভাব পড়তে লাগলো ক্রমাগত।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকশ্রেণীও তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটাতে লাগলেন। তাঁদের বিশ্বব্যাপী স্বার্থে ফ্যাশিবাদের আক্রমণ আশংকা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকায়, জাতীয় স্বাধীনতা রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব ক্রমাগত বিপন্ন হয়ে ওঠায়, তাঁরাও অনেক দৃঢ়তার সঙ্গে এই যৌথ ইতালীয় জার্মাণ জাপানী আক্রমণাত্মক মোর্চার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন।

১, হ্যারল্ড এল. ইকেস: The Secret Diary of Harold L. Ickes. দ্বিতীয় খণ্ড সাইমন ও সুশটার, নিউইয়র্ক ১৯৫৪ পৃঃ ৭০৫
২. ডেলী টেলিগ্রাফ ও মর্নিং পোষ্ট, জানুয়ারী ২৮, ১৯৪৬
৩. চার্লস দ্য গল: স্মৃতিকথা: ফরাসী গ্রন্থ ১৯৪০-৪২, পৃঃ ৮৭
৪. লুই এল. স্নিডার: The War, A Concise History, 1939-45, নিউ ইয়র্ক, জুলিয়ান মেসনার ১৯৬০ পৃঃ ১২০
৫ কে টিপ্পল স্মার্চ: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৮
৬. উইলিয়াম জেড্ ফষ্টার: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩
৭. একটি সোভিয়েত ভাষার রচিত গ্রন্থ: পৃঃ ৫১৫
৮. ঐ
৯. সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ১৯৪১ ৪৫ সালে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধকালে পত্র বিনিময়, প্রথম খণ্ড, মস্কো ১৯৫৭ পৃ. ১৭ (পরে এই সূত্রে সর্বত্র 'পত্র বিনিময়' নামে উল্লিখিত)
১০. I M T.
১১. টাইম অ্যাণ্ড টাইড, ২৯শে জুন, ১৯৪০, পৃ. ৬৮৩
১২. আর. ডব্লিউ. কুপার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫০
১৩. চার্চিল: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭
১৪. ওয়েস্তালি ফট: The Secret History of the War. নিউইয়র্ক, ১৯৪৫, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৬৩১-৩২
১৫. টিপ্পল স্মার্চ: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭১

১৬. Documents on Americam Foreign Relations. দ্বিতীয় খণ্ড, বোষ্টন ১৯৪০, পৃ: ১৪৬

১৭, অর্জ ম্যারিয়ন : Bases and Empire, A chart of American Expansion. নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃ: ৭১

১৮. ল্যাঙ্গর ও গ্লিসন : পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ: ২১৫

১৯. Documents on American Foreign Relation. তৃতীয় খণ্ড ১৯৪১, পৃ: ২০৬

২০. মরিস ম্যাটলোফ ও এডুইন স্নেল : U. S. Army in World War II Strategic Planning for Coalition War 1941-42 ওয়াশিংটন ১৯৫৩, পৃ: ২১

২১. টাইমস পত্রিকা, ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৪০

২২. ঐ

২৩. প্রাভদা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮

২৪. ঐ

২৫. International Conciliation. সংখ্যা ৩৬৭, ১৯৪১ পৃ: ৬৭

২৬, ফিলিপ পি. গ্রেভস : Record of the War, The Fourth Quarter. হ্যাচিনসন, লণ্ডন, পৃ: ২৪৫

২৭. টাইমস পত্রিকা, ৭ই অক্টোবর, ১৯৪০

২৮. মরিস ম্যাটলোফ ও এডুইন স্নেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ

২৯. টাইমস পত্রিকা, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪০

৩০. হাইনজে গুদোরিয়ান : জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, হাইডেলবার্গ ১৯৫১, পৃ: ১২৬

৩১. শের্ভারিয়ের : ফরাসী গ্রন্থ, ১৯৪৬ পৃ: ৯

৩২. ঐ পৃ: ১০

৩৩. ডেলী হেরাল্ড ১লা নভেম্বর ১৯৪০

৩৪. I M T.

৩৫. সোভিয়েত ভাষায় রচিত গ্রন্থ, ১৯৪৭, পৃ: ৪০

৩৬. নিউইয়র্ক টাইমস : ২৬শে মার্চ, ১৯৪১,

৩৬, ঐ, ৩রা এপ্রিল, ১৯৪১,

৩৮. সোভিয়েত ভাষায় রচিত গ্রন্থ, ১৯৪৬, পৃ: ৪৯

৩৯ I M T. প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩৬২

৪০. সোভিয়েত ভাষায় রচিত গ্রন্থ, পৃ: ৫৪৫

তৃতীয় খণ্ড

ফ্যাশি আক্রমণের বিস্তার : মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রথম পর্ব

ষষ্ঠ অধ্যায়, শক্তির আপেক্ষিকতা

বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা দীর্ঘদিন ধরেই যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ সম্পদ ও মার্কিণ দেশের উদার পুঁজিসরবরাহ নীতির সাহায্যে তারা জার্মাণীর শিল্পব্যবস্থাকে আধুনিকতায় রূপান্তরিত করে তুললো। শিল্পের উৎপাদন গেল বেড়ে। নীচের পরিসংখ্যাণ প্রমাণ করবে হিটলারের অধীনে জার্মাণীতে ক্রমবর্দ্ধমান বিনিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ।

জার্মাণ শিল্পগত বিনিয়োগ [১]
(মিলিয়ন মার্কের হিসাবে)

বৎসর	মোট পরিমাণ	পুঁজিদ্রব্য
১৯৩৩.....................	৫৫৭	৩০৯
১৯৩৪.....................	১,০৮০	৭০০
১৯৩৫.....................	১,৬৩৬	১,২২১
১৯৩৬.....................	২,১৫৯	১,৬৩৭
১৯৩৭.....................	২,৮৪৩	২,২০৮
১৯৩৮.....................	৩,৬৯১	২,৯৫২
১৯৩৯.....................	৪,৪৩২	৩,৫৯৬

জার্মাণ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উৎপাদন উনিশ শ' তেত্রিশ থেকে উনিশ শ' আটত্রিশের মধ্যে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। মূল সামরিক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় আরো বেশি। যেমন বলা যায় অ্যালু-মিনিয়ামের কথা। উনিশ শ' বত্রিশে এর উৎপাদনের মোট পরিমাণ ছিল উনিশ হাজার টন, উনিশ শ' উনচল্লিশে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় দুইলক্ষ টন্[২] যা সমকালের সমস্ত পুঁজিবাদী ইউরোপীয় দেশগুলির মোট

উৎপাদিত অ্যালুমিনিয়ামের চেয়ে বেশি ছিল। মার্কিণ একচেটিয়া কারবারীরা জার্মাণ শিল্পপতিদের কৃত্রিম গ্যাসোলিন ও রবার বৃহদায়তনে উৎপাদন করতে সাহায্য করলো। উনিশ শ' আটত্রিশে গ্যাসোলিনের উৎপাদন দাঁড়াল এগারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন, এবং পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে পৌঁছায় প্রায় ষাট লক্ষ টন। বিশ্বযুদ্ধের সূচনাপর্বে জার্মাণীর ছিল সর্বোচ্চ সংখ্যক ধাতু কাটার যন্ত্রপাতি যার সংখ্যা হবে ষোল লক্ষের মতো।[৩]

যুদ্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে সুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের জাতীয় অর্থনীতিকে যুদ্ধের উপযোগী করে গড়ে তুলেছিল। ফলে অস্ত্রশস্ত্র আর সমর উপকরণের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে দ্রুত গতিতে। পশ্চিম জার্মাণীর অর্থবিদগণ জার্মাণীর যুদ্ধ-পূর্ব সমর উপকরণ উৎপাদনের একটা সূচক সংখ্যা প্রস্তুত করেছেন।

জার্মাণ সমর উৎপাদন[৪]

(শতকরা হিসাব)

বৎসর	
১৯৩৩	১০০
১৯৩৪	১০০
১৯৩৫	২০০
১৯৩৬	৩:০
১৯৩৭	৪৫০
১৯৩৮	১,০০০
১৯৩৯	১,২৫০
১৯৪০	২,২০০

এতেই দেখা যাচ্ছে জার্মাণ সমর উপকরণের উৎপাদন উনিশ শ' তেত্রিশ থেকে উনিশ শ' চল্লিশের মধ্যে বাইশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি করা ছাড়াও, জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা বিপুল পরিমাণে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুত করতে সুরু করে। উনিশ শ' উনচল্লিশের শেষে এই মজুদ করা উপকরণের পরিমাণ দাঁড়ালো দশমাসের মতো প্রয়োজনীয় সীসা, ছয় থেকে আঠারো মাসের প্রয়োজনীয় টিন, এ্যান্টিমনি, নিকেল, মলিবডিনাম,

ক্রোমিয়াম, ভ্যানাডিয়াম, টাংস্টেন আর ম্যাঙ্গানীজ, এবং আড়াই বছরের প্রয়োজন মতো কোবাল্ট।[৫]

জার্মাণীর উৎপাদন ক্ষমতা, শ্রমশক্তি, খাদ্য সম্ভার, কাঁচা মাল, খনিজ দ্রব্য ও তৈল সম্পদ, নাৎসীরা ইউরোপের কয়েকটি ধনতান্ত্রিক দেশ দখল করার পর রীতিমতো বৃদ্ধি পেল। সেখানে বিভিন্ন সম্পত্তি দখলের মোট পরিমাণ দাঁড়ালো নয় হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড ষ্টার্লিং।[৬] সাত মাসের প্রয়োজন মতো একলক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টন তামা এবং পনের মাসের প্রয়োজন মতো নিকেল।[৭] আটাশীটি জার্মাণ ডিভিশন ফরাসী অটোমোবাইল শিল্পের জোরে সুসজ্জিত হয়ে উঠলো।[৮]

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের সময় জার্মাণীর উৎপাদন ক্ষমতা নীচের বিবরণ অনুযায়ী ছিল।

জার্মাণীর যুদ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা (১৯৪১)[৯]

বিবরণ	পরিমাণ	বিজিত দেশগুলি ছাড়া	বিজিত ও তাঁবেদার রাষ্ট্র সমেত
জনসংখ্যা	মিলিয়ন হিসাবে	৬৯	২৯০
শিল্প শ্রমিক	ঐ	১০	২৮
কয়লা	ঐ টন হিসাবে	২৩৫	৪০০
তৈল সম্পদ	ঐ	০.৭	৭.৫
ইস্পাত	ঐ	২২	৪৫

পশ্চিম জার্মাণীর অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ হান্স কেহ্‌রল (Hans Kehrl) লিখেছেন :

"পশ্চিমমুখী অভিযানের সময় যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল। সব চেয়ে কাঁচা মালের ক্ষেত্রে তার পরিবর্তন ছিল রীতিমতো। নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম এবং বিশেষ করে ফ্রান্স ও কিছুটা নরওয়ে যুদ্ধের প্রথম সাত মাসে তাদের বন্দরগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মজুদ করেছিল নানা ধরণের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক দ্রব্য যেমন নানা ধাতু, তৈল, রবার, বস্ত্রশিল্পের কাঁচা মাল ইত্যাদি, যা জার্মাণ যুদ্ধযন্ত্র ভেরমাখটের (Wehrmacht) কাছে হলো দারুণ মূল্যবান লুটের মাল। এই সব দেশের শিল্প

প্রতিষ্ঠানগুলিতেও কাঁচামাল মজুদ রাখা হয়েছিল বিপুলভাবে। এখন তারা কোন কিছুর যোগান না পেয়েও জার্মাণদের চাহিদা মতো জিনিস উৎপাদন করতে লাগলো। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা রীতিমতো বৃদ্ধি পায় এই সময়ে, কারণ নেদারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও পোল্যাণ্ডের কয়লা, ধাতুর খনি এবং ইস্পাতের কারখানাগুলি অক্ষত অবস্থায় জার্মাণদের অধিকারে এসে পড়ে। শিল্প উৎপাদনের সমস্ত শাখাতেই উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্ত অনুকূল অবস্থাই তখন বর্তমান ছিল।"[১০]

ফ্রান্স দখল করে হিটলার জার্মাণী নির্ভরশীল ও বিজিত দেশগুলি থেকে শ্রমিকদের ধরে চালান দিতে লাগলো তার নিজের যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাজ করার জন্যে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশে জার্মাণীতে বিদেশী কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল এক কোটির বেশি, যা উনিশ শ' চুয়াল্লিশের শেষে দাঁড়ায় এক কোটি তিরিশ লক্ষ।"[১১]

ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে জার্মাণী সামরিক অর্থে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উনিশ শ' চল্লিশে জার্মাণী প্রায় সাড়ে নয় হাজার বিমান, আঠারো শ' ট্যাঙ্ক, চার হাজার কামান, সাতান্ন হাজার মেশিনগান এবং চৌদ্দ লক্ষ রাইফেল উৎপাদন করে।[১২] তা ছাড়া ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া ও অন্যান্য নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলের কলকারখানাতেও হিটলারের সেনাবাহিনীর জন্যে অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হতে থাকে।

ফ্রান্সের আত্মসমর্পনের পর যেদিন মূল কার্যক্রম অনুযায়ী বৃটেন আক্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হয়, সেদিন থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্যে জার্মাণী প্রস্তুতি সুরু করে। সৈন্যদলের পুনর্বিন্যাস করা হয়, গড়ে তোলা হয় অনেক নোতুন ডিভিশন। জার্মাণ স্থলবাহিনীর সমর পরিষদ ছয়ই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে এক নির্দেশনামা জারী করে বলেন, "পূর্ব সীমান্তের দখলদারী সৈন্যদলের সংখ্যা আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরাপত্তার স্বার্থে লক্ষ্য রাখতে হবে এতে যেন রাশিয়ার অভ্যন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি না হয় যে জার্মাণী পূর্বমুখী অভিযান চালাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।"[১৩]

আঠারোই ডিসেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে জার্মাণ সমর পরিষদের সর্বোচ্চ সংস্থা একুশ সংখ্যক নির্দেশনামাটি তার সাংকেতিক নাম বারবারোসা পরিকল্পনা হিসাবে অনুমোদন করেন। নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল যে, "জার্মাণ ভের-

মাথটিকে বৃটেনের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার পূর্বেই এমন অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে একটি দ্রুত অভিযান সুরু করে সোভিয়েত রাশিয়াকে ধ্বংস করে ফেলা যায়।" এতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের মৌল উদ্দেশ্যগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল :

"রাশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে তাদের সৈন্য সমাবেশের কেন্দ্রগুলিকে তীব্র প্যানসার আক্রমণ চালিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিতে হবে। কর্মক্ষম সৈনিকেরা যাতে রাশিয়ার অভ্যন্তরে পিছনের দিকে চলে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে এশিয়াস্থিত রাশিয়াকে আরখানগেলস্ক ভল্গা (Arkhangelsk-Volga) সীমান্ত বরাবর সীমায়িত করে রাখা।"[১৬]

সোভিয়েত ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলার সব ইচ্ছাই জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের ছিল। এক সামরিক বৈঠকে হিটলার তাঁর সেনাপতিদের বলেন :

"রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করে লেনিনগ্রাদ, মস্কো এবং ককেশাস দখল করাটাই যথেষ্ট নয়। এই দেশের মানুষদের ধ্বংস করে, পৃথিবীর বুক থেকে দেশটাকেই মুছে ফেলতে হবে।"[১৭]

অভিযানের লক্ষ্য ও পথ একুশ সংখ্যক নির্দেশনামায় স্থির নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। আক্রমণের প্রধান আঘাত হানতে হবে প্রিপাইয়াত্ মার্শসেস্ (Pripyat Marshes) অঞ্চলের উত্তরে। দুইটি সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করা হবে এই উদ্দেশ্যে—উত্তরের বাহিনী ধেয়ে আসবে বাল্টিক দেশগুলি অতিক্রম করে লেনিনগ্রাদের দিকে এবং দক্ষিণের বাহিনী বাইলোরাশিয়া অতিক্রম করে এগোবে উত্তর-পূর্ব দিকে। নাৎসীদের পরিকল্পনা ছিল লেনিনগ্রাদ ও ক্রোনস্তাদ দখল করে, উত্তর ও পশ্চিম থেকে দ্বিমুখী অভিযানে এগিয়ে যাওয়া মস্কোর আঘাত হানার জন্যে। প্রিপাইয়াত মার্শসেসের দক্ষিণে নীপার (Dnieper) ধরে দক্ষিণমুখী অভিযান চালিয়ে লুবলিন (Lublin) থেকে আঘাত করতে হবে কিয়েভের দিকে। দক্ষিণ অঞ্চলে জার্মাণ রুমেনিয়ান সেনাদল যুদ্ধ সুরু করে উত্তরে নাৎসী বাহিনীর অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে দেবে, তাদের শত্রু বাহিনীর আক্রমণের আওতার বাইরে রেখে।

হিটলারের নেতৃত্ব সূচনা থেকেই পরিস্থিতির সমস্ত সুযোগটা নিজের হাতে

রাখার সঙ্কল্প নিয়ে এগোতে থাকে। পশ্চিম ইউরোপে একরকম অনায়াসে জয়লাভ করে নাৎসীরা এই আক্রমণেও সাফল্য সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত ছিল। ভেবেছিল তারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা ঘড়ির কাঁটার মতো বাঁধা ছকে ঘুরবে। তাদের সামরিক কাগজপত্রে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে একটা নিতান্ত পরোক্ষ শক্তি বলে মনে করা হয়েছিল যার কোন বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নেই।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে নাৎসীদের যুদ্ধ পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল একটা পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত কার্যক্রম হিসাবে। জার্মাণীর সমর বাহিনীকে সম্পূর্ণ সজ্জিত, প্রস্তুত করে রাখা হলো। তারা আধুনিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। তারা চেষ্টা করলো দ্রুত একবার দেশটা পর্যবেক্ষণ করে নিতে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। পশ্চিমের দেশগুলির মতো সোভিয়েতের অভ্যন্তরে তারা গড়ে তুলতে পারেনি এক গুপ্তচর বাহিনী। সোভিয়েত সরকারের গৃহীত নীতিই ছিল তাদের প্রধান কার্যকরী অন্তরায়। বিশেষ করে উনিশ শ' আটত্রিশে বিভিন্ন সোভিয়েত শহরে জার্মাণ কনসুল্যাট অ্যাপিস বন্ধ করে দেওয়ার সোভিয়েত নির্দেশই হয়ে দাঁড়ালো মস্তো বাধা। মস্কোর নাৎসী সামরিক অ্যাটাশে বলেছিলেন, বলা হয় যে, "এরই সঙ্গে সঙ্গে আমার খবরাখবর সংগ্রহের শেষ উৎসটিও লুপ্ত হয়ে গেল।"[১১] কিন্তু উনিশ শ' চল্লিশের শেষে দ্রুতগামী বিমান থেকে জার্মাণরা আক্রমণ সুরু করার পনের দিন পূর্বেও সীমান্ত অতিক্রম করে সোভিয়েত ইউনিয়নের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আকাশ থেকে ফটো তুলে নিয়েছে।[১২]

নাৎসীদের উদ্দেশ্য ছিল সূচনাতেই তীব্র আক্রমণ করা। তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিমাঞ্চলে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর প্রধান অংশ বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং হিটলারের সামরিক উদ্যোগ গ্রহণে অনেক সুবিধা হবে। তারা স্থির নিশ্চিত ছিল যে এই তীব্র আক্রমণের বেগে সোভিয়েতের সেনাবাহিনী ছত্রখান হয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, পতন ঘটবে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের।

নাৎসী নেতাদের বাগাড়ম্বর দেখে তাই মনে হয় যে তাঁদের এই দুঃসাহসী পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে তাঁদের কি পরিমাণে গভীর বিশ্বাস ছিল।

পাঁচই ডিসেম্বর, উনিশ শ' চল্লিশে হিটলার জার্মাণ জেনারেলদের

এক সভায় বলেন যে তিনি আশা করেছেন, "উনিশ' চল্লিশে ফরাসীরা জার্মাণ সৈন্যের আক্রমণে পরাজিত হয়ে যেমন দিশাহারা হয়ে পড়েছিল, রাশিয়ার সেনাদলের অবস্থা জার্মাণ সৈন্যের সামনে হবে তার চেয়েও খারাপ।"[২০]

সাতাশে মার্চ, উনিশ শ' একচল্লিশে মাত্‌সুওকার (Matsuoka) সঙ্গে এক আলোচনায়, নাৎসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিবেনট্রপ বলেন যে জার্মাণী সুনিশ্চিত যে, "রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের পরিণামে রাশিয়ারই ঘটবে চূড়ান্ত পরাজয় এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতন।"[২১] হিটলারের অনুচরেরা আশা করেছিলেন যে শীত এসে পড়ার আগেই এই যুদ্ধ এনে দেবে তাদের বিজয় গৌরব।

"সমর পরিষদ ও স্থলবাহিনীর সর্বোচ্চ সংস্থা, "হাইনজ্‌ গুদেরিয়ান তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, "শীত এসে পড়ার আগে যুদ্ধ শেষ করতে পারবেন বলে এমনই সুনিশ্চিত ছিলেন যে সেনাদলে প্রতি পাঁচজনে মাত্র একজনের জন্যে তাঁরা শীত বস্ত্রের যোগান দিয়েছিলেন।"[২২] পরবর্তীকালে জার্মাণ জেনারেলরা এর জন্যে সমস্ত দোষারোপ করেছেন হিটলারকে। কিন্তু গুদেরিয়ান স্বীকার করেছেন যে জেনারলেরাও দোষত্রুটী অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি লিখেছেন "এখন যে ধারণা ব্যাপক ভাবে চালু আছে যে উনিশ শ' একচল্লিশে সৈন্যবাহিনীকে যথেষ্ট শীতবস্ত্র সরবরাহ না করার দোষ শুধু একা হিটলারের, আমি তা মানতে পারি না।"[২৩]

হিটলার কেবল তার নিজের কথা নয়, সব জেনারেলের মনের কথাই বলেছিলেন, যখন তিনি বলেন, "নেপোলিয়নের মতো ভুল আমি করবো না। মস্কোয় আমি যখন যাবো, তখন যেন শীতের আগেই সেখানে পৌঁছতে পারি সেটা ভেবেই যাবো।"[২৪]

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করার অল্প কিছু কাল আগে বেক্টস্‌গ্যাডেনে (Berchtsgaden) এক বৈঠকে জেনারেল জোড্‌ল (Jodl) গর্বের সঙ্গে বলেন, "আমরা আক্রমণ সুরু করার তিন সপ্তাহ পরেই ওই তাসের ঘর ভেঙ্গে পড়বে।"[২৫]

তাদের যুদ্ধ পরিকল্পনা একেবারে নির্ভুল এই রকমের সুনিশ্চিত ধারণা নিয়ে জার্মাণ সমর পরিষদ সোভিয়েত ইউনিয়ন অধিকার সম্পূর্ণ করে বিশ্ব আধিপত্য

বিস্তারের জন্যে আর কি করবে তার জন্যে একটা নির্দেশনামা রচনা করে রাখলেন। এই বত্রিশ সংখ্যক নির্দেশনামার শিরোনামায় লেখা হয়েছিল বারবারোসা পরিকল্পনা কার্যকরী হওয়ার পরবর্তী সময়ের প্রস্তুতি। এতে বলা হলো একদিকে জিব্রাল্টার দখল করতে হবে অন্যদিকে "ট্রান্সককেসাস (Trans-caucasus) অতিক্রম করে এক মোটরবাহিত সেনাদল পাঠানো হবে আক্রমণ করার জন্যে প্রথমে পারস্যোপসাগরীয় অঞ্চলে, তারপর ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে।"[২১] বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে অভিযান করার কথাও এতে বলা হয়েছিল। নির্দেশনামার মতে একমাত্র জিনিস যা এই পরিকল্পনার রূপায়ণে বিলম্ব ঘটাতে পারে, তাহলো আবহাওয়া।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পূর্বে জার্মাণ সরকার তাঁর সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে বাহাত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার সাধারণ সৈনিক ও অফিসারে পরিণত করেন। এ ছাড়া ছিল তাঁর আরো সম্পূর্ণ শিক্ষিত, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, সংরক্ষিত বাহিনী। তাঁদের ধারণা হয়েছিল এটাই যথেষ্ট। কারণ যুদ্ধের এই অবস্থা পর্যন্ত জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল মাত্র তিরানব্বই হাজার সাত শ' ছত্রিশ।[২৭] জার্মাণীর মোট দুশ' বাইশ ডিভিশন সেনাদলের মধ্যে একশ' তিপান্ন ডিভিশনকে নিযোগ করা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। প্রথম পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানে একযোগে কাজে লাগানো হবে একশ' উনত্রিশ ডিভিশনকে। আর সর্বোচ্চ সমর পরিষদ ও সেনানায়কেরা বাকী চব্বিশ ডিভিশনকে সংরক্ষিত রাখবেন। তাছাড়া জার্মাণীর অনুগত ও তাঁবেদার দেশগুলি নিয়োগ করলো আরো সাইত্রিশ ডিভিশন, এর মধ্যে ফিনল্যাণ্ডের ছিল সতের, রুমেনিয়ার আঠারো আর হাঙ্গেরীর দুই ডিভিশন। সর্বসাকুল্যে একশ' নব্বই ডিভিশন সৈন্য আর পাঁচ হাজার জঙ্গীবিমান প্রস্তুত হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার জন্যে।

হিটলার-নেতৃত্ব এই আক্রমণ পরিকল্পনায় আকস্মিকতা ও বিস্ময়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে তাদের কাজে লাগাতে তৎপর ছিলেন। জার্মাণ সংবাদপত্রে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ আক্রমণের তোড়জোড়ের খবর প্রকাশিত হতে লাগলো। জার্মাণ সেনাদল নরওয়ে আর উত্তর ফ্রান্সে যেখানে সেখানে টহল দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এইসব সৈন্য চলাচল ও তোড়জোড়ের খবর প্রকাশের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কিন্তু মার্শাল পাউলাস বলেছিলেন পরবর্তীকালে,

বিশ্বযুদ্ধ—১০

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আক্রমণ সুরু করার ছলে, রাশিয়ার মনোযোগ সরিয়ে দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করা।[২৮] ঠিক একই কারণে জার্মাণ সরকার আসন্ন অভিযান সম্পর্কে পূর্বসীমান্তে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীকে কোন খবরই জানাননি আগে।

তা সত্ত্বেও জার্মাণ সংবাদপত্রে ধীরে ধীরে আসন্ন কার্যক্রমের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। সেখানে বের হচ্ছিল এমন সব মিথ্যা খবর যাতে ধারণা হয় জার্মাণী শান্তির জন্যে কতোই না আগ্রহী আর সোভিয়েত সেখানে চালাচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। এতে অন্য নানা উদ্দেশ্য সাধন ছাড়াও আরেকটি মস্তো লক্ষ্য ছিল পশ্চিমী শক্তিবর্গের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ। নাৎসী পররাজ্য আক্রমণ-কারীরা এটাই যেন দেখাতে চাইছিল যে সমগ্র ইউরোপকে "বলশেভিক আক্রমণ" থেকে রক্ষা করাই তাদের পবিত্র লক্ষ্য। কিছু কিছু মার্কিণ, বৃটিশ ও জাপানী সংবাদপত্র জার্মাণীর এই চাতুরীতে বিভ্রান্ত হয়ে তার মুখের কথায় বিশ্বাস করতে সুরু করে। ফলে তাদের কাগজে বের হতে থাকে সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রস্তুতির মিথ্যা খবর।

ফ্যাশিস্তদের প্রচারের জন্যে জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নানা দুর্নীতি, অনাচার, অনুপ্রবেশ করতে থাকে। আসন্ন যুদ্ধের শেষে তাই নাৎসীরা সাধারণ সৈনিক ও অফিসারদের সামনে তুলে ধরতে থাকে নানা রঙীন প্রতিশ্রুতি, সুখ সুবিধা প্রাচুর্যের স্বপ্ন। সাধারণ সৈনিককে প্রলুব্ধ করা হলো এই কথা বলে যে সহজে যদি কপাল ফেরাতে হয় তাড়াতাড়ি, তাহলে সে সুযোগ আসবে এইবার। হিটলারের একটা কথাকে বেশ ফলাও করে চারদিকে প্রচার করা হতে লাগলো। সেটা হলো: "জার্মাণ জাতি হবে সৈনিকের জাতি। অন্যসব জাতিকে তার দাসত্ব করতে হবে, টিউটোনিক জাতির বীর যোদ্ধাদের হুকুম তামিল করাই হবে তাদের কাজ।"

সোভিয়েতের মানুষের বিরুদ্ধে কোন অন্যায়, কি অত্যাচার অপরাধ অনুষ্ঠিত হবে তারও পরিকল্পনা করে রাখা হলো অনেক আগের থেকে। শুধু তাই নয় সামরিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট লিখিত আদেশের অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলি পালন করা সৈন্যদলের বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হলো। উনিশ শ' একচল্লিশের তেরোই মে, জার্মাণ সরকার এক বিশেষ ডিক্রী জারি করলেন, "বারবারোসা অঞ্চলে সামরিক ক্ষমতা ব্যবহারের এক্তিয়ার ও সৈন্যদের বিশেষ করণীয় কাজ।" ডিক্রীতে অসামরিক জনগণের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হলো

এবং সামান্যতম প্রতিরোধের আভাস কোথাও দেখলে সমস্ত লোককে গুলী করে হত্যা করার কথা বলা হলো। "সন্দেহজনক ব্যক্তিদের বিচার করা কিম্বা তাদের আটক রাখা সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে নির্দেশ দেওয়া হলো যেন দেখামাত্রই তাদের গুলী করা হয়। তাছাড়া অধিকৃত অঞ্চলের জেলায় জেলায় সমস্ত মানুষের উপর পিটুনী কর আদায়েরও ব্যাপক অধিকার দেওয়া হলো এতে।

জার্মাণ সৈন্য, অফিসার এবং সমস্ত সমরবিভাগীয় ব্যক্তিকে অসামরিক মানুষদের উপর অ্যাতচার চালানোর জন্যে কোন দায়ে অভিযুক্ত করা হবে না। এমনকি জঘন্য সামরিক অপরাধও যদি কোথাও অনুষ্ঠিত হয় তাহলেও তারা অব্যাহতি পাবে। জার্মাণ সরকার জানতেন যে এই ডিক্রীর মতো জঘন্য অপরাধমূলক দলিল আর হতে পারে না যাব আদ্যোপান্ত অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় ভরা তাই পরে তাঁরা এর সমস্ত প্রচারিত সংখ্যাকে নষ্ট করার আদেশও দিয়েছিলেন।[২৯]

একজন উচ্চপদস্থ জার্মাণ নেতা, এরিক কোক (Erich Koch) যাঁকে হিটলার পরবর্তী কালে অধিকৃত ইউক্রেনে সামরিক শাসক নিযুক্ত করেছিলেন সেনাবাহিনীর মানুষদের বলেন :

"আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি যে পূর্বাঞ্চলে যে সব কলকারখানা আমরা দখল করবো তা সবই তোমাদের দিয়ে দেওয়া হবে। এই প্রতিশ্রুতি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো। যোগ্যতা অনুযায়ী তোমাদের যে কেউ যে কোন পদ চাইবে তাকে আমি সেখানেই নিয়োগ করবো। তার জন্যে কারো কাছে টাকা চাইবো না বা নামও জানাতে বলবো না। আমরা যৌথ ভাবে যে বিপুল সম্পদের অধিকারী হব তাতে আমি সুনিশ্চিত। যুদ্ধের ফল, তার সুযোগ সুবিধে আমরা যারা লড়াই করছি, দেশ জয় করছি তাদের কাজেই লাগা উচিত।"

সোভিয়েতের শহরে ও গ্রামে অবাধে লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ ও যাকে খুশি হত্যা করার অধিকার দেওয়া হলো ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর সেনাদলকে। এক কথায় সমস্ত অপরাধ অনুষ্ঠানকে উৎসাহ দেওয়া হলো, তাদের বিন্দুমাত্র নিষিদ্ধ করার কথা কেউ ভাবেনি।

জার্মাণ সমরবিভাগের লোকজন কর্মীরা হিটলারের প্রচারে মোহগ্রস্ত হয়ে গেল। লুটের অভাবনীয় সম্ভাবনা তাদের প্রলুব্ধ করে তুললো। সোভিয়েতের

বিরুদ্ধে লড়াই তারা ধরেই নিয়েছিল যে নিতান্ত সাধারণ একটা ব্যাপার, বন্দুক ঘুরিয়েই জেতা যাবে। আর তারপর হাতে আসবে আলাদীনের ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি।

কিন্তু প্রত্যাশা তাদের উল্টো হয়ে গেল।

গোয়েরিং যিনি জার্মাণ একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিত্ব করতেন তাকে সোভিয়েত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের ভার নিতে বলা হলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর আক্রমণ সুরু করার অনেক পূর্বেই তিনি গ্রীণ ফোল্ডার (Green Folder) ছদ্মনাম দিয়ে চূড়ান্তভাবে তার নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা গ্রহণ করার একটা খসড়া কার্যক্রম রচনা করেছিলেন। একুশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশে হিটলার এক আদেশ জারী করে "অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে সমস্ত মজুত মাল ও সম্পদের চূড়ান্ত ব্যবহার করার জন্যে"[৩০] গোয়েরিংকে অসীম ক্ষমতা দান করেন।

গোয়েরিংয়ের গ্রীনফোল্ডার কার্যক্রমে একটা "প্রাচ্য অর্থনৈতিক সর্বোচ্চ-দপ্তর" স্থাপনের খুঁটিনাটি বিবরণ ছিল। এর বিস্তৃত শাখা প্রশাখায় পরে জার্মাণীর প্রথম সারির একচেটিয়াপতিদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। অধিকৃত অঞ্চলে তারাই সমস্ত "অর্থনৈতিক নেতৃত্বদান" করবে স্থির হয়। গোয়েরিংয়ের মূল পরিকল্পনা ও পরে বিভিন্ন পরিপূরক নির্দেশে যে অবস্থার কল্পনা করা হয় তাতে স্থানীয় সোভিয়েত জনগণের সমস্ত স্বার্থকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তাদের অনাহারে মারবার ফন্দী করা হয়। বিশে জুন উনিশ শ' একচল্লিশে অ্যালফ্রেড রোজেনবার্গ বলেন :

"এই উর্বর ভূখণ্ডের সম্পদ থেকে, উৎপাদন থেকে রাশিয়ার লোকদের খাওয়ানোর কোন দায়িত্বই আমাদের নেই। এটা যে একটা কঠোর বাস্তব যেখানে কোন অনুভূতির স্থান নেই তা আমরা জানি......রাশিয়ানদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।"[৩১]

অসামরিক জনগণকে পাইকারী হারে হত্যার জন্যে তাই বসানো হলো বিশেষ সামরিক কম্যাণ্ডের ইউনিট। অনেক আগের থেকেই রাখা হলো তাদের সব ব্যবস্থা করে। অধিকৃত অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ ও সেনাবাহিনীকে হিটলারের সংশ্লিষ্ট আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করার নির্দেশ দিলেন জার্মাণ সরকার। হিটলার বলেন : "আমাদের দেশের (সোভিয়েতের) সমস্ত মানুষকে হত্যা

করতে হবে কারণ জার্মাণ জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্যে তা দরকার। সেই হত্যার কলা-কৌশলকে আবিষ্কার করতে হবে, উন্নত করতে হবে।......যেহেতু যুদ্ধের সেই ভয়াবহ আগুনে আমি আহুতি দিচ্ছি জার্মাণীর সেরা মানুষদের, বিন্দুমাত্র আক্ষেপ না করে মহামূল্য জার্মাণ রক্তের স্রোত বইয়ে দিচ্ছি, তাতে আমার নিশ্চয়ই এই অধিকার আছে যে, যে জাত পোকা মাকড়ের মতো ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি করছে তার লক্ষ লক্ষ সংখ্যাকে নিঃশেষিত করার।”[৩২]

পাইকারী হারে সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের হত্যার সিদ্ধান্তও অনেক আগে নেওয়া হয়েছে। সমর পরিষদের সর্বোচ্চ দপ্তরে লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল রাইনেক্‌কের Reinecke অধীনে খোলা হয়েছিল একটি যুদ্ধবন্দী দপ্তর। মার্চ্চ উনিশ শ' একচল্লিশে একটা গোপন বৈঠকে রাইনেক্‌কে “যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হবে” তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। খোলা জায়গায় প্রায় অনাহারে রাখতে হবে তাদের, তারপর পাইকারীভাবে হত্যা। পরবর্তীকালে ফিল্ডে মার্শাল ফন রাইকেনাউ (Reichenau) একটা আদেশজারী করে বলেন যে, “অসামরিক জনগণ ও যুদ্ধবন্দীদের খাদ্য যোগান দেওয়া হলো একটা অর্থহীন বিবেকদংশনের অনুভূতি।”[৩৩]

ইউক্রেনায় ও বাল্টিক জাতীয়তাবাদী ও বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে থেকে জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সব ফ্যাশিপন্থীদের দলে টেনে নিয়েছিল তাদের কাজে লাগাতে মনস্থ করেছিল নাৎসীরা। অধিকৃত ইউরোপের সর্বত্র শ্বেত রুশিয়দের মধ্যে থেকে খুব তাড়াতাড়ি এই ধরণের লোক সংগ্রহ করে, জার্মাণীর গুপ্তচর শিক্ষাকেন্দ্রে তাদের শিক্ষিত করে ছেড়ে দেওয়া হলো সোভিয়েতের মানুষদের মধ্যে।[৩৪]

জার্মাণীর আগাগোড়া লক্ষ্য ছিল তার সমস্ত তাঁবেদার ও অনুগত রাষ্ট্রকে এই যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসা, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণে শরিক করে তোলা। তাই আক্রমণ সুরু করার অনেক আগের থেকে আলাপ আলোচনা চলছিল। ফ্যাশিপন্থী ইটালীকে রাজী করানো গেল সহজেই। মুসোলিনী ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা হিটলারের সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে নেচে উঠলেন। হাঙ্গেরীর সঙ্গে এইরকমই একটা বোঝাপড়া উনিশ শ' আটত্রিশ সাল থেকেই চলে আসছিল। হাঙ্গেরীর ফ্যাশিপন্থী একনায়ক হোরথী (Horthy) ইতিপূর্বেই হিটলারের সঙ্গে বহুবার দেখা সাক্ষাৎ করে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন

যে সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধে হাঙ্গেরী যোগদান করবে। বার্লিনে ডিসেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে, হাঙ্গেরীর দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল কারোলী বার্থা (Karoly Bartha), জার্মাণীর সেনানায়ক পরিষদের প্রধান ফিল্ড মার্শাল কাইটেলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হাঙ্গেরী কতো সৈন্য সমাবেশ করবে এবং হাঙ্গেরীর মূল ভূখণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্যে কি ভাবে জার্মাণীকে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে তার সর্তাবলী নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হলো। প্রতিদানে হাঙ্গেরী পাবে গ্যালিশিয়া আর কার্পেথিয়ান পর্বতের সানুদেশ একেবারে নিস্টারের (Dniester) সীমানা পর্যন্ত। জার্মাণী ও হাঙ্গেরী সমর অধিনায়কদের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপিত হলো। উনিশ শ' একচল্লিশ মে মাসের শেষের দিকে হাঙ্গেরী সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে বললেন যে এটা হলো "জার্মাণীর সঙ্গে দীর্ঘকালের স্বেচ্ছামূলক সামরিক সহযোগিতার পরিণতি।"[৩৫]

ফিন সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধি হিসেবে, ডিসেম্বর উনিশ শ চল্লিশে জেনারেল হাইনরিখস্ (Hinrichs), জোসেনে জার্মান সমর পরিষদের এক গোপন বৈঠকে যোগ দেন। উনিশ শ' উনচল্লিশ-চল্লিশে সোভিয়েতের সঙ্গে লড়াই করে ফিনল্যাণ্ড কি অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছে, তারই এক বিস্তারিত বিবরণী পেশ করেন তিনি এই সভায়। হাইনরিখ্স্ যে আলাপ আলোচনার সূত্রপাত করেন তা মে মাসের দ্বিতীয়ার্দ্ধ পর্যন্ত চলে, উভয় দেশের সামরিক প্রচেষ্টার মধ্যে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা চুক্তির আকারে পরিণতি লাভ করে। সেদিন ছিল বাইশে মে, উনিশ শ' একচল্লিশ সাল। ফিনল্যাণ্ডের সহায়তায় সেই দেশের মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের কার্যক্রমকে একটা সাংকেতিক নাম দেওয়া হলো, "ব্লু ফক্স"—নীল শৃগাল বারবারোসা কার্যক্রমের এটা হলো একটা পরিপূরক পরিকল্পনা।

শ্বেত সাগর বাল্টিক সাগর সংযোগ খাল বিনষ্ট করে, ফিনল্যাণ্ড জার্মাণীকে সোভিয়েতের বাল্টিক সাগরস্থ নৌবহর দখল করতে সাহায্য করবে। আর তার সঙ্গে মুরমানস্কে অভিযান চালিয়ে বারেন্ত সাগরের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে। প্রতিদানে ফিনল্যাণ্ড পাবে কোলা উপদ্বীপ ছাড়া (কারণ জার্মাণ একচেটিয়াপতিরা এর উপর অনেক দিন থেকেইনজর দিয়ে রেখেছে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্যে) সমগ্র পূর্ব কারেলিয়া ও

ও লেনিনগ্রাদ অঞ্চল। জার্মাণ ও ফিনদেশের ফ্যাশিস্তরা লেনিনগ্রাদ ধ্বংস করার জন্যে যৌথভাবে রচনা করলো এক মারাত্মক, ঘৃণ্য কার্যক্রম। জার্মাণ সমর পরিষদের এক সরকারী দলিলে বলা হয়েছিল :

"ফুয়েরার পিটার্সবার্গ শহরটিকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলতে মনস্থ করেছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়া পরাজিত হয়ে গেলে, এই জনবসতিপূর্ণ বিরাট শহরের অস্তিত্ব টি'কিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই।"৩৬

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুমেনিয়ার অংশ গ্রহণ সম্পর্কে আলাপ আলোচনা সুরু হয় উনিশ শ' চল্লিশের নভেম্বর মাসে। রুমেনিয়ার ফ্যাশিবাদী একনায়কতন্ত্রী নেতা আয়োন আন্তোনেস্কুকে তলব করা হলো বার্লিনে। জেনারেল হ্যানসেনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ সামরিক দল পাঠানো হলো রুমেনিয়ায় তার সেনাদলকে পুনর্গঠিত করতে। হিটলার আর আন্তোনেস্কু (জানুয়ারী আর মে উনিশ শ' একচল্লিশে) বৈঠকে বসলেন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যৌথ সামরিক কার্যসূচী রচনা করার জন্যে। যুদ্ধশেষে আন্তোনেস্কু তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন :

"সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যৌথভাবে আক্রমণ সুরু করার জন্যে আমরা সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেল্লাম। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা হিটলারই আমায় জানিয়েছিলেন। আক্রমণের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে পরেই, হিটলার বলেছিলেন, সোভিয়েতের সমগ্র সীমান্ত জুড়ে বাল্টিক থেকে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত এই সমগ্র অঞ্চলে আচম্বিতে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করতে হবে। যেহেতু আমার নিজস্ব পররাজ্য আক্রমণের কর্মসূচীর সঙ্গে হিটলারের সোভিয়েত বিরোধী কার্যক্রমের যথেষ্ট মিল ছিল, আমি সম্মতি জানিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রুমেনিয়া সৈন্য সংগ্রহের কাজে মন দিলাম। তাছাড়া তৈল ও কৃষিজ দ্রব্যাদি নিয়মিত জার্মাণীকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলাম আমি।"৩৭

হিটলার শপথ করলেন যে প্রতিদানে হাঙ্গেরী পাবে বেসারেবিয়া, উত্তর বুকোভিনা ও নীপারের পশ্চিমকূলস্থ সমস্ত সোভিয়েত ভূমি।

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্যে হিটলার জার্মাণী পেঁত্যার সঙ্গেও আলাপ করলেন। চব্বিশে অক্টোবর উনিশ শ' চল্লিশে হিটলার ফ্রান্সের মত'য়ারে অঞ্চলে তাঁদের বৈঠকে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করলেন। পরে

পেঁত্যার পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডারল্যান, একুশে মে, উনিশ শ' একচল্লিশে এক আমন্ত্রণ পেয়ে হাজির হলেন ব্রেক্টস গ্যাডেনে। তিনি দিয়ে আসলেন প্রায় একটি ঢালোয়াভাবে দেওয়া প্রতিশ্রুতি, যার মধ্যে আছে প্রয়োজনমতো ফরাসী স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী প্রেরণের কথা, কাঁচা মাল ও উৎপাদনের কাঠামো ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমিক প্রেরণের কথা।

জার্মাণ শাসকদের সব চেয়ে বড়ো ভরসা ছিল জাপানীরা। তাঁরা চেয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নকে একেবারে পর্যুদস্ত করার জন্যে, জাপানই প্রথম তাকে আক্রমণ করবে। এতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যাবে—সোভিয়েতের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি অনুযায়ী যে ধরনের কাজ করা তার পক্ষে নিষিদ্ধ তা লঙ্ঘন করলেও ধরা যাবে না এবং সেই সঙ্গে পশ্চিম থেকে সোভিয়েতের মনোযোগ আর সৈন্য সমাবেশ সরিয়ে দেওয়া যাবে পূর্বে। হিটলারের অনুগামীরা চেয়েছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপান পরস্পরকে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ করে উভয়েই দুর্বল, শক্তিহীন হয়ে পড়ুক। তাতে জাপানের বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের দাবী সীমিত হয়ে আসবে এবং ইতালী যেমন জার্মাণীর উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে সেও তেমনি বাধ্য হবে।

কিন্তু জাপানের নেতারা আলাপ আলোচনার বিষয়টি ক্রমাগত এড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে মার্চ উনিশ শ' একচল্লিশে, জাপানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জোসুকে মাৎসুওকা (Josuke Matsuoka) এলেন বার্লিনে। তিনি জার্মাণ মৈত্রীর প্রতি আনুগত্য জানিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, "সাধারণ লক্ষ্যের অভিমুখে জাপান তার শক্তি ও মন দুইই কেন্দ্রীভূত করবে, উৎসর্গ করে দেবে।"[৩৮]

কিন্তু ঠিক কোন তারিখ থেকে জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে তা না জানানোর জন্যে হিটলার অসন্তুষ্ট হলেন তাঁর প্রতি। কারণটা খুবই স্পষ্ট। তাঁর দেশেরও আছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ, তাই হিটলারের কথায় সায় দিতে তাঁরা অস্বীকৃত হলেন। তাতে লাভ কিছুই নেই, বরং লোকসান।

হিটলারপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণীবিরোধী কোন কোন দেশকেও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতে। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা আশা করে ছিল আরেকবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে তাকে কাজে লাগাতে পারবে। বৃটিশ ও মার্কিণী প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব সে ব্যবহার করতে পারবে নিজেদের স্বার্থ

সাধনে। তাই বৃটেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে, বৃটেণ ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক গোষ্ঠীর সমর্থন ও সাহায্য নিয়ে লড়াই করবে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে। তারপর নোতুন করে সংগ্রাম সুরু করবে প্রথমে বৃটেন ও পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে।

এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে ফ্যাশিস্ত দলে হিটলারের সহকারী নেতা রুড্‌লফ হেসকে নাৎসীরা পাঠালো কাজ করার জন্যে। দশই মে, উনিশ শ' একচল্লিশে, হেস জার্মাণীর অগসবার্গ থেকে মেসসারস্কমিট—১১০ বিমানে চড়ে এলেন বৃটেনে।

বৃটিশ সরকার তাঁদের বিশেষ মুখপাত্র আইভন কার্কপ্যাট্রিকের মাধ্যমে আলাপ আলোচনা চালালেন তাঁর সঙ্গে। তাছাড়া প্রখ্যাত বৃটিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ লর্ড হ্যামিলটন, লর্ড সাইমন ও লর্ড বিভারব্রুকের সঙ্গে হেসের দেখা সাক্ষাৎ হলো। জার্মাণ ফ্যাসিবাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সাইমনের সঙ্গে হেসের বেশ খোলাখুলি আলোচনা হলো নানা প্রসঙ্গ নিয়ে।[৩৯]

হেসের মাধ্যমে প্রেরিত হিটলারের প্রস্তাবের সার কথা ছিল ঃ শান্তি চুক্তি করে, ইউরোপে জার্মাণীর সব কিছু করার অধিকার মেনে নিতে হবে। বৃটেনের অনুরূপ অধিকার থাকবে প্রাক্তন জার্মাণ উপনিবেশ ছাড়া সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে। প্রাক্তন উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে জার্মাণীকে। সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে প্রাধান্য দেওয়া হলো এতে সবচেয়ে বেশি। সেখানে বলা হয়েছে যে, "সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে রাইখ অনেকগুলি দাবী পেশ করবে, যা মেটাতে গেলে পথ দুটি, হয় আলাপ আলোচনা, নয় যুদ্ধ।" কার্কপ্যাট্রিক প্রশ্ন করেছিলেন, রাশিয়াকে কিসের অংশ, এশিয়া না ইউরোপের অংশ বলে মনে করা হবে। তাঁকে জানানো হলো যে সে "এশিয়ার অংশ বিশেষ মাত্র।"[৪০]

হেস ঘোষণা করেন যে ; "বৃটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামো অপরিবর্তিত রেখে, হিটলার নিজের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের এক চিরস্থায়ী বোঝাপড়া ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করতে চান। এই বিমান যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল বৃটেনকে সম্মান না খুইয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।"

নাৎসী দূত জানালেন যে তাঁর প্রস্তাবে বৃটিশ সরকারের জবাব তিনি স্বয়ং বিমানযোগে জার্মাণীতে পৌঁছে দিতে চান। অবশ্য যোগাযোগের আরেকটি

মাধ্যমের কথাও তিনি বলেছিলেন। তা হলো আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলিনে জার্মাণ রাষ্ট্রদূতাবাসে কার্কপ্যাট্রিককে চিঠি দিয়ে পাঠানো।

হেসের প্রস্তাবে দেশে বিতর্কের ঝড় উঠলো। কোন কোন বৃটিশ ও মার্কিণ নীতি নিয়ামকরা হেসের প্রস্তাব গ্রহণ করার স্বপক্ষে মত দিয়েছিলেন। আবার অপর কয়েকজন এর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বললেন যে জার্মাণীর আরোপিত সর্তাবলী সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বকে না প্রশমিত করে আরো তীব্র করে তুলেছে। এতে বৃটেনের অসুবিধা হবে স্পষ্টতই অনেক বেশি। এর ফলে যেখানে ইউরোপে ও এশিয়ায় হিটলারের অভিযান বেশ দ্রুত গতিতে চলার সুযোগ পাবে, তখনও তার পরিবর্তে বৃটেন যা তার আছে, তার বেশি কিছুই পাবে না। বরং তার অধিকৃত অঞ্চল আয়তনে ছোট হয়ে যাবে, কারণ জার্মাণী প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ক্ষতিপূরণ বাবদ যে ভূখণ্ড ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, তা আবার তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। বৃটিশ ও মার্কিণ রাজনীতিকদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন অধিকতর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তাঁদের কাছে হিটলারের পরিকল্পনার আসল চেহারা ধরা পড়ে গেল। তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে জার্মাণীর শান্তি নীতি কেবল মাত্র সমকালের জন্যে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে বৃটেনের সঙ্গে জার্মাণীর একটা বোঝাপড়া করার প্রচেষ্টা, বৃটেনের মেহনতী মানুষের প্রতিরোধের মনোভাবের জন্যেই বানচাল হয়ে যায়। হেসের দৌত্য বৃটেনের মানুষদের সন্ত্রস্ত করে তোলে। হিটলারপন্থীদের সঙ্গে কোন সমঝোওতা করার বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। তেসরা জুন, উনিশ শ' একচল্লিশে শ্রমিকদলের এক সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। জার্মাণীর সঙ্গে শান্তির নামে আপোষ করার প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত হয়। সভায় বৃটেনের মানুষ ও মেহনতী জনগণের ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প পুনরায় জোরালো ভাবে ঘোষণা করা হয়।

ওদিকে অবশ্য কার্কপ্যাট্রিক ডাবলিনে উপস্থিত হয়ে জার্মাণ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করেন যথা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।[৪১] সেখানে তিনি তাদের প্রস্তাবে কি জবাব দিয়েছিলেন তা আজ পর্যন্ত গোপন রয়ে গেছে।

বৃটেনের জনসাধারণ এধারে হিটলার জার্মাণীর সঙ্গে কোন চুক্তি করার

এমনই তীব্র বিরোধী ছিল যে বৃটিশ সরকারের পক্ষে তাদের ইচ্ছা, মতামত অমান্য করার কোন উপায় ছিল না। হেসের দৌত্য ব্যর্থ হলো। নাৎসী জার্মাণীর কাছে এটা হয়ে রইলো একটা মস্ত বড়ো রাজনৈতিক পরাজয়। আর এটাই পরবর্তী কালের ফ্যাশি বিরোধী রাষ্ট্রিক মোর্চা গঠনের পথ প্রশস্ত করে কিন্তু সেদিন হিটলার এই ব্যর্থতার সমস্ত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি। বরং গর্বভরে তিনি একথাই বলেছিলেন যে, "বারবারোসা পরিকল্পনা যখন বাস্তবে রূপায়িত হবে তখন সারা দুনিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই কাজের দিকে তাকিয়ে থাকবে মুখ দিয়ে আর কথা সরবে না।"[৪২]

তিরিশে এপ্রিল, উনিশ শ' একচল্লিশে জার্মাণ সমর পরিষদের সর্বোচ্চ সংস্থা আদেশ জারী করলেন যে আগামী ২২শে জুন থেকে বারবারোসা পরিকল্পনার কাজ সুরু হবে।[৪৩] ছয়ই জুন তারিখে বার্লিনে চ্যান্সেলরীতে সমরনায়কেরা খবর পাঠালেন যে তাঁদের অধীনস্থ বাহিনী সব প্রস্তুত। ফ্যাশিস্ত দানবটা আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠলো।

হিটলারপন্থী সমেত ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার রাজনৈতিকদের পক্ষে কোন নিশ্চয়তার সঙ্গে সোভিয়েতের প্রকৃত শক্তি ও সমর আয়োজনের হদিশ করা শক্ত ছিল।

তার শক্তির মূল বনিয়াদ ছিল সমাজতন্ত্রের সামাজিক তথা রাজনৈতিক আস্থার গভীরে নিহিত। সমাজতন্ত্রী সমাজ উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানার ভিত্তিতে রচিত। সেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করে না। তার বনিয়াদ হলো যৌথ মালিকানা। যৌথ শ্রমের তারাই হলো সাফল্যের প্রতীক। আর সেখানেই আছে সাধারণ মানুষের ঐক্য, সংহতির মৌল স্তর, তার সঞ্জীবনী মন্ত্র। সোভিয়েতে সমাজে শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। কারণ যার থেকে তার সূত্রপাত সেই উৎপাদন ব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত মালিকানার কোন সুযোগই সেখানে নেই।

সামাজিক মালিকানাই তাই তার শক্তিতে সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, সংহত রূপ দিয়েছে। তাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। পুঁজিবাদী নীতি জনসাধারণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। তাতে তাদের প্রকৃত ঐক্য ব্যাহত হয়।

জাতির শক্তির উৎসমূলকে সে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। সেখানে যৌথ নীতি সোভিয়েত সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজের তুলনায় এনে দিয়েছে অনেক সুযোগ।

শ্রমিক ও কৃষকের অবিচ্ছেদ্য মৈত্রী সম্পর্ক, যার সঙ্গে বুদ্ধিজীবিরা যুক্ত হয়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজের সহজ প্রেরণায় তাই হলো সোভিয়েত সমাজের সবচেয়ে বড়ো শক্তি। সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থা হলো প্রকৃতই সেই জনপ্রিয় ব্যবস্থা যার শক্তির উৎস হচ্ছে জনগণের জোরালো সমর্থন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের সাফল্য তার জাতীয় জীবনে এনেছে আদর্শগত ও রাজনৈতিক ঐক্যের চেতনা। আর সেই ঐক্যের চেতনা আসছে কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকারের পিছনে দৃঢভাবে দণ্ডায়মান সমস্ত মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্বার্থ বোধ থেকে।

সোভিয়েত সমাজ ব্যবস্থার মতো সোভিয়েতের রাজনৈতিক কাঠামো জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে তাদেরই ক্ষমতায় রচিত, তাদের সমর্থনে পরিচালিত, এক জনপ্রিয় শাসন ব্যবস্থা। সোভিয়েতের জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন অনুসারে তাই দেখা যায় যে তার রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে প্রতিটি জাতির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে স্বাধীনভাবে সুগঠিত করবার সুযোগের স্বীকৃতি। সোভিয়েতের রাজনৈতিক কাঠামোর তাৎপর্যই হলো তাই একান্তভাবে গণতান্ত্রিক। সেই জন্যে সোভিয়েত সরকারের সমস্ত নীতি ও কার্যক্রমের মধ্যে প্রকাশমান হয় তার সমস্ত মানুষের কল্যাণ চিন্তা তাদের স্বার্থরক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহ। সে দেশে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্যবহার করেন, আর সেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে দেশের সমস্ত মানুষ।

বহু জাতিক সোভিয়েত রাষ্ট্রের জনগণের মৌল সংহতি ও ঐক্যবোধের প্রধান কারণ আছে তার উৎপাদন ব্যবস্থার সমাজতন্ত্রী বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নিহিত। সোভিয়েতের জাতিগুলি তাদের সাধারণ বিশ্বচেতনা, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সহযোগিতার মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে। দেশের সমস্ত জাতি ও জাতীয় জনসমাজের মধ্যে বন্ধুত্ব, সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে পেরেছে সোভিয়েত ব্যবস্থা, যাকে বলা যেতে পারে জাতি সমস্যার একমাত্র বৈপ্লবিক ও যথাযথ সমাধানের প্রতীক—যা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোথাও বোধ হয় সম্ভব নয়।

সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থা সমগ্র দেশের জাতি ও জাতীয় জনসমাজগুলিকে এক বিরাট সমাজতান্ত্রিক পরিবারের শরিক করে তুলেছে। সেই বন্ধুত্ব জোগাচ্ছে একটা প্রচণ্ড শক্তি অগ্রগতির স্বপক্ষে, যা জনগণের বিরাট অংশকে সক্রিয় করে, সমগ্র জাতিকে সচেতন করে আনছে এক বিরাট ঐতিহাসিক পরিবর্তন। সোভিয়েতের সমাজ তথা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা প্রেরণা জুগিয়েছে সোভিয়েত দেশপ্রেমের যাকে সম্পূর্ণ একটা নোতুন ধরণের, উন্নত দেশপ্রেম বলা যায়, সোভিয়েতের সমাজের শক্তি হিসাবে যার জোরালো অবদান আছে। সোভিয়েত ভূমির অগ্রগতি ও সাম্যবাদের চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে সোভিয়েতের মানুষ তার নিজ দেশের প্রতি গভীর, ঐকান্তিক আনুগত্যের সম্পর্কে আবদ্ধ। তার জাতিতে জাতিতে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্কের মধ্যে সেই শক্তি বিধৃত। সোভিয়েত দেশপ্রেম তাই সোভিয়েতের সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। সমস্ত মানুষের জাতির ঐতিহ্য ও সমস্ত মেহনতী মানুষের সাধারণ স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেই এর সুষম প্রকাশ ঘটেছে। সোভিয়েত দেশপ্রেম তাই সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতা যা সোভিয়েত জনগণের একটা মৌল বিশিষ্টতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

সোভিয়েত সমাজের এই মৌল শক্তি, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি, যে কোন যুদ্ধের পরিবেশে সমগ্র দেশের মধ্যে একটা গভীর ঐক্যস্থাপন করে। সেখানে যুদ্ধক্ষেত্র আর পশ্চাদভূমি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায়। এই সংহতির উপরই নির্ভর করে শত্রুকে পর্যুদস্ত করে চরম জয়লাভ।

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েতের মানুষ একটা বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েছে। মহান অক্টোবর বিপ্লবে জনগণকে নেতৃত্ব দিয়েছে কমিউনিষ্ট পার্টি, বিদেশী হস্তক্ষেপকারী. তাদের অনুগত অনুচর হোয়াইট গার্ডদের চরম পরাজয় সুনিশ্চিত করেছে। পার্টিরই নেতৃত্বে সোভিয়েতের শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবি মানুষ সমবেত হয়ে গড়ে তুলেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ, গড়ে তুলেছে তার বিরাট শিল্প শক্তি ও বীর সেনাবাহিনী।

তুলনামূলকভাবে সোভিয়েতের মানুষ প্রতিপক্ষের চেয়ে অপরিমেয় নৈতিক শক্তির অধিকারী। নৈতিক শক্তির কার্যকরিতা সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, "যে কোন যুদ্ধেই রণাঙ্গনে যারা নিজের রক্ত ছড়ায় তাদের নৈতিক বলই শেষ পর্যন্ত জয়লাভের পথ প্রশস্ত করে। যে যুদ্ধে তারা রত তা ন্যায়যুক্ত এই বিশ্বাস, নিজের ভাইয়ের স্বার্থরক্ষায় নিজের আত্মদানের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধি

সৈনিকের মনকে উন্নত করে তাকে যে কোন দুঃখকষ্ট অবলীলাক্রমে সহ্য করতে প্রেরণা দেয়। জারের সেনানায়কেরা বলেন যে আমাদের লাল ফৌজবাহিনী যে প্রতিকূলতাকে সহ্য করেছে, তা জারতন্ত্রের কোন সৈনিক কদাচ করত না। তার অর্থ হলো এই যে সৈন্যবাহিনীর প্রতিটি মানুষ যারা ছিল শ্রমিক না হয় কৃষক, তারা জানে কিসের জন্যে তারা লড়ছে, কেন তারা নিজের রক্ত ঝরাচ্ছে, যাদের সচেতন মানসে কাজ করছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা সমাজতন্ত্রের বিজয়ের স্বপ্ন।"[৪৪]

পুঁজিবাদের আবেষ্টনের মধ্যে অবস্থানের বিপদ সম্পর্কে সচেতন থেকে. সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টি, সমগ্র যুদ্ধ পূর্ব কাল ধরে প্রস্তুত হয়েছে সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে।

মূল ও ভারী শিল্পগুলিকে যতদূর সম্ভব উন্নত করতে হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করার জন্যে। পার্টি তার এই নীতি নির্দ্ধারণে মহান লেনিনের সেই শিক্ষারই অনুসরণ করেছে, যেখানে তিনি বলেছেন স্বাধীনতাকে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে ভারী শিল্প গড়ে তুলতে না পারলে সুরক্ষিত করা যাবে না। দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন তাই জোর দিয়েছে ভারী শিল্পের উপর যাতে সৈন্যবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত করা যায় এবং দেশের শিল্প, কৃষি ও যানবাহনের পুনর্গঠন করা যায়।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কর্মসূচী, কৃষিতে যৌথ ব্যবহার প্রবর্তন ও দেশের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়েই পার্টি কাজ করেছে যুদ্ধ পূর্ব কালের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলিতে। মাত্র তের বছরের মধ্যেই সোভিয়েতের মানুষ গড়ে তুলেছে *সেই অর্থনৈতিক ও কারিগরী বনিয়াদ যা দেশের প্রতিরক্ষার সামর্থকে* চূড়ান্তভাবে উন্নত করতে পারে।

স্থাপন করা হয়েছে দেশে বিভিন্ন বৃহদায়তন শিল্প কেন্দ্র, উরাল ও কুজনেস্ক অঞ্চলে কয়লা ও লৌহ শিল্প, কারাগান্দায় কয়লা শিল্পের কেন্দ্র, ভল্গার তীরে ও বাসকিরিয়ায় তৈলখনি আর কাজাকস্তানে লৌহ ব্যতীত অন্যান্য ধাতু শিল্পের কেন্দ্র। উনিশ শ' চল্লিশে সোভিয়েতের শিল্পোৎপাদন বিপ্লব পূর্ব রাশিয়ার তুলনায় বারোগুণ বৃদ্ধি পায়। আর সোভিয়েত ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের উৎপাদন উনিশ শ' তের সালের অনুপাতে বৃদ্ধি পায় পঞ্চাশ গুণ।[৪৫]

নীচের তালিকা থেকে প্রাক্ যুদ্ধের দিকগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনের অবস্থাটা লক্ষ্য করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্পোৎপাদন[৬১]

(মিলিয়ন টনের হিসাবে)

	১৯১৩	১৯৪০
লৌহ...	৪.২	১৪.৯
ইস্পাত...	৪.২	১৮.৩
কয়লা...	২৯.১	১৬৫.৯
তৈল...	৯.২	৩১.১

যাই হোক, সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ক্ষমতা যা তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বনিয়াদ, হিটলার জার্মাণীর তুলনায় ছিল যথেষ্ট কম। কারণ অধিকৃত দেশের সমস্ত সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার ক্ষমতালাভ করেছিল জার্মাণী। সোভিয়েতের শত্রুগোষ্ঠীর কাছে তাই মনে হয়েছিল যে যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় দুই দেশের অর্থনৈতিক শক্তিগত পার্থক্য জার্মাণীর অনুকূলে যাবে। কিন্তু তাদের এই অনুমানের ভিত্তি ছিল শুধু বস্তুগত ও কারিগরী ক্ষমতার পরিসংখ্যান। দেশের সেই নৈতিক মনোবলের হিসেব তারা করেনি জনগণের ইচ্ছাশক্তির হিসেব তারা ধরেনি, যাদের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে সমাজের অর্থনৈতিক সম্পদ।

সোভিয়েত সেনাবাহিনীর উন্নয়নের জন্যে সোভিয়েত সরকার সর্বক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন। সোভিযেত দেশের চারদিকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার বেষ্টনী ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের সম্ভাবনাকে সোভিয়েত সরকার কোনদিন ভুলে যাননি বা ছোট করে দেখেননি। তাই সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে সর্বদা প্রস্তুত উন্নত করার চেষ্টা চলেছে অবিরাম।

সৈন্যদলের মনোবল বরাবরই ছিল অত্যন্ত সুন্দর—তাদের ছিল জয়লাভ করার অনমনীয় ইচ্ছা এবং যুদ্ধের সমস্ত কষ্ট, প্রতিকূলতা সহ্য করার ক্ষমতা। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জনগণের প্রতি অসীম আনুগত্য আর সমাজতন্ত্রের মহান আদর্শে অটল বিশ্বাস।

যুদ্ধের অল্পকাল পূর্বেই খুব কার্যকরী ও উন্নত ধরণের অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদিত হতে লাগলো, বিশেষ করে ট্যাঙ্ক, নানাধরণের কামান ও যুদ্ধবিমান। জার্মাণ অস্ত্র-

শস্ত্রের তুলনায় সেগুলি হীন তো ছিল না কোনমতেই বরং আরো উন্নত ছিল বলতে হবে কোন কোন দিকে। তা সত্ত্বেও বলতে হবে যে যুদ্ধ যখন সুরু হলো তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অস্ত্রাদি নির্মাণের পরিমাণ তার সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে সুসজ্জিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্যান্য দেশের মেহনতী মানুষের সমর্থনও লাভ করে-ছিলেন, আর তার মূল্যও ছিল যথেষ্ট। সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্মলগ্ন থেকে এই ধরণের সমর্থন তাকে প্রভূত শক্তি জুগিয়েছে, ফলে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সুবিধা হয়েছে তার অনেক। যুদ্ধ-পূর্বকালে সোভিয়েতের শান্তিকামী নীতি, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় নিরলস প্রচেষ্টা এবং ফ্যাশিবাদী পররাজ্য আক্রমণনীতির বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করার আগ্রহ, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিশ্বের মেহনতী মানুষের আন্তরিক সমর্থন ও বিশ্বাস অর্জন করতে সাহায্য করেছিল।

সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির নৈতিক মানের উচ্চ মর্যাদা শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুকূল বিশ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এমনকি চার্চিলও স্বীকার করেছেন যে, "সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘ কোনদিন কোন চুক্তি বা সন্ধিভঙ্গ করেনি।"

জার্মাণ আক্রমণের পুর্বে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ছিল জার্মাণীর সম্ভাব্য মিত্রপক্ষের আক্রমণের হাত থেকে—প্রধানতঃ তুরস্ক ও জাপানের হাত থেকে দেশরক্ষা করা।

উনিশ শ' একচল্লিশের মার্চ মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তুরস্ক বিবৃতি বিনিময় করলেন। তুরস্ক অপর কোন দেশের দ্বারা আক্রান্ত হলে সোভিয়েতের সম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করতে পারে, এই ঘোষণার প্রত্যুত্তরে তুরস্ক সরকার ঘোষণা করলেন যে, "সোভিয়েত ইউনিয়নও অনুরূপ অবস্থায় পড়লে তুরস্কের সম্পূর্ণ বোঝাপড়া ও নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করতে পারে।"[৪৮]

সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এই ঘোষণা একটা মূল্যবান সম্পদস্বরূপ ছিল, যদিও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে তুরস্ক নিয়মিতভাবে তার নিরপেক্ষতার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে।

সোভিয়েত জাপ নিরপেক্ষতা চুক্তির আলাপ আলোচনা বেশ কয়েক মাস

ধরে চললো। জাপানী সরকার ও সামরিক কর্তৃপক্ষের চরমপন্থী গোঁড়া হিটলার জার্মাণীর অনুগত ও সংশ্লিষ্ট মানুষরা, আগাগোড়া এই চুক্তির বিরোধিতা করে গেলেন। তা ছাড়া মার্কিণী চাপের প্রতিকূলতা এড়ানোও ছিল একটা সমস্যা। কারণ মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা চাইছিল সোভিয়েত জাপ সম্পর্কের ক্রমাবনতি। যেমন প্রসঙ্গত বলা যায় সেনেট সদস্য ভ্যাণ্ডেনবার্গের কথা, যিনি ঘোষণা ক'রেন যে, "যদি জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কোন অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়......তাহলে আমি বিশ্বাস করি অনতি-বিলম্বে জাপানের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে।"[৪১]

মার্চ উনিশ শ' একচল্লিশে মাৎসুওকার বার্লিন সফরের পর, জাপ সরকার চুক্তি স্বাক্ষর করতে সম্মত হলেন। হিটলার জাপানের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ সুরু করার জন্যে যে চাপ দিচ্ছিলেন, তার হাত থেকে বাঁচাটাই জাপানেব মুখ্য উদ্দেশ্য। সোভিয়েত জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির জন্যে হিটলারের পক্ষে প্রথমে আক্রমণ সুরু করতে অসুবিধা হচ্ছিল। এই চুক্তি সম্পাদনের সময় জাপান সরকারকে ঘুণাক্ষরেও কোন আভাস দেওয়া হয়নি। এবারে জাপান জার্মাণীকে তারই অনুসৃত নীতির পাল্টা জবাব দিল। জার্মানীর সম্মতি নেওয়ার কোন প্রশ্নই সে গ্রাহ্য করলো না। জাপান সরকার মনে করেছিলেন যে সোভিয়েতের সঙ্গে এই চুক্তির ফলে একেবারে উপযুক্ত সময়ে তার আক্রমণাত্মক কাজ সুরু করার বিশেষ সুবিধা হবে। তাঁরা আশা করেছিলেন যে চুক্তির পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন দূর প্রাচ্যে তার সৈন্য সমাবেশের গুরুত্ব কমিয়ে দেবে ফলে আকস্মিকভাবে জাপান আক্রমণ সুরু করে অনেক সুবিধা পাবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু সত্যি সত্যি আন্তরিকতার সঙ্গে দূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপনে প্রয়াসী ছিল। জাপানের মতো কোন অভিসন্ধি সেখানে ছিলনা। তাছাড়া চুক্তির ফলে একযোগে জাপানী জার্মানীর আক্রমণের আশংকা বিনষ্ট হয়েছিল। পরবর্তী পরিস্থিতি নির্ভর করবে চলমান ঘটনা ও হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের প্রতিরোধ ব্যবস্থার সার্থকতার উপরে। কিন্তু তা বলে জাপানী শাসকগোষ্ঠীর হীন অপকৌশলকে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো ভুল বোঝেনি বা উপেক্ষাও করেনি তার গুরুত্ব।

তেরই এপ্রিল, উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত জাপান চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। তার বয়ানে অংশতঃ বলা হয়েছিল :

"প্রথম ধারা এই দুই চুক্তি স্বাক্ষরকারী পরস্পর শান্তিপূর্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী এবং তারা একে অন্যের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব বজায় রাখতে কোন স্বার্থ ক্ষুন্ন না করতে স্বীকৃত থাকছে।

"দ্বিতীয় ধারা যদি কোন এক বা একাধিক তৃতীয় শক্তি কোন একজন স্বাক্ষরকারীকে আক্রমণ করে, তাহলে অপর স্বাক্ষরকারী এই বিরোধ চলাকালীন সময়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করবে।"[৫০]

তৃতীয় ধারায় চুক্তির আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের দিন থেকে এর মেয়াদ পাঁচ বছর কাল স্থির করা হয়েছিল। চুক্তির পরিপূরক একটি ঘোষণায় বলা হলো যে সোভিয়েত ইউনিয়ন মাঞ্চুরিয়ার ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব ও পবিত্রতা সম্মান করে চলবে এবং জাপানও মঙ্গোলীয় জনগণতন্ত্রী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুরূপ নীতি গ্রহণ করবে। তাছাড়া এর সঙ্গে যে সমস্ত পত্রাদি বিনিময় করা হলো, তাতে জাপান উত্তর শাখালীন থেকে তার স্বার্থ জড়িত বিষয়গুলি পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে গুটিয়ে নিতে সম্মত হলো।

জার্মানীতে সোভিয়েত জাপ চুক্তির খবর বোমার মত এসে বিস্ফারিত হলো। রিবেনট্রপ টোকিয়োস্থ জার্মাণ রাষ্ট্রদূতকে জাপ সরকারের কাছে এর অর্থ ব্যাখ্যার দাবী জানাতে বললেন। জার্মাণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী জার্মানীতে মাৎসুওকা প্রদত্ত এক বিবৃতি উল্লেখ করে বল্লেন, "যে কোন জাপানী প্রধান মন্ত্রী বা পররাষ্ট্র মন্ত্রী জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংগ্রাম বাধলে, জাপানকে নিরপেক্ষ রাখতে পারবেন না। সেই অবস্থায় জাপান স্বাভাবিকভাবেই জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করে রাশিয়া আক্রমণ করতে বাধ্য হবে। কোন নিরপেক্ষতা চুক্তিই তাকে ব্যাহত করতে পারবে না।[৫১] জাপান সরকার জার্মাণীকে এই বলে আশ্বস্ত করলেন যে ফ্যাশিস্ত জোটের কোন সদস্যের সম্পর্কে জাপানের কোন স্বীকৃত দায় দায়িত্ব এই চুক্তির ফলে আদৌ পরিবর্তিত হবে না।

জার্মাণীর সামরিক প্রস্তুতির খবরাখবর সোভিয়েত সরকার পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া ও ফিনল্যাণ্ডে জার্মাণ সৈন্য সমাবেশের কথাও তাঁদের অজানা ছিল না। জার্মাণ গুপ্তচর বিমান সোভিয়েতের সীমান্ত অতিক্রম করে তখন ঘন ঘন হানা দিতে লাগলো। উনিশ শ' একচল্লিশের

জানুয়ারী মাসে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানালেন যে জার্মাণী আক্রমণ সুরু করতে পারে। উনিশে এপ্রিল, উনিশ শ' একচল্লিশে বৃটিশ সরকারও অনুরূপ সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু এই সব সতর্কবাণী ও অন্যান্য আরো নানা ঘটনার তাৎপর্য স্তালিন উপলব্ধি করলেন না। সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মাণীর সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক অভিযানের ধারাকে তিনি মনে করেছিলেন দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে তাকে জটিল করে তাদের যুদ্ধের মুখে ঠেলে দেওয়ার প্ররোচনা বলে।

আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনীয়তা পশ্চিম সীমান্তের সেনাদলের তখনও আসেনি মনে করে, স্তালিন তাদের উদ্দেশে বিশেষ কোন আদেশ জারী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। প্রতিরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী এস, কে, টিমোশেঙ্কো এবং সমরনায়ক পরিষদের সভাপতি জি, কে, জুকভ্ সামরিক পরিস্থিতির এই পরিমণ্ডলে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। ফলে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে দ্রুত যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে পারলেন না।

স্তালিনের ভুল সিদ্ধান্তের সেই জাতীয় কোন প্রতিক্রিয়াই ঘটতো না, যদি সেই সময়ে যৌথ নেতৃত্বের লেনিনবাদী নীতির অবশেষটুকুও তখন বর্তমান থাকতো। কিন্তু স্তালিন শাসন ব্যবস্থায় ও পার্টি জীবনে লেনিনবাদী নীতি তখন বর্জন করেছেন। শাসনব্যবস্থা, পার্টি নেতৃত্ব ও সমর পরিচালনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রনেতা ও জেনারেলদের মতামত উপেক্ষা করে, তিনি একাই তখন চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন।

তাই যখন জার্মাণী আক্রমণ করলো, নোতুন সোভিয়েত সীমান্ত তখন যথোপযুক্ত সুরক্ষিত নয়, তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়নি। সোভিয়েত সৈন্যদলের পুনর্গঠন ও তাদের আধুনিকীকরণ তখনও শেষ করা যায়নি। নোতুন ধরণের অস্ত্র শস্ত্র সবে তখন আসতে সুরু করেছে, সৈন্যরা তাদের ব্যবহারও আয়ত্ত করতে পারেনি ভালো করে। উনিশ শ' সাইত্রিশ ও আটত্রিশ সালে অন্যায়ভাবে অনেক কর্মদক্ষ সেনাপতিকে বহিষ্কার করার ফলে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী তাদের অভিজ্ঞ নেতাদের নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তাঁদের পরিবর্তে যে তরুণ শ্রেণী কর্মভার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের যথেষ্ট জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে যাঁরা সেনানায়কের পদ পেয়েছেন,

তারা আধুনিক যুদ্ধের অনেক জটিল পরিস্থিতিতে কেমন করে সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণ করতে হয় তাই জানেন না।

সৈন্যবাহিনীর মনোবল সম্পর্কেযুদ্ধপূর্ব কালীন নীতির মধ্যেও অনেক বড়ো ত্রুটি ছিল। সবার মধ্যেই একটি মারাত্মক ধারণা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে ছিল যে এই যুদ্ধে জয়লাভ করা নিতান্ত সহজ। এই অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, আত্মতৃপ্ত সুনিশ্চিত মনোভাব, যুদ্ধের নিদারুণ কষ্টকে ছোট করে দেখার প্রবণতা ও শত্রুকে এবং তার শক্তিকে তাচ্ছিল্য করার, উপেক্ষা করার ঝোঁককে কাটানোর জন্যে কোন কিছুই করা হয়নি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে তখনও যেন পুরোপুরি শেখা হয়নি এবং শত্রু সৈন্যবাহিনীর মনে ফ্যাশিস্ত প্রচারের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেই বিষয়টিও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। আর যুদ্ধ-শিল্পগুলিও স্বল্পকালীন সময়ের ব্যবধানে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপক উৎপাদন ও সরবরাহ করার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী, পররাজ্য আক্রমণ ও দখলের কোন ইচ্ছাই তার নীতিকে কখনো কলুষিত করেনি। তাই তার সৈন্যবাহিনীকে আগে থেকেই পুনর্বিন্যাস করে নানা জায়গায় আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত রাখার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু যখন সম্ভাব্য জার্মাণ আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে জরুরী অবস্থাকালীন প্রস্তুতির প্রয়োজন অনুভূত হলো তখন রাজনৈতিক তথা সামরিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্তালিনের ভ্রান্ত মূল্যায়ন সৈন্যবাহিনী তথা জনগণের প্রস্তুতিকে কালোপযোগী দ্রুততায় সমাধা করতে না দিয়ে ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর আক্রমণকে প্রতিরোধ করতে অসুবিধা সৃষ্টি করলো।

কিন্তু এতো ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও যুদ্ধপূর্ব কালে কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক জীবনে যে পরিবর্তনের সূত্রপাত করেছিল তাতেই ফ্যাশিবাদী জার্মাণী ও সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত চূড়ান্ত জয়ের সম্ভাবনা বর্তমান ছিল।

সোভিয়েতের জয়ের পথ প্রশস্ত করেছিল কমিউনিষ্ট পার্টি ও জনগণের সৃজনশীল কার্যক্রম। আর সেই কার্যক্রমকে রূপায়িত করেছিল পার্টির চেতনা সমৃদ্ধ, অভিজ্ঞ নেতৃত্ব এবং পার্টি ও জনগণের সুগভীর ঐক্য। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় দেশের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও প্রতিরক্ষার

ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশে এবং জনগণের সৃজন শক্তির উন্নয়ন করার জন্যে যে লেনিনবাদী নীতি ও আদর্শ রচিত, এই বিজয় তারই সাফল্য।

সমাজতন্ত্রের সাফল্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, নৈতিক ও সামরিক শক্তির যে উন্নতিসাধন করে তাই চূড়ান্তভাবে সোভিয়েতের সৈন্যবাহিনীকে ফ্যাশিবাদী রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্টা করতে সাহায্য করে।

১. হামবোল্ট, বার্লিন ১৯৫৪তে প্রকাশিত পরিসংখ্যান, পৃঃ ২০
২. ঐ, পৃঃ ১৮
৩. ঐ. পৃঃ ২০
৪. ঐ পৃঃ ২৩ (শতকরা হিসাব লেখকের)
৫. ঐ, পৃঃ ১৮
৬. মস্কোয় প্রকাশিত গ্রন্থ, ১৯৪৭, পৃঃ ১৭২
৭. মুলার-হিল্লেব্রাণ্ড ; জার্মাণ গ্রন্থ, পৃঃ ১০৫
৮. ঐ,
৯. হামবোল্ট, বার্লিন ১৯৫৪তে প্রকাশিত পরিসংখ্যান।
১০. হামবুর্গে প্রকাশিত ১৯৫৩, জার্মাণ গ্রন্থ, পৃঃ ২৭৫
১১. মস্কোয় প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ১১
১২. মস্কোয় প্রকাশিত গ্রন্থ, ১৯৫৬, পৃঃ ৭
১৩. টাইমস পত্রিকা, ডিসেম্বর ৫, ১৯৪৫
১৪. বারবারোসা বা রেডবেয়ার্ড, হোলী রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট প্রথম ফ্রেডেরিকের (১১২৩-৯০ খৃঃ) উপাধিবিশেষ। তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান পরপর কয়েকটি নিদারুণ সামরিক বিপর্যয়ে পরিণত হয়। তা সত্ত্বেও উগ্রপন্থী জার্মাণ জাতীয়তাবাদীরা তাঁর নামকে মহত্বমণ্ডিত করে, তাঁর সম্পর্কে এক বীরত্বব্যঞ্জক রূপকথা সৃষ্টি করে। তারই এক রূপকথার কাহিনীতে বলা হত যে থুরিঞ্জিয়া পর্বতের কাইফ্‌হাউসার অঞ্চলে বারবারোসা এখনো জীবিত আছেন। জার্মানী কোন পূর্বমুখী অভিযান করলে তিনি পর্বতের আশ্রয় পরিত্যাগ করে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করবেন।
১৫. আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের কার্যক্রম।
১৬. ঐ
১৭. ক্রাসনায়া জভেজ্‌দা, ডিসেম্বর ১১, ১৯৪৫
১৮. লুই ডি, জং : The German Fifth column in World war II, শিকাগো ১৯৫৬, পৃঃ ২৩৫
১৯, ঐ, পৃঃ ২৩৬
২০. হেলমুট গ্রেইনারের জার্মাণ গ্রন্থ, ১৯৫১, পৃঃ ৩২৬

২১. প্রাভদা. ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৪৮

২২. হাইন্‌জ্‌ গুদেরিয়ানের আত্মজীবনী, হাইডেলবার্গ ১৯৫১, পৃঃ ১৩৭

২৩. ঐ পৃঃ ১৫৭

২৪. ওয়েন্ডারলী রুট : The Secret History of the War. প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৫২০.

২৫. মস্কোর প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪

২৬. ঐ, ৫৩

২৭. মুলার হিলেব্রাণ্ড : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০২

২৮. Nuremberg Trial. মস্কোয় প্রকাশিত গ্রন্থ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭

২৯. অররে ডিক্সন ও অটো হাইলব্রুন : Communist Guerrila Warfare, এ্যালেন ও আনউইন, লণ্ডন, ১৯৫৯, পৃঃ ১০৩

৩০ Nuremberg Trial মস্কো, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩২

৩১. ঐ, পৃঃ ৭১৯-২০

৩২. ঐ, পৃঃ ৫১৮

৩৩. ঐ, পৃঃ ৪৪৪

৩৪. প্যারীতে প্রকাশিত ফরাসী গ্রন্থ, ১৯৪৫, পৃঃ ১৪৩

৩৫. Nuremberg Trial, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯২, হাঙ্গেরীর জেনারেল রাসসিয়ের রুদিগারের সাক্ষ্যবিবরণ।

৩৬. Nuremberg Trial, প্রাভদার প্রবন্ধ. জানুয়ারী ১৪, ১৯৪৬

৩৭, Nuremberg Trial, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৩ মস্কো

৩৮, প্রাভদা, ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৪৮

৩৯. ন্যুরেমবার্গে যুদ্ধবন্দীদের বিচার ১৯৪৭

৪০. ফরাসী গ্রন্থ, ১৯৪৯, পৃঃ ১০৪

৪১. মস্কোয় প্রকাশিত গ্রন্থ, ১৯৪৫, পৃঃ ২১৪

৪২. প্রাভদা, ডিসেম্বর ১২, ১৯৪৫

৪৩. Nuremberg Trial, মস্কো, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৭

৪৪. রুশগ্রন্থ, মস্কো, পৃঃ ১১৫

৪৫. National Economy of the U S S R Statistical Return. মস্কো, ১৯৪৭, পৃঃ ৪৫

৪৬. ঐ, পৃঃ ৫৫

৪৭. চার্চিলের চিঠিপত্র : Correspondence. ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০,

৪৮. মস্কোর প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪৭

৪৯. Amerasia, ডিসেম্বর ১৯৪০, পৃঃ ৪৪৮

৫০. মস্কোয় প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৫০

৫১. প্রাভদা, ফেব্রুয়ারী ২০, ১৯৪৮

সপ্তম অধ্যায়

নাৎসী আক্রমণ

বাইশে জুন ভোর রাতে সাড়ে তিনটায় কোন রকমের যুদ্ধ ঘোষণা না করে বা কোনরকম দাবীদাওয়া পেশ না করে, ফ্যাশিবাদী জার্মাণী, বাল্টিক সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত সমগ্র সীমান্ত জুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলো। জনমতকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে জার্মাণ সরকার ঘোষণা করলেন যে এই আক্রমণ হলো একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা, কারণ "সোভিয়েতের বলশেভিকবাদ" সমগ্র ইউরোপের কাছেই সামরিক কারণে একটা আতঙ্কের বিষয়। কিন্তু সেদিন হিটলার যা বলেছিলেন তাতে তাঁর প্রকৃত মনোভাবই ধরা পড়ে। প্রচণ্ড দম্ভের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন: "জার্মাণ রাইখ ও আমাদের জনসাধারণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার আমি আবার সেনাদলের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেছি।"[১]

জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্য জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা যে "প্রতিষেধক" যুদ্ধের জিগির তুলেছিল, আজো নাৎসীদের বিলীয়মান সমর্থক ও ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিক্রিয়াশীলরা সেই ধারণা বজায় রাখার চেষ্টা করে চলেছে।[২] তবু ফ্যাশিস্তদের প্রখ্যাত প্রচারবিদ ফ্রিটজ্‌শে (Fritzsche) নুরেমবার্গ বিচার সভায় স্বীকার করেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এই অভিযোগ করে জার্মানীর আক্রমণ সুরু করার কোন কারণই ছিল না।[৩] বাইশে জুন, উনিশ শ একান্নতে ষ্টাট্‌গাটার জেইটুঙ পত্রিকায় পশ্চিম জার্মানীর ইতিহাসবিদ অধ্যাপক গেরহার্ড রিটার লিখেছেন যে, "সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা ছিল একটা প্রতিষেধক ব্যবস্থা নাৎসীদের সেই কাহিনী বর্জন করার সময় হয়ে গেছে, সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে এটা হলো একটা প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা, একথা কোন মতেই সমর্থনযোগ্য নয়। ইউরোপকে রক্ষা করার যুদ্ধ ছিল না সেটি আদৌ, বরং তার লক্ষ্য ছিল সমগ্র মহাদেশের উপর অধিকার কায়েম করা।"

সেই আক্রমণ ছিল বিশ্বাসঘাতকতার চরম নিদর্শন। জার্মাণী তেইশে আগষ্ট, উনিশ শ উনচল্লিশে দশ বৎসরের জন্তে স্বাক্ষরিত সোভিয়েত জার্মাণ অনাক্রমণ চুক্তির সর্তাবলী লঙ্ঘন করে আক্রমণ সুরু করলো। ঠিক তেমনই বিশ্বাসঘাতকতার পরিচায়ক ছিল জার্মাণীর তাঁবেদার, ইটালী, রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী, ফিনল্যাণ্ড ও শ্লোভাকিয়ার আক্রমণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ইটালী উনিশ শ' আটত্রিশে বন্ধুত্ব, অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতার চুক্তি সম্পাদন করেছিল। আর ফিনল্যাণ্ড মাত্র উনিশ শ' চল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে সেই দেশ আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিল।

যুদ্ধের সূচনায় স্পেন, পর্ত্তুগাল, তুরস্ক, সুইডেন ও জাপান নিরপেক্ষতার ঘোষণা করলেও, নানা উপায়ে তারা সাহায্য করে যেতে লাগলো জার্মাণীকে। ফ্রাঙ্কো স্পেন তার ব্লু ডিভিশনকে পাঠালো সোভিয়েতের বিরুদ্ধে আর পর্ত্তুগাল জার্মাণীকে যোগান দিতে লাগলো খাদ্যসম্ভার আর টাংষ্টেন। উনিশ শ বিয়াল্লিশে জার্মাণীতে পর্ত্তুগালের রপ্তানী বাণিজ্য, উনিশ শ' উনচল্লিশের তুলনায় বৃদ্ধি পেল সাড়ে সাত শ' গুণ। ওদিকে জাপান সোভিয়েতের সীমান্ত বরাবর সৈন্য সমাবেশ করায় প্রায় চল্লিশ ডিভিশন সোভিয়েত সৈনাদলকে পাঠাতে হলো রণাঙ্গন থেকে দূরে।

উনিশ শ' ছত্রিশের মনট্রিক্স কনভেনশন (Montreux Convention) অনুযায়ী সেখানে কৃষ্ণসাগরে যুদ্ধমান কোন পক্ষের জাহাজের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, তুরস্ক সেই সর্ত অমান্য করে জার্মাণী ও ইতালীর যুদ্ধ জাহাজকে দার্দানেলিশ প্রণালীতে দিল প্রবেশের অধিকার। তাছাড়া সোভিয়েত তুরস্ক সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে তুরস্ক সরকার জার্মাণীকে খাদ্য ও নানা ধরণের সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল সরবরাহ করতে লাগলেন। চব্বিশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশে তুরস্ক জার্মাণীর সঙ্গে সম্পাদিত বন্ধুত্বও অনাক্রমণ চুক্তি অনুমোদন করলো, যা ছিল প্রকৃত প্রস্তাবে একটি সামরিক মৈত্রী চুক্তি। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মাণীর সামরিক অভিযানে এটি ছিল একটা মূল্যবান সম্পর্ক, কারণ এতে আক্রমণকারী সেনাদলের দক্ষিণ পার্শ্ব থেকে বিপদের সম্ভাবনা তিরোহিত হলো। তুরস্কের এই আচরণ উনিশ শ' পঁচিশ সালে সম্পাদিত সোভিয়েত তুরস্ক চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী।

সুইডেন জার্মাণীকে সাহায্য করলো খনিজ লৌহ আর বল বেয়ারিং দিয়ে

জার্মাণ সৈন্যদের সেই দেশের মধ্যে দিয়ে গমনাগমনের অধিকার দেওয়া হলো। তাদের জন্যে খোলা হলো হাসপাতাল। আর সুইডিশ "স্বেচ্ছাসেবকরা" সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে যোগ দিল দলে দলে।

বুলগেরীয় সরকার ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হলো। কিন্তু বুলগেরীয় সৈন্যদের সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্তে পাঠানো হলো না। কারণ তা সেনাদল বা জনসাধারণ কারো মনঃপূত ছিল না। বুলগেরীয় ফ্যাশিস্তদের অসমসাহসিক পরিকল্পনার যে ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক প্রবণতা ছিল বুলগেরীয় কমিউনিষ্টরা তার স্বরূপ সৈন্যদল ও জনগণের সামনে উদঘাটিত করে দিলেন। তা সত্ত্বেও বুলগেরীয় সরকার দেশের সম্পদ ও কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চলের বন্দরগুলি জার্মাণীকে ব্যবহার করতে দিয়ে, জার্মানদের প্রভূত সাহায্য করলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পরিকল্পনা বেশ আগের থেকে ভ্যাটিক্যানকে জানিয়ে দিয়ে, জার্মাণী তাকে সমস্ত দেশে পাদ্রী পুরোহিতদের মাধ্যমে সোভিয়েত বিরোধী প্রচার চালিয়ে নাৎসীদের সক্রিয় সাহায্য করার জন্যে আবেদন করে। ভ্যাটিক্যান ও নাৎসী জার্মাণীর মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়, তাতে স্থির হয় যে নাৎসী সেনাদলের অনুগমন করে ভ্যাটিক্যানের অনুচররা সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রবেশ করবে ক্যাথালিক ধর্মমতকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, যাতে নাৎসীদের সোভিয়েতের মানুষকে পদানত করতে সুবিধা হয় এবং সেখানে গুপ্তচরের ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করা যায়।[8]

দুই পুঁজিবাদীগোষ্ঠীর মধ্যে যে তীব্র সাম্রাজ্যবাদী অন্তর্দ্বন্দ্ব যুদ্ধের সূত্রপাত করলো, তার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও, আমেরিকার একচেটিয়াপতিরা তাদের মুনাফার লোভ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি ঘৃণাবশতঃ, হিটলার জার্মাণীকে ভিশী ফ্রান্স[৫], স্পেন, পর্তুগাল ও সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে দিয়ে যথারীতি নানা দ্রব্য সরবরাহ করে যেতে লাগলো। মার্কিণ মালিকদের জার্মাণীস্থিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি জার্মাণ সেনাদলের জন্যে সমানে অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক, বিমান , অটোমোবাইল ও যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন করে যেতে লাগলো। মার্কিণ-জার্মাণ কার্টেল চুক্তিগুলি সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে অব্যাহত ভাবে কার্যকরী ছিল। মার্কিণ ও জার্মাণ একচেটিয়াপতিরা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধের মুনাফা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেওয়ার জন্যে সুইজারল্যাণ্ডে আন্তর্জাতিক দাবী দাওয়া সম্পর্কিত

ব্যাঙ্কে (Bank for International Settlements) মাঝে মাঝে সমবেত হয়েছে।[৬]

পেতঁ্যা সরকার, যাঁর সঙ্গে জার্মাণী ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয়ের সম্পর্ক ছিল, দেশের অপরাধী ও দুর্বৃত্তদের, জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের সামরিক পোষাকে সজ্জিত করে, একটা বিশেষ সামরিক ইউনিট হিসেবে সোভিয়েত-জার্মাণ সীমান্তে প্রেরণ করেন। এর নাম দেওয়া হয়েছিল লিজিয়ন অব ফ্রেঞ্চ ভলান্টিয়ার্স বা ফরাসী স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যবাহিনী। উনিশ শ' একচল্লিশের সাতাশে জুন পেতঁ্যা, ভিশীস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অ্যাডমিরাল উইলিয়াম ড্যানিয়েল লিহাইকে জানান যে জার্মাণী রুশ সীমান্তবর্তী অঞ্চল দখল করে বাফার (Buffer) রাষ্ট্র সৃষ্টি করবে। ফলে সে দেশের বর্তমান শাসনব্যবস্থার পতন ঘটবে বলে তিনি মনে করেন এবং, সাম্যবাদের ভয় তিরোহিত হবে।[৭] লিহাই তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত হন। এ ব্যাপারে পেতঁ্যা ও লিহাই সমমতাবলম্বী ছিলেন এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। সোভিয়েতের জন্মলগ্ন থেকেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিভক্ত ও পদানত করার নানা পরিকল্পনা রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া, যার মধ্যে জার্মাণী, ইটালী ও জাপান ছিল মূল আক্রমণের হাতিয়ার, বরাবরই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমাজতন্ত্রকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্ত করে চলেছিল।

বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্নকে সফল করার পরিকল্পনায়, জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদ সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধকে মূল ঘটনা বলে মনে করতো। সোভিয়েত ইউনিয়নকে তারা ঘৃণা করতো, কারণ তারা জানতো তাদের স্বপ্ন সার্থক করতে সোভিয়েতই হলো সবচেয়ে বড়ো বাধা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মাণীর যুদ্ধ তাই ছিল সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল, আক্রমণাত্মক ও চরম অন্যায়। এ যুদ্ধের চূড়ান্ত লক্ষ্যই তার স্বাক্ষর বহন করে। হিটলার জার্মাণী চেয়েছিল সোভিয়েতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে, সেই দেশের সম্পদ ও সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করে সেখানে জমিদার ও পুঁজিপতিদের শাসন কায়েম করতে, যাতে সোভিয়েতের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া যায়।

হিটলারের বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ রীতিমতো সংকট সৃষ্টি করলো সেখানে।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে লড়তে হবে এমন এক প্রতিপক্ষের সঙ্গে যা বিপুল সমরায়োজনে সমৃদ্ধ, কুটিল ও নৃশংস।

উনিশ শ' একচল্লিশের গ্রীষ্মকালে, রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতির মূল্যায়ণে স্তালিনের বিভ্রান্তির জন্যে, জার্মাণ আক্রমণ সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে হতচকিত করে দিল। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য ও সমর সম্ভার কেন্দ্রীভূত করে, শত্রুসৈন্য সমগ্র সীমান্ত জুড়ে সোভিয়েত সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কোন কোন স্থানে সোভিয়েত সীমান্তবাহিনী শত্রুর অভিযানকে প্রতিহত করা দূরে থাক তার অগ্রগতিকে সামান্য মন্থর করতেও পারলো না। ফলে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করা গেল না এবং দেশের অভ্যন্তর থেকে সীমান্তের দিকে সৈন্য চলাচলও বাধা পেতে লাগলো। লোকবল ও সমরোপকরণে সীমান্ত সৈন্য-বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হলো দারুণ। ফলে যুদ্ধের গতি শত্রুর অনুকূলে চলে গেল আরো বেশি। সোভিয়েত বিমান বহরের উপরও আঘাত এলো প্রচণ্ড ভাবে। বিমান ঘাঁটিগুলির উপর লুফ্‌ট্‌বাফের (Luftvaffe) আকস্মিক আক্রমণ ও নোতুন ধরণের বিমানেও ঘাটতি, বিমানযুদ্ধেও নাৎসীদের শ্রেষ্ঠত্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলো।

সমগ্র সীমান্ত জুড়ে শত্রুপক্ষ দখল করে নিল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক অভিযানের উদ্যোগ, ঢুকে পড়লো তারা সোভিয়েত দেশের অভ্যন্তরে। নাৎসীদের প্যানসার ও মোটরবাহিত আক্রমণকারী ডিভিশনগুলি, সীমান্তে সোভিয়েত প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলো পূর্ব দিকে।

সোভিয়েত সেনাদল প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটে যেতে বাধ্য হলো। শত্রুদের ছোট দ্রুতগামী ইউনিটগুলি শক্তিশালী বিমানবহরের সাহায্য নিয়ে সোভিয়েত সেনাদলকে ঘিরে ধরলো। তারপর তাদের অতিক্রম করে ধেয়ে চললো দেশের অভ্যন্তরে। এই দ্রুত ধাবমান প্রতিপক্ষের চক্রাকার ব্যূহ ভেদ করতে না পেরে, চারদিকে আবদ্ধ হয়ে বহুবার সোভিয়েত সেনাদলকে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে সংগ্রাম করতে হয়েছে। যুদ্ধের প্রথম কুড়ি দিনের মধ্যে, জার্মাণরা তাদের আক্রমণ লক্ষ্যের দিকে চারশো থেকে ছ'শ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে গেল। তাদের দৈনিক গড় অগ্রগতির পরিমাণ দাঁড়ালো তিরিশ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার, সময় সময় যা পঞ্চাশ থেকে ষাট কিলোমিটারে

পৌঁছেছে। ন'য়ই জুলাই তারিখে মিনস্কের পতন ঘটলো নাৎসীদের হাতে। প্রচণ্ড প্রতিকূলতায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সোভিয়েত সেনাদল প্রাণপণে চেষ্টা করলো সে আক্রমণ প্রতিহত করতে। ঘন ঘন পাল্টা আক্রামণ চালাতে লাগলো তারা, পাল্টা আঘাত হানলো প্রচণ্ডভাবে। সৈন্য সামন্ত ও সমরোপকরণে শত্রুপক্ষের ক্ষয় ক্ষতিও হলো রীতিমতো। সংক্ষেপ বলতে গেলে অবস্থা যা দাঁড়ালো তা হলো এই যে, সোভিয়েত সেনাদল দেশের দূর অভ্যন্তরে সরে যেতে লাগলো ধীরে ধীরে প্রাণপণে ভয়ঙ্কর আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করতে করতে।

জার্মাণ সমরনায়কেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন স্থলবাহিনীর সমরনায়ক পরিষদের প্রধান, জেনারেল ফ্রানৎজ হালডের বড়াই করে বললেন :

"এটা বলা মোটেই অতিশয়োক্তি হবে না যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে এক পক্ষ কালের মধ্যেই জয়লাভ করা গেছে।"[৮]

জার্মাণ ষ্টাফ অফিসাররা বিশ্বাস করতে সুরু করলেন যে সোভিয়েত সেনা-নায়করা একটা আগাগোড়া প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দূরে থাক, গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলেও কোন প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে পারছে না। সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্ত থেকে যুদ্ধের প্রেরিত বিবরণী পড়ে হিটলার ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে সোভিয়েতের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির আর কয়েকদিনের মধ্যেই পতন ঘটবে। আটই জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে তিনি আদেশ জারী করলেন যে মস্কো ও লেলিনগ্রাদকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে সমভূমি করে দিতে হবে, "কারণ সমগ্র শীতকাল ধরে ওদের লোকজনকে খাদ্য যোগান দেবার দায়িত্ব আমরা নেব না।"[৯] কাইটেলও জারী করলেন অনুরূপ নির্দেশ। তাতে বলা হলো, "এই যুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর যে কোন এবং যতদূর সম্ভব ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করার অধিকার আছে আর তা কর্তব্যও বটে, তাতে নারী ও শিশুদেরও বাদ দেওয়ার দরকার নেই।...এই ধরনের ধ্বংসাত্মক, হিংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণের জন্যে কোন জার্মাণকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বা বিচার বিভাগীয় অভিযোগের দায়ে কখনও পড়তে হবে না।"[১০] বাস্তবিকই সোভিয়েতের মাটিতে নাৎসীদের অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে ছড়িয়ে পড়লো অবর্ণনীয় অত্যাচার আর বর্বরতার চিহ্ন।

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে সেই ধারণা কেবল হিটলারের একার ছিল না। অন্যান্য

বুর্জোয়া দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতাই সেই ধারণা পোষণ করছিলেন। যেমন প্রথমেই বলা যায়, উইনষ্টন চার্চিলের কথা। তাঁর স্মৃতিকথায় এই ধারণাকে তিনি কোথাও অস্পষ্ট, ঝাপসা করে বলেন নি। অবশ্য সত্যি যে চার্চিল একথা বলতে গিয়ে তাঁর সামরিক পরামর্শদাতাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "প্রায় সমস্ত দায়িত্বশীল সামরিক মতই এই ধারণা পোষণ করে যে রুশ সৈন্য শীঘ্রই পরাজিত এবং বহুলাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।"[১১] অন্যের মতের উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ অধীনস্থ ব্যক্তিদের কাছে বিভিন্ন উপদেশ সম্বলিত, ছয়ই ও উনিশে জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশে প্রেরিত তার বার্তায়, চার্চিল আসন্ন "রুশ বিপর্যয়ের"[১২] কথা বলেছিলেন।

পশ্চিম জার্মাণীর ইতিহাসবিদ জ্যাকোবসেন বলেন যে হিটলারের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিনি ব্লিৎসক্রীগ যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করবেন। এরকম চিন্তা কেবল একা তিনিই করতেন না। জার্মাণীর প্রখ্যাত সামরিক নেতৃবৃন্দ ছাড়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সামরিক নেতৃবৃন্দও অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। মার্কিণ যুদ্ধ সচিব ও তাঁর সমন্বয়ক পরিষদের প্রধানের প্রত্যাশা ছিল যে এই অভিযান "কম পক্ষে এক মাস ও বেশি হলে তিন মাস পর্যন্ত চলবে।"[১৩] উনিশ শ' একচল্লিশের গ্রীষ্মকালের পূর্বে ভেরমাখটের বিস্ময়কর প্রায় হতবুদ্ধিকর সাফল্যই ছিল এর কারণ। সারা পৃথিবী ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দেখতে লাগলো তা, আর অন্যদিকে সোভিয়েতের প্রতিরোধ শক্তিকে মনে করতে লাগলো হীণ, দুর্বল বলে।[১৪]

জার্মাণীর ফ্যাশিস্ত সমর বিশেষজ্ঞদের মতো, আমেরিকান ও বৃটিশ সমর বিশেষজ্ঞদেরও সোভিয়েতের শক্তি সম্বন্ধে পক্ষপাতমূলক ধারণা ছিল।

জাপানীরা কিন্তু জানতো ব্যাপারটা অতোটা সহজ নয়। তাদের ধারণায় একটা বাস্তব ভিত্তি ছিল, কারণ হাসান ও হালখিন-গোলে সোভিয়েত শক্তির মুখোমুখি তাদের হতে হয়েছে। তিনজন বৃটিশ ইতিহাসবিদ, জোন্স, বোর্টন ও পিয়ার্ন বলেন যে, "জাপানীরা চ্যাংকুফোন্ (Changkufeng) ও নোমোনহানে (Nomonhan) রুশদের মুখোমুখি সংগ্রাম করেছে এবং শেষোক্ত যুদ্ধে তাদের ঘটেছে প্রচণ্ড পরাজয়। ফলে সোভিয়েতের সশস্ত্র শক্তিকে তারা সমীহ করতে শিখেছে, যার জন্যে জার্মাণীর পক্ষে সরাসরি যুদ্ধে যোগ না দিয়ে তারা গ্রহণ করে অপেক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করার নীতি।"[১৫] এই কারণের জন্যেই জাপ সরকার

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে দ্রুত গতিতে অবিরাম।

আক্রমণের আকস্মিকতা যুদ্ধের সূচনা পর্বে জার্মাণীকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুবিধাজনক ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থানের অধিকার এনে দেয়। তার হাতে সমস্ত বিষয়েই এসে পড়ে উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধা।

আক্রমণ সুরু হওয়ার দু' ঘণ্টা পরে সোভিয়েত ইউনিয়নস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূত ফ্রেডারিক শুলেনবার্গ (Schulenberg) সোভিয়েত সরকারকে, জার্মাণীর পূর্ব সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের জন্য জার্মাণ সরকারের যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানান। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে আত্মরক্ষার তাগিদে অনুসৃত নীতি বলে চালানোর জন্যেই এই ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে। সোভিয়েত সরকার অভিযোগের উত্তরে বলেন যে, "শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জার্মাণ সরকার সোভিয়েত সরকারের কাছে কোন অভিযোগ পেশ করেন নি, বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ মনোভাব সত্ত্বেও জার্মাণী সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করেছে এবং সেই কারণের জন্য এই যুদ্ধে ফ্যাশিস্ত জার্মাণী হলো পররাজ্য আক্রমণকারী।"[১৬]

॥ দুই ॥

বাইশে জুন বেলা দ্বিপ্রহরে সোভিয়েত সরকার দেশবাসীকে বেতারের মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। কমিউনিষ্ট পার্টি ও সরকার ফ্যাশিবাদী আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করার জন্যে জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বললেন যে তাঁদের "দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমাদের দেশের সমগ্র জনগণ, সমস্ত শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি, নারী ও পুরুষ আত্মসচেনতার সঙ্গে নিজ নিজ কাজ ও কর্তব্য করে যাবেন।"[১৭]

সোভিয়েতের জনগণ গ্রহণ করলো এক দুর্ধর্ষ কাজের ব্রত, রক্ষা করতে হবে তাদের সমাজতন্ত্রী দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা, ফ্যাশিবাদী যুদ্ধ জোটকে পরাস্ত করতে হবে সংগ্রামে, ফ্যাশিবাদের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করতে হবে জার্মাণী সমেত সমগ্র ইউরোপের জাতিগুলিকে যাতে সব দেশের মানুষ পায় পূর্ণ স্বাধীনতা, গড়ে তুলতে পারে নিজের ইচ্ছা মতো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। যে যুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জড়িয়ে পড়লো তাতে

তার চরম লক্ষ্য হলো এই উদ্দেশ্য সিদ্ধি। আর এই লক্ষ্যই যুদ্ধের প্রকৃতিকে এখন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে সুরু করলো। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মহান দেশ-প্রেমিক যুদ্ধ তাই ছিল একটা ন্যায়ের যুদ্ধ, ফ্যাসি-বিরোধী মুক্তি সংগ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এটা ছিল তাই সমাজতন্ত্রের গৌরবময় সাফল্যের জয়যাত্রা।

আক্রমনোদ্যত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মূল আঘাতকারী অংশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ মরণপণ করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। মানুষের সভ্যতার স্বপক্ষে, সামাজিক প্রগতির জন্যে, সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক বনিয়াদকে সুরক্ষিত ও সুগঠিত করার সংগ্রামে তারা লিপ্ত হলো।

অন্য সমস্ত কারণ, বিচার বিবেচনার কথা বাদ দিয়েই বলা যায় সোভিয়েতের মানুষের এই বীরত্বপূর্ণ মনোভাব ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনের নামান্তর মাত্র। সমকালীন পরিস্থিতিতে সংগ্রামের মূল লক্ষ্যকে ব্যাখ্যা করে দিলেন কমিউনিষ্ট পার্টি। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে, কমিউনিষ্ট পার্টি সেই পরিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলো যাতে শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব হয়। সোভিয়েতের মানুষের স্বার্থ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের স্বার্থের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িত।

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে সোভিয়েতের যুদ্ধে যোগদান একটা অসাধারণ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একটা গুণগত পরিবর্তন এনে দিতে তা চরম সাহায্য করলো, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ফ্যাশিবিরোধী মুক্তি যুদ্ধে পরিণত হলো।

"সোভিয়েতের অংশগ্রহণ ছাড়া," উইলিয়াম জেড্-ফস্টার বলেছেন. "বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীরা, যাদের নিজেদেরই ফ্যাসিবাদী ঝোঁক যথেষ্ট ছিল এবং যারা হিটলারের সঙ্গে কোনমতে একটা রফা করতে সদাই ব্যগ্র ছিল, নিজেদের চেষ্টায় ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটা সর্বাত্মক মরণপণ যুদ্ধ করতে পারতো না।"[১৮]

যুদ্ধে সোভিয়েতের যোগদানের পরে তার রাজনৈতিক সামরিক চেহারাটা সম্পূর্ণ বদলে গেল। এ পর্যন্ত জার্মাণ যুদ্ধ যন্ত্রকে রোধ করতে কেউ পারেনি।

নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলের মানুষেরা কিম্বা যারা নাৎসীদের দ্বারা অধিকৃত হওয়ার আশংকায় কাল কাটাচ্ছিল, তারা সোভিয়েতের মানুষ ও সেনাবাহিনীর

নাৎসীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দিকে অনেক আশা ভরসা নিয়ে তাকিয়েছিল। তারা মনে করতো সোভিয়েত ইউনিয়ন হলো একমাত্র সেই শক্তির অধিকারী যা ফ্যাশিস্ত সেনাদলের অগ্রগতি রোধ করতে পারে, তাদের পরাস্ত করে মানবজাতি বাদামী প্লেগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।

শত্রুকে প্রতিহত করার জন্যে সোভিয়েতের মানুষকে প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করে সংঘবদ্ধ করা হতে লাগলো। কমিউনিষ্ট পার্টি লেনিনের নীতিকে অনুসরণ করে, যুদ্ধকালীন সময়ে সমস্ত শক্তি সমবেত করার কার্যক্রম গ্রহণ করলো। "যেহেতু অবস্থাটা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গিয়ে ঠেকেছ।" লেনিন লিখেছিলেন, "তখন অন্য সমস্ত কাজ, স্বার্থকেই যুদ্ধের প্রয়োজনে লাগাতে হবে। দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনধারাকে এই প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামান্যতম ইতস্ততভাব একেবারে অসহ্য।"[১২]

দেশের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ভার নিয়ে স্থাপিত হলো রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি। পার্টির কেন্দ্রিয় কমিটি দলের সেরা সেরা মানুষদের সামরিক বিষয় পরিচালনার ভার দিলেন।

উনত্রিশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশে কেন্দ্রিয় কমিটি একটা ব্যাপক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যাতে যুদ্ধকালীন সময়ে পার্টি ও সাধারণ মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে বলা হলো। এই সিদ্ধান্তে যে যুদ্ধ সোভিয়েতের উপর চাপানো হয়েছে তার মূল লক্ষণগুলি বিশ্লেষণ করে জয়লাভের বাস্তব কর্মসূচীও গৃহীত হলো। তাই বলা যায় এটি ছিল একটি কার্যক্রম ও নীতিগত দলিল যা জাতির সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্যে ঐক্যবদ্ধ, একত্রিত করলো।

ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সংগঠিত করলেন, তাতে অনুপ্রেরণা যোগালেন কমিউনিষ্ট পার্টি। এই সাধারণ লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশে সোভিয়েতের মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করে, শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে সংঘবদ্ধ করলেন কমিউনিষ্ট পার্টি। চূড়ান্ত জয়লাভের পথে যে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধক ছিল তাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হওয়ার সময় পার্টি আবার প্রমাণ করলেন তার মূল ভিত্তি হলো সংঘবদ্ধ সংগ্রামী শক্তি।

মাসের পর মাস ধরে রণাঙ্গনের পরিস্থিতি হয়ে রইলো দারুণ সংকটপূর্ণ।

তা সত্বেও শত্রু সৈন্য যদিও সোভিয়েত ভূখণ্ডের মধ্যে আরো অনেকখানি ঢুকে গেল, তবু বারবারোসা পরিকল্পনার আশু সামরিক লক্ষ্য সীমান্তে পশ্চিম

ডিনা-নিপার (Dvina Dnieper) অঞ্চলের পশ্চিমে বিদ্যুৎবেগে অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়েও সোভিয়েত সৈন্যের বেশিরভাগ অংশকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেল। জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনানায়কদের সামরিক সাফল্যের ধারণা যে ত্রুটীপূর্ণ তার আভাস সুরুতেই পাওয়া গেল।

পরিকল্পনার একটা মৌল লক্ষ্যের রূপায়ণে নাৎসীরা ব্যর্থ হলো। তাদের প্রত্যাশা ছিল সোভিয়েতের মানুষ ও সৈন্যবাহিনীর মনোবল এতে ভেঙে যাবে, কিন্তু তা হলো না।

কঠিন আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে সোভিয়েত সেনানায়করা নানা ধরনের বিচিত্র সমরকৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন—কখনো তাঁরা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করছেন, রণাঙ্গনের কোন কোন অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণ করছেন, কখনো বা শত্রুর সামরিক লক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছেন, যার সামগ্রিক উদ্দেশ্য হলো ব্যাপক পাল্টা আক্রমণের পথ প্রশস্ত করা।

সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ও সমগ্র জাতির সাহস ও অধ্যবসায় নাৎসী আক্রমণের ধারকে ক্রমেই ভোঁতা করে দিতে লাগলো। ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লিয়েষ্ট পরবর্তী কালে বলেছেন যে সুরু থেকেই সোভিয়েত সৈন্যের মধ্যে ছিল "প্রথম সারির সংগ্রামী বীর" যারা "আগাগোড়া প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে অসম্ভব কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে।"[২০] টিপ্পলস্কার্চ লিখেছেন যে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর অধ্যবসায়, মনোবল অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি লিখেছেন, "আমাদের মুখোমুখি হতে হলো এমন এক শত্রুর যার মনোবল লৌহ কঠিন। ব্যাপারটা মোটেই পরপর দ্রুত আঘাত হেনে তাসের ঘর ভেঙে দেওয়ার মতো ছিল না।"[২১] বৃটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞ ফুলার লিখেছেন, "পোল্যাণ্ডে, ফ্রান্সে ব্যাপার যেমন ঘটেছিল, এক্ষেত্রে তেমন করে তা ঘটলো না। যদিও দৃশ্যতঃ ব্লীৎসক্রীগ আক্রমণ সমস্ত ধারণার অতীত হিসাবেই সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছিল, তবু আশ্চর্যের কথা এই যে রুশদের সেনাদলের মধ্যে রণাঙ্গনে বা দেশের অভ্যন্তরে কোথাও কোন আতংকভাব দেখা গেল না।"[২২]

প্রথমেই শত্রুর মুখোমুখি হলো সোভিয়েত সীমান্ত রক্ষীবাহিনী এবং তারপরে সীমান্ত অঞ্চলে সন্নিবেশিত সেনাদল। যখন আক্রমণ সুরু হলো তখনো তারা যুদ্ধের প্রয়োজনে সব জায়গায় ঘাঁটি করে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে তারা অতর্কিত আক্রমণের সামনে পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

কিন্তু তারই মধ্যে আক্রমণকারীরা বুঝলো যে তারা সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর মনোবল, সাহস ও বীরত্ব ঠিক মতো উপলব্ধি করতে পারেনি। সংগ্রামের সূচনা থেকেই সোভিয়েতের মানুষের প্রচণ্ড নৈতিক শক্তি ও জ্বলন্ত দেশপ্রেম প্রকট হয়ে উঠলো চার দিকে।

বহু জায়গায় সেনাদলের খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশ, কোন গ্যারিসন শত্রু সৈন্য তাদের অতিক্রম করে পূর্ব মুখে আরো অগ্রসর হওয়া পর্যন্ত ঘাঁটি আগলে লড়াই চালিয়েছে, হার মানেনি। নব্বুই সংখ্যক ভ্লাদিমির ভোলিয়ান বাহিনীর ত্রয়োদশ সীমান্ত রক্ষী দলটি লেফ্টন্যান্ট এ. ভি. লোপাতিনের নেতৃত্বে, চারদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়েও সমানে এগারো দিন লড়াই চালিয়ে গেল। ব্রেষ্টের সুরক্ষিত ঘাঁটি তিরিশ দিনেরও বেশী অসীম সাহসিকতায় লড়াই চালিয়ে গেল। দেওয়ালের গায়ের প্রতিরোধকারীদের নিজের হাতে লেখা কথার টুকরো অংশ আজো সেখানে জ্বলজ্বল করছে। কোথাও লেখা আছে: "আমরা পাঁচজন আছি, সেদোভ, গ্রুতোভ, বোগোলিয়ুব, মিখাইলভ আর সেলিভানভ। বাইশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশে ভোর রাতে সওয়া তিনটেয় আমরা আক্রান্ত হলাম। আমরা মরবো কিন্তু পিছু হটবো না।" আবার আরেক জায়গায় লেখা আছে: "আমি মরছি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিনি! হে আমার প্রিয় স্বদেশ, বিদায়। বিশে জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশ।"[২৩]

পঞ্চম সৈন্যবাহিনীর একশ' চব্বিশ সংখ্যক পদাতিক ডিভিশনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে সোকাল শহরের উত্তরাংশে যে সব ছোট ছোট প্রতিরক্ষার ঘাঁটি তৈরী করা হয়েছিল তারা শত্রুর প্রচণ্ড ধ্বংসকারী আক্রমণের সামনেও বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সমানে লড়াই চালিয়ে গেল।

সোভিয়েত বৈমানিকরা আকাশযুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করে লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলো। বাইশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রথম একটি বিমান দিয়ে অন্য আরেক বিমানকে সরাসরি আঘাত করার ঘটনা ঘটলো। সেদিন ভোরবেলায় নবম বিমান ডিভিশনের একশ' চব্বিশ সংখ্যক জঙ্গী শাখার বৈমানিক জুনিয়ার লেফটেন্যান্ট ডি. ভি. কোকোরেভ, ফ্যাশি বাহিনীর এক মেসেরস্কমিড্ট্ (Messerschmidt) বিমানের পশ্চাৎভাগ নিজের বিমানখানা মোচড় দিয়ে, চালিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে, নিরাপদে একটা মাঠে অবতরণ করলেন। ঘন্টাখানেক পরে জাঙ্কার আটাশি শ্রেণীর আরেকটি বিমানের অনুরূপ অবস্থা

করলেন জুনিয়ার লেফটেন্যান্ট জি. বুভেলিন। সেদিন সন্ধ্যের দিকে ছেচল্লিশ সংখ্যক জঙ্গী শাখার নেতা, সিনিয়ার লেফটেন্যান্ট আই. আই. আইভানভ, শত্রুর আরেকটি বিমান আঘাত করে ধ্বংস করলেন। ছাব্বিশে জুন ক্যাপ্টেন এফ. এন. গাসতেল্লোর বিমানটি শত্রুর আঘাতে জখম হয়ে যখন জ্বলে উঠলো তখন জলন্ত বিমানখানি নিয়ে তিনি জার্মানদের সারি দেওয়া ট্যাঙ্ক ও লরীগুলির উপরে গিয়ে পড়লেন। ফলে দারুণ বিস্ফোরণে তাদের কয়েক ডজন ট্যাঙ্ক ও লরী ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু সোভিয়েতের এই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম সত্বেও, শত্রু সৈন্য দেশের অভ্যন্তরে ক্রমেই প্রবেশ করতে লাগলো। তাদের অগ্রগতি কিছুটা মন্থর হয়ে গেল এই যা। সেই মুহূর্তে সোভিয়েত সেনাদলের মূল লক্ষ্য ছিল শত্রুর অগ্রগতিকে রোধ করে, তাদের সামনে আগাগোড়া একটা দৃঢ় সংবদ্ধ সামরিক বাধার প্রাচীর তুলে দেওয়া। সমগ্র গ্রীষ্ম ও শরৎকাল ধরে নাৎসী আক্রমণের বিজয়যাত্রা মাঝে মাঝে নানা জায়গায় নিশ্চল হয়ে গেলেও, মোটামুটি অব্যাহত রইলো। অভিযানের জগন্নাথের রথ চলতেই থাকলো সামনের দিকে। কোন জায়গায় থেমে গেলে, নিজেদের পুনর্গঠিত ও কিছু নতুন শক্তি সঞ্চয় করে, তারা সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে আবার এগিয়ে যেতো। যুদ্ধের সূচনাতেই সোভিয়েত সেনাদলের যে ক্ষয়ক্ষতি হলো এবং দেশের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত বাহিনীর স্বল্পতার জন্যে, রণাঙ্গনকে একটি স্থানে আবদ্ধ রাখার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে লাগলো।

আকস্মিক আক্রমণ দেশের জনসংখ্যা ও বস্তুগত সম্পদকে সুশৃঙ্খলভাবে সমবেত করতে না দিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরোধ শক্তিকে বেশ দুর্বল করে দিয়েছিল।

উনিশ শ' একচল্লিশের নভেম্বর পর্যন্ত শত্রু সৈন্য যে অঞ্চল অধিকার করে নিল, যুদ্ধ-পূর্ব কালে সেই অঞ্চলে ছিল সোভিয়েতের মোট জনসংখ্যার শতকরা চল্লিশ ভাগ, মোট রেলপথের শতকরা একচল্লিশ ভাগ, পশু সম্পদের শতকরা আটত্রিশ ভাগ এবং শূকর সরবরাহের শতকরা ষাট ভাগ। অধিকৃত অঞ্চলে উৎপাদিত হতো দেশের মোট ইস্পাতের শতকরা আটান্ন ভাগ, এ্যালুমিনিয়ামের শতকরা ষাট ভাগ ও চিনির শতকরা চুরাশি ভাগ। তারা উৎপাদন করতো মোট খাদ্যশস্যের শতকরা আটত্রিশ ভাগ। তার খনিজ সম্পদ থেকে আসতো

মোট কয়লার শতকরা তেষট্টি ভাগ ও সেখানে উৎপাদিত হতো শতকরা আটষট্টি ভাগ লোহা।[২৪]

যুদ্ধকালীন অবস্থার সঙ্গে সোভিয়েতের অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করার কাজটিও রীতিমতো জটিল হয়ে পড়লো। কারণ শত্রু অধিকৃত অঞ্চল থেকে শিল্প ব্যবস্থার একটা বিরাট অংশকে সরিয়ে আনতে হলো দেশের পূর্বাঞ্চলে। যুদ্ধের প্রথম তিন মাসে তেরশ' ষাটটির বেশি বৃহদায়তন কলকারখানা অপসারিত করা হলো, তার মধ্যে চারশ' পঞ্চান্নটি গেল উরাল অঞ্চলে, দুশ' দশটি পশ্চিম সাইবেরিয়ায় এবং দুশ' পঞ্চাশটি মধ্য এশিয়া ও কাজাকস্থানে।[২৫] শিল্প অপসারণ কমিটির নেতৃত্বের ভার দেওয়া হলো এন. স্বেরনিককে। পুরানো কেন্দ্র থেকে অপসারিত হয়ে নোতুন জায়গায় পুনর্গঠিত না হওয়া পর্যন্ত কল-কারখানাগুলির উৎপাদন একেবারে বন্ধ হয়ে রইলো। ফলে উনিশ শ' একচল্লিশের জুন থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে সোভিয়েতের শিল্পোৎপাদন অর্ধেক হয়ে গেল। লৌহ-জাতীয় ধাতুর উৎপাদন কমে গেল শতকরা সত্তর ভাগ, লৌহ-ছাড়া অন্যান্য ধাতুর ঢালাই উৎপাদন কমে গেল শতকরা আটানব্বই ভাগ এবং বল-বেয়ারিংয়ের উৎপাদন শতকরা সাড়ে পঁচানব্বুই ভাগ।[২৬]

বলা বাহুল্য অবস্থা এমনই দাঁড়ালো যে বিরাট প্রচেষ্টা ছাড়া এর কোন প্রতিকারের পথ রইলো না। উনিশ শ' একচল্লিশের ডিসেম্বরে উৎপাদন রেখা খাড়া নীচের দিকে নেমে যাওয়ার ঝোঁক কাটিয়ে আবার উঠতে লাগলো। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মার্চ মাসের মধ্যেই পূর্বাঞ্চলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ যুদ্ধপূর্ব কালের পরিমাণের সমান হয়ে গেল।[২৭] এটা নিশ্চয়ই রীতিমতো অর্থনৈতিক সাফল্যের পরিচায়ক। শ্রমিক শ্রেণীর অসীম বীরত্বব্যঞ্জক প্রচেষ্টা ও সোভিয়েত শিল্পব্যবস্থার কারিগরি বিদ্যার উচ্চমান অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললো। এক পশ্চিমী গবেষক, জি. ডবলু. ফিয়ুকটার (Feuchter) বলেন,

"অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সোভিয়েতের রুশরা তাদের শিল্পের পুনর্বাসন এবং তার চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট সংখ্যায় উৎপাদন করে যে সাফল্য অর্জন করেছে, তাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ কারিগরি সাফল্যের পরিচায়ক বলা যেতে পারে; এই মুহূর্তে এই বিস্ময়কর, অভাবনীয় কৃতিত্বের মূল্যই সবচেয়ে বেশি।"[২৮]

সোভিয়েত প্রতিরোধ প্রতিদিন বাড়তে লাগলো। রণাঙ্গন থেকে প্রেরিত

সাফল্য গর্ব মিশ্রিত বিবরণীর সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর অগ্রগতির অন্তরালের খবরও প্রকাশিত হতে লাগলো ফ্যাশিস্তদের সংবাদপত্রে। চৌঠা জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে, ফ্যাশিস্তদের মুখপত্র, ভোলকিশকার বিয়োবাকটারে (Volkischer Bɜobachter) লেখা হলো ; "একথা অবিসম্বাদী যে এ পর্যন্ত জার্মাণ সৈন্য যতো প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে তার মধ্যে সোভিয়েতের প্রতিরোধই হলো সবচেয়ে একরোখা ও নিদারুণ অধ্যবসায়ী।" কিন্তু হিটলার অনুগামীরা অবস্থার প্রতিকূলতার মধ্যেও যতোটা সম্ভব প্রচণ্ডভাবে লড়াই চালাতে লাগলো। তাদেব মিত্রপক্ষকে তারা জানালো যে সবই বেশ ভালো চলছে। যখন আশঙ্কিত জাপ সরকার রণাঙ্গনের বিষয় সম্পর্কে বার্লিনে খোঁজ-খবব নেওযার চেষ্টা করলেন, তখন কাইটেল ও রিবেনট্রপ তাঁদের জানালেন যে, "জার্মাণ সৈন্যের অগ্রগতির বেগ মন্থর হয়ে যাওয়ার কারণ হলো সংযোগ ও রসদ সরববাহ ব্যবস্থার অত্যধিক দৈর্ঘ যার সঙ্গে কেন্দ্রগুলি তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। সে কারণেই জার্মাণ সৈন্যের অগ্রগতি পরিকল্পনা অনুযায়ী তিন সপ্তাহ পিছিয়ে পড়েছে।"[২৯]

কিন্তু হিটলার অনুগামীরা যা লোকের চোখের আড়ালে রাখতে চেয়েছিল, তা কিন্তু চাপা রইলো না। সকলেরই চোখে ধরা পড়ে গেল। সুইডেনের আরবেতারেন (Arbetaren) জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে মন্তব্য করলেন যে, "জার্মাণরা এবারে গিয়ে পড়েছে এ পর্যন্ত যা তারা পেয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশী একরোখা বিপজ্জনক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি। ট্যাঙ্ক, বিমান ও সেনাদলের ক্ষয়ক্ষতি জার্মাণদের অসম্ভব বেশি হয়েছে।"[৩০]

দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র ইউরোপে ফ্যাশিস্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠতে লাগলো। সর্বদেশের প্রগতিশীল মানুষেরা সোভিয়েতের মানুষের পিছনে এসে দাঁড়ালেন সমর্থনে। সোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ প্রচেষ্টা হিটলার অধিকৃত দেশের মানুষদের উদ্বুদ্ধ করে তুললো।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পূর্বেই হিটলার অধিকৃত দেশগুলিতে প্রতিরোধ আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, কিন্তু সেই অভিযান শুরু হয়ে সোভিয়েতের প্রতিরোধের সঙ্গে সঙ্গেই এই সব দেশেও প্রতিরোধের ব্যাপকতা, গভীরতা বাড়তে লাগলো।

"সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের আক্রমণ", মোরিস তোরে (Maurice Thorez) লিখেছেন, "আমাদের দেশে প্রতিরোধ আন্দোলনকে উদ্বুদ্ধ করলো, বিশেষ করে অনুপ্রেরণা লাভ করলো সশস্ত্র আন্দোলন। দেশ-প্রেমিকরা উপলব্ধি করলেন যে শক্তির একটা নতুন ভারসাম্যের অবস্থা সমুপস্থিত হয়েছে এবং জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সপক্ষে যারা তাদের জয়লাভ সুনিশ্চিত। এতোদিন পর্যন্ত অনেক ফরাসী মানুষ, যাঁরা দখলদারী সৈন্যের সম্পূর্ণ বিরোধী, তাঁদেরও নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় ছিল। ফ্রান্স যে কখনো আবার স্বাধীন হতে পারে এতে তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করতেন। বাইশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশের পর দেশ প্রেমিক মানুষেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন :

"এবার আর আমরা একা নই, সোভিয়েতের মানুষকে বন্ধু, সাথী সহযোদ্ধা হিসেবে পাশে পেয়ে, আমরা স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে পারি, শত্রুকে পরাস্ত করতে পারি।"[৩১]

সেদিন সোভিয়েতের গৌরবময় যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বিদেশের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি যে সমর্থন জানিয়েছিলেন তা ছিল মানুষের মৌল জাতীয় স্বার্থরক্ষা, জাতীয় মুক্তি ও ফ্যাশিস্ত দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি-সম্পন্ন।

ধনতান্ত্রিক দেশের সাধারণ মানুষের এই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন বিশেষ করে মেহনতি জনতা ও শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন ছিল আন্তর্জাতিক প্রলেতারীয় সংহতিরই প্রকৃত প্রকাশ।

সমস্ত দেশে ফ্যাশিবিরোধী জনপ্রিয় সংগ্রামে তাই নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করলেন কমিউনিষ্ট পার্টি। সেইসব কমিউনিষ্টদের, ফ্যাশিবিরোধী সাহসী, উৎসর্গীকৃত প্রাণ সংগ্রামী মানুষদের সম্মান বেড়ে যায় প্রায় রাতারাতি।

হিটলার জার্মাণীর সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি ঘোষণা করলেন তাঁদের মতামত। তাতে প্রতিটি দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের দ্রুত পরাজয় সম্ভব করে তোলার জন্যে ব্যাপক জনপ্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হলো।

নাৎসী অধিকৃত পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশে দেশে, কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি জনসাধারণকে দখলদারী সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু

করার জন্যে, গেরিলা আন্দোলন এবং সম্ভব হলে কোথাও কোথাও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে আহ্বান জানালেন। বাইশে জুন বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি একটি প্রকাশ্য আবেদন জানালেন এবং দুদিন পরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তাঁরা : সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বুলগেরিয়ার কমিউনিষ্টরা তাঁদের প্রথম পার্টিজান দল গঠন করলেন উনিশ শ' একচল্লিশের জুন মাসেই। চেকোস্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি অনুরূপ সিদ্ধান্ত করে, সেপ্টেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে প্রাগে একটা জাতীয় বিপ্লবী প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার পথ প্রস্তুত করলেন।

চেকোস্লোভাকিয়ায় অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো। জার্মাণদের আদেশ মতো উৎপাদনরত চেকদের কলকারখানায় শ্রমিকের উৎপাদন হার শতকরা চল্লিশভাগ নেমে গেল। অন্তর্ঘাতী কাজে লিপ্ত দলগুলি কখনো বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দিল কলকারখানা বা সেতু, কখনো আগুন জ্বালিয়ে দিল গুদামে, যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে চুরে কিম্বা অকেজো যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করে তারা সমানে বাধা দিয়ে চললো। পিলসেনের স্কোডা কারখানার কয়েকটি বিভাগ তারা অকেজো করে দিল। ব্রেবানিসের এমন একটা কারখানার বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র তারা নষ্ট করলো যেখানে তৈরী হচ্ছিল কামান, বন্দুকের গোলা বারুদ আর কার্তুজ। কয়েকটা বড়ো বড়ো কারখানায় কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে ধর্মঘট হয়ে গেল। হ্রাদেক-ক্রালোভে (Hradek-Kralove) স্কোদা শ্রমিকরা ধর্মঘট করলো। তাদের দেখাদেখি ওয়াল্টার বিমান নির্মাণ কারখানা, কোলবেন-দানেকের (Kolben-Danek) যুদ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র, প্রাগের রিঙ্গোফেন মোটর নির্মাণ কেন্দ্র, ক্লাদনোর ইস্পাত কারকানা, পোলদিনা গাটও অন্যান্য অনেক জায়গার শ্রমিকরা ধর্মঘট করতে লাগলো। সেই বছরই গ্রীষ্মকালে পূর্ব স্লোভাকিয়া ও বোহেমিয়ার কয়েকটি জেলায় প্রথম পার্টিজান দলের আবির্ভাব ঘটলো।

বাইশে জুন যুগোস্লাভ কমিউনিষ্ট পার্টির পলিট ব্যুরো, নাৎসীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্যে জনগণের কাছে আবেদন জানালেন। সেই দিনই বেলগ্রেডে পার্টিজানদের এক সদর দপ্তর খোলা হলো। জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশ পার্টিজানরা দখলদার ও দেশীয় ভাড়াটে সৈন্যদের নানা জায়গায় ছোটখাটো সংঘর্ষেও কয়েকটা দারুণ সংগ্রামে টেনে আনলো।

যুগোশ্লাভ পার্টিজানরা প্রথম সংঘর্ষ বাধায় সাতই জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে সার্বিয়াতে, তারপর তেরই জুলাই মন্টিনেগ্রোয় এবং সাতাশে জুলাই ক্রোয়াশিয়া, বসনিয়া ও হার্জগোভিনায়। অল্পদিনের মধ্যেই পার্টিজানদের যুদ্ধ এমন বিস্তৃতি লাভ করলো যে সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ায় সংঘর্ষ বেধে গেল।

শত্রু অধিকৃত আলবেনিয়ার রাজধানী তিরানায়, সমস্ত কমিউনিষ্ট গোষ্ঠীগুলির এক গোপন বৈঠক বসলো আটই নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশ। ফ্যাশিবাদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ে আস্থা ঘোষণা করে, সেখানে গঠিত হলো আলবেনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিষ্ঠান কমিউনিষ্টপার্টি। বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে নবগঠিত পার্টি, দখলদারী সৈন্যের বিরুদ্ধে ব্যাপক পার্টিজান আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ ও তাকে কার্যকরী করতে সচেষ্ট হলো।

জার্মানীতে আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্ট কর্মীরা ইশ্‌তাহার বিলি করে এই সমস্ত ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করলেন। গেষ্টাপো প্রদত্ত এক পরিসংখ্যাণে দেখা যায় যে উনিশ শ' এক চল্লিশের জানুয়ারী থেকে মে মাসের মধ্যে বাষট্টি থেকে পাঁচশ' উনিশ খানা বেআইনী ইশ্‌তাহার ও পুস্তিকা প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। জুলাই মাসে অর্থাৎ হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের একমাস পরে, এই সব গোপন প্রকাশনের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো তিন হাজার সাতাশ' সাতানব্বই। পরের দুই মাস আগষ্ট ও সেপ্টেম্বরে এর সংখ্যা প্রায় একই রকম থেকে, অক্টোবর মাসে দারুণ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো দশহাজার দুশ' সাতাশ।[৩২]

ছয়ই অক্টোবর উনিশ শ' একচল্লিশে জার্মান কমিউনিষ্ট পার্টি, জার্মান জাতি, তার সেনাবাহিনী, শ্রমিক কৃষক ও সমস্ত মেহনতী মানুষের প্রতি এক আবেদন প্রচার করলেন। বাস্তব অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বিস্তারিত বিশ্লেষণ করে, সেই আবেদনে প্রায় ভবিষ্যদ্বাণীর মতো এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল:

"বাইশে জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর ঘৃণ্য ও বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ সুরু করে, হিটলার জার্মাণ জাতির প্রতি এক নিদারুণ অপরাধ করেছে, যা জার্মাণীকে এক চরম জাতীয় বিপর্যয়ের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।"[৩৩]

গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পার্টিগুলিও তাঁদের নিজেদের জনগণ ও সরকারকে হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে দাঁড়িয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানালেন। তাঁদের ঘোষণায় জোরের

সঙ্গে একথাই বলা হলো যে সোভিয়েতের যুদ্ধের আদর্শই হলো সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষের আদর্শ, তা হচ্ছে শান্তি ও সমাজতন্ত্র। বৃটেনের কমিউনিষ্ট পার্টি বললেন :

"পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের মানুষদের সঙ্গে এদেশের মানুষের একটা ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করতে হবে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্টপার্টি, "হিটলারবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার জন্যে" আহ্বান জানালেন।[৩৪]

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নাৎসী আক্রমণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নাৎসী অধিকৃত পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির জনগণকে অবহিত রাখলেন সেই সেই দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি। ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি বাইশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশে এক বিশেষ আবেদন প্রচার করে ঘোষণা করলেন যে, ফরাসী জাতি কিছুতেই সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে শরিক হবে না।

হিটলার জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পূর্বেই উনিশ শ' একচল্লিশের এপ্রিলে, হাউতে-ভিয়েঁ (Haute-vienne) প্রদেশে প্রথম ফরাসী গেরিলা বাহিনীর একটি শাখা সংগঠিত হলো। বাইশে জুন, উনিশ শ' একচল্লিশের পরে ফরাসী কমিউনিষ্টরা আরো অনেক প্রদেশে গেরিলা শাখার কাজ সম্প্রসারিত করলেন। সেপ্টেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই গেরিলা সংস্থার নেতৃত্বে গ্রহণ করলেন জাতীয় যুদ্ধ কমিটি।

জার্মাণী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার সাতদিনের মধ্যেই ফ্রান্সের দেশপ্রেমিক মানুষেরা প্যারী অঞ্চলে কয়েকটি জার্মাণ সৈন্য বোঝাই ট্রেণ বোমা মেরে উড়িয়ে দেন। তুলুজে একটা বিরাট তৈল ডিপোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। উইংলিস অঞ্চলে একটা যুদ্ধ উৎপাদন কেন্দ্র বোমার ঘায়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়। বাস্তিল দিবস, চৌদ্দই জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে জার্মাণ অধিকৃত প্যারীতে বিরাট জার্মাণ বিরোধী মিছিল করা হয়।

শোভাযাত্রাকারীরা বিরাট ফেষ্টুন নিয়ে, মার্সেই সংগীত গাইতে গাইতে পরিভ্রমণ করে। সেই সব ফেষ্টুনে লেখা ছিল, "সোভিয়েত ইউনিয়ন দীর্ঘজীবি হোক।" প্রকাশ্য দিবালোকে দেশপ্রেমিক ফরাসীরা হিটলারের কয়েকজন

অফিসারকে হত্যা করেন। পাস দ্য-ক্যালে খনি শ্রমিকরা উনিশ শ' একচল্লিশের জুলাই মাসে গেরিলা বাহিনী সংগঠন করে। অনুরূপ সংস্থা গড়ে ওঠে আলসাসে ও অন্যান্য নানা জায়গায়।

উনিশ শ' একচল্লিশ বিয়াল্লিশে বেলজিয়ামে জার্মাণ বিরোধী ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের সংখ্যা দাঁড়ায় ষোল শ' সাতায়। এর মধ্যে দু' শ' ছেচল্লিশটি ট্রেনে বিস্ফোরণের ঘটনা।[৩৫] এই সময়ের মধ্যে আমাস্ট্রার্ডামের পথে ঘাটে পাঁচশ'র বেশি জার্মাণ সৈন্য ও অফিসার নিহত হয়।

সোভিয়েতের এই বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ প্রচেষ্টা চীনের জনগণকে তাদের জাপানী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সাহায্য করে। জার্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে যোগদান দূর প্রাচ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। ফলে সমগ্র পরিস্থিতি সমস্ত স্বাধীনতাকামী দেশগুলির বিশেষ করে মহাচীনের অনুকূলে যায়। সাতই জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি একটি ঘোষণায় এই নোতুন অবস্থায় জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি যুদ্ধের লক্ষ্যগুলির ব্যাখ্যা করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে একটা শক্তিশালী ফ্যাশি বিরোধী মোর্চা গঠনের প্রস্তাব করা হয় এই ঘোষণায়। জার্মাণী ও ইটালীর সঙ্গে চীনের সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদের দাবী জানায় কমিউনিষ্ট পার্টি। জাপানীদের বিরুদ্ধে আরো সক্রিয় কার্যকরী কর্মসূচীর বর্ণনা ছিল এই ঘোষণাপত্রে।

"ফ্যাশিস্ত পররাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পবিত্র সংগ্রামে রত", চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি বলেন, "তাতে সোভিয়েতের মানুষ কেবল তাদের স্বদেশ রক্ষার সংগ্রামই করছে না, যেখানে যতো দেশ ফ্যাশিস্ত দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাচ্ছে তাদেরও শরিক হয়ে গেছে।"

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির যে ঘোষণাপত্র অল্পকালের মধ্যেই চীনের মানুষের জাপ বিরোধী সংগ্রামের পতাকা হয়ে দাঁড়ালো, তা কিন্তু কুও-মিন-টাং এবং চিয়াং-কাই-শেক সরকার প্রত্যাখ্যান করেন। যখন ফ্যাশিবাদী কূটনীতিকেরা চীন থেকে বিদায় নিলেন, কুওমিনটাং সরকার তাঁদের সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করলেন। চিয়াং সরকারের পক্ষে, চীনের যুদ্ধ মন্ত্রী হো-ইং-চিন (Ho Ying-Chin) ভোজসভায় ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকার মনে করেন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানী ও জাপানই জয়লাভ করবে। পরাজয় হবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

ফ্যাশিবিরোধী মোর্চার আবির্ভাবে, বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিদের সংগ্রাম ও বিপুল জনসমর্থন লাভ, একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ সুরু হওয়ার পরে যে সমস্ত দেশগুলি ফ্যাশিস্ত পররাজ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত ছিল, তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে গঠন করলেন একটা সংযুক্ত ফ্রন্ট।

কিন্তু তা সত্বেও বলা যায় যে মস্কোয় জার্মাণ সৈন্যের পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত, ফ্যাশিস্ত অধিকৃত ইউরোপের দেশগুলির মুক্তি আন্দোলন ছিল বিচ্ছিন্ন, মুষ্টিমেয় মানুষদের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা। একে সমগ্র ইউরোপে ক্রমে বিস্তৃয়মান জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সূচনা পর্ব বলা যায়।

॥ চার ॥

সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধকালীন লক্ষ্য সোভিয়েতের যুদ্ধকালীন পররাষ্ট্র-নীতির লক্ষ্যকেও গড়ে তুলেছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত জয়লাভের জন্যে অত্যন্ত অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের মতো যুদ্ধ সুরু করা, আন্তর্জাতিক জীবনধারা থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে পর্যুদস্ত করতে হবে। একটা শক্তিশালী ফ্যাশিবিরোধী রাষ্ট্রগুলির মোর্চা গঠনের আবশ্যিকতা তখন অত্যন্ত বেশি করে অনুভূত হয়েছিল। শত্রুর শিবিরকে দুর্বল করতে হবে, তার শক্তিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, ভেঙ্গে দিতে হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকশ্রেণী চেয়েছিলেন যে হিটলার জার্মানী ও সাম্রাজ্যবাদী জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলুক। তাঁরা চেয়েছিলেন ফ্যাশিস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জোট ইউরোপের সমস্ত গণতান্ত্রিকও বৈপ্লবিক শক্তিকে ধ্বংস করে দিক। প্রাচ্যের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন এর চাপে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাক। সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে হবে। আর শেষতঃ হলেও কোন মতেই যা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না তা হলো যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর গণতান্ত্রিক বনিয়াদ রচনার জন্যে সোভিয়েত যুদ্ধকালীন পররাষ্ট্র নীতির প্রচেষ্টা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায় যে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য ছিল একটা শক্তিশালী ফ্যাশিবিরোধী মোর্চা গঠন করে এবং তারই মধ্যে দিয়ে সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধের পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়া।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বহু রাষ্ট্রনেতার মতো জার্মাণ ফ্যাশিস্ত নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় ছিলেন, প্রায় স্থির নিশ্চিত ছিলেন বলা যায় যে, সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মী সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন দেশগুলির পক্ষে কোন ফ্যাশিবিরোধী মোর্চা গঠন সম্ভব নয়।

হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রাক্কালে, একুশে জুন উনিশ শ' একচল্লিশে, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর একটা স্মারকলিপি রচনা করে বললেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আমাদের ভবিষ্যত নীতি কি রকম হবে সে সম্পর্কে কোন অগ্রিম প্রতিশ্রুতি দেওয়া বা কোন বিশেষ দায়িত্ব স্বীকার করা মোটেই উচিত হবে না।"[১*] এই অত্যন্ত অস্পষ্ট ঘোষণার মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট ছিল যে মার্কিন সরকার কোন ফ্যাশিবিরোধী মোর্চায় যোগদান করতে প্রস্তুত নয়। পররাষ্ট্র দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি মারফতে শুধু এই কথা জানিয়ে দিলেন যে নাৎসী জার্মাণী যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তাহলে সেই পরিস্থিতিতে আভ্যন্তরীণ চাহিদা ক্ষুণ্ণ না করে অন্য দেশে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দ্রব্যের যোগান ব্যাহত না করে, সোভিয়েতের সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্যে যে সমস্ত বিধি-নিষেধগুলি আছে তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে।

নাৎসীরা সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পরেও সাম্রাজ্যবাদীরা এই আশা পরিত্যাগ করেন নি যে সমস্ত চলতি গণ্ডগোল, সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে শেষ পর্যন্ত মিটমাট করে নেওয়া বা শুধরে নেওয়া যাবে। যদিও তাঁরা এটা স্পষ্টভাবেই জানতেন যে ফ্রান্স সমেত হিটলারের সৈন্যদল ইউরোপের এগারোটি দেশ পদানত করেছে। ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির বিপদও কোন মতে কম নয়। কারণ ফ্রান্স যার শক্তিকে ইউরোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ধরা হতো হিটলারী বাহিনীর সামনে তা নিতান্ত তুচ্ছ হয়ে গেছে। বৃটেনের মাথার উপরও তখন সম্পূর্ণ পরাজয়ের সম্ভাবনা ঝুলে আছে। কিন্তু যে সব মানুষ ইতিহাসের বাস্তব নিয়মকে উপেক্ষা করে চলতে চান, যাঁরা মনে করতেন মোর্চা গঠন কোন মতেই সম্ভব নয়, তাঁদের জন্যে আরো হতাশা অপেক্ষা

করছিল। ইতিহাসের অমোঘ শক্তি কোন নেতার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার অপেক্ষা রাখে না।

যেরকম প্রথমে বলতে হয়, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা, যার ফলে প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যেই যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু জার্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করা শক্ত দেখেই বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন। রয়াল ইনষ্টিটিউট অব্ ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের পক্ষ থেকে উনিশ শ' পঞ্চাশ সালে প্রকাশিত যুক্তরাজ্যের নীতি, বৈদেশিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক "(United Kingdom Policy. Foreign, Stretigic, Economic) শীর্ষক এক গ্রন্থে এই স্বীকারোক্তি ছিল যে জার্মাণী তার মোট শক্তির একাংশ বৃটেনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রায় যুক্তরাজ্যকে পরাজিত করে ফেলেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধে যোগদান না করলে, কমনওয়েলথ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও সমর্থনে বৃটেন জয়লাভ করতে পারতো কিনা সন্দেহ ছিল। জেনারেল জর্জ. সি. মার্শালের এক সরকারীভাবে প্রদত্ত যুদ্ধ বিষয়ক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "সোভিয়েত ও বৃটেনের মানুষের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিজের দেশের মাটিতে যুদ্ধের মুখোমুখি হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে।"[৩৭] তাই দেখা যায় নিছক ঠাণ্ডা মাথায় বেশ হিসেব করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক শ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

দীর্ঘকাল ধরে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের বক্তব্য ছিল যে, এক দিকে পুঁজিবাদী দেশগুলি ও অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুয়ের মধ্যে কোন রকম সহযোগিতা অসম্ভব। কিন্তু ঘটনার চাপ বিপরীত গতিই নির্দেশিত করলো। সহযোগিতা সম্ভব হয়ে উঠলো। তার চেয়েও যা বড়ো কথা, এর বিরোধীরাই নিজেদের গরজে, সহযোগিতার জন্যে সচেষ্ট হতে বাধ্য হলেন।

ফ্যাশি বিরোধী মোর্চা গঠনে ও তাকে অগ্রসরমান করার অনুকূলে আরো যে সব বাস্তব অবস্থা ছিল তার মধ্যে জনগণের সংগ্রাম, আন্দোলন অন্যতম। বৃটিশ ও আমেরিকার জনগণের বৃহত্তম অংশ, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বন্ধুভাবপন্ন ছিলেন। তাঁরা দাবী করতে লাগলেন যে তাঁদের দেশ, হিটলার

জার্মানীর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সহযোগী হোক।

ফ্যাশি বিরোধী মোর্চা গঠনে সোভিয়েত সরকার ভি. আই. লেনিনের সেই নির্দেশানুসারেই কাজ করেছেন, যিনি বলেছিলেন :

"অধিকতর শক্তিশালী কোন শত্রুকে পরাস্ত করার জন্যে অব্যর্থভাবে সমগ্র প্রচেষ্টা সংহত করে, পূর্ণ সতর্কতা, মনযোগ এবং দক্ষতার সঙ্গে শত্রুদের মধ্যে যে কোন এমন কি সামান্যতম ভাঙ্গনকে কাজে লাগিয়ে, বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াদের মধ্যে যে কোন স্বার্থগত বিরোধের সুযোগ নিয়ে,......এবং যে কোন বৃহৎ দেশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করার সামান্যতম সুযোগ, তা সেই মৈত্রী যতোই সাময়িক, ইতস্তত মনোভাব সম্পন্ন, অনির্ভরযোগ্য, পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন অযোগ্য এবং সর্ত সাপেক্ষ হোক না কেন, তার সুযোগ নিতে হবে। যারা একথার মূল্য বোঝে না, তারা মার্ক্সবাদ কিম্বা সাধারণ ভাবে বৈজ্ঞানিক, আধুনিক সমাজতন্ত্রের, কণামাত্রও বোঝে না।"[৩৮]

তদানীন্তন পরিস্থিতি বৃটিশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারদের সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এক সারিতে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করলো। এরই স্বপক্ষে বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বিবৃতিদান করলেন চার্চিল বাইশে জুন উনিশ শ' একচল্লিশ সালে। আমেরিকার পক্ষ থেকে অনুরূপ ঘোষণা করলেন চব্বিশে জুন তারিখে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট।

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকরা চেয়েছিলেন জার্মানীকে দুর্বল করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ব্যবহার করতে এবং তারই ফলে জার্মানীর আঘাতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করে রাখতে। চার্চিল তাঁর বেতার ভাষণে বলেন :

"বিগত পঁচিশ বৎসর ধরে আমার চেয়ে এমন দৃঢ়, অপরিবর্তনীয় মনোভাব নিয়ে সাম্যবাদের বিরোধিতা আর কেউ করেনি। তার সম্বন্ধে এতোদিন আমি যেসব কথা বলেছি, তার একটিও আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি না।"[৩৯]

তা সত্বেও চার্চিল স্বীকার করেছিলেন যে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা, বৃটেনের চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ণয়ে অসীম গুরুত্বপূর্ণ। তাই তিনি বলেন : "রাশিয়ার বিপদ আমাদের বিপদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপদ. তাই যে রুশ তার নিজের দেশ, মাটি, ঘর বাড়ীর জন্যে সংগ্রাম করেছে

সে আসলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় স্বাধীন মানুষের, স্বাধীন জাতির স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম করছে।"

মার্কিন দেশে রুজভেল্টের বিবৃতি, ও সেনেট সদস্য এবং পরবর্তীকালে উপরাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি হ্যারী ট্রুম্যানের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারের বিবরণ সহ প্রকাশিত হয়। সাক্ষাৎকারে ট্রুম্যান একেবারে খোলাখুলি বলেন :

"আমরা যদি দেখি যে জার্মাণী যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে তাহলে উচিত হবে রাশিয়াকে সাহায্য করা এবং রাশিয়া জিতলে জার্মাণীকে সাহায্য করা, যাতে তারা নিজেদের মধ্যে যতো বেশি সম্ভব খুনোখুনি করে মরতে পারে।"[৪১]

ভ্যাটিক্যানে মার্কিণ রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মাইরণ সি. টেইলর, পোপ দ্বাদশ পিয়াসকে বলেন যে, "নাৎসী জার্মাণী যাতে রাশিয়াকে পরাজিত করে, তাদের গম, তৈল ও অন্যান্য উপকরণ আবার পররাজ্য আক্রমণে ব্যবহার করতে না পারে"[৪২] সেই সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার, সোভিয়েত ইউনিয়নকে যতোদূর সম্ভব সাহায্য করতে বদ্ধপরিকর।

তেসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশে পোপের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বলেন যে, হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করছে, কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষায় জার্মাণ ফ্যাশিবাদের চেয়ে সোভিয়েত ব্যবস্থা "কম বিপজ্জনক"। সেই বাণীতে আরো বলা হয়েছিল যে, নিজ সীমান্তের বাইরে সোভিয়েত ইউনিয়ন একমাত্র সাম্যবাদী প্রচার ছাড়া আর কোন হাতিয়ার ব্যবহার করে না। অন্যদিকে জার্মাণী "তার নিজ সীমান্তের বাইরে অস্ত্রের জোরে ও প্রচারের সাহায্যে বিশ্ববিজয়ের স্বপ্নে যে কোন ধরনের সামরিক শক্তি ব্যবহার করে পররাজ্য আক্রমণ করে চলেছে।"[৪৩]

জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ তাই ন্যায় যুদ্ধ, মুক্তি যুদ্ধ এবং বিশেষ করে সেকথা সত্যি হয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পর। এই ধারনাই ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চা গঠনে সাহায্য করলো প্রভূতভাবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে একটা কার্যকরী বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করলেন।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সর্বস্তরে, সমস্ত সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা, ধারক ও বাহক। উনিশ শ' একচল্লিশের জুলাই মাসের প্রথম দিকে, মস্কোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে, সাধারণ শত্রুর

বিরুদ্ধে একটা সোভিয়েত বৃটিশ চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব সোভিয়েত সরকার পাঠান। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হলে, জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যৌথ ভূমিকা গ্রহণের চুক্তি হিসেবে তা বারোই জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে বর্তমান যুদ্ধে স্বাক্ষরকারীরা একে অন্যকে সমস্ত রকমের সাহায্য দিতে ও সমর্থন জানাতে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করেন। তাছাড়া স্বাক্ষরকারীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে পরস্পরের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সম্মতি লাভ না করলে তাঁরা এককভাবে জার্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি বা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করবেন না।[৪৪]

হিটলার বিরোধী মৈত্রী গঠনে এটাই ছিল প্রথম কার্যকরী পদক্ষেপ। এরই ফলে বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য দেশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মিত্র পক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপনের ভিত্তি রচিত হলো। এই দুই দেশ যে পরস্পরের মধ্যে মিত্রপক্ষীয় সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে বদ্ধপরিকর, চুক্তিটিই প্রথম তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত করলো।

কিন্তু যেহেতু চুক্তিতে কিভাবে পারস্পরিক সাহায্যদান সম্ভব হবে সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা ছিল না তাই দুই দেশের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলতে লাগলো। সেই আলোচনায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার প্রশ্নটিই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অবিলম্বে যদি দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা যায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে অসুবিধার সামনে পড়েছে তা বহুলাংশে কেটে যাবে, কারণ তখন জার্মাণী তার সৈন্যবাহিনীর একাংশকে সোভিয়েতের দিক থেকে সরিয়ে আনতে বাধ্য হবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি, আঠোরোই জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে চার্চিলের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে বলেন :

"ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে একটা ফ্রন্ট খোলা হলে শুধু পূর্বসীমান্ত থেকে হিটলারের সৈন্যবাহিনী শুধু সরে আসতেই বাধ্য হবে না, হিটলারের পক্ষে বৃটেন আক্রমণ অসম্ভব করে দেবে। বৃটিশ সৈন্যবাহিনীও দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের মানুষদের দ্বারা এই রণাঙ্গনের সূচনা অভিনন্দিত হবে। এই ধরনের রণাঙ্গন খোলার বাধা কি সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার মনে হচ্ছে যে সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও যদি এই রণাঙ্গন খোলা যায়, এবং তাকে

সম্ভব করে তুলতেই হবে, তাতে আমাদের উভয়েরই সাধারণ উদ্দেশ্য সফল হবে শুধু তাই নয়, বৃটেনের স্বার্থরক্ষার পক্ষেও এর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।"[৪৫]

দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সূচনা করার প্রভূত সুযোগ ছিল। হিটলার জার্মাণী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার জন্যে তার সৈন্যবাহিনীর বেশির ভাগ নিয়োগ করেছে, ফলে পশ্চিম ইউরোপে জার্মাণ সৈন্য প্রায় তখন ছিল না বললেই চলে। বৃটিশ সেনাদলও ডানকার্কের আঘাত সামলে উঠেছে। নোতুন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়েছে তারা, তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। সোভিয়েত সরকার ও চার্চিল স্বীকার করেছেন,[৪৬] দ্বিতীয় রণাঙ্গণের সূচনা করার জন্যে বৃটেনকে তিন চারটি সেনাদল পাঠিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

কিন্তু চার্চিল চেয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়ুক। রক্তাক্ত হয়ে থাকে তার দেহ। তাই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি সোভিয়েত প্রস্তাব। সন্দেহ নেই তিনি বলেছিলেন প্রত্যাখান করার সময় যে তিনি "আন্তরিকতার সঙ্গেই তাঁদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য কোন উপায়ে আঘাত হানার চেষ্টা করবেন" এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার জন্যে "বৃটেন যুক্তিযুক্ত ও কার্যকরী যে কোন পন্থা" অবলম্বন করবে। কিন্তু এই সব প্রতিশ্রুতিই ঝাপসা ধরনের, নির্ভরযোগ্য নয়।

সোভিয়েত সেনাবাহিনী ও সোভিয়েতের মানুষ সম্পর্কে বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী প্রশংসা বর্ষণে কিন্তু কোন কার্পণ্য করেননি। তিনি লেখেন যে "সোভিয়েতের সেনাবাহিনী ও জনসাধারণের বীরত্ব অধ্যবসায় সম্পর্কে সকলেই প্রসংসা মুখর।"[৪৭] কথাটা মিথ্যা ছিল না, কিন্তু চার্চিলের মুখ থেকে আসার জন্যে একে ততোটা আন্তরিক বলে মনে হয়নি, বিশেষ করে যখন তাঁর স্মৃতিকথায় দেখা যায় তিনি লিখেছেন যে তিনি সচেষ্ট ছিলেন যে "শূন্যতাকে সভ্যতা, ভব্যতা দিয়ে পূরণ করার জন্যে।"[৪৮] আর এই সভ্যতা, ভব্যতার অর্থ কি, তার ব্যাখ্যাও তিনি নিজেই দিয়েছেন এই বলে: "যখন তোমায় কোন লোককে হত্যা করতে হবে, তখন একটু ভদ্রতা দেখালে বিশেষ কিছু যায় আসে না।"[৪৯]

সোভিয়েত সরকার চেষ্টা করতে লাগলেন বৃটেনকে কোনমতে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করতে। তেসরা সেপ্টেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রেরিত এক বাণীতে বলেন যে শত্রুদেশ-গুলিকে একে একে আক্রমণ ও পরাস্ত করার জার্মাণ নীতিকে ব্যর্থ করার জন্যে

এখনই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলাটা জরুরী। তাছাড়া তিনি সেই বাণীতে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, বিমান ও ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার কথা বলেন।

বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হলে যে ধরণের সুবিধা হতো, এই সব যুদ্ধের জিনিস সরবরাহ করার সুবিধা কোন মতেই তার সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়নের অসুবিধা এতে কিছুটা কমে গিয়েছিল তাতে কোন ভুল নেই। কিন্তু তাতেও বৃটেন দীর্ঘসূত্রী মনোভাব অবলম্বন করে, সমস্ত বিষয়টি যৌথভাবে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে স্থির করার চেষ্টা করতে থাকে।

মার্কিণ সরকারও সোভিয়েত ইউনিয়নকে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ দিয়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তা করা হবে আমেরিকার সর্তে যা সাহায্য-গ্রহণকারী দেশের পক্ষে অসুবিধাজনক। ফলে আমেরিকার কাছ থেকেও সাহায্য আসতে দেরী হতে লাগলো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে এই সমস্ত দ্রব্যাদি সরবরাহের বিষয় আলাপ আলোচনার জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের ঘনিষ্ট পরামর্শদাতা হ্যারী হপ্‌কিন্সকে মস্কোয় পাঠালেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি তাঁর সঙ্গে একটি চিঠিতে বলেন :

"আমার সঙ্গে সরাসরি আলাপ আলোচনায় আমার প্রতি আপনি যেমন বিশ্বাস স্থাপন করতেন, মিঃ হপকিন্সকেও আমি সেই রকম বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি।"[৫০] মস্কোর পথে হপকিন্স প্রথমে এলেন লণ্ডনে, চার্চিলের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে আলোচনা করার জন্যে। মস্কোয় এলেন তিনি জুলাই মাসের শেষে উনিশ শ' বিয়াল্লিশে।[৫১]

মস্কোয় হ্যারী হপকিন্স বলেন যে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার, সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করতে রাজী। কিন্তু তিনি একটি সর্ত আরোপ করলেন যে "দীর্ঘকালীন উপকরণ সরবরাহ সমস্যা সম্পর্কে" মার্কিণ সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হতে পারে যদি তার "শুধু রাশিয়ার সামরিক পরিস্থিতি .নয়, রাশিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের ধরণ, সংখ্যা ও উপযোগিতা এবং

মজুদ কাঁচামালের পরিমাণ ও কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা থাকে।"[৫২]

স্পষ্টতই দেখা যায় যে, মার্কিণ সরকার রাশিয়ার সামরিক পরিস্থিতি ও যুদ্ধোপকরণ উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ খবরাখবর সংগ্রহকে সাহায্যদানের পূর্বসর্ত করেছিলেন। স্বভাবতই ব্যাপারটি অমীমাংসিত হয়ে রইলো।

কিন্তু তা সত্বেও সোভিয়েত-মার্কিণ সম্পর্কে পরিবর্তনের সূত্রপাত হলো। দোসরা আগষ্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে দুই দেশের সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে মার্কিণ অর্থনৈতিক সাহায্যদান সম্পর্কে মত বিনিময় করলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্তব্য ছিল এই যে সরবরাহের পরিমাণ ও দ্রুততা এমন হওয়া উচিত যাতে, "আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যে ব্যাপক সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার কাজে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপৃত আছে তার প্রয়োজন ও গুরুত্বের অনুপাতে সেই সাহায্য আসে।"[৫৩]

কিন্তু এতো প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, যুদ্ধের সূচনায় সেই অত্যন্ত সংকটপূর্ণ মাসগুলিতে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়কে সাহায্য করতে বিশেষ কিছুই করেননি। পরবর্তী বৎসরগুলিতেও দেখা গেছে যে ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর মূল আক্রমণকারী সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধরত রেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই দুই দেশকে যতোটা সাহায্য করেছে, সেই অনুপাতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রদত্ত ইঙ্গমার্কিণ সাহায্য কার্যকরী হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমগ্র ইতিহাসে সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনই ছিল সবচেয়ে বড়ো সামরিক সক্রিয়তার কেন্দ্র।

নাৎসী আক্রমণ সুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন দেশত্যাগকারী চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও নরওয়ে সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এতে নাৎসী অধিকৃত দেশগুলির জাতীয় সার্বভৌমত্ব যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করবে, সোভিয়েতের এই দুই নীতির উপর গুরুত্ব আরোপিত হলো। এক্ষেত্রেও ইঙ্গ-মার্কিণ নীতি নিয়ামকদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সোভিয়েতের নীতির মৌল পার্থক্য সূচিত হলো, কারণ তখনো পর্যন্ত তাঁরা ইউরোপের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী খেলার ঘুঁটি হিসেবেই ব্যবহার করতে চাইছিলেন।

চেকোশ্লোভাকিয়াকে যে আবার রাষ্ট্র হিসাবে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে

দীর্ঘদিন ধরে ইঙ্গমার্কিন সরকার সেই দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করতে গররাজী ছিলেন। বরং তাঁরা মনে করতেন যে জার্মাণীর চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করাটা বেশ আইনসম্মতভাবেই সুসম্পন্ন হয়েছে। মিউনিক চুক্তির অন্যতম স্বাক্ষরকারী হিসেবে বৃটেনের সেই চুক্তি নাকচ করার তেমন বিশেষ গরজ ছিল না। প্রথমে তো বেনেসের ইংরেজ প্রীতি জানা সত্বেও বৃটেন সেখানে পলাতক সরকার গঠনের অনুমতি দান করতে অসম্মত ছিল। পরে নয়ই জুলাই উনিশ শ' চল্লিশে যখন সেই সরকার গঠিত হলো তখন আবার বৃটেন তাকে স্বীকৃতি দান করতে অস্বীকার করলো। আরো পরে যখন আর স্বীকৃতিদানে অসম্মতি বজায় রাখা গেল না, তখন তাকে স্বীকার করা হলো পলাতক অস্থায়ী সরকার বলে সর্তসাপেক্ষে। স্বীকৃতি পত্রে বৃটেনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হলো যে ভবিষ্যতে মধ্য ইউরোপে কোন সীমান্ত কেমন দাঁড়াবে বৃটেনের এই স্বীকৃতি পত্র থেকে সে বিষয়ে তার সমর্থন ও স্বীকৃতি থাকবে এমন কিছু মনে করা বা ধরে নেওয়া চলবে না। বৃটেন যে তার মিউনিক কার্যক্রমের ভবিষ্যতকে খোলা রাখতে চায় এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মিউনিক পূর্ব সীমান্ত সম্পর্কে আগের থেকেই কোন মন্তব্য করতে চায় না, তার সেই ইচ্ছাই এই ঘোষণাপত্রে প্রকট হয়ে উঠলো।

কিন্তু যখন সোভিয়েত সরকার চেকোশ্লোভাক সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দানের আলাপ আলোচনা সুরু করলেন, তখন বৃটিশ সরকার আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে চেক মন্ত্রিসভাকে বিনাসর্তে স্বীকৃতি দান করে বসলেন। আসলে এর উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েতের বক্তব্য চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের মনে যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেই আশংকাতেই তাঁরা তাই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু অন্যদিকে যখন বৃটিশ সরকার কিভাবে নিজের গা বাঁচিয়ে চলার জন্যে নানারকম সর্তের বিষয় চিন্তা করছিলেন, সেই সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, আঠারোই জুলাই উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

সেই দিনই কয়েকঘণ্টা পরে, পলাতক চেক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী জ্যান মাসারিকের (Jan Masaryk) হাতে একটি চিঠি দিলেন এ্যান্টনী ইডেন (Antbony Eden), যাতে আইনগত স্বীকৃতির ঘোষণা করা হয়েছিল। সোভিয়েত নীতির চাপে পড়ে এই ধরনের ঘোষণা করতে বাধ্য হলেও, বৃটেন

আরেকবার জানিয়ে রাখলো যে রাজ্যের সীমান্তগত প্রশ্ন সম্পর্কে তার মত অপরিবর্তিতই থাকছে।[৫৪] মিউনিক কার্যক্রমের প্রতি বৃটেনের শাসকশ্রেণীর মনোভাবের যে কোন পরিবর্তনই হয়নি, এতে আবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এমন কি পাঁচই আগষ্ট উনিশ শ' বিয়াল্লিশে যখন বৃটেন শেষ পর্যন্ত স্বীকার করলো যে জার্মাণীর আচরণ মিউনিক চুক্তিকে অকার্যকরী করে দিয়েছে, তখনো এ্যান্টানী ইডেনের লিপিতে বলা হচ্ছে যে চেক সীমান্ত সমস্যার মীমাংসা করা হবে যুদ্ধ শেষের পরে। চেকোশ্লোভাকিয়ার মিউনিক পূর্ব সীমান্ত যে বৃটিশ সরকার কোন মতেই মানতে রাজী নন, আরেকবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

এ বিষয়ে বৃটেনের বক্তব্যের সঙ্গে সোভিয়েতের বক্তব্যের মৌলিক প্রভেদ ছিল। বেনেস স্বীকার করেছেন যে চেক্ জনগণের মৌল জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সোভিয়েতের নীতি সব সময়েই সঙ্গতিপূর্ণ ও অপরিবর্তিত ছিল। চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় স্বার্থকে সমর্থন জানাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন কখনো বিরত হয়নি। তিনি লিখেছেন :

"যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সুরু থেকে মিউনিক চুক্তি ও পনেরোই মার্চ উনিশ শ' উনচল্লিশের ঘটনাবলীর বিরোধিতা করে এসেছে (যে তারিখে জার্মাণী চেকোশ্লোভাকিয়া গ্রাস করেছিল—লেখক)। সে এই দারুণ সংকটময় মুহূর্তে মিউনিক চুক্তি ও তার সমস্ত ফলশ্রুতিকে মর্মান্তিক আঘাত করলো চেকোশ্লোভাক সাধারণতন্ত্রের মিউনিক-পূর্ব পরিস্থিতিকে বিনাসর্তে পূর্ণ মর্যাদায় স্বীকৃতিদান করে।"[৫৫]

আঠারোই জুলাই উনিশ শ' উনিশ একচল্লিশের সোভিয়েত চেক চুক্তিতে হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে উভয় স্বাক্ষরকারী পারস্পরিক সাহায্য ও সমর্থনদানে স্বীকৃত হলেন এবং সোভিয়েত দেশে চেকোশ্লোভাক সামরিক সংস্থা স্থাপনের ব্যবস্থা করার কথা বলা হলো।

পাঁচই জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে লণ্ডনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পলাতক পোলিশ সরকারের মধ্যে আলাপ আলোচনা সুরু হলো। পোলিশ সরকার সেপ্টেম্বর পূর্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে এমনভাবেই কথার যাদু সাজাতে চাইলেন যার গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন পোল জনসাধারণের মনঃপুত হয়। কিন্তু এই গণতন্ত্রের যাদুর আড়ালে ছিল পোল্যাণ্ডে বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বজায় রাখার আপ্রাণ প্রচেষ্টা। সিকোরস্কি (Sikorski) সরকারের

প্রকৃত ইচ্ছা গণতন্ত্রের বাতাবরণ ও দখলদারী সৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প ঘোষণার আড়ালে লুকানো ছিল। কিন্তু সেই প্রকৃত ইচ্ছা প্রকট হয়ে উঠলো যখন বৃটেনের সমর্থনপুষ্ট হয়ে তাঁরা পশ্চিম ইউক্রেন ও পশ্চিম বাইলোরাশিয়ার উপর দাবী জানালেন। হিটলারের দখলদারী সৈন্যের অত্যাচারে জর্জরিত পোলিশ জনগনের জাতীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে, এই প্রতিক্রিয়াশীল পলাতক পোলিশ সরকার, সোভিয়েত পোলচুক্তি সম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করলেন। অবশেষে অবশ্য তিরিশে জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে সেই চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো, কিন্তু সীমান্ত প্রশ্নকে পরবর্তীকালে সমাধানের জন্য স্থগিত রাখা হলো। চুক্তির প্রথম ধারায় বলা হয়েছিল :

"সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের সরকার স্বীকার করেন যে উনিশ শ' উনচল্লিশে সোভিয়েত জার্মাণ চুক্তিতে পোল্যাণ্ডের আঞ্চলিক পরিবর্তনের যে স্বীকৃতি ছিল তা এখন মূল্যহীন হয়ে গেছে। পোল্যাণ্ড সরকার ঘোষণা করছেন যে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত, কোন তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির সর্তাবলী মানতে তাঁরা বাধ্য নন।"[৫৬]

চুক্তির অন্যান্য ধারায় জার্মাণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে উভয় স্বাক্ষরকারী পারস্পরিক সাহায্যদানে সম্মত হলেন এবং সোভিয়েত দেশে পোল সামরিক সংস্থা স্থাপনের ব্যবস্থা হলো।

সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রামের মাধ্যমে সোভিয়েত ও পোল্যাণ্ডের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক সুন্দরভাবে গড়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু তা সত্বেও দেশত্যাগী পোল সরকার তার জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তার চুক্তি লঙ্ঘন করে চললেন। নিজের স্বার্থরক্ষা ও সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাশার প্রেরণায় তাঁরা সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্ত করতে লাগলেন। পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্নেল বেকের সোভিয়েত বিরোধী নীতিকে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সমর্থন করেছিল, এই দেশত্যাগী সরকারের নীতি নির্ণয়ে তারাই নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করলো। পোল্যাণ্ডের জনগণের প্রকৃত স্বার্থের ক্ষতি করেও এই দেশত্যাগী সরকার এমন এক সময়ে ইউক্রেন ও বাইলোরাশিয়ার উপর নিজেদের দাবীর স্বপক্ষে প্রচার সুরু করলেন, যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমস্ত শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুর অগ্রগতি প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট।

জেনারেল সিকোরস্কির পোল সরকারের প্রতিকূলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে সোভিয়েত দেশে পোল সামরিক সংস্থার নেতা হিসেবে জেনারেল আন্দের্সের (Anders) নিয়োগ। জেনারেল আন্দের্স তাঁর সোভিয়েত বিরোধিতার জন্যে তখন যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। তাই দেখা যায় সোভিয়েত দেশে সোভিয়েতের মানুষের প্রভূত সাহায্য নিয়ে তিনি যখন সামরিক বাহিনী গঠন করছেন তখন জার্মাণদের সঙ্গে যুদ্ধ করার দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তিনি নিজের খেয়াল মতো অ্যাডভেঞ্চার করে কাজ গুছিয়ে নেওয়ার তালে ঘুরছেন। ভল্গার মধ্যবর্তী কোন এক অঞ্চলে পোলিশ সেনাবাহিনী গঠনের কাজ তখন চলছিল। আন্দের্স তাঁর সঙ্গীসাথীদের তখন একদিন বললেন যে, "শিক্ষণের এই স্থান নির্বাচনে আমি অত্যন্ত খুশি হয়েছি। কারণ জায়গাটা প্রকৃত রণাঙ্গন থেকে বহু দূরে আছে, ফলে সামরিক তৎপরতা শিক্ষণ কাজে ব্যাঘ্যাত ঘটাতে পারবে না। জার্মাণ আক্রমণের তীব্রতায় লাল ফৌজ পর্যুদস্ত হয়ে পড়লে, যা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অনিবার্যভাবেই ঘটবে, আমরা কাস্পিয়ান তীর দিয়ে লড়তে লড়তে যাত্রা সুরু করবো ইরানের উদ্দেশে। তখন এই সমগ্র অঞ্চলে যেহেতু আমরাই থাকবো একমাত্র সুগঠিত সেনাবাহিনী, তাই যা ইচ্ছা তাই করবার অবাধ সুযোগ মিলবে আমাদের।"

সাতাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত সরকার, ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটির সঙ্গে মত বিনিময় করলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন কিছু করার অনেক পূর্বেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে, "স্বাধীন ফরাসী সংস্থাকে হিটলার জার্মাণী ও তার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে সর্বতোভাবে সম্ভাব্য সকল সাহায্যদান করবে।"[৫৭]

সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে, "সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ বিজয় সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, ফ্রান্সের মহান সত্ত্বা ও জাতীয় স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করার" দায়িত্ব সে গ্রহণ করছে।[৫৮] স্বাধীন ফরাসী জাতি-সত্ত্বার এটাই ছিল প্রথম ও পূর্ণ স্বীকৃতি, যাকে সত্যিই একটা প্রকৃত ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার গোড়াপত্তন বলা যেতে পারে।

বিভিন্ন দেশের মানুষের ফ্যাশিবিরোধী মোর্চা গঠনের আগ্রহে নেতৃত্ব দিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার বৈদেশিক সম্পর্ককে ক্রমেই সম্প্রসারিত করে তার আন্তর্জাতিক ভূমিকাকে সুরক্ষিত করলো। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত

প্রগতিশীল মানুষকে সংঘবদ্ধ করার জন্যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বেশ কয়েক বছর ধরে যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল, এটা হলো তার স্বাভাবিক পরিণতি।

॥ পাঁচ ॥

এদিকে ততোদিনে মোর্চা গঠন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার সূত্রপাত করার ক্ষেত্রে ইরাণের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাচোর এই দেশের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের সূত্র। তাছাড়া ইরাণের প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে তৈল সম্পদ যুদ্ধের প্রয়োজনে অতীব মূল্যবান। আরো লক্ষ্য করার বিষয় হলো সোভিয়েত পশ্চাৎভূমির কয়েকটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে ইরাণের ভৌগোলিক প্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক।

ইরাণের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে হিটলার জার্মাণীর বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সে দেশে জার্মাণ গুপ্তচররা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তাদের কর্মক্ষেত্র বিস্তৃত করেছিল। যুদ্ধ সুরু হওযার পরে, ইরাণ তার কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য জার্মাণীতে রপ্তানী করতে লাগলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, জার্মাণী ইরাণকে আরেকটি রণাঙ্গন বলে মনে করতে লাগলো। ফলে সোভিয়েতের স্বার্থ তথা বৃটেন ও সমগ্র হিটলার বিরোধী মোর্চার স্বার্থ এর ফলে রীতিমতো বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা দেখা দিল। পর পর তিনবার (ছাব্বিশে জুন, উনিশে জুলাই এবং ষোলই আগষ্ট) সোভিয়েত সরকার ইরাণকে তার অনুসৃত নীতির সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইরাণের সরকার সোভিয়েতের উপদেশের কর্ণপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি।

পঁচিশে আগষ্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েতের পক্ষ থেকে ইরাণের কাছে একটি নোতুন লিপি প্রেরণ করা হলো। তাতে সোভিয়েত-ইরাণ সম্পর্কের ইতিহাস থেকে, সোভিয়েতের ইরাণের প্রতি বন্ধু মনোভাবের নজীর স্বরূপ পর পর বহু ঘটনার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছিল। তাতে সাম্প্রতিককালে যে তিনটি স্মারকলিপি সোভিয়েত ইরাণকে পাঠিয়েছে, সে সম্পর্কেও আবার স্মরণ করিয়া দেওয়া হলো যে, ইরাণ সরকার সেই কথায় কর্ণপাত করেনান। সোভিয়েত সরকার তাতে বলেন যে জার্মাণ গুপ্তচররা ইরাণে বসে সেইদেশের

প্রতি তার সার্বভৌমত্বে ন্যূনতম শ্রদ্ধা দেখাতেও অনিচ্ছুক, "তারা যথেচ্ছভাবে কাজ করে চলেছে এবং ফলে ইরাণের জাতীয় ভূখণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালাবার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে।" সোভিয়েত স্মারকলিপিতে তাই বলা হয়েছিল যে "পরিস্থিতি যেমন মারাত্মক সংকটপূর্ণ হয়ে উঠেছে",[১১] তাতে উনিশ শ' একুশ সালের সোভিয়েত ইরানীয় চুক্তির ছয় ধারা অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন আত্মরক্ষার তাগিদে কাজ করতে পারে, তার সে অধিকার আছে। সেই তাগিদেই, উনিশ শ' একচল্লিশের ছাব্বিশে আগষ্ট, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ইরাণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

একই সঙ্গে দক্ষিণ ইরাণে প্রবেশ করলো বৃটিশ সৈন্য। ইরাণ অভিযান সোভিয়েত ও বৃটিশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলেও, ইংরেজ শাসক-শ্রেণীর মনের কোণে ছিল ভিন্ন অভিপ্রায়। তাঁরা চেয়েছিলেন সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনের সংকটপূর্ণ অবস্থাকে চাপ হিসেবে ব্যবহার করে ইরাণ থেকে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী অপসারিত করবেন এবং তারই ফলে বিনা বাধায় সমগ্র ইরাণ দখল করে মধ্য প্রাচ্যে নিজেদের স্বার্থকে সুরক্ষিত ও প্রসারিত করতে পারবেন।

একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেন এবং অন্যদিকে ইরাণ, এদের সম্পর্ক কি হবে, তা উনত্রিশে জানুয়ারী উনিশ শ' বিয়াল্লিশে স্বাক্ষরিত এক ত্রিপাক্ষিক মৈত্রী চুক্তিতে (Tripartite Treaty of Alliance) লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেন, ইরাণের ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব, সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখতে স্বীকৃত হয়ে সেই দেশকে সমস্ত পররাজ্য আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে যৌথভাবে প্রতিশ্রুত হলেন। তাছাড়া জার্মাণী ও তার বন্ধুস্থানীয় রাষ্ট্রদের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সমস্ত যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ইরাণ থেকে সমস্ত সৈন্য অপসারিত করে নিতে সম্মত হলেন। তার দিক থেকে ইরাণ মিত্রপক্ষের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং নিজ দেশের সর্বত্র সংযোগব্যবস্থা রক্ষা ও ব্যবহার করার অবাধ অধিকারদান এবং রসদ ও শ্রমিক সংগ্রহের কাজে সর্বরকমে সাহায্য করতে সম্মত হলো।

সোভিয়েত ও বৃটিশ সৈন্যদলের ইরাণ প্রবেশ এবং ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনের আন্তর্জাতিক প্রভাব হলো ব্যাপক ও প্রচণ্ড। ইরাণে হিটলারের

গুপ্তচররা অকেজো হয়ে গেল এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের আরেকটি রণাঙ্গন সুরু হওয়ার সম্ভবনা রুদ্ধ হয়ে গেল। মিত্রপক্ষকে নানা ধরণের সুযোগ সুবিধা দিয়ে ইরাণ ফ্যাশিবিরোধি মোর্চায় যোগদান করলো। সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সাধারণ যুদ্ধে, এই ইঙ্গ-রুশ যৌথ কর্ম প্রচেষ্টাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ, যা কিন্তু নিঃসন্দেহে প্রমাণ করলো যে ফ্যাশিবিরোধি মোর্চা গঠনের সম্ভবনা কতোটা বাস্তব ও কার্যকরী ছিল।

ইরানীয় চুক্তির সর্তাবলী সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আন্তর্জাতিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। ইরানকে সাহায্য করেছে সে নানাভাবে, বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য রপ্তানী করে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদীরা কিন্তু ইরানের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয় এক অসম চুক্তির বোঝা। তার ফলে ডঃ এ. সি. মিলস্‌পাগের নেতৃত্বে বিশেষ মার্কিণ অর্থনৈতিক মিশন অসীম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে থাকে। এই ডাঃ মিলস্‌পাগ ছিলেন আমেরিকার একচেটিয়া কারবারীদের নিতান্ত একজন অনুগত ব্যক্তি। উনিশ শ' তেতাল্লিশে তাঁকে ইরাণের অর্থ নৈতিক বিষয়েব প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করা হয়। তার মাধ্যমে ইরাণের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক ব্যবস্থা এবং সরকারী শাসনযন্ত্রের উপর চরম নিয়ামকের ক্ষমতা লাভ করে, আমেরিকা ইরাণকে প্রায় একটা উপনিবেশে পরিণত করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু জনগণের আন্দোলনের চাপে পড়ে অবশেষে উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে মিলস্‌পাগ মিশন ইরাণ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু তা সত্বেও ইরাণের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ক্ষমতা লাভ করার জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে যথারীতি। বৃটেনকে কোন ঠাসা ও হতবল করে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইরাণের তৈলশিল্পের বেশ বড়ো একটা অংশের উপর নিজের অধিকার কায়েম করে।

॥ ছয় ॥

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের স্বাধীনতামূলক লক্ষ্যের জন্যে, পৃথিবীর বহু স্বাধীনতাকামী দেশ সমবেত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে। মুখ্য যোদ্ধার ভূমিকার জন্যে, সোভিয়েতের নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে হিটলার বিরোধী মোর্চা। তখন দেশে দেশে জনগণ দাবী করতে থাকে যে

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকারের এখন একমাত্র করণীয় হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কার্যকরী মৈত্রীর শরিক হওয়া।

ফলে ইংরেজ ও আমেরিকানরা ঠিক করে যে যৌথ কার্যক্রমের রূপায়ণের জন্যে আগে রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা সুরু করা দরকার। এ বিষয়ে আলোচনা যৌথভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে হলেই ব্যাপারটা সঠিক বা যুক্তিযুক্ত হতো, কিন্তু তা না করে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার আলাদাভাবে আলোচনা করার পক্ষপাতী হলেন।

তদনুযায়ী নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের আর্জেন্টিয়া নৌ-ঘাঁটিতে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে যুদ্ধজাহাজে বসে একটা ইঙ্গ-মার্কিণ বৈঠক সুরু হলো। এই বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল তিনটি—প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক পরিস্থিতি, সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করার কর্মসূচী ও পদ্ধতি নির্ণয় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সামরিক লক্ষ্য নির্ণয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন "জাপানের নোতুন কোন আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে অনুরূপ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করতে" সম্মত হলেন।[১০] আমেরিকার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে, জাপানের সঙ্গে তার নিজের স্বার্থগত দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার চেষ্টা করা।

এই বৈঠকে হ্যারী হপকিন্স তাঁর মস্কো সফর সম্পর্কে যে বিবরণী পেশ করেন তারই ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পনেরোই আগষ্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী সোভিয়েত সরকারের প্রধানের কাছে এক যৌথ বাণী প্রেরণ করলেন। তাতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের পারস্পরিক সর্তাবলী আলোচনা করার জন্যে মস্কোয় এক বৈঠক আহ্বান করার প্রস্তাব করা হলো। সোভিয়েত সরকার সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পর থেকে বিগত প্রায় দু'বছর ধরে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারদ্বয় তাঁদের যুদ্ধের লক্ষ্য ঘোষণার বিষয়ে একেবারে নীরব ছিলেন। এই সব দেশের একচেটিয়া স্বার্থের প্রতিনিধি শাসক শ্রেণী, নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের কথা জনগণের কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তাছাড়া

তাড়াতাড়ি কোন ঘোষণা করার সাধারণ প্রতিক্রিয়ার সামনে তাঁরা দাঁড়াতে রাজী ছিলেন না। কারণ তাতে তাঁদের ইচ্ছামতো কাজ করার ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন স্বাধীনতার উচ্চ মহান আদর্শকে যুদ্ধের লক্ষ্য হিস'বে ঘোষণা করলো, তখন আর তাদের নীরব থাকা চললো না।

যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে ইঙ্গমার্কিণ আলোচনায় এই দুই দেশের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠলো। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চাইলো বৃটেনের অধিকৃত অঞ্চলে আমেরিকার পুঁজির বাধাহীন প্রবেশের অধিকার। তাদের প্রত্যাশা ছিল এই অধিকার পাওয়া গেলে কালক্রমে বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার পথ সুগম হবে। কিন্তু চার্চিল এর বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন, "বৃটিশ ডোমিনিয়নগুলিতে ইংল্যাণ্ডের যে বিশেষ সুবিধাজনক স্বার্থ আছে, তা হারানোর কথায় ইংল্যাণ্ড মুহূর্তের জন্যেও সম্মত হতে পারে না।"[৬১] অবশেষে বিরোধের একটা আপোষ মীমাংসা হলো। মিত্র পক্ষের যুদ্ধের চরম লক্ষ্যের ইঙ্গ-মার্কিণ ঘোষণায় আমেরিকার দীর্ঘদিনের সম্প্রসারণশীল নীতিরই (যথা, "সমুদ্রে অবাধ যাতায়াতের স্বাধীনতা," "সমান সুযোগ" ইত্যাদি) প্রকাশ ঘটলো, তবে অবশ্য অনেকটা রেখে ঢেকে, প্রস্তাবের আকারে, ইংগিতের মাধ্যমে। বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকেও যথারীতি তার "বর্তমান চলতি দায়িত্বের" আড়ালে সংরক্ষণ করা হলো এই কথা বলে যে তাকে মেনে চলা হবে। যার প্রকৃত তাৎপর্য হলো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে বৃটেনের অধিকার অক্ষুন্ন রাখা।

ইঙ্গ-মার্কিণ ঘোষণা অতলান্তিক সনদ নামে, চোদ্দই আগষ্ট উনিশ শ' একচল্লিশে স্বাক্ষরিত হলো। পৃথিবীব্যাপী মুক্তি আন্দোলন ইঙ্গ-মার্কিণ সরকারকে বাধ্য করলো ঘোষনায় গণতান্ত্রিক নানা প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করতে যা রক্ষা করার তেমন কোন ইচ্ছা তাদের ছিল না। বরং তাদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যগুলিকে আড়ালে রাখার জন্যে আবরণ বলা যেতে পারে।

অতলান্তিক সনদে বলা হলো যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কোন রাজ্য দখলের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই এবং এমন কোন ভূখণ্ডের সীমানাগত পরিবর্তন তারা দেখতেও চায় না যার পিছনে সেখানকার অধিবাসীদের অবাধে প্রকাশিত ইচ্ছার সমর্থন নেই। যে কোন দেশের মানুষের নিজেদের স্বাধীনভাবে ইচ্ছা

মতো শাসনব্যবস্থা গঠনকরার অধিকারকে তারা শ্রদ্ধা করবে। এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তারে তারা সকলের জন্যে সমান সুযোগের পক্ষপাতী, ইত্যাদি। কিন্তু যে ভাষায় এই নীতিগুলি ঘোষিত হলো, তার মধ্যে প্রয়োজন মতো তাদের নিজেদের অনুকূলে ব্যবহার করার সুযোগ রয়ে গেল।

যেমন উদাহরণতঃ দেখা যায় অতলান্তিক সনদের তৃতীয় নীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দায়িত্ব স্বাক্ষরকারীরা গ্রহণ করছেন যে সমস্ত দেশের সার্বভৌম অধিকারও আত্মশাসন ক্ষমতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হচ্ছে যে এই নীতি প্রয়োগ করা হবে সেইসব দেশের ক্ষেত্রে যাদের বলপূর্বক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। ক্রমে ক্রমে এই সর্তটির পরিধি আরো বিস্তৃত করার চেষ্টা করা হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন বলপূর্বক কোন রাজ্য দখল করাকেই শুধু ফ্যাশিস্ত আক্রমণের নমুনা স্বরূপ গ্রহণ করলে, উপনিবেশের মানুষদের স্বাধীনতার দাবী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়ে গেল। অন্ততঃ বৈঠক থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, উইনষ্টোন চার্চিল এই ভাবেই সনদের তৃতীয় নীতির ব্যাখ্যা করেছিলেন। তেসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশে তিনি পার্লামেণ্টে বলেন :

"অতলান্তিক বৈঠকে আমাদের সেই সব ইউরোপের জাতি ও রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা, আত্মশাসন ও জাতীয় জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথাই মুখ্যতঃ মনে হয়েছে, যারা বর্তমানে নাৎসী শাসনের অধীনে বাস করছে।"[৬২]

পরে চার্চিল বিষয়টির আরো বিশদ ব্যাখ্যা করেন। "এই বক্তব্য সম্বন্ধে পাছে কোথাও কারো মনে কোন সন্দেহ থাকে, তাই আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই," তিনি বলেন যে, "আমি বৃটিশ সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গে দেওয়ার কাজে পৌরহিত্য করার জন্যে রাজার প্রথম মন্ত্রী নিযুক্ত হইনি।"[৬৩]

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্যে সমস্ত শক্তিকে সংহত করার উদ্দেশে অতলান্তিক সনদের এক বর্ণও রচিত হয়নি।

অতলান্তিক সনদের গণতান্ত্রিক নীতিগুলি লক্ষ্য করে, সোভিয়েত সরকার চব্বিশে সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশে ঘোষণা করেন যে, এর মৌল নীতির সঙ্গে তাঁরা একমত। কিন্তু তাঁরা একথাও মনে করেন যে, এই সনদের বাস্তব প্রয়োগ, "বিশেষ বিশেষ দেশ ও অবস্থার ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য, প্রয়োজন ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করার উপর নির্ভর করবে।" "হিটলারের

বর্বর অনুচরদের অত্যাচারে যে সব জাতি আর্তনাদ করছে, তাদের দ্রুত ও সম্পূর্ণ মুক্তি" সফল করার জন্যে সোভিয়েতের বিবৃতিতে, "হিটলারী পররাজ্য আক্রমণ ও নাৎসী পরাধীনতাকে আজ চূর্ণ বিচূর্ণ করার উপরই," সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হলো।[৬৪]

তখন ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চা গঠনের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উপস্থিত করলো তার নিজের কর্মসূচী। সেই কর্মসূচীর মূল নীতিগুলি হলো: বর্ণবৈষম্যগত চরম ভেদপন্থী নীতি বিদূরিত করতে হবে ; জাতি-সমূহের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব বজায় রাখতে হবে ; পরাধীন জাতি সমূহের মুক্তি ও তাদের সার্বভৌম অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; প্রতিটি দেশকে দিতে হবে তার নিজের ইচ্ছামতো শাসনব্যবস্থা গঠন করার পূর্ণ অধিকার ; পরাভূত জাতিগুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করতে হবে ; করতে হবে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা আর সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করতে হবে হিটলার-তন্ত্রকে।

এই কর্মসূচী যে খ্যাতি ও শক্তি অর্জন করে তার প্রধান কারণ ছিল এর উচ্চ নৈতিকমান ও হিটলার বিরোধী মোর্চার স্তম্ভস্বরূপ বহুদূরে সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্তি। সমগ্র পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষের মৌল আশা আকাঙ্খা ও স্বার্থ এর মাধ্যমে রূপায়িত হয়ে উঠলো। তাই সারা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী দেশ সমর্থন করলো তাকে।

উনত্রিশে সেপ্টেম্বর থেকে পয়লা অক্টোবর, উনিশ শ' একচল্লিশে মস্কোয় সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো, তাতে ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চা গঠনে সাহায্য হলো যথেষ্ট। সেই সভায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করলেন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী অ্যাভ্রেল হ্যারীম্যান (Averell Hariman)। আর বৃটেনের প্রতিনিধি হিসাবে এলেন বিখ্যাত প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদ পত্র জগতের রাজা লর্ড বিভারব্রুক (Beaverbrook)।

মস্কো বৈঠকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সাইবেরিয়ায় বিমান ও অন্যান্য সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের জন্যে প্রস্তাব করলো।[৬৫] প্রতিনিধিরা সোভিয়েতের বাল্টিক নৌ-বাহিনীর সম্ভাব্য ভবিষ্যত নিয়ে অহেতুক ব্যগ্রতা দেখালেন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে সেই বাহিনীর শক্তি কমিয়ে দেওয়ার জন্যে বল্লেন।[৬৬] তাছাড়া পরিশেষে হলেও মোটেই যা কম গুরুত্বপূর্ণ নয় সেই

"সাহায্যদানের" বিষয়ে, ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধিরা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে "বিশেষ সর্তাবলীর" প্রশ্ন তুললেন।

বলা বাহুল্য এই সমস্ত ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চা গঠনের বিরোধী বিষয়গুলি, সোভিয়েতের দৃঢ় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। সাহায্যদানের বিষয়টিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার একটি সূত্র হিসেবে বিচার করে এসেছে যা তুই দেশের সাধারণ সম্পর্কের নিয়মের অধীনে পরিচালিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সোভিয়েতের বক্তব্যই গৃহীত হলো।

কিন্তু মূল বাস্তব প্রশ্নগুলির সমাধান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। বৃটিশ প্রতিনিধিদলকে চার্চিল যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফলে তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সামান্য পরিমাণে রপ্তানী করার সর্তেই কেবল সম্মত হতে পারতেন এবং সেই রপ্তানীও করা হবে উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শেষের দিকে। চার্চিলের নির্দেশে বলা হয়েছিল: "রাশিয়াকে সাহায্যদানের পরিকল্পনা রচনায় সাহায্য করাই শুধু আপনাদের কাজ না. সঙ্গে সঙ্গে দেখতে হবে যে সেই সাহায্য করতে গিয়ে আমরা যেন তুর্বল হয়ে না পড়ি। এমন কি যদি আপনারা রাশিয়ার পরিবেশে অভিভূত বা প্রভাবিত হয়ে পড়েন, তাহলে জেনে রাখবেন এই ব্যাপারে এখানে আমি অনমনীয় মনোভাব বজায় রাখব।"[৬৭]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মোট সম্পদের অনুপাতে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সামান্য সাহায্য চেয়েছিল, তার পরিমাণ আরো কমিয়ে দেওয়া হলো। যেমন উদাহরণতঃ বলা যায় যে উনিশ শ' একচল্লিশের অক্টোবরের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তিরিশ হাজার টন অ্যালুমিনিয়ামের রপ্তানী লাভের কথা বলে। কিন্তু বলা হলো যে "জাহাজের ব্যবস্থা করতে পারলেই প্রথমে পাঠানো হবে পাঁচ হাজার টন এবং তারপর থেকে মাসে তু'হাজার টন করে।" এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময়ও বৃটিশ ও মার্কিণ মুখপাত্রগণ আবার চেষ্টা করলেন এই রপ্তানী এমনভাবে সর্ত সাপেক্ষ করতে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের ব্যাপকভাবে গুপ্ত সংবাদ দিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু যেহেতু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন চেয়েছিল যে হিটলারের আক্রমণ প্রতিরোধ করার মূল দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়নই বহন করুক, তাই আগামী বছরের জন্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কর্মসূচী গ্রহণ করতে তারা

অর্থহীন আপত্তিগুলি বাদ দিয়ে বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। কিভাবে সেই সাহায্য আসবে, পাঠানো হবে সেই প্রশ্নেরও মীমাংসা হয়ে গেল। এবং বৈঠক শেষ হওয়ার পূর্বেই, পয়লা অক্টোবর উনিশ শ' একচল্লিশে এই বিষয়ের সমস্ত দলিলপত্র স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

এক মাস পরে, দোসরা নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানালেন যে তাঁরা ঋণ-সাহায্য (Lend Lease Act) আইনের প্রক্রিয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত করেছেন এবং তদনুযায়ী প্রারম্ভিক ঋণ হিসাবে একশ' কোটি ডলার মঞ্জুর করেছেন।

নিজ দেশে গভীর সামরিক ও অর্থনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েও সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতি মতো মার্কিণ যুক্তরষ্ট্রে ও বৃটেনে নানাবিধ কাঁচামাল রপ্তানী করে গেল। সেই সব দেশে যুদ্ধোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তা যে সাহায্য করেছে তা বলাই বাহুল্য। অন্যদিকে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার তাঁদের তরফ থেকে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রপ্তানী করতে, মালপত্র সরবরাহ করতে কিন্তু ব্যর্থ হলেন। মার্কিণ দেশের এক সরকারী বিবরণীতে বলা হয়েছে যে চুক্তির প্রথম পর্বের মধ্যে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোট সরবরাহের চার-পঞ্চমাংশের বেশি পাঠানো যায় নি।[১৮] তাঁদের দেশ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে উনিশ শ' একচল্লিশ-বিয়াল্লিশে যে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ পাঠানো হয়েছিল, তাদের সরবরাহে যে "হতাশাব্যঞ্জক শ্লথগতি" দেখা গিয়েছিল সেই স্বীকারোক্তি বহু মার্কিণ ও বৃটিশ্ পদস্থ সরকারী কর্মচারীর রচনার মধ্যে রয়েছে।[১৯]

মার্কিণ ইতিহাসবিদ্ ল্যাঙ্গর ও গ্লিসন লিখেছেন যে, "সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রেরিত মার্কিণ সাহায্যের পরিমাণ অনিবার্যভাবেই অনুল্লেখযোগ্য হয়ে রইলো। ......পয়লা অক্টোবর পর্যন্ত সমগ্র সময়ে তার মোট পরিমাণ দু'কোটি নব্বই লক্ষ ডলার হবে বলে অনুমিত হয়েছিল।" এই হারে লেখকদ্বয় মন্তব্য করেছেন যে, "সোভিয়েতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অথবা পূর্ব রণাঙ্গনে বিজয়লাভ করার জন্যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের পরিমাণকে নিতান্ত সামান্য ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।[২০]

কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ সরবরাহের পরিমাণ যতোই সামান্য হোক না কেন, যখন

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমগ্র শক্তিকে সংহত করে জার্মাণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত, তখন তার কাছে এর প্রয়োজনটাও খুব কম ছিল না।

মোটের উপর মস্কো বৈঠকে তার কার্যক্রমের অন্তর্গত সমস্ত বিষয়েরই একটা মোটামুটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যা আরেকবার প্রমাণ করে যে ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চায় যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলাটা বাস্তবে অসম্ভব নয়। হিটলার তাঁর প্রতিপক্ষকে একে একে শেষ করার যে পরিকল্পনা করেছিলেন, এই বৈঠক তার মূল ভিত্তিকেই বাণচাল করে দিল।

মস্কো সম্মেলনের অল্পকাল পরে সোভিয়েত সরকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। আটই নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে তাঁরা বৃটিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন পারস্পরিক সম্পর্কের সূত্রকে ব্যাখ্যা করে আরো স্পষ্ট করার চেষ্টা হয় এবং যাতে যুদ্ধের চরম লক্ষ্য ও যুদ্ধোত্তর কালে শান্তি স্থাপনের সাংগঠনিক দিক সম্পর্কে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় আসা যায়। সেই প্রস্তাবে ইউরোপে পারস্পরিক সামরিক সাহায্যদানের বিষয়েও একটা চুক্তি সম্পাদনের কথা বলা হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সরকার এটাও দেখিয়ে দেন যে জার্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্র ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও রুমেনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করার কারণ স্বরূপ বৃটিশ সরকার যে মনোভাব ও যুক্তির অবতারণা করছেন, তা নিতান্ত ভ্রান্ত।

যে সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে মিত্রপক্ষের মধ্যে সম্পর্ককে সুসংহত ও উন্নত করে চলেছে, ঠিক সেই সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনের শাসকগোষ্ঠী তাদের যুদ্ধপূর্বকালের চিরাচরিত দ্বিমুখী নীতি বর্জন করতে গররাজী। হিটলারের সঙ্গে নোতুন ভাবে কোন বোঝাপড়া করা যায় কিনা সে বিষয়ে তারা তখন গোপন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তাই দেখা যায় লর্ড বিভারব্রুক যখন মস্কোর পথে রওনা হয়েছেন সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে, তখন তাঁর ছেলে আইট্কেন বিভারব্রুক, একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারী যিনি পরবর্তীকালে পার্লামেন্টের সদস্যপদ লাভ করেছিলেন, বৃটিশ সরকারের পক্ষ থেকে হিটলারের অনুচরের সঙ্গে লিসবনে বসে গোপনে সলাপরামর্শ চালাচ্ছেন। সেটা হলো তেরই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশের কথা। আর হিটলারের সেই অনুচর হলো হাঙ্গেরীর এক ফ্যাশিস্ত নেতা, গুস্তাভ ফন্ কোভার (Gustav von Kover) যিনি

জার্মাণ সরকারের সম্মতি সাপেক্ষেই সেই আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন। আইটকেন বিভারব্রুক ও কোভারের আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল, বৃটেন ও হিটলার জার্মাণীর মধ্যে স্বতন্ত্র কোন শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করা যায় কিনা, তার পথ অন্বেষণ করা।'[১]

কিন্তু বৃটেন ও জার্মাণীর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব তখনো বজায় ছিল, তার অবসান ঘটেনি। ফলে ঘটনার অনিবার্য পরিণতিতে মিত্রপক্ষের মধ্যে, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে, পারস্পরিক সম্পর্ক আরো উন্নত হয়ে উঠতে লাগলো। পৃথিবীর রাজনৈতিক ও সামরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, হিটলার-বিরোধী মৈত্রী বিভিন্ন জাতি, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে ধীরে ধীরে বাস্তব হয়ে উঠতে লাগলো।

॥ সাত ॥

এই নব উন্মেষিত ফ্যাশিবিরোধী মোর্চার বিরোধিতা করতে থাকে হিটলারের নেতৃত্বে এক পররাজ্য আক্রমণকারী রাষ্ট্রজোট। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের উর্বর মাটিতে গড়ে ওঠে এই রাষ্ট্রজোট, যার পররাজ্যলোলুপ সদস্যদের মধ্যে মৈত্রী গঠিত হয় লুঠতরাজ ও পররাজ্য আক্রমণের জন্যে। এই আক্রমণাত্মক জোটের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণীত হতো জার্মাণী তার ইউরোপীয় মিত্রশক্তির উপর যে পরিমাণ চাপ দিতে পারতো তার প্রভাবে।

বিশ্বাসঘাতকতা করে জার্মাণী যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তারই মধ্যে সে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ অধিকার ও পদানত করে ফেলেছে। অধিকৃত দেশগুলিতে জার্মাণ সৈন্যদল শক্ত ঘাঁটি গেড়ে বসেছে গেষ্টাপো আর এস, এস, বাহিনীর লোকজন লৌহ কঠোর দৃঢ়তায় শাসন করছে সেখানে। হিটলারের মিত্ররা স্বাধীনতা ভোগ করছে বটে, তবে তা নামমাত্র স্বাধীনতা। যে কোন বিষয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করে জার্মাণ কর্তৃপক্ষের উপর।

মিত্রপক্ষের দেশগুলিতে জার্মাণী যে সামরিক সাহায্য পেতে থাকে সোভিয়েত-জার্মাণ যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই তা দুই পক্ষের শক্তির ভারসাম্যে ব্যাহত করতে থাকে।

মিত্রদের যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য- জার্মাণী যে কোন প্রতিক্রিয়া

দিয়ে তাদের প্রলুব্ধ করতে কখনো কার্পণ্য করেনি। হিটলারের সদর কার্যালয়ে তাই ষোলই জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশে, সোভিয়েত ভূমি অধিকার করে কেমন ভাবে তা বণ্টন করা হবে তা নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। এই সম্মেলনে স্থির হলো যে ক্রিমিয়া ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল, ইউক্রেন, বাল্টিক রাষ্ট্রগুলি, বিয়ালিস্তক বনভূমি এবং কোলা উপদ্বীপ জার্মাণী নিজের দখলে রাখবে। তা ছাড়া ভল্গার উভয় তীরে গঠিত হবে এক জার্মাণ উপনিবেশ এবং বাকু সমেত সমগ্র ট্রান্সককেশিয়ায় স্থাপিত হবে একটা জার্মাণ সামরিক ঘাঁটি। নিস্তার নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সোভিয়েত ভূমি সমেত বেসারেবিয়া ও ওডেসা দেওয়া হবে রুমেনিয়াকে। তার প্রতিশ্রুতি রইলো। লেনিনগ্রাদ ও তৎ-সন্নিহিত অঞ্চলে এবং পূর্ব কারেলিয়া যাবে ফিনল্যাণ্ডের ভাগে আর হাঙ্গেরী পাবে গ্যালিশিয়া অঞ্চল ও কার্পেথিয়ান পর্বতের সানুদেশ।

হিটলারের তাঁবেদার রাষ্ট্রজোটের যৌথ যুদ্ধ পরিচালনার মূল প্রেরণা ছিল তাদের সকলেরই লুঠেরা মনোভাব। কিন্তু ঐক্যের এই সুর তাদের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বকে দূরীভূত করতে পারেনি। তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি সর্বদাই অনুভব করতো তাদের মর্যাদাহীনতার কথা। তাদের গুরুত্ব হিটলারের কাছে নিতান্ত কৃপাপ্রার্থী হিসেবে। ইটালীতে এ নিয়ে দিন দিন অসন্তোষ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বহু বছর ইটালীর সাম্রাজ্যবাদীরা সমগ্র বিশ্বশাসনের যে স্বপ্ন দেখে আসছিল, তাদের কপালে জুটলো মুসোলিনীর প্রতিশ্রুত "ইতালীয় সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক ভূমিকার" পরিবর্তে, হিটলারের দয়াদাক্ষিণ্যের ভরসা, যা কোন অনুগত স্তাবকের কপালে জুটতে পারে। জার্মাণীতে রপ্তনী করার জন্যে, কাঁচামাল ও জ্বালানীর অভাবে ইটালীর কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে জার্মাণ শিল্পপতিরা একেবারে জলের দামে ইটালীর কল কারখানাগুলি কিনে নিচ্ছে এবং তাদের নিজেদের দেশে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সৈন্য সরবরাহের ব্যাপারে জার্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তাই সুরু হয়ে গেল মনমালিন্য। কেউ আর নিজের প্রতিশ্রুতি বজায় রাখতে রাজী নয়। সবাই সৈন্য যোগানের সংখ্যা কম করতে চাইছে। উদ্দেশ্য পরে যুদ্ধের লাভ নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারার সময় যাতে সৈন্যবল নিয়ে হাজির হয়ে জবরদস্তি কিছু আদায় করা যায়। আঞ্চলিক স্বার্থ নিয়ে বাদ বিসম্বাদ ধীরে ধীরে তখন তিক্ত

সংগ্রামের পর্যায়ে চলে যেতে লাগলো। তারই একটা উদাহরণ হলো রুমেনিয়া হাঙ্গেরীর সংকট।

কিন্তু এর আগেও, যখন জার্মাণী তার দুর্বারগতিতে সবাইকে টেনে নিয়ে চলেছে, তখনও তার নিতান্ত বশম্বদ মিত্রদেশের অত্যুৎসাহের একমাত্র কারণ ছিল যুদ্ধোত্তর কালে সম্ভাব্য লাভের প্রত্যাশা।

উনিশ শ' উনচল্লিশ-চল্লিশের সোভিয়েত-ফিন যুদ্ধে যে ইঙ্গ-মার্কিণ সরকার ফিনল্যাণ্ডকে সমর্থন করেছিলেন, এতোদিন পরেও তাঁরা ফ্যাশিবাদী জার্মাণীর মিত্রপক্ষ ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে কম আগ্রহ দেখাননি। তাই দেখা যায় ফিনল্যাণ্ড, সোভিয়েত ইউনিয়নের কারেলিয়া অঞ্চল দখল করার পর, মার্কিণ পররাষ্ট্রসচিব হাল ফিনমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তারবার্তা পাঠাচ্ছেন, তেসরা অক্টোবর তারিখে।

জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যৌথ কার্যক্রমের ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পরে, সোভিয়েত সরকার দাবী করলেন যে হিটলারের যে সব মিত্রদেশ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণে শরিক হয়েছে, বৃটেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করুক। চার্চিল যেহেতু ফিন প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন জানিয়েছিলেন, উস্কানি দিয়েছিলেন, তাই তিনি এই দাবী কার্যকরী করতে বাধা দিতে লাগলেন। কিন্তু শীঘ্রই এটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে এরকম নীতি বজায় রাখা যাবে না। ফলে ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী ও রুমেনিয়ার বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হলো।

যুদ্ধ ঘোষণা করার পূর্বে ফিনল্যাণ্ডস্থিত দূতাবাসের মন্ত্রী শোয়েনফেল্ডের মারফতে চার্চিল, ফিন সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ম্যানারহাইমের কাছে একটি ব্যক্তিগত বাণী প্রেরণ করেন, উনত্রিশে নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে। চার্চিল তাতে লিখেছিলেন যে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মিত্রপক্ষের রাশিয়ার প্রতি আনুগত্যবশতঃ আগামী কয়েকদিনের মধ্যে বৃটেন যে ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হবে, তার জন্যে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত। চার্চিল তাতে আরো বলেন যে পরিণামে যখন অপরাধী ও পরাজিত নাৎসীদের সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের অপরাধেরও বিচার করা হবে, তখন এদেশে ফিনল্যাণ্ডের অনেক দরদী বন্ধু মনে কষ্ট পাবেন। তিনি বলেন যে বিগত যুদ্ধের স্মৃতি এবং এই ব্যাপারে তার সাদৃশ্যই তাঁকে এই একেবারে ব্যক্তিগত ও গোপন বার্তা পাঠাতে

প্ররোচিত করেছে।[৭৩] ম্যানারহাইম প্রত্যুত্তরে জানান যে তিনি বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রীর এই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের অভিব্যক্তিতে খুশি হয়েছেন।[৭৪]

বৃটেন আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করলো ছয়ই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে।

হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পরে, জাপান সরকার এক সরকারী বিবৃতির মারফতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে জানান যে, তাঁরা সোভিয়েত জাপান চুক্তি অনুযায়ী এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু সেই একই দিনে তাঁরা জার্মাণীকে জানালেন যে ফ্যাশিস্ত অক্ষ দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যা করণীয় সবই করে যাবেন এবং সোভিয়েতের কাছে নিরপেক্ষতার পুনরুল্লেখ শুধু তাকে বিভ্রান্ত করার জন্যেই করা হয়েছে।

দোসরা জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে জাপানী কোকুমিনে (Kokumin) লেখা হলো যে জার্মাণী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ নিছক যে কোন দুটি দেশের মধ্যে যুদ্ধ নয়। পূর্ব এশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে তার ভূমিকা নিয়ামকের। কারণ, এটা হলো অক্ষশক্তি ও গণতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধ।

জাপানের আচরণ জার্মাণীকে খুশি করতে পারলো না। কারণ ততোদিনে সোভিয়েতের প্রতিরোধে তার এই ধারণা হয়েছে যে জাপানের এই সময়ে একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করা উচিত। পয়লা জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে রিবেনট্রপ টোকিওতে এক তারবার্তা পাঠিয়ে জাপানকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, বার্লিন চুক্তি অনুযায়ী এখনই সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করতে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই আক্রমণ পরিকল্পনা, যার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছিল কান্তোকুয়েন (Kantokuen) বা কোয়ানতুং সৈন্যের বিশেষ কার্যক্রম, জাপানের সামরিক কর্তৃপক্ষ, জার্মাণ সেনানায়ক পরিষদের সাহায্যে অনেক আগেই প্রস্তুত করেছিল।

দোসরা জুলাই, এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সম্রাট হিরোহিতোর সভাপতিত্বে, রিবেনট্রপের তারবার্তা নিয়ে আলোচনা হলো। সেখানে স্থির করা হলো যে বাস্তবিকই জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে, কিন্তু তা যতোদিন না জার্মাণী সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গণে কোন চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে দূরপ্রাচ্যে তার সৈন্য সমাবেশ ভেঙে দিয়ে, সেনাদলকে নানা সীমান্তে

পুনর্বণ্টন করতে বাধ্য করতে না পারছে, ততোদিন সুরু হবে না। সেই সিদ্ধান্তের মূল বয়ানে বলা হয়েছিল :

"জার্মাণ-সোভিয়েত যুদ্ধ সম্পর্কে, জাপান সাম্রাজ্য আপাততঃ কিছুকাল কোথাও হস্তক্ষেপ করবেন না, যদিও অক্ষশক্তির মৌল উদ্দেশ্যকে রক্ষা করে চলতে হবে। যাই হোক, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাতে হবে গোপনে।...জার্মাণ-সোভিয়েত যুদ্ধের গতি যদি সাম্রাজ্যের অনুকূলে যায়, তাহলে উত্তরাঞ্চলে সসৈন্যে আঘাত হানতে হবে।"[৭৫]

জাপান জার্মাণীর সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংঘাতের এটা হলো আরেকটা নোতুন প্রমাণ। জার্মাণীর বিপরীত মনোভাব নিয়ে, জাপান চেয়েছিল যুদ্ধ চালানোর সমস্ত ঝুঁকি, ক্ষয়ক্ষতি তার মিত্রপক্ষের মাথার উপরেই থাক্, যাতে তার নিজস্ব সামরিক শক্তিকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখা যায়। একদল ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন যে, "এশিয়ায় জাপান বিজয় গৌরব লাভ করুক এটা জার্মাণীর আসল ইচ্ছা ছিল না এবং জাপানের আশংকা ছিল এই যে জার্মাণী যদি ইউরোপে তার প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে তাহলে দূরপ্রাচ্যেও কালক্রমে তাকে বিস্তৃত করার জন্যে সচেষ্ট হতে পারে।"[৭৬]

জাপান শুধ্ মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার সোভিয়েত সীমান্ত বরাবর তার সৈন্য সমাবেশের সংখ্যাবৃদ্ধি করে গেল। সেটা হলো উনিশ শ' একচল্লিশের গ্রীষ্ম-কালের ঘটনা। ইতিমধ্যে সম্রাট হিরোহিতোর আদেশে জীবাণুযুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ব্যাপক লোকনাশের উদ্দেশে গোপন সংগঠন সব জমায়েত হলো মাঞ্চুরিয়ায়।

জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের পররাজ্য আক্রমণ ও অধিকারের উচ্চাভিলাষের কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। নয়ই জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশে জাপানী দৈনিক পত্রিকা নিপ্পনে লেখা হলো—

"জাপানী প্রতিরক্ষাব্যবস্থার সম্মুখ সীমা হওয়া উচিত উত্তরে কারা সমুদ্র থেকে উরাল পর্বত বরাবর কাস্পিয়ান সাগরের তীর ধরে, ককেশির ও কুর্দিস্তান পর্বতের সীমানা দিয়ে পারস্যোপসাগরীয়, সৌদি আরব পার হয়ে দক্ষিণে এডেন পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার যৌথ সমৃদ্ধিময় অঞ্চলভুক্ত দেশগুলির জন্যে এই প্রতিরক্ষা সীমা নিতান্ত আবশ্যিক।"

জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে যোগদান করলো না।

কিন্তু হিটলার জার্মাণীকে যথাসম্ভব সাহায্য ও সুবিধা দিতে কুণ্ঠা করলো না মোটেই। পনেরোই মে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে প্রেরিত, রিবেনট্রপের এক তারবার্তায় তারই স্বীকৃতি দেখা যায়। তাতে বলা হলো যে সোভিয়েত মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে জাপানী সৈন্য সমাবেশ প্রচুর সাহায্য করেছে তাঁদের, কারণ "তারই জন্যে পূর্ব সাইবেরিয়ায় রুশ-জাপান সংঘর্ষের আশংকা এড়াতে রাশিয়াকে সেখানে সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয়েছে।"[৭৭] সোভিয়েত দেশে অবস্থিত জাপানের সামরিক ও কূটনৈতিক সংস্থার সাহায্যে সংগৃহীত সে দেশের অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থার গোপন খবরাখবর, জাপান সরকার নিয়মিতভাবে জার্মাণীকে সরবরাহ করে গেলেন। পনেরোই জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশের এক তারবার্তায় দেখা যায়, রিবেনট্রপ টোকিওস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্র-দূতকে "মস্কোস্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূতের প্রেরিত বিবরণীর পূর্ণাঙ্গ বয়ানের তারবার্তা পাঠানোর জন্যে, জাপানের পররাষ্ট্র দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাতে নির্দেশ দিয়েছেন।...এইভাবে যদি নিয়মিত আমরা রাশিয়ার খবরাখবর পাই, তাহলে প্রচুর সুবিধা হবে।"[৭৮]

এরই সঙ্গে জাপান সোভিয়েতের দূর প্রাচ্যস্থিত বন্দরগুলি অবরোধ করার চেষ্টা করলো এবং সোভিয়েত বাণিজ্যবহরের উপর জলদস্যুতা সুরু করলো। আরো যা করলো জাপান তা হচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে এক দাবী যেন ভ্লাদিভোস্তক দিয়ে সোভিয়েত মালপত্র লেনদেন না করা হয়। প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত সরকার জানালেন যে, "সোভিয়েতের দূরপ্রাচ্যস্থিত বন্দরগুলির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে স্বাভাবিক বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু আছে, তাকে কোন মতে ব্যাহত করার কোন চেষ্টাকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন শত্রুতামূলক কাজ ছাড়া আর কিছু মনে করবে না।"[৭৯]

ফ্যাশিস্ত জার্মাণী মর্মান্তিকভাবে সচেতন ছিল যে, তার অনেক সাধের অক্ষ-রাষ্ট্রজোটের বনিয়াদ তেমন শক্ত থাকছে না। তাই তার চেষ্টা হলো একে জোরদার করা। সেই জন্যে উনিশ শ' ছত্রিশে স্বাক্ষরিত পাঁচ বছরের মেয়াদী কমিন্টার্ণ বিরোধী চুক্তি পুনর্ণবীকরণের কলাও ব্যবস্থা করলো জার্মাণী। তার দিন স্থির হলো পঁচিশে নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশ সাল। তার সামরিক মৈত্রীর মূল লক্ষ্য যে কমিউনিস্ট বিরোধিতা সেকথা পুনরায় ঘোষণা করে, জার্মাণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব আরেকবার চেষ্টা করলেন, নির্মীয়মান ফ্যাশি-

বিরোধী মোর্চার বনিয়াদ ধ্বসিয়ে দিয়ে, ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রজোটকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণ ত্বরান্বিত করতে।

তার সমগ্র তাঁবেদার রাষ্ট্রগোষ্ঠী-ইটালী, হাঙ্গেরী, স্পেন, ফিনল্যাণ্ড, ক্রোয়াশিয়া, ডেনমার্ক, রুমেনিয়া, শ্লোভাকিয়া ও বুলগেরিয়াকে নিয়ে জার্মানী এবং জাপান ও তার মাঞ্চুকুও এবং জাপ অধিকৃত চীনভূখণ্ডের ওয়াং চিং ওয়েইয়ের ক্রীড়নক সরকারদের নিয়ে কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো। স্পষ্টতঃই দেখা গেল যে, বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে গঠিত হয়েছে একটা পররাজ্যলোলুপ আক্রমণকারী রাষ্ট্রজোট।

কিন্তু নোতুন অথবা পুরানো কোন চুক্তির সাহায্যেই আর ইটালী জাপান ও জার্মানীর সামরিক মৈত্রীকে অক্ষুণ্ন রাখা যাচ্ছিল না। মৈত্রীর সৌধে জাপ-জার্মান ও জার্মান-ইটালী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাত ফাটল ধরিয়ে তাকে ভেঙ্গে দিচ্ছিল। তাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত ধূমায়িত হয়ে উঠলো যুদ্ধ পরিচালনার বোঝা ও যুদ্ধের লাভের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে।

আসলে এই রাষ্ট্রজোটের মৌল উদ্দেশ্যের মধ্যেই তার অস্থায়িত্বের বীজ লুকানো ছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অন্যায় ও লুঠেরার মনোভাব নিয়ে কোন রাষ্ট্রজোট স্থায়ী হতে পারে না।

তার উপরে ছিল হিটলারী মৈত্রীর উপর মানুষের অপরিসীম ঘৃণা। আক্রমণকারীরা কোণঠাসা হয়ে পড়তে লাগলো প্রতিদিন।

অক্ষশক্তির রাজনৈতিক ও নৈতিক সম্বল ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যেতে লাগলো। তার শক্তি কমতে লাগলো ক্রমেই।

অক্ষশক্তিকে সঞ্জীবিত করার নাৎসী বাসনা, মস্কো দখলের সংগ্রামে সোভিয়েতের বিজয় সাফল্যে পর্যুদস্ত হয়ে গেল সম্পূর্ণভাবে।

১। গ্রীগোরার গেফান্কো: Prelude to the Russian campaign. ফ্রেডারিক মুলার, লণ্ডন ১৯৫৫, পৃঃ ২১১

২। চার্লাস বিয়ার্ড: American Foreign Policy in the Making 1932-40 নিউ হ্যাভেন, ১৯৪৬

৩। আই. এম. টি. দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৫৫

৪. অ্যাভ্রো ম্যানহাটান: The catholic church Against the 20th Century. লণ্ডন ১৯৪৭

৫. পেণ্ডার কেনেথ রচিত একটি ফরাসী গ্রন্থ, প্যারী ১৯৪৮
৬. আলবার্ট নর্ডেন রচিত একটি জার্মান গ্রন্থ, বার্লিন ১৯৪৭ পৃঃ ১৯৩
৭. ল্যাঙ্গর রচিত একটি ফরাসী গ্রন্থ, প্যারী ১৯৪৮, পৃঃ ১৭২
৮. প্রাভদা ডিসেম্বর ৭, ১৯৫৬
৯. ঐ
১০. লর্ড রাসেল অব্ লিভারপুল : The Scourge of the Swastika, লণ্ডন ১৯৫৪, পৃঃ ১৩০
১১. চার্চিল : পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৫০
১২. ঐ, পৃঃ ৩৫৫
১৩, রবার্ট ই. শেরউড : Roosevelt and Hopkins, An Intimate History. নিউ ইয়র্ক ১৯৪৮, হার্পার ব্রাদার্স, পৃঃ ৩০৩-৪
১৪. এইচ. এ. জ্যাকোবসেন রচিত একটি জার্মান গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭১-৭২
১৫. এফ. জি, জোন্স, হিউ বর্টন ও্যুর্বি, আর. পিয়ার্স : Survey of International. Affairs 1939-45, The Far East 1942-46 লণ্ডন, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৫৫, পৃঃ ১০৩
১৬, Soviet Foreign Policy, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৭৫
১৭, ঐ পৃঃ ৭৬
১৮. উইলিয়াম জেড ফষ্টার : Outline of Political History of the Americas, ইণ্টার ন্যাশন্যাল পাবলিশার্স. নিউ ইয়র্ক ১৯৫১ পৃঃ ৪৩৯
১৯. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, পৃঃ ১১২
২০, বি. এইচ. লিডেল হার্ট : The German Generals Talk, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮ পৃঃ ২২০
২১, টিপ্পলস্কার্চের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১০০
২২. ফুলোরের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১০০
২৩, একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, ১৯৬১ পৃঃ ১৯
২৪. রুশ গ্রন্থ, পৃঃ ১৪২
২৫. ঐ, পৃঃ ৪১
২৬. ঐ, পৃঃ ৪৩
২৭. ঐ পৃঃ ৪৬
২৮. জর্জ ডবলিউ ফেউথ্টারের একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ বন ১৯৫৪, পৃঃ ১৯২
২৯. নিউ টাইমস, মস্কো ১৮ সংখ্যা, ১৯৪৭
৩০. বলশেভিক, মস্কো ১৫ সংখ্যা, ১৯৪১

৩১. মরিস তোরের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ পৃঃ ১৪৮
৩২. অটো ভিন্‌ষারের জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থ. পৃঃ ১৯২
৩৩. ঐ. পৃঃ ১৮৬
৩৪. ডেইলী ওয়ার্কার, নিউ ইয়র্ক', জুন ২৩শে ১৯৪১
৩৫. ওয়াল্টার গোরলিটেজ্‌র একটি জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৬৮-৬৯
৩৬. ল্যাঙ্গর ও গ্লিসনের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৩১
৩৭, The war Reports of Marshall, Arnold. King, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৭, পৃঃ ১৪৯
৩৮. লেনিন : Selected works, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৫৯৬
৩৯. চার্চিল : পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৩১-৩২
৪০. ঐ. পৃঃ ৩৩৩
৪১, নিউ ইয়র্ক টাইমস্' ২৪শে জুন, ১৯৪১
৪২. Wartime Correspondence Between President Roosevelt and Pope Pius XII, নিউইয়র্ক ১৯৪৭, পৃঃ ৫৭
৪৩. Wartime Correspondence ঐ, পৃঃ ৬১-৬২
৪৪. Soviet Foreign Policy, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৭
৪৫. Correspondence, প্রথম খণ্ড, মস্কো পৃঃ ১৩
৪৬. চার্চিল : পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৯-৪০
৪৭. Correspondence, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১১
৪৮. চার্চিল : পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৫
৪৯. ঐ পৃঃ ৫৪৩
৫০. শেরউড : Roosevelt and Hopkins, পৃঃ ৩২২
৫১. এইচ, ওয়াই. মর্টন : Atlantic Meeting, মেথুয়েন কোং, লণ্ডন ১৯৪৩ পৃঃ ১১
৫২. শেরউডের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪১
৫৩. Soviet Foreign Policy, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮৪
৫৪. আর. এইচ. ব্রুস লকহার্ট : Comes the Reckoning, দ্বিতীয় খণ্ড, লণ্ডন পুটনাম ১৯৪৭, পৃঃ ১১৯-২০
৫৫, এডোয়ার্ড বেনেস : চেক্‌ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্রাগ ১৯৪৮
৫৬. Soviet Foreign Policy. প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৮১
৫৭, ঐ, পৃঃ ৮৯
৫৮, ঐ, ঐ,
৫৯. ঐ, পৃঃ ৯২

৬০. Peace and War, U. S, Foreign Policy 1939-41, পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত, ওয়াশিংটন ১৯৪৩, পৃঃ ১২৯
৬১. ইলিয়ট রুজভেল্ট : As He Saw It. নিউইয়র্ক ১৯৪৬, পৃঃ ৩৬
৬২. টাইমস্ পত্রিকা, ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪১
৬৩. ঐ ১১ই নভেম্বর, ১৯৪২
৬৪. Soviet Foreign Policy, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৯৮
৬৫. শেরউডের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ. পৃঃ ৩৮৮
৬৬. বারোই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশ মস্কোস্থিত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত, সোভিয়েত সরকার সমীপে নিম্নলিখিত স্মারক লিপি পেশ করেন : "If the Soviet Government were compelled to destroy its naval vessels at Leningrad in order to prevent their falling into the enemy hands, His Majesty's Government would recognise after the war claimrs of the Soviet Government to a cartain compensation from His Majesty's Government for the restoration of the vessels destroyed,"— Correspondence প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৪
৬৭. চার্চিল : পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪১০-১১
৬৮, এডোয়ার্ড আর. স্টেটিনিয়াস, Lend-Lease, Weapon for Victory, নিউইয়র্ক ম্যাকমিলান কোং ১৯৫৪, পৃঃ ২০৭-৮
৬৯. জন. আর. ডীন : The Strange Alliance, The Story of Our Efforts at Wartime Cooperation with Russia নিউইয়র্ক ১৯৫০, পৃ: ৮৯
৭০, ল্যাঙ্গর ও গ্লিসন : The Undeclared War পৃঃ ৫৬০
৭১. Falsifiers of History, মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ১০০
৭২. জন, এইচ, ভুয়োরিনেন : Finland and world War II. 1939-44 রোনাল্ড প্রেস, নিউইয়র্ক ১৯৪৮, পৃঃ ১৩৬
৭৩. Hilsingin Sanomat. ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৫
৭৪. ঐ
৭৫, রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ ১৯৫১. পৃঃ ২৭৪
৭৬. জোন্স বর্টন ও পিয়ার্ন : Survey of International Affarrs 1939-46, The Far East 1942-46, পৃঃ ১০৩
৭৭. প্রাভদা, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮
৭৮, ঐ
৭৯. Soviet Foreign Policy, প্রথম খণ্ড পৃঃ ৯৩

অষ্টম অধ্যায়

মস্কো দখলের সংগ্রাম

উনিশ শ' একচল্লিশের আগষ্ট মাসের মধ্যেই একথাটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে জার্মান সমর পরিষদ সোভিয়েতের প্রতিরোধ সামর্থকে ভুল ভাবে বিচার করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে জার্মাণীর সামরিক কার্যক্রমের সাফল্য সূচিত হলেও, সেই ফলাফল চূড়ান্ত ভাবে কোন কিছুরই মীমাংসা করতে পারলো না। হিটলারের সেনানায়করা স্বীকার করেছেন যে এই সামরিক সাফল্য, "শত্রুর সমগ্র সংগ্রামী শক্তিকে যেমন দ্রুত ধ্বংস করতে পারেনি তেমনি লাল ফৌজের মনোবলকেও ভাঙতে পারেনি।"

জার্মানদের প্রত্যাশা ছিল আচম্বিতে আক্রমণ করে তারা সোভিয়েত পশ্চাৎভূমির দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু তাদের সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। বারেবার নাৎসীদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়, এবং সোভিয়েত সেনাদল কঠোর পাল্টা আঘাত হানতে থাকে। লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্রে জার্মাণদের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ালো প্রচুর। এবং যে শীতকালীন যুদ্ধের ব্যবস্থা জার্মাণরা করেনি, তারই সম্ভবনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

সেপ্টেম্বরের সুরুতে স্মোলেনস্কের যুদ্ধের পর, রণাঙ্গনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে শত্রু সৈন্য আক্রমণ স্থগিত রাখতে বাধ্য হলো।

রণাঙ্গনের উত্তরাঞ্চলের মূল লক্ষ্য ছিল লেনিনগ্রাদ শহর। জুলাই মাসেই জার্মাণরা শহর দখলের জন্যে প্রথমবার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় বাহিনীর অসীম ধৈর্যপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্যে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। আগষ্ট মাসে ফ্যাশিস্তদের দ্বিতীয় আক্রমণও প্রতিরোধ করা হয়।

সেপ্টেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশের সুরুতে নাৎসী সৈন্যরা শহরের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ ও বিমান আক্রমণ চালিয়ে হিংস্রভাবে মরণ পণ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শী ঘটনার এই রকম বিবরণ দিয়েছেন :

"বাড়ীঘর, রাস্তাঘাত, পুল সেতু, মানুষজন যা এক সেকেণ্ড আগেও ঘন অন্ধকারেও ঢাকা ছিল, হঠাৎ এক ভয়াবহ লেলিহান অগ্নিশিখায় তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। ঘন জমাট কালো ধোঁয়া মেঘের মতো আকাশের দিকে উঠতে লাগলো, বাতাসে তীব্র কটু গন্ধ। দমকল বাহিনী, আত্মরক্ষামূলক সংঘ এবং সারা দিনের পরিশ্রমের পর হাজার হাজার শ্রমিক সমস্ত ক্লান্তি উপেক্ষা করে আগুন নেবাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তাদের প্রচেষ্টায় লেলিহান শিখার দাপট কমে এলো ধীরে ধীরে, এক সময়ে নিভেও গেল তা। কিন্তু যেখানে খাদ্য মজুদ করা আছে, সেই বাদাইয়েভ গুদামগুলিতে আগুন জ্বলতে থাকলো একই ভাবে। সেখানে আগুন জ্বলেছিল পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে।"[২] শহরবাসীর সক্রিয় সাহায্য পেয়ে সোভিয়েত সেনাদল, নাৎসীদের অগ্রগতি প্রতিহত করে তাদের পিছু হটিয়ে দিল।

নাৎসীরা লেনিনগ্রাদ দখল করতে না পারলেও, স্থল পথে অবরোধ করে বসে রইলো শহরটিকে। তারপর সুরু হলো সেই বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সংগ্রামে যা একটানা চলেছিল নয় শ' দিনের বেশি। নাৎসীদের কঠোর অবরোধ জনিত দুঃখকষ্ট, খাদ্যাভাব, ক্ষুধাকে উপেক্ষা করে, প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ ও বিমান আক্রমণকে আমল না দিয়ে, শহরবাসী মানুষ আর সোভিয়েত সেনাদল, সমগ্র সোভিয়েত দেশের মানুষের সমর্থনপুষ্ট হয়ে পূর্ণ মর্যাদায় অটল প্রতিরোধ রচনা করলো।

ওদিকে দক্ষিণে রণাঙ্গনে জার্মাণ সমর বাহিনীর জগন্নাথের 'রথ তখন ক্রমাগত গড়িয়েই চলেছে তার লক্ষ্যের অভিমুখে। দশই আগষ্ট থেকে ষোলই অক্টোবরের মধ্যে উনিশ শ' একচল্লিশে, সংখ্যালঘিষ্ট সোভিয়েত নৌ সেনা বাহিনী, কৃষ্ণ সাগরীয় নৌবাহিনী ও স্থানীয় জনগনের সহায়তায়, শত্রুর ওডেসা অভিযানে আঠারো ডিভিশন সৈন্যকে আটক করে, হতবল করে দিয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি জার্মাণরা কিয়েভ সহর দখল করে. নীপার নদী অতিক্রম করে ইউক্রেনে ঢুকে পড়েছে। তারপর তীরবেগে সেখানে অগ্রগতি ঘটিয়ে তার বুক চিরে হাজির হয়েছে একেবারে ক্রিমিয়ার উপকণ্ঠে। এবার তাই রণাঙ্গনে ক্রিমিয়া উপদ্বীপে সোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের উপর যবনিকা উঠলো।

সোভিয়েত সেনা বাহিনীর বীরত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা সত্বেও দক্ষিণমুখী অভিযান সুরু করে জার্মানরা প্রাথমিক পর্যায়ে যে সব সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল তার গতি রইলো অব্যাহত। জার্মান সমর পরিষদ এই সুবিধাজনক পরিস্থিতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার জন্যে মস্কো অভিযানের তোড়জোড় সুরু করলেন। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল সোভিয়েত প্রতিরোধকে ভেঙ্গে খান খান করে শীত সুরু হওয়ার আগেই চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব করা যাবে।

জার্মান স্থল বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ সামগ্রিক যুদ্ধ পরিকল্পনা রচনা করার সময়েই মস্কো অভিযানের ছক করে রেখেছিলেন। এই পরিকল্পনার একজন উৎসাহী প্রবক্তা হিসাবে জোডল, দশই আগষ্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে লিখেছিলেন যে "প্রবল শত্রু সৈন্যকে নির্মূল করার মৌল উদ্দেশ্য নিয়ে যখন সেনাদলের মধ্য বাহিনী (Army group centre) তাদের মুখোমুখি দাঁড়াবে যখন মস্কো বিজয়ের সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠবে, তার তুলনায় সেনাদলের অন্যান্য অংশের অত্যন্ত লোভনীয় বিজয় প্রচেষ্টাও ম্লান হয়ে পিছনে পড়ে যায়।"৩

জার্মানীর রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা মস্কোর অসীম গুরুত্বের কথা জানতেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের শুধু রাজধানী নয় মস্কো মুক্তি সংগ্রামের পতাকা সগৌরবে তুলে ধরার দায়িত্বও তার সমগ্র দেশের মানুষের গর্ব ও আশা রূপান্তরিত হয় মস্কোকে নিয়ে। সোভিয়েত অর্থনীতিতে মস্কোর শিল্পকেন্দ্রগুলির আছে অনন্য ভূমিকা। দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার সে একটা মূল কেন্দ্র তার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এই সব বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করে, জার্মাণ সমর নায়করা বিশ্বাস করেছিলেন যে, মস্কোর পতন সমগ্র সমগ্র যুদ্ধের ফলাফলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।

মস্কো আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিয়ে নাৎসীরা তাদের সৈন্যবাহিনীকে নোতুন ভাবে পুনর্গঠিত করে নিল। সেনাদলের মধ্য বাহিনীর অধীনে রইলো আশী ডিভিসন সৈন্য। তার মধ্যে তেইশটি হলো মোটর বাহিত প্যানসার ডিভিশন। তাদের একমাত্র লক্ষ্য সোভিয়েত রাজধানী। এক হাজার বিমান সমেত নাৎসীদের দ্বিতীয় বিমান বাহিনী, স্থল বাহিনীকে আকাশ থেকে সাহায্য করে যাবে। সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ এর অর্দ্ধেকের বেশি সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করতে পারলেন না। কারণ উনিশ শ' একচল্লিশের

গ্রীষ্মকালে অতর্কিতে আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ায় তার যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা তখনো পুরণ করা সম্ভব হয়নি।

ফ্যাশিস্ত সমর পরিষদের পরিকল্পনা ছিল উত্তর ও দক্ষিণ থেকে শক্তিশালী প্যানসার ও মোটর বাহিত সৈন্যদল নিয়ে কালিনিন ও তুলার মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করতে করতে অগ্রসর হওয়া। আর পশ্চিম দিক থেকে মুখোমুখি লড়াই করতে করতে অগ্রসর হবে স্থলবাহিনী। মস্কোকে একেবারে লড়াইয়ের বেড়াজালে ঘিরে ধরতে হবে সম্পূর্ণভাবে।

মস্কো অভিযান যে সফল হবে তাতে নাৎসীদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। যেদিন দোসরা অক্টোবর, উনিশ শ' একচল্লিশে সেই আক্রমণ সুরু হলো, হিটলার তখন এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, "শীত আসার আগে আমাদের শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে ধ্বংস করে ফেলার বনিয়াদ এতো দিনে শেষ পর্যন্ত রচনা করা গেছে। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তেমন প্রস্তুতিই সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এবারে একটা সুপরিকল্পিত, স্পষ্ট ছক অনুযায়ী ধাপে ধাপে প্রস্তুতি করতে করতে অগ্রসর হওয়া গেছে, যাতে আমাদের শত্রুকে একটা জায়গায় আবদ্ধ করে তাকে মরণের পথে নিয়ে যাওয়া যায় প্রচণ্ড আঘাতে। আজ সুরু হচ্ছে এই বছরের সেই চূড়ান্ত পর্যায়ের বিরাট, চরম ও শেষ যুদ্ধ।"

দশই অক্টোবর জার্মান সৈন্যদলের সিনিয়ার কোয়ার্টারমাষ্টার এক নির্দেশনামা জারী করে বল্লেন যে মস্কো ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কোন কোন ব্যারাক ও প্রাসাদে জার্মাণ সৈন্যদল থাকবে। প্রচারকর্তা গোয়েবল্‌স বার্লিনের সমস্ত সংবাদপত্রগুলিকে তাদের বারোই অক্টোবর সংখ্যার জন্যে, মস্কোর পতনের খবর ছাপবার মতো শেষ সংবাদের স্থান সংরক্ষিত রাখার আদেশ দিলেন।

মস্কো শহর ধ্বংস করার জন্যে নাৎসী সমর নায়কদের সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী ছিল। সেনাদলের মধ্যবাহিনীর সদরকার্যালয়ে এক বৈঠকে, হিটলার বলেন,

"শহরটাকে অবরোধ করতে হবে। কোন রুশ সৈনিক, কোন অসামরিক কর্মচারী, সাধারণ মানুষ, নারী অথবা শিশু, কেউ যেন শহর থেকে বের হতে না পারে। যদি কেউ পালাবার চেষ্টা করে, বলপূর্বক তাকে বাধা দিতে হবে। বিরাট বিরাট যন্ত্র বসিয়ে সমগ্র মস্কো শহর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে জলে ডুবিয়ে দিতে হবে। আজ যেখানে মস্কো শহর দাঁড়িয়ে আছে, সেই জায়গাটাতে একটা

বিরাট সমুদ্র সৃষ্টি করে, রুশদের সাধের রাজধানীকে চিরকালের মতো সভ্য জগতের দৃষ্টি থেকে সরিয়ে রাখতে হবে।"[৪]

গোড়ায় জার্মাণদের অগ্রগতি রীতিমতো সাফল্যমণ্ডিত হলো। ঘণ্টায় ঘণ্টায় সমগ্র পরিস্থিত বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠতে লাগলো। শত্রুর প্রত্যক্ষ আঘাতের সম্মুখীন হয়ে পড়লো মস্কো। উত্তরে শত্রুর ট্যাঙ্ক ও মোটরবাহিত সৈন্যরা কালিনিন দখল করে ফেললো। দক্ষিণে তারা ওরেল দখল করে তুলার দিকে এগিয়ে গেল।

প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সত্বেও জার্মাণ সৈন্যরা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করতে লাগলো। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যরাও অসীম অধ্যবসায়ের সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে লাগলো। জেনারেল আই. ভি. প্যানফিলভের নেতৃত্বে বিখ্যাত তিন শ' ষোল সংখ্যক ডিভিশনের, এক হাজার সাতাত্তর সংখ্যক রেজিমেণ্টের আঠাশজন সেনানী যে বীরত্ব প্রদর্শন করে, সেকথা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। দুবোসেকোভোয় তারা শত্রুর পঞ্চাশটি ট্যাঙ্কের সামনে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, আঠারোটি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত করে। তবু পিছু হটে যায়নি তারা এক পা। ভোলোকোলামস্ক সড়কের উত্তরে, স্ত্রোকোভো গ্রামে, জুনিয়র লেফ্‌টেন্যাণ্ট পি. আই. ফ্রিস্তভ ও রাজনৈতিক উপদেষ্টা এম. এ. পাভলভের নেতৃত্বে বাইশ জন পরিখাখননকারী, বিশটি শত্রুপক্ষীয় ট্যাঙ্ক ও এক ব্যাটেলিয়ান পদাতিক সৈন্যকে পুরো একদিন আটকে রেখে দিল। মস্কোর বীর প্রতিরক্ষাকারীদের কর্তব্যনিষ্ঠা বীরত্বের অসংখ্য এই ধরনের কাহিনী প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে।

এগারোই অক্টোবর, উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা কমিটি, মস্কো ও সন্নিহিত অঞ্চলে অবরুদ্ধ অবস্থার কথা ঘোষণা করলেন। প্রতিরক্ষা কমিটি ও সর্বোচ্চ সমরপরিষদের সদর কার্যালয় ছাড়া, মস্কোর কয়েকটি কারখানা এবং প্রায় সব সরকারী আপিস সরিয়ে দেওয়া হলো মস্কো থেকে।

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে, মস্কো থেকে একশ' কিলোমিটার পশ্চিমে এবং তুলা অঞ্চলে দারুণ সংগ্রামের পর শত্রুর অগ্রগতি রোধ করা গেল। সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুকে তার আক্রমণ ধারা প্রসারিত করতে বাধা দিল, যাতে এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের কোন সংযোগ না ঘটে। তারপর মধ্যবর্তী বাহিনীর দুই পাশে এমনভাবে তাদের ঘিরে ফেলতে লাগলো যাতে জার্মাণদের প্রতি পদক্ষেপে আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যে লড়াই করতে হয়।

এতে জার্মাণদের কেন্দ্রীভূত শক্তি বেশ ক্ষয় হতে লাগলো। এসবেরই উদ্দেশ্য ছিল সময় লাভ করা এবং পাওয়া গেল সেই মহামূল্যবান সময় যাতে মস্কোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করা যায়। আর তার আশে পাশে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বিরাট সংরক্ষিত বাহিনী সমাবেশ করা সম্ভব হয়।

হিংস্র জার্মাণ আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে প্রয়োজন ছিল অসীম সাহস, সামরিক নৈপুণ্য আর কঠোর অনমনীয় মনোবল। সোভিয়েত সৈন্যরা মাটী আগলে দাঁড়িয়ে রইলো। মস্কোর জনসাধারণ তাদের লোকবল ও যথাসর্বস্ব এনে ধরে দিল প্রতিরক্ষার কাজে। মস্কোর ভিতরে ও বাইরে প্রতিরোধের বেড়া নির্মাণ করতে পাঁচ লক্ষ লোক এগিয়ে এলো স্বেচ্ছায়। এগারোটি স্বেচ্ছাসেবক ডিভিশন এবং সাতাশী সেনাদলের ব্যাটেলিয়ান গঠন করা হলো। মস্কো অভিমুখে ধাবমান শত্রু সৈন্যের পিছনে লেগে রইলো পার্টিজান দল। মস্কোর আশে পাশে গোপন পার্টি সংগঠন ও পার্টিজানদের প্রায় চল্লিশটি সংস্থা শত্রুদের হাতে ধরা পড়ে।

পার্টিজানদের প্রথম দলের নেতৃত্ব করেছেন পার্টির কর্মী, স্থানীয় সোভিয়েতের নেতৃস্থানীয় কর্মী, দীর্ঘদিনের পুরানো বলশেভিক কর্মী, গৃহযুদ্ধের সেনানী, যৌথ খামারের সভাপতি, কারখানার পরিচালক ও অন্যান্য বহু কমিউনিষ্ট, কমসোমল ও দেশপ্রেমিক মানুষ। প্রথম দলে ছিলেন পার্টিকর্মী হিসাবে টি. বুমাশকভ্, এন. পোপুদ্রেঙ্কো, আই-ইয়াকোভেঙ্কো, এফ. কোরোত্‌কভ, সেই সব স্থানীয় সোভিয়েত নেতৃস্থানীয় কর্মী যেমন এস. কোভপাক্, এস. কোর্নেইয়েভ, পুরানো বলশেভিক কর্মী ও গৃহযুদ্ধের বীর যেমন পি. কুকসেনিয়ুক, ভি. কোরঝ ও জি. লিঙ্কভ্ এবং আরো অনেকে। আত্মগোপনকারী ওর্সা পার্টিজান দলের নেতা হিসাবে রেল ইঞ্জিনীয়ার কোনস্তান্তিন জাসলোনভ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এমনই একজন সুদক্ষ বিচক্ষণ পার্টিজান কর্মী ছিলেন ভি. জেবোলোভ্, যাঁর দুটি হাতই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আঠারো বছর বয়সের ছেলে, পার্টিজান, মস্কো কমসোমলের সদস্য জোয়া কোসমোদেমিয়ানাস্কায়া, বন্দী হয়ে তার ফ্যাশিস্ত অত্যাচারকারীদের সামনে নতজানু হতে অস্বীকার করে, নির্মম লাঞ্ছনায় বীরের মৃত্যু বরণ করেছিল। মস্কোর আশে পাশে সর্বত্র এবং সাময়িকভাবে ফ্যাশিস্ত সেনাদলের অধিকৃত অঞ্চলে পার্টিজান আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়লো।

এটাই হলো মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের নামের, জনপ্রিয়তায় সার্থকতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ।

মস্কোর অসামরিক জনগণকে সংঘবদ্ধ করার দায়িত্ব নিলেন মস্কোর কমিউনিষ্ট পার্টি কমিটি। মস্কোবাসীদের উদ্দেশে প্রচারিত এক আবেদনে তাঁরা বলেন,

"মস্কো আজ বিপদের সম্মুখীন, কিন্তু আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত মরণপণ সংগ্রাম করব ধৈর্য ধরে। আপনারা সকলে, যে যে পদেই থাকুন না কেন, যে কাজই করুন না কেন, ফ্যাশিস্ত হানাদারদের আক্রমণের হাত থেকে আজ যাঁরা মস্কোব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলায় আত্ম নিয়োগ করেছেন, তাঁরা সবাই জেনে রাখুন, তাঁদের কাজ মস্কোকে সুরক্ষিত করছে। কলে কারখানায় আজ যাঁরা কর্মরত, তাঁরা জেনে রাখুন শ্রমের প্রতিটি মুহূর্ত মস্কো ও আমাদের স্বদেশের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করছে। লালফৌজের সৈন্যরা, সংগ্রামী সৈনিকরা জেনে রাখুন যে জাতি তাঁদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, তাঁদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দেশ ও দেশের মানুষকে তাঁরা যেন রক্ষা করতে পারেন।"[৫]

নাৎসীদের প্রথম মস্কো আক্রমণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। জার্মান সেনানায়করা ক্ষিপ্তপ্রায় হযে পড়লেন। দ্বিতীয় প্যানসার বাহিনীর নায়ক কর্ণেল জেনারেল হাইনজে গুদেরিয়ান, ছয়ই নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে তাঁর এক বিবরণীতে বলেছেন:

"এটা আমাদের সৈন্যদলের পক্ষে একটা অত্যাচার স্বরূপ, আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ জিতে যাচ্ছে, সময় লাভ করছে, আর আমরা আমাদের উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হয়ে যেতে দেখছি, দেখছি সামনে শীতকালীন যুদ্ধের অনিবার্য সম্ভবনা। শত্রুকে মর্মান্তিক আঘাত হানার অপূর্ব সুযোগ আমাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে, জানিনা সে সুযোগ আর আমরা কখনো পাবো কিনা।"[৬] নাৎসী নেতৃত্ব দারুণ শংকিত হয়ে উঠলো। পঁচিশে অক্টোবর তারিখে হিটলার সিয়ানোকে তাই বলেছেন, "এমনটি হবে জানলে, আমি কিছুতেই হয়তো অগ্রসর হতাম না।"[৭]

হতাশার জ্বালায়, জার্মাণরা ঠিক করলো তারা আবার দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু করবে মস্কোর বিরুদ্ধে।

টিপ্পলস্কার্চ লিখেছেন যে সেনাদলের মধ্যবর্তী বাহিনীর নায়ক মস্কো আক্রমণের ধারা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সোভিয়েত প্রতিরোধ ক্ষমতাকে চূর্ণ করার আশা তাঁর ছিল। স্থল বাহিনীর সর্বোচ্চ নায়ক পরিষদও শেষ আঘাত হানার আশা পরিত্যাগ করতে রাজী ছিল না।[৮]

ফলে স্থলে, অন্তরীক্ষে ভয়াবহ সংগ্রাম চলতে লাগলো। পশ্চিম ইউরোপের বিমান আক্রমণের অভিজ্ঞতাপুষ্ট, শ্রেষ্ঠ বৈমানিকদের জার্মাণরা পাঠাতে লাগলো, মস্কো আক্রমণ করার জন্যে।

মস্কোর উপর নাৎসী বিমান প্রথমবার হানা দিল একুশে জুলাই, উনিশ শ' একচল্লিশে। তারপর শুরু হলো নিয়মিত ব্যবধানে উপর্যুপরি আক্রমণের ধারা। নাৎসী আক্রমণের ধারা তীব্র থেকে যতোই তীব্রতর হতে লাগলো, বিমান আক্রমণের প্রচণ্ডতা বেড়ে চললো ততোই। কিন্তু মস্কোর বিমান বিধ্বংসী প্রতিরক্ষার কার্যকরী ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত উঁচু মানের। উনিশ শ' একচল্লিশের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মস্কোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একশ' বত্রিশ বার বিমান আক্রমণ প্রতিহত করেছে আর ভূপাতিত করেছে নাৎসীদের এক হাজার পঁয়ত্রিশটি বিমান।

আসন্ন শীতের হিমেল হাওয়ার চাবুক খেয়ে, জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব, ষোলই নভেম্বর তারিখে মস্কোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় "ব্যাপক" অভিযান আরম্ভ করলো। জার্মাণ সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এই অভিযান সুরু করার কারণ স্বরূপ নির্দেশনামায় যেসব কথা বলেছে তা সবিশেষ লক্ষ্যণীয়:

"আসন্ন ঘটনাবলীর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে, বিশেষত সমাগত শীত ও সৈন্যবাহিনীর জিনিসপত্র যোগানের শীর্ণতা বিবেচনা করে, আমি রাজধানী মস্কো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব যে কোন মূল্যে দখল করার জন্যে আদেশ দিচ্ছি।"

এবারে জার্মাণ বাহিনীতে রইলো একান্ন ডিভিসান সৈন্য। তার মধ্যে একুশ ডিভিশন ছিল প্যানসার ও মোটরবাহিত। মস্কো সাগর থেকে ইয়েক্রেমভ পর্যন্ত বিস্তৃত রণাঙ্গন জুড়ে তারা ধেয়ে এলো মস্কোর দিকে। মধ্যবর্তী বাহিনীর বাকী অংশকে রাখা হলো, এই মূল আক্রমণকারী বাহিনীর দুই পাশে যে কোন সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে। বিশ দিন ধরে দিবারাত্র তীব্র যুদ্ধের পর জার্মাণ সৈন্যেরা আশী-নব্বই কিলোমিটার এগিয়ে

এলো মস্কোর দিকে। সেই অগ্রগতির চাপে সোভিয়েত বাহিনী হটে গেল মস্কোর উত্তরে মস্কো-ভল্গা খাল, ক্রাসনায়াপোলিয়ানা এবং ক্রিয়ুকোভো আর দক্ষিণে কাশিরার দিকে। এই রণাঙ্গনের কোন কোন অঞ্চলে ফ্যাশিস্ত সৈন্যরা মস্কোর একেবারে পঁচিশ-তিরিশ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পড়লো। জার্মাণ আক্রমণের প্রচণ্ডতার বেশির ভাগ ধাক্কাই গিয়ে পড়লো জেনারেল কে. কে, রকোসোভস্কি ও এল. এ. গোভোরোভের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েত বাহিনীর উপর।

এই প্রচণ্ড আক্রমণের ধারা রচনা করতে গিয়ে কিন্তু জার্মাণদের সব রসদ নিঃশেষিত হয়ে গেল। মানুষ ও মালপত্রে তাদের ক্ষয়ক্ষতি দাঁড়ালো প্রচণ্ড। জার্মাণীর সংরক্ষিত সেনাদল ও মজুদ রসদের ভাণ্ডার একেবারে প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকলো। আহত, বাধাপ্রাপ্ত ফ্যাশিস্ত সেনাদল তখনো বারো শ' কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গন জুড়ে রয়েছে, যদিও সেই সেনাদলের আশে পাশে তাদের সাহায্য করার মতো কোন আক্রমণ প্রতিহত করার মতো তখন আর তেমন কিছু সমাবেশ নেই।

॥ দুই ॥

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব মস্কোয় একটা পাল্টা আক্রমণের জন্যে প্রস্তুতি সুরু করলেন।

রাজধানীর উত্তরে ও দক্ষিণে শত্রু সৈন্যের দুই পাশে প্রথমে আঘাত সুরু করে সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম অভিমুখে এগিয়ে যেতে হবে। কালিনিন রণাঙ্গনের বাম অংশস্থিত সোভিয়েত সৈন্য জেনারেল আই. এস. কোনেভের নেতৃত্বে নাৎসী মধ্যবর্তী বাহিনীর উত্তর ভাগ আক্রমণ করবে। ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনের দক্ষিণ ভাগের সঙ্গে তারা একযোগে কাজ করতে পারবে। দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গনে মার্শাল এস. কে. টিমোশেঙ্কোর নেতৃত্বে সোভিয়েত সৈন্যরা তাদেরই দক্ষিণ ভাগে নাৎসী সৈন্যদের আক্রমণ করবে। ফলে পশ্চিম রণাঙ্গনে নাৎসী মধ্যবর্তী বাহিনীর দক্ষিণ ভাগে আক্রমণকারী সোভিয়েত সৈন্যের সাহায্য হবে। আর এই সমগ্র কার্যক্রম পরিচালিত হবে জে. কে, জুকভের নেতৃত্বে।

অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানী ও অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণের

অভাব ছিল সোভিয়েত সৈন্যের। অপসারিত কলকারখানাগুলি উপক্রুত অঞ্চল থেকে পিছনের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, জাতীয় অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থা যুদ্ধকালীন উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও যুদ্ধের সূচনায় পশ্চাৎপসারণ করার সময় যে ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে তা তখনো পূরণ করা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজনীয় উপকরণের এই ঘাটতিই জার্মানদের হাত থেকে সামরিক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ ছিনিয়ে আনার পথে একটা বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ালো।

সোভিয়েত নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ছিল শত্রুর অবসন্নতার পূর্ণ সুযোগ নিতে হবে। এখন তার আক্রমণ করার মতো আর কোন সংরক্ষিত বাহিনী নেই। এই পাল্টা আক্রমণে সোভিয়েত সৈন্যের অধ্যবসায় ও বিপুল সংখ্যক সংরক্ষিত সৈন্যের অংশ গ্রহণই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো।

জার্মাণ সেনানায়করা স্বীকার করেছেন যে সোভিয়েতের পাল্টা আক্রমণের জন্যে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না মোটেই। টিপ্পলস্কার্চ লিখেছেন "যে জার্মাণ সৈন্য তাদের সমগ্র শক্তি ও উপকরণ নিয়ে অভিযানে নেমেছিল, তারা একটা শীতকালীন যুদ্ধের কলাকৌশল সম্বন্ধে নৈতিক বল বা রসদের দিক থেকে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ফলে রুশ সৈন্যের পাল্টা আক্রমণে তারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। রুশদের পাল্টা আক্রমণে ব্যাপকতা ও আঘাতের তীব্রতা এতো বেশি ছিল যে বিস্তৃত রণাঙ্গনের একটা বিরাট অংশ জুড়ে নাৎসী সৈন্যরা বিহ্বল হয়ে পড়লো যা ছিল তাদের কাছে প্রায় একটা চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সামিল।"[১]

প্রথম আঘাত করে কালিনিন রণাঙ্গনের বাম অংশের সৈন্যরা। পরের দিন তাদের অনুসরণ করলো পশ্চিম রণাঙ্গনের মূল বাহিনী ও দক্ষিণ পশ্চিম রণাঙ্গনের দক্ষিণ অংশের সৈন্যরা। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের নাৎসী সৈন্যরা নিজেদের জন্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করেছিল, পাল্টা আক্রমণের চাপে তা ভেঙে পড়লো। তাতে তাদের একটা বেষ্টনীর মধ্যে আটকে পড়ার আশংকা ছিল যথেষ্ট। শত্রুরা তাই দ্রুত পিছু হটে গেল।

মস্কো, তিখ্‌ভিন ও রোস্তভের পাল্টা আক্রমণ ধীরে ধীরে একটা সমগ্র সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণের চেহারা নিল, যাদের সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে শত্রু সৈন্যের কেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আক্রমণের এই ধারা সবচেয়ে তীব্র ও

সফল হয়ে উঠতে থাকে পশ্চিম দিকে যাওয়ার সময়। শত্রুর মরণপণ প্রবল প্রতিরোধকে পর্যুদস্ত করে, সোভিয়েত সৈন্যরা কোন কোন ক্ষেত্রে চারশ' কিলোমিটার দূরত্বের প্রায় সবটুকুই অতিক্রম করে এবং নাৎসী মধ্যবর্তী বাহিনীকে বিধ্বস্ত ও পরাস্ত করে। বহু সংখ্যক সৈন্য নিহত হওয়ায়, শত্রুপক্ষ প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও কামান যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রেখে হটে যেতে বাধ্য হয়। ভেলিকিয়ে লুকি, ভেলিঝ, বাইলী, আর্জেভ, ঝহৎস্ক ও ভিয়াজ্‌মার কাছাকাছি এসে পড়ে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী।

রীতিমতো দুঃখ ও শোকের সঙ্গে টিপ্পলস্কার্চ লিখেছেন যে, "প্রতিশোধের জন্যে তরবারি কোষমুক্ত হলো।"[১০] মস্কোয় জার্মাণীর পরাজয় একটা বিরাট ঐতিহাসিক প্রভাবযুক্ত ঘটনা। অলৌকিক সাহস আর বীরত্বের সঙ্গে সোভিয়েত সেনাদল লড়াই করেছে যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত করার জন্যে। এই অসীম গুরুত্বপূর্ণ পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলো সোভিয়েত সেনাদলের গুণাবলী তার সেনানায়কদের কর্মকুশলতা। পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতিতে কোথাও কোন ঘাটতি ছিল না। তা ছিল যেমন পূর্ণাঙ্গ তেমনই কুশলী। সর্বোচ্চ সামরিক নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত ছিল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে পাল্টা আক্রমণ করতে করতে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো অন্যান্য জায়গায় ক্রমাগত আঘাত হানা যাতে সমগ্র রণাঙ্গনে সোভিয়েত সৈন্যের কাজের মধ্যে একটা সংযোগ স্থাপন করা যায়। সোভিয়েতের মনোবল তখন উচ্চ মানে পৌঁছেছে। তার সৈন্যরা অতুলনীয় ধৈর্য সাহসিকতা বীরত্ব প্রদর্শন করছে। মস্কোর যুদ্ধেই সর্বপ্রথম সোভিয়েত রক্ষী বাহিনী গড়ে উঠলো।

জার্মাণ আক্রমণ পরিকল্পনার ব্লিৎসক্রীগ নীতি তখন স্পষ্টতই ভেঙ্গে পড়েছে। জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সৈন্যরা অজেয়, সেই প্রচলিত বিশ্বাস সোভিয়েত সৈন্যের আক্রমণে ভেঙ্গে পড়েছে। মার্কিন ও বৃটিশ সমরনায়করা যাঁরা জার্মাণ সামরিক কৌশলের প্রতি আগাগোড়া শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যাঁরা সবচেয়ে শুরুতে স্থির নিশ্চিত হয়ে বসেছিলেন যে জার্মাণী অজেয়", তাঁরা প্রত্যক্ষ করলেন সেই ধারণা কেমন করে ভেঙ্গে গেল। ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়াশীল সোভিয়েত বিরোধী পরিকল্পনা ছত্রখান হয়ে গেল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শরিক যারা তারা তাতে পেল সাফল্যের ইঙ্গিত, উৎসাহ।

যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাবলীতে মস্কোয় জার্মাণ পরাজয় রীতিমতো প্রভাব বিস্তার

করেছিল। টিপ্পলস্কার্চ লিখেছেন যে, "এই শীতকালীন অভিযানের ফল পরবর্তী যুদ্ধ পরিচালনার উদ্যোগের উপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।"[১১] চার্চিল বলেন, "রুশ প্রতিরোধ সংগ্রাম জার্মাণ সৈন্যের শক্তিকে ভেঙ্গে দেয়।"[১২]

জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব অবশ্য চেষ্টা করেছিলেন পরাজয়ের ব্যাপকতা গোপন রাখতে তার প্রকৃত কারণ উপেক্ষা করতেই তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। শীতের প্রচণ্ডতাকেই তাঁরা ব্যর্থতার মৌল কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন, যাতে জার্মাণ সৈন্যের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে। আর সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে লাল ফৌজ। কিন্তু এই উপকথা অন্য জায়গায় দূরে যাক্, জার্মানীর মিত্রদের কাছেও তেমন বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। ইটালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী সিয়ানো তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন:

"যুদ্ধের ভাগ্য বিপর্যয়, বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালের ঘটনাগুলি হিটলারকে এটুকু বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এই বিস্তীর্ণ সাগরের মতো বিরাট ভূখণ্ডের দেশ রাশিয়ার চমক লাগাবার মতো অনেক ক্ষমতাই আছে।"[১৩]

কিন্তু তা সত্ত্বেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী লেখকবৃন্দ, মস্কো দখলের যুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়টা মূলতঃ প্রচণ্ড শীতের জন্যেই সম্ভব হয়েছিল বলে দোষ দিতে চান। যেমন ধরা যাক্ মার্কিন দেশের জেনারেল ওমার এন. ব্রাডলীর বই, "সৈনিকের গল্পের" (A Soldier's Diary) কথা। ইউরোপের রণাঙ্গনে তিনি নেতৃত্ব করেছেন এবং উনিশ শ' উনপঞ্চাশ থেকে মার্কিন সেনানায়ক পরিষদের প্রধান ছিলেন। তিনি লিখেছেন যে, "মস্কোর সদর দরজার বাইরে যেখানে জার্মাণ সৈন্যদল একেবারে বিজয়ে মুখোমুখি এসে পড়েছিল, সেখানে এক তীব্র রাশিয়ার শীত এসে হঠাৎ ভেরমাখটকে পঙ্গু করে দিল।"[১৪]

কিন্তু রাশিয়ার নিদারুণ শীতের বারেবার উল্লেখটা যেমন ভিত্তিহীন তেমনই অবিশ্বাসযোগ্য। আসলে ঘটনাটা ছিল এই যে জার্মাণ সৈন্যরা শীতকালীন যুদ্ধের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না যা জার্মাণ সামরিক নেতৃত্বের দুর্বলতারই পরিচয় দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কি কি প্রতিকূলতা ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তাদের দূরদৃষ্টির অভাব, অক্ষমতা ছিল।

মস্কো পরাজয়ের অনিবার্য ফলশ্রুতিকে কেমন করে কাটিয়ে ওঠা যায়, কি ভাবে তার প্রতিক্রিয়াকে সীমিত করা যায়, সে সম্বন্ধে নাৎসীদের কোন ধারণাই ছিল না। জনৈক বুর্জোয়া ইতিহাসবিদ আর্ভিড ফ্রেডবার্গ, মস্কোর নাৎসী

বিপর্যয়ের খবরে বার্লিনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, তার বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, "জনসাধারণের মধ্যে অস্থিরতা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। হতাশাবাদীরা মনে করতে লাগলো নেপোলিয়ন রাশিয়া অভিযানের কাহিনী। তাঁর গ্রাণ্ড আর্মির সম্পর্কে সমস্ত রচনাবলী যা বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে ছিল হঠাৎ তার আবার চাহিদা বেড়ে গেল বাজারে। ভবিষ্যদ্বক্তারা নেপোলিয়েঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চারদিকে জ্যোতিষের চর্চা যেন অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেল।[১৫]

জার্মাণ সমরনায়কদের মধ্যেও অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়লো। যাঁরা মনে প্রাণে হিটলারের সমস্ত কার্যক্রমের সঙ্গে একমত ছিলেন তাঁদের মনেও সন্দেহ দেখা দিতে লাগলো। যুদ্ধ শেষের পরে, তাঁদের অনেকেই বিপর্যয়ের জন্তে একা হিটলারকে দায়ী করে, তাঁর ঘাড়ে সমস্ত দোষের বোঝা চাপিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাশিস্ত সমরকলা কুশলীদের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। তাদের বক্তব্যের যথার্থ প্রমাণ করতে তৎপর হয়েছেন। হিটলারের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ ছিল এই যে, তিনি তাদের মতামত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু সেটাই সত্যি কথা ছিল না। কারণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণনৈতিক পরিকল্পনা ও যুদ্ধ পরিচালনা জার্মাণ সমরনায়করা একযোগে হিটলারের সঙ্গে করেছিলেন।

মস্কোয় জার্মাণীর পরাজয়ের পর হিটলার তাঁর সমরনায়কদের মধ্যে অনেক রদবদল করলেন। বৃটিশ যুদ্ধ ইতিহাসবিদ্ ফুলার, মস্কো দখলের সংগ্রাম প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, "এর প্রতিক্রিয়ার মধ্যে জার্মাণ সৈন্য ও সমরনায়কদের উপর প্রতিক্রিয়াই ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। এই যুদ্ধে যে তেজ, প্রচণ্ডতা তারা হারায়, পৃথিবীর মানুষের কাছে অজেয় সেনাবাহিনীর যে মর্যাদা তাদের ক্ষুণ্ণ হয়, তা আর কোনদিন ফিরে আসেনি। আর সেনানায়কদের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তারা যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।......মার্নের যুদ্ধের পর থেকে সেনানায়কদের এই রকম ব্যাপক হত্যাকাণ্ড আর কখনো অনুষ্ঠিত হয়নি।"

সাতাশে এপ্রিল, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে রাইখ্‌ষ্টাগ্‌ একটি আইন পাশ করে হিটলারকে ইচ্ছামতো সরকারী কর্মচারী পদচ্যুতির অধিকার দান করলেন।[১৬]

মস্কো যুদ্ধের ফলাফল ফ্যাশিস্ত মৈত্রীর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তুললো। তার মুখ্য প্রকাশ ঘটলো জাপান ও জার্মাণী এবং ইটালী ও জার্মাণীর সম্পর্কের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে জার্মাণীর অনুগত ও তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে

এবং জার্মাণ নাৎসীদের মধ্যেও তার প্রকাশ চাপা থাকলো না। মস্কোর জার্মাণরা যে শিক্ষালাভ করলো তারই জন্তে উনিশ শ' একচল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর সম্ভাব্য তুর্কী আক্রমণ আর ঘটলো না। জাপান তার সোভিয়েত দেশ আক্রমণের পরিকল্পনা পিছিয়ে দিল আরেক বছর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশ সাল পর্যন্ত। জার্মাণী যখন মস্কোয় আঘাত করছিল, তখন জাপানী নেতৃত্ব আক্রমণ সুরু করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু চৌঠা অক্টোবর, উনিশ শ' একচল্লিশে, টোকিওস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূত ওট (Ott) বার্লিনে খবর পাঠালেন যে সোভিয়েত দূর প্রাচ্যস্থিত সেনাদলের সংখ্যা এখনো রীতিমতো থাকায়, তাদের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণ আগামী বসন্তকালের পূর্বে সুরু করা যাবে না। ওট তাঁর বিবরণীতে লিখেন যে, "জার্মাণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে একাগ্রতা ও অধ্যবসায় দেখাচ্ছে, তার থেকে মনে হয় যে আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বরে কোন জাপানী আক্রমণ ঘটলেও, সামনের বছরের পূর্বে সাইবেরিয়ায় ঢোকা সম্ভব হবে না।"[১৮]

সত্তেরই নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে জাপান সরকারীভাবে বার্লিনকে সতর্ক করে দেয় যে উনিশ শ' বিয়াল্লিশ না আসা পর্যন্ত জাপান সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ পরিকল্পনা স্থগিত রাখছে। তাই বলা যায় যে মস্কোর যুদ্ধে সোভিয়েতের বিজয় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সেই উদ্দেশ্যকে তছনছ করে দেয়, যার প্রত্যাশা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে একযোগে সোভিয়েত আক্রমণ করে হয় তাকে বিধ্বস্ত করা নয় তো দুর্বল করে দেওয়া।

সোভিয়েতের খ্যাতি কিন্তু এতে বেড়ে গেল যথেষ্ট। সব দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ জার্মাণীর পতনের একটা বাস্তব সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। সোভিয়েতের জনগণের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম বিভিন্ন দেশের দেশপ্রেমিক মানুষের কাছে দৃষ্টান্তস্থল হয়ে দাঁড়ালো। "ফ্যাশীবাদী নোতুন সভ্যতার" বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রেরণা লাভ করলেন তাঁরা এর থেকে।

এই "নোতুন সভ্যতা" আসলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক পরাধীনতার নামান্তর মাত্র। এর যা নোতুনত্ব তা হলো জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃক ইউরোপের দেশগুলিতে এর যুদ্ধকালীন প্রয়োগ এবং উপনিবেশের দাসত্বপ্রথার সঙ্গে, বিজিত দেশের জন সমষ্টির এক অংশের বিলোপ সাধনের এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর যোগাযোগ। স্বভাবতই এই "নোতুন সভ্যতা"কে কমিউনিষ্টবিরোধিতার

পতাকার আড়ালে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কারণ কমিউনিষ্টরাই সবসময়ে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্যে আন্দোলন করেছে, সংগ্রাম করেছে। হিটলারের এই লুঠেরা, খুনেদের যে সব প্রতিক্রিয়াশীল মানুষ যথেষ্ট মদৎ যুগিয়েছিল, তাদেরই একজন হলেন বুলগেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ফিলো (Filow)। তিনি মনে করতেন যে, "ইউরোপে নোতুন সভ্যতা গড়ে তোলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসর্ত হলো সাম্যবাদের ধ্বংস।"[১৯]

সাম্রাজ্যবাদের দালাল যারা, যারা সাম্রাজ্যবাদকে রেখে ঢেকে একটু সহনীয় করে তোলার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছে, আমেরিকা ও বৃটেনে এই শ্রেণীর মানুষ, যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদ্ধোত্তরকালেও এই "নোতুন সভ্যতার" প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বৃটেনের একচেটিয়াতন্ত্রের বিশ্বস্ত সেবক, প্রতিক্রিয়াশীল ইংরেজ ইতিহাসবিদ, আর্নল্ড টয়েনবী সুপারিশ করেছেন যে, শক্তির ভিত্তিতে একটা "বিশ্বরাষ্ট্র" গঠন করার উদ্দেশ্যে, হিটলারের "অভিজ্ঞতার" মূল্যায়ন করে তাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য তাঁর "নোতুন সভ্যতা" হলো অ্যাংলো স্যাকসনদের রচনা, অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিন সভ্যতা, যা ইউরোপ ও সমগ্র পৃথিবীতে প্রবর্তিত হতে পারে।

ইউরোপের নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলে এই "নোতুন সভ্যতার" ধারক ও বাহক এক কথায় স্তম্ভ স্বরূপ হয়ে রইলো জার্মাণ দখলদারী সৈন্য নাৎসীদের অত্যাচার ও সন্ত্রাস সৃষ্টির যন্ত্র বললেও যার পূর্ণ পরিচয় দেওয়া যায় না আর কুইসলিংয়ের দল।

সবদেশেই বিশ্বাসঘাতকতা যারা করেছে, তারা হলো বিত্তবান শ্রেণী, সমাজের উপরতলার লোক, বড়ো বড়ো বুর্জোয়া; জমিদার, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী কর্মচারী, রাজতন্ত্রের সমর্থক কর্মচারীবৃন্দ এবং দক্ষিণ-পন্থী সমাজতন্ত্রী নেতৃত্বের এক অংশ। এই সব বিশ্বাসঘাতক ও সহযোগিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নেতৃত্ব করলো শ্রমিক শ্রেণী। কৃষক বুদ্ধিজীবি এবং বুর্জোয়াদের নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর দেশপ্রেমিক অংশ তাদের সঙ্গে করলো ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। ফলে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠলো এই সব শ্রেণীর সমবায়ে নোতুন শক্তির সমাবেশ, যা চরিত্রগত বিচারে জনপ্রিয়, গণতান্ত্রিক, সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। যা তাদের বিনাশ করতে তৎপর।

অধিকৃত দেশগুলিতে মুক্তি সংগ্রামের নেতৃত্ব করলেন কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক

শ্রেণীর সংগঠনগুলি। যুদ্ধের অগ্নি পরীক্ষায় তাঁরা নিজেদের দেশপ্রেমের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন, যখন অন্য সব রাজনৈতিক দলের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। যুদ্ধ এটাও সপ্রমাণ করেছে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির তাদের চেয়ে বড়ো সমর্থক আর নেই।

মস্কোয় সোভিয়েতের জয়লাভ, ইউরোপের জনগণের মুক্তি আন্দোলনে একটা নোতুন স্তরের সূচনা করলো। একটা সুসংবদ্ধ, কার্যকরী পরিকল্পনা অনুযায়ী সক্রিয় সুগঠিত ও পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার বন্ধনে জড়িত পার্টিজান দলের আবির্ভাব ঘটলো দেশে দেশে।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের সুরুতে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে বুলগেরিয়ায় পিতৃভূমি সংগঠনের পত্তন করা হলো। দেখা দিল পার্টিজান দল। পিতৃভূমি সংগঠন একটি কার্যক্রম গ্রহণ করলো যার লক্ষ্য ছিল নাৎসী ও ফ্যাশিবাদী রাজতন্ত্রের একনায়কত্বের কবল থেকে জাতীয় মুক্তি সম্ভব করা। এই সংগঠন বুলগেরিয়ার মানুষকে হিটলার বিরোধী মোর্চায় সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে দেশে জনগণতন্ত্রী শাসন কায়েম করার লক্ষ্য ঘোষণা করলো।

গ্রীসে কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে, দেশপ্রেমিক মানুষ গঠন করলো ইয়েম (EAM) সংগঠন—জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট। এরই সামরিক শাখার নাম ছিল এলাস (ELAS)—গ্রীক জনগণের মুক্তি ফৌজ। জার্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করাই ছিল এর প্রধান কাজ।

পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির গোড়াপত্তন হয় উনিশ শ' বিয়াল্লিশে। স্বাধীন ও সার্বভৌম পোল্যাণ্ডের জন্যে জনগণকে একটি জাতীয় ফ্রন্টে যোগদানের আবেদন জানায় এর কেন্দ্রিয় কমিটি। সেই আবেদনে বলা হয়েছিল :

"যে জাতি পৃথিবীকে দিয়েছে কোপার্নিকাস, মিকিভিজ, শোপ্যাঁ এবং ম্যারী সক্লোডোভাসকাকে তাকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। যে জাতি সব যুদ্ধক্ষেত্রে সব জাতির জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছে, রক্তের অক্ষরে যারা পতাকায় লিখেছে, "তোমার স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতার জন্যে," তাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না।"[২০]

পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টির উদ্যোগে সংগঠিত গওয়ার্ডিয়া লুডোভা (Gwordia ludowa) বা জনগণের রক্ষীবাহিনী, জার্মাণ ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পার্টিজান যুদ্ধ আরম্ভ করলো। বোলস্ল বেইরুট (Boleslaw Bierut) বললেন,

"জনগণের জীবনেতিহাসের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে তাদের অগ্রগামী অংশ হিসেবে গড়ে উঠলো পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টি, শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে সুগঠিত সংগ্রামী অংশ। নাৎসী অধিকারের বিরুদ্ধে সবচেয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে প্রথম সংগ্রাম সুরু করেছিল পোলিশ ওয়ার্কার্স পার্টি।"[২১]

পোলিশ পার্টিজানরা প্রথমে তাদের কাজ সুরু করলো রাদোমের (Radom) কাছে কিয়েলসে (Kielce) ও লুবলিন (lublin) অঞ্চলে। লুবলিনের আশেপাশে তারা সোভিয়েত পার্টিজানদের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে থাকে। তাদের সেই কাজের পদ্ধতি ছিল যেমন কার্যকরী তেমনই ব্যাপক। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ ধরে গওয়ার্ডিয়া লুডোভা নাৎসীদের দু'শ সাইত্রিশ বার যুদ্ধে টেনে নামায়, একশ' সাতাশটা নাৎসী ট্রেন উড়িয়ে দেয়, আর ধ্বংস করে ছত্রিশটা রেল ষ্টেশন।

চেকোশ্লাভাকিয়াতেও পার্টিজান আন্দোলনের জোশ বেড়ে উঠতে লাগলো। বহু সংখ্যক পার্টিজান সেখানে নিজেদের একটা ব্রিগেড গলে তুলে মোরাভস্কা অস্ত্রাভা অঞ্চলে কাজে নেমে পড়ে। তাদের নাম দেওয়া হয় ইয়ান জিজ্‌কা। যে শ্লোভাক সেনাদলকে হিটলার সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণে ব্যবহার করতে উদ্যোগ করেছিলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি তাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার সংগঠিত করলো নিপুণভাবে। শ্লোভাক রেজিমেন্টের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। সোভিয়েত সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে অস্বীকার করে, শ্লোভাক সৈন্যরা দল ছেড়ে পালিয়ে গেল পার্টিজানদের সঙ্গে যোগ দিতে।

ইউক্রেণের ট্রান্সকার্পেথিয়ান অঞ্চলে ঘটলো এক সশস্ত্র সংগ্রাম। উনিশ শ' একচল্লিশের শেষাশেষি উঝগোরোদের কাছে প্রথম পার্টিজান দল দেখা যায়। এই দলে যারা ছিল তারা সবাই স্থানীয় লবণখনি শ্রমিক। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মের মধ্যেই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ালো দশ হাজারে।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের সুরুতে আলবেনিয়াতেও পার্টিজান আন্দোলন বিস্তার লাভ করলো। অল্পদিনের মধ্যেই আলবেনিয়ার মতো ছোট দেশেও পার্টিজানদের চল্লিশটি দল গড়ে উঠলো। আর তাতে যোগ দিল দশ হাজারেরও বেশি যোদ্ধা।

যুগোশ্লাভিয়ার পার্টিজান আন্দোলন ধীরে ধীরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নিচ্ছিল। যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছিল একটা জনপ্রিয়

বিপ্লবেরই নামান্তর মাত্র। সেখানে তাই গড়ে উঠলো একটা সংযুক্ত মুক্তি ফ্রন্ট। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের ছাব্বিশে সাতাশে নভেম্বর মুক্ত ক্রোয়াশিয়ার বিহাক্ শহরে যুগোশ্লাভ জনগণের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে গঠন করলেন ফ্যাশি বিরোধী জাতীয় মুক্তি পরিষদ। যুগোশ্লাভিয়ার প্রথম পার্লামেন্টের গোড়াপত্তন হলো।

ইউরোপের দেশে দেশে প্রতিরোধ আন্দোলন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিল। সেই আন্দোলনকে দমন করতে শুধুমাত্র বলকান অঞ্চলে ছয় লক্ষেরও বেশি জার্মাণ সৈন্য নিয়োগ করতে হয়েছিল।[২২]

প্রতিরোধ সংগ্রামীদের সোভিয়েত ইউনিয়ন নানা ধরনের সাহায্য ও সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল। অন্যদিকে কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক গোষ্ঠী জনস্বার্থ বিরোধী পলাতক সরকারদের সঙ্গে সহযোগিতা করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করেন। লণ্ডন ও অন্যান্য জায়গায় আশ্রিত, পলাতক প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রের সাহায্যে, তারা আশা করে ছিল ইউরোপের সেই সব সুবিধাজনক অথচ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে তাদের অধিকার কায়েম করে নেবে, যেখানে আজ ফ্যাশি শক্তি ঘাঁটি গেড়ে বসে আছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপ দপ্তরের Office of strategic Services কাজের ধারাকে জোরালো করে তুললো। আসলে এই দপ্তরটি ছিল স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে গুপ্তচর আর অন্তর্ঘাতী কাজের একটা বড়ো ঘাঁটি। ইউরোপে তার সদর দপ্তর স্থাপন করা হয় সুইজারল্যাণ্ডের বের্ণ সহরে। এর বড়োকর্তা ছিলেন অ্যালেন ডালেস, জন ফষ্টার ডালেসের ভাই। প্রতিরোধ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্যে যুদ্ধ চলাকালীন সময়েই এই দপ্তর প্রভূত অর্থ ব্যয় করে। অস্ত্রশস্ত্রের বড়ো রকমের রসদ যোগাতেও তার কার্পণ্য ছিল না।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরও অনুরূপ সংস্থা ছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে স্বাধীনতাকামী মানুষের বিরুদ্ধে এই দুই দেশের এই দুই প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে কাজ করলেও, যুদ্ধোত্তর ইউরোপে নিজের নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধে যে কোন জঘন্য কাজ করতে পেছপা ছিল না।

ও. এস. এস. এর একটি বিশেষ দপ্তর ছিল শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতী

কাজ সংগঠন করার জন্যে। তাই দেখে বৃটেনে, শ্রমিকদলের কিছু সদস্যের সাহায্যে সহযোগিতায় একটি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান চালু করা হলো।

স্বাধীনতাকামী মানুষদের বিরুদ্ধে কর্মরত ইঙ্গ-মার্কিন গুপ্তচর কেন্দ্রের মোটামুটি কয়েকটি সাধারণ লক্ষ্য দেখা যায়, যথা :

এক : ইউরোপীয় ফ্যাশিবিরোধী সংগঠনগুলি, বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টি শ্রমিক সংগঠন ও জাতীয় সংস্থাগুলির কর্মদক্ষতাকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্যে, যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তাদের মধ্যে গুপ্তচরদের অনুপ্রবেশ ঘটাতে হবে।

দুই : যে কোন উপায়ে এমন কি প্রয়োজন হলে নাৎসীদের সাহায্য নিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করে তাদের জনপ্রিয় আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দিতে হবে। সেই উদ্দেশে অধিকৃত দেশগুলির প্রাক্তন সেনাদলের বিচ্ছিন্ন অংশকে যেখানে সম্ভব সুগঠিত করে সশস্ত্র বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে।

তিন : জার্মাণীকে হিটলারের কবল মুক্ত করে, তারই গুপ্তচর ও সশস্ত্র শক্তিদের কাজে লাগিয়ে, জার্মাণী সমেত ইউরোপের নানা দেশে প্রতিক্রিয়াশীল, মার্কিণ ও বৃটিশপন্থীশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

চার : সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সেনাবাহিনী এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক ও শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন সম্পর্কে গোপন খবরাখবর সংগ্রহের কাজ সুগঠিত করে তুলতে হবে।

বিভিন্ন দেশের পলাতক ও আশ্রিত সরকারদের এই কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা হলো। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতা সুরু হয়ে গেল তাদের দলে টেনে আনার জন্যে। কিন্তু ধীরে ধীরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিযোগিতায় বৃটেনকে কোনঠাসা করে ফেললো যদিও সূচনায় অনেক আশ্রিত সরকারের পক্ষপাতিত্ব ছিল বৃটেনের প্রতি।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার এবং এই সমস্ত পলাতক ও আশ্রিত গোষ্ঠীর অনেকেই মুক্তি আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্যে নানা ধরণের কলাকৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এই কাজে তাঁদের সাহায্যে এসেছিল নানা দেশের বিশ্বাসঘাতক মানুষ আর গেষ্টাপো বাহিনী।

দেশপ্রেমিক মানুষদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যে বিশেষ গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান খোলা হলো, লাগিয়ে দেওয়া হলো এর ভাড়াটে লোকদের তাদের বিরুদ্ধে। ধরিয়ে দেওয়া হলো অনেক দেশপ্রেমিক মানুষদের নাৎসী দখলদারী

কর্তৃপক্ষের কাছে। এই সমস্ত গুপ্তচর প্রতিষ্ঠানকে (যেমন পোল্যাণ্ডের গুপ্তচর বাহিনী, আলবেনিয়ার বল্লি কোমবেতার, যুগোশ্লাভিয়ার মিহাইলোভিকের চেৎনিক্ সংস্থা ইত্যাদি) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার অকৃপণভাবে লোকজন, টাকাপয়সা ও অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিয়ে সাহায্য করলেন। দেশপ্রেমিক মানুষদের সুবিধা পেলেই হত্যা করার জন্যে ইঙ্গ-মার্কিণ গুপ্তচর সংস্থাগুলি লোক নিয়োগ করলো। আর নির্দেশ দিল তাদের ভাড়াটে লোকজনদের পার্টিজানদের পেছন থেকে আক্রমণ করে ধ্বংস করতে। অধিকৃত দেশগুলিতে যে সব অকুতোভয় দেশপ্রেমিক মানুষ, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে অকাতরে সব কষ্ট সহ্য করেছিলেন, তাদেরই অনেককে এরা হত্যা করলো নির্মমভাবে। পলাতক ও আশ্রিত সরকার, নানা গোষ্ঠী ও তাদের অনুচররা, ফ্যাশিস্ত হানাদার অত্যাচারীদের চেয়ে নিজের দেশের মানুষকে ভয় করতো বেশি, ঘৃণা করতো বেশি। কারণ ফ্যাশিস্তদের সম্পর্কে ছিল তাদের মানসিক সাযুজ্য আর সমশ্রেণী চেতনা।

তাই দেখা যায় যুগোশ্লাভিয়ায় মিহাইলোভিকের চেৎনিকরা ধীরে ধীরে দখলদারী হানাদার সৈন্যদের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। অভিন্ন হয়ে গেল তারা। কিন্তু তা সত্ত্বেও পলাতক সরকার যুগোশ্লাভিয়ার তাদের বলতে লাগলেন এরাই হলো সে দেশের জাতীয় বাহিনী। আর লণ্ডনে বসে যুগোশ্লাভিয়ার রাজা হয়ে রইলেন এই জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

সমস্ত নাৎসী অধিকৃত দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্যে গড়ে উঠলো সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির একটা সংযুক্ত মোর্চা। তার মধ্যে রইলো দখলদারী সৈন্যরা, স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার চক্র ও বিদেশে আশ্রিত তাদের পলাতক সহযোগিরা, ট্রট্স্কীপন্থী ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকরা এবং ইঙ্গ-মার্কিণ গুপ্তচর সংস্থার ভাড়াটে অনুচররা।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শক্তিকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। যথারীতি সোভিয়েতের নীতি হলো বিদেশের মানুষের আশা আকাঙ্খা ও প্রগতিশীল লোকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যে পরিমাণে শক্তি যুগিয়ে যেতে পারলো, ঠিক সেই অনুপাতেই হিটলারের শক্তি গেল কমে। কারণ অধিকৃত অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের সংগঠিত রূপ জার্মাণীকে

সংরক্ষিত বাহিনী ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলো। নাৎসী পরাধীনতা থেকে মানুষ মুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে দলে দলে সমবেত হলো হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে।

ফলে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাবাহিনীর বিপদ আসলো দু'দিক থেকে। বাইরে সোভিয়েতের প্রচণ্ড আঘাত এবং অধিকৃত অঞ্চলের দেশে দেশে সশস্ত্র দেশ প্রেমিক মানুষের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্যে সংগ্রাম। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সমর্থনে যতোই মানুষ সমবেত হতে লাগলো ততোই শক্তিশালী হয়ে উঠলো সর্বহারার নেতৃত্ব ও তাদের অগ্রগামী অংশ হিসাবে কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বের ভূমিকা। যা দখলদারী সৈন্য ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে, যুদ্ধোত্তর কালে গণমুক্তির পথ প্রশস্ত করে।

অধিকৃত অঞ্চলে মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েতের মনোভাবের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় পার্টি ও সরকারী নেতাদের নানা বক্তৃতা ও নানা দলিল থেকে। এই রকমই একটা দলিল হলো আঠারেই ডিসেম্বর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে সোভিয়েতের পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রচারিত আলবেনিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তব্য। বিবৃতিতে আলবেনিয়ার দেশপ্রেমিক মানুষ ও অন্যান্য দেশের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রতি সোভিয়েতের নৈতিক সমর্থন জানিয়ে বলা হয় যে:

"আলবেনিয়ার দেশ প্রেমিক মানুষ ইটালীর পররাজ্য আক্রমণকারী হানাদারদের বিরুদ্ধে যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালাচ্ছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্ণ সমর্থন আছে তাঁদের প্রতি। আলবেনিয় ভূখণ্ডের উপর ইটালীর সাম্রাজ্যবাদী কোন দাবী দাওয়ার প্রতি সোভিয়েতের কোন স্বীকৃতি নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখতে চায় আলবেনিয়ায় ফ্যাশিস্ত হানাদাররা পরাস্ত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে। আলবেনিয়া ফিরে পেয়েছে তার স্বাধীনতা।...আলবেনিয়ার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা কেমন হবে তা স্থির করবে সেই দেশের মানুষ কারণ এটা হলো তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়।"[২৩]

এই বিবৃতির :কথা আগের থেকেই মার্কিন ও বৃটিশ সরকারকে জানানো হয়েছিল বলেই, তাঁরাও এ বিষয়ে নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনী ইডেন আলবেনিয়ার মানুষদের প্রতি তাঁর "সহানুভূতি" জানালেন মাত্র, কিন্তু তাদের মুক্তি আন্দোলন বা সে

বিষয়ে বৃটেনের মনোভাব কি সে সম্পর্কে কিছুই বললেন না।[২৪] আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হালের বক্তব্যের বয়ান ছিল একেবারে ভিন্ন ধরণের। তাতে বলা হয়েছিল যে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে আলবেনিয়ার বিভিন্ন পার্টিজান দল যেভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে তা সবিশেষ প্রশংসা ও সমর্থনযোগ্য।[২৫]

এই বিবৃতিতে "বিভিন্ন" পার্টিজান দল সম্পর্কে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই উল্লেখ করা হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরোক্ষে সাম্রাজ্যবাদীদের যোগ-সাজসে গঠিত "বাল্লি কোমবেতারের" (Balli Kombetar) কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন, যার কাজ ছিল আলবেনিয়ার মানুষদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো। সুতরাং মার্কিন বিবৃতির অন্যান্য লক্ষ্যের মধ্যে এটাও ছিল, যেন তার থেকে জনবিরোধী শক্তিরা সমর্থন পায়, যাদের প্রচেষ্টা পক্ষান্তরে জার্মাণীর ফ্যাশিস্ত হানাদারদেরই সাহায্য করছিল।

উনিশ শ' একচল্লিশের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন পোলিশ সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যদানের এক প্রতিশ্রুতির ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করলেন। পোল্যাণ্ডের মানুষদের এই সংকটকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাদের জন্যে সৌভ্রাতৃত্বমূলক সাহায্য ও সমর্থন জানালো। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের জুন মাসে সোভিয়েত সরকার ফ্রান্সের উদ্দেশে তাঁদের মনোভাবের পুনরুক্তি করে বল্লেন যে তাঁরা চান যেন "ফ্রান্স মুক্তি লাভ করে এবং ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে একটা গণতান্ত্রিক, হিটলার বিরোধী মহান শক্তি হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় তার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।"[২৬]

সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতি তার সামরিক সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আন্তরিক বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবকে, তাদের শ্রদ্ধা ভালোবাসাকে বাড়িয়ে তোলে।

॥ তিন ॥

সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির মৌল লক্ষ্য ছিল ফ্যাশি বিরোধী মোর্চাকে সংগঠিত করা। ফ্যাশি বিরোধী সংগ্রামে জড়িত থাকার জন্যে, আক্রমণ-কারীদের অনিবার্য পতন ত্বরান্বিত করার জন্যেই এই আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে।

উনিশ শ' একচল্লিশের ডিসেম্বরে অ্যান্টনী ইডেন এলেন মস্কোয়।

আলাপ আলোচনায় বসে তাঁদের কথাবার্তা হলো দ্বিতীয় রণাঙ্গন, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি সংগঠন ও ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি সম্পর্কে।

সোভিয়েতের প্রশংসনীয় যুদ্ধ প্রচেষ্টা, মস্কোয় জার্মাণদের পরাজয় ফ্যাশি-বিরোধী মোর্চাকে তখন শক্তিশালী করে তুলেছে। পয়লা জানুয়ারী উনিশ শ' বিয়াল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীন সমেত ছাব্বিশটি দেশ একটি যৌথ ঘোষণায় বলেছে যে ফ্যাশিবাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা তাদের সমস্ত সম্পদ নিয়োগ করতে বদ্ধপরিকর এবং কোন শত্রু দেশের সঙ্গে এককভাবে তারা কোন যুদ্ধ বিরতি বা শান্তি চুক্তি না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু এই ঘোষণা সত্বেও যুদ্ধের প্রচণ্ডতা, তার ঝড় ঝাপ্টা সবই বয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর দিয়ে।

মস্কোর যুদ্ধে সোভিয়েতের জয়লাভ যুদ্ধের গতিতে একটা আমূল ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। কিন্তু জার্মাণী তা সত্বেও তার গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত শক্তি যে ভাবে ব্যবহার করে গেল, তা যদি না করতে পারতো তাহলে সত্যিই যুদ্ধের গতি যেমন পরিবর্তিত হয়েছিল তা কার্যকরী হতে পারতো। তখন জরুরী প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয় রণাঙ্গনের। অর্থাৎ পশ্চিম ইউরোপে কোথাও ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির যৌথ অবতরণ এবং সোভিয়েত সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতায় জার্মাণী আক্রমণ ছিল একটা অত্যন্ত জরুরী কার্যক্রম।

আমেরিকা ও বৃটেনের অগণিত সাধারণ মানুষ, দ্বিতীয় রণাঙ্গনের জরুরী প্রয়োজনের বিষয়টি উপলব্ধি করে তার জন্যে দাবী জানাচ্ছিলেন। বৃটিশ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা হ্যারী পলিট (Harry Pollitt) এই সময়ে লেখেন যে, "সোভিয়েতের জনগণের প্রতিরোধ আন্দোলন ও শক্তি একটা বিরাট সংহতির সপক্ষে বিস্ময়কর আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে। বৃটেনে তার যে সক্রিয়তা দেখা যাচ্ছে, তেমনটি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি।"[২৭]

উনিশ শ' একচল্লিশ বিয়াল্লিশের শীতকালে সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণের সাফল্য, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। ততোদিনে ফরাসী প্রতিরোধ আন্দোলন বেশ ব্যাপক ও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সপক্ষে সেটা ছিল আরেকটি অনুকূল বিষয়। ফরাসী দেশ প্রেমিক মানুষেরা ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিণ

সঙ্গের অবতরণে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারতেন, সাহায্য করতে পারতেন তাঁরা তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টায়। কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেনের শাসক শ্রেণী দ্বিতীয় রণাঙ্গনের দাবীকে চেপে রাখতে চাইলেন। জনৈক জার্মাণ সাংবাদিক হেরম্যান রাউশ্‌নিং মন্তব্য করেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে যেমন করে হোক এমনই দুর্বল করে ফেলা যাতে "বেশ কয়েক দশক ধরে সে নিতান্ত শক্তিহীন হয়ে থাকে।"[২৮] মার্কিণ ও বৃটিশ নেতৃবৃন্দ পার্টিজানদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হলেন। তাঁরা জানালেন যে পার্টিজান আন্দোলনের সাহায্য তাঁরা গ্রহণ করতে পারেন না কারণ "প্রতিরোধ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশে যে আনুগত্যের মনোভাবের ঘাটতি ঘটে যাচ্ছে, তার মধ্যে ভবিষ্যতে গৃহ যুদ্ধের বীজ লুকানো আছে।"[২৯]

কিন্তু ইঙ্গ-সোভিয়েত-মার্কিণ সহযোগিতাকে সুরক্ষিত করার জন্য, শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বসম্মত যৌথ কর্মপদ্ধতি গ্রহণ তাকে প্রয়োগ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে, এবং বৃটেনের ইতস্তত: মনোভাবের জন্যে ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি সম্পাদনা ত্বরান্বিত করার আগ্রহে, সোভিয়েত সরকার উনিশ শ' বিয়াল্লিশের এপ্রিলে প্রস্তাব করে পাঠালেন যে তাঁরা তাঁদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে আলাপ আলোচনার জন্যে লণ্ডনে পাঠাতে উৎসুক। সেই প্রস্তাবে গৃহীত হলো, শুধু তাই নয় পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সফরসূচীর মধ্যে ওয়াশিংটন যাত্রাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। মে মাসের সেই বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সেই বছরেই ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা। কিন্তু আলোচনা বাধা পেয়ে আটকে গেল। ইঙ্গ মার্কিণ সরকার নানারকম চেষ্টা করে যুক্তিতর্ক দিয়ে আপততঃ দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার কাজটি স্থগিত রাখার জন্য মতামত প্রকাশ করলেন। তাঁদের এই ধারণার কারণ ছিল সম্ভবত সেই মনোবৃত্তি যে মিত্র স্থানীয় কোন দেশের শক্তিবৃদ্ধি হলো বিপজ্জনক। এই মিত্রের শক্তিবৃদ্ধিতে তাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে এবং যদি তা সত্বেও সেই দেশ কোন মতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তাহলে এমনই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে তাকে দুর্বল করে দেওয়া যায়। র‍্যালফ ইঙ্গারসোল নামে জনৈক মার্কিণ সাংবাদিক লিখেছিলেন যে "রুশদের সম্পর্কে শতকরা ক্ষয়ক্ষতির হিসাব কষে এটাই স্থির করা হয়েছিল যে, রুশরা যতো দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ করে যাবে, যুদ্ধের শেষে তারা ততোই বেশিদিন দুর্বল হয়ে থাকবে।"[৩০]

এপ্রিল উনিশ শ' বিয়াল্লিশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারী হপ্‌কিন্স ও জেনারেল মার্শাল এবং বৃটিশ সরকারী মুখপাত্র ও সামরিক প্রতিনিধিরা মোটামুটি এই রকম সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছিলেন যে আপাততঃ উত্তর ফ্রান্স আক্রমণ করা হবে না। অন্ততঃ যতোক্ষণ না রুশ সীমান্তে যুদ্ধের অবস্থা দারুণ সংকটপূর্ণ হয়ে না ওঠে অথবা পশ্চিম ইউরোপে জার্মাণীর অবস্থা রীতিমতো বিপজ্জনক না হয়।[৩১]

অল্পকালের মধ্যেই এই সমঝোওতার পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায় চার্চিল ও রুজভেল্টের মধ্যে এক তারবার্তা বিনিময়ের মধ্যে, যেখানে মত বিনিময় করে তাঁরা তাঁদের সামরিক শক্তি "সংরক্ষিত" রাখতে সম্মত হচ্ছেন। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁর সহকারীদের কাছে তাই দেখা যায় ইঙ্গ-মার্কিন সামরিক শক্তিকে ফুটবল ম্যাচে যারা বেঞ্চি গরম করে বসে থেকে হাত পা ছোঁড়ে, তাদের সঙ্গে তুলনা করছেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, "খেলা যখন আরো খানিকটা এগিয়ে যাবে, যখন আমাদের প্রতিরোধকারীরা বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখনই শেষ খেলার জন্যে আমরা মাঠে নামবো। তখন আমরা থাকবো বেশ সজীব।"[৩২]

মার্কিণ ও বৃটিশ নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানালেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার মতো শক্তি সঞ্চয় তাঁরা তখনো করে উঠতে পারেননি। কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা গাম্ভীর্যের সঙ্গে সেই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে উনিশ শ' বিয়াল্লিশেই দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলা হবে ইউরোপে। সেই প্রতিশ্রুতির লিপিতে কোন বাগাড়ম্বর ছিল না। শুধু তাই নয়, দশই জুন, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে স্মারক লিপি দেন তাতে স্পষ্ট করে সংখ্যা দিয়ে বলা হয়েছিল যে সেই অবতরণে দশ লক্ষেরও বেশি ইঙ্গ-মার্কিণ অফিসার ও সৈন্য অংশ গ্রহণ করবে। স্মারক লিপিতে অবশ্য বলা হয়েছিল যে পরিস্থিতির উপর অনেকখানি নির্ভর করছে কার্যক্রম। কিন্তু "যদি তা অনুকূল ও উপযুক্ত বলে মনে হয়, তাহলে আমরা আমাদের কার্যক্রম অনুযায়ী কাজ করতে ইতস্ততঃ করবো না।"[৩৩]

ছাব্বিশে মে উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, ইউরোপে হিটলার জার্মাণী ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে মৈত্রী এবং যুদ্ধোত্তরকালে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো লণ্ডনে। হিটলার বিরোধী মৈত্রী গঠনে সোভিয়েতের নিরন্তর আন্তরিক প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করে

আনলো এই চুক্তি যাতে দুই দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ককে চিরস্থায়ী করার সমস্ত প্রচেষ্টার প্রতিশ্রুতি রইলো। দুই দেশের নিরাপত্তার যৌথ স্বার্থ সুরক্ষিত হলো এই চুক্তির মাধ্যমে, যা পরবর্তী ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েত চুক্তির সঙ্গে একযোগে ইউরোপের নিরাপত্তার বনিয়াদ গড়ে তুলেছিল। সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতির এটাই হলো আরেকটি নোতুন সাফল্য।

ইঙ্গ-সোভিয়েত চুক্তি দুই অংশে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশের বক্তব্য ছিল যুদ্ধ চলাকালীন উভয় সরকারের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত—যেমন পারস্পরিক সামরিক ও অন্যান্য সকল প্রকার সাহায্যদান, এককভাবে শত্রুর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগদানে অস্বীকৃতি এবং কোন যুদ্ধ বিরতি বা শান্তি চুক্তি সম্পাদনে অসম্মতি ইত্যাদি। চুক্তির অপর অংশে ছিল নোতুন কোন আক্রমণের সম্ভবনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠন এবং আগামী বিশ বছর ধরে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে কোন নোতুন আক্রমণের মুখোমুখি পারস্পরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি। চুক্তিতে জার্মাণী নোতুন কোন আক্রমণ করলে সামরিক বিষয় সমেত পারস্পরিক সাহায্যদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হলো। পুনরাক্রমণের ক্ষেত্রেও এই একই সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে। চুক্তি স্বাক্ষরকারীরা কোন রাজ্য অধিকার, অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন জোট বা মোর্চায় যোগদান না করার সিদ্ধান্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। তাছাড়া তাঁরা একে অন্যকে অর্থ-নৈতিক সাহায্য দান করতেও সম্মত হলেন।

কিন্তু তা সত্বেও বৃটিশ সরকার জেদ করতে লাগলেন যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, স্বাক্ষরকারীরা যাতে চুক্তির অন্তর্গত প্রতিশ্রুতি পালনের দায় থেকে পারস্পরিক সম্মতিতে অব্যাহতি পায়, তার জন্যে অব্যাহতির ব্যবস্থা এতে সংরক্ষিত করতে হবে। অর্থাৎ চুক্তি তখন অপ্রয়োজনবোধে বাতিল হয়ে যাবে। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই, বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বেভিন এই সংরক্ষিত ধারার সুযোগ গ্রহণ করলেন উনিশ শ' ছেচল্লিশ সালে। চুক্তির অন্তর্গত প্রতিশ্রুতির দায় পালন করতে অস্বীকার করে তিনি চুক্তির পারস্পরিক সম্মতিতে সমস্ত কাজ করার সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করলেন। এক ঘোষণায় তিনি জানালেন যে সম্মিলিত জাতি সংঘের

বিষয়গুলি ছাড়া বৃটেন এই চুক্তির অন্তর্গত অন্য কোন প্রতিশ্রুতি পালন করতে অসম্মত।

পররাজ্য আক্রমণ জনিত যুদ্ধের বিরুদ্ধে পারস্পরিক সাহায্যদানের নীতির ভিত্তিতে, এগারোই জুন, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ওয়াশিংটনে একটি সোভিয়েত-মার্কিণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দ্রব্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থ জড়িত বিষয়ে অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল এই চুক্তির লক্ষ্য। অর্থাৎ চুক্তির ধারা অনুযায়ী ঋণ সাহায্য আইনের অন্তর্গত দ্রব্যাদি মার্কিণ দেশ থেকে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নে যেতে পারে তারই ব্যবস্থা হলো এতে। এই চুক্তির বয়ান, তেইশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' বিয়াল্লিশে যে ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তারই অনুরূপ হলো। দুটি চুক্তির বয়ান এক হলেও, তাদের তাৎপর্যে আশমান-জমীন ফারাক ছিল। মার্কিণ দেশের শাসকগোষ্ঠির কাছে ঋণ সাহায্য ব্যবস্থা ছিল তার স্বার্থের সম্প্রসারণের হাতিয়ার বিশেষ, যাতে করে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের উপর অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক প্রভুত্ব কায়েম করা যায়, পররাজ্যে দখল করা যায় গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। কিন্তু সোভিয়েত মার্কিণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার কোন অবকাশ ছিল না। কারণ সোভিয়েত সরকার মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের সমস্ত সম্প্রসারণ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে দেশের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অধিকার বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কিন্তু এসব সত্বেও স্বীকার করতে হবে যে সোভিয়েত-মার্কিণ চুক্তি সম্পাদনের ঘটনাটিই নিঃসন্দেহে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির আরেকটি সাফল্যের নির্দেশক হয়ে রইলো। এই চুক্তি ব্যর্থ করে দিল আমেরিকার চরম প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠির সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্রব্যাদি সরবরাহে বিরোধিতা করার নীতিকে। তাছাড়া এই চুক্তি পরোক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে স্বীকার করতে বাধ্য করলো যে সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনই হলো এই যুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

সোভিয়েতের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে হিটলার বিরোধী মোর্চা একটা পরিণত রূপ লাভ করলো। সেই আঘাতে নাৎসী কূটনীতি পিছু হটে যেতে বাধ্য হলো। আর ব্যর্থ হয়ে গেল ইঙ্গ-মাকিন প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত।

কিন্তু মোটামুটি মার্কিণ ও বৃটেনের শাসকগোষ্ঠি হিটলার বিরোধী মোর্চাকে স্বাগত জানালেন। তখন তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী, বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারে

পাল্টা দাবিদার, জার্মাণী ও জাপানকে যেন তেন প্রকারেণ, যে কোনো মোর্চা, সংগঠনের সাহায্যে, পরাস্ত করা ছাড়া অন্য কিছুই তাঁরা চিন্তা করতে পারছিলেন না। তাঁরা ভেবেছিলেন এতে ইউরোপ ও অন্য জায়গায় তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন থাকবে। সোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের সুযোগ নিয়ে তাঁরা সারা বিশ্বে তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট রাখতে পারবেন এবং সম্প্রসারণের নীতি সুযোগ সুবিধা মতো কাজে লাগাতে পারবেন।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমস্ত প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে হিটলার বিরোধী মোর্চার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কারণ ফ্যাশিশক্তির বিরুদ্ধে দ্রুত চূড়ান্ত জয়লাভ এর মাধ্যমেই সম্ভব।

অন্যদিকে এই মোর্চার বাস্তবতাই নির্দেশ করলো সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী চূড়ান্তের ব্যর্থতা যারা চেয়েছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কোণঠাসা করে রাখতে। কিন্তু কোণঠাসা হয়ে একক নিঃসঙ্গ হওয়া দূরে থাক, এর মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন শক্তিশালী ফ্যাশি বিরোধী শক্তিজোটে গ্রহণ করলো নেতৃত্বের ভূমিকা, সম্প্রসারণ করলো তার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বরং দেখা গেল যে পররাজ্যলোলুপ ফ্যাশিস্ত হানাদাররাই একঘরে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে।

মার্কিন দেশ ও বৃটেনের চরমপন্থীদের কাছেও এই মৈত্রী ব্যর্থতা বহন করে আনলো। সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার শক্তির ছলা কলার সুযোগ গেল দারুণ কমে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকশ্রেণীর মধ্যে যারা ছিল সোভিয়েত বিরোধী, সরাসরি, খোলাখুলি তারা আর তাদের কাজ করতে পারলো না। বরং সেই সব দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণী সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানাবার সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং সোভিয়েত রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্যে তৎপর হয়ে উঠলেন। ফ্যাশিস্ত বিরোধী মৈত্রী আমেরিকা ও বৃটেনের শ্রমিক শ্রেণীকে, তাঁদের নিজের দেশের সরকারের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করলো। সোভিয়েত ও ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার অন্তর্ভুক্ত পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিস্তৃত হয়ে পড়লো। সোভিয়েত সমাজের নানা সংগঠন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে, বিদেশে শ্রমিক শ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংস্থার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো।

শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের গণআন্দোলনের জোয়ারে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মধ্যে আপোষ মীমাংসা হয়ে গেল। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের প্রস্তাব ক্রমে, উনিশ শ' একচল্লিশের অক্টোবরে, একটা ইঙ্গ-সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হলো। হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে দ্রুত ও চূড়ান্ত জয়লাভ এবং অধিকৃত দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সম্প্রসারিত ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যে, সোভিয়েত দেশ ও বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়নের কাজের ধারায় সামঞ্জস্য বিধান করাই ছিল এর মৌল উদ্দেশ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মেহনতী মানুষ এর পর থেকে নিজেদের দেশে দ্বিগুণ উদ্দীপনা, উৎসাহ নিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্যে সংগ্রাম করতে থাকে। ফলে মার্কিন ও বৃটিশ সরকার নিজের দেশের ফ্যাশিপন্থী প্রতিষ্ঠান-গুলির কাজের উপর ক্রমেই নানা বিধিনিষেধ আরোপ করতে থাকেন।

ফ্যাশি-বিরোধিতা স্পষ্টই প্রতীয়মান করলো যে সমাজব্যবস্থার বিভিন্নতা সত্বেও বিভিন্ন দেশ পরস্পর সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সহযোগিতা করতে পারে। সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য সত্বেও বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্ভব, এই লেনিনবাদী তত্বের আলোয় পথ নির্দেশ পেয়ে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি যুদ্ধের নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তার যথার্থতা প্রমাণ করলো। তাই যে মৈত্রী স্থাপিত হলো তার সৌধ গড়ে উঠলো সার্বভৌম রাষ্ট্রিক সাম্যের নীতি, সমান অধিকার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে।

১. একটি জার্মাণ ভাসায় রচিত গ্রন্থ. পৃঃ ৫৩
২. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, ১৯৫৮, পৃঃ ২৫
৩. ডি. মেণ্ডেলশোন : জার্মাণ ভাষায় রচিত দলিলের সংকলন, পৃঃ ৪০
৪. জার্মাণ গ্রন্থ, জুরিখে প্রকাশিত ১৯ ৩, পৃঃ ৪৮
৫. কমিউনিষ্ট পত্রিকা, ১৭ সংখ্যা, ১৯৫৬, পৃঃ ৩৪
৬. এইচ্, গুদেরিয়ান : Reminiscences of a Soldier, পৃঃ ২২৩
৭. Ciano's Diplomatic Papers, লণ্ডন ১৯৪৮, পৃঃ ৪৪৫
৮. টিপ্পলস্কার্চ : Histocy of the Second World War, পৃঃ ২০০
৯. ঐ, পৃঃ ২০১

১০. ঐ, পৃঃ ৭৯
১১. ঐ, পৃঃ ২০৬
১২. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩১২
১৩. The Ciano Diaries, 1939- 943, পৃঃ ৪২৬
১৪. ওমার এন, ব্রাড্লী : A soldier's story নিউ ইয়র্ক ১৯৫১, পৃঃ ১৮৬
১৫. আর্ভিড ফ্রেডবোর্গ : Behind the Steel Wall, লণ্ডন ১৯৪৪, পৃঃ ৬০
১৬. ফুলার : The Second World War, পৃঃ ১২৬
১৭. The Goebbels Diaries, লণ্ডন ১৯৪৮, পৃঃ ১৪১
১৮. প্রাভ্দা, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮
১৯. বগদান ফিলো রচিত একটি বুলগেরীয় ভাষায় গ্রন্থ ১৭৪২, পৃঃ ২৭
২০. পোলিশ ভাষায় রচিত একটি পুস্তক, পৃঃ ২৪
২১. ঐ, পৃঃ ২১
২২. জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ পৃঃ ৬৩
২৩. Soviet Foreign Policy, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৯২
২৪. প্রাভ্দা ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৪২
২৫. ঐ
২৬. ঐ, পৃঃ ১৭৭
২৭. হ্যারী পলিট : "The Communist Party and the Fight for Unity," Labour Monthly, ১ম সংখ্যা, ১৯৪২, পৃঃ ১৫
২৮. হেরম্যান রাউশনিংয়ের একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৪-৯৫
২৯. লিডেল হার্ট : Defence of Europe, পৃঃ ৬৫
৩০. র‍্যাল্ফ্ ইঙ্গারসোল : Top Secret, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬, পৃঃ ৬৭
৩১. হেনরী এল, স্টিমসন ও ম্যাকজর্জ বান্ডি : On Active service in Peace and War, নিউ ইয়র্ক, হার্পার ১৯৪৮ পৃঃ ৪১৮-১৯,৪২৩
৩২, ইলিয়ট রুজভেল্টের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৫
৩৩, চার্চিল : The Second World War, চতুর্থ খণ্ড, লণ্ডন ১৯৫১ পৃঃ ৩০৫

নবম অধ্যায়

প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সূচনা

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছিল সাম্রাজ্য-বাদের প্রায় সূচনাপর্ব থেকে। সেই স্বার্থের সংঘাত কোনদিনই প্রশমিত হয় নি, বরং তা বাড়তে থাকে বিশেষ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে যারা মনে করতো নিজেদের একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তারের সবচেয়ে প্রশস্ত, অনুকূল ক্ষেত্র।

"আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, বিরোধের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, জাপান ও আমেরিকার মধ্যে," লিখেছিলেন লেনিন "কারণ তারা দুজনেই আপ্রাণ সংগ্রাম করতে প্রস্তুত প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভুত্ব বিস্তার করতে, তার উপকূলকে নিজেদের অধিকারে আনতে। প্রশান্ত মহাসাগর ও তার নানা কূল উপকূলের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলেই এই রকম প্রচুর, সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় যে জাপান ও আমেরিকার বিরোধের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা একদিন তাদের মধ্যে যুদ্ধকে অনিবার্য করে তুলবে।"[১]

জাপান, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী, পররাজ্যলোলুপ স্বার্থের পারস্পরিক প্রতিযোগিতা সংঘাত, দূর প্রাচ্যকে যুদ্ধের মুখে ঠেলে না দিয়ে পারে না।

কথাটা স্ববিরোধী শোনালেও সত্যি যে সাম্রাজ্যিক স্বার্থের তীব্র দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকশ্রেণী, দূর প্রাচ্যে জাপানী আক্রমণে সাহায্য জুগিয়েছে, সমর্থন করেছে, প্ররোচনা দিয়েছে। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে জাপান তার শক্তি প্রয়োগ করবে।

জাপান নিজের স্বার্থে, এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করেনি। সে মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করেছে এবং উনিশ শ' সাইত্রিশে চীনের অন্যান্য অঞ্চলে

অধিকার বিস্তারে সচেষ্ট হয়ে, তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রভাব প্রতিপত্তিতে আঘাত হেনেছে। কিন্তু মার্কিন বৃটিশ ও সরকার নিরাশ হননি, তখনো প্রত্যাশা করেছেন যে শেষ পর্যন্ত জাপানী আক্রমণের গতি তাঁদের ঈপ্সীত পথেই পরিচালিত হবে।

ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ট্রিট্ জাপানের চীন আক্রমণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে অন্যান্য দেশের এই কাজের জন্যে জাপানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। বিখ্যাত মার্কিণ প্রকাশন ব্যবসায়ী হার্ষ্ট, উনিশ শ' পঁয়ত্রিশে বলেন যে, দূর প্রাচ্যে শান্তি ও ভারসাম্য রক্ষার অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে, জাপানের পক্ষে চীন অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ করাটা নিতান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত ঘটনা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জাপানী আক্রমণকে সম্ভব করে তোলার জন্যে বৃটেন বিশেষ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণী, জাপানের আচরণকে কেবল সহনীয় করে তুললেন না, তাকে একটা শুভ সূচনা বলে মনে করতে লাগলেন। ফিলিপাইনে মার্কিণ সেনাবাহিনীর একজন বড়ো অধিনায়ক, জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার বলেছিলেন, হিটলারের নেদারল্যাণ্ড অভিযান ও ফ্রান্সের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের পরেই, জাপানের পক্ষে অভিযান সুরু করার সুযোগ এসেছিল। সেই সময়ে জাপান যদি দক্ষিণ দিকে তার অভিযান চালাতো তিনি একথাও বলেছিলেন, তাহলে অনেক সহজে, অনেক কম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে সে জয়ী হতে পারতো।[২]

ঘটনার একটা বাস্তবসম্মত বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় যে উনিশ শ' চল্লিশে, তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে জাপান তখন কোন অভিযান সুরুতে চায়নি। সোভিয়েতের শান্তি নীতি, সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার শক্তিই, জাপানী আক্রমণকারীদের স্বেচ্ছাচার সীমিত রাখতে বাধ্য করেছিল। তখন আক্রমণ সুরু না করে, চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া তার গত্যন্তর ছিল না। অন্ততঃ যতোক্ষণ পর্যন্ত না জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করছে।

জাপানের আক্রমণ সুরু করার বিরুদ্ধে আরেকটি কারণ ছিল চীনের মানুষের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম, যার জন্যে জাপানের সামরিক শক্তির বেশ একটা বড়ো অংশ সেখানে আটকে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। মার্কিণ

সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক, চিয়াং কাই-শেকের সে তত্ত্ব অজানা ছিল না। জাপান যদি তার আক্রমণের ধারাকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে, তাহলে আত্মসমর্পণ করতেও তাঁর অনিচ্ছা ছিল না। উনিশ শ' একচল্লিশের জানুয়ারীতে, আশী হাজার কুওমিনটাং বেয়নেট নিয়ে, গণমুক্তি ফৌজের চতুর্থ রুট বাহিনীর বিরুদ্ধে চিয়াংয়ের বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ সেই সত্যকেই নির্দেশ করে।[৩] কিন্তু এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতায় জনচিত্ত এতোই বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, যে চিয়াংয়ের পক্ষে আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি করা শক্ত হয়ে পড়ে।

প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে মৌল স্বার্থের সংঘাতগুলির মধ্যে মোটামুটি একটা আপোষ রফা করে মীমাংসার চেষ্টা সুরু হয় উনিশ শ' একচল্লিশের জানুয়ারীতে। অবশ্য জাপান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এই আলোচনা বেসরকারী স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। এই বৈঠকে জাপানের প্রতিনিধিত্ব করেন কর্ণেল কিংগোরো হাসিমোতো। তিনি জাপানের ফ্যাশিবাদী ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির নেতা। মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে তার সুদীর্ঘ আলোচনা হয়। উনিশ শ' একচল্লিশের মার্চ মাসে উচ্চস্তরে পরবর্তী আলোচনার কূটনৈতিক প্রস্তুতিপর্ব সমাধা হয় এইখানে।

এখানে জাপানের প্রতিনিধি হলেন অ্যাডমিরাল নোমুরা। তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনে জাপানের রাষ্ট্রদূত। আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি হয়ে এলেন স্বয়ং পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল। একটা কঠোর গোপনীয়তার আড়ালে আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো।

যখন আলাপ আলোচনা আনুষ্ঠানিকভাবে সুরু হলো, ততোদিনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আসন্ন জার্মাণ অভিযানের ইংগিত পেয়ে গেছেন। স্বভাবতঃই জাপানকে সোভিয়েত আক্রমণের শরিক হতে উৎসাহিত করার জন্যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যতো দ্রুত সম্ভব তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কটাকে সুসামঞ্জস করে নিতে বদ্ধপরিকর ছিল। মার্কিণ দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ডেইলী ওয়ার্কার পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে এই ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা করেন।[৪]

জাপানী-মার্কিন চুক্তির একটা খসড়া হিসেবে, উনিশ শ' একচল্লিশের এপ্রিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাপানের বিচার বিবেচনার জন্যে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করলেন। মার্কিণ প্রস্তাবের মৌল বক্তব্য ছিল এই যে

জাপান চীন থেকে তার সমস্ত সৈন্য অপসারণ করবে, চীনকে গ্রাস করার নীতি পরিত্যাগ করে সেই দেশ সম্পর্কে "মুক্ত দুয়ার" (Open door policy) নীতি অনুসরণ করবে। প্রতিদানে মার্কিন সরকার চিয়াং কাই-শেক ও ওয়াং চিং-ওয়েই গোষ্ঠীদ্বয়ের শাসনের মধ্যে ঐক্য সংহতি স্থাপনে সচেষ্ট হবেন এবং মাঞ্চুকুওর উপরে জাপানের দাবী স্বীকার করে নেবেন। আসলে এই প্রস্তাবে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার না করেই চীনকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার নীতি উপস্থিত করা হয়েছিল।

নিজের দাবী দাওয়া জোরালো করার জন্যে জাপানী সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর সোভিয়েত-বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খাকে কাজে লাগাতে উদ্যত হলেন। তাই জাপানের পাল্টা প্রস্তাবের শিরোনাম লেখা হলো, "সাম্যবাদকে রুখবার জন্যে যৌথনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাব।" জাপানা জানালো যে সে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা চুক্তিস্বাক্ষর করতে সম্মত আছে যদি, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ব্যবহারে তার অবাধ অধিকার স্বীকৃত হয়, মার্কিণ দেশ তাকে ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্য করে, ফিলিপাইনের "নিরপেক্ষীকরণে" মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্মতি দেয়, মাঞ্চুকুওয় তার অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে নেয়, এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চিয়াং কাই-শেককে সাহায্য সমর্থন করা থেকে বিরত থাকে।

জাপানীরা মার্কিণ শাসকগোষ্ঠীর সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে চীন বিজয় সম্পূর্ণ করার মতলবে ছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্যপুষ্ট হয়ে তারা নিজেদের সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধি করবে এবং পরে তাকেই যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তাই নিজের তরফ থেকে জাপান এই ধরণের "প্রতিশ্রুতি" দিতে খুবই রাজী ছিল যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া বা দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সে কোন সশস্ত্র অভিযান চালাবে না এবং ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ থেকে উত্তরে সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে আনবে।

বারোই মে তারিখে জাপানের প্রস্তাব মার্কিণ সরকারের কাছে পেশ করা হলো। ষোলই মে পররাষ্ট্র সচিব হাল জাপানীদের জানালেন যে তাদের প্রস্তাব "কিছু রদবদল করে" মোটামুটি গ্রহণযোগ্য, আর সেগুলি হলো যেমন: চীনের উপর জাপানের একচেটিয়া অধিকার রাখা যাবে না, অন্যান্য স্বার্থের

উপর সেখানে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। আমেরিকার জবাবে চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে জাপানী সৈন্য অপসারণের কোন দাবী করা হলো না। বরং খানিকটা অসুবিধাজনক নিজের স্বার্থের দিক থেকে হলেও, মার্কিণ সরকার চীনের মূল ভূখণ্ডে মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাকে অবদমিত করার জন্যে জাপানী দখলদারী সৈন্যের অবস্থিতি অনুমোদন করে গেলেন। এমন কি হাল একথাও ইংগিতে জানিয়ে দিলেন যে এই বিষয়ে চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতেও তাঁরা প্রস্তুত।

ফলতঃ যা দাঁড়ালো তা হলো "দূর প্রাচ্যে আরেকটি মিউনিক" নীতির কাঠামো রচনা, যার সর্তাবলী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সংঘাতে জন্মলাভ করছিল। দুই দেশের শাসক শ্রেণী সব ন্যায় নীতির বালাই জলাঞ্জলি দিয়ে, কখনো চোখ রাঙিয়ে, কখনো চাপ সৃষ্টি করে, কখনো বা একেবারে ধাপ্পা দিয়ে নিজেদের স্বার্থের সম্প্রসারণের জন্যে দর কষাকষির টানা পোড়েন করছিলেন।

চীনের কমিউনিষ্টদের কাছে এই যোগ সাজসের স্বরূপটা ধরা পড়তে বেশি দেরী হয়নি। তারা চীনের জনগণকে তাই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। উনিশ শ' একচল্লিশের মে মাসে কেন্দ্রিয় কমিটির এক নির্দেশনামায় তাই বলা হয়েছিল:

"চীনের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাম্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম সুরু করার জন্যে জাপান, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও চিয়াং কাই-শেক একটা চক্রান্ত করছে যার ভিত্তি হলো জাপান ও আমেরিকার মধ্যে বোঝাপাড়ার মাধ্যমে একটা "প্রাচ্য মিউনিকের" পথ প্রশস্ত করা। আমাদের এই চক্রান্তের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে এর বিরুদ্ধে।"

সেই নির্দেশনামায় স্পষ্টতই বলা হলো যে চীনের জনগণ তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কোন পরিকল্পনা, কোন জাপ-মার্কিন বোঝাপড়াকে স্বীকার করবে না। তারা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ অব্যাহত রাখবে।

হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের প্রাক্কালে, একুশে জুন উনিশ শ' একচল্লিশে, মার্কিণ সরকার জাপানীদের সরকারী ভাবে তাদের প্রস্তাবের উপর মতামত জানিয়ে দিলেন। চীনও দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে

জাপানের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার দাবীতে তাঁরা আপত্তি জানালেন। ভবিষ্যতে কোন একদিন চীনের মূলভূখণ্ড থেকে জাপানী সৈন্য অপসারণের দাবীও জানানো হলো, যদিও তার ছিল অনেকটা ইতস্ততঃ ভাব। জাপান ও চীনের মধ্যে শান্তির শর্তাবলী রচনার কাজে মার্কিণ সরকার অংশ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বললেন যে অবশ্য এই শর্তটা এমন কিছু চরম নয়। "সাম্যবাদ বিরোধী নীতি উদ্ভাবনে যৌথ ভূমিকার" উপর গুরুত্ব আরোপ করে সে সম্পর্কে আরো আলাপ আলোচনার জন্যে তাঁরা সম্মতি জানিয়ে রাখলেন। আর সেই সঙ্গে চীনে জাপানী সৈন্যের অবস্থিতি ও মাঞ্চুকুওয়ে জাপানের অধিকারে স্বীকৃতি জানানোর বিষয়গুলিতেও আলোচনার পথ খোলা রাখা হলো।[৫]

কিন্তু এই দুই দেশ পরস্পরকে কিছু সুযোগ সুবিধা দিতে আপাতত সম্মত হলেও তাদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্ব চূড়ান্ত পর্যায়ে কোন বোঝাপড়ায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করলো।

তাই দেখা গেল রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, সতেরই আগষ্ট জাপ রাষ্ট্রদূতের কাছে এক মৌখিক বিবৃতিতে বলছেন যে, "প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি শক্তি প্রয়োগ করে অথবা শক্তি প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে, জাপ সরকার যদি সামরিক প্রভুত্ব বিস্তারের নীতি বা কার্যক্রম অনুযায়ী, কোন কাজ করেন তাহলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারও প্রয়োজনমতো, নিজের বিচার বিবেচনা মতো যে কোন নীতি বা কার্যক্রম তখনই গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারেন।"[৬]

প্রস্তাবিত জাপ-মার্কিণ চুক্তি আমেরিকার জনগনের ক্রমবর্দ্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে পড়লো। সমস্ত ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারী হানাদার ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে মানুষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব গ্রহণের দাবী করতে লাগলো। তারই সঙ্গে সোভিয়েত-জার্মাণ সীমান্তের ঘটনাবলীও এই চুক্তির বিরুদ্ধে গেল রীতিমতো। দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েতের সামরিক শক্তি সম্পর্কে অবহিত বলে এবং জার্মাণীকে সরাসরি সামরিক সাহায্য দান করলে পাছে তার নিজস্ব শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তাই জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা এই দুয়ের একটিও না করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অধিকৃত অঞ্চল ও অগ্রবর্তী সামরিক ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করাটাই বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করলো।

জাপানের শাসকশ্রেণী প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার

তাদের সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বীদের দূর করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য যুদ্ধে নিজেদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি যতদূর সম্ভব বৃদ্ধি করার জন্যে এই অঞ্চলের সমস্ত সম্পদ ব্যবহার করার আশা ছিল তাদের প্রচুর। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যখন জার্মাণীর সঙ্গে সংগ্রামে রত তখন সেই জায়গার সমস্যাকে উপেক্ষা করে এই অঞ্চলে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্যে তারা বিশেষ কিছু করতে পারবে না, জাপানের এটাই ছিল মূল আশা। সঙ্গে সঙ্গে তার শাসক শ্রেণী এটাও চিন্তা করেছিলেন যে তীব্র সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবের জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও বৃটেনের শাসক-শ্রেণী শেষ পর্যন্ত হয়তো জাপানের সঙ্গে কোন একটা বোঝাপড়া করতে সম্মত হবেন।

ছয়ই সেপ্টম্বর, জাপ সম্রাটের উপস্থিতিতে একটা উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যে জাপানী সরকার একটা কার্যক্রম গ্রহণ করলেন। তার নাম দেওয়া হলো জাতীয় সাম্রাজ্যনীতির মৌল বনিয়াদ। এর তিন সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছিল :

"অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আমাদের দাবীগুলি গৃহীত হওয়ার কোন সম্ভবনা যদি দেখা না যায়, তাহলে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে কাল বিলম্ব না করে যুদ্ধ সুরু করে দিতে হবে।"[৭]

পরবর্তী আরেক বৈঠকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আক্রমণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেদিনটা ছিল পাঁচই নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশ। দফাওয়ারী সেই সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল :

এক : ডিসেম্বরের সুরুতেই সামরিক অভিযান সুরু করতে হবে। স্থল ও নৌবাহিনী অভিযানের সমস্ত প্রস্তুতি সমাধা করে রাখবে। দুই : পরিকল্পনা অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। তিন : জার্মাণী ও ইটালীর সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে। চার : অভিযান সুরু করার পূর্বাহ্নেই শ্যামদেশের সঙ্গে গোপন সামরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।[৮]

পাঁচই নভেম্বরের সিদ্ধান্তে দেখা গেল নোতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলা হচ্ছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। তার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিণ সরকারকে অসতর্ক করে রাখা, তার সজাগ দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত

করে দেওয়া যাতে জাপানী আক্রমণ অপ্রত্যাশিত ও অতর্কিত হয়ে উঠতে পারে। আলাপ আলোচনায় একটি আন্তরিক আগ্রহের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যে, অ্যাডমিরাল নোমুরার সাহায্যার্থে জাপানী কূটনীতিবিদ সাবুরো কুরুসুকে মার্কিণ দেশে পাঠানো হলো। পাঁচই নভেম্বর তারিখেই তিনি টোকিয়ো ছেড়ে গেলেন, যেদিনটিতে জাপানের শাসকরা প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাপাণের সর্বোচ্চ সমর পরিষদ যথাযথ "নৌ ও স্থলবাহিনী অধিনায়কদের নিজ নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে একযোগে আক্রমণ শুরু করার প্রস্তুতির জন্যে" আদেশ জারী করলেন।[৯] জাপানের উচ্চ পর্যায়ের এক নৌ সেনাপতির আদেশে বলা হলো যে, "মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও নেদারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।"[১০] বিভিন্ন নৌ ঘাঁটির সেনাপতিদের উদ্দেশ্যে শীল করা গোপন আদেশনামায় বলা হলো, "কোথায় কোথায় তাদের আক্রমণ করতে হবে, বিশেষ করে পার্ল হারবার, ফিলিপাইন ও হংকংয়ে। আক্রমণের দিনও স্থির করা হয়ে গেছে।"[১১]

কোয়ানতুং সৈন্যবাহিনীর সংবাদপত্র, মাঞ্চুরিয়া ডেইলী নিউজে, ছয়ই নভেম্বরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়েছিল যে, সাম্প্রতিক জাপ-আমেরিকান আলাপ আলোচনা দেখে উনিশ শ' চার সালের সংঘর্ষের ঠিক আগের সপ্তাহে রুশ জাপান আলোচনার চূড়ান্ত স্তরের কথা মনে পড়ে।

কুরুসু ও নোমুরার মাধ্যমে জাপান সরকার, বিশে নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে, মার্কিণ সরকারের কাছে তাঁদের নোতুন এক দফা প্রস্তাব পেশ করলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যেন চীন-জাপান সম্পর্কের ক্ষেত্রে মাথা গলাতে না আসে এবং সে যেন ইন্দোনেশিয়ার উৎপাদিত দ্রব্য ও সম্পদের যৌথ জাপ-আমেরিকান ব্যবহারে সম্মত হয়। তাতে জাপ-আমেরিকান বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃ স্থাপনের দাবী জানিয়ে বলা হয় যে জাপান মার্কিণ দেশ থেকে তার "প্রয়োজনীয় তৈল" সংগ্রহ করতে চায়। দুই পক্ষ এই প্রস্তাবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিতে সম্মত, একথা বলা হয়। "প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে একটা ন্যায়সঙ্গত, যথাযথ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে," জাপান যে ইন্দোচীন থেকে তার সৈন্য অপসারিত করে নিতে সম্মত, প্রস্তাবে তারও উল্লেখ করা হয়। আর যতোদিন না

সেই রকম শান্তি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততোদিন জাপান ফরাসী ইন্দোচীনের দক্ষিণাংশ থেকে উত্তরে সৈন্য দল সরিয়ে নিতে প্রস্তুত বলে জানানো হয়।[১২]

কিন্তু ততোদিনে সোভিয়েত জার্মাণ যুদ্ধ পুরোদমে চলতে থাকায়, জাপানী পররাজ্যলোভী হানাদারদের শুধু সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবের জন্যে মার্কিণ সরকার এতোটা মূল্য দিতে আর প্রস্তুত ছিলেন না। তাই ছাব্বিশে নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে, "সমস্ত জটিল সমস্যাগুলির সাধারণ সমাধানের" জন্যে মার্কিণ সরকার এক প্রস্তাব পাঠালেন। দু'ভাগে এই পরিকল্পনা বিভক্ত ছিল। প্রথমাংশে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ-আমেরিকান যৌথ নীতির মৌল ভিত্তি সম্পর্কে একটা ঘোষণার খসড়া ছিল। দ্বিতীয়াংশে নানা বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রস্তাব ছিল যেমন বহুপক্ষীয় অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন, চীন ও ইন্দোচীন হতে জাপ সৈন্যের অপসারণ, চীনের একমাত্র আইন সম্মত শাসন ব্যবস্থা হিসেবে চিয়াংকাই শেক সরকারকে স্বীকৃতি দান, দুই দেশের মধ্যে ঘনিষ্ট বাণিজ্য সম্পর্ক গঠনের চুক্তি সম্পাদন এবং ডলার ও ইয়েনের বিনিময়ের হার স্থিরকরণ।[১৩]

আমেরিকার নোতুন প্রস্তাব দেখে জাপানী শাসকরা নিঃসন্দেহ হলেন যে জাপানের যুদ্ধবাদী মনোভাব ও প্রস্তুতির আভাস মার্কিণ সরকার পাননি। এদিকে জাপানে তখন জনমতকে যুদ্ধের অনুকূলে গড়ে তোলা হচ্ছিল। উনত্রিশে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী তোজো এক প্রবন্ধে বল্লেন যে পূর্ব এশিয়া থেকে সমস্ত কিছু "বিদায় করে তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।"[১৪] প্রবন্ধের বক্তব্য মার্কিণ দেশে আশংকা সৃষ্টি করেছে দেখে দোসরা ডিসেম্বর অ্যাডমিরাল নোমুরা সংবাদপত্রে এক সাক্ষাৎকারে ওয়াশিংটন থেকে ঘোষণা করলেন যে, কেউ যুদ্ধ চায় একথা তিনি বিশ্বাসই করতে পারেন না।

পঁচিশে নভেম্বর জাপানের পার্ল-হারবার আক্রমণকারী নৌবাহিনীক যাত্রা সুরু করার আদেশ দেওয়া হলো। তাদের বিশেষ করে নির্দেশ দেওয়া হলো যে গোপনে তারা হাওয়াই দ্বীপের কাছে যাবে এবং যে মুহূর্তে আক্রমণের আদেশ আসবে, যুদ্ধঘোষণা করা হবে সেই মুহূর্তেই হাওয়াইয়ে মার্কিণ নৌ ঘাঁটিতে তারা যেন প্রচণ্ড আঘাত করে। আক্রমণ করে আঘাত করার পর তারা যেন হাওয়াই অঞ্চল পরিত্যাগ করে আবার জাপানে ফিরে আসে।[১৫]

উনিশ শ' একচল্লিশের পয়লা ডিসেম্বর জাপানী মন্ত্রীসভা সেই মাসের গোড়াতেই যুদ্ধ সুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরদিন নৌবহরকে পার্ল হারবার আক্রমণ করার আদেশ দেওয়া হলো।

জাপানের গোপনীয়তা রক্ষার এই ছলাকলা হয়তো ব্যর্থ হয়ে যেত। অক্টোবর উনিশ শ' একচল্লিশে মার্কিণ গুপ্তচর বিভাগ জাপানের সাংকেতিক লিপির চাবিকাঠি হাতে পেয়ে যায়। তার অনেক লিপিতেই তখন আসন্ন আক্রমণের কথা বলা হতো।

টোকিয়ো থেকে বার্লিনে জাপানী রাষ্ট্রদূতের কাছে প্রেরিত এক রেডিও-গ্রামে বলা হয়েছিল, "হিটলার রিবেনট্রপকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে জানাবেন যে অ্যাঙ্গলো স্যাক্সন জাতিগুলি ও জাপানের মধ্যে হঠাৎ যুদ্ধ সুরু হয়ে যাওয়ার চরম বিপজ্জনক সম্ভাবনা আছে এবং তা অনেকে যা আশা করেছেন, তার অনেক আগেই আসতে পারে।"[১৬] জার্মানী ও ইটালী যথাক্রমে এই দুই দেশের জাপানী রাষ্ট্রদূতের কাছ থেকে এ ধরণের খবর পেয়ে, জার্মাণ ও ইটালী সরকারের তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে বিশেষ সময় লাগলো না। ইটালীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী কাউন্ট সিয়ানো তাঁর রোজ নামচায় লিখেছেন: "জাপানের কার্যক্রম বিশেষ হতবুদ্ধিকর।"[১৭]

জাপানী রেডিওগ্রামের বার্তা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত, সংগৃহীত ও পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল মোটামুটি জাপান আক্রমণ সুরু করার তারিখও একটা ঠিক করে ফেলেছে। কুরুসু ও নোমুরার কাছে ওয়াশিংটনে একটা গোপন বার্তা এসে পৌঁছলো, বাইশে নভেম্বর তারিখে। তাতে নভেম্বর মাসের শেষের তারিখগুলিকে "চরম সীমারেখা যা 'কোনমতে বদলানো যাবে না বলা হয়েছিল।' এই তারিখের পর ঘটনাবলী আপনা আপনি যথারীতি ঘটে যাবে।"[১৮] তেসরা ডিসেম্বর তারিখে মার্কিণ গুপ্তচর বিভাগ, ওয়াশিংটন-স্থিত জাপানী রাষ্ট্রদূতাবাসে প্রেরিত এক আদেশনামা হস্তগত করে দেখলো যে তাতে সমস্ত গোপন দলিল, নথিপত্র ও সাংকেতিক ভাষার লিপি নষ্ট করে ফেলতে বলা হয়েছে। গুপ্তচর বিভাগের কর্মীরা রাষ্ট্রদূতাবাসের উপর নজর রেখে দেখলো যে, সেখানকার কর্মচারীরা রাষ্ট্রদূতাবাসের পিছনের দিকে কোথাও কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলেছে। ছয়ই ডিসেম্বর তারিখে আরেকটি রেডিওগ্রাম হস্তগত করে দেখা গেল যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জাপানী

সরকারের বিবৃতি যেমন করেই হোক সাতই ডিসেম্বর ওয়াশিংটনের সময় অনুযায়ী বেলা একটায় পৌঁছে দেওয়া হবে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের উপর এতোটা গুরুত্ব দেওয়ার কারণ কি হতে পারে। মার্কিণ নেতৃবৃন্দের সে কথাটা বিশেষভাবে বিচার করে দেখা দরকার ছিল।

পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল পরবর্তীকালে স্বীকার করেছেন যে "সমস্ত সময়েই তিনি এই সব গোপন বার্তার বয়ান অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করতেন, অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন।"[১৯]

"এই সময়ের মধ্যে", তিনি বলেন, "যে সব খবর আমরা পেয়েছিলাম, তাতে জাপানের আক্রমণ করার ইচ্ছা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।"[২০] মার্কিণ যুদ্ধ সচিব, হেনরী এল. ষ্টিমসন বলেন, "আমরা সবাই ভাবছিলাম আঘাতটা প্রথম কোনখানে আসবে।"[২০]

কিন্তু মার্কিণ সরকার বোধ হয় সেটাও জানতেন। সাতাশে জানুয়ারী উনিশ শ' একচল্লিশে, টোকিয়োস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত জোসেফ্ সি. গ্রু, ওয়াশিংটনে এক গোপন বিবরণীতে জানান যে, "এখানে শহরের পথে ঘাটে একটা কথা প্রায়ই শোনা যাচ্ছে যে জাপানীরা পার্ল হারবারের উপর অতর্কিতে একটা বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা করছে।"[২২] মার্কিণ সরকারকে আরো জানান হয় যে জাপানী ও জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগে পার্ল হারবার সম্পর্কে নানা রকম খবর সংগ্রহ করছে। জাপানী "মেছোরা" হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে নানা ছবি তুলছে, সমুদ্রের গভীরতা মেপে আনছে এবং আরো নানা খবর সংগ্রহ করছে।

উনিশ শ' একচল্লিশের নয়ই এবং চৌদ্দই এপ্রিল তারিখে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে দু'জন উচ্চপদস্থ মার্কিণ সরকারী কর্মচারী জেনারেল মার্শালের কাছে এক বিবরণী পেশ করেন। তাতে সম্ভাব্য জাপানী আক্রমণের প্রায় সঠিক এক বিশ্লেষণ উপস্থিত করে, তার পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল।

কিন্তু এই সমস্ত সতর্ক বাণী একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায়। নিজেদের সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তের প্রভাবে অভিভূত হয়ে, মার্কিণ শাসকগোষ্ঠী তখনো আশা করেছিলেন যা একেবারে দুরাশার সামিল হয়ে যাচ্ছিল, যে জাপান সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবেই। মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা তাই জাপানী আক্রমণ-কারীদের তুষ্ট করতে কোন কার্পণ্য করেনি। তিরিশে নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশে, মার্কিণ ব্যাঙ্কার বার্ণার্ড বারুচ (Burnard Baruch) জাপানীদের

জাপানীদের একশ' কোটি ডলার ঋণ দানের প্রস্তাব করেন। মার্কিণ সাম্রাজ্য-বাদীদের শেষ মুহূর্তে জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার এটা হলো একটা চরম নিদর্শন, কারণ ততোক্ষণ জাপানী হানাদারের দল পার্ল হারবার অভিমুখে রওনা হয়ে গেছে।

মার্কিণ সমরবাহিনী একুশে জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে গৃহীত এক সামরিক কার্যক্রম অনুযায়ী কাজ করতে গেল। কিন্তু এই কার্যক্রমের ভিত্তি ছিল সেই সুপরিচিত নিশ্চিন্ততা যে জাপান প্রথমে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করবে।[২৩] উনত্রিশে নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশে গুপ্তচর বিভাগের এক বিবরণীতে বলা হয়েছিল যে আগামী তিন মাসের মধ্যে সম্ভাব্য জাপান আক্রমণের একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে সোভিয়েত ইউনিয়ন, কারণ সত্যি সত্যিই জাপান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়।[২৪] সত্যি বলতে কি ষোলই অক্টোবর তারিখে যুদ্ধ ও নৌ দপ্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় সামরিক পরিষদকে সতর্ক করে দিয়েছিল একটা সম্ভাব্য যুদ্ধ সম্পর্কে। সেই সতর্ক বাণীতে বলা হয়েছিল যে যদিও জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা বেশি, কিন্তু তা সত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে জাপানের লড়াই বেধে যেতে পারে। কিন্তু এই "সতর্ক বাণী" পাওয়ার পর, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি আরো শিথিল করে দেওয়া হলো।

ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজেই নিজের কবর খুঁড়ে রাখলো। মার্কিণ যুদ্ধ ইতিহাসবিদরা লিখেছেন যে, "খবরটা (পার্ল হারবার আক্রমণের) এলো একটা প্রচণ্ড ধাক্কার মতো। আমেরিকার সাধারণ মানুষ যারা অল্প কিছুক্ষণ পরেই আক্রমণের খবর পেল, কেবল তারাই নয়, তাদের নেতৃবৃন্দও এই খবরে হতচকিত হয়ে গেলেন।"[২৫]

প্রখ্যাত মার্কিণ লেখক জি. ডবলিউ. ওয়ারনেক্ যথার্থ ই মন্তব্য করেছেন যে, "দীর্ঘকাল ধরে জাপানের প্রতি ইঙ্গ-মার্কিণ আপোষ নীতিই পশ্চিমী শক্তিবর্গের মানসিক ও সামরিক অপ্রস্তুতির একমাত্র যথার্থ কারণ।"[২৬] প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে, সেই সময় আপোষনীতির অপর নাম ছিল মিউনিক নীতি।

॥ দুই ॥

সাতই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে কুরুসু ও নোমুরা, কর্ডেল হালকে অনুরোধ করেন যে বেলা একটায় যেন তাঁদের মধ্যে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। হাল তাঁদের সঙ্গে মিলিত হলেন বেলা দু'টো বেজে কুড়ি মিনিটে। এরই ঠিক আধ ঘণ্টা আগে তিনি পার্ল হারবার আক্রমণের খবর পেয়েছিলেন। জাপানী মুখপাত্রদ্বয় তাঁর কাছে এক স্মারক লিপি পেশ করে বলেন যে ছাব্বিশে নভেম্বর তারিখের মার্কিণ প্রস্তাব তাঁদের সরকার প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেই স্মারকলিপির শেষ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল :

"জাপানী সরকার এই স্মারকলিপি মারফৎ দুঃখের সঙ্গে মার্কিণ সরকারকে জানাতে বাধ্য হচ্ছে যে, মার্কিণ সরকার বর্তমানে যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন তাতে আরো আলাপ আলোচনা চালিয়ে কোন গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে।"[২৭]

স্মারকলিপিতে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত কোন খবর ছিল না, যদিও যখন তা মার্কিণ সরকারের হাতে এসে পৌঁছলো, ততোক্ষণে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে।

জাপানীরা একযোগে কয়েকটা জায়গায় প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। সাতই ডিসেম্বর তারিখে জাপানীরা, ওয়াশিংটন সময় অনুযায়ী সকাল দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে, সাংহাইয়ে আন্তর্জাতিক আবাস কেন্দ্রগুলি দখল করে নিল। বেলা এগারোটা চল্লিশে তারা উত্তর মালয়ে বৃটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলির উপর বোমা বর্ষণ করলো। বেলা বারোটা বেজে পাঁচ মিনিটে তারা মালয়ে অবতরণ করতে সুরু করলো এবং এক ঘণ্টা পরেই দক্ষিণ থাইল্যাণ্ডে কোন এক জায়গায় অবতরণ করে ছুটলো মালয় সীমান্তের দিকে। বেলা একটা কুড়ি মিনিটে তারা পার্ল হারবার আক্রমণ করলো।

আটই ডিসেম্বর জাপানে একটা রাজকীয় ঘোষণাপত্র জারী করা হলো। তাতে জাপানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কথা প্রচারিত হলো।

জাপ মার্কিন আলোচনা চলার সময়ে পার্ল হারবারে মার্কিন নৌ বহরের একটা বড়ো অংশকে এনে জমায়েত করা হয়েছিল জাপানের উপর চাপ সৃষ্টি

করে তাকে নমনীয় করার জন্যে। কিন্তু জাপানী শাসকদের শঙ্কিত করা দূরে থাক, এটা তাদের কাছে একটা ঈশ্বরদত্ত সুযোগ বলে মনে হলো। কারণ এক প্রচণ্ড আঘাতে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্কিন নৌ-বহরের একটা বড়ো অংশকে তারা একেবারে অকেজো করে দিল।

জাপানী সমর পরিষদ বিশ্বাস করতো যে দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এবং অন্যত্র তার অধিকার কায়েম করতে হলে ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ বহরের মূল আঘাতকারী শক্তিকে বিধ্বস্ত করতে হবে।

মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ অতর্কিত জাপানী আক্রমণের সম্ভবনাকে উপেক্ষা করেছিল। এমন কি পার্ল হারবারের নৌ ঘাঁটি হিসাবে দুর্বলতাকেও তারা আদৌ আমল দেয় নি। পার্ল হারবার ছিল অত্যন্ত ঘিঞ্জি আর অগভীর। একটা বড়ো নৌ বহরের পক্ষে যা স্পষ্টতই বিপজ্জনক। দৈর্ঘ্যে বন্দরটি পাঁচশ কিলোমিটার কিন্তু গভীরতা তার মাত্র বারো কিলোমিটার। এর একমাত্র নির্গমনের পথের সামনে পড়ে একটা প্রবাল প্রাচীর। ফলে যে কোন জরুরী অবস্থায় বন্দরের এই বৈশিষ্ট্যটাই তার পক্ষে চরম বিঘ্ন স্বরূপ হয়ে উঠতে পারে। স্থানাভাবের জন্যে যুদ্ধ জাহাজগুলি আড়াআড়ি জোড়ায় জোড়ায় নোঙর করে রাখতে হতো। সেখানে ছিল বাটটি যুদ্ধজাহাজ অরে চাব্বিশটি সাহায্যকারী জাহাজ। কিন্তু এই নৌবহরের মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধক্ষম জাহাজের সংখ্যা ছিল মাত্র আটটি।

ছাব্বিশে নভেম্বর সকাল ছটায়, কিউরাইল দ্বীপের হিতোকাপ্পু (Hito-kappu) বন্দর থেকে জাপানী অভিযাত্রী বাহিনী যাত্রা সুরু করলো। সেই নৌ বহরে ছিল ছ'টি বিমানবাহী জাহাজ, দু'টি যুদ্ধজাহাজ, দু'টি বড়ো ভারী ক্রুইজার, একটি হাল্কা ধরণের ক্রুইজার এবং ন'টি ডেষ্ট্রয়ার। যেখান থেকে বিমানগুলি আকাশে উড়বে সেখানে, ওআহুর দু'শ মাইল উত্তরে তারা এসে পৌঁছলো আটই ডিসেম্বর সকাল ছটায়। সেদিনটি ছিল রবিবার।[২৮]

জাপানী বিমানবাহী জাহাজগুলিতে মোট বিমানের সংখ্যা ছিল তিন শ' বাটটি। তারা হাওয়াইয়ে আমেরিকার নৌ বহর ও বিমান বন্দরের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সকাল সাতটা পঞ্চান্ন মিনিটে। বিমান বহর প্রথম ধাক্কাতেই মার্কিণ নৌ বহরের প্রতিটি জাহাজের উপর হয় টর্পেডো আঘাত, নয়তো বোমা বর্ষণ করলো। বারোটি ডুবো জাহাজ এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করে। তার মধ্যে পাঁচটি ছিল নিতান্ত ছোট আকারের। মাত্র দু'জন নাবিক তাদের

পরিচালনা করতো। ডুবো জাহাজের আক্রমণ কার্যকরী হলো না। আর ছোট ডুবো জাহাজগুলি বিশেষ কিছু ক্ষতি করতে একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। তাদের পাঁচটির মধ্যে মাত্র একটি বন্দরের মধ্যে ঢুকে পড়ে আক্রমণে কিছুটা অংশ গ্রহণ করতে পেরেছিল।[২৯]

জাপানের পার্ল হারবার আক্রমণ মার্কিণ সামরিক বাহিনীকে একেবারে হতচকিত করে, তার নৌবহরকে এমন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন করে যে, নৌ-যুদ্ধের ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। একশ' দশ মিনিটের মধ্যে জাপানীরা পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ ডুবিয়ে দেয় এবং অন্য তিনটিকে মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সর্ব সাকুল্যে আমেরিকা হারায় উনিশটি যুদ্ধ জাহাজ এবং তার হাওয়াইস্থিত বিমান বহরের বেশ বড়ো একটা অংশ। তা ছাড়া মানুষ জন ও জিনিষপত্রে তার যে ক্ষতি হয় তা ভয়াবহ। অনুপাতে জাপানের ক্ষতি হয়েছিল সামান্যই—উনত্রিশটি বিমান আর ছ'টি ডুবোজাহাজ যার মধ্যে পাঁচটি হলো সেই বিশেষ ছোট ধরণের ডুবো জাহাজ।

পার্ল হারবার আক্রমণের ফলাফল জাপানীদের পক্ষেও কম বিস্ময়কর ছিল না। হয়তো সেই জন্যেই তারা আক্রমণ করে তার ফলাফল শেষ পর্যন্ত কাজে লাগাবার জন্যে অপেক্ষা করেনি। তাদের কার্যকরী সমর পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে, "আঘাত করো এবং দ্রুত সরে যাও।" ভাইস অ্যাডমিরাল নাগুমো (Nagumo) যিনি এই আক্রমণ পরিচালনা করেন, তিনি কার্যক্রমের নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন এবং আক্রমণ চালিয়েই উত্তর পশ্চিমদিকে সরে যান। যদি তিনি তা না করে পলায়মান মার্কিণ নৌ বহরের পিছু ধাওয়া করতেন, যারা তখন দ্রুত পূর্বদিকে হটে যাচ্ছে, আমেরিকার ক্ষতির পরিমাণ তাতে আরো অনেক বেশি হতো। জেনারেল জর্জ সি মার্শাল সমেত আমেরিকার পদস্থ সামরিক নেতৃবৃন্দের অভিমত হলো এই যে পার্ল হারবার দখল করার সুযোগ কাজে না লাগিয়ে জাপানীরা চরম ভুল করেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের সূচনা বৃটেনের পক্ষেও ছিল একই রকম দুর্ভাগ্যজনক। আটই ডিসেম্বর বৃটিশ প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ বহরের দু'টি যুদ্ধ জাহাজ ও চারটি ডেষ্ট্রায়ার, উত্তর মালয়ে জাপানীরা সৈন্য অবতরণ করাচ্ছে খবর পেয়ে, সিঙ্গাপুর থেকে তাদের আক্রমণ করার জন্যে রওনা হলো। পথেই তাদের অভিযান জাপানী ডুবোজাহাজের নজরে আসায়, তার তৎক্ষণাৎ

সায়গনে বেতার বার্তা পাঠাল। দশই ডিসেম্বর সকালে জাপানী টর্পেডো বোট ও বোমারু বাহিনী আক্রমণ করলো বৃটিশ নৌ বহর। যুদ্ধে ডুবে গেল বৃটেনের যুদ্ধ জাহাজ দু'টি।

মার্কিণ ও বৃটেনের নৌ বহরের ক্ষয় ক্ষতিতে জাপান রীতিমতো উৎসাহিত হয়ে উঠলো। সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় বিজয় অভিযান পরিচালনা করার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলেই তার মনে হলো।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের প্রথম কয়েকদিনের মধ্যেই একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে আধুনিক নৌ যুদ্ধের পক্ষে, বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা থাকার জন্যে, যুদ্ধ জাহাজ, ভারী ক্রুইজার প্রায় অচল। ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ বিভাগীয় পদস্থ কর্মচারীরা তা স্বীকার করলেন। মার্কিণ পঞ্চম নৌ বহরের অধিনায়ক, অ্যাডমিরাল ফ্রেডরিক সি শারমন লিখেছেন যে, নৌ বাহিনীর কার্যক্রম যা জাপানী আক্রমণের অল্প কিছুকাল পূর্বেই রচিত হয়েছিল, "যাতে যুদ্ধ জাহাজকে নৌ যুদ্ধের মৌল শক্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা গ্রীসের রূপকথার গল্পের মতোই হয়ে দাঁড়ালো। তখন সেই "মৌল শক্তির" বেশির ভাগ অংশই পার্ল হারবারের জলের তলায় অকেজো হয়ে তলিয়ে গেছে। নৌ কর্তৃপক্ষের আত্মতুষ্ট মনোভাবের বনিয়াদটায় কে যেন জোরে নাড়া দিয়ে টলিয়ে দিয়ে গেছে।"[৩০]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর জাপানী আক্রমণ শুধু যুদ্ধের ক্ষেত্রটাকেই বিস্তৃত করে দিল না, যুদ্ধে যোগদানকারীর সংখ্যাবৃদ্ধিও ঘটালো। আটই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এগারোই ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানী ও ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, তারাও তার বিরুদ্ধে পাল্টা যুদ্ধ ঘোষণা করলো। একই সঙ্গে বুলগেরিয়া, শ্লোভাকিয়া এবং ক্রোয়াশিয়া বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। হাঙ্গেরী ও রুমেনিয়া, যারা পূর্বেই বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তারাও এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। জাপানের ক্রীড়নক মাঞ্চুকুও সরকারও এই দুই পশ্চিমী শক্তির বিরুদ্ধে এক ঘোষণা পত্র জারী করে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

যেদিন জার্মানী ও ইটালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, সেই দিনই অর্থাৎ এগারই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে, অক্ষ শক্তিবর্গ

নোতুন এক সামরিক মৈত্রীতে স্বাক্ষর করলো। এটি হলো পূর্বতন বার্লিন চুক্তির একটা পরিপূরক সমঝোওতা। এই নোতুন চুক্তিতে বলা হলো যে সমস্ত রণাঙ্গনে যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত জার্মানী, ইটালী ও জাপান, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি একত্র করে যৌথভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তারা পরস্পরের পূর্ণ সম্মতি ব্যতিরেকে কোন যুদ্ধ বিরতি বা শান্তি চুক্তিতে এককভাবে স্বাক্ষর না করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো। এই চুক্তির তিন সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছিল: "বর্তমান যুদ্ধের বিজয় গৌরব মণ্ডিত পরিসমাপ্তির পরে ইটালী, জার্মানী ও জাপান সমগ্র বিশ্বে একটা নোতুন সভ্যতা গড়ে তোলার জন্যে, সাতাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চল্লিশে সম্পাদিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তির আদর্শ অনুযায়ী পরস্পর একযোগে ঘনিষ্ট সহযোগিতায় সচেষ্ট হবে।" অর্থাৎ একথা এখন নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই তিন ফ্যাশিস্ত শক্তি সমগ্র বিশ্বে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে, পৃথিবীটাকে পদানত করতে চায়। সেই আকাঙ্খা আর গোপন রাখা দরকার মনে করছে না।

একে একে বহুদেশ তখন ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রজোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে লাগলো। তাদের মধ্যে আছে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, ক্যানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, কোষ্টারিকা, নিকারাগুয়া, এল স্যালভেডর, হণ্ডুরাস, হাইতি, ডোমিনিক্যান রিপাবলিক, কিউবা, পানামা, গুয়াতেমালা ও ভারত। স্বাধীন ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্, পোল্যাণ্ড, ইথিওপিয়া এবং বেলজিয়ামের সরকারগণ অনুরূপ ঘোষণার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করলেন। উনিশ শ' সাইত্রিশে জাপানের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি ও রক্ত ঝরানো অঘোষিত যুদ্ধ চালাবার পর, চীন নয়ই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচাল্লিশে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো।

॥ তিন ॥

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মে মাসে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের যে প্রথম পর্ব পরিসমাপ্ত হলো, তাতে জাপানী শক্তির বিজয়গর্বই সূচিত করলো। জাপানীরা এর ফলে আপাততঃ বেশ কিছু সুবিধা পেয়ে গেল। সামান্য শক্তি প্রয়োগ করে তারা প্রশান্তমহাসাগরে বিরাট সম্পদময় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকার

লাভ করলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, বৃটিশ ডোমিনিয়ন ও নেদারল্যাণ্ডের সৈন্যবাহিনী একের পর এক সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। এক লক্ষ সৈন্য সমন্বিত সিঙ্গাপুরের অত্যন্ত সুসজ্জিত ঘাঁটি, যা অনায়াসেই বেশ কয়েকমাস জাপানীদের রুখতে পারতো, কোনরকম লড়াই না করেই আত্মসমর্পণ করলো। এর চেয়ে মর্মান্তিক, দুঃখজনক পরিণতি আর কি হতে পারে। মার্কিণ সাংবাদিকদ্বয় থিওডোর এইচ. হোয়াইট ও অ্যানালী জ্যাকোবী, দক্ষিণ সাগরীয় অঞ্চলে সমর বাহিনীর কার্যকলাপের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তাদের "লজ্জা, অপমান ও মূর্খতার চরম প্রকাশ" বলে অভিহিত করেছেন।[৩১]

যুদ্ধ সুরু হওয়ার পাঁচ ছয় মাসের মধ্যে জাপানীরা ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ডে তাদের অবস্থান সুরক্ষিত করে নিল, দখল করলো মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়ার প্রধান দ্বীপগুলি, নিউগিণির একাংশ, ব্রহ্মদেশ, ফিলিপাইন ও হংকং। এরই সঙ্গে তারা দখল করলো গুয়াম, ওয়েক, নিউ বৃটেন ও সলোমন দ্বীপপুঞ্জ। দক্ষিণ চীনের ইউনান প্রদেশের উপর আক্রমণ করলো তারা ব্রহ্ম দেশের মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে। সংক্ষেপে বলতে গেলে তারা চীনের মূল ভূখণ্ডের যে অংশ আগেই দখল করেছিল, তা বাদ দিয়ে পনের কোটি মানুষের বসবাস সমেত আটত্রিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার স্থান দখল করে নিল।

প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের সাফল্য, জার্মানীর সঙ্গে তার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দ্বন্দ্বকে তীব্র করে তুললো। বিশ্ব বিজয়ের স্বপ্নে তারা তখন উভয়েই মশগুল। তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে উভয়েই তৎপর। তাই আপাততঃ একটা আপোষ রফা করে সেই দ্বন্দ্বের তীব্রতাকে প্রশমিত করে রাখতে চাইলো তারা। তাই আঠারোই জানুয়ারী, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে বার্লিনে জার্মানী, ইটালী ও জাপানের মধ্যে আরেকটি সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এই চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে বলা হলো যে পশ্চিম ভাগে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকবে হিটলার জার্মানী ও ইটালীর আর পূর্ব অংশে সর্বময় কর্তৃত্ব করবে জাপান।

আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ দ্বন্দ্বের একটা তীব্রতর পরিণামের ফলশ্রুতি মাত্র। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ জার্মানী ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব বিজয়ের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল।

"বিশ্বনেতৃত্ব" লাভের জন্যে তার নিজস্ব যে পরিকল্পনা ছিল, তাকেই রূপায়িত করতে আমেরিকা তৎপর হয়ে উঠলো।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলির যুদ্ধে যোগদানের ঘটনাকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা, "সেই দেশের যে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ফ্যাশিপন্থী নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলছিল তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্যে কাজে না লাগিয়ে, নিজেদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্বকে আরো জোরদার করার জন্যে ব্যবহার করতে চাইলো।[৩২] তাই মার্কিণ সরকার নিজের স্বার্থেই ফ্যাশিপন্থী প্রতিক্রিয়ার চক্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে যেতে কুণ্ঠা বোধ করলেন না। ফলতঃ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির মৈত্রী যতোটা সক্রিয় হয়ে উঠলো সমস্ত প্রগতিশীল গোষ্ঠী ও লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে তার সক্রিয়তা সেই অনুপাতে হলো অনেক কম।

রাইয়ো-ডি-জেনিরো সম্মেলনে (জানুয়ারী পনের থেকে আঠাশে উনিশ শ' বিয়াল্লিশ) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে সাহায্যদানের প্রস্তাব করে, সেখানে নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপনে সম্মতির চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নিল। গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কাঁচামাল, কৃষিজ উৎপাদন ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির ও উত্তরোত্তর বিনিময় বৃদ্ধির সপক্ষে একটি প্রস্তাব গৃহীত হলো। বরং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। ষোলটি লাটিন আমেরিকার সাধারণতন্ত্রকে সে প্রণোদিত করলো সমস্ত বাণিজ্যিক ও শুল্কগত বাধা উঠিয়ে দিতে।[৩৩]

রাইয়ো-ডি-জেনিরো সম্মেলন তাই বলা যায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লাতিন আমেরিকার উপর নিজ অধিকার বিস্তৃত ও কায়েম করার এক নোতুন যুগের সূত্রপাত করলো। ফলে তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটেন সেই অঞ্চল থেকে ক্রমেই পিছু হটে আসতে বাধ্য হলো।

যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় মার্কিণ দেশের একচেটিয়া পতিদের লাভের অঙ্ক ফুলে ফেঁপে উঠতে লাগলো। আমেরিকার শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের মাত্রা ক্রমেই আকাশচুম্বী হতে থাকলে নীচের পরিসংখ্যানে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

মার্কিণ শিল্পোৎপাদন[৩৪] (১৯৩৯=১০০)

১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪	১৯৪৫
১০০	১১৫	১৪৯	১৮৩	২১৯	২১৬	১৮৬

উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পে বিনিয়োজিত পুঁজিরও কেন্দ্রীভবন ঘটতে লাগলো। উনিশ শ' উনচল্লিশে মার্কিণ ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প সংস্থার দশ হাজার শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানে দেশের মোট শ্রমিকের শতকরা তের ভাগ নিয়োগ করতো। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে তার শতকরা হিসাব দাঁড়ালো তিরিশ দশমিক চার। উল্লিখিত সংস্থা সমেত, বৃহৎ শিল্পগত একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এক থেকে দশ হাজার শ্রমিক নিয়োগকারী সংস্থাগুলি, সর্বসাকুল্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের শতকরা বাহান্ন দশমিক আট ভাগ নিয়োগ করতো।

মার্কিণ ম্যানুফাকচারিং শিল্পে কেন্দ্রীভবনের রূপ[৩৫]

শ্রমিকের সংখ্যা	কারখানার সংখ্যা		মোট শ্রমিকের সংখ্যা			
	১৯৩৯	১৯৪৪	হাজার হিসাবে		শতকরা হিসাবে	
			১৯৩৯	১৯৪৪	১৯৩৯	১৯৪৪
১-৯৯	১৮৭,৪৭৭	১৯৭,৬৩৮	২,৭৮৭	৩,১৩৮	২৫·৮	১৮·৯
১০০-৪৯৯	১৪,০০০	১৫,৯৩৮	২,৭৮২	৩,২২৫	২৫·৮	১৯·৩
৫০০-৯,৯৯৯	২,৩৭৪	৪,৪৬১	৩,৮[illegible]১	৫,২৪৮	৩৫·৩	৩১·৪
১০,০০০ও বেশি	৪৯	৩৪৪	১,৪২০	৫,০৮৩	১৩·১	৩০·৪

শ্রমিকদের উপর শোষণের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি করে শিল্পায়িত একচেটিয়া কারবারীরা তাদের যুদ্ধকালীন আয়ের মাত্রা উত্তরোত্তর ক্রমেই বৃদ্ধি করে চললো। যুদ্ধোৎপাদনের চুক্তিগুলি বৃহৎ একচেটিয়া কারবারীদের সুবিধার দিকে নজর রেখে বিলি করা হতে লাগলো। তদানীন্তন মার্কিণ আভ্যন্তরীণ বিষয়ের সচিব ও প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্য, হ্যারল্ড, এল, আইকেস বলেছেন যে, "প্রতিরক্ষা কমিটি তার বৃহৎ ব্যাবসায়ী বন্ধুদের সাহায্যার্থে যা কিছু করা যায় করার চেষ্টা করছে।"[৩৬] যুদ্ধোৎপাদনের চুক্তি একশ' থেকে একশ' পঞ্চাশটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই কেবল বিলি করা হতো।[৩৭]

ফ্যাশিস্ত জার্মানী তার সামরিক শক্তির বেশির ভাগই কেন্দ্রীভূত করেছিল সোভিয়েত—জার্মাণ রণাঙ্গনে। তাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সুবিধা

হয়ে গেল। তারা তাদের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর একটা বড়ো অংশকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে লড়াইয়ের জন্যে পাঠিয়ে দিল। ওদিকে জাপান তখনো পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন আগে আক্রমণ করবে কিনা স্থির করতে না পারায় তার সামরিক শক্তির একটা বড়ো অংশ সোভিয়েত সীমান্তে জমায়েত করে। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে শক্তির ভারসাম্য নানা কারণে খানিকটা তার প্রতিকূলে যায়। এক কথায় বলতে গেলে যুদ্ধের এক চরম রণাঙ্গনে সোভিয়েতের মরণপণ প্রতিরোধ শক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অধিকতর শক্তি সমাবেশ ঘটাতে সাহায্য করে।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মে মাসে প্রবাল সাগরে একটা বড়ো রকমের নৌযুদ্ধ হয়ে গেল। প্রবাল সাগর হলো অষ্ট্রেলিয়ার সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ হেব্রাইডিজে্র মধ্যবর্তী অঞ্চল। দুই প্রতিপক্ষ (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান) বিমানবহরের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করলো। দুই পক্ষের যুদ্ধ জাহাজ থেকে একবারও গুলীবর্ষণ করলো না। উভয়ের ক্ষতির পরিমাণও হলো প্রায় সমান সমান। কিন্তু জাপানী নৌবহর বাধ্য হল সেই স্থান পরিত্যাগ করে যেতে।

দ্বিতীয় এক সংঘর্ষে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশের জুন মাসের সুরুতে জাপান মিডওয়ের কাছে আবার পরাজিত হলো। তার চারখানি বিমানবাহী জাহাজ; একটি ক্রুইজার ও অনেকগুলি বিমান বিনষ্ট হলো। মিডওয়ের যুদ্ধেই প্রথম বোঝা গেল যে যুদ্ধের গতি এবার জাপানের প্রতিকূলে যেতে সুরু করেছে।

সামরিক শক্তিতে অধিকতর পরিমাণে শক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নীতি নিয়মকরা তাঁদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে পুরোদমে কোন আক্রমণ সুরু করতে নারাজ ছিলেন। পরের দু'বছর ধরে, শক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেও মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্য, ছোটখাটো নৌযুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই করলো না। স্থলেও তাদের অনুরূপ নীতি অনুসৃত হলো এবং তাও প্রধানত সলোমন দ্বীপপুঞ্জ ও নিউ গিনি অঞ্চলে।

॥ চার ॥

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিণ, বৃটিশ ও ডাচ সৈন্য বাহিনীর ব্যর্থতা ও ভ্রান্ত নীতির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তাদের নিজ নিজ সরকারের

ঔপনিবেশিক ও জাতি বৈষম্যগত নীতি। তারই জন্যে তারা জাপানী সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনগণকে কোন কাজেই টেনে আনতে পারলো না। মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকরা জাপানকে প্রতিরোধ করার জন্যে স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য চাইতে পারলো না, কারণ তাদের আশংকা ছিল এতে সেই সব অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠবে। যেমন প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি সংযুক্ত জাতীয় প্রতিরোধ ফ্রন্ট গঠন করার জন্যে ফিলিপাইনের কমিউনিষ্ট পার্টির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

বৃটিশ, মার্কিণ ও ডাচ শাসকদের ঔপনিবেশিক চরিত্র যুদ্ধের হাজারো পরিবর্তনের ধাক্কাতেও অপরিবর্তিত রয়ে গেল। ফলে তারা জনগণকে দূরে সরে দাঁড় করিয়ে তাদেরই স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করে গেল।

কিন্তু জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার এই প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষায় দমে গেল না। সোভিয়েত সীমান্তে যুদ্ধের গতি যেমনই পরিবর্তিত হতে লাগলো, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনেও তার ঢেউ ক্রমে তেমনি তাকে নাড়া দিয়ে গেল। ঔপনিবেশিক শাসকদের মতামতের অপেক্ষা না করেই জনগণ অস্ত্র তুলে নিল নিজের হাতে। কারণ ফ্যাশিস্ত পররাজ্য লোলুপতাকে বরদাস্ত করবে না তারা সহ্য করবে না জাপানী নেতৃত্বে "নোতুন সমাজ" প্রতিষ্ঠার আয়োজনকে।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশে মার্চ মাসের শেষাশেষি, একটা গণ সংগঠন, জনগণের জাপ বিরোধী সেনাদল—"হুকবালাহাপ" ফিলিপাইনে সক্রিয় হয়ে উঠলো। সেই বছরেই মালয়ে গড়ে উঠলো একটা গণফৌজ। ব্রহ্মদেশের দেশপ্রেমিক সৈনিকেরা ফ্যাশিবিরোধী জনগণের স্বাধীনতা লীগ (AFPFL) গঠন করে জাপানী হানাদারদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে রত হলো। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন ও কোরিয়ার স্থানে স্থানে দেখা দিল পার্টিজান দল। ভারতের জনগণের স্বাধীনতা দাবীও জোরালো হয়ে উঠতে লাগলো।

ইউরোপের দেশে দেশে মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গ-মার্কিণ শাসকগোষ্ঠীর যে প্রতিকূলতা, শত্রুভাবাপন্ন আচরণ দেখা গিয়েছিল এখানেও তার ঘাটতি দেখা গেল না। ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড়ো ভয় ছিল এই যে, এই সব প্রতিরোধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই প্রাচ্যের দেশগুলিতে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ ঘটবে। তারা আশংকা করেছিল যে যুদ্ধকালীন সময়ে

জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে এই সব দেশের মানুষ যোগদান করবে, তারই ফলে যুদ্ধোত্তর কালে যে কোন সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের এই সংগ্রামী অভিজ্ঞতা প্রযুক্ত হবে।

মার্কিণ ও বৃটিশরা তাদের সহযোগী দেশীয় দালাল বুর্জোয়াদের ব্যপকভাবে কাজে লাগাতে লাগলো জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতাই এই প্রচেষ্টাকে সহজ করে দিল। তাই দালাল বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা নানা ধরণের জনগণ বিরোধী চুক্তিতে যোগ দিতে লাগলো।

ভারতের মাটি কামড়ে প্রাণপণে পড়ে থাকতে চাইলো ইংরেজ ঔপনিবেশিকেরা। তারা ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফল্যের চেয়ে জাপানীদের হাতে দেশটা তুলে দিতেও রাজী ছিল। কারণ অবস্থা যদি কোনদিনই সত্যি তেমন খারাপ হয়, তারা হিসেব করেছিল, জাপান ভারত দখল করবে। কিন্তু কোনমতেই সেই অধিকার স্বল্পকালস্থায়ী ছাড়া আর কিছু হবেনা। কিন্তু এই স্বল্পকালীন জাপানী শাসন, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। এখনই সমস্ত দেশটা জাতীয়তাবাদীদের কাছে হাতছাড়া করার চেয়ে, সাম্রাজ্যবাদীরা জাপানীদের কাছে পরাজয় শ্রেয় বলে মনে করতো।

ভারতে বৃটেনের অর্থনৈতিক কার্যক্রমও, সাম্রাজ্যবাদীদের এ দেশে শাসনের অধিকার বজায় রাখার অদম্য বাসনার প্রতিফলন ছিল মাত্র। বৃটেন ভারতে মূল ও ভারী শিল্পের পত্তন কোন দিন সুনজরে দেখেনি। ভারী শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ শাখার পত্তন ও সংগঠনকে তারা সর্বোতোভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। সেক্ষেত্রে কোন ন্যায় নীতির বালাই তাদের কখনো ছিল না। কারণ এই সব শিল্পের সংগঠনকে তারা জাতীয় স্বাধীনতা দাবীর মৌল অর্থনৈতিক বনিয়াদ বলে মনে করতো। কিন্তু যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রয়োজনে ভারতীয় সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর ক্রমাগত চাপ এসে পড়তে লাগলো। বিচিত্র ভাবে হলেও উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল কিছুটা। যেমন প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে ভারত ইঞ্জিন তৈরী না করেই অটোমোবাইলের কাঠামো তৈরী করতে লাগলো। ট্যাঙ্কের মোটর তৈরী না করেই বৃটিশ ট্যাঙ্কের কাঠামো তৈরী হতে লাগলো। বিমান তৈরী

করার হুকুম না থাকলেও, তার কাঠামো তৈরীর আদেশ আসতে লাগলো হরদম।

বৃটিশ ব্যবসায়ী, বাগিচা মালিক ও শিল্পপতিরা যুদ্ধকালীন সময়েও যে ধরণের আচার আচরণ করতে লাগলো, তাতে দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ না হয়ে পারলো না।

উনিশ শ বিয়াল্লিশের মার্চ মাসে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা দেখে, বৃটিশ সরকার ছিটেফোঁটা কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাকে প্রশমিত করার চেষ্টা করলেন। ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব করার জন্যে একটি বিশেষ বৃটিশ দৌত্য মিশন ভারত সফরে এলেন। তার প্রস্তাবগুলি ছিল মোটামুটি এই ধরণের যথা: ভারতকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া হবে, তার কোন অংশ চাইলে তাকে স্বতন্ত্র ডোমিনিয়নের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। এর পরিবর্তে যুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র সময়ের জন্যে দেশের শাসনের সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করবেন ভাইসরয়।

ভারতীয় জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল করে দিয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়াই ছিল কূটচালের উদ্দেশ্য। কমিউনিষ্ট পার্টি ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংগঠন এই পরিকল্পনাকে বর্জন করলো। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। তাই দেখা যায় জওহরলাল নেহরু সঠিকভাবেই মন্তব্য করছেন, "আজকের অবস্থায় ভারতকে দ্বিখণ্ডিতকরণের কোন চিন্তাই হলো, আধুনিক কালের ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমগ্র চালু ধারণার পরিপন্থী।"[৩৮]

কিন্তু জমিদার ও বুর্জোয়াশ্রেণীর মুখপাত্র মুসলীম লীগ ছিল দেশ বিভাগের পক্ষে। তার প্রস্তাব হলো দ্বিখণ্ডীকরণ করতে হবে দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে। দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে বৃটিশ ঔপনিবেশিক স্বার্থ যে বিরোধ ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তারই ভিত্তিতে তার প্রস্তাব রচিত হয়েছিল।

গান্ধী ও নেহরুর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পাল্টা এক প্রস্তাব উপস্থিত করে বললেন যে একটা ভারতীয় জাতীয় সরকার গঠন করতে হবে, যে হানাদারদের বিরুদ্ধে দেশের সমস্ত শক্তি ও সম্পদকে একত্রিত করে কাজে

জাগাতে পারবে। এবং এই সরকার বলা বাহুল্য ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে যাবে।

কিন্তু কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলো। প্রত্যাখ্যানের জবাবে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আঠারোই জুলাই উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, "এদেশ থেকে বৃটিশ শাসনের অবসানের জন্যে" জনগণের উদ্দেশ্যে গণআন্দোলনের আহ্বান জানালেন। নয়ই আগষ্ট, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ইংরেজরা গান্ধী, নেহরু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করলো।

পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির মতো ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টিও, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটা সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ছিলেন, যার মৌল লক্ষ্য ছিল হানাদার জাপানীদের রুখতে হবে, তাড়াতে হবে। সমস্ত ফ্যাশি বিরোধী শক্তিকে নিয়ে এক সংযুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন ভারতীয় কমিউনিষ্টরা। তা ছাড়া জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে গঠন করতে হবে একটা পূর্ণাঙ্গ জাতীয় সরকার, যাতে ফ্যাশি-বাদকে রুখে দাঁড়াতে দেশের সমস্ত শক্তিকে সংঘবদ্ধ করা যায়।

কিন্তু ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে লড়াই করার পরিবর্তে, ইংরেজ সরকার সৈন্য নিয়োগ করলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার জন্যে। সমগ্র বৃটিশ শাসনে ভারতে যতো না সৈন্য নিয়োগ করা হয়েছিল, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্যকে এই কাজে নিযুক্ত করা হলো।

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের লোভাতুর দৃষ্টি ততোদিনে ভারতের উপর পড়েছে। ওয়াশিংটন থেকে ভারতকে সাহায্যদানের প্রস্তাব করা হলো। দেশীয় প্রগতিশীল মানুষ ও বৃটিশ শাসক চক্র তা বন্ধ করার চেষ্টা করলেন। যদিও দুয়ের আদর্শ এক ছিল না মোটেই। ভারতের প্রগতিশীল মানুষ সেদিন এক ঔপনিবেশিক শাসকের পরিবর্তে আরেক শাসকের অধীনতা চাইছিলেন না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল সমস্ত রকম ঔপনিবেশিক শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি। সেই উদ্দেশ্যেই কাজ করে যেতে লাগলেন তাঁরা।

কিন্তু তা সত্বেও মার্কিণ পুঁজি তার নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সুরক্ষিত করে নিতে পারলো ভারতে। মোট কথা হলো এই যে ঔপনিবেশিক স্বার্থের নীতি, জাপানী আক্রমণের মুখে ভারতীয় প্রতিরোধ ক্ষমতাকে যথেষ্ট দুর্বল করে দিয়ে গেল। প্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে অনুচররা,

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যে কোন সুযোগে আঘাত হানার কাজ থেকে বিরত না হয়ে, অনুরূপ ক্ষতিসাধনই করেছিল। যেমন তার একটা জলন্ত নিদর্শন হলো চীনে চিয়াং চক্রের শাসন।

উনিশ শ' একচল্লিশ-বিয়াল্লিশে যখন জাপানী আক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে ইঙ্গ-মার্কিণ ও কুওমিনটাং সেনাদল ভীত, ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর হয়েছিল, সেই একই সময়ে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ, জাপানী শক্তি উপেক্ষা করে নিজেদের ঘাঁটি আগলে দাঁড়িয়েছিল। গণ প্রতিরোধের এই শক্তিতে আতংকিত চিয়াং কাই-শেক, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ঘোষণা করলেন যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের যুদ্ধে চীন কোন মতে জড়িত নয়। বলা বাহুল্য এই ঘোষণা জাপানীদের অনেক ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রক্ষা করলো। জন তিরিশেক কুওমিনটাং জেনারেল শত্রুদের মধ্যে গিয়ে, সঙ্গে করে জাপানী সৈন্যদের পথ্ দিয়ে দেখিয়ে নিয়ে এলেন উনিশ শ' একচল্লিশ বিয়াল্লিশে। জাপানী যুদ্ধ ইতিহাসবিদ্‌রা লিখেছেন যে, "কুওমিনটাং কর্তৃপক্ষ প্রায়ই জাপানী সেনাদলকে মুক্ত এলাকা ও গণমুক্তি ফৌজের ঘাঁটির দিকে আক্রমণ পরিচালনা করতে প্ররোচিত করতো।"[৩৯]

ইঙ্গ-মার্কিণ অথবা চিয়াং কাই-শেকের সেনাদলের চেয়ে চীনের গণমুক্তি ফৌজকে সংখ্যায় বহুগুণ বেশি জাপানী সৈন্যের মোকাবিলা করতে হয়েছে। সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে দেখা যায় জাপানী সৈন্যের শতকরা ষাট ভাগ এবং ক্রীড়নক সরকারের শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সৈন্য লড়াই করেছে মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে।[৪০] বলতে কি কুওমিনটাং সৈন্য কিম্বা মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে জাপানীদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে তাদের গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে লড়তে গিয়ে। যদি ধরা যায়, উনিশ শ' সাঁইত্রিশ চীনে জাপানীদের মোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হলো একশ তাহলে উনিশ শ' বিয়াল্লিশে গণমুক্তি ফৌজের অষ্টম রুট বাহিনীর কাছে সেই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তু'শ চৌদ্দ। এবং একই সময়ে কুওমিনটাংয়ের সঙ্গে লড়াইয়ে সেই ক্ষতির পরিমাণ বত্রিশের বেশি ছিল না কোন মতে।

পররাজ্য আক্রমণকারী জাপানীদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক যুদ্ধ প্রচেষ্টায়, চীনের জনসাধারণ তাঁদের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে স্মরণীয় অবদান রেখেছেন।

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার কিন্তু আগাগোড়া বিশ্বাসঘাতক চিয়াং কাইশেক

চক্রের শাসন ব্যবস্থাকেই মদত যুগিয়ে গেছেন। তাঁরা চিয়াংয়ের অস্ত্র-শস্ত্র যুগিয়াছেন, গড়ে তুলেছেন চিয়াংয়ের সংরক্ষিত বাহিনী যাতে এই সব নিয়ে চীনের গণতান্ত্রিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করে দেওয়া যায়। চিয়াংয়ের অগণতান্ত্রিক কার্যক্রমকে একদিকে আরো জোরালো করার জন্যে অন্যদিকে জাপানীদের সঙ্গে চিয়াংয়ের কোন বোঝাপড়ায় আসা বন্ধ করার জন্যে, মার্কিণ সরকার জেনারেল জোসেফ ডবলিউ ষ্টিলওয়েলের নেতৃত্বে চীনে এক সামরিক মিশন পাঠালেন। এই ষ্টিলওয়েলকেই দশই মার্চ, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, কুওমিনটাং সেনাবাহিনীর চীফ অব্ ষ্টাফ্ নিযুক্ত করা হলো।

সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির কুশলী পরিচালনা, সেই দেশকে একযোগে জার্মাণ ও জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হতে দেয়নি, যার ফল হতো একই সঙ্গে দুই সীমান্তে যুদ্ধ। যুদ্ধ চলাকালীন সমগ্র সময়ে সোভিয়েতের মানুষ জাপানী যুদ্ধবাদীদের প্রতি তাহাদের সহজাত ঘৃণা প্রদর্শন করতে কুণ্ঠা বোধ করেনি যে তারাই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুদ্ধের জন্যে দায়ী। সোভিয়েত সংবাদপত্রগুলিতে জাপানী শাসকদের উদ্ধত হঠকারিতার প্রতি কটাক্ষ করে বলা হয় যে জাপানের পরাজয় সুনিশ্চিত।

মার্কিণ ও বৃটিশ ইতিহাস বিকৃতকারীরা যাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় সাফল্যে সোভিয়েতের ভূমিকা খর্ব করে দেখাতে চান, তাঁরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনকে, সোভিয়েত জার্মাণ ফ্রন্ট নিরপেক্ষ একটি বিশেষ যুদ্ধাবস্থা হিসাবে বর্ণনা করতে আগ্রহী। মহান চীন দেশের বীর জনগণ, জাপানী আক্রমণকে প্রতিহত ও পরাজিত করে, জাপানের চূড়ান্ত পরাজয়ে যে ভূমিকা অর্জন করেছে তাকেও অস্বীকার করাটা তাঁদের লক্ষ্য।

তথাপি একথা অনস্বীকার্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামগ্রিক পরিচয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের গুরুত্বকে প্রথম শ্রেণীর বলা যায় না। যে রণাঙ্গনে যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল ও পৃথিবীর জাতি সমূহের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলছিল, তা হলো সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গন। সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রচেষ্টা প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঘটনাবলীর গতি প্রকৃতিতে অসীম প্রভাব বিস্তার করে। ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রজোটের প্রবক্তা, তার সবচেয়ে বড়ো শক্তিশালী রাষ্ট্র জার্মানীর পরাজয়, জাপানের পতনকেও অনিবার্য করে তোলে।

সাম্রাজ্যবাদী জাপান তার সমস্ত অভিযান পরিকল্পনার সময় স্থির করেছিল

সোভিয়েতের পরাজয়ের পরে। কিন্তু তার প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়ে গেল। কারণ সে সোভিয়েতের শক্তির পূর্ণ মূল্যায়ণ করতে পারেনি, যা জার্মানীকে পর্যুদস্ত করে, জাপানের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি, কোয়ান্টাং (Kwantung) বাহিনীকে পরাস্ত করেছে উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে।

*　　*　　*　　*

উনিশ শ' একচল্লিশের জুন মাস থেকে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর মধ্যে প্রাধান্য অনিবার্য ভাবেই পায় সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের ঘটনা, যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি ও প্রকৃতিকে চূড়ান্তভাবে পরিবর্তিত করেছে। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রথম স্তরে, সোভিয়েতের মানুষ ও সামরিক বাহিনী যে চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়েছিল, কোন পুঁজিবাদী দেশ সেই সময় পর্যন্ত তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি—সেই চ্যালেঞ্জ হলো জার্মাণ যুদ্ধযন্ত্রের অপ্রতিহত গতি, যা প্রায় সমগ্র ইউরোপ মহাদেশকে দলিত, মথিত করে এসেছে, তাকে প্রতিহত করা।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সূচনাপর্বের বিস্তৃতিকাল বলা যায় উনিশ শ' বিয়াল্লিশের আঠারোই নভেম্বর পর্যন্ত চলেছিল। এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের ব্লীৎসক্রীগ আক্রমণ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছে, রণাঙ্গনে প্রস্তুত হয়েছে নিজে, দেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক প্রস্তুতি চালিয়েছে, যাতে যুদ্ধের গতিকে নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া যায়। সোভিয়েতের বীর জনগণ, তাঁদের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং তার যথাযোগ্য জবাব দিয়েছে।

---

১. একটি রুশ ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০৫

২. হ্যালেট অ্যাবেণ্ড : Ramparts of Pacific, নিউ ইয়র্ক ১৯৪২, পৃঃ ১৮৩.

৩. সেই সময়ে চীনের গণমুক্তি ফৌজ বা Peoples Liberation Army দু'টি বাহিনীতে বিভক্ত ছিল, 8th Route Army এবং 4th Route Army.

৪. ডেইলী ওয়ার্কার, নিউইয়র্ক', ১লা মার্চ, ১৯৪১

৫. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States Japan, 1931-1941, দ্বিতীয় খণ্ড. ওয়াশিংটন ১৯৪৩, পৃঃ ৫৫৬-৫৭

৬. ঐ, ঐ,

৭. ঐ, ঐ.

৮. ঐ, পৃঃ ১৬২

৯. ফ্রেডারিক মুর: With Japan's Leaders, নিউ ইয়র্ক ১৯৪২, পৃ: ২৫৭
১০. একটি সোভিয়েত গ্রন্থ, ১৯৫৬, পৃ: ৬১
১১. ফ্রেডারিক মুরের উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ২৫৭-৫৮
১২. Contemporary Japan, টোকিয়ো ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা জানুয়ারী ১৯৪২
১৩. American Diplomacy in the Far East.*পৃ: ২৪৫-৪৬
১৪, জোসেফ সি. গ্রু Ten years in Japan, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৪ পৃ: ৪৮৩-৮৪
১৫, একটি রুশ ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ
১৬. Hearings Before the joint Committee on the Investigation of the Pearl Harbor Attack, ওয়াশিংটন ১৯৪৬ ষোড়শ খণ্ড. পৃ: ২৩৯০
১৭. The Ciano Diaries. 1939-1943, পৃ: ৪১৪
১৮, Hearings Before............একাদশ খণ্ড. পৃ: ৫৩৯৮
১৯. ঐ, পৃ: ৫৩৭৬
২০. ঐ, পৃ: ৫৩৯৭
২১. ঐ, পৃ: ৫৪২৭
২২. জোসেফ সি. গ্রু: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৩৬৮
২৩, Hearings : Pearl Harbor Attack : চতুর্দশ খণ্ড, পৃ: ২৫৬৮
২৪. ঐ, পৃ: ১৩৬৮, ১৩৭৩
২৫, মরিস ম্যাটলোফ ও এডুইন এম, স্নেল : Strategic Planning for Coalition Warfare 1941-42, ওয়াশিংটন ১৯৫৩, পৃ: ৮০
২৬, Pacific Affairs, ডিসেম্বর ১৯৪২, পৃ: ৪৩৪
২৭. জোসেফ সি গ্রু পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৪৯৩
২৮. তারিখের আপাত: বৈষম্য ও বিভ্রান্তি আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার জন্য ঘটিয়াছে। এই কাল্পনিক রেখা পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর দিয়া গিয়াছে।
২৯, ফ্রেডারিক সি, শারম্যান: Combat Command. The American Aircraft carriers in the Pacific War, নিউ ইয়র্ক ১৯৫০, পৃ: ৩৮
৩০. ঐ, পৃ: ৬৯
৩১. থিয়োডোর এইচ. হোয়াইট ও অ্যানালী জ্যাকোবী : Thunder out of China নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬
৩২, ভিক্টোরিয়ো কোদোভিল্লা: Sera America Latina Colonia Yanqui, বুয়েনস এয়ার্স' ১৯৪৭, পৃ: ১২
৩৩. War and Peace Aims of the United Nations পৃ: ৫৮৩-৮৪
৩৪. Economic Concentration and world War II, Report of the Smaller War Plants Corporation : ওয়াশিংটন ১৯৪৬

৩৫. ঐ, পৃঃ ৩১৩, ৩১৯

৩৬. হ্যারল্ড এল, আইকেস : The Secret Diary, দ্বিতীয় খণ্ড, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৪ সাইমন ও সুশ্‌টার পৃঃ ৪৩৪

৩৭. ডোনাল্ড এম, নেলসন : Arsenal of Democracy, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬, পৃঃ ২৭৬

৩৮. জওহরলাল নেহরু : The Discovery of India, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬ পৃঃ ৪৬৪

৩৯. তো কেইজাই শিমবোশা : History of the Pacific War টোকিয়ো, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫৩

৪০. ঐ, ঐ

চতুর্থ খণ্ড

সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা

দশম অধ্যায় ঃ ভল্গার বিজয়

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালেও, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু না হওয়ার জন্যে, নাৎসী জার্মানীর হুকুম তামিল করার জন্যে এমন অনেক সৈন্য ছিল যাদের সে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারতো। সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতিতে এমন কোন গুণগত পরিবর্তন তখনো আসেনি যা উভয় পক্ষের শক্তির আপেক্ষিক সম্পর্ককে পরিবর্তিত করতে পারে। বরং যুদ্ধের প্রথম কয়েক মাসে সোভিয়েতের যে সামরিক বিপর্যয় ঘটে গেছে, যার ফলে সোভিয়েত ভূমির বেশ কিছু অংশ জার্মাণীর করায়ত্ত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তির ক্ষয়ক্ষতি, এই সব মিলে সোভিয়েত জীবনে তখন নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাদের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব প্রকট ভাবে অনুভূত হচ্ছে।

মস্কো আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মাণ সামরিক নেতারা সেই উনিশ শ' একচল্লিশের শেষ নভেম্বরেই উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধের পরিকল্পনার কাজে নেমে পড়েছিলেন।

নোতুন একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে এই নোতুন পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল। বারবারোসা পরিকল্পনার মৌল উদ্দেশ্য ছিল, উনিশ শ' এক চল্লিশে আকস্মিকভাবে প্রচণ্ড দ্রুততায় মস্কো অভিযান, যাতে জার্মাণ সৈন্যবাহিনী সোভিয়েত সামরিক শক্তির প্রধান অংশ ছত্রখান করে দেশের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলি দখল করবে এবং বিদ্যুৎগতিতে বিজয় গৌরব অর্জন করবে। কিন্তু যখন তা ব্যর্থ হয়ে গেল তখন জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ নোতুন করে সমগ্র অভিযানের পরিকল্পনা রচনায় মন দিলেন।

নোতুন পরিকল্পনার ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে সোভিয়েত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে যে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি আছে যদি সেগুলি দখল

করে নেওয়া যায় তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়বে, অথচ জার্মাণীর শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়ে তাই যুদ্ধের গতিকে তার অনুকূলে নিয়ে আসবে।

তাছাড়া উনিশ শ' একচল্লিশের শেষাশেষি খোদ জার্মাণীতেই তৈল ও খাদ্যশস্যের যে তীব্র সংকট দেখা দেয়, সেটাও তাকে এই নোতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে অনেকখানি উদ্বুদ্ধ করে।

জার্মাণ কর্তৃপক্ষ এবারে হিসাব করলেন যে সোভিয়েতের অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষয়ক্ষতি তাকে ক্রমেই দুর্বল করে ফেলবে, ফলে সুবিধামতো সময়ে আবার মস্কো অভিযান কর্মসূচী গ্রহণ করে তাকে সফল করার চেষ্টা করলেই হবে। এই চিন্তাধারা অনুযায়ীই নাৎসী বাহিনীর একটা বড়ো রকমের অংশকে মস্কো অঞ্চলে রেখে দেওয়া হলো।

গ্রীষ্মকালীন অভিযানের সামরিক তাৎপর্য, জার্মাণ সমরনায়কদের সদরদপ্তরে এক বৈঠকে পরিস্কার করে বলা হলো, উনিশে নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে। পাঁচই এপ্রিল, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে সদর দপ্তর একচল্লিশ সংখ্যক নির্দেশনামা অনুমোদন করলো, যাতে উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালীন অভিযানের মৌল কর্তব্যগুলি বলা হয়েছে। জার্মাণ সৈন্যবাহিনী সোভিয়েতের জনশক্তিকে যতোদূর সম্ভব নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দখল করতে হবে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি। ডন নদীর অপর তীরে শত্রুর ঘাঁটিকে পর্যুদস্ত করে, ককেশীয় অঞ্চলের তৈলখনি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দখল করার মূল কার্যক্রমের জন্যে, নির্দেশনামায় যতোদূর সম্ভব সৈন্য সমাবেশ করার কথা বলা হলো।[১]

নয়ই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' বিয়াল্লিশে এক বক্তৃতায় হিটলার একচল্লিশ সংখ্যক নির্দেশনামার খুঁটিনাটি আলোচনা প্রসঙ্গে, এর মৌল ভিত্তিরও ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য ছিল: প্রথমতঃ শত্রুর অবশিষ্ট প্রধান খাদ্য উৎপাদন অঞ্চলগুলি দখলে করা; দ্বিতীয়তঃ তার কয়লা সম্পদের অবশিষ্টটুকু দখল করা যাকে আমরা কোকে রূপান্তরিত করে নিতে পারি; তৃতীয়তঃ তার তৈল খনির কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়া, সম্ভব হলে সেগুলি দখল করা, নয়তো সমগ্র দেশ থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং চতুর্থতঃ সামরিক তৎপরতায় রণাঙ্গনের এলাকা বিস্তৃততর করা এবং তার শেষ প্রধান জলপথ ভল্গাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।"[২]

গ্রীষ্মকালীন অভিযানের নাৎসী পরিকল্পনা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মাণীর লুঠেরা চরিত্রটিকে যে ভাবে প্রকট করে তোলে, তেমন আর কোন কিছুই ইতিপূর্বে করেনি। গোয়েবল্‌স্‌ তো স্পষ্টাস্পষ্টি বলেই দিয়েছিলেন, "এ যুদ্ধটা কোন সিংহাসন বা বেদী দখলের যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধ হলো খাবারের জন্যে রুটীর জন্যে, প্রাচুর্যময় ডিনার টেবিলে, প্রচুর প্রাতরাশ সুপ্রচুর নৈশভোজের জন্যে............আর কাঁচা মাল, রবার, ইস্পাত ও খনিজ লৌহের জন্যে।"

তখনও পর্যন্ত ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু না হওয়ার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে জার্মাণী বিরাট সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করলো সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্তে; জুন মাসের শেষাশেষি তার সামরিক বাহিনীর মোট পরিমাণ দাঁড়ালো দু'শ সাইত্রিশ ডিভিসন, যার মধ্যে একশ' চুরাশী ডিভিসন হলো নাৎসী জার্মাণ। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের সমগ্র গ্রীষ্ম ও শরৎকাল ধরে, শত্রু সৈন্যের ডিভিসন বেড়েই চললো ক্রমাগত, শেষ পর্যন্ত তার সংখ্যা দাঁড়ালো দু'শ ছেষট্টি: যার মধ্যে একশ' তিরানব্বইটি হলো শুধু জার্মাণ ডিভিসন। কিন্তু এতো সৈন্য সমাবেশ করেও জার্মাণী, সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে উনিশ শ' একচল্লিশের মতো প্রচণ্ডতায় আর আক্রমণ সুরু করতে পারলো না। তাকে কেবল দক্ষিণ অঞ্চলেই সীমিত থাকতে হলো।

সেনাদলের দক্ষিণমুখী অভিযাত্রী বাহিনীর সংগঠনে রইলো পাঁচটি জার্মাণ এবং রুমেনিয়া ইটালী ও হাঙ্গেরীর প্রত্যেকের একটি করে দল। তারাই মূল আক্রমণ পরিচালনা করবে। এই বাহিনীকে 'ক' ও 'খ' দুই শাখায় বিভক্ত করা হলো। 'খ' শাখা 'ক' উত্তর দিক দিয়ে অভিযান সুরু করে প্রথমে ডন উপত্যকার ভোরোনেঝ্‌—নোভয়া কালিৎভা অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাবে এবং তারপর দক্ষিণে মোড় ঘুরে ডন ও ভল্গার মধ্যবর্তী অঞ্চল দিয়ে সোজা চলে যাবে স্তালিনগ্রাদের (যার বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে ভোলগোগ্রাদ) দিকে। 'ক' শাখা সোজা এগিয়ে যাবে দক্ষিণ মুখে ডন উপত্যকার উপকূলের দিকে এবং এরই একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আক্রমণ করবে ককেশাস অঞ্চল।

জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ এই নোতুন সমর পরিকল্পনায় চাইলেন সোভিয়েত দেশের দক্ষিণাংশের প্রধান শস্য উৎপাদন ও শিল্পাঞ্চলকে দখল

করতে এবং ভল্গা অববাহিকা বিচ্ছিন্ন করে ককেশাস অঞ্চলে অভিযানের পথ প্রশস্ত করতে। ভল্গা অঞ্চলে পৌঁছবার পর 'খ' শাখার কাজ হবে, সেনাদলের যে অংশ ককেশাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার উত্তর ও পশ্চাৎ ভাগ সুরক্ষিত রাখা।

দক্ষিণমুখী অভিযানের কয়েকটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ছিল। যে রকম প্রথমেই বলা যায়, হিটলার জার্মাণী স্বপক্ষে তুরস্ককে যুদ্ধে টেনে নাবাবার প্রয়াস পাচ্ছিল রীতিমতো। এবার এই অভিযানের মাধ্যমে সোভিয়েত দেশের দক্ষিণাংশে দুই বন্ধুর "দেখা সাক্ষাৎ" হবে এমন একটা সম্ভবনার পথ খুলতে চাইছিল সে তুরস্কের শাসক গোষ্ঠীর কাছে। এই সম্ভবনা যে তাদের কাছে প্রলুব্ধকর হবে তার কারণ হলো এই যে, তুরস্কের শাসকচক্র মহা-তুরস্ক গঠনের জন্যে রাজ্যবিজয়ের উচ্চাশা পোষণ করতেন। উনিশ শ' একচল্লিশের জুলাই মাসে, তুর্কী পত্রিকা বোজ্‌কুর্ত। (Bozkurt) একটি মানচিত্র প্রকাশ করে যাতে মহাতুরস্কের সম্ভাব্য সীমানায় প্রায় অর্দ্ধেক সোভিয়েত ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

জার্মাণদের দক্ষিণমুখী অভিযান প্রসঙ্গে, আঙ্কারাস্থিত জার্মাণ রাষ্ট্রদূত, ফ্রানজ্‌ ভন্‌ প্যাপেন, তুর্কী রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে গভীর উৎসাহ আর অধ্যবসায় নিয়ে আলোচনা চালাতে থাকেন। তদানীন্তন তুর্কী প্রধান মন্ত্রী সুক্রু সারাকোগলু (Sucru Saracoglu) বলেন যে, "রাশিয়ার পতন প্রত্যক্ষ করার জন্যে তিনি উন্মুখ হয়ে আছেন।" তিনি বলেছিলেন, "রাশিয়াকে ধ্বংস করতে পারাটাই এক বিরাট সাফল্য। ফুয়েরার যদি তা করতে পারেন, তাহলে সেটা হবে তার এক চরম কৃতিত্ব, যে কৃতিত্ব অর্জন শতাব্দীতে মাত্র একবারই সম্ভব।... জার্মানীই কেবলমাত্র রুশ সমস্যার সমাধান করতে পারে। এবং তা করা যাবে রুশ জাতির অর্দ্ধেকের বেশি নির্মূল করে দিলে পরে।"[৩]

তুর্কী রাষ্ট্রপতি ইসমেট ইনোনুকে (Ismet Inonu), ভন্‌ প্যাপেন ককেশাস অঞ্চলে প্রত্যাসন্ন জার্মাণ অভিযানের খবর জানিয়ে বলেন যে "এই সময়ে যদি রুশ সীমান্তে তুর্কী সৈন্য সমাবেশ করা হয়, তাহলে জার্মাণী অত্যন্ত খুশি. হবে।"[৪] জার্মাণীকে খুশি করতে সদাব্যগ্র তুরস্ক সরকার, তুরস্ক-সোভিয়েত সীমান্তে ছাব্বিশ ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করলেন। কিন্তু ভল্গায় সোভিয়েত যে প্রচণ্ড তেজে পাল্টা আক্রমণ সুরু করলো, তাতে তুরস্কের অনেক আশার বেলুন চুপসে গেল।

আরেকটি দেশ যে উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল সেটি হলো জাপান। জাপান ততোদিনে দক্ষিণ সমুদ্রে আক্রমণ চালিয়ে প্রচুর সামরিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ লুঠ করে আরো শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে নিজের। জাপানী সংবাদপত্রগুলিতে উন্মাদের মতো চীৎকার সুরু হলো যে সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ন্যায়তঃ জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা একজন জাপানী গভর্ণর-জেনারেলের দ্বারাই শাসিত হওয়া উচিত। জাপানী সমরনায়করা একটা নোতুন পরিকল্পনা রচনা করলেন সেই আদর্শে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অতর্কিতে আক্রমণ করে যুদ্ধের সূচনা করা হবে। সোভিয়েত-জাপান চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই কার্যক্রমকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করার ফন্দী ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাই উনিশ শ' একচল্লিশের গ্রীষ্মকালের মতোই, মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানী সৈন্য বাহিনীকে যুদ্ধার্থে সম্পূর্ণ তৈরী রাখা হলো। জাপ সরকার কেবল ভোলগোগ্রাদের পতনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন, যাতে সেই সুবর্ণ মুহূর্ত আসলেই সৈন্যবাহিনীকে সোভিয়েত দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আদেশ দেওয়া যায়। কিন্তু ভল্গা শহরে অসীম বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম, আবার জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণের তারিখ পিছিয়ে দিতে বাধ্য করলো।

সমগ্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের চূড়ান্ত জয়পরাজয় নির্ণয়ে ভল্গা অঞ্চলের যুদ্ধের ফলাফল অসীম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু সেই চরম সংকটের দিনেও, নিজেদের দেশে জনগণের উপর্যুপরি দাবী সত্বেও, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার উনিশ শ' বিয়াল্লিশে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার প্রতিশ্রুতি বেমালুম চেপে গেলেন।

যখন হিটলার জার্মানী ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়ন একক সংগ্রামে রত, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার তাঁদের সামরিক বাহিনীর বেশির ভাগ অংশকেই যুদ্ধের অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে প্রায় যুদ্ধ না করিয়ে জমায়েত করে রেখেছিলেন।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার বিষয়ে তাঁদের নিজেদের সরকারের এই দীর্ঘসূত্রী মনোভাব ও কলাকৌশলের পিছনে প্রকৃত কারণ কি ছিল, সে বিষয়ে বেশ কিছু মার্কিণ ও বৃটিশ সামরিক ও রাজনৈতিক নেতা যথেষ্ট খোলাখুলি ভাবে

আলোচনা করেছেন। বৃটিশ যুদ্ধ ঐতিহাসিক লিডেল হার্ট (Liddell Hart) উনিশ শ' একচল্লিশে তাঁর এক গ্রন্থে বলেন যে বৃটেনের অতীত ইতিহাস তার বর্তমান শত্রুকে অনাহত রাখতে শিক্ষা দেয়। কারণ সে হলো তার ভবিষ্যত বন্ধু। সেই ইতিহাস আবার তার বর্তমান বন্ধুকে দুর্বল করে তোলার নির্দেশ দেয়, কারণ খুব সম্ভবতঃ সেই হবে তার শত্রু। এই ধারণা গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত পক্ষে বৃটিশ জনমতকে আগামী সোভিয়েত বিরোধী মৈত্রী সম্পর্কে মোটামুটি ইংগিত দিয়ে রাখা, যাতে বৃটিশ শাসক ও জার্মাণ জঙ্গীবাদের অবশিষ্ট অংশের মধ্যে কোন সমঝোওতায় বাধা না হয়।

তেসরা জুন উনিশ শ' বিয়াল্লিশে মার্কিণ বিচার দপ্তরের সহকারী অ্যাটর্নী জেনারেল আর্ণল্ড বলেন যে, মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা জার্মানীর সঙ্গে একটা সামরিক মৈত্রী স্থাপন করার পরিকল্পনা করছেন। তিনি বলেছিলেন: "মার্কিণ ব্যবসায়ী শ্রেণীর একটা ক্ষুদ্র অংশ, শক্তিমান জার্মাণ রাষ্ট্রের সঙ্গে যথারীতি ব্যবসা সম্পর্ক চালু রাখার নীতিতে, এই যুদ্ধকে এখনো একটা ক্ষণিক বিরতি বা অবকাশ বলে মনে করেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে সেই পুরানো সম্পর্ক আবার যথারীতি স্থাপিত হবে বলেই তাঁদের আশা। এই সমস্ত ব্যবসায়ীরা কার্টেলের নেতারা এখনো যে ভাবছেন এবং একথা বলছেন যেন যুদ্ধ একটা স্থিতাবস্থায় শেষ হবে তাই তারা শক্তিমান জার্মানীর সঙ্গে পুরাণো বাণিজ্য সম্পর্ক আবার যুদ্ধের পরে যথারীতি চালু করতে পারবেন, এ সবই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।"*

জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যে, পশ্চিমী মুখপাত্রগণ নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে লাগলেন, কেন তাঁদের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করতে এতো দেরী হচ্ছে বোঝানোর জন্যে। নাৎসীদের প্রচারিত অতলান্তিক প্রাচীরের রূপকথার কাহিনীকে আবার ফলাও করে বলতে লাগলেন, যা নাকি মহাদেশীয় ইউরোপের অভ্যন্তরে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কিণ দেশ ও বৃটেনের সামরিক ও রাজনৈতিকরা ভাণ করতে লাগলেন যেন সত্যিই কোথায় একটা অতলান্তিক প্রাচীর খাড়া হয়ে আছে। আফ্রিকা ও ইউরোপে মিত্রপক্ষের তদানীন্তন সর্বাধিনায়ক আইসেনহাওয়ার বললেন যে, "পশ্চিম ইউরোপের সুরক্ষিত উপকুলভাগকে সাফল্যের সঙ্গে আক্রমণ করা যাবে না।"

তিনি আরো বলেন, "অনেকেরই মতে এই ধরণের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে আক্রমণ করাটাই হলো মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ, একটা সামরিক আত্ম-হত্যার সামিল।"[৭]

আইসেনহাওয়ার বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার পূর্বে আমাদের দেখতে হবে যে "সত্যিই জার্মাণীর মনোবলে কোন ভাঙন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে কিনা"।[৮] যখন "চ্যানেল থেকে বার্লিন পর্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর বিজয় অভিযানকে মাঝে মধ্যে দু'একটা চোরাগোপ্তার গুলী ছাড়া আর কিছুই বিব্রত করার মতো থাকবে না,"[৯] দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার সেটাই হবে আরো বেশি আকাঙ্খিত সময়, চার্চিলের এই অভিমতের সঙ্গে আইসেনহাওয়ারের মতও হুবহু মিলে যায়।

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার চেয়েছিলেন যুদ্ধের লড়াই অংশ যেটা সেটা সোভিয়েত ইউনিয়ন একাই জার্মাণীর সঙ্গে ফয়সলা করুক, তারপরে সে আসবে বিজয়ীদের সভায় একত্রে বসার জন্যে। তাঁরা বেশ খোলাখুলি স্বীকার করে-ছিলেন যে তাঁরা বিরাট কিন্তু কর্মরত নয়, এমন সৈন্যবাহিনী গঠন করেছেন। কমন্স সভায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে চার্চিল বলেন, "রণাঙ্গনে এমন প্রচুর সৈন্য সমাবেশিত হয়েছে যারা কোন লড়াই করছে না।"[১০] আর জনসাধারণকে বলা হলা হলো বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে জার্মাণীর আক্রমণের আশংকা এখনো তিরোহিত হয়নি। একথা চার্চিল বলেছেন এপ্রিল মাসে আবার জুলাই মাসে উনিশ শ' বিয়াল্লিশে।[১১]

তিনি এই ধারণার উপরই সবিশেষ জোর দিয়েছিলেন যে, "কেউ একথা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারে না যে জার্মাণী রাশিয়াকে হারাতে পারবে না, কিম্বা তাকে উরাল পর্বতের পিছনে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারবে না।"[১২] অথচ এই পরিস্থিতিতে যে কোন মানুষের পক্ষে এটাই ভাবা স্বাভাবিক যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন তাদের মিত্রপক্ষের দিকেই সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হবে। তা কিন্তু ঘটলো না আদৌ। এবং চার্চিল দেখা গেল যে মিত্রপক্ষের দুর্দ্দশায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করার চেয়ে বেশ যেন খুশিই হয়েছেন। কূপমণ্ডুক মার্কিণ ও বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা একথাটা ভেবে দেখেননি যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপদ আজ তাদেরও বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধের পরে, মার্কিণ ঋণ সাহায্য সংস্থার যুদ্ধকালীন নিয়ামক, এডোয়ার্ড আর ষ্টেটিনিয়াস (Edward R. Stettiuius) লিখেছেন :

"আমেরিকাবাসীর স্মরণ রাখা উচিত যে উনিশ শ' বিয়াল্লিশে তারা একেবারে বিপর্যয়ের কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল। যদি সেদিন সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিজ সীমান্তে পরাজিত হতো, তা হলে জার্মাণরা গ্রেট বৃটেনে দখলে করে নিতে পারতো। তাহলে আফ্রিকা দখল করাটা শক্ত কাজ হতে না তাদের পক্ষে। এবং এগুলো হয়ে গেল তারা লাতিন আমেরিকাতে ঘাঁটি গড়বার মতো জায়গাও করে নিতে পারতো।"[১৩]

বৃটিশ শ্রমিক দলের নেতারা দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার বিষয়ে চার্চিল মন্ত্রিসভার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন। যথা সম্ভব দ্রুত দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সুরু করার এক গণদাবীর জবাবে, অ্যাটলী ও বেভিন বলেছিলেন যে, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকের দাবীতে সামরিক সিদ্ধান্ত প্রভাবিত হতে পারে না। সরকার ভালোমতেই জানেন যে কি করতে হবে এবং তাঁরা কি করছেন।

ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিই দ্রুত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। দলের পক্ষ থেকে সরকারীভাবে অনেক বিবৃতি প্রকাশ করে দ্বিতীয় রণাঙ্গন বাণচাল করার অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং বৃটিশ সরকারকে অনুরোধ করা হয় যে, তাঁরা যেন তাঁদের প্রতিশ্রুতি পালনে পরাঙ্মুখ না হন।

চার্চিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত উপায়ে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা স্থগিত রাখতে লাগলেন। তাঁর মনোযোগ উত্তরোত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। মার্কিণ নেতারাও অনুরূপ নীতির পক্ষপাতী হয়ে উঠতে লাগলেন ক্রমাগত। যখনই কোন আলাপ আলোচনায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠে পড়তো, মার্কিণ জেনারেলরা সোভিয়েত ইউনিয়নের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে দাবী জানাতেন। আসলে তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এইটা দেখা যেন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপান পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, উভয়েই দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া আরো যে প্রত্যাশা ছিল মার্কিণ নেতাদের তা হলো যে এই সুযোগে সাইবেরিয়া ও সোভিয়েত দূর প্রাচ্যে একটা ঘাঁটি গড়ে তোলার সুবিধা পাওয়া যাবে। মার্কিণ সমর নায়ক পরিষদের, সামরিক কার্যক্রম শাখা পঁচিশে মার্চ, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে যে স্মারকলিপি রচনা করেছিলেন তাতে বলা হয়ে ছিল যে, "পশ্চিম

সাইবেরিয়ায় যে কোন যুদ্ধাবস্থা এড়াতে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিতান্ত আগ্রহী, কিন্তু এই এলাকাতেই আমাদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি।"[১৪]

মার্কিণ সরকার ও উচ্চপদস্থ মার্কিণ সামরিক নেতারা সোভিয়েত সাইবেরিয়ায় নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জন্যে স্থানীয় বিমান ঘাঁটিগুলির উপর কর্তৃত্ব দাবী করেছিলেন এবং সেই জন্যেই সুবিধা হবে ভেবে তাঁরা জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করছিলেন।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ক্রমাগত দাবী করছিলেন যে মার্কিণ বিমান বাহিনীর একটা বিরাট অংশকে সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ও সাইবেরিয়ায় ঘাঁটি স্থাপন করতে দেওয়া উচিত। সেই উদ্দেশ্যে দূর প্রাচ্যে সোভিয়েতের সামরিক ঘাঁটিগুলি পরিদর্শন করার জন্যে জেনারেল ওমার সি, ব্রাডলীর নেতৃত্বে একটি সামরিক মিশন প্রেরণ করার জন্যে সোভিয়েত সরকারের অনুমতি চাইলেন। এরই সঙ্গে সাইবেরিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাপক আলোচনার জন্যে জেনারেল জর্জ সি, মার্শালের মস্কো সফরের ও প্রস্তাব করা হলো।

তেরই জানুয়ারী, উনিশ শ' তেতাল্লিশে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রি পরিষদের সভাপতি, মার্কিণ রাষ্ট্রপতিকে জানালেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিমান বাহিনীর কোন সংস্কার প্রয়োজন নেই। তার প্রয়োজন হলো চালক বিহীন বিমানের, কারণ তার নিজস্ব পাইলটের সংখ্যা হলো যথেষ্ট। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে যে কথা বলেন তা হলো এই যে বিমানের প্রয়োজনীয়তা সোভিয়েত ইউনিয়নের আছে, "সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের জন্যে সেখানে বিমান খুবই দরকার। দূর প্রাচ্যের জন্যে নয়, কারণ সেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কারো কোন যুদ্ধাবস্থা নেই।" সেই বাণীতে মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি মার্কিণ প্রস্তাব যে "জেনারেল ব্রাডলী দূর প্রাচ্যে ও অন্যত্র রাশিয়ার সামরিক সংস্থাগুলি পর্যবেক্ষণ করবেন "তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেন।" এটা নিতান্তই স্পষ্ট থাকা উচিত যে রাশিয়ার সামরিক সংস্থাগুলি পরিদর্শন করবে একমাত্র রুশরা, ঠিক যেমন মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি কোন আমেরিকান ছাড়া আর কারো পরিদর্শনের অধিকার নেই। এ ব্যাপারে কোথাও কোন অস্পষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।"[১৫]

"সাহায্য দানের" ইচ্ছার আবরণে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে দাবী জানালো, বলা বাহুল্য তা প্রত্যাখ্যাত হলো।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার পরিবর্তে, ফরাসী উপকূলে ছোটখাটো কিছু তথাকথিত আক্রমণ চালিয়ে গেল পরপর। এই ধরণের আক্রমণের ফলে জার্মাণদের ধারণা হলো যে আপাততঃ পশ্চিম ইউরোপে বড়ো রকমের কোন মিত্রপক্ষীয় আক্রমণ প্রচেষ্টা বা সৈন্য অবতরণ করা হবে না। তা ছাড়া নগণ্য সৈন্য নিয়ে ছোটখাটো আক্রমণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে, তারা এটাই "প্রমাণ" করতে চাইলো যে সুনিশ্চিত পরাজয় হবে জেনেই এখন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করতে হবে। সেই জন্যেই দিয়েপে (Dieppe) মিত্রপক্ষীয় সৈন্য অবতরণ করার পূর্বেই, উনিশে আগষ্ট উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, লণ্ডন রেডিয়ো থেকে বেতারে প্রচার করা হলো যে এই অভিযানের লক্ষ্য নিতান্ত সীমাবদ্ধ। ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষ সৈন্য অবতরণের খবর পেয়ে পাছে হঠকারিতার বশে কোন কাজ করে ফেলে, তাদের সে কাজে উৎসাহ না দেওয়ার জন্যেই এই আনুষ্ঠানিক বেতার বার্তা প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু আসলে এর উদ্দেশ্য ছিল যে ক্যানাডীয় ডিভিসন অবতরণ করছে যাতে জার্মাণরা সংগঠিত ভাবে তাদের বাধা দিতে পারে, তারই পথ সুগম করে দেওয়া। এই অভিযানে যে সব সৈন্য ও অফিসার অংশ গ্রহণ করেছিল, তারা প্রচণ্ড বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেও, আগের থেকেই তাদের নিয়তি নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল।

তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, মার্কিণ দেশ ও বৃটেনের বহু মানুষ সন্দেহ করেছিলেন যে আদৌ কোনদিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা হবে কিনা। "যে সমস্ত অফিসার এই অভিযানের পরিকল্পনায় যুক্ত ছিলেন, তাঁরা পরে স্বীকার করেছেন সে তাঁদের মনে একটা ভয় ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল যে আসলে এই সব তোড়জোড়ের সবটাই হলো একটা প্রচণ্ড ধাপ্পা। আসলে আমরা মোটেই পশ্চিম ইউরোপ আক্রমণ করবো না। সুতরাং সাধারণ মানুষের মনে যে সন্দেহ দেখা দেবে, তার জন্যে তাদের মোটেই দোষ দেওয়া যায় না।"[১৩]

সরকারী বৃটিশ ও মার্কিণ ইতিহাসবিদ্‌রা দাবী করেছেন যে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সুরু করতে না পারার যে অসুবিধা, তা সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রচুর যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে বহুগুণ বেশি মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন দেখা যায় জে. এফ. সি. ফুলার লিখেছেন যে, "উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শরৎকালে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা চরম সংকটের মুখোমুখি

হয়ে পড়েছিল, সে সময়ে যদি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ইঙ্গ-মার্কিণ সাহায্য আর্কেঞ্জেলে এসে না পৌঁছতো, তাহলে হিটলার তাঁর সৈন্য সমাবেশ করে যে অবিশ্বাস্য অবস্থার সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে কাটিয়ে উঠে, সমস্ত পরিস্থিতি রাশিয়া নিজের অনুকূলে নিয়ে যেতে পারতো কিনা সন্দেহ।"[১৭] এই উক্তি একেবারে সর্বৈব মিথ্যা। কোনদিনই "নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ইঙ্গ মার্কিণ সরবরাহ" রাশিয়ায় এসে পৌঁছায় নি।

এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক ফ্লেমিং কি বলছেন দেখা যাক। তিনি লিখেছেন, "প্রথমে ঋণ সাহায্য চুক্তি অনুযায়ী সরবরাহের ধারা ছিল নিতান্ত ক্ষীণ। একেবারে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আসছিল তা। উনিশ শ' একচল্লিশে সেই সাহায্যের মূল্যায়ন করলে, তাকে নৈতিক সমর্থন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। আর উনিশ শ' বিয়াল্লিশে......রাশিয়ায় যে সাহায্য পাঠানো হয়......তা কোন মতেই প্রচুর করা যায় নি।"[১৮] এবং স্বয়ং এডোয়ার্ড আর স্টেটিনিয়াস, মার্কিণ ঋণ সাহায্য সংস্থার নিয়ামক স্বীকার করেছেন যে, "সামগ্রিক পরিস্থিতির বিচারে আমরা যে সব অস্ত্র শস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, তাকে পর্যাপ্ত বলা যায় না।"[১৯] ম্যাকইন্নিসের (McInnis) মতেও, স্তালিনগ্রাদের সময়ে পশ্চিমী সাহায্যের পরিমাণ অল্পই ছিল। তিনি আরো বলেছেন যে, "রাশিয়া তার রণাঙ্গনে নিজের যে জিনিস ব্যবহার করেছে, তুলনায় পশ্চিমী সাহায্যের গুণগত মান ছিল নীচু দরের।"[২০]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এই সরবরাহ এবং যুদ্ধের সংকটময় মুহূর্তে সাময়িক বিরতিগুলিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে লাগলো। সুরুতে তারা অজুহাত দেখাতো যে আসন্ন উত্তর আফ্রিকা অভিযানের জন্যে তারা জিনিসপত্র যোগানের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে পারছে না। পরে সোভিয়েতের উত্তর সাগরতীরস্থ বন্দর আর্কেঞ্জলগামী এক সরবরাহ বহর রওনা করে দিয়ে, তাদের প্রতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করে জার্মাণদের সেগুলি আক্রমণ ও বিনষ্ট করতে পরোক্ষে সাহায্য করা হলো। উদ্দেশ্য হলো শুধু এইটা প্রমাণ করা যে সোভিয়েতে মালমাত্র পাঠানোর অসুবিধার, বিপদের আর শেষ নেই।

যে সরবরাহ বহরের উল্লেখ এখানে করা হলো, তা হচ্ছে পি, কিউ,—সতের'র কথা। চৌত্রিশটি মালবাহী জাহাজ এতে ছিল, যারা বাইশে জুন,

উনিশ শ' বিয়াল্লিশে আইসল্যাণ্ড থেকে রওনা হয়। এর সঙ্গে পাহারাদার হিসাবে যায় ছ'টি ডেষ্ট্রয়ার, দু'টি বিমান বিধ্বংসী জাহাজ, দু'টি ডুবোজাহাজ এবং এগারোটি ছোট খাটো জাহাজ। এদের সাহায্যকারী হিসাবে ছিল দু'টি করে বৃটিশ ও মার্কিণ ক্রুইজার ও তিনটি ডেষ্ট্রয়ার। নরওয়ের উত্তর উপকূলে ন'টি বৃটিশ ও দু'টি রুশ ডুবো জাহাজ এদের জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। তাছাড়া কোন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে এদের আগে যেতে থাকে দু'টি যুদ্ধ জাহাজ, একটি বিমানবাহী জাহাজ, তিনটি ক্রুইজার ও অনেকগুলি ডেষ্ট্রয়ার। যেখানে সোভিয়েত নৌ বহর জার্মাণদের আটকে রেখে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেখান দিয়ে এই সরবরাহ বহর নিরাপদে পার করে নেওয়ার মতো অনেক যুদ্ধ জাহাজই ছিল এর সঙ্গে।

চৌঠা জুলাই তারিখে যখন সরবরাহ বহর মাঝ সমুদ্রে এসে পড়েছে, তখন হঠাৎ লণ্ডন থেকে আদেশ এলো যে সমস্ত পাহারাদার, পথ প্রদর্শক ও অগ্রবর্ত্তী বাহিনীর জাহাজগুলি যেন অবিলম্বে ফিরে আসে। সরবরাহকারী জাহাজগুলিকে বলা হলো, তারা যেন দলবদ্ধ ভাবে না গিয়ে "একক ভাবে সোভিয়েত বন্দরের দিকে এগিয়ে যায়।" বৃটিশ নৌ দপ্তর যখন এই আদেশ পাঠালেন, তখন তাঁরা বিলক্ষণ জানতেন যে এই সরবরাহ বহরের যাত্রাপথের খবর জার্মাণদের জানা আছে। সুতরাং বলা যায় যে স্বেচ্ছাকৃতভাবেই জার্মাণ বিমানবাহিনী ও ইউ-বোটের আক্রমণ সম্ভাবনার মুখে এই জাহাজগুলিকে ঠেলে দেওয়া হলো। এ সম্পর্কে চার্চিল তাঁর স্মৃতিকথায় এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন। "মোটামুটি এই ব্যাপারে আমি আমার সব দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলাম।"[২১] বৃটিশ নাবিকরা তাদের পিছনে কি গভীর ষড়যন্ত্র হয়ে গেল, তার বিন্দুমাত্র কোন আভাস পায় নি। তাই তারা সোভিয়েতের মানুষের এক চরম সংকটময় মুহূর্তে অসীম বীরত্ব দেখিয়ে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করেছিল।

পি, কিউ-সতের সরবরাহ বহর আক্রান্ত হলো। এর চৌত্রিশটি জাহাজের তেইশটি জাহাজ ডুবে গেল। ফলে মার্কিণ ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাটিকে সোভিয়েতে মালপত্র পাঠানোর দায়িত্ব পালন অসম্ভব, এমন কথা বলার বেশ একটা ভালো সুযোগ পেয়ে গেলেন। সরবরাহের পরিমাণ এই অজুহাতে কমিয়ে দেওয়া হলো। সতেরই জুন তারিখে বৃটিশ সরকার সরকারীভাবে

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন যে আপাততঃ মালপত্র রপ্তানী স্থগিত রাখা হবে। চার্চিল স্বয়ং তাঁর স্মৃতিকথায় স্বীকার করেছেন যে সময়ে যুদ্ধোপকরণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল, ঠিক সেই সময়েই সে গুলি পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হলো।

উত্তরাঞ্চলের বন্দরে মালপত্র রপ্তানী বন্ধ করে দেওয়ার বিষয়ে, সোভিয়েতের কি মন্তব্য, তা সোভিয়েত সরকার চার্চিলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই স্থগিতকরণ সম্পর্কে বৃটিশ অজুহাত তাঁরা গ্রহণযোগ্য নয় বলেই মনে করেন।

সোভিয়েত সরকারের বাণীতে বলা হয় যে, "প্রকৃত সদিচ্ছা ও নিজ দায়িত্ব পালনে আগ্রহ এবং তৎপরতা থাকলে, মালপত্র রপ্তানীর গতি জার্মানদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে অব্যাহত রাখা যেত। পি, কিউ-সতের জাহাজগুলিকে মালবহনকারী জাহাজগুলি অরক্ষিত অবস্থায় রেখে বৃটেনে ফিরে যাওয়ার যে নির্দেশ বৃটিশ নৌ দপ্তর দিয়েছিলেন, যখন মালবহনকারী জাহাজগুলিকে তাঁরা কোন পথ নির্দেশকের সাহায্য ছাড়াই, বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে সোভিয়েত বন্দরের দিকে যাত্রা করতে বলেন, তখন সেই নির্দেশের তাৎপর্য আমাদের বিশেষজ্ঞদের কাছে একটা হতবুদ্ধিকর, ব্যাখ্যার অতীত ঘটনা বলেই মনে হয়।"[২২]

সেই বাণীতে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার বিষয়টি উনিশ শ' তেতাল্লিশ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটিও যে সোভিয়েত সরকারের সমস্ত প্রত্যাশার অতীত, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়। তাঁরা জানান যে এই সিদ্ধান্ত তাঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না।

সোভিয়েত দেশে পোলিশ পলাতক সরকারের যে সৈন্যবাহিনী গঠিত হয়েছিল, সোভিয়েত—পোলিশ চুক্তি অনুযায়ী তাদের তখন রণাঙ্গন সীমান্তে রওনা হওয়ার কথা। সৈন্যবাহিনীর বেশির ভাগ অংশই তখন নাৎসীদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করতে ব্যগ্র। কিন্তু তাদের অধিনায়ক, জেনারেল আন্দের্সের মতলব ছিল ভিন্ন।

লণ্ডন থেকে প্রকাশিত পলাতক পোলদের এক সংবাদপত্রে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মে মাসে লেখা হয়:

"এই বছরের আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ জার্মাণ ও সোভিয়েত সেনা-বাহিনী নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ হতবল হয়ে যাবে। তারা পরস্পরকে ধ্বংস করে ফেলবে।

তখন সময় আসবে অ্যাংলো সাক্সনদের আঘাত হানবার।"[২৩] ভল্গার যুদ্ধ যখন চরমে উঠেছে, তখন আন্দের্সের সৈন্যবাহিনীকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মধ্য প্রাচ্যে।

চেকোস্লোভাক পলাতক সরকারের যে সৈন্যবাহিনী সোভিয়েত দেশে সংগঠিত হয়, চেক সরকার তাদের নিরাপদে মধ্য প্রাচ্যে সরিয়ে নেওয়ার জন্যে ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হলো। চেকোস্লোভাক ইউনিটের সংগ্রামী মানুষ সোভিয়েত সরকারকে, হিটলারী সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। তাদের সেই অনুরোধ রক্ষা করা হলো। উনিশ শ' তেতাল্লিশের মার্চে তাদের পাঠানো হলো সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্ত, খারকভের দক্ষিণে সোকোলোভো গ্রামের কাছেই।

॥ দুই ॥

সোভিয়েতের তৈল সম্পদের প্রতি লোভ কেবলমাত্র হিটলার জার্মাণীরই ছিল না। মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নজরও পড়েছিল এর উপর। তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের অসুবিধাগুলিকে নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা করতে লাগলো। মধ্য প্রাচ্য থেকে ককেশাস অঞ্চলে সৈন্য প্রেরণের জন্যে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার একটা পরিকল্পনা তৈরী করে ফেললেন। তার নাম দেওয়া হয়েছিল ভেলভেট পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনা সত্ত্বেও তারা কে আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে তার তোড়জোড় করতে লাগলেন। এই ধরণের পারস্পরিক স্বার্থগত প্রতিযোগিতা সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই পরিচায়ক।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের আগষ্টে চার্চিল মস্কোয় গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে তাঁর সেই পুরাণো খবর যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন উনিশ শ' বিয়াল্লিশে তাদের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার দায়িত্ব পালনে অপারগ। চার্চিল বিমানে বসেই তাঁর রোজনামচায় নীচের কথাগুলি লিখেছিলেন :

"এই বলশেভিক রাষ্ট্রে সফর করতে এসে আমি আমার উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবতে লাগলাম। এই সেই রাষ্ট্র যাকে জন্মলগ্নে শ্বাসরোধ করে হত্যা করার জন্যে আমি চেষ্টার কোন কার্পণ্য করিনি। আজ তাদের আমি কি কথা বলার

দায়িত্ব নিয়ে এসেছি? জেনারেল ওয়াভেল তাঁর সাহিত্যিক সুলভ মনোভাব নিয়ে একটি কবিতায় সেই কথাগুলোই বলেছেন......। বেশ কয়েকটি ছত্রের কবিতা। আর তাদের প্রতিটি স্তবকের শেষ পংক্তিতে লেখা আছে, "উনিশ শ' বিয়াল্লিশে কোন দ্বিতীয় রণাঙ্গন নয়।"[২৪] এই অনুচ্ছেদ থেকেই বোঝা যায় যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থগিত রাখার নীতি হলো আসলে তাঁর পুরাণো সোভিয়েত বিরোধী নীতিরই একটা নবতর অন্তর্ঘাতমূলক সম্প্রসারণ মাত্র।

মস্কো বৈঠকে যোগ দিলেন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী, মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ও সোভিয়েত রাষ্ট্রনেতারা। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর নায়কদের মধ্যেও নানা আলাপ আলোচনা চললো।

মার্কিণ মুখপাত্রের সমর্থনপুষ্ট হয়ে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী সরকারী ভাবেই সোভিয়েত সরকারকে জানিয়ে দিলেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন উনিশ শ' বিয়াল্লিশে সুরু না করে পরের বছর সুরু করার সময় স্থিরীকৃত হয়েছে। চার্চিলকে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হলো। তাতে বলা হয়েছিল :

"ইউরোপে উনিশ শ' বিয়াল্লিশে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করায় বৃটিশ সরকারের অসম্মতি, সোভিয়েত জনমতের বিরুদ্ধে একটা নৈতিক আঘাত স্বরূপ। কারণ তার প্রত্যাশা ছিল যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা হবে। এর ফলে সীমান্তে যুদ্ধরত লালফৌজের বেশ অসুবিধা হবে এবং সোভিয়েত সামরিক পরিষদের পরিকল্পনা বাধাপ্রাপ্ত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করায় বৃটিশ সরকারের অসম্মতির মধ্য দিয়ে লাল ফৌজকে যে অসুবিধায় পড়তে হবে, তার ফলে বৃটেন ও অন্যান্য মিত্রপক্ষের সামরিক তৎপরতা অনিবার্যভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।"[২৫]

উনিশ শ' তেতাল্লিশেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা হবে কিনা সে বিষয়ে সোভিয়েত স্মারকলিপিতে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। তিরিশে জানুয়ারী, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত সরকার মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার কি প্রস্তুতি করা হয়েছে এবং উনিশ শ' তেতাল্লিশেও তা সুরু করা হবে কিনা। তার কোন জবাব এলো না, যদিও সোভিয়েত সরকার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, "সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনী জার্মানী ও তার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জার্মাণ সীমান্তে

যথাসাধ্য আক্রমণ চালিয়ে যাবে।[২৬] সারা পৃথিবী জানে সোভিয়েত সরকার তাদের এই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

চার্চিল ভেবেছিলেন যে ভল্গা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সোভিয়েতের যে প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে, তিনি তাকে নিজের কাজে লাগাতে পারবেন। তিনি বারেবার বৃটিশ সৈন্য দিয়ে সোভিয়েত ট্রান্সককেশিয়া দখল করানোর জন্য সোভিয়েতের সম্মতি আদায় করতে চাপ দিতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এটা বুঝতে দেরী হলো না যে সে সম্মতি তিনি কোনদিনই পাবেন না। বরং তাঁর মার্কিণ সহযোগী ও নিজের কাছে একথাটা নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে গেল যে এই প্রচেষ্টায় হতাশা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল যে যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্লান্ত, শ্রান্ত হতবল হয়ে পড়বে। কিন্তু তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বরং বিপরীতটাই যেন ক্রমে প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো। ফলে চার্চিল আবার উঠে পড়ে লাগলেন, বৃটেনে ফিরে এসে উনিশ শ' বিয়াল্লিশের অক্টোবরে কেমন করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঘায়েল করা যায়। একটা গোপন স্মারকলিপি প্রচার করলেন তিনি, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক সামরিক মৈত্রী গঠনের প্রস্তাব করা হলো।[২৭]

ভল্গার যুদ্ধ যখন চরম পর্যায়ে উঠেছে, সেই সময়ে মাদ্রিদে বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েল হোর ও জাপানী রাষ্ট্রদূত সুমা গোপনে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। হোর প্রস্তাব করেন যে বৃটেন ও জাপান শান্তিচুক্তি করে ফেলুক; তিনি উত্তর চীনে জাপানী অধিকারে বৃটিশ স্বীকৃতি দানের বিনিময়ে জাপানের কাছে সিঙ্গাপুর ও সমগ্র মালয় ফেরৎ চাইলেন। বৃটেনের এই শান্তিপ্রচেষ্টার পূর্বতন বিভিন্ন সর্তসাপেক্ষে উত্থাপিত মার্কিণ প্রস্তাবগুলির মতোই লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন, কেমন করে সোভিয়েত-জাপান যুদ্ধ ত্বরান্বিত করা যায়।

সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের চরম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও স্বার্থসিদ্ধির পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিল। যেইমাত্র ওয়াশিংটন জানতে পারলো যে চার্চিলে ককেশাস অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব করেছেন, অমনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সেই প্রস্তাব সমর্থন করে দাবী করলো যে মার্কিণ সৈন্যও এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে। শুধু তাই নয়, মার্কিণ সরকার সোভিয়েতের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামরিক কেন্দ্রগুলিতে যথা ট্রান্স-ককেশিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও কামচাট্‌কায় মার্কিণ

সামরিক ঘাঁটি স্থাপনেরও প্রস্তাব করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাইবেরিয়ায় মার্কিণ বিমান ঘাঁটি স্থাপনের জন্যেও নোতুন করে প্রস্তাবাকারে দাবী জানানো হলো। মার্কিণ বিমান বহরের সৈন্যবাহিনীর কমাণ্ডার, জেনারেল হেনরী এইচ্ আর্ণাল্ড, আইসেনহাওয়ারের কাছে লেখেন যে, "ব্যাপারটা এখানেই ছেড়ে দিলে চলবে না। সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলিকে যতো দ্রুত সম্ভব কাজে লাগাবার উপযুক্ত করে তুলতে হবে। তাছাড়া ওই সব জায়গায় আমাদের ঘাঁটি করতেই হবে, যাতে ভবিষ্যতে যদি কোনদিন বিশ্ব পরিস্থিতি সেটা অনিবার্য করে তোলে, এই নিয়ে কেউ কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা করতে না পারে।"[২৮]

সোভিয়েত ইউনিয়ন আপত্তি করায়, মার্কিণ শাসকচক্র ভল্গা সংগ্রামের এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তরে, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রপ্তনী বন্ধ করে দিয়ে প্রতিশোধ নিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃঢ় প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সোভিয়েত ট্রান্সককেশাস অঞ্চল দখল করার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। আটাশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' বিয়াল্লিশে চার্চিল ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ সামরিক নেতৃত্বের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠিয়ে, তিরস্কারের ভাষায় তাদের ককেশাস অঞ্চলে সুযোগ না হারানোর জন্যে ইংগিত করলেন। কিন্তু জার্মাণদের আক্রমণধারা উনিশ শ' বিয়াল্লিশেই বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, তিনি উদ্বিগ্ন বোধ করতে লাগলেন।[২৯] স্মারকলিপিতে সরবরাহকারী পি, কিউ—উনিশ কনভয় যে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে, তাও জানানো হলো। সে সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় অভিমত ছিল এই যে ব্যাপারটা সোভিয়েত ইউনিয়নকে জানতে দেওয়া ঠিক হবে না। পাঁচই অক্টোবর উনিশ শ' বিয়াল্লিশে রুজভেল্ট চার্চিলের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে ককেশাস অভিযানের পরিকল্পনা অনুমোদন করে বলেন যে সোভিয়েতে সরবরাহকারী কনভয় যে আদৌ রওনা হবেনা সেকথা বলার কোন দরকার নেই।[৩০]

এদিকে সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে তখন চলেছে তীব্র সংগ্রাম। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের আটাশে জুন, জার্মাণরা আক্রমণ সুরু করলো। ওরেলের দক্ষিণে সোভিয়েত সেনাদলের বাম ভাগকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার সর্বতোমুখী জার্মাণ

প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী অনেক বেশি শক্তিশালী শত্রুর অগ্রগতি রোধ করে তার অভিযান পরিকল্পনাকে বিলম্বিত করে দেওয়ার কার্যক্রম সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করেও ডন নদীর অপর তীরে পিছু হটে যেতে বাধ্য হলো। ছয়ই জুলাই ভোরোনেঝের কাছে অগ্রসরমান শত্রু সৈন্য বাহিনী উত্তর দিক থেকে সোভিয়েতের প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণের সম্মুখীন হলো। ফলে হিটলার বাহিনীর অগ্রগতি রুদ্ধ হলো। জার্মাণ অভিযান কার্যক্রম প্রাথমিক স্তরেই ব্যর্থ হয়ে গেল। তারপর সংগ্রামের কেন্দ্র সরে গেল দক্ষিণের দিকে, ভল্গা অঞ্চলে। বারোই জুলাই সোভিয়েতের সর্বোচ্চ সমর পরিষদ ভল্গা রণাঙ্গনের গোড়াপত্তন করলেন কর্ণেল-জেনারেল এ. জেরেমেঙ্কোর নেতৃত্বে। স্থানীয় যে সামরিক পরিষদ গঠিত হলো তার একজন সদস্য হলেন এন. এস. খ্রুশ্চভ।

সতেরোই জুলাই চির নদীর তীরে ভল্গা রণাঙ্গনের প্রথম যুদ্ধ হলো। পরবর্তী চার মাস ধরে, আঠারোই নভেম্বর উনিশ শ' বিয়াল্লিশ পর্যন্ত, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী অসীম কষ্ট সহ্য করে, দৃঢ় প্রতিরোধ খাড়া রেখে দিল।

এর মধ্যে জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর দু'টি শাখা, ষষ্ঠ ও চতুর্থ প্যানসার বাহিনী ভোলগোগ্রাদে এসে মিলিত হলো। কিন্তু সেনাদল অধিকতর শক্তিশালী শত্রুবাহিনীকে তা সত্ত্বেও অগ্রসর হতে দিল না।

সাধারণ সৈনিক ও অফিসাররা অবিশ্বাস্য বীরত্বের পরিচয় দিলেন। এই রকম হাজার হাজার কাহিনীর কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। নয়ই আগষ্ট তারিখে যেদিন সোভিয়েত সেনাদলের চৌষট্টিতম শাখা পাল্টা আক্রমণ করে, সেইদিনেই জার্মাণদের শতাধিক ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ক্লেৎস্কায়ার (Kletskaya) কাছে সৈন্যবাহিনীর বাষট্টিতম শাখার তেত্রিশ সংখ্যক গার্ড ডিভিসনের মাত্র চারজন সৈনিক দু'টি ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান নিয়ে পি. ও. বোলোতোভের নেতৃত্বে তিরিশটি জার্মাণ ট্যাঙ্কের গতিরোধ করে এবং পনেরটি ধ্বংস করে দেয় একদিনে। রণাঙ্গনের অপর এক অঞ্চলে, ষোলই আগষ্ট চল্লিশ সংখ্যক পদাতিক গার্ড বাহিনীর ষোলজন সৈনিক জুনিয়র লেফটেন্যান্ট ভি. ভি. কোচেৎকভের নেতৃত্বে বারোটি ট্যাঙ্ক সমেত এক কম্পানী নাৎসী সৈন্যের আক্রমণ পরপর পাঁচবার প্রতিহত করে দেয়। সোভিয়েত সৈনিকদের সব গোলাবারুদ নিঃশেষিত হয়ে গেল, যে ক'জন তাদের তখনো বেঁচে ছিল,

তারা হাতবোমা নিয়ে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং শত্রুর ছ'টি ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে দেয়।

পঁচিশে জুলাই জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ ককেশাস দখল করার জন্যে কুখ্যাত এডেলভেইস (Edilweiss) পরিকল্পনার রূপায়নে সচেষ্ট হলেন। জার্মাণ সৈন্যরা প্রতিরোধ ভেঙ্গে উত্তর ককেশাস ও কুবান অঞ্চলে এসে হাজির হলো। উত্তর ককেশাস রণাঙ্গনের সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী বাধ্য হয়ে পিছু হটে গেল ককেশাস পর্বতমালার সানুদেশে। ভল্গায় সোভিয়েত প্রতিরোধ কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়েই জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ উত্তর ককেশাসে সমবেত জার্মাণ সৈন্যের সংখ্যা কমিয়ে, চতুর্থ প্যানসার শাখাকে ককেশাস অঞ্চল থেকে ভল্গা শহরের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের ডিসেম্বর পর্যন্ত ককেশাস রণাঙ্গনে চললো ভয়াবহ সংগ্রাম। এবং শেষ পর্যন্ত তখন সেখানেও সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী শত্রুর অগ্রগতিকে রুদ্ধ করতে সমর্থ হলো।

জার্মাণ জেনারেলরা বলেছিলেন যে ককেশাস অঞ্চলে তাঁদের ব্যর্থতার মূল কারণ হলো তৈল সরবরাহে তীব্র সংকট। 'ক' সংখ্যক সেনাদলের অধিনায়ক, ফিল্ড মার্শাল ফন ক্লেইষ্ট (Kleist) বলছেন :

"আমাদের সঙ্গে সমস্ত জ্বালানী, তৈল আমরা নিঃশেষিত করে ফেলায় থেমে যেতে বাধ্য হলাম। তৈল সরবরাহও প্রয়োজনের অনুপাতে ছিল অনেক কম।"

টিপ্পলস্কার্চের মুখেও শোনা যায় তারই প্রতিধ্বনি। তিনি লিখেছেন : "সরবরাহের অসুবিধাই আমাদের ককেশিয়া গিরিপথগুলি দখল করায় বাধা দিল।"[৩১]

কিন্তু আসল ঘটনার সঙ্গে এই সব উক্তির কোনও মিল নেই। জার্মানীর ব্যর্থতার প্রকৃত কারণ হলো উত্তরোত্তর ব্যাপক ও সুতীব্র সোভিয়েত প্রতিরোধ ও জার্মাণ সমর নায়কদের অগ্রপশ্চাৎ বিচার বিবেচনাহীন অ্যাডভেঞ্চার করার প্রবণতা। নাৎসী পরাজয়ের মূল কারণ সরবরাহের অপ্রাচুর্য, একথা প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেও ক্লেইষ্টকে শেষ পর্য্যন্ত বলতে হয়েছে : "আমরা হয়তো তা সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারতাম, যদি না আমার সৈন্য-বাহিনী থেকে ইউনিটের পর ইউনিট স্তালিনগ্রাদ্ আক্রমণ করার জন্যে সরিয়ে

দিতে হতো। হিটলার তাঁর মৌল লক্ষ্যকে অবহেলা করে, গৌণ সাফল্যের দিকে ঝুঁকে পড়লেন আর শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কোন লক্ষ্যেই পৌঁছতে পারলেন না তিনি।"

একুশে আগষ্ট, প্রচণ্ড সামরিক চাপে পড়ে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী শহরের বাইরের প্রতিরোধ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে, শহরের মধ্যে সরে যেতে বাধ্য হলো। তেইশে আগষ্ট লুফ্‌টবাফে কয়েক শ' বিমান পাঠালো এই শান্তিপূর্ণ শহর ও তার অসামরিক জনসাধারণের উপর বোমাবর্ষণ করতে। তাঁরই এক গ্রন্থে মার্শাল এ. জেরেমেঙ্কো এই দস্যু মনোবৃত্তিসম্পন্ন আক্রমণের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: স্তালিনগ্রাদের মাটী ভেঙ্গে চুরে এবড়োখেবড়ো, কালো হয়ে গেল। মনে হতে লাগলো যেন এক ভয়াবহ ঘূর্ণাবর্ত্তের মুখে পড়েছে শহরটা। সেই ঝড়টা শহরটাকে বাড়ীঘর সমেত অনেকটা শূন্যে তুলে আবার আছড়ে ফেলে দিয়েছে নীচে। তারই ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে আছে মাঠে, পথে ঘাটে। বাতাস তার উত্তপ্ত, কটুগন্ধময়। নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হয়। চারদিকের শব্দ, হৈচৈ একেবারে অবর্ণনীয়। বিচিত্র শব্দের ধাক্কায় কানে তালা ধরে যায়। সেই শব্দের মধ্যে আছে পড়ন্ত বোমার সোঁ সোঁ বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। তার সঙ্গে মিশেছে ঘরবাড়ী ভেঙ্গে পড়ার আর লেলিহান আগুনের পট পট শব্দ। পুড়ছে সব চারদিকে। শব্দের সেই বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা স্পষ্ট শুনতাম মুমূর্ষুর আর্তনাদ আর অভিশাপ, শিশুর কান্না আর পরিত্রাণ পাবার আকুতি আর মেয়েদের ফোঁপানোর শব্দ: ফ্যাশিস্ত বর্বরতার এই নিরীহ শিকারের প্রতি সমবেদনায় আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো। কিন্তু এতো দেখেও একথা কিছুতেই অসম্ভব বলে মনে হতো না যে এই শত সহস্র, শান্তিপ্রিয়, নিরীহ মানুষের বিশেষ করে শিশুদের এই যন্ত্রনা, বেদনা, বন্ধ করা যেত।"[৩২]

তেরই সেপ্টেম্বর লড়াই ছড়িয়ে পড়লো শহরের মধ্যে। হিটলার তাড়াতাড়ি ঘোষণা করলেন যে, স্তালিনগ্রাদের পতন আসন্ন। কিন্তু তাঁর ঘোষণাটা একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গিয়েছিল। যুদ্ধমগ্ন শহর কিন্তু আত্মসমর্পণ করবে না। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশের সমগ্র শরৎকাল ধরে "সোভিয়েত জার্মাণ যুদ্ধের মূল আকর্ষণ হয়ে রইলো স্তালিনগ্রাদের সংগ্রাম। শহরটি ছিল শিল্প ও সংযোগব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষের লুব্ধ দৃষ্টি

তাই এর উপর পড়ে যে একে কোনমতে দখল করতে পারলে ভল্গা অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যাবে এবং ককেশাস দখলের সমস্ত প্রাথমিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে।

সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের দক্ষিণভাগে যেখানে তীব্র সংগ্রাম চলছিল, সেখানেই জার্মাণ সামরিক বাহিনীর প্রধান অংশ জড়িয়ে পড়েছিল। আবার ভল্গা শহরের সংগ্রামে শত্রু সৈন্যের দক্ষিণমুখী অভিযানেরত সৈন্যের বেশির ভাগই আটকে পড়ে। তাই অভিযাত্রী বাহিনী দুই পাশে নিরাপত্তা এবং ককেশাসস্থিত সেনাদলের নিরাপত্তার জন্য জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ সৈন্যদলের পুনর্বণ্টন করলেন। তাই ভোলগোগ্রাদ অঞ্চলে চতুর্থ প্যানসার, তৃতীয় ও চতুর্থ রুমেনিয় ও অষ্টম ইটালীয় বাহিনীকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ফলে ককেশাসস্থিত সেনাদল দুর্বল হয়ে পড়ায় তারা আর নোতুন করে অভিযান সুরু করতে পারলো না। ভল্গায় সোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রাম, শত্রু পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে ককেশাসের তৈলাঞ্চলকে সেদিন রক্ষা করতে পেরেছিল।

সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ ভোলগোগ্রাদের উপর নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। সঙ্গে আক্রমণরত শত্রু সৈন্যের দু'পাশে যে সোভিয়েত সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল তাদের দুর্বল করে দেওয়ার জন্যে তাদেরও যথাস্থানে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করতে কার্পণ্য করলেন না। ডন নদীর দক্ষিণ তীরে সেতুমুখগুলি এবং ভোলগোগ্রাদের দক্ষিণে যে হ্রদগুলি আছে তার সংযোগ অঞ্চলে যে উপায়েই হোক অধিকার বজায় রাখতে হবে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ ভোলগোগ্রাদের উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য সমাবেশে সচেষ্ট হলেন।

সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ভোলগোগ্রাদের প্রতিরক্ষায় সচেষ্ট হয়েছিল। এই প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত এক সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল চুইকভ্ লিখেছেন যে:

"শহরের প্রতিরক্ষার কথা বলতে গেলে, সংগ্রাম ক্ষেত্রের কথাই আগে বলতে হয়, কারণ আমার সেনাদলের সক্রিয়তা তার জন্যে খুবই প্রতিকূলতার মধ্যে পড়েছিল। উত্তর দক্ষিণে শহরটি ছিল চল্লিশ কিলোমিটার দীর্ঘ আর প্রস্থে তিন কিলোমিটারেরও কম। শহরের চারদিকে যে বিস্তীর্ণ স্তেপভূমি পড়ে

আছে সেখানে একের পর এক রয়েছে বহু গিরিখাত। সেই খাতগুলি পূর্ব পশ্চিমে লম্বা। আর তাদের এক প্রান্ত গিয়ে মিশেছে ভল্গার তীরে। ফলে সমগ্র শহরটাই যেন বেশ কয়েকটি জেলায় বিভক্ত হয়ে গেছে। আর রয়েছে সেই বিপুল জলরাশির বাধা—ভল্গা—আমার সেনাদলের ঠিক পিছনেই। কিন্তু রসদের যোগানে, অস্ত্র-শস্ত্র, লোকজন সুবিধা মতো স্থাপন করে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায়, সেটাই এক বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ালো। সে সব কাজ করতে হতো রাতে, দক্ষিণতীরের সংকীর্ণ অঞ্চলটুকুর মধ্যে। ওধারে শত্রুরা ঘাঁটি করেছে উঁচু পাহাড়ে, যেখান থেকে দশ বারো কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত সব কিছু স্পষ্ট দেখা যায়। সেখান থেকে তারা সমানে গুলী চালিয়ে যাচ্ছে গিরিখাতগুলির দিকে। আকাশ থেকে গুলীবর্ষণেরও কমতি নেই। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার যে যুদ্ধের প্রায় সুরুতেই শত্রু পক্ষ ভল্গা প্রতিরোধ ভেঙ্গে আমাদের আশে পাশে উপস্থিত হয়ে, রীতিমতো বিপদ ঘনিয়ে তুলেছিল। এর থেকেই বোঝা যায় যে শহরের প্রতিরক্ষাকারী দলকে আক্রমণকে রুখতে গিয়ে কি ধরণের দুরূহ ও জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।"[৩৩]

এক এক সময়ে প্রতিরক্ষাকারীদের অধীনস্থ অঞ্চলের সীমা সাতশ' মিটারে নেমে এসেছিল। কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী শত্রুর সমস্ত আক্রমণ সহ্য করেও অটল হয়ে রইলো। বরং শত্রুবাহিনীর উপরে তারা হানলো চূড়ান্ত পরাজয়ের আঘাত। ফলে সুযোগ এসে গেল সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সেই বিরাট প্রস্তুতির, যাতে তারা আক্রমণের ধারা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ভল্গা থেকে বার্লিন, এলব পর্যন্ত।

সোভিয়েতের ধৈর্যপূর্ণ প্রতিরক্ষা সংগ্রাম ভল্গা ও ককেশাস অঞ্চলে জার্মাণদের অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিল। মানুষজন, রসদ ও জিনিসপত্রে শত্রুকে তার হঠকারিতার জন্যে মাশুল দিতে হলো প্রচুর। আরো যা বেশি ক্ষতি হলো তার, তা হলো সময়ের। সময়ের গতি ক্রমেই নাৎসীদের বিরুদ্ধে যাচ্ছিল। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দেশের সংরক্ষিত শক্তিও জিনিসপত্র সংগঠিত করার সুযোগ পেয়ে গেলেন।

ভল্গা যুদ্ধের সময়েই সোভিয়েতের কয়েকটি পদাতিক বাহিনীকে সোভিয়েত-গার্ড ডিভিসনের মর্যাদায় উন্নীত করা হলো। উনিশ শ' তেতাল্লিশের বসন্ত-

কালের মধ্যেই সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীতে তিন শ'রও বেশি গার্ড ইউনিট ও শাখা খোলা হলো।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সমগ্র জগৎ ভল্গা যুদ্ধের গতিবিধি লক্ষ্য করে গেল। মাসের পর মাস যতোই কাটতে লাগলো ততোই এটা সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেল যুদ্ধের চূড়ান্ত ফলাফল, ভল্গা যুদ্ধের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছে বহুলাংশে। সাউদ অল শাব (Soud al shab) নামে বেইরুটের একটি সংবাদপত্রে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশের অক্টোবরে লেখা হয়েছিল যে, "স্তালিনগ্রাদের কামানগুলি কেবল জার্মাণ সৈন্যের মাংসেরই কিমা বানাচ্ছে না বার্লিনের প্রাচীরও তাতে কেঁপে উঠছে থরথরো। হিটলার উন্মাদের মতো দাঁতে দাঁত ঘষছে। নেশাখোর গোয়েরিং সামরিক পোষাক পড়েই কাঁপতে লেগেছে। বামন গোয়েবলসের ধাত ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। সে চীৎকার করে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলেছে যে কেন রুশরা এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলার নিয়ম মেনে এখনো আত্মসমর্পণ করছে না। স্তালিনগ্রাদের কামান গর্জনের প্রতিধ্বনি ফ্রান্সের রানী প্যারী শহরেও শোনা যাচ্ছে। কামানের যে গোলা স্তালিনগ্রাদে ফেটে পড়ছে সশব্দে, তার জন্যে ফরাসী ধমনীতে রক্ত ফুটছে টগ্‌বগ্‌ করে। তারা ফরাসীদের মনে করিয়ে দিচ্ছে তাদের নিজের কামানের গর্জনের কথা, যা মাত্র গতকাল গর্জে উঠেছিল ভালমিতে, ভার্দুঁতে। নিশ্চয়ই আসছে কাল তা আবার দারুণ গর্জনে ফেটে পড়বে হানাদার, আক্রমণকারীদের মাথার উপরে, যারা ফ্রান্সের মাটীকে করেছে অপবিত্র। স্তালিনগ্রাদের প্রতিধ্বনি তাই শোনা যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র, চুংকিংয়ে, নিউ ইয়র্কে লণ্ডন আর এল অ্যালামিয়েনে। কিন্তু কোথাও কোথাও এই কামানই জ্বলে উঠছে নিজের জ্বালায়, তাদের লজ্জার জ্বালা। কারণ তারা আজো স্তব্ধ হয়ে আছে।.........ভল্গাতীরের শহর যেন হিটলারকে জানিয়ে দিয়েছে তার শেষের সে দিন সমাগত। ফ্যাশিবাদের দানবীয়, নারকীয় শক্তিমত্তার কবর খোঁড়া হয়েছে স্তালিনগ্রাদে।"

এই শহরের সফল প্রতিরোধ ব্যবস্থা সারা পৃথিবী জুড়ে, সর্বত্র প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে আঘাত করলো মর্মান্তিকভাবে। সোভিয়েতের পাল্টা আক্রমণ তাদের সমস্ত অভিযান পরিকল্পনাকে খতম করে দিল। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ—তেতাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্যাপকভাবে কোন পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারবে না, বুর্জোয়া সামরিক বিশেষজ্ঞদের এই ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত প্রমাণিত হলো।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শুরুতেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন একক, নিঃসঙ্গ ভাবেই হিটলার জার্মাণী ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যুদ্ধের গতিকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিল যাতে ফ্যাশিস্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হয়।

ভল্গায় জার্মাণীর পরাজয়ের জন্যে সুখ্যাতি যা কিছু প্রাপ্য তা পাবেন সোভিয়েত জেনারেলদের সদর কার্যালয় তার দক্ষতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্যে, জেনারেলরা সমগ্রভাবে এবং প্রতিটি রণাঙ্গনের সামরিক পরিষদ। রণাঙ্গনের নানা স্থানে নানা অসুবিধা সহ্য করে, সমস্ত প্রতিকূলতার ঝুঁকি নিয়ে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব দক্ষতা ও দ্রুততার সঙ্গে সংগ্রামের নির্বাচিত অঞ্চলে গোপনে বিরাট সংখ্যক সৈন্য সমাবেশ ঘটাতে পেরেছিলেন।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের উনিশে নভেম্বর সোভিয়েত সৈন্য বাহিনী পাল্টা আক্রমণ সুরু করে। ন্যুরেমবার্গের বিচার সভায় কর্ণেল-জেনারেল জোড্‌ল বলেছিলেন যে, "ষষ্ঠ সৈন্যবাহিনী আশেপাশেই (ডন অঞ্চলে) সোভিয়েতের যে বিপুল সৈন্য সমাবেশ ঘটেছে, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। রাশিয়ার এই অঞ্চলে শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা ছিল না। আগে যেখানে প্রায় কিছুই ছিল না, অকস্মাৎ দারুণ শক্তি নিয়ে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক প্রচণ্ড আঘাত নেমে এলো সেখানে।"

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতৃবৃন্দের কাছে সোভিয়েতের এই অগ্রগতি প্রত্যাশিত ছিল না। তাঁরা মস্কোস্থিত মার্কিণ রাষ্ট্রদূত অ্যাডমিরাল ডবলু এইচ, ষ্টাণ্ডলির প্রেরিত বিবরণীর উপর নির্ভর করে ধারণা করেছিলেন যে উনিশ শ' বিয়াল্লিশের নভেম্বরে, "রুশ সৈন্য যেখানে যেখানে ঘাঁটি করেছে, তারা সেখানেই সমগ্র শীতকাল ধরে থেকে যাবে।" ৩৪

সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণের সময়টি হয়েছিল অত্যন্ত যথার্থ। যেন এক সাঁড়াশী, তার অনেকগুলি দাঁড়া নিয়ে, জার্মাণ ব্যূহকে ভেদ করে যাচ্ছে। সোভেৎস্কি শহরে তেইশে নভেম্বর ভোলগোগ্রাদ রণাঙ্গন ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সৈন্যবাহিনী, শত্রুর এক বিরাট সমাবেশকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে এসে মিলিত হলো। ফলে বিশটি জার্মাণ ও দু'টি রুমেনীয় ডিভিসন, প্রায় তিন লক্ষ তিরিশ হাজার সৈন্য ও অফিসার সহ এই বেড়াজালে আটকে পড়লো। উনিশে থেকে তিরিশে নভেম্বরের অভিযানে সোভিয়েত বাহিনী একটা

শক্তিশালী বেষ্টনী গড়ে তুললো শত্রু সমাবেশের অনেকটা দূর দিয়ে। তাদের এই প্রচেষ্টায় বিনষ্ট হলো সাত ডিভিসন সৈন্য, আর বন্দী হলো আরো পাঁচ ডিভিসন।

আক্রমণের দ্বিতীয় স্তরে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী অবরুদ্ধ নাৎসী সৈন্যদের মুক্ত করার জন্যে জার্মাণদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল। ফিল্ড মার্শাল ম্যানস্টেইনের নেতৃত্বে জার্মাণ সেনাদলে যে ডন বাহিনী, কোতেলনিকোভো-তোরমোসিন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে সমস্ত প্রতিরক্ষা ভেঙ্গে চলে এসেছিল, তাদের গতিরোধ করে পিছনে হাটিয়ে দেওয়া হলো। ভোলগোগ্রাদ, ভোরোনেঝ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের সোভিয়েত বাহিনী তাদের সামনে থেকে শত্রুকে হাটিয়ে দিয়ে, সোজা পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। ফলে অবরুদ্ধ জার্মাণদের চারদিকে সোভিয়েত সেনাদলে বেষ্টনীর বহিঃসীমা বেড়ে গেল আরো একশ' সত্তর থেকে আড়াইশ' কিলোমিটার। সেই সময়ে ডন রণাঙ্গনের সৈন্যরা বেষ্টনীকৃত, অবরুদ্ধ জার্মাণদের আরো চাপ দিতে দিতে অগ্রসর হওয়ায় তাদের অবস্থিতির সীমা ক্রমেই সঙ্কুচিত হতে লাগলো।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের আটই জানুয়ারী সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব অবরুদ্ধ জার্মাণদের এক চরমপত্র দিলেন। নাৎসীরা তা প্রত্যাখ্যান করলো। জার্মাণ সামরিক পরিষদের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সৈন্যদলকে অবরুদ্ধ অবস্থাতেই নিজের জায়গায় থাকার আদেশ দিলেন। এই আদেশ পালন করতে গিয়ে সেনা-নায়করা দেখলেন সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখাই একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তারা চরম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে। ফলে তিন শ' ছেষট্টি জন সৈনিকের কোর্ট মার্শাল হয়ে গেল।[৩৫]

দশই জানুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশে ডন রণাঙ্গনের সেনাদল অবরুদ্ধ জার্মাণদের বিরুদ্ধে অভিযানের শেষ পর্ব সুরু করে দিল। দোসরা ফেব্রুয়ারী শেষ হলো তার পালা। ভল্গা অঞ্চলে জার্মাণদের আটকে ফেলে নির্মূল করে দেওয়ার পরিকল্পনা এক অসাধারণ সাফল্যের মধ্যে পরিসমাপ্ত হলো। "জার্মাণ-দের বাছাই করা তিন লক্ষ তিরিশ হাজার সৈন্য হয় নিহত বা বন্দী হলো। সারা হিটলার জার্মাণীতে নেমে এলো শোকের ছায়া। ওদিকে সোভিয়েত সেনাদলের মাথার উপর বিজয় গৌরবের উজ্জ্বল আলোক উজ্জ্বলতর হয়ে উঠলো।"[৩৬]

একজন সমকালীন বুর্জোয়া জার্মাণ ইতিহাসবিদ, গোরলিট্জ্ (Gorlitz) বলেছেন যে, "জার্মাণ সৈন্যবাহিনী ইতিপূর্বে কোনদিন আর এমন পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি।"[৩১]

ভোলগোগ্রাদের যে পাল্টা আক্রমণের সূত্রপাত হয়েছিল তাই একটা ব্যাপক আক্রমণের রূপ নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো লেলিনগ্রাদ থেকে আজভ্ সাগর পর্যন্ত। চার মাস কুড়ি দিনের মধ্যে, রণাঙ্গনের কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েত সৈন্য-বাহিনী এগিয়ে গেল পশ্চিম দিকে ছশ' থেকে সাতশ' কিলোমিটার পর্যন্ত। অনেক অর্থ নৈতিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল শত্রুর কবলমুক্ত হয়ে গেল। ফলে ভল্গা ও ককেশাস অঞ্চলের বিপদ গেল কেটে। শত্রুর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ালো প্রায় একশ' বারো ডিভিসন সৈন্য। উনিশ শ' তেতাল্লিশের জানুয়ারী মাসে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী অবরুদ্ধ লেলিনগ্রাদের অবরোধে ভাঙন ধরিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলো। লাদোগা হ্রদের দক্ষিণ তীর দিয়ে আবার সুরু করলো রেলপথে গমনাগমন।

ভোলগোগ্রাদ যুদ্ধের ফলাফল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি ও বীর্যবত্তার জলন্ত প্রমাণ উপস্থিত করলো। অসীম মনোবলের অধিকারী সুদক্ষ, অভিজ্ঞ সমর-নায়কদের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েতের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত যে একটা অসীম শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী আছে, এই যুদ্ধ যেন সেটাই প্রমাণ করে দিল। সোভিয়েতের যুদ্ধ সরঞ্জাম যে হিটলার জার্মাণীর তুলনায় অনেক উন্নতমানের তা যেন প্রকট হয়ে উঠলো। ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েতের সামরিক খ্যাতি গেল বেড়ে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রগতিশীল মানুষ সোভিয়েতের ভল্গা বিজয়কে সাহস, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের এক অতুলনীয় নিদর্শন বলে অভিনন্দিত করলেন।

ভল্গায় জার্মাণীর পরাজয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নাৎসীদের পরাজয় যে অনিবার্য তারই যেন ইংগিত পাওয়া গেল। ইংগিত পাওয়া গেল ফ্যাশিবিরোধী মোর্চার চূড়ান্ত বিজয়ের লগ্নের।

হিটলারী শাসনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে ফুটিয়ে তুললো তাদের ভল্গা বিপর্যয়। ভোলগোগ্রাদে সোভিয়েতের জয়লাভ প্রসঙ্গে, ইটালীর জনৈক কমিউনিষ্ট ইতিহাসবিদ রবার্তো বাত্তাগ্লিয়া (Roberta Battaglia) বলেছেন

যে এটা ছিল "একটা পরিণতি......যার তাৎপর্য শুধু সামরিক অর্থেই সীমিত নয়, মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত।"[৩৮]

অবশ্য বুর্জোয়া রাজনীতিক ও ইতিহাসবিদরা সোভিয়েতের এই ঐতিহাসিক সাফল্যের গুরুত্বকে পাল্লা দিয়ে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা করছেন। তাঁরা হয় ভল্‌গা যুদ্ধের কথা উল্লেখই করেননি, না হলে প্রসঙ্গতঃ কোথাও তার উল্লেখ করে, দ্বিতীয় শ্রেণীর সামরিক সাফল্যকে অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন। মার্কিণ রাষ্ট্রপতির কাছে এক বিবরণী পেশ করতে গিয়ে মার্কিণ সমরনায়ক পরিষদের প্রধান জেনারেল জর্জ সি, মার্শাল, ভোলগোগ্রাদ ও এল এ্যালামিয়েনকে সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন।

তিনি লিখেছিলেন যে, "যুদ্ধের চরম সংকটপূর্ণ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে স্তালিনগ্রাদ ও এল এ্যালামিয়েনে।"[৩৯] একথা বলার সময়, শেষোক্ত যুদ্ধে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা যে অনেক কম ছিল, যুদ্ধের প্রধান ক্ষেত্রে থেকে তা যে বহুদূরে মরুভূমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং তার সাফল্য যে যুদ্ধের গতিকে কোনমতে প্রভাবিত করেনি বা করতে পারতো না, এই সব বাস্তব সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন।

একথা সত্যি যে কোন কোন পশ্চিমী ইতিহাসবিদ ঘটনার সত্যের বিরুদ্ধাচারণ না করে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির একটা ছাপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যেমন উদাহরণতঃ বলা যায় কুর্ট ফন টিপ্পলস্কার্চের কথা, যিনি বিন্দুমাত্র না রেখে ঢেকে সরাসরি স্বীকার করেছেন যে ভল্গা বিপর্যয়, যুদ্ধের গতি পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। তিনি বলেছেন যে, "যুদ্ধের সামগ্রিক পটভূমিতে যদিও উত্তর আফ্রিকার ঘটনাবলীকে স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধের চেয়েও বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলেও বলতে হবে যে স্তালিনগ্রাদের বিপর্যয় জার্মাণ জনগণ ও সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর পরিমাণে মর্মাহত করেছিল।"[৪০]

তাঁর সমগ্র গ্রন্থে বারেবার তিনি নানা প্রসঙ্গে "স্তালিনগ্রাদের বিপর্যয়ের কথা" উল্লেখ করেছেন।

জনৈক প্রখ্যাত মার্কিন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞ, এলসৃওয়ার্থ রেমণ্ট, ভল্গা যুদ্ধকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক গতি পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করে বলেছেন যে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই এই বিজয় গৌরব অর্জন করেছে। 'লিডেল হার্ট কর্তৃক প্রকাশিত এক প্রবন্ধ

সংকলনে, হিটলারের সৈন্যাধ্যক্ষ হাইনজে গুদেরিয়ান লিখেছেন : "রাশিয়া অভিযানের গতি পরিবর্তিত হয়ে গেল স্তালিনগ্রাদে। সন্দেহ নেই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে হলেও সেই রণাঙ্গন ধাক্কা খেয়ে পেছু হটে গেল, অনিবার্যভাবে অত্যন্ত কষ্টকর, নিষ্ঠুরভাবে।[৪১]

ফ্যাশিস্ত শিবিরে ভল্গা বিপর্যয় একটা দারুণ সংকট ঘনিয়ে তুললো। সারা জার্মাণীতে নেমে এলো শোকের ছায়া। নাৎসীদের ভাড়াটে প্রচারকরা জার্মাণদের প্রবোধ দেওয়ার চেষ্টা করে বলতে লাগলো বার্লিন থেকে ভোলগো-গ্রাদ অনেক দূর। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মাণীর অধিকাংশ মানুষের মনেই এই আশংকা দেখা দিল যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মাণীর পরাজয় হবে। হিটলার চক্রও যেন ভেঙ্গে, মুষড়ে পড়লো। গুদেরিয়ান বলেছেন যে জেনারেল জোড্‌ল একেবারে হতাশ হয়ে পড়লেন।[৪২]

ভল্গা যুদ্ধের অল্পকাল পরেই, সাতই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশে নাৎসী নেতৃত্ব আদেশ জারী করলেন যে যুদ্ধ চালাতে হবে এবং তারই জন্যে "সামগ্রিক প্রস্তুতি" করতে হবে। অর্থাৎ যুদ্ধ শিল্পের দক্ষতাপূর্ণ কাজে নিযুক্ত নয় এমন সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের সৈন্যদলে নাম লেখাতে বলা হলো। এরই সঙ্গে অনেক শ্রমিককেও টেনে আনা হলো সৈন্যদলে। যুদ্ধে পরাজিত হলে যাতে নাৎসীরা আত্মগোপন করে কাজ করতে পারে তারও একটা পরিকল্পনা করে রাখা হলো।

দেশে এর ফলে শ্রমিকের সংখ্যায় যে ঘাটতি দেখা দিল, তা পূরণ করার জন্যে জার্মাণীর শিল্প প্রতিষ্ঠানে, কৃষিতে লক্ষ লক্ষ বিদেশী শ্রমিককে বাধ্যতা-মূলক শ্রমে লাগিয়ে দেওয়া হলো। তার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত অঞ্চল থেকে বহু অল্পবয়স্ক মানুষকে জোর করে ধরে এনে কাজে লাগিয়ে দেওয়া হলো। তার মধ্যে রণাঙ্গনে ধৃত, অসুস্থ, সোভিয়েত সেনাদলের অনেক সৈনিক ও অফিসারাও ছিল। কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে বহু সহস্র সোভিয়েত নাগরিককে এর মধ্যে নিদারুণভাবে হত্যা করা হলো। আরো বহু সহস্র প্রাণ হারালো নাৎসীদের "মৃত্যু কারখানায়"। কিন্তু শত অত্যাচার, মৃত্যু দাসশ্রমিক হিসাবে নিয়োগ কিম্বা অনাহারেও দেশ প্রেমিক সোভিয়েত নাগরিকদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া গেল না। শত্রুর মাটিতে দাঁড়িয়ে, তাদের পিছনে তারা ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে গেল।

ফ্যাশিস্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে, সোভিয়েতের দেশ প্রেমিক মানুষ যে সংগ্রাম

চালায়, তাতে বহু সহস্র মানুষকে আত্মবলি দিতে হয়। সেই আত্মবলি দিতে হলো যুদ্ধবন্দী শিবিরের কাঁটাতারের বেড়ার ভিতরে। "পূর্বাঞ্চলীয় শ্রমিকদের" মধ্যে, যেখানে ছেড়ে দেওয়া হলো বুভুক্ষু, দীর্ঘ পরিশ্রমের যন্ত্রণাক্লিষ্ট সমস্ত সভ্যতার স্পর্শ বর্জিত আততায়ী, গুণ্ডা বদমায়েসদের। হিটলারী বর্বরতার ভয়াবহতা, বিভীষিকা সহ্য করতে হলে, বলশেভিকের সাহস, ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস ছাড়া, আর কিছুতেই বোধ হয় তা সম্ভব নয়। কারণ সেই অত্যাচার সহ্য করতে তারা আত্মসমর্পণ তো করেনি, বরং চেষ্টা করেছে কেমন করে আরো হাজার হাজার মানুষকে সমবেত করা যায় ফ্যাশিস্ত বর্বরতার বিরুদ্ধে। নাৎসী সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে সোভিয়েতের মানুষ সেদিন যে বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়েছিল তার অনুপ্রেরণা এসেছিল জার্মাণীর ফ্যাশি বিরোধী মানুষদের আত্মত্যাগ, তৃতীয় রাইখের পদানত অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের যোদ্ধাদের বীরত্ব দেখে এবং সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার মহত্তর চেতনায়।

নাৎসী জার্মাণী ও অন্যান্য নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলে সোভিয়েতের মানুষ ও অন্যান্য ফ্যাশি বিরোধীদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, হিটলার জার্মাণীকে, সোভিয়েত জার্মাণ ও অন্যান্য রণাঙ্গন থেকে প্রচুর সৈন্য সরিয়ে এনে এই সব জায়গায় নিয়োগ করতে বাধ্য করলো। নাৎসী শাসকচক্র যেন শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। ফলে জার্মাণীর অভ্যন্তরে রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এর দ্বারা প্রভাবিত হলো বহুল পরিমাণে। সেটাই ফ্যাশিবাদের চূড়ান্ত পরাজয় সম্ভব করে, শান্তির সপক্ষে যারা তাদের শক্তিকে জয়যুক্ত হতে সাহায্য করেছে।

বিদেশী শ্রমিকেরা যে কোন সময়ে গণ আন্দোলন করতে পারে, নাৎসীদের মনে এই ভয় সর্বদাই লেগে থাকতো। হিটলারের সামরিক সর্বোচ্চ দপ্তর ও গেষ্টাপো বাহিনী তাই যুদ্ধ বন্দী ও বিদেশী শ্রমিকদের সম্ভাব্য বিদ্রোহ ঘটলে, কেমন করে তাকে দমন করবে, তার একটা পরিকল্পনাও তৈরি করে রেখেছিল। তার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয় ভ্যালকিরাইজ (Valkyries)। এই ধরণের কোন জরুরী অবস্থায় সমস্ত কিছু অপরিবর্তিত রাখার জন্যেই তাই এক বিরাট বাহিনীকে জার্মাণীতে রেখে দেওয়া হয়। আত্মগোপনকারীদের আন্দোলন দমন করতে তারা নির্মমভাবে তাদের শক্তি ব্যবহার করে।

নাৎসীরা কেবল বিদেশী শ্রমিকদেরই ভয় করতো না নিজেদের দেশের লোকের কাছেও তাদের ভয় কম ছিল না। সেটা ভল্গা বিপর্যয়ের পর আরো

বেড়ে যায়। ফলে জার্মাণীতেই আত্মগোপনকারী কমিউনিষ্টদের কর্মতৎপরতা বেড়ে যায়।

সমগ্র যুদ্ধ চলাকালীন সময় ধরেই, জার্মাণীর অভ্যন্তরে কমিউনিষ্টরা নিজেদের গোপন কাজগুলি যথারীতি চালিয়ে গেছে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশে বার্লিনে স্থাপিত এবং আন্তোন সেইফ্‌কো, ফ্রানজ্‌ জ্যাকোব ও বার্ণার্ড বাষ্টলেইনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই রকম একটা গোষ্ঠী, প্রায় তিরিশটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। জর্জ শুম্যানের কমিউনিষ্টগোষ্ঠী সক্রিয় হয়ে ওঠে স্যাক্সনীতে, থিয়োডোর নেউবয়ারের নেতৃত্বে আরেক গোষ্ঠী সক্রিয় হয় থুরিঙ্গিয়ায়। এই সমস্ত গোপন সংগঠনে কেবল কমিউনিষ্টরাই যোগ দেয়নি। এদের সঙ্গে ছিল বিভিন্ন সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও নির্দলীয় মানুষ আর এমনকি জার্মাণীর রক্ষী বাহিনীর বহু সৈনিক। তারা রণাঙ্গনস্থিত সৈনিক ও অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী ও জার্মাণীতে কর্মরত বিদেশী শ্রমিকদের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জার্মাণ কমিউনিষ্টরা, ফ্যাশি-বিরোধী জার্মাণ গণফ্রন্ট নাম দিয়ে একটি গোপন কিন্তু বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করে। এটি সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দীদের উদ্যোগে গঠিত, সৌভ্রাতৃত্ব মূলক যুদ্ধবন্দী সংস্থার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে। এই দুই সংস্থার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা দেখে জার্মাণীর সোস্যালিষ্ট ইউনিটি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান সম্পাদক, ওয়াল্টার উল ব্রিখট্‌ লিখেছিলেন যে, জার্মাণীর দক্ষিণাঞ্চলে সমস্ত সোভিয়েত যুদ্ধবন্দী শিবিরে এবং পূর্বাঞ্চলীয় শ্রমিকদের বিশটি শিবিরে দ্রুত এই ধরণের সংস্থা গড়ে উঠেছে। উনিশ শ' তেতাল্লিশের শেষে, যখন এই দু'টি সংস্থার কার্যক্রম একেবারে চরমে উঠেছে, তখন সোভিয়েত অফিসারদের নেতৃত্বে একটা প্রতিরোধ সংস্থা গড়ে ওঠে। দক্ষিণ জার্মাণীর কার্লশ্রু থেকে ভিয়েনা পর্যন্ত এর গতিবিধি ছড়িয়ে পড়ে। এর কয়েক হাজার সদস্য অংশতঃ সশস্ত্র ভাবে সামরিক কায়দায় সংগঠিত হয়। কিন্তু এদের এই সহযোগিতাপূর্ণ প্রস্তুতি, এই দুই সংস্থার মধ্যে পুলিশের অনুপ্রবেশের ফলে ব্যর্থ হয়ে যায়।[৪৩]

একটা জনপ্রিয় গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আহ্বান জানিয়ে, যত শীঘ্র সম্ভব একটা গণতান্ত্রিক শান্তি স্থাপনের উদ্দেশে, কমিউনিষ্টরা সব রকমের যুদ্ধ বিরোধী কাজে সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেশময় তারা

ছড়াতে থাকে ফ্যাশি বিরোধী ইশ্‌তেহার, যুদ্ধোপকরণ উৎপাদনকারী শিল্পে সংঘটিত করতে থাকে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ।

বারোই জুলাই, উনিশ শ' তেতাল্লিশে জার্মাণ বিরোধীরা সোভিয়েত যুক্ত ইউনিয়নে একটা জার্মাণী স্বাধীন জাতীয় কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভোলগোগ্রাদে বন্দী জার্মাণ সৈনিক ও অফিসার এবং জার্মাণ কমিউনিষ্টরাই ছিল এর প্রধান উদ্যোক্তা। জার্মাণ জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশে কমিটি একটি আবেদন প্রচার করে। তাতে সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের বাস্তব অবস্থার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করে, জার্মাণীর আভ্যন্তরীণ সমস্যার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। ফ্যাশিস্ত শাসনের অবসান ঘটিয়ে, স্বাধীন জার্মাণী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে সমস্ত দেশ প্রেমিক মানুষের কাছে মুক্তি আন্দোলন সুরু করার জন্যে আবেদনে আহ্বান জানানো হয়। এর অল্পকাল পরেই জার্মাণ অফিসারদের একটি সংঘ স্থাপন করা হয়, যা স্বাধীন জার্মাণী সংস্থার কার্যক্রম মেনে নিয়ে, তাদের সঙ্গে আন্দোলনে যোগ দেয়।

॥ তিন ॥

ফ্যাশিস্ত শিবিরেও যে তখন সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হচ্ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ঘটনা থেকে যে তারাও চিন্তা করতে সুরু করেছিল যুদ্ধের অবসান কেমন করে করা যায়। তারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক চক্রের সঙ্গে একটা সমঝোওতায় আসার প্রত্যাশা করছিল। এই দুই দেশেও অনুরূপ মনোভাব তখন দেখা দিতে থাকে। ভল্গা বিজয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা এইটুকু বোঝে যে সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করে ফেলার আশাটা দুরাশা মাত্র। তারা শংকিত হয়ে ওঠে। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যখন দেখা যায়, মার্কিণ ইতিহাসবিদ্‌রা বলছেন যে ভল্গায় সোভিয়েত বিজয়ের দিন থেকেই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। এঁদের একজন হলেন ডবলিউ. রষ্টো, যিনি বলেছেন যে, "ঠাণ্ডাযুদ্ধ সুরু হওয়ার মোটামুটি তারিখ বলা যায় উনিশ শ' তেতাল্লিশের সুরুতে।" এবং এই কথা বলে পূর্বপর উক্তির কোন সামঞ্জস্য না রেখে তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের জন্যে দায়ী করেন।[৪৪]

ওদিকে যখন সোভিয়েতের একটার পর একটা সাফল্য হতে সুরু করলো,

তখন এদিকে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার হিটলার জার্মাণীর সঙ্গে সোভিয়েত বিরোধিতার সাধারণ ভিত্তিতে একের পর এক সুবিধাজনক সর্ত আদায়ে সচেষ্ট হলেন। সমগ্র যুদ্ধকালীন সময় ধরে বৃটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াশীলেরা ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার সহযোগিতার ভিত্তিকে বাণচাল করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে তারা যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে, যাতে সোভিয়েতের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ক্রমেই বাড়তে থাকে। আরো চেষ্টা করেছে যাতে এরই মাধ্যমে নাৎসী হানাদারদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের হাত থেকে কোন মতে রক্ষা করা যায়।

জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই টানা পোড়েন বুঝতে বিশেষ দেরী হয় নি। ফলে তারাও এর সুযোগ নিয়ে ভল্গা যুদ্ধের পর মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের সঙ্গে গোপন আলাপ আলোচনা ব্যাপকতর ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। তারা পশ্চিমের কাছে শান্তির প্রস্তাব করে, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরো জোরদার করা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তাদের মিত্রপক্ষীয় দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা, নাৎসীদের সঙ্গে এ জাতীয় গোপন বৈঠকে আলাপ আলোচনা চালাতে মোটেই দ্বিধা বোধ করেনি।

হিটলার-বিরোধী মৈত্রীকে দুর্বল করে ভেঙ্গে দিয়ে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা ইঙ্গ-মার্কিণ জার্মাণ জোট গঠনের জন্যে, হিটলার চক্র ফ্রাঙ্কো স্পেন, সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের সরকারকে মধ্যস্তকারী হিসাবে ব্যবহার করতে লাগলো। স্প্যানীশ মধ্যস্ততাকারীর মাধ্যমে মাদ্রিদে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েল হোর ও স্বয়ং বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী অ্যান্টনী ইডেন নাৎসীদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে লাগলেন।

জার্মাণীর সঙ্গে গোপন চুক্তি সমাধা করার ক্রমিক প্রচেষ্টায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈঠক অনুষ্ঠীত হয় ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশে সুইজারল্যাণ্ডে। মার্কিণ সরকারের পক্ষে, হিটলারের দূত, প্রিন্স হোয়েনলোহের (Hohenlohe) সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন অ্যালেন ডালেস। যুদ্ধ ও শান্তি প্রসঙ্গে ডালেস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মতামত সরকারীভাবে সেখানে উপস্থিত করলেন। তিনি জানান যে "শৃঙ্খলা রক্ষা ও পুনর্বাসনের" কাজে সহায়ক শক্তি হিসাবে জার্মাণ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় থাকাটাই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাম্য। তাই জার্মাণীর বিভক্তিকরণ

অথবা অষ্ট্রিয়ার বিযুক্তির কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া জার্মাণ শিল্প ব্যবস্থা যা ইউরোপে যুদ্ধ ও পররাজ্য আক্রমনের প্রধানতম সহায়ক শক্তি, তার যে একটা শ্রেষ্ঠ ভূমিকা থাকা উচিত সে বিষয়েও তিনি তাঁর সহানুভূতি জানান।

সেই বৈঠকে ডালেস সোভিয়েত বিরোধী "প্রতিষেধক বেষ্টনী" (Cordon Sanitaire) তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করার একটা পরিকল্পনা পেশ করেন, যার মধ্যে থাকবে পোল্যাণ্ড রুমানিয়া ও হাঙ্গেরী। তিনি আরো বলেন যে পোল্যাণ্ডের সীমা "পূর্ব দিকে" আরো সম্প্রসারিত করতে হবে। অর্থাৎ সোভিয়েত ভূমির বিনিময়ে সেই কাজ সুসম্পন্ন করতে হবে। প্রিন্স হোহেনলোহেকে তিনি একথাও বলেন যে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে নিয়ে একটা ড্যানিয়ুব রাষ্ট্র সম্মেলন গড়ে তোলাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত ইচ্ছা।[৪৬]

ডালেস-হোহেনলোহে আলোচনাকে, বৃটিশ সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগসাজসে অনুষ্ঠিত, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হিটলার জার্মাণীর সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনাগুলি বিচার বিবেচনা করার স্পষ্ট প্রচেষ্টা বলা যায়। সেইদিক থেকে একে মিত্রপক্ষীর দায় দায়িত্ব পালনের একটা চরম বিচ্যুতি বলে মনে করা যায়। কিন্তু এতো সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদীদের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এই দুই শক্তি জোটের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলায় বাধা সৃষ্টি করে হিটলার জার্মাণীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণদের একটা নোতুন চুক্তি সম্পাদন ব্যর্থ করে দিল। এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার অপর কারণ ছিল সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক খ্যাতির ক্রমোন্নতি এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনগণের সোভিয়েতের বীর জনগণের প্রতি গভীর ভালোবাসা।

যে সমস্ত জার্মাণ শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কারদের মার্কিণ একচেটিয়া কারবারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, মার্কিণ গুপ্তচর বিভাগ তাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করলো। জার্মাণদের এই গোষ্ঠীর নেতা হাজলমার শাখট্ (Hjalmar Schacht), দেশে একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করে আরেক জন ফ্যাশি নেতাকে সেই পদে নিয়োগ করার জন্যে ষড়যন্ত্র করছিলেন। তাঁরা চাইছিলেন এই নোতুন ফুয়েরার, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে একটা "সম্মানজনক" শান্তি চুক্তি করে, ভেরমাখ্‌টের সমগ্র শক্তি সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে নিয়োজিত করতে। হোট্‌ল (Hottl) নামে জনৈক গেষ্টাপো অফিসার, যিনি প্রায়ই সুইজারল্যাণ্ড সফরে যেতেন, ক্যাপটেন-

ব্রুনার (Kaltenbrunner) তাঁর মাধ্যমে ডালেসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ন্যুরেমবার্গের বিচার সভায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের মে মাসের পর থেকে হোট্টলের মাধ্যমে ক্যালটেনব্রুনার ও ডালেসের মধ্যে যোগাযোগ রীতিমতো ঘন ঘন ঘটতে থাকে।

পলাতক পোলিশ সরকার, যাঁরা সোভিয়েত বিরোধী "প্রতিষেধক বেষ্টনীর" খবর রাখতেন, উনিশ শ' তেতাল্লিশের সুরুতে তাঁরা সোরগোল করে দাবী করলেন যে পোলিশ জমিদার ও পুঁজিবাদীদের সম্প্রসারণের আকাঙ্খা সোভিয়েত ইউনিয়নকে মেটাতে হবে। এবং শুধু দাবী করেই ক্ষান্ত হলেন না। সরকারী ভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সেই দাবী পেশ করতেও দ্বিধা করলেন না তাঁরা।

স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে লণ্ডনে পলাতক পোলিশ সরকারের সঙ্গে কোন যোগাযোগ বজায় রাখা সম্ভব হলো না। পঁচিশে এপ্রিল, উনিশ শ' তেতাল্লিশে পলাতক পোলিশ সরকারের কাছে প্রেরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে সোভিয়েত সরকার বলেন যে তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি যে শত্রুভাবাপন্ন আচরণ করছেন তাতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের মিত্র-পক্ষীয় সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও প্রমাণ থেকে সোভিয়েত সরকারের এই ধারণা হয়েছে যে পলাতক পোলিশ সরকার এখনো নাৎসীদের সঙ্গে সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রেখেছেন এবং জঘন্য রকমের সোভিয়েত বিরোধী প্ররোচনা মূলক কাজ করে যাচ্ছেন। এর পর লণ্ডনস্থ পোলদের সঙ্গে সোভিয়েতের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যথাসময়ে সোভিয়েত সরকার মার্কিণ রাষ্ট্রপতি ও বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন যে পলাতক পোলিশ সরকারের সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি মনোভাব স্বাভাবিক তো নয়ই, বরং তাঁকে মিত্র-পক্ষের পারস্পরিক সম্পর্কের যে সাধারণ নিয়মাবলী আছে তার পরিপন্থী বলে মনে হয়। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকার যে সব ঘটনাবলী প্রকাশ করেন, সেগুলি এতোই স্পষ্ট, প্রকট ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল যে, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার এর কোন প্রতিবাদের চেষ্টাও করেননি। সোভিয়েত সরকারের প্রধানের কাছে একটি ব্যক্তিগত বাণীতে চার্চিল স্বীকার করেছিলেন যে পোলিশ সরকার, "সেভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে যে অসম্মানজনক অভিযোগ করেছেন, তার থেকে

মনে হয় যে নাৎসীদের জঘন্য প্রচারের টোপ তাঁরা গিলেছেন।"[৫৭] কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার, সোভিয়েত সরকারকে লণ্ডনস্থ পোলদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। পলাতক পোলদের সঙ্গে সোভিয়েতের সম্পর্ক ছেদ ফ্যাশি বিরোধী মোর্চাকে জোরদার করেছিল। তাছাড়া পোল জনসাধারণের সঙ্গে সোভিয়েত জনগণের বন্ধুত্ব সম্পর্ক ও সহযোগিতা এরই ফলে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী পোল জনগণ পোলিশ 'দেশপ্রেমিকদের একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংঘ একটি সশস্ত্র শাখা সংগঠিত করে—দেশপ্রেমিক কোসিয়ুস্কো ডিভিসন—যারা বারোই অক্টোবর উনিশ শ' তেতাল্লিশে স্মোলনেস্ক অঞ্চলের লেনিনো'তে নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে। এই দিনটিকে আজো পোল্যাণ্ডের মানুষ সৈনিক দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করে থাকেন।

সোভিয়েতের বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে দেশপ্রেমিক পোল জনগণকে নাৎসীদের হানাদার ও তাদের অনুগত দাসদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জোরদার করতে সাহায্য করে। একত্রিশে ডিসেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে ওয়ারস্ শহরে তাদেরই কার্যনিয়ামক সংস্থা—ক্রাজোয়া রাদা নারোদোয়া (Krajowa Rada Narodowa) প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ চার ॥

ভল্গা বিজয় শুধু জার্মাণীতেই নয়, সমস্ত ফ্যাশিস্ত জোটের মধ্যেই একটা তীব্র সংকটের সূচনা করে। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী ভেরমাখ্‌ট ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে সহযোগিতার পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। কথা ছিল জার্মাণী ভোলগোগ্রাদ দখল করার পর, জাপান সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ও সাইবেরিয়া আক্রমন করবে। আরো কথা ছিল দুইদিক থেকে অগ্রসরমান জার্মাণ ও জাপানী সৈন্যদল সাইবেরিয়া ও মধ্য প্রাচ্যের কোন অঞ্চলে মিলিত হবে। কিন্তু এখন জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরা সেই পরিকল্পনা বাতিল করে দিল। কারণ জাপানীর ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পর্কে তাদের মনে আর কোন প্রত্যাশা রইলো না।

সোভিয়েত সীমান্তে সৈন্যবাহিনীর বাছাই করা সেনাদল, গোলন্দাজ বাহিনীর

অর্দ্ধেক ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া বাহিনীর দুই তৃতীয়াংশ শক্তি সমাবেশ করার ফলে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনে জাপানের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধে রত হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর রইলো না। ফলে সামরিক উদ্যোগ চলে গেল তার শত্রুদের হাতে। ভল্গা বিজয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক এবং রণনৈতিক গুরুত্ব পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করলো অন্যভাবে। দেশে দেশে জাপানী হানা-দের রুখবার জন্যে জনগণের নোতুন নোতুন অংশ সংঘবদ্ধ হতে লাগলো নবীন চেতনায়।

কিন্তু সোভিয়েতের সশস্ত্র বাহিনী বিজয় গৌরব অর্জন করে যে অনুকূল পরিস্থিতির সূচনা করলো মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার এবং চিয়াং-কাই-শেক তাকে কাজে লাগাবার তেমন চেষ্টা করলেন না। জাপানের বিরুদ্ধে উনিশ শ' তেতাল্লিশে তাঁরা উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পাল্টা আক্রমণ সুরু করলেন না।

চীনের গণমুক্তি ফৌজের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। সোভিয়েতের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উনিশ শ' তেতাল্লিশে তারা ব্যাপক পাল্টা আক্রমন সুরু করলো। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে অষ্টম ও চতুর্থ রুট সেনাদলের অপরিসীম বীরত্বের কথা, পার্টিজান দলের সাহসিকতার কথা, জাপানী ইতিহাসবিদরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।[১৮] গণমুক্তি ফৌজের সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো দ্রুত। উনিশ শ' তেতাল্লিশের শেষার্দ্ধের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় অষ্টম ও চতুর্থ সেনাদলে সৈনিকের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষেরও বেশি এবং পার্টিজান দলগুলিতে যোগ দিয়েছিল প্রায় বিশ লক্ষ মানুষ। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ—তেতাল্লিশের শীতকালে হুপে (Hupeh) প্রদেশের শত্রুমুক্ত অঞ্চলে, অর্থাৎ দক্ষিণ, মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে আসে।

এদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন চীনের মুক্তি আন্দোলনকে দুর্বল করে দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের জানুয়ারীতে চিয়াং-কাই-শেকের কাছে তাদের প্রাক্তন বিশেষ রাজ্যগত অধিকারের দাবী প্রত্যার্পণ করে। তাদের আশা ছিল এর ফলে চিয়াং সরকারের জনপ্রিয়তা ও সম্মান বৃদ্ধি পাবে।

সোভিয়েতের পাল্টা আক্রমণের ফলে জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্র গোষ্ঠীর যে বিপুল ক্ষতি হয়, তাতে সেই সব দেশে ফ্যাশি বিরোধী সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে ওঠে। অবস্থাটা চরমে পৌছায় ইটালীতে। সোভিয়েতের এই সাফল্য,

বাস্তাগলিয়া লিখেছেন ইটালীর শ্রমিক শ্রেণীকে, "তাদের বিশেষ কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে" সাহায্য করে, "যাতে সমগ্র জাতির প্রতি তারা সবচেয়ে সচেতন শ্রেণী হিসাবে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে"।[৪৯] দিনের পর দিন এখন থেকে শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে ইটালীতে। নয়ই মার্চ, উনিশ শ' তেতাল্লিশে, মুসোলিনী হিটলারের কাছে লিখিত একটা চিঠিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্যে অনুরোধ করেন।[৫০] ভ্যাটিক্যানের পক্ষ থেকেও অনুরূপ আবেদন করা হয়। পঁচিশে মার্চ, উনিশ শ' তেতাল্লিশে মুসোলিনী বলেছিলেন যে, "জাপান এই ক্ষেত্রে যোগদান করলেও"[৫১] সোভিয়েতের বিনাশ সাধন কোনমতেই সম্ভব নয়।

হিটলার মুসোলিনীর উপদেশ উপেক্ষা করলেন। সেই সময়ে যুদ্ধের বেড়াজাল থেকে সরে দাঁড়ালেও, ইটালীতে ফ্যাশিস্ত একনায়ত্বের বিরুদ্ধে যে জনপ্রিয় আন্দোলন সুরু হয়েছি, তা কোনমতে থেমে যেত না। ভল্গা যুদ্ধের পর মুসোলিনীর ফ্যাশিস্ত শাসন ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

রুমেনিয়ার ফ্যাশিস্ত নেতারাও গভীর আশংকায় আতংকিত হয়ে উঠেছিলেন। আন্তোনেস্কু চেষ্টা করতে লাগলেন কেমন করে জার্মানীর যুদ্ধে সব রকমের সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করা যায়। হিটলারের উদ্দেশে একটা ব্যক্তিগত বাণীতে তিনি লেখেন : "উনিশ শ' বিয়াল্লিশে সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে রুমেনিয়া তার সেরা ছাব্বিশ ডিভিসন সৈন্য দিয়ে দৃশ্যতই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছিল। সোভিয়েতের অপ্রতিরোধ্য পাল্টা আক্রমণের মুখে ডন ও স্তালিনগ্রাদের সন্নিকটে আমরা আমাদের আঠারো ডিভিসন সৈন্য হারিয়েছি। পরবর্তী এক বছরে কুবান নদী অঞ্চলে বাকী আট ডিভিসন বিভিন্ন সংগ্রামে যে যুদ্ধোপকরণ হারিয়েছে, তাতে অন্ততঃ দু' ডিভিসন সৈন্যকে সজ্জিত করা যেত। ক্ষয়ক্ষতির বিচারে আমাদের নিহতের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। এ ছাড়া আছে আহত সৈনিকের অগণিত সংখ্যা। আর চব্বিশ ডিভিসন সৈন্যের অস্ত্র শস্ত্র চিরকালের মতোই হারিয়ে গেছে।"[৫২]

রুমেনিয়ার এই ফ্যাশিস্ত একনায়কের অভিযোগ করার পেছনে আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল। আন্তোনেস্কু চাইছিলেন, হোরথীর হাঙ্গেরীর বিনিময়ে হিটলার যে সব সুযোগ সুবিধা তাঁকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেইগুলি চাপ দিয়ে আদায় করে নিতে। কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে হিটলার, রুমেনিয়া ও

হাঙ্গেরী, উভয় দেশের ফ্যাশিস্ত নেতাদের কাছেই নানা প্রতিশ্রুতি দেন. যার কোনটা রক্ষা করাই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই আস্তোনেস্কুকে এর পরেও সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে নোতুন নোতুন সৈন্যবাহিনীর ডিভিসন পাঠাতে হলো।

হাঙ্গেরীর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থাও ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছিল। হাঙ্গেরীয় সেনাদলের দ্বিতীয় শাখাটি, সোভিয়েতের প্রচণ্ড আঘাতে পর্যুদস্ত হওয়ার পরে, তাদের অবশিষ্ট অংশকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সারা দেশে হাঙ্গেরীর এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিতে থাকে।

ফিনল্যাণ্ডে অনুরূপ অসন্তোষ দেখা দিলেও, সেখানকার ফ্যাশিবাদী নেতারা হিটলারের উপর তখনো অবিচল আস্থা রেখেছিলেন। তাঁরা ভল্গা যুদ্ধের প্রকৃত তাৎপর্য-উপলব্ধি করতে না পেরে, তখনো জার্মানীর চূড়ান্ত জয়-লাভের আশা পোষণ করছিলেন।

এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মোটামুটি একথা বলা যায় যে, যারা হিটলারী আক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে সোভিয়েতের শক্তি ভেঙ্গে পড়বে বলে বিশ্বাস করতো, ভল্গার বিজয় গৌরব তাদের আশাভঙ্গ করে, স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির সপক্ষে যারা তাদের নোতুন আশায়, শক্তিতে সঞ্জীবিত করে তুললো।

॥ পাঁচ ॥

সোভিয়েত পার্টিজানরা যে সব দেশের মানুষ হিটলারের হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছিল, তাদের কাছে এক অনুপ্রেরণাময় দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলো। সোভিয়েত পার্টিজানদের আন্দোলন একটা প্রচণ্ড শক্তি হিসাবে দেখা দিল।

সোভিয়েত পার্টিজান আন্দোলনের সক্রিয়তার প্রথম পর্ব যুদ্ধের সুরু থেকে উনিশ শ’ বিয়াল্লিশের শরৎকালের প্রায় শেষাশেষি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সময়ের মধ্যে পার্টিজান দলগুলি গড়ে ওঠে, তাদের সংগ্রামের সব চেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি স্থিরীকৃত হয় এবং পার্টিজান আন্দোলনের যথাযথ সাংগঠনিক কাঠামো সংগঠিত হয়।

এর পর যতো দিন যায় পার্টিজান দলগুলির সদস্য সংখ্যা ততোই বৃদ্ধি পায় এবং সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের স্থায়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। তিরিশে মে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে সোভিয়েত সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের সদর কার্যালয়ে একটি কেন্দ্রিয় পার্টিজান কর্মিপরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই বছরেই জুলাই মাসে একটি ইউক্রেনীয় পরিষদ গঠিত হয়ে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করে।

অধিকৃত অঞ্চলেও পার্টিজানদের সদর কার্যালয় স্থাপিত হয়। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্ম কালে ব্রায়নস্ক বনাঞ্চলে সক্রিয় পার্টিজান দল একটি যৌথ পরিষদ স্থাপন করে। মিনস্ক অঞ্চলের দলগুলিও অনুরূপ সংগঠন গড়ে তোলে সেই বছরের শরৎকালে। পার্টিজান আন্দোলনকে সুগঠিত করে, তার বিভিন্ন দলের কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য এনে এই যৌথ পরিষদ সোভিয়েত সৈন্যদলের সঙ্গে পার্টিজানদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা আরো সম্প্রসারিত করেন।

পার্টিজান দলগুলি শত্রুর জীবনযাত্রা অসহনীয় করে তোলে। তারা শত্রুর লোকবল ও যুদ্ধোপকরণ ধ্বংস করতে থাকে। শুধু মিনস্কেই তারা নাৎসীদের ষোল শ' সামরিক ও অসামরিক অফিসারদের হত্যা করে। এরই মধ্যে ছিল হিটলারের সেরা জল্লাদ ও বাইলোরাশিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি উইলহেল্ম কুবে (Wilhelm Kube)। জার্মাণ সমরনায়ক পরিষদের এক বক্তব্যে দেখা যায় যে ঝিতোমিরে (Zhitomir) সোভিয়েত পার্টিজানরা একদিনেই ন'শ' ষাটটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়।[৫৩] শত্রুর কবল থেকে বিরাট অঞ্চল মুক্ত করে তারা পার্টিজান ভূখণ্ড গড়ে তোলে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালে চার শ'টি গ্রাম ও শহর নিয়ে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই রকম একটি ভূখণ্ড গড়ে ওঠে। ব্রায়নস্কের বনাঞ্চলে পার্টিজানদের বাহাত্তরটি দল ও প্রায় নব্বইটি উপদল সক্রিয় ছিল। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শরৎকালের মধ্যেই এই ধরনের পার্টিজান অঞ্চল দেখা যায় লেনিনগ্রাদ ও স্মোলনেস্ক অঞ্চলে. পোলসাই বনভূমিতে, ব্রেষ্ট অঞ্চলে, নালিবোক বনাঞ্চলে এবং শেপেতোভ্কায়।

রেলপথগুলিতে পার্টিজানরা যে সাফল্যের সঙ্গে সংগ্রাম চালায় তাতে রণাঙ্গনে জার্মানদের মালপত্রের যোগান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সোভিয়েতের নিয়মিত সৈন্যদলের সঙ্গে পার্টিজান দলগুলি ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় সংগ্রাম চালাতে থাকে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের জানুয়ারী মাসের

শেষে যখন জেনারেল বেলোভের অশ্বারোহী বাহিনী ভিয়াজ্‌মা (Vyazma) আক্রমণ করে, মস্কো অঞ্চলের পার্টিজান দলগুলি তাতে যোগ দিয়ে অতর্কিতে দোরোগোবুঝ (Dorogobuzh) দখল করে নেয়। মস্কোর কাছে সোভিয়েতের আক্রমণের সমগ্র সময় ধরে, গেরিলা বাহিনীর লোকেরা শত্রুর পিছনে সক্রিয় হয়ে তাদের ক্রমাগত হয়রাণ করতে থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে নিয়মিত সেনাদলকে সাহায্য করে। ভল্গা যুদ্ধের সময়ে পার্টিজানদের কার্যকলাপ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গেরিলা সংগঠনগুলি অত্যন্ত সচল ও সক্রিয় ছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে বাইলোরাশিয়ার পার্টিজান দলগুলি শত্রুর পশ্চাৎভাগে ঘন ঘন আক্রমণ করতে থাকে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের মে-জুন মাসে, জি. লিঙ্কভের পার্টিজান দলটি লেপেল থেকে পোলসাই অভিমুখে যাত্রা সুরু করে। উদ্দেশ্য ছিল তাদের বাইলোরুশিয়ার পার্টিজান আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি করা।

গেরিলাদের সক্রিয়তা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে, জার্মাণ সমর পরিষদ উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শরৎকালে বাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করে। তাতে নিয়োগ করা হয় একশ' চুয়াল্লিশটি পুলিশ ব্যাটেলিয়ান। সাতাশটি পুলিশ রেজিমেণ্ট, দশটি পুলিশ ও শান্তি প্রদানকারী এস. এস. ডিভিসন, দু'টি রক্ষী বাহিনী, বিশটি জার্মাণ ও তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির পদাতিক বাহিনী এবং বাহাত্তরটি বিশেষ সংগঠন সর্বসাকুল্যে পার্টিজানদের আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্যে, রণাঙ্গন থেকে ষাট ডিভিসন সৈন্য প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল।

পার্টিজান আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয় ভল্গা অঞ্চলে সোভিয়েতের পাল্টা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে। আর তার পরিসমাপ্তি ঘটে উনিশ শ' চুয়াল্লিশের বসন্তকালে। সোভিয়েতের নিয়মিত সেনাদলের সঙ্গে একযোগে পার্টিজানরা রচনা করে এক ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণ ধারা।

গেরিলা সংগ্রামে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব দারুণ বিব্রত হয়ে পড়েন। যুদ্ধ হওয়ার এক মাস পরে, পঁচিশে জুলাই উনিশ শ' একচল্লিশে, তাঁরা সোভিয়েত পার্টিজানদের সক্রিয়তা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে এক বিশেষ আদেশ জারী করেছিলেন। পঁচিশে অক্টোবর উনিশ শ' একচল্লিশে তাঁরা কেমন করে "গেরিলা দলের সঙ্গে লড়তে হবে" সেই বিষয়ে এক বিশেষ নির্দেশনামা প্রচার করেন। তাই পার্টিজান আন্দোলন যতই শক্তিশালী হতে থাকে, নাৎসীদের

মনে উদ্বেগ ততোই বাড়তে থাকে। ছয়ই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, হিটলারের সমরনায়ক পরিষদ যে আদেশ জারী করেন তাতে স্বাকার করা হয়েছিল যে, "গত কয়েক মাস ধরে পূর্বাঞ্চলের দলগুলি একটা অসহ্য আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং তারা রণাঙ্গনে সরবরাহ যোগানের পথে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে।"[৫৪] এর অল্পকাল পরেই তারা, "পূর্বাঞ্চলের দলগুলির সঙ্গে কি ভাবে লড়াই করতে হবে" তার নানা উপদেশ ও নির্দেশ প্রকাশ করেন।

পার্টিজান আন্দোলনে নাৎসীদের যে দুরবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, তার প্রচুর প্রমাণ রয়ে গেছে হিটলারের প্রাক্তন জেনারেলদের স্মৃতি কথায়। গুদেরিয়ান লিখেছেন যে, "গেরিলা যুদ্ধ একটা এমন বাস্তব আতঙ্ক সৃষ্টি করে যাতে রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সেনাদলের মনোবল ভেঙ্গে যেতে থাকে।"[৫৫] জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদী আদর্শের ধ্বজাধারী ভেরণার পিক্‌ট (Werner Picht) বলেছেন যে, "যতো দীর্ঘকাল জার্মাণ সৈন্য সেই দেশে থাকছে, ততোই তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে"[৫৬]

॥ ছয় ॥

অধিকৃত দেশগুলিতে মুক্তি আন্দোলনও একটা নোতুন স্তরে উন্নীত হলো। স্বতন্ত্র পার্টিজান দলগুলিতে যথার্থ গেরিলা বাহিনী সংগঠিত হতে লাগলো। কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে এখানে গড়ে উঠতে লাগলো সংযুক্ত জাতীয় ফ্রন্ট। হানাদারদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামে কমিউনিষ্ট পার্টিগুলি জনগণকে সমবেত করতে লাগলো।

জার্মাণদের যুদ্ধোৎপাদনকারী ফরাসী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ উৎপাদন বন্ধ করে দিতে লাগলো। দক্ষিণ ফ্রান্সের বনভূমি ও পার্বত্যাঞ্চলে, বিশেষ করে আপার স্যাভয়ের জেলাগুলিতে পার্টিজানদের শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠলো। ফরাসী পার্টিজানরা বেতার সংযোগ লাইন ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে দিল। উনিশ শ' একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে পনের শ' বার তারা অভিযান চালায় এবং ধ্বংস করে দেয় ষোল শ' বিদ্যুৎ সরবরাহের খুঁটি। ক্ষতিগ্রস্ত করে আরো বারো শ'টি খুঁটি। অ্যাল-পাইন জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্যারীতে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী দু'টি লাইন, তাদের সক্রিয়তায় তিন শ' কুড়ি দিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকে।

উনিশ শ' তেতাল্লিশে দেশপ্রেমিকরা লে ক্রুসোর (Le Creusot) শিল্প কেন্দ্রে আঘাত করে একত্রিশটি কারখানায় ও ব্রাইয়েই (Briey) অববাহিকায় এক সপ্তাহের জন্যে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ করে দিল।" উনিশ শ' তেতাল্লিশের নভেম্বর ডিসেম্বরে দেশপ্রেমিকরা গ্রেঁওব্‌লে (Grenoble) নাৎসীদের কয়েকটি অস্ত্র-শস্ত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র ও সামরিক আবাস বোমা মেরে উড়িয়ে দিল।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শেষে ফ্রান্সে এই ধরণের দেশপ্রেমিক যোদ্ধা ও পার্টিজানদের সংখ্যা দাঁড়ালো প্রায় দু' লক্ষের কাছাকাছি। কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে সাতাশে মে, উনিশ শ' তেতাল্লিশে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিরোধ পরিষদ, সমগ্র ফ্রান্সে দেশপ্রেমিক সমস্ত মানুষের কার্যক্রমকে সুসংগঠিত করতে লাগলো। প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদানকারী সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের তেত্রিশজন প্রতিনিধি নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হলো।

ইটালীতেও প্রথম পার্টিজান দল দেখা দেয় উনিশ শ' তেতাল্লিশে। তাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল পিয়েডমণ্ট, লোম্বার্ডি ও এমেলিয়া। এরিউলিতে একজন কমিউনিষ্ট শিল্পশ্রমিক, ম্যারীও ফ্যান্তিনি পাঁচশ জন লোক নিয়ে প্রথম গ্যারিবল্ডি ব্যাটেলিয়ন সংগঠিত করলেন। সেটা হলো উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালের কথা। ততো দিনে প্রায় সমগ্র ইটালীতে পার্টিজান আন্দোলন ছড়িয়ে গেছে। আর তাদের সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা ও শক্তি দেখা গেছে দেশের উত্তরাঞ্চলে।

তখন চেকোস্লোভাকিয়াতেও পার্টিজান আন্দোলন ক্রমেই জোরদার হয়ে উঠছিল। উনিশ শ' তেতাল্লিশের সুরুতে, সোভিয়েত রাশিয়ার গৃহ যুদ্ধের জনৈক বীর শ্চাপাইয়েভের নামে সংগঠিত এক বিরাট পার্টিজান দল, জার্মাণদের বিরুদ্ধে পূর্ব স্লোভাকিয়ায় সক্রিয় হয়ে উঠলো।

উনিশ শ' তেতাল্লিশে বুলগেরিয়াতে জাতীয় মুক্তি ফৌজ গঠিত হলো। তারা তাদের কাজ সুরু করলো নাৎসীদের সামরিক ঘাঁটি ও সরবরাহ লাইনগুলি আক্রমণ করে।

দুরাজ্জো সম্মেলনে (ষোলই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে) আলবেনিয়ার দেশপ্রেমিক মানুষরা সে দেশের সমস্ত পার্টিজান দলগুলির কার্যক্রম সংগঠিত করার বিষয়ে আলোচনা করলেন। সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যে একটা সাধারণ পরিষদ ও একটা সমর নায়ক পরিষদ গঠন করা হলো। সাতাশে

জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে এই সমরনায়ক পরিষদ এক আদেশ জারী করে দেশের সমস্ত পার্টিজান দলগুলি সংঘবদ্ধ করে একটি গণমুক্তি ফৌজ গঠন করলেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই ফৌজের সক্রিয়তায় এক লক্ষ সত্তর হাজার ফ্যাশিস্ত সৈন্য আটকে পড়লো। অনেক ইটালায় সৈন্য দেশত্যাগ করে আলবেনিয়ার গণমুক্তি ফৌজে যোগ দিল। সংগঠিত হলো আন্তোনিও গ্রামশ্চি পার্টিজান ব্যাটেলিয়ান।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালের মধ্যেই পার্টিজান আন্দোলন সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। এদেশের পার্টিজানদের কেবলমাত্র জার্মান সৈন্যদের সঙ্গেই লড়তে হয়নি। বৃটিশ ও মার্কিন সমর্থনপুষ্ট পলাতক যুগোশ্লাভ সরকারের দেশরক্ষা মন্ত্রী মিহাইলোভিকের চেৎনিক বাহিনীর সঙ্গেও তাদের লড়তে হলো সমানে।

চোদ্দই ডিসেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রচার দপ্তর, একটি বিশেষ বিবৃতিতে বলে যে, "জেনারেল মিহাইলোভিকের চেৎনিক সংস্থার কার্যকলাপ এ পর্যন্ত জার্মান আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে যুগোশ্লোভিয়ার মানুষের সংগ্রামকে সাহায্য করার চেয়ে ক্ষতিগ্রস্তই করেছে বেশি এবং সেই কারণের জন্যেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিকূল মনোভাব ছাড়া আর কিছুই তারা প্রত্যাশা করতে পারে না।"[৫৮]

জার্মান জেনারেলরা এবং ফ্যাশিস্ত নেতৃত্ব পার্টিজান আন্দোলনকে দারুণ ভয় করতে লাগলেন। প্রায়ই তাঁদের সোরগোল শোনা যেত যে "পার্টিজান যুদ্ধ আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী।"[৫৯] এই কথা যাঁর, হিটলারের সেই কর্ণেল জেনারেল লোথার রেণ্ডুলিক স্বীকার করেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পার্টিজান যুদ্ধের কি অসীম গুরুত্ব ছিল। তিনি লিখেছেন, "বিগত মহাযুদ্ধের মতো অন্য কোন যুদ্ধেই, পার্টিজানদের সংগ্রাম এতো গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তার ব্যাপকতা ও সম্ভবনার বিচারে বলা যায় যে যুদ্ধের ইতিহাসে এটা ছিল সম্পূর্ণ নোতুন ধরনের এক ঘটনা। রণাঙ্গনে যুদ্ধরত সৈন্যদলের উপর প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, দেশে সরবরাহ ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে এবং অধিকৃত অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করে, এই সংগ্রাম সর্বাত্মক যুদ্ধের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, বলকান অঞ্চল, এমনকি ফ্রান্স ও ইটালীতে পার্টিজান দলের আভির্ভাব

এবং বছরের পর বছর তাদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি, সমগ্রভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতি প্রকৃতিকেই প্রভাবান্বিত করেছিল।"৬০

পার্টিজান আন্দোলনের এই ব্যাপকতম রূপ সপ্রমাণ করে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ক্রমেই ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে একটা গণযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

সমস্ত দেশেই ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম পরিচালনা করেছে কমিউনিষ্ট পার্টি। এটা কোন একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। মহাযুদ্ধের কেন্দ্রিয় রণাঙ্গন মানুষের এই উপলব্ধি ঘটায় যে তাদের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার সাফল্য, জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতার সুরক্ষিত অস্তিত্ব কেবল মাত্র কমিউনিষ্টদের পরিচালনাধীনেই সম্ভব।

সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে সমস্ত সংগ্রামের মধ্যে ভল্গা যুদ্ধই ছিল মুখ্য। সেই যুদ্ধে ভেরমাখটের বাছাই করা, সেরা সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেই বিজয় গৌরব অর্জন করা গেছে। তাই একটা শুধু মাত্র একটা সামরিক বিজয়ই ছিল না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিকে এটি চূড়ান্তভাবে পরিবর্তিত করেছিল।

এরই ফলে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী জার্মানীর কাছ থেকে সামরিক উদ্যোগ ছিনিয়ে নেয়। আর হিটলারের সৈন্যদল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই আত্মরক্ষার সংগ্রামেও জার্মাণীর অদৃষ্টে পরাজয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

১. হান্স ডোয়ের রচিত, ডার্মষ্টাডে প্রকাশিত একটি জার্মাণ গ্রন্থ, ১৯৫৫, পৃঃ ১২০
২. প্রাভদা, ২২শে নভেম্বর, ১৯৭৬
৩. একটি সোভিয়েত গ্রন্থ, পৃঃ ৯৬
৪. ঐ, পৃঃ ৫৮
৫. লিডেল হার্ট : The Way to Win Wars. The Strategy of Indirect Approach. ফেবার ও ফেবার লিমিটেড, লণ্ডন
৬. নিউ টাইমস, ৯ম সংখ্যা, ১৯৫৮ পৃঃ ৯
৭. আইসেনহাওয়ার : Crusade in Europe, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃঃ ৪৫-৪৬
৮. ঐ
৯. শেরউড : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৬৭
১০. চার্চিল : The End of the Beginning, বোষ্টন ১৯৪৩, পৃঃ ১৭২
১১. চার্চিল : The Second World War, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪৭

১২. ঐ, পৃঃ ২৪১
১৩. এডোয়ার্ড আর. স্টেটিনিয়াস : Roosevelt and the Russians, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৯, পৃঃ ৭
১৪. ম্যাটলোফ ও স্নেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৬
১৫. Correspondence : দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫০
১৬. জন. ড্যালগেলিশ : We Flanned the Second Front, লণ্ডন ১৯৪৫, পৃঃ ১০
১৭. জে. এফ. সি. ফুলার : The Second World War, পৃঃ ১৮৬
১৮. ডি. এফ্. ফ্লেমিং : The Cold War and its Orgins. ১ম খণ্ড, ডব্লডে, নিউ ইয়র্ক, পৃঃ ১৪০
১৯. এডোয়ার্ড স্টেটিনিয়াস জুনিয়ার : Lend Lease. Weapons for Victory. নিউ ইয়র্ক ম্যাকমিল্যান ১৯৪৪ পৃঃ ২১০
২০. এডগার ম্যাকইন্নিস : The War, Fourth year, অক্সফোর্ড ১৯৪৪, পৃঃ ৯০
২১. চার্চিল : Second World War, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৩৮
২২. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬
২৩. ট্রাইবুনা ভোলনোস্চি, ১লা সেপ্টেম্বর, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৬৬
২৪. চার্চিল : Second World War, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৭৫
২৫. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১
২৬. ঐ পৃঃ ৮৯
২৭. চার্চিল : Second World War ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৭৫
২৮. ম্যাটলোফ ও স্নেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৫৪১
২৯. চার্চিল : Second World War, ৪র্থ খণ্ড. পৃঃ ৫১৪
৩০. ঐ, পৃঃ ৫১৬
৩১. টিপ্পলস্কার্চ : একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ, পৃঃ ২৪৬
৩২. এ এপিমেকোর একটি রুশ গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৫-৩৬
৩৩. ক্রাসনায়া যভেজদা, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬
৩৪. উইলিয়াম লিহাই : I was there, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫০, পৃঃ ১২৪
৩৫. একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৩৬. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৩৭. একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৩৮. রবার্তো বাত্তাগলিয়া : Storia Della Resistenza Italiana, ইতালীয় গ্রন্থ ১৯৫৩, পৃঃ ৬৯
৩৯. The War Reports of Marshall, Arnold and King ফিলাডেলফিয়া ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৭, পৃঃ ১৪৯

৪০. টিপ্পলস্কার্চ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ২৬৮

৪১. লিডেল হার্ট সম্পাদিত : The Soviet Army. লণ্ডন, ১৯৫৬ পৃঃ ১৩১

৪২. হাইনজ গুদেরিয়ান : পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮৮

৪৩. সোভিয়েত মিলিটারি মস্কো, অষ্টম সংখ্যা, ১৯৫৭, পৃঃ ২০১

৪৪. ডবলিউ, ডবলিউ, রস্টো ; The United States in the World Arena An Essay in Russian History : নিউ ইয়র্ক, ১৯৬০, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০১

৪৫. Falsifiers of History র "Conversation Pauls—Mr. Bull" মস্কো ১৯৫১, পৃঃ ১০২

৪৬ ঐ

৪৭. Correspondence : ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪-২৫

৪৮. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ

৪৯. আর' বাত্তাগলিয়া : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬২

৫০. Ciano Diary পৃঃ ৫৫০-৫৮

৫১. প্যারীতে প্রকাশিত হিটলার ও মুসোলিনীর গোপন পত্র বিনিময়ের সংকলন, ১৯৪৬, পৃঃ ১৮৫

৫২. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ

৫৩. একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ

৫৪. সি' এ' ডিকসন এবং ও হেইলব্রুণ : Communist Guerrilla Warfare, লণ্ডন ১৯৫৯ পৃঃ ৫৫

৫৫. একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ

৫৬. ঐ

৫৭. লিবার্তি ৩০শে নভেম্বর, ১৯৪৭

৫৮. Soviet Foreign Policy : ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪

৫৯. একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ

৬০. ঐ

একাদশ অধ্যায়

উত্তর আফ্রিকার জন্য সংগ্রাম

উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সৈন্য ও এরউইন রোমেলের আফ্রিকা বাহিনীর মধ্যে উনিশ শ' চল্লিশের নভেম্বর থেকে উনিশ শ' একচল্লিশের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে জয় পরাজয়ের, ঘন ঘন ভাগ্য পরিবর্তনের লড়াই চললো। কিন্তু যতোই দিন যেতে লাগলো ততোই জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব এই যুদ্ধ সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে লাগলো। প্রথমে লিবিয়া রণাঙ্গন জার্মানীর কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কারণ তখন তার লক্ষ্য ছিল সুয়েজ খাল দখল করে, পূর্ব দেশীয় উপনিবেশগুলির সঙ্গে বৃটেনের প্রধান যোগাযোগের সূত্র বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া।

বৃটিশ সরকার তখন এই অসীম গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্রটি দখলে রাখার জন্যে সর্বস্ব পণ করেছিলেন। ফলতঃ বৃটেনের রণকৌশলে লিবিয়া রণাঙ্গন প্রাধান্য লাভ করেছিল।

মস্কোর কাছে জার্মাণরা পরাজিত হওয়ার পরে পরিস্থিতি বদলে গেল। তখন থেকে সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে, জার্মানীর প্রায় সব সৈন্য আবদ্ধ হয়ে গেল। হিটলার অন্যান্য সমস্ত রণাঙ্গন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এনে এখানেই পূর্ণ মনোযোগ দিলেন। ফুলার স্বীকার করেছেন যে, "হিটলার ও তাঁর অনুচররা লিবিয়ার যুদ্ধকে একটা আনুষঙ্গিক ঘটনা বলে মনে করতেন। তার গুরুত্ব এতোই কম ছিল তাঁদের কাছে যে রাশিয়ায় কোথাও কাজে লাগতে পারে এমন কোন সৈন্যদলকে তাঁরা সেখানে (লিবিয়ায়) পাঠাতে গররাজী ছিলেন।"[১] টিপ্পলস্কার্চও বারবার জোর দিয়ে বলেছেন যে, "জার্মাণ ভেরমাথ্‌ট রাশিয়াতে প্রায় একেবারে আটকে পড়েছিল।"[২]

ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশ ও জুন উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, রুজভেল্ট ও চার্চিল তাঁদের ওয়াশিংটন বৈঠকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে সামরিক তৎপরতার লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু আলোচনায় গুরুতর মতভেদ দেখা দেয় এই

দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে। বৃটিশ সরকার তুরস্ককে সহযোগী করে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অভিযান চালাবার পরিকল্পনা অপরিবর্তিত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। এই বলকান রণকৌশল সম্পর্কে চার্চিল একেবারে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তিনি প্রথম মহাযুদ্ধকালে লয়েড জর্জ প্রদত্ত যুক্তিগুলি পুনরুত্থাপন করে বলেন যে, বলকান অঞ্চল হলো "ইউরোপের খিড়কির দরজার" মতো। সেই মহাদেশের "নরম তলপেট", যেখানে একবার পৌঁছতে পারলে জয়লাভ ত্বরান্বিত করা যাবে।

প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধশেষ ত্বরান্বিত করার জন্যে সামান্যমাত্র চিন্তা করতো। তাদের বলকান রণকৌশলের মৌল লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে বৃটিশ আধিপত্য বিস্তার করা। সেখানকার মানুষদের উপরে একটা ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে, বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম হাতিয়ার স্বরূপ সেখানে একটা সোভিয়েত বিরোধী "প্রতিষেধক বেষ্টনী" গড়ে তোলা। সেভিয়েত সৈন্যবাহিনী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করার পরে, বলকান রণকৌশলের আরেকটি লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ দখল করে সোভিয়েত পাল্টা আক্রমণ মহাদেশের পশ্চিমে বিস্তৃত হতে না দেওয়া এবং পরে তারই সুযোগ নিয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যদলকে উত্তরমুখী অভিযানে নিয়োগ করা।

দক্ষিণ পূর্ব-ইউরোপ সম্পর্কে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের নিজস্ব একটা পরিকল্পনা ছিল। তদানীন্তন পরিস্থিতিতে উত্তর আফ্রিকা অভিযানই ছিল তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে. একটা অধিকার স্থাপনের ক্ষেত্র স্থির করে, তারপর উত্তর আফ্রিকার সম্পদ এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মধ্য প্রাচ্যের তৈলখনি অঞ্চলে নিজেদেব দাবী প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাদের মৌল লক্ষ্য।

একটি মার্কিণ সাময়িক পত্রে এই সময়ে লেখা হয়েছিল: "নিকট প্রাচ্যে বৃটিশ প্রভাব প্রতিপত্তি গত এক শতাব্দীর মধ্যে বর্তমানেই সবচেয়ে নীচে নেমে গেছে। নিকট প্রাচ্যের ঘটনাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা কোন মতেই আর বৃটেনের হাতে ছেড়ে দিতে পারেনা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র।... আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে নিকট প্রাচ্য হলো ইউরোপের সবচেয়ে ভালো সংযোগ সেতু। যদি সেই সেতু হাত ছাড়া হয়ে যায় তাহলে এমন

কি লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের জীবনের বিনিময়েও তা পুনরাধিকার করতে হবে। সৌভাগ্যের কথা নিকট প্রাচ্য এখনো হাত ছাড়া হয়ে যায় নি। আমাদের তাড়াতাড়ি করতে হবে। নিকট প্রাচ্যে প্রভূত পরিমাণে সামরিক শক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেকে সেই অঞ্চল একটি দুর্গে পরিণত করতে হবে। এবং তারপরে নিজের আয়ত্তাধীন সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সাহায্যে সেই দুর্গকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এটাই হলো প্রধান লক্ষ্য আজকে যে কোনরকম ঊদাসীনতা বা অমনোযোগের ফলে এই বিরাট সুযোগ হাত ছাড়া করা চলবে না।"[৩]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকচক্র তাঁদের শত্রু ও মিত্র, উভয়পক্ষীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের শিবিরেই নিজেদের অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধালাভে সচেষ্ট ছিলেন। এ কারণেই মার্কিণ দেশের রাজনৈতিক নেতারা উত্তর আফ্রিকা অভিযানের পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কারণ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্পদের উপর তাঁদের লোভ ছিল দীর্ঘ দিনের। অমেরিকানদের পরিকল্পনা ছিল উত্তর আফ্রিকার পরে অভিযান চালাতে হবে ইটালী, আফ্রিকা এবং বলকানে মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে, ওয়াশিংটন তাই দাবী জানালো ইঙ্গ-মার্কিণ যুদ্ধ পরিকল্পনায় নেতৃত্বের ভুমিকা। এইভাবেই সামরিক নীতি নির্দ্ধারণের প্রশ্নে, ইঙ্গ-মার্কিণ ও মার্কিণ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠলো।

রুজভেল্ট স্বয়ং উত্তর আফ্রিকার বিষয়ে প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন কারণ "স্পষ্টতই এই সমগ্র অঞ্চল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিচারে অতীব মূল্যবান ছিল।"[৪] তাই আমেরিকান বিমানবহর উনিশ শ' চল্লিশ—একচল্লিশেই উত্তর আফ্রিকার ব্যাপকভাবে আলোক চিত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিল।

সুরুতে মার্কিণ যুদ্ধ দপ্তর আফ্রিকা অভিযানে আপত্তি করেছিল, কারণ তাদের মতে এটাকে "বড় জোর নাৎসীদের চূড়ান্ত পরাজয়ে পরোক্ষ অবদান বলা যেতে পারে," বলে মনে হয়েছিল।[৫] কিন্তু মার্কিণ একচেটিয়া পতিরা শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে তাদের মতে, যুদ্ধ দপ্তরকে মত দিতে রাজী করালো।

মার্কিণ সরকার কিন্তু তাঁর অভিসন্ধি গোড়াতেই তাঁদের বৃটিশ সাথীদের কাছে খুলে বলেননি। আলাপ আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত আফ্রিকা

অভিযানে তাঁরা বৃটেনকে রাজী করলেন। সেই অবস্থায় বৃটিশ সরকার, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সম্প্রসারণশীল নীতি মেনে নিলেও, চেষ্টা করতে লাগলেন কিভাবে ফ্রান্সের ঘাড়ে চাপ দিয়ে মার্কিণ দেশকে খুশি করা যায়।

মার্কিণ সরকারের ইচ্ছা ছিল সেই সমস্ত ফরাসী রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ করার, যাঁরা উত্তর আফ্রিকার নেতৃত্বের ভূমিকা মার্কিন একচেটিয়া—পতিদের কাছে ছেড়ে দিতে রাজী। দ্য গল তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, এরা (মার্কিনরা) উত্তর আফ্রিকার দরজা তাদের জন্যে খুলে দেবে এমন যে কোন লোকের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজী। তেমন রাজনীতিকের অভাবও দেখা গেল না শেষ পর্যন্ত। তাঁরা হলেন জেনারেল ওয়েগাঁ (Weagend) ও অ্যাড্‌মিরাল দারলাঁ (Darlan) তাঁরা জানালেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি বেশ তোড় জোড় করে, সুনিশ্চিত সাফল্যের জন্যে নাবতে পারে, তাহলে তাঁরা সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ভিশী নেতৃবৃন্দ যেই দেখলেন যে হিটলারের সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে অমনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে তাঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন। দারলাঁর সঙ্গে তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে ওয়াশিংটনে প্রেরিত এক বিবরণীতে লিহাই লিখেছিলেন যে, রাশিয়াতে জার্মানরা যে অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছে, সেটাই দারলাঁ ও তাঁর মতো ফরাসী সহযোগীদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি আরো লিখেছিলেন যে এই সব লোকদের চূড়ান্ত মনোভাব রাশিয়া অভিযানের চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল।[১১]

পেঁত্যার ভিশী সরকারে দারলাঁ ছিলেন একজন প্রথম সারির লোক। উনিশ শ' একচল্লিশের বসন্তকাল থেকে তিনি বহু পদ অধিকার করেছেন। প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তারপর হয়েছেন কখনো প্রতিরক্ষা, বিমান চলাচল অথবা নৌবিভাগীয় মন্ত্রী। কখনো বা আবার পররাষ্ট্র কিম্বা প্রচার দপ্তরের মন্ত্রী। ফ্রান্সে ফ্যাশিস্ত শাসনকে কায়েম করার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তারই সঙ্গে মার্কিন সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বের ভাণ করে, ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটির সঙ্গে মার্কিনদের যোগাযোগ স্থাপনে বাধা দিয়েছেন।

এধারে আফ্রিকায় অবতরণের প্রস্তুতি যখন জোরদার চলছিল তখন বৃটিশ সরকার স্থির করলেন যে এ অঞ্চলে আমেরিকানরা পোঁছবার পূর্বেই তাঁরা

একক অভিযান চালিয়ে হৃত সম্মান কিছুটা পুনরুদ্ধার করবেন। পরিস্থিতি তখন বৃটেনের যথেষ্ট অনুকূল। ভল্গা যুদ্ধ নাৎসী নিয়মিত বাহিনীর বেশির ভাগকেই রণাঙ্গনে টেনে আনেনি, তাদের সংরক্ষিত বাহিনী, এমন কি আফ্রিকা রণাঙ্গনকে দুর্বল করে সেখান থেকেও সেনাদল, হিটলারকে সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে পাঠাতে বাধ্য করেছে। তাই আফ্রিকায় উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শরৎকালে দেখা গেল বৃটিশ অষ্টম বাহিনীর অধীনে আছে সাতটি পদাতিক, তিনটি সাঁজোয়া ডিভিসন এবং সাতটি ট্যাঙ্ক ব্রিগেড। তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সংখ্যার হিসাবে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও বহুযুদ্ধের অভিজ্ঞতা ক্লান্ত চারটি জার্মান ও এগারোটি ইটালীয় ডিভিসন।

তেইশে অক্টোবর উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, বৃটিশ সেনাদল অভিযান সুরু করেই, অতর্কিতে এল অ্যালামিয়েন অঞ্চল আক্রমণ করলো। অতর্কিত আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় জার্মাণ ও ইটালীয় সৈন্যরা সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে পিছু হটে গেল। এক পক্ষকালের প্রচণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সেনাদল, আট শ' পঞ্চাশ কিলোমিটার এগিয়ে গেল, এবং বিশে নভেম্বর দখল করে নিল বেনগাজী। পলায়নপর জার্মাণ সৈন্যদলের প্রাণ রক্ষার সমস্ত আশায় জলাঞ্জলী পড়লো যখন দূরে, অনেক পিছনে, মরোক্কো ও আলজিরিয়ায় অবতরণ করলো এক ইঙ্গ মার্কিন বাহিনী।

॥ দুই ॥

উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ মার্কিণ অবতরণ পরিকল্পনা, যার সাংকেতিক নাম দেওয়া হয়েছিল টর্চ কার্যক্রম", আটই নভেম্বর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে রূপায়িত করা সুরু হলো। তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে, লেফটেন্যান্ট জেনারেল ডিউইট ডি আইসেন হাওয়ারের নেতৃত্বে এর কাজ সুরু হলো। সরাসরি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমেরিকানদের একটি দল সাগর পেরিয়ে এসে অবতরণ করলো ফরাসী মরোক্কোয়। অন্য দু'টি দল, যাতে ছিল বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্য, ইংল্যাণ্ড থেকে এসে পৌঁছলো। তাদের একটা অবতরণ করলো ওরান অঞ্চলে, অপরটি আলজিয়ার্সের কাছে। পাঁচশটি সৈন্যবাহী জলযান বয়ে আনলো তাদের, আর সঙ্গে পাহারাদার হিসাবে রইলো তিনশ' পঞ্চাশটি নৌবাহিনীর জাহাজ।

অবতরণ কাজে সুরু হওয়ার পূর্বেই, ফ্রাঙ্কো স্পেন কেমন করে সব টের পেয়ে যায়। হিটলারকে জানাতেও সে দ্বিধা করেনি। কিন্তু হিটলারের তখন আর কিছু করার ছিল না। ভল্গা যুদ্ধ নিয়েই তিনি তখন ব্যতিব্যস্ত।

উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী সৈন্যদল তাদের নাম মাত্র প্রতিরোধের চেষ্টা করলো। উত্তর আফ্রিকায় ভিশী সেনাদলের প্রধান সেনাপতি অ্যাড্‌মিরাল জঁা দারলঁা জেনারেল অইসেনহাওয়ারের সঙ্গে একটা যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে ফেললেন। তাতে ইঙ্গ মার্কিণ সেনাদল সহজেই অবতরণের পরে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়তে পারলো এবং অল্পদিনেই আলজিরিয়া মরোক্কো ও টিউনিশেয়ার কিছু অংশ দখল করেনিল। টিউনিশিয়ার অন্য অঞ্চলে জার্মাণরা তখনো ঘাঁটি করে বসে আছে।

যদিও আফ্রিকা অবতরণের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল এবং সমগ্রভাবে তা যুদ্ধের গতিতে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, তা সত্বেও উত্তর আফ্রিকা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়াটা জার্মানীর পক্ষে ছিল একটা বেদনাদায়ক আঘাতের মতো। কারণ জার্মানী এতো দিন আফ্রিকার কাঁচা মাল ও খাদ্য দ্রব্য ব্যবহার করেছে নিজের প্রয়োজনে। তা ছাড়া ফরাসী নৌবহরের অনেক জাহাজ, যারা এতোদিন বিভিন্ন আফ্রিকা বন্দরে আশ্রয় নিয়ে ছিল, তারা এসে যোগ দিল মিত্রপক্ষে। কিন্তু তা সত্বেও ফরাসী নৌবহরের একটা বড়ো অংশ তখন ছিল দক্ষিণ ফ্রান্সের তুলোঁ'তে। সেই জন্যেই নাৎসীরা মূল ফরাসী ভূখণ্ডের কিছু অংশ যা তখনো তারা অধিকার করেনি, তা আর ফেলে রাখা সমীচিন মনে করলো না।

একুশে নভেম্বর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, জার্মাণ সৈন্য অনধিকৃত ফ্রান্সের সীমান্ত রেখা অতিক্রম করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। লক্ষ্য তাদের তুলোঁ বন্দরের জাহাজগুলি দখল করা। একই সময়ে ইটালীয় সৈন্য প্রবেশ করলো নাইস, স্যাভয় ও কর্সিকা অঞ্চলে।

জার্মাণরা প্রবেশ করলো তুলোঁয়। পেতঁ্যার বিশেষ বার্তা নিয়ে অ্যাড্‌মিরাল অ্যাব্রিয়াল ছুটলেন তুলোঁর দিকে, যাতে ফরাসী নাবিকদের নৌ বহর নিয়ে জার্মাণদের কাছে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাঁর দৌত্য ব্যর্থ হলো। ফরাসী নাবিকদের মধ্যে উঠলো প্রতিবাদের গুঞ্জন। কিন্তু, জাহাজগুলি সমুদ্রে সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারার জন্যে তাঁরা সেখানেই

তাদের ডুবিয়ে দিলেন। তুলোঁ বন্দরে ফরাসী নৌবহরে ছিল তিনটি যুদ্ধজাহাজ, একটি বিমানবাহী জাহাজ, চারটি ভারী ও তিনটি হাল্কা ধরণের ক্রুইজার, পঁচিশটি ডেষ্ট্রয়ার, ছাব্বিশটি ডুবো জাহাজ ও অন্যান্য আরো কিছু জলযান।

পেতাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্লাঁদি, (Flaudin) বিভিন্ন সময়ে আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী পুশ্যু (Puehen) ও পাইরোতোঁ (Peyrouton) ও অন্যান্য চরম প্রতিক্রিয়াশীলরা উত্তর আফ্রিকায় ইঙ্গ মার্কিণ অবতরণের পরে দারলাঁর নীতি অনুসরণ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পক্ষে যোগ দিলেন। ফরাসী উত্তর আফ্রিকার অসামরিক শাসন ব্যবস্থায়—সর্বোচ্চ কমিসারিয়েটে, দারলাঁ তাদের গ্রহণ করে, নানা পদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। পাইরোতোঁকে আলজিরিয়ার গভর্ণর পদে নিযুক্ত করা হলো।

এই সমস্ত নিযুক্তি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদনেই করা হয়। আঠারোই নভেম্বর, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, উত্তর আফ্রিকায় আইসেনহাওয়ার যে সমস্ত চুক্তি করেছেন তার সবের প্রতি তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। ফ্রান্সকে পদানত করে তার উপনিবেশ-গুলিতে ঘাঁটি স্থাপন করতে আগ্রহী, মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা ফ্যাশিস্তদের সাম্প্রতিকতম সহযোগীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে যথেষ্ট পরিমাণে ইচ্ছুক ছিল। তাই মার্কিণ সমর্থণপুষ্ট হয়ে দারলাঁ তাড়াতাড়ি নিজেকে ঘোষণা করলেন ফরাসী "রাষ্ট্রপ্রধান", ফরাসী সৈনবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও একজন রাজনৈতিক একনায়ক হিসাবে।

দেশপ্রেমিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত অবদমন নিপীড়নকারী ফ্যাশিপন্থী আইনগুলি, যা ভিশী সরকারের নেতৃত্বে নিপুণভাবে কার্যকরী হচ্ছিল, ইঙ্গ মার্কিণ কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দেওয়া সমীচিন মনে করলেন না। তখন পেতাঁর আদেশে আলজিয়ার্সের মাইসোঁ-কার কারাগারে, ফরাসী পার্লামেন্টের সাতাশ জন কমিউনিষ্ট সদস্যকে আটক রাখা হয়েছিল। সাতাশজন বন্দী কমিউনিষ্ট সদস্যের একজন, ফ্লরিমোঁ বঁতে তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন: "মিত্রপক্ষের অবতরণের পরে দু'মাস কেটে গেল, কিন্তু এখনো একজন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। আমাদের এখনো আটক রাখা হয়েছে কারণ কর্তৃপক্ষ জানেন যে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সমস্ত বিশ্বাস-

ঘাতকদের শাস্তি দাবী করবো। আমরা ফ্রান্স ও আলজিরিয়ার জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করবো এবং চেষ্টা করবো যাতে এখানে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সংস্থা গড়ে উঠতে পারে।"[৭]

ততোদিন পর্যন্ত বন্দী দশায় থাকার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করে সাতাশ জন কমিউনিষ্ট সদস্য আইসেনহাওয়ারের কাছে একটা চিঠি লিখলেন। কিন্তু কোন জবাব এলো না তার। ফ্লরিমোঁ বঁতে লিখেছেন যে, "মার্কিণ কর্তৃপক্ষ যেহেতু প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধি, যেহেতু এই সব নেতাদের আদেশ নির্দেশ মেনেই তাঁদের চলতে হয়, তাই চরম, নির্ভেজাল ভিশীপন্থী, যারা দু'দিন আগেও হিটলার ও মুসোলিনীর সহযোগী ছিল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা বাঞ্ছনীয় মনে করছেন।"[৮] ইঙ্গ মার্কিণ অবতরণের তিন মাস পরে, পাঁচই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশের পূবে এই বন্দী কমিউনিষ্ট ডেপুটিদের মুক্তি দেওয়া হয়নি।

উত্তর আফ্রিকার পরিস্থিতিতে জনমত রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী ও ফ্যাশিস্ত সহযোগীদের প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের উপর থেকে ছদ্ম আবরণটা সরিয়ে দিল। সারা বিশ্বের প্রগতিশীল মানুষ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র গুলি বিশ্লেষণ করে দেখিয়ে দিল যে উত্তর আফ্রিকায় মার্কিণ নীতি, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের আদর্শের পরিপন্থী।

উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী ফ্যাশিস্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থনের পিছনে মার্কিণ সরকারের যে একটা গোপন উদ্দেশ্য ছিল, সেটা সেদিন স্পষ্ট হয়ে গেল। অনেক ভেবেচিন্তে এই নীতি গ্রহণ করা হলেও তা মার্কিণ নীতিকে লোকের চোখে হেয় করে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসীদের মনোভাবও করে দিল প্রতিকূল। তখন মার্কিণ সরকার মনস্থ করলেন যে দারলাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের ডিসেম্বর দারলাঁর আততায়ীর হাতে নিহত হলেন। তারপর আরেকজন ফরাসী প্রতিক্রিয়াশীল আঁরি গিরোকে (Ghenry Girand) তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হলো।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের চোদ্দই থেকে চব্বিশে জানুয়ারী উত্তর আফ্রিকার ক্যাসাব্লাঙ্কার মাইল পাঁচেক দূরে রুজভেল্ট ও চার্চিলের নেতৃত্বে মার্কিণ ও বৃটিশ

প্রতিনিধিদল একটি সম্মেলনে মিলিত হলেন। সম্মেলনের সরকারী বিবৃতিতে বলা হলো যে, "উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শেষে পরিস্থিতিতে যে লক্ষ্যনীয় অনুকূল গতি দেখা গেছে, তার থেকে পূর্ণ সুযোগ লাভ করার জন্যে "এই বৈঠক আহুত হয়েছিল।[৯] কিন্তু এমনই বৈপরীত্য সেই বৈঠকে দেখা গেল যে, তার গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার সময় আবার স্থগিত রাখা হলো এবং এবারে উনিশ শ' তেতাল্লিশ থেকে উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। পরিবর্তে ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃবৃন্দ, উনিশ শ' তেতাল্লিশের গ্রীষ্মকালে, একটা অপেক্ষাকৃত অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ, সিসিলী অভিযানের পরিকল্পনা করলেন। মার্কিণ সাংবাদিক র‍্যাল্‌ফ ইঙ্গারসোল বলেছেন যে ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন "প্রভূত পরিশ্রম করে একটা সিসিলীয় ইঁদুর প্রসব করলো।"[১০]

কিন্তু খাস জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন বলতে, সম্মেলন শুধু বিমান আক্রমণেই তা সীমিত রাখার প্রস্তাব করলো।

সোভিয়েত সরকারকে ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনের আলোচনা প্রসঙ্গে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়, তা মোটেই পূর্ণাঙ্গ ছিল না। রুজভেল্ট ও চার্চিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে যে বাণী পাঠিয়েছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল:

"আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জার্মাণী ও ইটালীর উপরে, স্থল, জল ও আকাশ পথে যতোদূর শক্তি প্রয়োগ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব, তাই করা।"[১১]

ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে সোভিয়েত সরকারের বিশেষ দেরী হলো না। সোভিয়েত সরকার তাঁদের জানালেন যে পুনরায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত এবং টিউনিশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক কার্যক্রম বাতিল করে দেওয়া, কেন যে করা হলো তা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। জার্মাণরা এতে কিন্তু খুশিই হলো, তারা তাড়াতাড়ি পাঁচটি প্যানসার ডিভিসন সমেত আরো সাতাশ ডিভিসন সৈন্য পাঠালো সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে।

ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গনের কথাও আলোচিত হয়েছিল। কিন্তু জাপ বিরোধী যুদ্ধ তীব্রতর করার জন্যে কোন সিদ্ধান্তই নেওয়া হলো না। চিয়াংকাই-শেকও তাতে সম্মতি জানালেন। সম্মেলনের যোগদান-কারীরা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে 'এই রণাঙ্গনে অংশ গ্রহনের একটা

সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি খুবই কাম্য বলে মনে করেছিলেন, যেন জাপবিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মানী পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যোগ দেয়।[১২]

সামরিক কার্যক্রমের রূপায়নে বিশেষতঃ ইউরোপীয় রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিণ মত পার্থক্য ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে আবার নোতুন করে দেখা গেল। শেষ পর্যন্ত মতপার্থক্যের সমাধান হলো একটা আপোষের মধ্যে যে, দুই পক্ষ তাদের মধ্যে নিজ নিজ প্রভাবযুক্ত অঞ্চল ভাগাভাগি করে নেবে। মধ্য প্রাচ্য ও বলকান অঞ্চলের জন্যে বৃটেন গ্রহণ করবে রাজনৈতিক ও সামরিক "দায়িত্ব" আর আমেরিকার "দায়িত্ব" থাকবে উত্তর আফ্রিকা ও দূর প্রাচ্যের জন্যে। মার্কিণ মুখপাত্র চার্চিলের পরিকল্পনা অনুযায়ী দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে আক্রমণের একটা রণক্রম রচনা করতে সম্মতি জানালেন।

ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলন থেকে চার্চিল সরাসরি বিমানে গিয়ে হাজির হলেন এডনে। সেখানে উনিশ শ' তেতাল্লিশের তিরিশে একত্রিশে জানুয়ারী বৈঠক বসলো তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ইসমেট ইনোনু ও অন্যান্য তুর্কী নেতাদের সঙ্গে। বৈঠক শেষে সরকারী বিবৃতিতে বলা হলো, "তুর্কী রাষ্ট্রনেতারা বিগত কয়েকটি সংকটপূর্ণ বছরে তুরস্কের নীতির পর্যালোচনা করেন, তখন প্রধান মন্ত্রী (চার্চিল) তাদের জানান যে বৃটিশ সরকার সহানুভূতি ও বোঝাপড়ার মনোভাব নিয়ে তাদের অনুসৃত নীতি গভীরভাবে লক্ষ্য করে এসেছেন।"[১৩] এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো এই যে চার্চিল, তুরস্কের নেতাদের হিটলারপন্থী নীতির সঙ্গে নিজের সমর্থন ও বৃটেনের সংহতি জানাতে মোটেই দ্বিধা করলেন না।

তুর্কী নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় চার্চিল, তুরস্কে মার্কিণ অর্থ নৈতিক স্বার্থ সম্প্রসারণের নীতি প্রতিরোধ করার জন্যে, বৃটিশ পুঁজির আনুকূল্যলাভের জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করলেন, যাতে তুরস্কের বাজার বৃটেনের প্রভাবাধীনে থাকে। নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থ সুরক্ষিত করতে বৃটিশ মন্ত্রিসভা অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়েছিলেন কারণ তাদের মার্কিণ প্রতিযোগীরা দারুণভাবে স্বার্থহানি ঘটানোর চেষ্টা করছিল। বৃটেনের বলকান নীতিতে তুরস্কের অংশ গ্রহণের বিষয় নিয়েও চার্চিল আলাপ করেন এবং তুরস্ক সম্মত হলে তাকে প্রভূত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র যোগান দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন।

তখন জার্মানী একটার পর একটা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছে। তুর্কী প্রতিক্রিয়াশীলরা স্বভাবতই তাদের এতোদিনের অনুসৃত নীতি পরিবর্তন করে, ইঙ্গ-মার্কিণ শাসক

টির মতে সায় দিতে ইচ্ছুক হয়ে উঠলো। যদিও হিটলারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্ক ছেদ করাটা তখনই যুক্তিযুক্ত বলে তারা মনে করেনি।

ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধের আরেকটি কারণ হলো ফ্রান্স। বৃটেন দ্য-গলের সঙ্গে ততোদিনে রীতিমতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তারা মার্কিণদের ক্রমাগত জেনারেল গিরোর পক্ষাবলম্বনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত সেখানেও একটা আপোষ রফা হয়ে গেল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সম্মত হলো যে পলাতক ফরাসী সরকারের নেতৃত্বে দ্য-গল ও গিরো উভয়েই সম ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে থাকবেন।

কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তে কোন সুরাহা হলো না, কারণ ইঙ্গ-মার্কিণদের সমর্থিত দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী নেতা—দ্য-গল ও গিরোর মধ্যে তীব্র মতভেদ হতে লাগলো। অবশেষে আটই জুন, উনিশ শ' তেতাল্লিশে ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হলো। স্থির হলো কমিটির যৌথ সভাপতি হবেন দ্য-গল ও গিরো। আর প্রত্যেকের থাকবে ছ'জন করে অনুগামী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার তখনো জেনারেল গিরোকে সমর্থন করতে লাগলেন। উনিশ শ' তেতাল্লিশের জুলাইয়ে তাঁরা গিরোকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমন্ত্রণ জানালেন। খুব খোলাখুলি এবং স্বেচ্ছাকৃত ভাবেই তাঁরা দ্য গলকে উপেক্ষা করেন। ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটিকে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের স্বীকৃতিদান করতে বিলম্ব করা হতে লাগলো। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সরকার, ফরাসী রাষ্ট্রিকসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই কমিটিকে স্বীকৃতিদান করা স্থির করলেন। একথা শুনে, চার্চিল সোভিয়েত সরকারকে তেইশে জুন, উনিশ শ' তেতাল্লিশে একটি বিশেষ বাণী পাঠালেন। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর ফরাসী কমিটির প্রতি এই মনোভাবের সপক্ষে কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি দেখাতে পারলেন না।

তেইশে আগষ্ট, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করলেন যে, তাঁরা "ফরাসী সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে, ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটিকে স্বীকৃতিদানের সিদ্ধান্ত করেছেন"[১৪] এবং এই কমিটির সঙ্গে তাঁরা দূত বিনিময় করবেন।

এমন কি ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটিকে স্বীকৃতিদানের পরেও, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন তাকে ক্রমাগত উপেক্ষা করতে লাগলো। যুদ্ধে ফ্রান্সের পুনরায় অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে, মার্কিণ ও বৃটিশ সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে

ফরাসীরা কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে, সেই প্রসঙ্গে এই কমিটির সেপ্টেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশের প্রস্তাবে, তারা কোন জবাব দিল না। এই প্রতিনিধি-মূলক সংস্থা ফ্রান্সে থাকা সত্ত্বেও, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদল প্রবেশ করতে পারে, ফ্রান্স সমেত এই ধরনের দেশগুলির জন্যে একটি বিশেষ সামরিক শাসন সংস্থা গঠন করলো। তার নাম দেওয়া হলো, অধিকৃত রাজ্যগুলির জন্য মিত্রপক্ষীয় সামরিক সরকার (Allied Military Govt. of Occupied Territories)। ইউরোপে ফ্যাশিস্ত দখলভুক্ত, মুক্তি প্রতীক্ষিত অঞ্চলগুলিতে বৃটেনের সহযোগিতায় মার্কিণ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হলো এর মাধ্যমে। এপ্রিল মাসে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত নির্দেশাবলী পাঠালেন তাতে ফ্রান্সে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ব্যবহার করবেন, সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ডিউইট ডি. আইসেনহাওয়ার।[১৫]

ফ্রান্সে এইভাবে ক্ষমতার দাবীদার কোন ফরাসী প্রতিপক্ষকে স্বীকার না করে, নিজের শক্তি, আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ও জোরালো করে নেওয়ার পরে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গিরোর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। তাছাড়া তখন ফরাসী জনমতেরও গিরোর প্রতি বিন্দুমাত্র কোন সমর্থন ছিল না। নয়ই নভেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে গিরো পদত্যাগ করলেন এবং এর পর থেকে ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটির একমাত্র সভাপতি রইলেন দ্য গল।

জার্মাণী প্রসঙ্গে যুদ্ধের চরম উদ্দেশ্য নিয়েও ক্যাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে আলোচনা হয়। ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রগুলি **বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ** না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তই এখানে গৃহীত হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তে সোভিয়েতের প্রভাব সুস্পষ্ট, যদিও সোভিয়েতের পক্ষ থেকে যুদ্ধের উদ্দেশ্য আরো পূর্ণাঙ্গ করে বলা হয়েছিল যে হিটলার জার্মানীর সম্পূর্ণ পরাজয় ও তার বিনাসর্তে আত্ম-সমর্পণ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকবে।

মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকচক্রের চরম প্রতিক্রিয়াশীল মহলে, যারা ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আপোষরফার মাধ্যমে একটা স্বতন্ত্র শান্তি চুক্তি সম্পাদন করার প্রত্যাশা করছিল, এই সিদ্ধান্ত চরম ক্রোধ ও আক্রোশের প্রকাশে অভিনন্দিত হলো। বৃটিশ যুদ্ধতত্ত্ববিদ লিডেল হার্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে "বিনাসর্তে আত্ম-সমর্পণ" কথাটিকে ধিক্কার দিলেন। তিনি হিটলারতন্ত্র শুধু নয়, জার্মাণ রাষ্ট্র-প্রধান হিসাবে হিটলারকে ক্ষমতাসীন রাখা একান্ত কাম্য বলে মনে করতেন।

তিনি লিখেছিলেন, "হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মধ্যে একটা বিপজ্জনক সম্ভাবনা রয়ে গেছে, তা হলো এই যে রক্ত মাংসের মানুষের পরিবর্তে সেখানে গড়ে উঠবে একটা কাহিনী যা নেপোলিয়ঁর কাহিনী সভ্যতার পক্ষে যতোটা ক্ষতিকর হয়েছে, পর চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে।"[১৬] আরেকজন বৃটিশ ইতিহাসবিদ ঠিক এই রকম কথাই বলেছিলেন। তিনি হলেন জে. ফুলার। তিনি বলেন এই দুটি কথা—"বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ"—এর পর থেকে "আমেরিকা ও বৃটেনের গলায় গলিত অ্যালবেট্রসের মতোই ঝুলে থাকবে।"[১৭] চার্লস জি. টেনসিল নামে জনৈক মার্কিণ ইতিহাসবিদ, এই দু'টি কথা ব্যবহার করার জন্যে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টকে মারাত্মকভাবে আক্রমণ করেন। তিনি খোলাখুলি বলেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাশে দাঁড়িয়ে দেখা কেমন করে জার্মানী ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একে অন্যকে ধ্বংস করে।[১৮] "বিগত বহু শতাব্দীর যুদ্ধের সাধারণ অভিজ্ঞতার" প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, লিডেল হার্ট বলেন যে, বৃটেনের এই দীর্ঘস্থায়ী নিরাপদ অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির পিছনকার কারণ হলো এই যে, সে তার মহাদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের মতো যুদ্ধে সমস্ত শক্তি ব্যয় করে চূড়ান্ত জয়লাভের পিছনে না ছুটে, যে কোন যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছে আপোষ মীমাংসায়, চুক্তি করে।[১৯]

বিশে মার্চ, উনিশ শ' তেতাল্লিশে, লিবিয়া টিউনিশিয়া সীমান্তে অবস্থানকারী বৃটিশ অষ্টম বাহিনী, আবার আক্রমণ সুরু করলো। আইসেনহাওয়ারের সেনাদল আক্রমণ করলো পশ্চিম টিউনিশিয়া। দু'দিকে আক্রমণের চাপ সহ্য করতে না পেরে, ইটালী-জার্মানীর সেনাদল, টিউনিশিয়ার উত্তরাঞ্চলে সরে যেতে লাগলো। মে মাসের সুরুতে তারা এসে সমবেত হলো, টিউনিশিয়ার উত্তর-পূর্ব সীমান্তে কেপ বনে। বারোই মে তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করলো। উত্তর আফ্রিকার যুদ্ধের পরিসমাপ্ত ঘটলো।

॥ তিন ॥

উত্তর আফ্রিকার বিজয়গৌরব আমেরিকার একচেটিয়াপতিদের বিশ্বে প্রভুত্ব-বিস্তারের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তীব্র করে তুললো। বৃহৎ পুঁজির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল, তাদেরই স্বার্থের প্রবক্তা, খ্যাতিমান বুর্জোয়া সাংবাদিকরা, সংবাদপত্রে এই বিষয়ে দারুণ লেখালেখি সুরু করলেন। উনিশ

শ' তেতাল্লিশে প্রখ্যাত সাংবাদিক ওয়াল্টার লিপম্যান, "অতলান্তিক গোষ্ঠীর" প্রস্তাব করলেন, যাকে পুঁজিবাদী দেশগুলির উপর মার্কিণ প্রভাব স্থায়ী করার একটা মাধ্যম, হাতিয়ার বলা যায়। কয়েকমাস পরে তিনি আবার এই প্রস্তাব পুনরুত্থাপন করে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে "পশ্চিমী সভ্যতার" কেন্দ্র বলে অভিহিত করেন। যুদ্ধ বিধ্বস্ত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে মার্কিণ আধিপত্য কায়েম করার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো সেই দেশের একচেটিয়াপতিরা।

মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের লোভের সীমা সেখানেই আবদ্ধ রইলো না, তা ক্রমেই বহু বিস্তৃত হতে লাগলো। তারা বৃটিশ ও ফরাসী উপনিবেশগুলির বিষয়ে, বিশেষতঃ মধ্যপ্রাচ্যের উপনিবেশগুলিতে তীব্র আগ্রহ দেখাতে সুরু করলো। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে মার্কিণ সাময়িকপত্র ফরচুনে লেখা হয়েছিল ঃ

"মধ্যপ্রাচ্যে আমরা পথঘাট, বন্দর, বিমানঘাঁটি নির্মাণ করেছি। সেগুলিকে আজ অকেজো ট্যাংক বা বাজুকার (bazooka) মতো বাতিল করে দেওয়া যায় না, কারণ তারা আজ পানামা খালের মতোই, পৃথিবীর মানচিত্রের অঙ্গীভূত। আর সেটা আমরাই করেছি। প্রভূত পরিমাণে জাতীয় ঋণের বোঝা বাড়িয়ে, বিশ্বব্যাপী একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা যা আমরা গঠন করেছি, এগুলি হলো তারই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র।......তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদেও আমাদের বিরাট স্বার্থ জড়িয়ে আছে।"[২১]

এখানে লক্ষণীয় হলো এই যে পত্রিকাটি মধ্য প্রাচ্য ও মার্কিণ একচেটিয়া স্বার্থের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণযুক্ত পানামা খাল অঞ্চলকে সমগোত্রীয় বলে অভিহিত করেছে।

উত্তর আফ্রিকা ও মধ্য প্রাচ্য নিয়ে একদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, অন্যদিকে জার্মানী ও ইটালীর মধ্যে সংঘর্ষ শুধুমাত্র যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ঘটেনি। এটা ছিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত। অন্যদিকে এটা ছিল প্রাচ্যের জনগণের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা অবদমিত রাখার সংগ্রাম। মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকচক্র স্বেচ্ছাকৃতভাবে এশিয়া আফ্রিকার জনগণকে এই যুদ্ধের মধ্যে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়তে দেননি এবং আরব দেশগুলির যুদ্ধে যোগদান প্রস্তাবে তাঁরা সরাসরি আপত্তি করেছিলেন।

জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতাদান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকচক্রের

মনের দূরতম কোণে কোথাও ছায়াপাত করেনি। পক্ষান্তরে তাদের উপর ঔপনিবেশিক শাসনকে আরো জোরদার করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। প্রাচ্য দেশগুলির প্রতি অনুসৃত তাঁদের যুদ্ধকালীন নীতির এটাই ছিল মূল কথা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন হিটলারের সঙ্গে সংগ্রামে রত হয়েছিল এই কারণে যে জার্মাণীর বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনাকে বানচাল করে দিয়ে, তারা তাদের স্বার্থ সম্প্রসারিত করবে। তারা যে ফ্যাশিস্ত বিরোধী ও জাতীয় মুক্তির সপক্ষে বহু জিগির তুলেছিল, তার লক্ষ্য ছিল বিশ্ব জনমতকে ভুলিয়ে রাখা। কিন্তু এরই পাশাপাশি তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করলো যাতে পরাধীন দেশের জনগণ, ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে জাতীয় মুক্তির পতাকা ঊর্দ্ধে তুলে ধরতে না পারে। কোটি কোটি মানুষের জীবনকে বেড়াজালে আটকে ধরে যে যুদ্ধ তখন চলছিল, তাতে বৃটিশ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের অতি সংকীর্ণ স্বার্থের সফলতার জন্যেই জোর দিল সবচেয়ে বেশি।

যাই হোক এরই মধ্যে মার্কিণ তৃতীয় সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল জর্জ জি. প্যাটন অতিরিক্ত খোলাখুলিভাবে কথা বলতে গিয়ে যখন বলে ফেললেন, "পৃথিবী শাসন করাটা আমাদের নিয়তি নির্দিষ্ট,"[২২] যাতে সারা পৃথিবীতে খুব প্রতিকুল মন্তব্য হলো, তখন মার্কিণ সরকার ও তাঁদের যুদ্ধ দপ্তর, এই উক্তির প্রতিবাদ না করে পারলেন না।

আগামী দিনের পরিকল্পনা থেকেই, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের সারা পৃথিবীতে ক্ষমতা বিস্তারের ঔৎসুক্য প্রকাশ হয়ে পড়লো। এরই আভাস ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান উনিশ শ' তেতাল্লিশেই পেয়েছিলেন। তিনি তখন এই বলে সতর্ক করে দেন যে, "পরিণামে এটা সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধে" পরিণত হতে পারে।[২৩] যখন বিশ্বযুদ্ধ তার চরম পর্যায়ে রয়েছে, তখনই মার্কিণ সরকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যুদ্ধশিল্প সংগঠন করেন। শুধু তাই নয় মাকড়সার জালের মতো বিপুল অর্থব্যয়ে এমন সব যুদ্ধ ঘাঁটি নির্মাণ করেন যা সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়কে অতিক্রান্ত করে অটুট থাকবে এবং যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে তাঁদের আক্রমণাত্মক কার্যক্রমকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবে।

জার্মাণীর প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ও বৃটেনের অনুসৃত নীতি, তাদের শাসক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার ভিত্তিতেই রচিত হয়ে ছিল। উনিশ শ' তেতাল্লিশে ট্রুম্যানের বিশেষ সহকারী, অ্যালবার্ট জেড্ কার তাঁর রোজনামচায়

লিখেছিলেন: "ওয়াশিংটন ও লণ্ডনের উর্দ্ধতম সরকারী মহল ব্যক্তিগত আলোচনায় একথা প্রকাশ করতে মোটেই দ্বিধা করেন না যে যুদ্ধের পরে রাশিয়াকে নিয়ে গোলমাল বাধবে। এই গোষ্ঠীর কাছে তাই জার্মাণীর কাছে "বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের" দাবী একটা বিভ্রান্তি বলে মনে হয়েছিল। জার্মাণীর সামরিক শক্তি তাঁরা যে ধ্বংস করতে গররাজী এটা খুব স্পষ্টই বোঝা যেত, যেহেতু এঁদের প্রত্যাশা ছিল যে শেষ পর্যন্ত জার্মাণীকে আবার পূর্বমুখী কোন অভিযানে নাবানো যাবে।"[২৪]

যুদ্ধোত্তর কালের কার্যক্রম ও নীতির সপক্ষে মিত্রদেশের অন্বেষণে, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার ইউরোপের জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং সমর্থনও পেলেন। দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে এই ভাবে একদল গোপন গুপ্তচর সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো যাতে হাঙ্গেরীতে ফেরেন্স নাজ্ (Ferenc Nagy) ও বুলগেরিয়ায় লুলশ্চেভ এবং নিকোলা পেত্‌কভের মতো লোকের সাহায্য পাওয়া গেল। পর্তুগালের ফ্যাশিস্ত একনায়কতন্ত্রী শাসক সালাজারের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হলো। সালাজার যেহেতু ততোদিনে হিটলারের জয়লাভ অসম্ভব বলে ধরে নিয়েছিলেন, তাই উনিশ শ' তেতাল্লিশের অক্টোবরে তিনি দল ছেড়ে আজোরের (Azores) নৌ ও বিমান ঘাঁটি গুলি অকুণ্ঠভাবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনকে ব্যবহার করতে দিলেন।

স্পেনের নায়ক ফ্রাঙ্কো অবিশ্যি তখনো আশা করছিলেন যে জার্মানী জিতবে, তাই তিনি জার্মাণদের যথাশক্তি সাহায্য করে গেলেন। সামরিক সাহায্য তেমন কিছু দিতে না পারলেও, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিচারে স্পেনের সাহায্যের মূল্য ছিল। মহাযুদ্ধে স্পেনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয়তা শুধু জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে সীমিত ছিল না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন স্পেনকে সমস্ত অবরোধের বাইরে রাখার জন্যে, এই সব দেশ থেকে আমদানী করা প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র, স্পেন আবার জার্মাণীতে রপ্তানী করতে লাগলো। বাইরে থেকে বিনাবাধায় আমদানীকৃত জিনিস এসে পৌঁছতো স্পেনের বন্দরে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা চালান হয়ে যেত জার্মানীতে। মার্কিণ আমদানী রপ্তানী ব্যাঙ্ক ফ্রাঙ্কো স্পেনকে মহাযুদ্ধকালে এক কোটি সাইত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার ঋণ দেয়। আর বৃটিশ ব্যাঙ্কগুলির মোট প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল বিশ লক্ষ পাউণ্ড।

মাদ্রিদে নিযুক্ত জার্মাণ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ফ্রাঙ্কোর যে চুক্তি হয়, তাতে ফ্রাঙ্কো যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জার্মাণীকে সাহায্য করার স্বীকৃতি দিয়ে বলেন যে তিনি "একদিকে বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যদিকে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে তাকে তীব্রতর করতে" সচেষ্ট হবেন।[২৫] বারোই মে, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সেই অনুসারে ফ্রাঙ্কো বেতার ভাষণে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন জানান যে তারা যেন সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে জার্মাণীর সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হতে চেষ্টা করে। তাতে তিনি মধ্যস্থতা করতেও স্বীকৃত হন। স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর্দানাও (Jordana) অনুরূপ প্রস্তাব করেন। তাঁরা উভয়েই মাদ্রিদে নিযুক্ত বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যামুয়েল হোরের সঙ্গে নানা আলাপ আলোচনায় এই যুক্তি বারেবারে উত্থাপন করতে থাকেন যে বৃটেনের পক্ষে সোভিয়েতের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক ছিন্ন করে, জার্মাণীর পক্ষে যোগদান করাটাই কর্তব্য। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত এই ধরণের আলোচনা, মন্তব্যে প্রতিবাদ তো করেনইনি, বরং এই রকম আলোচনা আরো করতে সম্মত হন।

মৌখিক আলোচনায় সন্তুষ্ট না হয়ে, জোর্দানা তাঁর প্রস্তাব লিখিতভাবে একটা গোপন স্মারকলিপি হিসাবে হোরের বিচার বিবেচনার জন্যে পেশ করেন। জোর্দানা তাতে বলেছিলেন, "মধ্য ইউরোপে আজ জার্মাণীই হলো একমাত্র শক্তি যে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বজনীন স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, তাকে সীমিত রাখতে এমন কি ধ্বংস করতে সক্ষম। এই বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ইউরোপীয় সংহতির খাতিরে সমস্ত তুচ্ছ, সামান্য বিরোধ ও সমস্যা অন্তর্হিত হয়ে যাওয়া দরকার, যাতে আমরা সকলে আমাদের সাধারণ বিপদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি।"[২৬]

লণ্ডনেও অনুরূপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। লণ্ডনে নিযুক্ত স্পেনের রাষ্ট্রদূত ডিউক অ্যালবা ইডেনকে বলেন যে সোভিয়েতের প্রশংসা করাটা নীতি নয়, কুনীতি। ইডেন বলেছিলেন যে মতের দিক থেকে অ্যালবার সঙ্গে তাঁর মিল থাকলেও, যুদ্ধের বাস্তব অবস্থা পরিবেশে সময় সময়ে তাঁকে তাঁদের "প্রাচ্যের সামরিক বন্ধুর প্রশংসায়" কিছু বলতে হয়।[২৭]

মাদ্রিদ থেকে জার্মাণ রাষ্ট্রদূত স্বদেশে যে সব খবরাখবর পাঠান তাতে স্পেনের প্রস্তাবে লণ্ডনের নিমরাজী ভাব প্রকাশিত হয়। তিনি লেখেন,

"বৃটেনে এমন দায়িত্বশীল অনেক মানুষ আছেন, মন্ত্রিসভার অন্ততঃ একজন সদস্যকে তার অন্তর্ভুক্ত করা যায়, যাঁরা শান্তির জন্যে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাবে অনুকূল মত পোষণ করেন এবং বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠনের ধারণাকে সমর্থন করেন।"[২৮]

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার জন্যে উনিশ শ' তেতাল্লিশের গ্রীষ্মকালের মধ্যেই বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে সমবেত ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য পশ্চিম ইউরোপে অভিযান চালাবার সমস্ত প্রস্তুতিই সম্পূর্ণ করে ফেললো। জনৈক বৃটিশ অফিসার লিখেছেন, "উনিশ শ' তেতাল্লিশের জুলাই মাসের শেষে সেই চরম দিনের জন্যে আমরা প্রস্তুত এই অনুভূতিতে আমরা আশান্বিত হয়ে উঠলাম।......যতোই দেখতে লাগলাম একটার পর একটা তাঁবু খাটানো হচ্ছে, অস্ত্রশস্ত্রের মজুদ কেন্দ্রগুলি স্ফীতোদর হয়ে উঠছে, ততোই মনে হতে লাগলো কোন কিছুই এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে পারবে না। এটা একটা বাস্তব সারগর্ভ প্রচেষ্টা, যাকে অনেক যত্নে, প্রায় স্নেহ মমতা দিয়ে লালন করা হচ্ছে।"[২৯] তিনি অত্যন্ত খাঁটি কথাই সেদিন বলেছিলেন। মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর মাঝারী, নীচু স্তরের অফিসাররা সৈনিকরা অনেক আশা নিয়ে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ইউরোপের উত্তর উপকূলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যের অবতরণ, তারপর হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে দ্রুত বিজয় পর্ব সমাধা করার পরিকল্পনা জনগণের শক্তিকে সঞ্জীবিত করে তুললো। তাতে তাদের পূর্ণ ও আন্তরিক সমর্থন ছিল।

কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই পরিকল্পনা রচিত হলেও, সামরিক বিচারে তার উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হলেও, অবতরণের মুহূর্তকে আবার পিছিয়ে দেওয়া হলো। এবং ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক নেতৃত্ব গোপনে ইউরোপ অভিযান স্থগিত রাখার যে আদেশ দিয়েছিলেন তার গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্যে তেমন কোন চেষ্টা করলেন না। জনৈক পর্যবেক্ষক বলেছেন যে, "খোলাখুলি বলতে গেলে, জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগ সহজেই তার খবর পেয়ে গেল।"[৩০] ফলে জার্মাণরা পুনরায় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত কয়েকটি ডিভিসনকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে পাঠিয়ে দিল সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের দিকে।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার এই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত শুধুমাত্র সোভিয়েত সৈন্যদলের অসুবিধাই বৃদ্ধি করলো না, বৃটিশ জনগণের ঘাড়ে রীতিমতো একটা বোঝা চাপিয়ে দিল। কিন্তু বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন

সংগঠনগুলির দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব, বৃটিশ শাসক চক্রের এই নীতি অনুসরণ করে গেল।

মস্কোয় উনিশ শ' তেতাল্লিশের গ্রীষ্মকালে, ইঙ্গ-সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির তৃতীয় অধিবেশনে, বৃটিশ প্রতিনিধি দলের নেতা সাইট্রিন, (Citrine) সোভিয়েতের আশু দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা সম্পর্কে একটি ঘোষণার খসড়া সরাসরি অগ্রাহ্য করলেন।

উনিশ শ' তেতাল্লিশে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের, ইউরোপীয় অভিযান স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে, জার্মাণ সামরিক নের্তৃত্বও বিস্মিত না হয়ে পারেন নি। যুদ্ধশেষে ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডষ্টেড্ বলেছিলেন, "আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম এই দেখে যে যখন আমরা উনিশ শ' একচল্লিশে রাশিয়ার অভ্যন্তরে অনেকখানি ঢুকে পড়েছি, তখনো আপনারা আক্রমণের কোন চেষ্টা করেননি।" তিনি আরো বলেন "উনিশ শ' তেতাল্লিশে যখন আমরা সমগ্র ফ্রান্স অধিকার করলাম, তখন আমি অভিযান প্রত্যাশা করেছিলাম। কারণ আমি ভেবেছিলাম যে পশ্চিমে জার্মাণ সৈন্যদের এই ব্যাপক অঞ্চলে বিস্তৃতিজনিত দুর্বলতার সুযোগ আপনারা নেবেন।"[৩১]

উনিশ শ' তেতাল্লিশে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার পুনঃ প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার পরে, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার উত্তর সাগরের পথে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রপ্তানী করতে অস্বীকৃত হলেন। উনিশ শ' তেতাল্লিশের মার্চে উত্তর সাগরের পথে যে সরবরাহ বহর আসার কথা পূর্বনির্দিষ্ট ছিল, তা পাঠানোই হলো না। শরৎকাল না আসা পর্যন্ত এই রপ্তানী স্থগিত রেখে, চার্চিল তিরিশে মার্চ, উনিশ শ' তেতাল্লিশে মস্কোয় সেই খবর পাঠালেন। তাতে অনুষ্ঠানিকভাবে অজুহাত দেখিয়ে বলা হলো যে, "এখন থেকে ভূমধ্যসাগরে আক্রমণ পরিচালনার জন্যে প্রতিটি পাহারাদার জাহাজের বিশেষ প্রয়োজন হবে।"[৩২] আসলে কিন্তু মার্কিণ ও বৃটিশ নৌবহরের বেশির ভাগ জাহাজই নোঙর ফেলে চুপচাপ বসে রইলো, কারণ দ্বিতীয় রণাঙ্গনের সিদ্ধান্ত তখন স্থগিত রাখা হয়েছে।

এই খবরের প্রাপ্তি স্বীকার করে, সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি প্রত্যুত্তরে জানালেন:

"এই অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তকে সোভিয়েত ইউনিয়নে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ

কাঁচা মাল ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠানোর ইঙ্গ-মার্কিণ দায়িত্বের ঘাটতিকে আমি মারাত্মক বলে মনে করি। কারণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় পথে আমদানী রপ্তানীর সুযোগ অল্প এবং তাও তেমন নির্ভরযোগ্য নয়। দক্ষিণের পথে জাহাজ খালাসের সুবিধা কম। ফলে অবস্থা দাঁড়াচ্চে এই যে উত্তর সাগরের পথে জিনিসপত্র রপ্তানী স্থগিত রাখায় যে ঘাটতি পড়বে, তাকে এই দুই পথে আমদানীকৃত জিনিসপত্রে মেটানো যাবেনা। একথা বলাই বাহুল্য যে বর্তমান পরিস্থিতি সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর কর্মক্ষমতাকে প্রভাবান্বিত না করে পারে না।"[৩]

দশই জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদল সিসিলীতে অবতরণ করলো। পূর্বেকার সময়সূচী অনুযায়ী এই অভিযান দু'মাস পিছিয়ে গিয়েছিল এবং যেমন তাঁরা বলেছেন যে রপ্তানী জাহাজের ঘাটতিও এর একটি অন্যতম কারণ।[৪] সিসিলীতে তখন দু'টি জার্মাণ ও চারটি ইটালীয় ডিভিসন ছিল। শেষেরটির মধ্যে তিনটি ছিল একেবারে শক্তির বিচারে রীতিমতো কমজোরী। এ ছাড়া দ্বীপে আরো যে ছ' ডিভিশন ইটালীয় উপকূলরক্ষী সেনাদল ছিল, তাদের সমরায়োজন ও অস্ত্র শস্ত্রের সাজশয্যা ছিল নিতান্ত জঘন্য।

নব্বই দিনে কাজ সমাধা করার পরিকল্পনায়, দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু না করে তার তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার জন্যে যে বিক্ষোভ চারিদিকে দেখা যাচ্ছিল, তা নিতান্ত স্বাভাবিক।

ইটালীয় সৈন্যরা কিন্তু প্রায় কোন প্রতিরোধ করারই চেষ্টা করলো না। সুরুতে একটু আধটু চেষ্টা করা ছাড়া, জার্মাণরাও বিশেষ কিছু করলো না। আটত্রিশ দিনের মধ্যে সব কাজ শেষ করে, আঠারোই আগষ্টে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। এতেই স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে ইঙ্গ-মার্কিণদের ইউরোপের অভিযান পরিকল্পনা স্থগিত রাখার কোন কারণই ছিল না। সে সময়ে ফ্যাশিস্ত জার্মানীর এমন কোন ক্ষমতা ছিল না যাতে তারা ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের ফ্রান্সে অবতরণে তেমন বাধা দিতে পারে।

১. জে. ফুলারের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৫
২. টিপ্পলস্কার্চের পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২২৫
৩. এশিয়া পত্রিকা, এপ্রিল সংখ্যা, ১৯৪২, পৃঃ ২১৫
৪. উইলিয়াম এল, ল্যাঙ্গর : ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ, প্যারী ১৯৪৮, পৃঃ ২৯৯

৫. ব্যাট্রোক ও মেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১০৪
৬. ল্যাঙ্গর : ঐ পৃঃ ২০০
৭. ফ্লোরিস বঁতে : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪০৭
৮. ঐ
৯, Documents on American Foreign Relations, ৫ম খণ্ড, ওয়ার্ল্ড পীস ফাউণ্ডেশন, বোষ্টন ১৯৪৪, পৃঃ ২৫৩
১০. র‍্যাল্ফ ইঙ্গারসোল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৮
১১. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৮
১২. চার্চিল : The Second World War, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৬১২
১৩. প্রাভ্দা, ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৩
১৪. Soviet Foreign Policy, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১২
১৫. দ্য গলের : আত্মজীবনী—১৯৪২-৪৪, পৃঃ ২১২
১৬. লিডেল হার্ট : Why Don't We Learn from History, লণ্ডন এ্যালেন ও আনউইন, ১৯৪৪, পৃঃ ৫৩
১৭. ফুলার : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৫৮
১৮. সি. জি. টেনসিল : Back Door to War, Roosevelt Foreign Policy 1933-41, শিকাগো ১৯৫২
১৯. লিডেল হার্ট : উপরিল্লিখিত গ্রন্থ, পৃঃ ৫০
২০. ওয়াল্টার লিপম্যান : U. S. War Aims, বোষ্টন ১৯৪৫, পৃঃ ২০৮
২১. ফরচুন পত্রিকা, সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৪৪, পৃঃ ১১৩
২২. ওমার ব্র্যাডলী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩০
২৩. লিপম্যান : উপরিল্লিখিত গ্রন্থ ১৯৪৫ বোষ্টন, পৃঃ ১৩২
২৪. কার্ল মারজানী : We can beFriends. Origins of the Cold War, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫২, পৃঃ ২২৪
২৫. একটি রুশ ভাষায় লিখিত গ্রন্থ
২৬. Hoare, Ambassador on Special Mission, কলিনস লণ্ডন ১৯৪৬, পৃঃ ১৯১
২৭. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
২৮. ঐ
২৯. জে. ড্যারলীশ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭১
৩০. ঐ, পৃঃ ৭৭
৩১. লিডেল হার্ট : The Other Side of the Hill, লণ্ডন ১৯৪৮, পৃঃ ২৩৭-৩৮,
৩২. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১১
৩৩. ঐ পৃঃ ১১২
৩৪. হ্যারি সি. বুচার : My three years with Eisenhower, সাইমন ও শুস্টার, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬, পৃঃ ৩৫১

দ্বাদশ অধ্যায়

কুর্স্ক বাল্‌জের যুদ্ধ

উনিশ শ' বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশে সোভিয়েতের শীত কালীন আক্রমণ পর্ব শেষ হলো একত্রিশে মার্চে। জার্মাণ ফ্যাশিস্ত বাহিনীকে পিছু হটিয়ে দেওয়া হলো মেৎসেন্‌স্ক, মলো-আরখানগেলস্ক, সেব্‌স্ক, রিল্‌স্ক, সুমি বেলগোরোদ্‌ ও উত্তর দোনেৎস্‌ অঞ্চলে। কুর্স্ক ও কুর্স্কের আশে পাশে সমবেত সৈন্যদল জায়গাটির অবস্থানগত বৈচিত্রের জন্যে পশ্চিম অভিমুখে অনেকখানি ঝুঁকে রইলো। সৈন্য সমাবেশ সেই দিকটাতেই বেশি। এই অঞ্চলে সোভিয়েত সৈন্য ঘাঁটি করেছে। তাদের পিছনে আছে বিরাট সংরক্ষিত বাহিনী। কুর্স্ক বালজ্‌ উভয় পক্ষকেই বিরাটাকারে আক্রমণ সুরু করার সুযোগ সুবিধা দেওয়ার পক্ষে অনুকূল ছিল।

শত্রু যদি আগে আক্রমণ সুরু করে, তাহলে শক্তির ভারসাম্য রীতিমতো সোভিয়েতের অনুকূলে আসার সম্ভবনা ছিল। কারণ সোভিয়েত ঘাঁটি যেমন সুরক্ষিত ছিল তাতে আক্রমণকারীদের প্রভূত ক্ষতির সম্ভবনা। সোভিয়েত সৈন্যদলের আক্রমণ কারীর জন্যে কোন তাড়াহুড়া ছিল না। তারা অপেক্ষা করতে পারতো। কিন্তু জার্মাণীর পক্ষে অন্যদিকে অপেক্ষা করার কোন উপায় ছিল না। সময় নাৎসীরা খুব ভালোভাবেই জানতো তাদের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে।

আরো বলা যায়, জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব নিজ দেশের অভ্যন্তরে এবং তার চেয়েও যা বড়ো কথা সৈন্য বাহিনীর ভেঙ্গেপড়া মনোবল সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন। সেই কারণে জার্মাণ সরকারের মনোবল ও ভেঙ্গে পড়ছিল। চব্বিশে মার্চ উনিশ শ' তেতাল্লিশে গোয়েবল্‌স 'ডাস রাইখ' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন "যুদ্ধের গোধূলি।" তিনি লিখেছিলেন যে "এই যুদ্ধ জার্মাণীর কাছে এনেছে এক অন্ধকার গোধূলি।……

যে দুর্ভাগ্য আজ আমাদের ঘিরে ধরেছে তা হলো অদৃষ্টের লিখন। সোভিয়েতের যুদ্ধ ক্ষমতার মূল্যায়নে আমরা ভুল করেছিলাম।"

ওদিকে হিটলার জার্মানী যখন নোতুন আক্রমণ সুরু করার জন্যে প্রস্তুতি করছিল, তখন একটা ধ্বনি তোলা হলো জার্মাণীর পক্ষ থেকে। ফেস্তুং ইউরোপা" (Festung Europa)—শক্তিশালী ইউরোপ, যার অর্থ ছিল এই যে অধিকৃত যে সব দেশ সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী এখনো মুক্ত করতে পারেনি, জার্মানী সেই সব অঞ্চল আঁকড়ে থাকবে। জার্মানীর গ্রীষ্মকালীন যুদ্ধ কার্যক্রমের তাই এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নামকরণ করা হলো দুর্গ কার্যক্রম—অপারেশন সিটাডেল। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলা হবে বিরাট প্যানসার বাহিনীর সাহায্যে। তাদের একটা আসবে ওরেল, অন্যটা বেলগোরোদ অঞ্চল থেকে। লক্ষ্য তাদের কুর্স্কে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া।

ফিল্ড মার্শাল ভন্ ক্লুগের (Kluge) নেতৃত্বে একটা বিরাট বাহিনীকে আক্রমণ সুরুর কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এগারোটি পদাতিক, সাতটি প্যানসার ও দু'টি মোটরবাহিত বাহিনী ওরেল থেকে কুর্স্কের দিকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসবে। আর বেলগোরোদ থেকে আসবে আঠারো ডিভিসন সৈন্য—সাতটি পদাতিক, দশটি প্যানসার ও একটি মোটরবাহিত ডিভিসন। ওরেল-কুর্স্ক রণাঙ্গনে প্রতি দুই দশমিক সাত কিলোমিটারে ছিল একটি জার্মাণ ডিভিসন। রণাঙ্গনের প্রতি কিলোমিটারে ছিল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি ট্যাঙ্ক ও সত্তর থেকে আশীটি কামান। এদিকে বেলগোরোদ কুর্স্ক রণাঙ্গনে প্রতি সাড়ে চার কিলোমিটারে ছিল এক ডিভিসন জার্মাণ সৈন্য ও প্রতি কিলোমিটারে বিয়াল্লিশটি ট্যাঙ্ক এবং পঞ্চাশটি কামান। নাৎসীরা তাদের সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করবে স্থির করেছিল—তার মধ্যে ছিল টাইগার ও প্যানসার ট্যাঙ্ক, স্বয়ংচালিত ফার্দিনান্দ কামান ও এম, ই, একশ' নব্বই বিমান।

জার্মাণ আক্রমণের প্রস্তুতি তখন প্রায় শেষ, যে কোন দিন তা সুরু হয়ে যেতে পারে। তবু নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার তালে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার বলতে লাগলেন যে জার্মাণদের আক্রমণ করার কোন ইচ্ছাই আর নেই।

উনিশে জুন, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত সরকারের কাছে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লেখেন :

"আমাদের একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে উত্তর আফ্রিকায় জার্মাণদের অপ্রত্যাশিত দ্রুততায় পরাজিত হওয়ার জন্যে সমস্ত সামরিক কার্যক্রম বাণচাল হয়ে গেছে এবং দক্ষিণ ইউরোপে আক্রমণের সম্ভবনা এ বছরের গ্রীষ্মকালে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাপক কোন অভিযান পরিচালনায় হিটলারকে ইতস্তত করতে ও বিলম্ব ঘটাতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।"[১]

সাতাশে জুন চার্চিল আবার লিখলেন "এই গ্রীষ্মে আপনারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হবেন না।"[২]

যদি সোভিয়েতের সর্বোচ্চ সামরিক নেতৃত্ব চার্চিলের কথায় আস্থা স্থাপন করতেন, জার্মাণ আক্রমণ তাহলে হয়তো বা সফল হয়ে যেতে পারতো।

কিন্তু হিটলার কি করতে যাচ্ছেন সে সম্বন্ধে সোভিয়েত সরকারের ভালো মতো ধারনা ছিল। নানা জায়গায় গভীর ও সুদৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলো। সঙ্গে সঙ্গে গঠন করা হলো সংরক্ষিত বাহিনী। গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিতে সোভিয়েত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একশ' কিলোমিটার পর্যন্ত গঠন করা হলো। সর্বোচ্চ সামরিক কার্যালয় কুর্স্ক বাল্‌জের জন্যে একটা কার্যক্রম ছকে ফেল্‌লেন। প্রথমে মধ্যবর্তী ও ভোরোনেঝ রণাঙ্গনের সৈন্যবাহিনী জার্মাণ আক্রমণকে রুখে দাঁড়াবে। তার শক্তি ক্ষয় করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিম ব্রিয়ান্‌স্ক, মধ্য ভোরোনেঝ ও স্তেপ রণাঙ্গনের সৈন্যরা একযোগে পাল্টা আক্রমণ চালাবে।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের পাঁচই জুলাই, ভোর সাড়ে পাঁচটায় জার্মাণরা কুর্স্কের উচ্চভূমি লক্ষ্য করে আক্রমণ সুরু করলো। জার্মাণদের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত বাহিনীর প্রধান সমাবেশ কেন্দ্র। তুমুল সংগ্রাম চললো এর পর। আক্রমণ ধীরে ধীরে সুরু হলেও, নাৎসীদের ক্ষয় ক্ষতি হতে লাগল প্রচণ্ড। সোভিয়েত বাহিনী সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ চালাতে লাগলো সংরক্ষিত সেনাদলকে অসীম সাহসিকতায় ব্যবহার করতে লাগলো প্রয়োজনমতো। কোন কোন জায়গায় শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণে যেখানে সোভিয়েত প্রতিরোধে ভাঙ্গন ধরেছিল, সেখানে ট্যাঙ্ক পাঠিয়ে সোভিয়েত বাহিনী হানতে লাগলো পাল্টা আঘাত। এইখানেই প্রথম সোভিয়েত সেনাদলে ট্যাঙ্ক সৈন্য বাহিনী যোগ দেয়, ব্যবহার করা হয় ট্যাঙ্ক ধ্বংসী কামান।

সমগ্র কুর্স্ক যুদ্ধের মধ্যে প্রোখোরোভ্‌কা গ্রামের সংঘর্ষই ছিল সবচেয়ে বড়।

উভয় পক্ষই এতে নিয়োগ করে পনের শ' ট্যাঙ্ক। যুদ্ধের প্রথম দিনেই জার্মাণদের সাড়ে তিন শ' ট্যাঙ্ক ধ্বংস ও দশ হাজার সৈনিক ও অফিসার প্রাণ হারায়। সোভিয়েতের সাহসী বৈমানিক আই, কোঝেদুব্ বহু শত্রু বিমান ভূপাতিত করেন। অন্য সোভিয়েত বৈমানিকদের প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বে ও সাহসিকতায় তাঁর সমতুল্য ছিল। একদিনের যুদ্ধে বৈমানিক এ, গোরোভেৎ নয়টি জার্মাণ বিমান গুলীবিদ্ধ করে ভূপাতিত করেন। যোদ্ধা বৈমানিক এ. মরেসিয়েভ্ যিনি উনিশ শ' বিয়াল্লিশের বসন্তকালের যুদ্ধে দুটো পা হারিয়ে ছিলেন, এখন আবার ফিরে আসেন সক্রিয়ভাবে। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে, কুর্স্ক বালজের গোড়ার দিকে আকাশ যুদ্ধে তিনি তিনটি জার্মান বিমান ধ্বংস করেন। এই যুদ্ধে সোভিয়েত বিমান বহরের পাশাপাশি সংগ্রাম করে ফরাসীদের "নর্মাণ্ডি" স্কোয়াড্রন। উনিশ শ' তেতাল্লিশের জুলাই আগষ্টের মধ্যে এই স্কোয়াড্রনের বৈমানিকরা তেত্রিশটি জার্মান বিমান ধ্বংস করেন।

এক সপ্তাহের যুদ্ধশেষে দেখা গেল, ওরেল-কুর্স্কের পথে জার্মানরা এগিয়েছে মাত্র ছয় থেকে আট কিলোমিটার, আর বেলগোরোদ কুর্স্কের পথে তিরিশ পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার। নাৎসীদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল। টিপ্পলস্কার্চ লিখেছেন: "জার্মাণ আক্রমণের উদ্দেশ্য কয়েকদিনের যুদ্ধের পরেই ব্যর্থ হয়ে গেল, কিন্তু তাতে যে ক্ষয়ক্ষতি হলো তা আর কখনো পূরণ করা যায়নি।" তিনি আরো বলেছেন যে, "যুদ্ধের সমস্ত সামরিক উদ্যোগ একটা প্রতিকূল অবস্থায় মধ্যে চিরকালের জন্যে শত্রুর হাতে চলে গেল।"[৪]

শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার পরে, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী নিজেরাই এবার পাল্টা আক্রমণ সুরু করলো, বারোই জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে। পাঁচই আগষ্টের মধ্যে ওরেল ও বেলগোরোদ অঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়ে গেল, এবং সেই মাসের মাঝামাঝি ওরেল অঞ্চলে জার্মাণবাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তেইশে আগষ্ট সোভিয়েত বাহিনী খারকভ শত্রুমুক্ত করলো। তাই দেখে লিডেল হার্ট লিখেছিলেন:

"এর ফলে জার্মাণদের স্বাধীন উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে গেল, তাদের সংরক্ষিত বাহিনীর শক্তি ক্রমাগত যেতে লাগলো কমে। এ হলো রণনৈতিক 'ক্রমিক পক্ষঘাত'।[৫]

কুর্স্কে সোভিয়েতের পাল্টা আক্রমণ ধীরে ধীরে একটা বিরাট রণাঙ্গন

জুড়ে সাধারণ ব্যাপক আক্রমণ রূপায়িত হলো। আগষ্ট সেপ্টেম্বর মাসে স্মোলনেস্কে সাফল্যের সঙ্গে অভিযান চালাবার পর, যুদ্ধ সীমান্ত মস্কো থেকে সরে গেল আরো বেশি পশ্চিমের দিকে। দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ রণাঙ্গনের সৈন্যরা, দক্ষিণে এক বিরাট জার্মাণবাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ায়, সমগ্র দোনেৎস অববাহিকা মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই শত্রুমুক্ত হয়ে গেল।

ইউক্রেনে জার্মাণদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হলো নীপার নদীর অপর পারে। আপাতদৃষ্টিতে গভীর বিস্তৃত নীপার নদীকে একটা বিরাট বাধা বলে মনে হয়। নদীর পশ্চিম তীরে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব তাই দীর্ঘকালীন আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি করেছিল। মৌচাকের মতো একের পর এক শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠিত হলো। কিন্তু সোভিয়েত বাহিনী তার দুর্বার অগ্রগতিতে বেশ কয়েক জায়গায় নীপার অতিক্রম করে, জর্মাণ নেতৃত্বকে একেবারে বিস্মিত হতবুদ্ধি করে দেয়। ছয়ই নভেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশ, সোভিয়েত ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ শত্রুমুক্ত হলো। এই অঞ্চলে সোভিয়েতের প্রধান সেনাদল পোলসাইয়ের দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগরের দিকে অগ্রসর হতে গিয়ে, নীপারের পশ্চিম তীরে কয়েকটি প্রধান সেতুমুখ দখল করে নিল। ফলে নোতুন করে আক্রমণ সুরু করার সুযোগ বৃদ্ধি পেল তাদের।

কুর্স্কের যে যুদ্ধে জার্মান সামরিক নেতৃত্ব রণনৈতিক উদ্যোগ পুনরায় দখল করার আশা করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত নাৎসী সামরিক কার্যক্রমের চরম ব্যর্থতা প্রমাণ করে দিল। জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাদলের কাছে এটা ছিল একটা নোতুন বিপর্যয়। গুদেরিয়ান স্বীকার করেছেন যে এ ছিল একটা "চূড়ান্ত পরাজয়", যাতে "সমস্ত সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা চিরকালের মতো শত্রুর হাতে চলে গেল।"*

নাৎসী জার্মাণীর আক্রমণাত্মক রণকৌশলই নয়, তাদের আত্মরক্ষামূলক কার্যক্রমও ব্যর্থ হয়ে গেল, উনিশ শ' তেতাল্লিশের গ্রীষ্মকালে। হিটলারের "দুর্গ" ভেঙ্গে গুড়িয়ে গেল। সোভিয়েত সেনাদলের অগ্রগতি, জার্মাণীর "ফেস্তুং ইউরোপা" কার্যক্রমের মধ্যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলো। ফলতঃ সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে একটা শক্তিশালী কুশলী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলে, সুবিধাজনক সর্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে যে গোপন আলোচনা

চলছিল, তাতে একটা চুক্তি করার মতো ক্ষমতা সময় লাভ করার জার্মাণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। সোভিয়েতের পাল্টা আক্রমণের তীব্রতা ও অগ্রগতি, জার্মাণী রোধ করতে পারলো না।

ভল্গায় যুদ্ধের যে গতি পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তারই পূর্ণতা এলো উনিশ শ' তেতাল্লিশের গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ ধারায়। নীপার, মিউস ও মোলোশ্‌নায়া অঞ্চল জুড়ে, জার্মাণীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। রণাঙ্গনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সোভিয়েত সেনাদল পাঁচ শ' কিলোমিটার পথ দারুণ সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হলো। দক্ষিণ রণাঙ্গনে সেই অগ্রগতির ব্যাপকতা দাঁড়ালো তেরো শ' কিলোমিটার। ফ্যাশিস্ত জার্মাণী তার নিয়তি নির্দিষ্ট পরিণামের অনেক কাছাকাছি এসে পড়লো।

ততোদিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা কুশলী ও ক্রমবর্দ্ধমান যুদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যা আরেকবার সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার সুবিধাকে সপ্রমাণ করলো। সোভিয়েতের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ঘড়ির কাঁটার মতো নিখুঁত নিয়মে কাজ করে চললো এই চমকপ্রদ সোভিয়েত আক্রমণকে তার প্রয়োজনীয় সরবরাহের যোগান দিয়ে।

সোভিয়েত নিয়মিত বাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত হলো, শত্রুর পিছনে পার্টিজান দলের সক্রিয়তার যৌথ কার্যক্রম।

পার্টিজানরা প্রচণ্ড আঘাত হানলো শত্রুর সংযোগ ব্যবস্থার উপরে। বিনষ্ট করতে লাগলো তারা শত্রুর লোকবল আর অস্ত্রশস্ত্র। আবার শত্রু অধিকৃত অঞ্চল পার হয়ে সুবিধামতো তারা চালাতে লাগলো চমকপ্রদ অভিযান।

কুর্স্ক যুদ্ধের সময়ে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের আগষ্ট মাসে, পার্টিজান দলগুলি শত্রুর রেলপথ সংযোগ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড আঘাত করে। চৌঠা আগষ্ট উনিশ শ' তেতাল্লিশে লেলিনগ্রাদ, বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেনের পার্টিজানরা মাইন বসিয়ে ও বোমার ঘায়ে ছত্রিশ হাজার রেল লাইন উড়িয়ে দেয়। ফলে কোভেল-রোভ্‌নো ও কোভেল-খোল্ম রেলপথে গাড়ীর চলাচল শতকরা সত্তর থেকে আশী ভাগ কমে যায়। সর্বসাকুল্যে সেই আগষ্ট মাসে, বাইলোরাশিয়ার পার্টিজানরা একলক্ষ কুড়ি হাজার আটশ' লাইন উড়িয়ে দেয়। একত্রিশে আগষ্ট উনিশ শ' তেতাল্লিশে জার্মাণ এক রক্ষী বাহিনীর নায়ক এই মর্মে বিবরণী পেশ করেন যে :

"সুপরিকল্পিত অতর্কিত আক্রমণে জার্মাণ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যে পার্টিজানরা এমনভাবে তাদের কাজ করে যাচ্ছে, যার কোন নজীর আছে বলে মনে হয় না। আমাদের বাহিনী যে অঞ্চলটায় ছিল, সেখানে আগষ্ট মাসের প্রথম দু'রাতে ছয় হাজার সাতশ' চুরাশীটি বিস্ফোরণ ঘটে। আগষ্টের মাঝামাঝি রেলপথে বিস্ফোরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় পনের হাজার।"' বাইলোরাশিয়ার সমগ্র অধিকৃত অঞ্চল জুড়ে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের আগষ্ট সেপ্টেম্বরে রেলপথে গাড়ী চলাচলের সংখ্যা শতকরা চল্লিশ ভাগ কমে আসে। সোভিয়েত সেনাদলের অগ্রগতিতে এই সাহায্যের মূল্যায়ন করা অসম্ভব।

যুদ্ধের সুরু থেকে পয়লা ডিসেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশের মধ্যে, বাইলোরাশিয়ার পার্টিজানরা শত্রুপক্ষের দু'লক্ষ বিরাশী হাজার সৈনিক ও অফিসারকে হত্যা করে, পাঁচ হাজার সাত শ' আটান্নটি ট্রেন উড়িয়ে দেয় বোমার আঘাতে, ধ্বংস করে সাড়ে তিন হাজার রেলসেতু, দু'শ পঞ্চান্নটি বিমান এবং আটশ বারোটি ট্যাঙ্ক। যুদ্ধের সুরু থেকে পয়লা এপ্রিল উনিশ শ' তেতাল্লিশ পর্যন্ত লেনিনগ্রাদের পার্টিজানরা শত্রুর চুয়াল্লিশ হাজার আটশ' ছিয়াত্তর জন সৈনিক ও অফিসারকে নিহত করে।

যুদ্ধের সুরু থেকে পনেরই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' চুয়াল্লিশ পর্যন্ত ইউক্রেনীয় পার্টিজানদের সক্রিয়তার সে অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তাতে দেখা গেছে যে তারা শত্রুর একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার সৈনিক ও অফিসারকে নিহত করেছে, ধ্বংস অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাদের তেইশ শ' একত্রিশটি সৈন্যবাহী ট্রেন, চৌষট্টিটি বিমান এবং পাঁচশ' সাতাশটি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশের শরৎকালের পরে শত্রু সৈন্যের পশ্চাৎবর্তী অঞ্চলে কয়েকটি পার্টিজান দল বেশ কয়েকটি বড়ো রকমের অভিযান চালায়। এস, কোভপাক ও এ, সাবুরোভের নেতৃত্বে পার্টিজান দলগুলি ব্রিয়ানস্ক বনভূমি ছেড়ে ইউক্রেনের কয়েকটি অঞ্চল অতিক্রম করে, প্রিপিয়াত নদীর ওপারে পোলসাইয়ে একটা নোতুন পার্টিজান অঞ্চল গঠন করে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের চৌঠা ডিসেম্বর রাতের অন্ধকারে কোভ্‌পাকের পার্টিজানরা সার্নি ক্রশ কার্যক্রম নাম দিয়ে, সার্নি রেলপথের জংশনে পাঁচটি রেল সেতু বোমার আঘাতে ধ্বংস করে দেয়। সেই একই দল আবার উনিশ শ' তেতাল্লিশের এপ্রিলে, প্রিপিয়াত নদীতে শত্রুর এক জলবাহিনীকে বিনষ্ট করে।

এম, নাউমোভ, এ, ফিয়োদোরভ, এল, মেলনিক ও অন্যান্য নেতার অধীনে পার্টিজান দল এই ধরণের নানা অভিযান চালায়। নীপার নদীর পূর্ব তীরে ব্রিয়ানস্কি বনভূমি থেকে বের হয়ে, পার্টিজান দল নীপারের পশ্চিম তীরে ইউক্রেনে নোতুন ঘাঁটি তৈরী করে।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের গ্রীষ্মকালে কোভ্পাকের পার্টিজানরা রওনা হয় কার্পেথিয়ান পার্বত্য প্রদেশের উদ্দেশে। উনিশ থেকে চব্বিশে জুলাইয়ের মধ্যে তারা উড়িয়ে দিল একচল্লিশটি তৈল কূপ, তেবটি তৈল সংরক্ষণাগার, তিনটি তৈল শোধনাগার এবং একটি ওজোসেরাইট কারখানা। তারা যেতে না যেতেই সাবুরোভ, ওলেকসেয়িঙ্কো ও শিতোভের নেতৃত্বে এসে পড়লো নোতুন পার্টিজান দল। মোলদাভিয়ার পার্টিজানরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে আন্দ্রেইয়েভ ও শক্রিয়াবাশের নেতৃত্বে একদল গেল বেসারেবিয়ার দিকে, মেলানিক ও বুয়িনয়ির নেতৃত্বে একদল ভিন্নিৎসার দিকে এবং কাপুৎসার নেতৃত্বে আরেক দল গ্রোদনোর দিকে। মেলনিকের পার্টিজান দল যখন ভিন্নিৎসায় পৌঁছয় তখন হিটলারের সদর কার্যালয় ছিল সেখানে।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালে নাৎসী অধিকৃত অঞ্চলে পার্টিজান দলে সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ ষাট হাজারেরও বেশি। এদের পিছনে সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে ছিল আরো পাঁচ লক্ষ মানুষ। শত্রুর যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ক্রমাগত আঘাত হানার ফলে, পার্টিজানরা উনিশ শ' তেতাল্লিশে গ্রীষ্ম ও শরৎকালে নাৎসী সৈন্যের পুনর্গঠনে রীতিমতো বাধা দিতে পারে। তারই জন্যে পশ্চিম, মধ্য ও ভোরোনেঝ রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনাদলের আক্রমণ চালাতে প্রভূত সাহায্য হয়। উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালে নীপার নদী নিয়ন্ত্রণ করার সংগ্রামে, পার্টিজানরা নদীর পশ্চিম তীরে একটা বিরাট সেতুমুখ দখল করে। ফলে অগ্রগামী সোভিয়েত বাহিনী পঁচিশটি বিভিন্ন পারাপার কেন্দ্র তাদের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে, দেশনা নীপার ও প্রিপিয়াত নদী অতিক্রম করে।

শত্রু সৈন্যের পশ্চাদবর্তী অঞ্চলে কোভ্পাকের পার্টিজান দল তাদের ছাব্বিশ মাসের কর্মতৎপরতায় আঠারোটি অঞ্চলে অভিযান চালাবার উদ্দেশে দশ হাজার কিলোমিটার পথ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। তাদের সক্রিয়তায় নিহত হয় আঠারো হাজার হিটলারী সৈনিক। ধ্বংস করে তারা

বাষট্টিটি সৈন্যবাহী ট্রেন, দু'শ ছাপান্নটি রেলসেতু, ছিয়ানব্বইটি গুদাম ও দু'টি তৈল উৎপাদন কেন্দ্র। এতে নষ্ট হয়ে যায় পঞ্চাশ হাজার টন তৈল, দু'শ কিলোমিটারের বেশি টেলিফোনের তার, পঞ্চাশটি সংযোগ কেন্দ্র, পঁচিশটি মোটর গাড়ী এবং কুড়িটি ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী।

এই ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জন্যে নাৎসী নেতৃত্বকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে পূর্ব রণাঙ্গনে সৈন্য বাহিনী ও রসদ পাঠাতে হয়। ফ্রান্সে জার্মাণ দখলকারী সৈন্যের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে, ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার কাজে সুবর্ণ সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতারা দীর্ঘসূত্রী মনোভাব অবলম্বন করে বসে রইলেন।

সেই সময়ে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার সমীপে প্রেরিত এক বাণীতে সোভিয়েত সরকার বলেন যে তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে চলেছেন। এগারোই জুন উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রিসভার সভাপতি, দ্বিতীয় রণাঙ্গন পুনরায় স্থগিতকরণের নোতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মার্কিণ রাষ্ট্রপতির কাছে একটি বাণী পাঠান। সেই বাণীতে বলা হয়:

"যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমস্ত সম্পদ একত্রিত করে জার্মাণী ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির প্রধান সৈন্য বাহিনীর সঙ্গে বিগত দু'বছর ধরে যুদ্ধ করে চলেছে, আপনার সিদ্ধান্ত তার পক্ষে অসাধারণ কষ্টকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে, যে সোভিয়েত সেনাদল আজ সংগ্রাম করছে, তারা কেবল নিজের দেশের জন্যে করছে না, লড়াই করছে সমগ্র মিত্রপক্ষের হয়ে, এককভাবে প্রায় কোন্ সাহায্য না পেয়েই এমন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যারা আজো অত্যন্ত শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ।"[৮] এই বাণী বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর কাছেও পাঠানো হলো।

উভয় সরকারের পক্ষ থেকে চার্চিল এর জবাব দিলেন। তিনি যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করলেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা, মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্যদলের অপ্রস্তুত অবস্থায়, সুনিশ্চিত পরাজয়ের নামান্তর মাত্র। তিনি দুঃখজনক হতাশার সুরে বলেন, "কেমন করে বৃটিশ সৈন্যের একটা বড়ো পরাজয় ও অস্তিত্ব বিলুপ্তি, সোভিয়েত সেনাদলকে সাহায্য করবে আমি বুঝতে পারছিনা।"[৯]

চব্বিশে জুন, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত সরকারের প্রধান, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর কাছে আরেকটি বাণীতে বলেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার বাধা, অসুবিধা, যখন মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার পবিত্র গাম্ভীর্যে সেই দায়িত্ব গ্রহণ

করেন, তখনই নিশ্চয় জানা ছিল। সেই সময় থেকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার পরিবেশ সোভিয়েত সেনাদলের বিজয় সাফল্যের মাধ্যমে আরো অনুকূল হয়েছে। সেই কারণে তিনি বলেন, চার্চিল যে "পরাজয় ও হত্যার" কথা বলেছেন, তা "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন"। এই বাণীর শেষে বলা হয়েছিল :

"আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এখানে সোভিয়েত সরকারের আশা ভঙ্গটাই বড়ো কথা নয়, বড় কথা হলো মিত্রপক্ষের উপর তার বিশ্বাস বজায় রাখার প্রশ্ন, যে বিশ্বাসের বনিয়াদের উপর রীতিমতো চাপ পড়ছে। একথা কারো বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় সমস্যাটা হলো পশ্চিম ইউরোপ ও রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনরক্ষা এবং সোভিয়েত সেনাদলের বিপুল ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে কমিয়ে আনা, যার তুলনায় ইঙ্গমার্কিণ সেনাদলের ক্ষয়ক্ষতি নিতান্ত তুচ্ছ।"[১০]

ইউরোপ দূরে যাক্ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও যুদ্ধের এই অনুকূল পরিস্থিতির কোন সুযোগ গ্রহণ করার চেষ্টা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন করলো না। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কুওমিনটাং সেনাদলও নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলো। যখন কুর্স্ক অঞ্চলে হিটলার জার্মাণী তার গ্রীষ্মকালীন আক্রমণ সুরু করে, তখন কুওমিনটাং সেনাদল ও তাদের পরিকল্পনা মতো আক্রমণ করে, তবে তা জাপানী জঙ্গীবাদীদের বিরুদ্ধে নয়। সাতই জুলাই, উনিশ শ' তেতাল্লিশে তার আক্রমণ সুরু হয় চীনের মুক্ত অঞ্চলগুলির দিকে এবং সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে আত্মসমর্পণের জন্যে জাপানের সঙ্গে গোপন আলোচনা। কুওমিনটাং দলের সৈনিক ও অফিসাররা দলত্যাগ করে, জাপানীদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের আত্মসমর্পণের সম্ভবনা ও এর প্রতিকূল প্রভাব বাড়তে বাড়তে ক্রমেই চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। মুক্ত অঞ্চলে কুওমিনটাংয়ের আক্রমণ প্রতিহত করে চীনের গণমুক্তি ফৌজ। জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামও চালাতে থাকে তারা।

সোভিয়েত সেনাদলের প্রচণ্ড আক্রমণের সামনে পিছু হটতে হটতে, ফ্যাশিস্ত সৈন্যবাহিনী পাশবিক, দানবীয় অপরাধের অনুষ্ঠান করতে থাকে। তাদের সেই অপরাধের প্রতিবাদে সারা পৃথিবীর মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী এই সব কথায় কাণ না দিয়ে, নাৎসীদের

অত্যাচারের কাহিনী অস্বীকার করতে থাকেন। কারণ তখনও তাঁরা চাইছিলেন হিটলার অনুগামীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পথ খোলা রাখতে। জনকয়েক বৃটিশ সৈনিক, ফ্রান্সে নাৎসী অভিযানের সময় আহত ও বন্দী হয়ে, আন্তর্জাতিক রেডক্রশের প্রচেষ্টায় উনিশ শ' তেতাল্লিশে মুক্তি লাভ করে ফিরে আসে, তখন তারা সেই অত্যাচারের কিছু কাহিনী প্রকাশ করতেই বৃটিশ সরকার ভ্রূকুটি করে ওঠেন। এই দলেরই একজন, সৈনিক পুলে যখন বলে জনৈক জার্মাণ অফিসারের আদেশে নিরানব্বই জন বৃটিশ যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করা হয়, তখন এই ঘটনা প্রকাশের জন্যে তাকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।

মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা নাৎসী অত্যাচারের কাহিনী অস্বীকার করেন। তাতে অবিশ্যি অবাক হওয়ার কিছুই নেই। ফ্যাশিস্তদের মৃত্যু কারখানায় যে সব গ্যাস চেম্বার তৈরী হয়েছিল, তার সাজ সরঞ্জাম যে সব জার্মাণ উৎপাদনকারীরা (যথা সিমেন্স-হালস্কে) সরবরাহ করতো, তাদের সঙ্গে মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাই এই সরবরাহে লাভের বখরা দু' জনেই পেয়েছিল। গ্যাস চেম্বার সম্বলিত বাসগুলি যে সব জার্মাণ কারখানায় নির্মিত হতো তাদের মালিক ছিল ফোর্ড ও জেনারেল মোটরস্ প্রতিষ্ঠান। সুইজারল্যাণ্ডের বাসলে (Basle) শহরে যে আন্তর্জাতিক সেটেলমেন্ট ব্যাঙ্কের সদর কার্যালয় ছিল (ইয়ং পরিকল্পনা অনুযায়ী জার্মাণীকে সাহায্যদানের উদ্দেশেই এর প্রতিষ্ঠা), যুদ্ধচলাকালীন সময়ে তাদের কাজকর্ম বন্ধ করা হয়নি। নাৎসীদের রাইখ্সব্যাঙ্কের কাছ থেকে তারা যে সোনা কিনে নিয়ে আসে তার মধ্যে মৃত্যু শিবিরে নিহত, মৃত মানুষের সোনা বাঁধানো অনেক দাঁত ছিল। এর ডিরেকটর ছিলেন জনৈক নিউ ইয়র্ক ব্যাঙ্কার টমাস ম্যাককিট্রিক।

শুধুমাত্র জার্মাণ যুদ্ধোৎপাদন থেকে নয়, জার্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির শিল্প ব্যবস্থা থেকেও বৃটিশ ও মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের মুনাফা এসেছে প্রচুর। রুমেনিয়ার রোমিনো আমেরিকানা প্রতিষ্ঠান তার মার্কিণ ষ্টক হোল্ডারদের, উনিশ শ' তেতাল্লিশে বাহাত্তর কোটি ষাট লক্ষ লী (Lei- রুমেনিয়া মুদ্রা) নীট মুনাফা দিয়েছে। সেই একই বছরে বৃটিশ প্রতিষ্ঠান আস্ত্রা-রোমিনা নীট মুনাফা দিয়েছে চুরাশী কোটি লী।

॥ দুই ॥

সোভিয়েত বিজয়ের জয়োল্লাসে চার্চিল ও রুজভেল্ট যে সময়ে আবার মিলিত হওয়ার আশা করেছিলেন, তার অনেক আগেই তাঁদের বৈঠকে বসতে বাধ্য করলো। সেই সম্মেলন বসলো ক্যানাডার কুইবেক শহরে, এগারো থেকে চব্বিশে আগষ্ট উনিশ শ' তেতাল্লিশে। পূর্বতন সম্মেলনগুলির মতো এটাও হলো একটা স্বতন্ত্র সম্মেলন। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ সম্মেলনে যোগ দেয়নি। স্বভাবতই যুদ্ধ সম্পর্কে সোভিয়েতের মতামত সংবদপত্রে প্রকাশ করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইলো না। যুদ্ধের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে সোভিয়েত প্রচার ব্যুরো যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাতে বলা হয় যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিষয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন একটা দীর্ঘসূত্রী নীতি গ্রহণ করছে। তাতে বলা হয়েছিল যে, "এই বছরে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গণ সংগঠিত হলে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হয়ে যাবে ফলে হিটলার বিরোধী মোর্চার ক্ষয়ক্ষতি বিশেষতঃ জীবন নাশের পরিমাণ অনেক কমে যাবে।"[১১]

কুইবেক সম্মেলন সুরু হওয়ার অল্প কয়েকদিন পূর্বে, প্রাভদায় "দ্বিতীয় রণাঙ্গন" শিরোনামায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছিল যে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার তাঁদের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার প্রতিশ্রুতি বারেবার ভঙ্গ করেছেন। প্রবন্ধে একথাও বলা হয়েছিল এই স্থগিতকরণ, জনগণের ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে চরম সংগ্রামে শরিক হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে, মুষ্টিমেয় একদল প্রভাবশালী মানুষের ইচ্ছানুযায়ী করা হচ্ছে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "একথা সুনিশ্চিত যে এই রকম ক্ষুদ্র গোষ্ঠি আছে, সংখ্যায় যদিও তারা কম, যারা যুদ্ধের আশু বিরতি দেখতে কোনমতে রাজী নয়। কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনকারীরা, যুদ্ধের যোগানদার ও অন্যান্য স্বার্থজড়িত মানুষেরা, যারা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে, স্বদেশের ও জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে, হিটলারের বুটের তলায় নিপীড়িত মানুষের স্বার্থের চেয়ে বেশি মূল্যবান বলে মনে করে, তাদের এই ধরণের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়ে বিশেষ কিছু বলে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।"[১২]

কুইবেক সম্মেলনে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিষয়ে আবার আলোচনা হলো। মার্কিণ ও বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী সোভিয়েত সেনাদলের সাফল্য ভীত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁদের ভয় হচ্ছিল যে তাঁরা যোগদান না করলেও অধিকৃত ইউরোপে নাৎসী শাসনের অবসান হবে। তাতে কেবল তখন তাদের কোন ভূমিকা থাকবে না। একচেটিয়াপতিরা পশ্চিম ইউরোপে জনগণের আন্দোলন দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা উঠে পড়ে লাগলো নানা পরিকল্পনার রূপায়নে যাতে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে তাদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তাই কুইবেকে মার্কিণ প্রতিনিধিদল ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে দ্রুত দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার পক্ষপাতী ছিলেন। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা বৃটেনের প্রাধান্য ক্ষুণ্ন করে ইউরোপে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে খুবই ব্যগ্র ছিল। অন্যদিকে উইনষ্টন চার্চিল প্রস্তাব করলেন বলকান অভিযানের। সম্মেলনে তিনি ঠিক এই কথাগুলিই বলেছিলেন যে "এই অঞ্চলে সোভিয়েতের প্রভাব বিস্তৃত না হতে দেওয়াই" তাঁর উদ্দেশ্য, কারণ তা হবে, "মুখ্যতঃ বৃটেনের এবং পরোক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী।"[১৩]

চার্চিলের পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিম ভাগ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত প্রভাব বিলুপ্ত করে, সেখানে বৃটেনের ঈপ্সীত প্রাধান্য বিস্তার করা। এরই মধ্যে, মার্কিণ মুখপাত্র যুক্তিদেখালেন যে, ক্রমাগত যুদ্ধে সোভিয়েত সেনাদল দুর্বল হয়ে পড়লে, পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য বাহিনীর প্রভাব বিস্তার নিতান্ত সহজ হয়ে পড়বে।

কিন্তু আলোচনা যাই হোক. এবারেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন স্থগিতকরণের পক্ষে যারা, তাদেরই জয় হলো। কুইবেক সম্মেলন দ্বিতীয় রণাঙ্গনকে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশ পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়ে, পরিবের্ত ইটালী অভিযানের সুপারিশ করলো।

কুইবেকে মার্কিণ ও বৃটিশ প্রতিনিধিরা জার্মাণীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও মত বিনিময় করেন। ইডেন হালকে বলেন যে তাঁর মন্ত্রিসভা জার্মাণীর খণ্ডী-করণের প্রস্তাব উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সমর্থন করেন না, "প্রধানতঃ এই কারণে যে সেটি কার্যকরী করা প্রায় অসম্ভব," বরং তার জায়গায় "যদি স্বেচ্ছায় জার্মাণীর বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে স্বাতন্ত্রের মনোভাব সৃষ্টি করে তাদের স্বতন্ত্র রাখা যায়, তাহলে সেটাই ভালো হবে।"[১৪] এই আলোচনা থেকে বোঝা যায়

যে বৃটিশ নেতারা "স্বাভাবিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে জার্মাণ রাজ্যগুলিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার সম্ভবনার বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করছিলে।" [১৫]

মার্কিণ সরকারও জার্মাণীর বিভক্তকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। হাল বলেন যে, "জার্মাণীর একটা অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের বিষয়টি বিচার করে দেখা অসম্ভব নয়, যাতে তার নিজের স্বার্থেই দেশের বিকেন্দ্রিকরণের ঝোঁক আপনা আপনি দেখা দেবে।" [১৬] জার্মাণীর খণ্ডীকরণের বিষয়ে মার্কিণ সরকার আলোচনার জন্যে একটা পরিকল্পনা পেশ করেন। তার নাম মরগেনথাউ (Morgenthau) পরিকল্পনা। যাই হোক আলোচনা স্থগিত রাখার জন্যে এবিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো না।

যে সম্মেলনে চিয়াং কাই-শেক যোগদান করেন সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক কার্যক্রম নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হয়। এখানেও কোন নোতুন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো না, বরং চিয়াং কাই-শেককে বলা হলো সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ্ রাখতে গৃহযুদ্ধের জন্যে। কুওমিনটাং আরো অস্ত্রশস্ত্র চাইলো। তাই জেনারেল ষ্টিলওয়েলকে আদেশ দেওয়া হলো নোতুন কুওমিনটাং ডিভিসন সংগঠিত ও অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করে তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে একটা অভিযান চালাবার নির্দেশও দেওয়া হলো তাঁকে।

ব্রহ্মদেশ অভিযানে অংশ গ্রহণ করলো প্রধানতঃ চিয়াং কাই-শেকের সেনাদল। বিমানে করে তাদের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল পার করে আনা হলো। বৃটিশ সামরিক নেতৃত্ব ভারতে বিপুল পরিমাণে সৈন্য সমাবেশ করলেও, প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশে কোন অভিযানে তাদের লিপ্ত করতে চাইলেন না। উপনিবেশে মুক্তি আন্দোলনকে দমন করার জন্যে এই সৈন্যদলকে যুদ্ধার্থে সদা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। কারণ তাঁরা জানতেন উপনিবেশের মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অচিরে আন্দোলন করবে। যুদ্ধশেষ পর্যন্ত এই সৈন্যদলকে অক্ষত ও প্রস্তুত রাখার সিদ্ধান্তের পিছনে ছিল বৃটেনের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য অটুট রাখার বাসনা যে সাম্রাজ্যের এক কোটি চল্লিশ লক্ষ বর্গমাইল আয়তনের মধ্যে বাস করতো পঞ্চান্ন কোটি পরাধীন মানুষ।

বৃটিশ সরকার ব্রহ্মদেশ অভিযানে আপত্তি করেন, কারণ তাঁদের আশংকা

ছিল এর মাধ্যমে মার্কিণ পুঁজি ও প্রভাবের অনুপ্রবেশ ঘটবে! চার্চিল এই অভিযান পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে, প্রশান্ত মহাসাগরের অন্য অঞ্চলে অনুরূপ কার্যক্রম সুপারিশ করেন। শেষ পর্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে আপোষ রক্ষা করতে বাধ্য করা হয়। বৃটিশ অ্যাডমিরাল লুই মাউন্টব্যাটেনকে ভারত ও চীন সমেত সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়। ষ্টিলওয়েলের হাতে তখনো চীনে সমস্ত জিনিষপত্র যোগানের সম্পূর্ণভার ঋণ-সাহায্য আইন অনুযায়ী ন্যস্ত। তখন তিনি চিয়াং কাই শেকের সেনানায়কদের প্রধান ও ব্রহ্মদেশে চিয়াং সৈন্যের অধিনায়ক। তা ছাড়া ভারত থেকে চীনে বিমান পথে যাতায়াত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণভার ছিল ষ্টিলওয়েলের হাতে।

তখন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বহুলাংশে রূপায়িত হচ্ছিল বিজয়ী সোভিয়েত বাহিনীর আক্রমণ ধারায়। বিপর্যয়ের ধাকায় অতল গহ্বরে পতনোন্মুখ ফ্যাসিস্তদের সেরা সেরা রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা মরিয়া হয়ে বাঁচার পথ খুঁজতে লাগলেন। তাঁরা আবার "সর্বাত্মক প্রস্তুতির" জন্যে সচেষ্ট হয়ে, ফ্যাশি বিরোধী মোর্চায় ভাঙ্গন ধরানোর কাজে তোড়জোড় করে লাগলেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের হিটলার পন্থীদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগলেন প্রায় মরিয়া হয়ে এই প্রত্যশা নিয়ে যদি কোন মতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একটা স্বতন্ত্র শান্তিচুক্তি করা যায়।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালে ষ্ট্রাসবুর্গের রোটেস হাউস হোটেলে জার্মাণ শিল্পপতি ও হিটলারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এক বৈঠকে মিলিত হলেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণী আত্মসমর্পণ করলে যাতে জার্মাণীর যুদ্ধ-শিল্প ব্যবস্থা ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের অক্ষুন্ন ও অনাহত রাখা যায় তারই এক কার্যক্রম রচনা করা। এই কার্যক্রমের ভিত্তি ছিল এই ধারণা যে ইঙ্গ-মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা একে রূপায়িত করতে সাহায্য করবে। হিমলার পরিকল্পনা ছিল এই কার্যক্রমেরই অংশ বিশেষ মাত্র। বার্লিন থেকে আশী কিলোমিটার দূরে কোট্রবাসের (Cottbus) কাছে পাক্‌লার দুর্গে দশই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশে হিমলার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। এখানে জেনারেল রুণ্ডষ্টেড্, ম্যানষ্টেইন, ব্রাউশিচ্, ভন্ ক্লুগে ও ক্লেইষ্ট হিমলারের সঙ্গে এই পরিকল্পনা রচিত হওয়ার সময় আলোচনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাশিস্ত দলের সেরা

মানুষ ও হিটলারের পার্ষদদের সমস্ত রকমের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা। এতে স্থির হয় যে যতোদিন পর্যন্ত না মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার সরাসরি জার্মাণ জঙ্গীবাদের সঙ্গে একটা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, ততোদিন পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর জার্মাণীতে একটা মোটামুটি আইন সম্মত প্রতিষ্ঠান গঠন করে ফ্যাশিস্তদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। হিমলার ও ফ্যাশিস্ত জেনারেলরা যুদ্ধোত্তর কালকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলার মতো ক্ষণিক বিরতি বা অবকাশ বলে মনে করেছিলেন।

॥ তিন ॥

ফ্যাশিস্ত অধিকৃত ইউরোপ ও এশিয়ার দেশগুলোতে সমগ্র উনিশ শ' তেতাল্লিশ ধরে প্রতিরোধ আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করতে লাগলো। বিভিন্ন দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে সংঘবদ্ধ করতে লাগলো। সোভিয়েত ইউনিয়নও যথারীতি হিটলারের পদানত দেশের মানুষদের মুক্তি আন্দোলন সমর্থন করতে লাগলো।

জার্মাণীর ফ্যাশিস্ত সেনাদল তাই সর্বদাই পিছন থেকে অতর্কিতে প্রচণ্ড আক্রমণের সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতো। সোভিয়েত সেনাদলের জয়লাভে ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রজোটের মধ্যে তীব্র সংকট দেখা দেয়। উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েতের গ্রীষ্মকালীন আক্রমণের ধারা, ইটালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে ইটালীর বাছাই করা সৈন্যদের দশটি ডিভিসন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রায় দু'লক্ষ সৈনিক ও অফিসার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আর ফিরে আসতে পারেনি। যুদ্ধে ইটালী তার সমস্ত উপনিবেশ হারায়। তার ভূমধ্যসাগরীয় নৌ-বহরের কপালে জোটে একের পর এক মর্মান্তিক, লজ্জাজনক পরাজয়।

সেই সময়ে ইটালীতে একটা শক্তিশালী ফ্যাশি-বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে। কমিউনিষ্টদের পুরোভাগে রেখে দেখা দেয় একটা ব্যাপক ভিত্তিতে সংগঠিত পপুলার ফ্রন্ট। ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক পার্টি এই ফ্যাশি বিরোধী জনপ্রিয় মোর্চায় যোগদান না করে, শত্রুতামূলক আচরণ করতে থাকে। এদের আরেক শত্রু ছিল ভ্যাটিক্যান। পোপ কমিউ-নিষ্টদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে জনগণকে ফ্যাশিস্তদের মেনে চলার জন্যে

আহ্বান জানান। শুধু সেখানেই শেষ নয়, অন্যান্য অধিকৃত দেশের মানুষদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত বাণীতে, তিনি তাদের প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে দূরে সরে থাকার জন্যে আবেদন জানান।

উনিশে জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে হিটলার ও মুসোলিনীর মধ্যে একটা সাক্ষাৎকার ঘটলো ভেরোনায়। মুসোলিনী সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র চাইলেন দেশে নিজের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যে। কিন্তু সোভিয়েতের ক্রম প্রসারমাণ আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে হিটলারের পক্ষে আর কাউকে সাহায্য করার কোন উপায় ছিল না। পরিবর্তে তাই তিনি এমন একটা কার্যক্রমের কথা বললেন, যাতে ইটালীর জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি মুসোলিনীকে দক্ষিণ ও মধ্য ইটালী ছেড়ে দিয়ে, সমস্ত সৈন্যবাহিনী পাভিয়ায় সমবেত করে একটা শক্তিশালী আত্ম-রক্ষামূলক ব্যবস্থা গঠন করতে বললেন, যাতে ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযান সেখানে রুখে দেওয়া যায়।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি প্রাণপণে চেষ্টা করে চলল এমন কার্যক্রম রচনা করতে যাতে ইটালীর ফ্যাশিবাদী একনায়কত্ব জীইয়ে রাখা যায়। সেটা ছিল মার্কিণ ও বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী, ইটালীর একচেটীয়া গোষ্ঠী ও ভ্যাটিকানের একটা সমবেত প্রচেষ্টা। নিউ ইয়র্কের ক্যাডিন্যাল ফ্রান্সিস স্পেলম্যান, উনিশ শ' তেতাল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে ইটালী এলেন ভ্যাটিক্যান পরিদর্শনের অছিলায়। তাঁর কাজ ছিল মধ্যস্থতাকারী হিসাবে সাহায্য করা। এই কার্যক্রমে ফ্যাশিস্ত একনায়কত্ব বজায় রাখার জন্যে মুসোলিনীর অবসর গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। "কারণ ভ্যাটিক্যান ও পশ্চিমী মিত্রপক্ষ, উভয়েরই মনে ভয় ছিল যে ইটালীর বৈপ্লবিক শক্তি এই সুযোগে মাথা চাড়া দিতে পারে। সেই জন্যে তাঁরা একটা বোঝাপড়া করে ফেল্লেন যাতে মুসোলিনীকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তাঁর শাসনব্যবস্থার কাঠামোকে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মোটামুটি অটুট রাখা যেতে পারে।"[১৭] এই কার্যক্রম অনুযায়ী ইটালীর রাজা মুসোলিনীকে পদত্যাগ করতে আদেশ দেবেন এবং পরে একটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে তাকে বন্দী করে রাখবেন।

চব্বিশে জুলাই উনিশ শ' তেতাল্লিশে মুসোলিনী ফ্যাশিস্তা পার্টির মহান

জাতীয় পরিষদে, হিটলারের সঙ্গে তাঁর আলোচনার বিবরণী পেশ করলেন। পরিষদে ডুচে হিটলারের দাবী মেনে নেওয়ার সপক্ষে জোর দেন। প্রত্যুত্তরে পরিষদ একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে মুসোলিনীর পদত্যাগ দাবী করেন। প্রস্তাবটি সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়। পরদিন ফ্যাশিস্ত একনায়ককে গ্রেপ্তার করা হয়। চার্চিল এই সময়েই তাঁর রোজনামচায় মুসোলিনীর প্রশংসা করে কিছু মন্তব্য লিখে রাখেন যে তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর সঙ্গে চার্চিলের বহু বছর ধরে পত্র বিনিময় হয়েছে।[১৮]

মুসোলিনীর ক্ষমতাচ্যুতি ছিল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা, লুইগী লঙ্গো (Luigi Longo) এই ঘটনাকে উনিশ শ' তেতাল্লিশের বসন্তকালে ইটালীর প্রধান প্রধান শিল্প কেন্দ্রগুলিতে কমিউনিষ্টরা যে বিরাট ধর্মঘট সংগঠিত করেছিল, তারই ফলশ্রুতি বলে বর্ণনা করেন। এই ঘটনার পরেই ইটালীর শ্রমিক শ্রেণী একটা ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে একেবারে প্রথম সারিতে এসে দাঁড়ায়।

আরেক জন ফ্যাশিস্ত নেতা, মার্শাল বাদোগলিয়ো (Badoglio) এবার ইটালীর নোতুন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। নিযুক্তির পরেই তিনি নীচের নির্দেশনামাটি জারী করেছিলেন :

"যে কোন আন্দোলনকে দানা বাঁধা মুহূর্তেই নির্মম ভাবে দমন করতে হবে। এর জন্যে ঘেরাও করা, শব্দ সংকেত করা, সতর্ক করা বা কাউকে বোঝানোর চেষ্টা করার সেকেলে নীতি ছাড়তে হবে। সমস্ত আইন ভঙ্গকারীদের সৈন্যরা প্রতিরোধ করবে সামরিক কায়দায়, কোন রকমে সতর্ক না করে গুলী বর্ষণ করবে, এবং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে যেমন যে কোন অস্ত্র ব্যবহার করা যায় এক্ষেত্রেও বোমা, মাইন বা অনুরূপ অস্ত্র ব্যবহার করবে প্রয়োজন মতো। কোন মতেই সৈন্যরা আকাশের দিকে গুলী ছুঁড়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমন এখানে তারা গুলী করবে লক্ষ্য বস্তুর দিকে। এবং যদি কোথাও সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন কোন হিংসাত্মক কাজ ঘটে, তাহলে অপরাধীকে ধরে সেখানেই গুলী করে মারা হবে।"[১৯]

ইটালীর একচেটিয়াপতিরা এই ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করলো যে তারা ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করছে। তারা এর মাধ্যমে জনপ্রিয়তা অর্জন করে জনগণের বিদ্বেষ এড়াতে পারবে প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু বাদোগলিয়োর

সংস্কারের পক্ষে তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য চেপে রাখা বিশেষ সম্ভব ছিল না। প্রসঙ্গত বলা যায় যে ডেইলী টেলিগ্রাফ ও মর্নিং পোষ্ট পত্রিকা এ সম্পর্কে লিখেছিলেন যে, "ফ্যাশিস্ত আইনগুলির সংস্কার সাধনের অসম্ভব প্রচেষ্টা ও নোতুন নির্বাচনী আইন রচনার অন্তরালে, বাদোগলিয়োর নীতি সরাসরি নাৎসীদের হাতে চলে গেছে।"[২০]

হিটলারের সঙ্গে মুসোলিনী যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, ছয়ই আগষ্ট তা আবার সুরু করা হলো ভেনিসের কাছে ত্রেভিসোতে। এখানে ইটালীর প্রতিনিধিত্ব করলেন বাদোগলিয়োর পররাষ্ট্র মন্ত্রী জেনারেল গুয়ারিগলিয়া (Guariglia) এবং ইটালীর সেনাদলের অধিনায়কদের প্রধান অ্যামব্রোসিয়ো (Ambrosio)। জার্মাণীর পক্ষে এলেন রিবেনট্রপ ও কাইটেল। কিন্তু পূর্বে মুসোলিনী এবং বর্তমানে বাদোগলিয়ো যে ধরনের সাহায্য চাইছিলেন তা দেওয়ার সামর্থ্য জার্মাণীর ছিল না।

বাদোগলিয়ো চেষ্টা করেছিলেন গণ আন্দোলনকে ভেঙ্গে চুরমার করে যুদ্ধ যথারীতি চালিয়ে যেতে। কিন্তু ইটালীর ফ্যাশিস্ত পার্টির আভ্যন্তরীণ সংকট ও সোভিয়েতের ক্রমিক সাফল্যে অনুপ্রাণিত, জাতীয় মুক্তির জন্যে ব্যাপক গণ আন্দোলন, বাদোগলিয়ো সরকারকে জার্মাণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য করলো।

পনেরোই আগষ্ট উনিশ শ' তেতাল্লিশে মাদ্রিদে গোপন সামরিক আলোচনা সুরু হলো ইটালীর মুখপাত্র জেনারেল কাস্তেল্লানো (Castellano) ও মার্কিণ এবং বৃটিশ প্রতিনিধিদের মধ্যে। পরে এই আলোচনা চললো লিসবন শহরে এবং শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলো ইটালী এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে আইসেনহাওয়ারের প্রতিনিধিরা।

আটই সেপ্টেম্বরে ঘোষিত ইটালীর যুদ্ধবিরতি ছিল একটা নিতান্ত আনুষ্ঠানিক ঘটনা। এতে ইটালীতে ফ্যাশিবাদ ও তার ফলশ্রুতিকে নির্মূল করার জন্যে কোন ধারা সংযোজিত হয়নি। যে সমস্ত দেশ ইটালীর পররাজ্য আক্রমণ নীতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সে কি ক্ষতিপূরণ দেবে সে কথাও এখানে বলা হয়নি। চুক্তিতে কেবল বলা হয়েছিল যে যুদ্ধ এখনই বন্ধ করতে হবে, কর্সিকা সমেত সমগ্র ইটালীকে আত্ম সমর্পণ করতে হবে যাতে মিত্রপক্ষ তাদের সামরিক কার্যক্রম বা অন্য কোন উদ্দেশে একে কাজে লাগাতে পারে, জাতিপুঞ্জের সমস্ত

নাগরিক যারা বন্দী বা অন্তরীণ আছে তাদের মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে, ইটালীর নৌ ও বিমান বাহিনী অস্ত্র পরিত্যাগ করবে এবং ইটালীর নৌ ও বিমান বন্দর মিত্রপক্ষ যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবে।

তেসরা সেপ্টেম্বর ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য দক্ষিণ ইটালীতে অবতরণ করতে সুরু করলো। কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হলো না তাদের। লিডেল হার্ট বলেছেন যে, "মাটিতে পা দেওয়ার আগে অর্থহীন ভাবে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করা হলো—এ অঞ্চলে একটি মাত্র জার্মাণ সৈন্য ডিভিসন যা ছিল, তা বেশ কয়েকদিন আগেই উত্তর দিকে সরে যায়।"[২১]

উত্তর ইটালীতে যেখানে দেশের শিল্পগুলি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল সেখানে উত্তরোত্তর তীব্র পার্টিজান দলের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পেল কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে। মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার জানতেন যে যদি তাঁরা তাদের শক্তি প্রয়োগ করে পার্টিজান আন্দোলন দমন করতে যান, তাহলে তাঁদের নিজেদের দেশেই প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এর আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াও খুব সুখকর হবে না। সুতরাং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের ভার তাঁরা হিটলার জার্মানীর হাতে ছেড়ে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলের কালক্ষেপ করার নীতিতে নাৎসীরা উত্তর ও মধ্য ইটালী আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে গেল। ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক নেতৃত্ব ইটালীর পার্টিজানদের প্রতিরোধ বন্ধ করে নাৎসীদের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করার নির্দেশ দিলেন। তারা যেন এখন শান্ত হয়ে "পরিস্থিতি ভালো না হওয়া পর্যন্ত" অপেক্ষা করে। কিন্তু ইটালীর দেশপ্রেমিক মানুষ তাদের কর্তব্যভ্রষ্ট হলো না। "প্রাক্তন সোভিয়েত সৈনিকরা, যারা এতোদিন যুদ্ধ বন্দী ছিল—সেই নাম-না-জানা সৈনিকরা সামরিক অভ্যুত্থানের আহ্বান জানিয়ে সান্তা মেরিয়ার, ওয়াকেবহাল লোকদের কাছে যার নাম 'ক্যাপুয়া ভেতেরে', যুদ্ধে তারা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। ইটালীর মানুষের কাছে আজো তারা স্মরণীয় হয়ে আছে। পার্টিজান আন্দোলনে যোগ দিতে তারা কোন দ্বিধাই দেখায়নি। কুনেও প্রদেশে জনৈক সোভিয়েত মেজর, পাওলো ব্রাচ্চিনি ব্রিগেডে, রুশ শাখার নেতৃত্ব করেন।" এই সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন রবার্তো বাত্তাগলিয়া তাঁর ইটালীর প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসে।[২২] ফাইদার (Feidar) নামে জনৈক পার্টিজন সদস্যের নামোল্লেখ করেছেন তিনি, যাকে

তাঁর "লিগুরিয়ার পার্টিজান আন্দোলনের সবচেয়ে সাহসী যোদ্ধা" বলে মনে হয়েছে।

ইটালী সরকার তাঁকে সেই দেশের সেরা সম্মানে ভূষিত করেন তাঁর মৃত্যুর পর। উনিশ শ' বাষট্টিতে প্রমাণিত হলো যে ফাইাদরের নাম ফাইদার পোয়েতান নয়, নাম হলো তাঁর ফিয়োদোর আন্দ্রিয়ানোভিচ্ পোলেতাইয়েভ্। যুদ্ধের পূর্বে তিনি রিয়াজান অঞ্চলের স্কোপিনো জেলায় একটি যৌথ খামারের কামারশালার শ্রমিক ছিলেন। তাঁর স্বদেশেও তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আখ্যায় ভূষিত করেছে।

মিত্রপক্ষ জার্মাণীকে মুসোলিনীর বন্দীদশা মুক্ত করতে বাধা দিল না। সঙ্গে সঙ্গেই জার্মাণ অধিকৃত ইটালীতে মুসোলিনী ক্রীড়নক "সালো সাধারণতন্ত্রের" (Republica di Salo) প্রতিষ্ঠা করলেন। সালো নামের তাৎপর্য হলো এটি মুসোলিনীর নয়া সাধারণতন্ত্রের রাজধানী।

বাত্তাগলিয়া লিখেছেন: "সালো সাধারণতন্ত্র ইটালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার পরিণাম নয়, সুতরাং প্রাক্তন ফ্যাশিস্ত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে তাকে তুলনা করা যায় না। তার জন্ম হয়েছিল জার্মাণীতে, সুতরাং ইউরোপের আরো নানা জায়গায় নাৎসীরা যেমন ক্রীড়নক সরকার প্রতিষ্ঠা করেছিল, এটাও ছিল তাদেরই সমগোত্রীয়।"[২৩]

তেরোই অক্টোবর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে বাদোগলিয়ো সরকার জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সেই দিনই সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এক ঘোষণায় ইটালীকে স্বপক্ষীয় যুদ্ধরত দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দান করলো। এই যুদ্ধের সীমান্ত ইটালীয় উপদ্বীপে নেপল্‌সের দক্ষিণ বরাবর গেল। ইঙ্গ মার্কিণ সামরিক তৎপরতা তখন খুব ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে। এক সরকারী বিবরণীতে এই অভিযানকে দুর্গম পার্বত্য পথে মন্থর ও অত্যন্ত কষ্টকর প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। অথচ সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অত্যন্ত সুসজ্জিত ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলের মোকাবিলা করার জন্যে তখন সেখানে ছিল মাত্র দশ ডিভিসন জার্মাণ সৈন্য।

ইটালীতে জার্মাণ সৈন্যবাহিনীর নাৎসী অধিনায়ক, জেনারেল কেসেলরিং পরে লিখেছেন: "পরিস্থিতি মিত্র পক্ষের অনুকূলে থাকা সত্বেও তাদের সাফল্যের পরিমাণ বিস্ময়কর ভাবেই কম।"[২৪]

দক্ষিণ ইটালী দখল করে. মার্কিণ ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সেখানকার ফ্যাশিস্ত আইন, নিয়মকানুন বদলে দেওয়ার কোন চেষ্টা করেনি। স্থানীয় শাসনভার গ্রহণ করলো মিত্র পক্ষের অধিকৃত অঞ্চলে সামারক শাসন সংস্থা (A. M. G. O. T.), যারা ইটালীর ফ্যাশিস্তদের ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে চেষ্টা করলো। দক্ষিণ ইটালীতে ইঙ্গ-মার্কিণ নীতি প্রমাণ করে দিল অধিকৃত দেশের জাতীয় অধিকার ও সার্বভৌমত্ব পদদলিত করে, বৃটিশ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা সেখানে নিজেদের নীতি ও শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়। তাদের কাজ থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা গেল যে তাদের সহানুভূতি আছে ফ্যাশিস্ত একনায়কত্বের দিকে। বাত্তাগলিয়া তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন যে চার্চিল চাইছিলেন একটা "শান্ত" ইটালী, অর্থাৎ এমন এক ইটালী যার কোনও সক্রিয়তা নেই। আন্তর্জাতিক রাজনীতির খেলায় ইটালীকে তাঁর প্রয়োজন ছিল একটা তুরুপের টেক্কা হিসাবে। ইটালীকে তিনি চেয়েছিলেন একটা ঘাঁটি হিসাবে, যেখান থেকে সুবিধা মতো বলকানে হামলা চালানো যাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[২৫]

সে যাই হোক, ইটালীর আত্মসমর্পণের একটা প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল। সোভিয়েতের সামরিক সাফল্য, ইটালীকে ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রজোটের বাইরে টেনে এনে, অক্ষশক্তিকে ভেঙ্গে দেয়। ইটালীর আত্মসমর্পণ তাই জার্মাণীর অন্যান্য মিত্রদেশের কাছে একটা উদাহরণ হয়ে রইলো, যে পথে তাদেরও যেতে হবে খুব তাড়াতাড়ি, আর তারই সঙ্গে ভেঙ্গে পড়বে সমগ্র ফ্যাশিস্ত জোট।

সোভিয়েত সাফল্যের আন্তর্জাতিক প্রভাবে, কর্সিকাতে একটা সফল অভ্যুত্থান ঘটে গেল। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত কর্সিকার জাতীয় ফ্রন্টের উদ্যোগে, আটই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে এই অভ্যুত্থান ঘটে। স্পেনের চতুর্দশ আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের প্রাক্তন সদস্য, কমিউনিষ্ট ফ্রাঁসোয়া ভিত্তোরী (Francois Vittori) বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব করছিলেন। মাসাবধি কাল ব্যাপী সেই তীব্র সংগ্রামের শেষে, একলক্ষ পনের হাজার সৈন্য ও অফিসার সমেত শত্রুপক্ষকে একটা কলঙ্কময় পরাজয় বরণ করতে হলো। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে কর্সিকার মোট জনসংখ্যা শিশু সমেত, মোটেই তিন লক্ষের বেশি নয়। সংখ্যা-তাত্ত্বিক বিচারে বলা যায় যে কর্সিকার সুসজ্জিত ফ্যাশিস্ত সেনাদল, উত্তরে

আফ্রিকায় ইটালী ও জার্মাণীর যে যৌথ ডিভিসনের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদল সাত মাস ধরে লড়েছে তার সমান ছিল।

সমগ্র কর্সিকা শাসনের জন্যে একটা পরিষদ গঠন করা হলো। তা ছাড়া কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করা হলো পৌর শাসনের। কর্সিকাই হলো ফ্রান্সের প্রথম শত্রুকবল মুক্ত প্রদেশ।

---

১. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪
২. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৪১
৩. টিপ্পলস্কার্চ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৯
৪. একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৫. বি. এইচ. লিডেল হার্ট : Strategy, The Indirect Approach, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৪, পৃঃ ২৯৬
৬. গুদেরিয়ান : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৮৩
৭. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৮. Correspondence, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭০
৯. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩
১০. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৩৮
১১. প্রাভ্দা, ২২শে জুন, ১৯৪৩
১২. ঐ, ৬ই আগষ্ট, ১৯৪৩
১৩. কর্ডেল হাল : Memoirs, পৃঃ ১২৩২
১৪. ঐ, পৃঃ ১২৩৩
১৫. ঐ, পৃঃ ১২৩৪
১৬. ঐ, পৃঃ ১২৩৬
১৭. অ্যাভ্রো ম্যানহাট্টান : The Catholic Church Against the Twentieth Century, লণ্ডন ১৯৪৭, পৃঃ ১৩৫
১৮. চার্চিল : The Second World War, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৫১
১৯. রবার্তো বাত্তাগলিয়া : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৮৫
২০. ডেইলী টেলিগ্রাফ ও মর্নিং পোষ্ট, ২রা আগষ্ট, ১৯৪৩
২১. লিডেল হার্ট : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৩
২২. রবার্তো বাত্তাগলিয়া : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৫
২৩. ঐ, ঐ, পৃঃ ১৫০
২৪. একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
২৫. রবার্তো বাত্তাগলিয়া : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৩৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়

তেহেরান সম্মেলন

উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েতের সামরিক সাফল্য যুদ্ধের অবসান ত্বরান্বিত করেছিল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ় করার জন্যে সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতিকে তাই অনেক আগের থেকে সম্ভাব্য সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করতে হয়। সেই পৃথিবীর রাষ্ট্রিক সম্পর্কের, বোঝাপড়ার মৌল নীতি কি হতে পারে, সে সম্বন্ধে সোভিয়েত সরকার একটি ঘোষণা করেন। তাতে বলা হয়েছিল :

এক : ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের দখল থেকে ইউরোপকে মুক্ত করে ফ্যাশিস্তরা সুবিধামতো রাষ্ট্রগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে যেভাবে ব্যবহার করছে তা বাতিল করে, তাদের পুনর্গঠনে সাহায্য করতে হবে।

দুই : ইউরোপের পরাধীনতা মুক্ত মানুষকে কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থার অধীনে তারা বসবাস করতে চায়, তা স্থির করার পূর্ণ স্বাধীনতা, অধিকার ও সুযোগ দিতে হবে।

তিন : যে সমস্ত ফ্যাশিস্ত অপরাধীরা যুদ্ধের জন্যে দায়ী, অগণিত মানুষের অসীম যন্ত্রণা যারা সৃষ্টি করেছে, তাদের তা সে যেখানেই তারা আশ্রয় নিক না কেন যথোচিত শাস্তিবিধান করতে হবে।

চার : ইউরোপের রাষ্ট্রিক সংস্থার মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে জার্মাণী কোন দিন আর কোন রাজ্য আক্রমণ করতে না পারে।

পাঁচ : ইউরোপের দেশগুলির যে অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও সাংস্কৃতিক মান জার্মাণ আক্রমণ তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছে তার দূরীকরণের জন্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটা স্থায়ী অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র ও সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক আদর্শের সম্প্রসারণের জন্যে, সোভিয়েত সরকার এই নীতিগুলি কার্যকরী করতে উদ্যোগী হলেন।

অন্যদিকে মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকচক্র, তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন বিস্তারের ছদ্ম আবরণটা ক্রমেই একটু একটু করে সরাতে লাগলেন। মুক্তি আন্দোলনের বিস্তার ও জনপ্রিয়তায় আশংকিত চিত্ত শাসকবর্গ, জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে দেশপ্রেমিক মানুষদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুললেন।

তাঁরা একদিকে নানা অজুহাতে, অছিলায় দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার কাজ স্থগিত রাখতে লাগলেন, অন্যদিকে বলকানে চেষ্টা করতে লাগলেন নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা তো উঠে পড়ে লাগলো তাদের বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন যে কোন উপায়ে সম্ভব সফল করতে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে জীবাণু যুদ্ধ ও পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কাজ চলতে লাগলো। কুইবেকে মার্কিণ ও বৃটিশ নেতারা পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক আলাপ আলোচনা করেন। মার্কিণ সরকার তাঁদের বাজেট বরাদ্দের বেশির ভাগ টাকাটাই ব্যয় করতে লাগলেন পৃথিবী-ব্যাপী নানা জায়গায় সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলতে এবং তারই সঙ্গে নৌ ও বিমান বহরের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে বিশ্বে প্রাধান্য বিস্তারের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতে।

সমগ্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা, জার্মাণ একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে চলে। মার্কিণ দেশের বৃহদায়তন শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে দু'শ উনচল্লিশটি প্রতিষ্ঠান, যুদ্ধের মধ্যেই, হিটলার জার্মাণীকে নানা ভাবে সাহায্য করে যায়।[১]

ফ্যাশিস্ত হাঙ্গেরী সরকারের আত্মসমর্পণের সর্তাবলী আলোচনা করে, উনিশ শ' তেতাল্লিশের সেপ্টেম্বরে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার একটা গোপন চুক্তি করেন। তার লক্ষ্য ছিল হাঙ্গেরীতে ফ্যাশিস্ত শাসন ব্যবস্থা কায়েম রাখতে সুযোগ দিয়ে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নিজস্ব স্বার্থ সাধনে তাকে ব্যবহার করা। এই চুক্তি বলকানে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গেই কার্যকরী হবে।[২]

উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালে চার্চিল শ্রমিকদলের একজন নেতা আর্নেষ্ট বেভিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ইয়ান

স্মাট্‌সের সঙ্গে বহু কিছু আলোচনা করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম ছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির একটি সোভিয়েত বিরোধী জোট গঠন। সেই বছরের পঁচিশে নভেম্বর স্মাট্‌স বৃটিশ পার্লামেন্টের এক গোপন অধিবেশনে এই ধরনের জোট গঠনের কথা বলেন। তখন যে আলাপ আলোচনা চলে, তাতে অংশ গ্রহণ করেন বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, লাক্সেমবুর্গ ও ফ্রান্সের পলাতক সরকার।

এই সমস্ত বৈঠক ছিল বিভেদমূলক আলোচনার কেন্দ্র। সুকঠোর গোপনীয়তার আড়ালে এখানে অগণতান্ত্রিক ও সোভিয়েত বিরোধী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হতো, অথচ বাইরের লোকের কাছে এই সম্মেলনগুলিকে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার প্রস্তুতি পর্ব বলে প্রচার করা হতো। কুইবেক সম্মেলনের পরে টাইমস্‌ পত্রিকায় লেখা হয় :

"কুইবেকের সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য যা তার ভাষ্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে, তাহলো এই যে হিটলারকে প্রথমে আঘাত করার জন্যে প্রচণ্ড রণনৈতিক চাপ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করেও দূর প্রাচ্যে বিরাট নোতুন প্রচেষ্টা সুরু করার মতো যথেষ্ট শক্তি থাকবে।"[৩]

তখন সুরু হলো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের নেতাদের মধ্যে রণনৈতিক কলাকৌশল স্থির করার জন্যে তীব্র প্রতিযোগিতা। আইসেনহাওয়ার তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন যে, "সমস্ত পক্ষের গ্রহণযোগ্য রণনৈতিক লক্ষ্যের একটা সাধারণ ধারণা স্থির করার জন্যে যে বিতণ্ডা করতে হচ্ছে তাতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। প্রত্যেকেই এখানে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন।"[৪]

র‍্যাল্‌ফ ইঙ্গারসোল লিখেছেন "সকলে কেবল অন্তহীনভাবে আলাপ করে যাচ্ছে, কেবল কথা বলে যাচ্ছে, আর সেই সব বক্তব্য কতো যে বাধা আছে তারই মধ্যে নিবদ্ধ। কিন্তু কেমন করে কাজ করা হবে সেকথা কেউ বলছে না।" তিনি আরো বলেছেন যে, "এর (বৃটেনের) জড়ত্বে আঘাত করার অর্থ হলো একটা ভিজে সারে ভর্তি থলেতে ঘুষি মারা : আঘাতে থলের গায়ে একটু গর্ত হলো. থলেটা হয়তো একটু দুলে উঠলো—তারপর যেই মুষ্টিবদ্ধ হাতটা সরিয়ে নেওয়া হলো তখন গর্তের জায়গাটা আবার ভরাট হয়ে নিটোল হয়ে গেল, যেন কেউ এখানে হাতই দেয়নি। কেবল যে আঘাত করেছে তার হাতটাতেই ময়লা লেগে গেল।"[৫]

দ্বিতীয় রণাঙ্গন বাণচাল করে দেওয়ার চেষ্টাতে জনগণ বিক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলো। বিভেদাত্মক নীতিকে আশ্রয় করে স্বতন্ত্র সম্মেলন আহ্বান করার নীতি নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা চলতে লাগলো। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ কুইবেক সিদ্ধান্তগুলি শুনে বিশেষ কোন উৎসাহ প্রকাশ করলো না, নিতান্ত শান্ত, সংযত হয়ে রইলো তারা। অনেকেই কেবল একথা বলতে থাকলো যে এই সব সম্মেলন, "যতক্ষণ পর্যন্ত না সোভিয়েত ইউনিয়ন তার যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারছে," ততোদিন একেবারে অর্থহীন।

বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার তিন প্রধান সদস্য, বৃটেন-সোভিয়েত ইউনিয়ন—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, একত্রে যুদ্ধের সমস্যা নিয়ে যে কোন আলোচনা করতে পারেনি, তা একটা অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার। তার জন্যে সমস্ত দোষ বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য। সোভিয়েত সরকার যুদ্ধ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করার জন্যে কেবল সদা প্রস্তুত বলেই জানাননি, সে বিষয়ে যথাযথ বাস্তব কর্মপদ্ধতিও গ্রহণ করেছিলেন।

যৌথ আলোচনায় তাঁদের যে আপত্তি নেই, এই রকম ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার একটা সম্মেলন আহ্বান করার উদ্দেশে বারেবার প্রস্তাব করে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোথাও আন্তরিকতার ছাপ ছিল না।

যেমন উদাহরণতঃ বলা যায় যে ষোলই ডিসেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি চুংকিংয়ে চীন, সোভিয়েত, বৃটিশ, ডাচ ও মার্কিণ প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনের প্রস্তাব করলেন। সম্মেলন সুরু হবে ঠিক পরের দিন, অর্থাৎ সতেরই ডিসেম্বর। এবং তিনি এটাও বলেন যে সম্মেলনের ফলাফল বিশে ডিসেম্বরের মধ্যে নিজ নিজ সরকারকে জানাতে হবে। সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাবের উত্তরে বলেন যে এতো অল্প সময়ের মধ্যে কোন সম্মেলন আহ্বান করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া তাঁরা সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তথ্যাদি জানানোর জন্যে অনুরোধ করেন।* কিন্তু সোভিয়েতের এই বার্তার কোন জবাব আসেনি।

কিছুদিন পরে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার—সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন—এই ত্রিশক্তির সরকারের প্রধান নেতাদের এক বৈঠকের কথা বলেন। যদিও অনেক বাস্তব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের আলোচনা এই

তিন দেশের মন্ত্রী ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের পর্যায়ে হতে পারতো। সম্মেলনের স্থান হিসাবে বেশ কয়েকটি জায়গার সুপারিশ করা হয়, যথা আলাস্কায় ফেয়ারব্যাঙ্কস, কায়রো, খার্তুম, ইরিত্রিয়ায় আসমারা, বাগদাদ ও আঙ্কারা। কিন্তু দূরত্বের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের একটিও গ্রহণ যোগ্য মনে করেনি। উইনষ্টোন চার্চিল সোভিয়েত সরকারের প্রধানের কাছে, উনিশে জুন উনিশ শ' তেতাল্লিশ একটি বাণীতে স্পষ্ট ভাবে বলেন যে সোভিয়েত সরকার এই ধরনের সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে ঠিক কাজই করেছেন। তারপরে তিনি স্কটল্যাণ্ডের উত্তরে প্রধান নৌ ঘাঁটি বন্দর, স্কাপাফ্লো'র নাম প্রস্তাব করেন।"

সে যাই হোক, সোভিয়েতের সামরিক সাফল্য, প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলি সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে আলোচনা করার জন্যে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারকে বাধ্য করে। উনিশ শ' তেতাল্লিশের দ্বিতীয়ার্ধে মস্কোয় সোভিয়েত, বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধিদের মধ্যে একের পর এক নানা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত বৈঠক এই মৌল সত্যই সপ্রমাণ করে যে সমাজ ব্যবস্থার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যুদ্ধ পরিচালনা ও যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের সমাধানে বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন করা সম্ভব এবং কাম্যও বটে।

মস্কো পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের (উনিশ থেকে তিরিশে অক্টোবর উনিশ শ' তেতাল্লিশ) প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল এই তিন প্রধান শক্তির মধ্যে সামরিক সহযোগিতা। সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরের মতো এখানেও, হিটলার ও তাঁর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় ত্বরান্বিত করার সপক্ষেই জোরালো ভাবে অভিমত প্রকাশ করে। মার্কিণ ও বৃটিশ মুখপাত্ররা, সোভিয়েত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তিগ্রাহ্য মতামত উপস্থিত করতেই পারেন নি। সম্মেলন শেষের বিবৃতিতে বলা হয় যে স্বাক্ষরকারী সরকারগণ দ্রুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটানো তাঁদের প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করেন।

ত্রিশক্তির সামরিক কার্যক্রমে সামঞ্জস্য বিধানের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং সোভিয়েতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টাকে সম্প্রসারিত করে ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার কাজ ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

সম্মেলন যুদ্ধশেষেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুত হয়।

সম্মেলনের বিবৃতিতে বলা হয় যে স্বাক্ষরকারী দেশগুলির পক্ষে এটি অবশ্য প্রয়োজন যে, তাদের জাতীয় স্বার্থে এবং সমস্ত শান্তিকামী দেশগুলির স্বার্থে যুদ্ধ পরিচালনায় যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বর্তমান আছে তাকে যুদ্ধোত্তর কালেও বজায় রাখতে হবে কারণ একমাত্র সেই সহযোগিতার ভিত্তিতেই শান্তি স্থায়ী হতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকটি দেশের জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।"[৮]

উনিশে অক্টোবর উনিশ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রপ্তানী সম্পর্কে লণ্ডনে তৃতীয় আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আলাপ আলোচনাকালে সোভিয়েত সরকার উপস্থিত প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে রপ্তানী বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক, উনিশ শ' তেতাল্লিশে তার পরিমাণ আরো কমে গেছে এবং সোভিয়েতের চমকপ্রদ সামরিক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার কোন গুরুত্বই আর চোখে পড়েনা। নোতুন চুক্তিতে তাই আরো বর্দ্ধিত হারে রপ্তানীর কথা বলা হয়।

মস্কোয় ত্রিশক্তি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন পূর্ব ইউরোপের সমস্যাবলী নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। চার্চিলের নির্দেশানুসারে বৃটেনের অ্যান্টনী ইডেন, তুরস্কের সহযোগিতায় দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অভিযান চালানোর বিষয়ে সোভিয়েত ও আমেরিকার সম্মতি লাভের জন্যে চেষ্টা করেন। সোভিয়েত প্রতিনিধি জবাবে বলেন যে বৃটিশ পরিকল্পনা সামরিক স্বার্থের বিচারে রচিত হয়নি। শুধু তাই নয় জনগণের ইচ্ছা ও স্বার্থের সঙ্গে এর কোন উদ্দেশ্যগত সঙ্গতি নেই। সোভিয়েত মুখপত্র পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার বিষয়েই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

মার্কিণ ও বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়, শত্রুভাবাপন্ন পলাতক পোলিশ সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্যে সোভিয়েত সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সোভিয়েত পোল্যাণ্ড সম্পর্কের প্রকৃত উন্নতির দিকে তাঁদের কোন লক্ষ্য ছিলনা। তাঁরা যা চাইছিলেন তা হলো এই যে যুদ্ধ শেষে, লণ্ডনে পলাতক ও আশ্রিত গোষ্ঠী যেন পোল্যাণ্ডে ক্ষমতা দখল করতে পারে। সোভিয়েত সরকার এ প্রস্তাবে সম্মত হননি।

নিজেদের মধ্যে তীব্র মতভেদ থাকা সত্বেও, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন একটি ড্যানিয়ুবীয় রাষ্ট্রসংসদ গঠনের প্রস্তাব বিবেচনার্থে পেশ করে। তাদের

ধারণা অনুযায়ী প্রস্তাবিত ড্যানিয়ুবীয় রাষ্ট্র সংসদ অষ্ট্রিয়ার নেতৃত্বে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করতে পারবে বলে মনে হয়েছিল। অন্য ভাবে বলা যায় যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ কৃত্রিম উপায়ে অতীতের অষ্ট্রিয়াহাঙ্গেরীর পুরুজ্জীবনের সম্ভবনা দেখছিলেন। আসলে এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তা ছিল মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা ও ভ্যাটিক্যান।

উনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকেই মার্কিণ শাসকবর্গ ও ভ্যাটিক্যান মধ্য ইউরোপে একটা ক্যাথলিক রাষ্ট্র গঠন করে হ্যাপ্‌সবার্গ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্যে পরিকল্পনা করছিলেন। এই রাষ্ট্র অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, ব্যাভেরিয়া, চেকো-শ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া নিয়ে গঠিত হবে কথা ছিল। ইউরোপে একে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার কথা ছিল। জনৈক বৃটিশ ইতিহাসবিদ বলেছেন যে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট মনে করতেন যে প্রথম মহাযুদ্ধের পর অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রকে ভেঙ্গে দেওয়াটা একটা চরম ভুল হয়েছে। তিনি ড্যানিয়ুবীয় রাষ্ট্রসংঘের পরিকল্পনা করেছিলেন, ড্যানিয়ুব অঞ্চলকে সংগঠিত, ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে। হ্যাপসবার্গ রাজতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে তেমন কিছু আগ্রহান্বিত ছিলেন না তিনি তবে "যদি এই অঞ্চলকে পুনর্গঠিত করতে এটি (রাজতন্ত্র) সাহায্য করে, তাহলে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাঁর কোন আপত্তি ছিল না।"[৯]

বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল যে মার্কিণ সরকার হ্যাপসবার্গদের আকাঙ্ক্ষায় আপত্তি করা দূরে থাক সর্বতোভাবে তাদের উৎসাহ যুগিয়ে গেলেন। উনিশ শ' চল্লিশে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সিংহাসনের জাল দাবীদার অটো হ্যাপ্‌সবার্গকে হোয়াইট হাউসে আপ্যায়িত করলেন। মার্কিণ যুদ্ধদপ্তর সরকারীভাবে অটোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো। উনিশ শ' বিয়াল্লিশের নভেম্বরে যুদ্ধদপ্তর অটোকে পরামর্শ দেয় যে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের সামরিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করার জন্যে তাঁর একটা অষ্ট্রিয় বাহিনী গঠন করা উচিত। কিন্তু এই উপদেশ কাজে লাগানো গেল না। তা সত্ত্বেও হ্যাপসবার্গ ও অন্যান্য অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীয় রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সরকারীভাবে যোগাযোগ বজায় রাখা হতে লাগলো। হ্যাপ্‌সবার্গ রাজতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনাতে ভ্যাটিক্যানের উৎসাহ ছিল খুব বেশি। তাঁর রোমে অবস্থান-কালে, ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশে, মার্কিণ সরকারের নির্দেশক্রমে

কার্ডিন্যাল ফ্রান্সিস স্পেলম্যান, পোপ দ্বাদশ পায়াসের সঙ্গে এবিষয়ে গভীরভাবে খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করেন।

কিন্তু অস্ট্রিয়া সম্পর্কে মার্কিণ সরকারের আরো একটা পরিকল্পনা ছিল—তা হলো একে জার্মাণীর অঙ্গীভূত করে রাখা। হোহেনলোহের সঙ্গে আলোচনায় এ্যালেনডালেস সেটি প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিকল্পনা দু'টির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন—তা হলো ইউরোপে এমন একটি শক্তি কেন্দ্র গঠন করা, যাকে মার্কিণ একচেটিয়া কারবারীদের স্বার্থে যে কোন দিকে সম্প্রসারণের জন্যে কাজে লাগনো যাবে। তাই অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরীর পুনর্গঠনকে মনে করা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে একটা হাতিয়ার, যেটা সাম্রাজ্যবাদ ইউরোপে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবে এবং যাকে কেন্দ্র করে মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে ক্যাথলিকবাদের প্রচার ও প্রসার ঘটানো যাবে।

সোভিয়েত্ সরকার বলেন যে কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি হবে তো সেখানকার জনগণই ঠিক করবে। জনগণকে বাদ দিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। সোভিয়েত মুখপত্র আরো বলেন যে বাইরে থেকে চাপ দিয়ে কিম্বা বিদেশী হস্তক্ষেপে কৃত্রিম "যুক্তরাষ্ট্র" গড়ে তোলা অন্যায় এবং বিপজ্জনক। পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন অস্ট্রিয়া সম্পর্কে একটি ঘোষণার কথা বলে এবং মস্কো সম্মেলনে তাই গৃহীত হয়।

ঘোষণাপত্রে এই তিন সরকারের এই ইচ্ছা প্রকাশিত হলো যে সেখানে, "পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম অষ্ট্রিয়ার, যার জনগণ নিজেরা, এবং অনুরূপভাবে প্রতিবেশী কোন দেশে যেখানে অনুরূপ সমস্যা দেখে দেবে সেখানকার জনগণ, সেই ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় সচেষ্ট হবে যা শান্তিকে স্থায়ী করার জন্যে একমাত্র বনিয়াদ বলে মনে হতে পারে।"[১০]

ঘোষণাপত্রে অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধপূর্ব কালের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক সমর্থিত জার্মাণীর সঙ্গে একত্রিকরণ (Anschluss) বাতিল করে, তার রাষ্ট্রিক অস্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করার কথা বলা হলো। ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত মৌল নীতিগুলি অনুসরণ করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন যুদ্ধ শেষে অষ্ট্রিয়ার জাতীয় স্বার্থ ও অধিকার রক্ষার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁড়ালো, যখন ইঙ্গ-মার্কিণ ও পশ্চিম জার্মাণী একটা নোতুন অ্যান্স্লাস্ বা একত্রিকরণ সম্ভব করতে তৎপর হয়েছিল।

ঘোষণাপত্রে বলা হলো : "অষ্ট্রিয়াকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে হিটলার জার্মাণীর পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করার জন্যে সে তার দায়িত্ব এড়াতে পারবে না এবং যুদ্ধশেষে চূড়ান্ত পর্যায়ে মীমাংসার সময় তার নিজের মুক্তির জন্যে সে কি করেছে তার হিসাব নেওয়া হবে।"[১১]

মস্কো সম্মেলনে মার্কিণ প্রতিনিধিদল উপনিবেশের সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রাচ্যের জনগণের উপর বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা যে ক্ষমতা ভোগ করতো তাকে দুর্বল করে, উপনিবেশের জনগণের উপর নিজেদের ঔপনিবেশিক আধিপত্য বিস্তারের চরম উদ্দেশ্য নিয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকবর্গ মস্কো সম্মেলনে উপনিবেশের জনগণের দরদী বন্ধু, স্বার্থরক্ষা-কারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে বিশেষ তৎপর ছিলেন। সমস্ত উপনিবেশের মানুষের মুক্তিদাবী করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রস্তাব পেশ করে। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল এই মার্কিণ প্রস্তাব অনুমোদন করেন। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে বিদেশী শাসন মুক্ত হওয়ার জন্যে উপনিবেশের জনগণ এই প্রস্তাবকে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু বৃটিশ প্রতিনিধিদল ঔপনিবেশিক সমস্যা আদৌ আলোচনা করতে গররাজী হওয়ায়, সমস্ত সমস্যাটির বিচার বিবেচনা মুলতুবী রাখা হয়।

তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যুদ্ধশেষে সাধারণ ভাবে নিরাপত্তা বজায় রাখার পন্থা ও উপায় সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং শান্তি সুরক্ষিত করার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেন। মার্কিণ সরকার এতে খুবই উৎসাহ দেখান। মস্কো সম্মেলন সুরু হওয়ার মাসখানেক পূর্বে মার্কিণ কংগ্রেস ফুলব্রাইট প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাবে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে একটা ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে পর্যাপ্ত শক্তির অধিকারী একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার কথা বলা হয়, যাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার সংবিধান সম্মত উপায়ে অংশ গ্রহণ করতে পারে।[১২] এই প্রস্তাবিত সংস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করবে আশা করেছিল। কিন্তু লীগ অব্ নেশন্‌সে বৃটিশ সরকারের যে মুখ্য ভূমিকা ছিল, তা কোনমতে এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ছেড়ে দিতে বৃটেন রাজী ছিল না। আসন্ন মস্কো সম্মেলন প্রসঙ্গে চার্চিল, ইডেনের কাছে প্রেরিত এক লিপিতে লিখেছিলেন যে, "আমরা দৃঢ়চিত্তে লীগ অব্ নেশন্‌সের অনুরূপ সংস্থার পক্ষে থাকবো।"[১৩]

সাধারণ নিরাপত্তার প্রশ্নে মস্কো সম্মেলন যে ঘোষণাপত্র রচনা করে তাতে

স্বাক্ষর করলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীন দেশ। ঘোষণাপত্রে "যতো শীঘ্র সম্ভব সমস্ত শান্তিপ্রিয় দেশের সার্বভৌম সমানাধিকারের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান" গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[১৪]

এই ঘোষণাপত্রের যে বিশেষ মূল্য ছিল তা সহজেই অনুমেয়। কারণ এতে শুধু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠন করার প্রয়োজনীয়তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, এতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় আগ্রহী সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মৌল নীতি কি হবে, তার কথাও বলা হয়েছিল।

ঘোষণাপত্রের ছয় সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছিল যে যুদ্ধ শেষের পরে স্বাক্ষরকারী সরকারগুলি "এই ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্য সাধক বিষয় ছাড়া এবং যৌথভাবে আলাপ আলোচনা না করে, তাদের সামরিক শক্তি অন্যদেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে প্রয়োগ করবে না।"[১৫]

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন মারাত্মকভাবে এই ঘোষণাপত্র অমান্য করে অন্য দেশে যুদ্ধের ঘাঁটি নির্মাণ করেছে, সৈন্য পাঠিয়েছে এবং সেই সৈন্যদের অন্য দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্যে ব্যবহার করেছে। ঘোষণাপত্রের জঘন্যতম বিচ্যুতি ঘটিয়েছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার স্বাধীনতা প্রিয় মানুষদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে। আর সেই আক্রমণে সহযোগী হয়েছে এই ঘোষণাপত্রের আরেকজন স্বাক্ষরকারী—বৃটেন।

ইটালীর আত্মসমর্পণ প্রমাণ করে দিল যে জার্মাণ ফ্যাশিবাদ এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে, এবং যে "নোতুন সভ্যতার" পত্তন তারা করেছিল তা আজ বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জার্মাণদের কবলমুক্ত ইটালীতে মার্কিণ ও বৃটিশরা যে অগণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করছিল, তা ফ্যাশিবিরোধী মোর্চার উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করছিল। তাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়ে পড়ছিল যে ইঙ্গ-মার্কিণরা স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্রভাবে কাজ করার জন্যে ঝুঁকে পড়ছে। এই স্বাতন্ত্র্যরোধ করে সামঞ্জস্য বজায় রাখার জন্যে সোভিয়েত সরকার একটি ত্রিশক্তি প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব করেন। মস্কো সম্মেলনে ইউরোপীয় সমস্যার বিচার ও তাদের সমাধানে যৌথভাবে সুপারিশ করার জন্যে লণ্ডনে একটি ইউরোপীয় পরামর্শদান কমিশন (European Advisory Commission) গঠনের প্রস্তাব

গৃহীত হয়। ইটালীর জন্যে একটি পরামর্শদান পরিষদও গঠিত হয়। প্রথমে তার সদস্য ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটি। পরে গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়াকেও সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে ইটালী সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। এতে আপোষ রফার ছাপ পড়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার্য যে অভ্রান্তভাবে ঘোষণাপত্রটি গণতান্ত্রিক শক্তির জয় সূচিত করেছিল। ঘোষণাপত্রে ইটালীর গণতন্ত্রীকরণের জন্য কয়েকটি কার্যক্রমের কথা বলা হয় যাতে সে দেশ থেকে ফ্যাশিবাদের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হতে পারে।

এই ঘোষণাপত্র সম্পর্কে বাত্তাগলিয়া লিখেছেন যে, "ইটালীর অতি জটিল ও পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সমস্যাগুলির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা করার জন্যে ঘোষণাপত্রটি বিশেষ গুরুত্বলাভ করে। যেরকম প্রথমেই বলতে হয় যে ইটালী জাতির যে অংশ ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে সংগ্রাম করছিল, ঘোষণাপত্রে তাদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইটালীর জনগণ ফ্যাশিবাদের নিতান্ত বশম্বদ ছিল এবং যতোদিন ফ্যাশিবাদ সাফল্য অর্জন করেছে ততোদিন তারা এর সমস্ত নীতিকে সমর্থন করেছে, স্বাগত জানিয়েছে, সেই চালু ধারণাও ঘোষণাপত্রে অগ্রাহ্য করা হয়। এবং আরো যে ধারণা চলতি ছিল যে অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন ও শিক্ষিত কয়েকজন মানুষ ছাড়া ফ্যাশিবাদকে আর কেউ প্রতিরোধ করেনি, ঘোষণাপত্র সেটিও বর্জন করে। বিপরীতপক্ষে এবং অত্যন্ত সঠিকভাবে তাতে বলা হয়েছিল জনগণের এক বিরাট অংশের প্রতিরোধের ভূমিকা। কূটনৈতিক নীতির যথার্থতা বজায় রাখার জন্যে স্পষ্ট করে সেই জনগণের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে না পারলেও, ঘোষণাপত্রের বয়ান থেকে এটা বুঝতে কোনমতে ভুল হয় না তারা হলো ইটালীর শ্রমিকশ্রেণী। এই শ্রেণীর ভূমিকার স্বীকৃতি দানের ফলে, তাদের একটা অধিকার জন্মে গেল যে সরকারের মধ্যে নিতে হবে তাদের প্রতিনিধি এবং সাম্প্রতিক ও আগামী দিনের সমস্ত সংগ্রামের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দাবীতে তাদের কথাকেও যথাযোগ্য মর্যাদা ও গুরুত্ব দিতে হবে।"[১৬]

অবসান ঘটলো ইটালীতে মিত্রপক্ষের অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক শাসন সংস্থার কর্তৃত্ব। আর এই এই ঘটনার পরে ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিণ অবতরণের পরে এরকম কোন সংস্থা গড়ে তোলার বিরুদ্ধে একটা নজীরও রয়ে গেল।

এগারোই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে দক্ষিণ ইটালীতেও, ইটালীয় শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হলো।

সোভিয়েতের উদ্যোগে হিটলারের অনুগামীরা যে সব অত্যাচার অপরাধ করেছে, তার জন্যে তাদের চূড়ান্ত দায়িত্ব নির্দেশ করে, একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। তাতে বলা হয় যে, যে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরাধীরা নানা অপরাধ করেছে, তাদের বিচার করবে সেই সেই দেশের মানুষ। আর অপরাধীদের মধ্যে যারা পালের গোদা, মিত্রপক্ষ যৌথ ভাবে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করবে। যুদ্ধাপরাধীদের এই ঘোষণাপত্রে সতর্ক করে দেওয়া হলো যে তারা কোনমতেই শাস্তি এড়াতে পারবে না। কারণ এই তিন মিত্রশক্তি "পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলে তাদের পিছু ধাওয়া করে, ন্যায়ের জন্যে, বিচারের জন্যে তাদের অভিযোগকারীদের সামনে হাজির করবেই।"[১৭]

জার্মাণ যুদ্ধাপরাধী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে এটা ছিল একটা মর্মান্তিক আঘাত।

ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার ইতিহাসে মস্কোয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনকে একটি রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলা যেতে পারে। সম্মেলন প্রমাণ করে দিল যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্ভব এবং কল্যাণকর। এর সিদ্ধান্তগুলি যুদ্ধোত্তর কালে গণতন্ত্রের কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্যে সমস্ত প্রগতিশীল মানুষদের আন্দোলনকে সাহায্য করে। ইঙ্গ-সোভিয়েত-মার্কিণ মৈত্রীকে শক্তিশালী করে, তার শত্রুদের একেবারে চরম আঘাত হানে এই সম্মেলন। প্রাভ্‌দায় তাই লেখা হয়ে ছিল:" সমস্ত স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষের স্বার্থে, মিত্রপক্ষের শক্তিকে সংঘবদ্ধ করে, সম্মেলন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়ে ছিল।"[১৮]

॥ দুই ॥

মস্কো সম্মেলন তেহেরানে নির্দিষ্ট প্রথম ত্রিশক্তির ক্রমিক শীর্ষ সম্মেলনের পথ প্রশস্ত করে। তেহেরান সম্মেলন সম্ভব করেছিল সোভিয়েতের সামরিক সাফল্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিস্তারে সোভিয়েত পররাষ্ট্র নীতির অবদান ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের জনগণের উত্তরোত্তর প্রবল চাপ।

তেহেরানের পথে চার্চিল ও রুজভেল্ট সদলবলে বাইশে থেকে ছাব্বিশে

নভেম্বর, উনিশ শ তেতাল্লিশে কায়রোতে নিজেদের মধ্যে একদফা আলাপ আলোচনা সেরে নিলেন। এই নোতুন স্বতন্ত্র বৈঠকে, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের প্রশ্নে তেহেরানে যৌথ বক্তব্য উপস্থিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মর্কিণ সরকার চার্চিলের "বলকান কার্যক্রম" কোনমতে সমর্থন করতে পারছিলেন না। তা ছাড়া পশ্চিম ইউরোপে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ হারাতে তাঁরা সাহস করছিলেন না। রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট তাঁর পুত্রকে বলেন যে, "পশ্চিম দিক থেকে ইউরোপ" আক্রমণ করার সুযোগ সমুপস্থিত। তিনি আরো বলেন: "যেভাবে রাশিয়ায় ব্যাপারগুলি ঘটে যাচ্ছে, তাতে আগামী বসন্তকাল নাগাদ, হয়তো বা দ্বিতীয় রণাঙ্গনের কোন দরকার থাকবে না।[১৯]

একই সময়ে চিয়াং কাই-শেক কায়রোয় এসে হাজির হলেন, দূর প্রাচ্যের সমস্যাগুলি আলোচনা করার জন্যে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁকে আরো অস্ত্র-শস্ত্র ও সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দেয়।

এ ব্যাপারটা তখন নিতান্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার, জাপানী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চেয়ে, চীনের মুক্ত অঞ্চলে চিয়াংয়ের অভিযানেই অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। মার্কিণ ও বৃটিশ মুখ-পাত্ররা তাই চীনের এই একনায়কের প্রকৃত ইচ্ছা ও পরিকল্পনা কি তাই জানতে চেষ্টা করছিলেন। তাঁরা এও দেখছিলেন যে দেশে গৃহযুদ্ধে শক্তি সংগ্রহ করে লড়াই করার মতো দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনোভাব চিয়াংয়ের আছে কিনা।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক কার্যক্রমের প্রশ্নে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে নোতুন করে মতবিরোধ দেখা দিল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশে বৃটিশ সরকার প্রমাদ গুণলেন। উত্তর ব্রহ্মদেশে মার্কিণ সৈন্যরা ঢুকে পড়ুক তা বৃটিশরা চাইছিল না। চার্চিল পরিস্থিতির এই পরিবর্তন দেখে নৌ-সৈন্যের অবতরণের জন্যে দাবী করলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে এতে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মার্কিণ নৌ বহরের সাহায্যে হারানো ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য পুনর্দখল করতে পারবেন। রুজভেল্টের সঙ্গে এক আলোচনা কালে এই অঞ্চলে বৃটিশ সর্বাধিনায়ক মাউন্টব্যাটেন, বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যার্থে মার্কিণ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে দাবী জানালেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃটেন, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে মার্কিণ প্রভাব বৃদ্ধি পাবে জেনেও, উত্তর ব্রহ্মদেশে আমেরিকার সামরিক পরিকল্পনা মেনে ছিল।

পয়লা ডিসেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীনের এক যৌথ ঘোষণাপত্র কায়রোতে প্রকাশ করা হলো। ঘোষণাপত্রে জোরের সঙ্গে বলা হলো যে উনিশ শ' চোদ্দ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সুরু থেকে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যে সমস্ত দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেছে অথবা দখল করে আছে, সেগুলি থেকে জাপানকে বঞ্চিত করা হবে। তা ছাড়া মাঞ্চুরিয়া, তাইওয়ান এবং পেংহু দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি মহাচীনের যে সব ভূখণ্ড জাপান দখল করেছে, তা চীন সাধারণতন্ত্রকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অন্যান্য যে সব ভূখণ্ড জাপান জবর দখল করেছে, তাদের অধিকার থেকে জাপানকে বঞ্চিত করা হবে। সুতরাং কায়রো ঘোষণার মূল বক্তব্য হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান যে সব দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নিয়েছিল (যথা ম্যারীয়ান্না, মার্শাল ও ক্যারোলীন দ্বীপপুঞ্জ) যার উপর এখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল, সেগুলির অধিকার থেকে তাকে অপসারিত করা। এই ঘোষণার যে অংশ ছিল আরো গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো মাঞ্চুরিয়া, তাইওয়ান ও পেংহু দ্বীপপুঞ্জের চীনের মূল ভূখণ্ডের অংশ হিসাবে স্বীকৃতিদান। ঘোষণাপত্রে আরো বলা হয় যে কালক্রমে কোরিয়া স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবে। এই ত্রিশক্তি আরো ঘোষণা করলেন যে জাপান বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তাঁরা ব্যাপক সামরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন। অবিশ্যি ঘোষণাপত্রের এই অংশে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন ঘটেনি। কারণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন বা চীন, কারো সামরিক সক্রিয়তা সেখানে মাঝারী ধরনের বেশি ছিল বলা যায় না।

কায়রো ঘোষণাপত্রে মার্কিণ ও বৃটিশ শাসক চক্রের প্রকৃত লক্ষ্য, বিশেষতঃ চীনে চিয়াং কাই-শেকের জনসমর্থন হীন একনায়কতন্ত্র কায়েম করার মার্কিণ আগ্রহাতিশয্য, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের লক্ষ্যকে একটা ন্যায়নীতির ছদ্ম আবরণে রেখে প্রকাশ করা হলো। মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা আসলে চাইছিল যে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের অধিকারমুক্ত অঞ্চলগুলিকে নিজেদের পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্র ও যুদ্ধের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করতে। এটি সহজেই

বোঝা যায় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্যে এর যে গুণগত পরিবর্তন ঘটেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই ফ্যাশি বিরোধী যুদ্ধে তারা তাদের সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমকে স্পষ্ট করে খোলাখুলি বলতে পারছিল না।

তেহেরানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকারের প্রধান নেতাদের সম্মেলন, আটাশে নভেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশ থেকে পয়লা ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থায়ী হলো। সম্মেলনে সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হলো সামরিক বিষয়ে। বৃটিশ প্রতিনিধিদল তুরস্কের সহযোগিতায় দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে সামরিক অভিযান পরিকল্পনার এক ব্যাখ্যা উপস্থিত করলেন এই সম্মেলনে। সোভিয়েত প্রতিনিধি জানালেন যে দ্রুত জার্মানীকে পরাজিত করার উদ্দেশ্য ছাড়া, বৃটিশ পরিকল্পনার অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

সামরিক অর্থে বলকানে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের যৌথ অবতরণ নিতান্ত অর্থহীন। কারণ জার্মানীর পরাজয় এতে দ্রুততর করা যাবেনা। ববং এই অবতরণের ফলে আরেকটি স্থিতাবস্থা রণাঙ্গণের সূত্রপাত ঘটবে, যেমনটি ঘটেছে ইটালীতে। যেহেতু বলকানের সাধারণ পরিবেশ, পথ ঘাট, নদী, গিরিবর্ত এমনই প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে, উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব সেখানে এমনই সংকট সৃষ্টি করে যে, অবতরণকারী সৈন্যদলের পক্ষে জার্মাণ প্রতিরোধ অতিক্রম করা সম্ভব হবেনা।

চার্চিল কিন্তু সমানে বলতে থাকলেন যে বলকানের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই হবে সবচেয়ে সোজা। ইউরোপের ভৌগোলিক পরিবেশ ও সীমা-রেখার প্রতি ইঙ্গিত করে, চার্চিল বলেন যে ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে অভিযান করে যখন ইউরোপের "নরম তলপেটে"[২০] আঘাত হানা যাবে, তখন ব্রেষ্টের পথে গিয়ে কুমীরের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে লাভ কি? চার্চিলের এই উক্তির যথাযোগ্য জবাব দিয়েছিল এক মার্কিণ দেশের সংবাদপত্র, ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করে। ছবিতে দেখা যাচ্ছিল সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছে একজন মিত্রপক্ষীয় সৈন্য। আর তার পথভূমি রচনা করেছে আল্পস ও বলকানের গিরিশৃঙ্গ। কার্টুনের নীচে লেখা ছিল: "যে লোক একে নরম তলপেট বলেছেন, তাঁর মস্তিষ্ক একবার পরীক্ষা করানো উচিত।"[২১]

দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দেখানো হয়েছিল, তাদের সারবত্তা অনস্বীকার্য। বলকান অভিযান

পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলো। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের পয়লা মে'র পূর্বে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার প্রস্তাব তেহেরান সম্মেলনে গৃহীত হলো। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল যে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন সে কথা বলতে গিয়ে ব্রাড্‌লী লিখেছেন :

"এইবার সেই চরম সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। দু' বছর ধরে কতো আলোচনা, এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির পরে ওভারলর্ড, ইউরোপীয় যুদ্ধে মিত্রপক্ষের রণকৌশলের অপরিবর্তনীয় ফলশ্রুতি হয়ে দাঁড়ালো।"[২২]

সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিশ্রুতি দিল ওভারলর্ড (পশ্চিম ইউরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযান) পরিকল্পনা কার্যকরী করার সঙ্গে তাকে মদৎ যোগানোর জন্যে পূর্ব সীমান্তে বিরাট আকারে তীব্র আক্রমণ সুরু করা হবে। এতে জার্মাণরা পূর্ব রণাঙ্গন থেকে সৈন্য অপসরণ করে পশ্চিমে পাঠাতে পারবে না। এই ত্রিশক্তির সামরিক পরিষদ আসন্ন ইউরোপীয় সমরে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখতে সম্মত হলো।

তেহেরান সম্মেলনের সুরুতেই মার্কিণ রাষ্ট্রপতি জার্মানী আত্মসমর্পণ করার পরেই সোভিয়েত ইউনিয়নের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার জন্যে প্রস্তাব করলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতির এই প্রস্তাবে বলা হলো যে কিউরাইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সামরিক অভিযান চালাবে। আসলে মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা অনেক দিন ধরেই কিউরাইল দখল করার ফন্দী আঁট ছিল।

সোভিয়েত সরকার কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে মার্কিণ দেশের সমস্ত দাবী অস্বীকার করে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে ইউরোপে যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় মাস পরেই সোভিয়েত জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে। চার্চিলের স্মৃতিকথায় দেখা যায় যে তিনি সোভিয়েতের এই প্রতিশ্রুতিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।[২৩]

তেহেরানে বলকান অভিযান পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যাওয়ায়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ একটা ধাক্কা খেয়ে গেল। এরই ফলে হাঙ্গেরীর ফ্যাশিস্ত সরকারের ইঙ্গ-মার্কিণ চুক্তি অর্থহীন হয়ে যায়। জনৈক ইতিহাসবিদ দুঃখ করে লিখেছেন : "তেহেরান সম্মেলনে, ডিসেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশে বলকানের মধ্য দিয়ে মিত্রপক্ষের প্রস্তাবিত অভিযানের কার্যসূচী, স্তালিনের অনুরোধে বাতিল

করে দেওয়া হয়। ফলতঃ হাঙ্গেরীয় সৈন্যবাহিনীর বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ গ্রহণ বা কোন কিছু সামরিক সমঝোওতা গঠন করার জন্যে ধারে কাছে কোন ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যদল রইলো না" ।[২৪]

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার উভয়েই নিজের চরম স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ জার্মাণ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিয়ে জার্মাণীর খণ্ডীকরণের প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁদের ধারণা ছিল খণ্ডিত জার্মাণীর এক একটি বিচ্ছিন্ন অংশ সহজেই তাঁদের প্রভাবাধীনে আসবে। এতে তাঁদের একচেটিয়া কারবারীদের মুনাফা শিকারের স্থযোগ বাড়বে এবং আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি সফল করার পথও স্থগম হবে।

ঐক্যবদ্ধ জার্মাণ রাষ্ট্রের পরিবর্তে, রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা সম্পন্ন পঞ্চ রাষ্ট্র গঠনের একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সেগুলি হবে: "(এক) প্রাশিয়া (কিছুটা শীর্ণকায়), (দুই) হ্যানোভার ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চল, (তিন) স্যাক্সনী ও লাইপ্‌জিগ্‌ অঞ্চল, (চার) হেস-ডার্মষ্টাড্‌, হেস-কাসেল ও রাইনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অঞ্চল, (পাঁচ) ব্যাভেরিয়া, ব্যাডেন, গুটেমবার্গ ইত্যাদি। আর কিয়েল খাল, হামবুর্গ এবং রুঢ় ও সার অঞ্চল থাকবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে।[২৫] (অবিশ্যি জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বেনামদার)।

রুজভেল্ট পরিকল্পনার প্রকৃত তাৎপর্য ছিল যুদ্ধে প্রভূত মুনাফা অর্জনকারী মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের, সহজে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেওয়ার একটা স্থযোগ সৃষ্টিকারী কৌশল মাত্র।

বৃটেন প্রস্তাব করে জার্মাণীকে ভেঙ্গে তিন টুকরো করা হোক—প্রাশিয়া, দক্ষিণ জার্মাণী (ব্যাভেরিয়া, গুটেমবার্গ, প্যালাটিনেট, স্যাক্সনী ও ব্যাডেন) এবং রুঢ় অঞ্চল। চার্চিল মনে করতেন যে প্রাশিয়া একটা জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র হিসাবে থাকতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দক্ষিণ জার্মাণী ড্যানিয়ুবীয় রাষ্ট্রজোটের অংশ হতে পারে। আর রুঢ় সম্পর্কে তিনি আশা করেছিলেন যে বৃটেন তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করতে পারবে এবং তা সম্ভব হলে এর শিল্পগত শক্তি কাজে লাগিয়ে, ইউরোপ মহাদেশে একটা দারুণ ক্ষমতাশালী নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে।[২৬]

জার্মাণ জনগণের জাতীয় অধিকারের চরম সমর্থক হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মাণী খণ্ডীকরণের সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

তেহেরানে পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সীমান্ত নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের আলোচনা হয়। সোভিয়েত সরকার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ও পোলিশ জনগণের বাসভূমির ভৌগোলিক বাস্তবতার ভিত্তিতে একটা ন্যায়সঙ্গত সীমান্তের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র জোরের সঙ্গে দাবী জানায় যে পোল্যাণ্ডের সীমান্তরেখা যেন সংঘর্ষ ও যুদ্ধের পথে দেশটিকে না টেনে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার দিকে নিয়ে যায়। পোলিশ জনগণের আইনসঙ্গত দাবীকে সমর্থন করে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল পোল্যাণ্ড পশ্চিমের দিকে যে অঞ্চল হারিয়েছে তার প্রত্যার্পণের দাবী জানান। তাঁরা প্রস্তাব করেন যে পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত ওডার ও নিসে (Oder and Neisse) নদী বরাবর হওয়া উচিত।

ত্রিশক্তি তেহেরান ঘোষণাপত্রে বলা হলো যে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রর ও বৃটেনের সরকার "অনাগত বহুকালের মানুষের জীবন থেকে যুদ্ধের ভয় নির্বাসিত করার জন্যে এবং পৃথিবীর সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের শুভেচ্ছার ভিত্তিতে শান্তি স্থাপন করার জন্যে" তাঁদের চরম দায়িত্ব স্বীকার করে নিচ্ছেন।[২৭]

সম্মেলনে ইরান সম্পর্কেও একটি ঘোষণাপত্র গৃহীত হলো। এতে হিটলার বিরোধী মৈত্রীতে ইরানের সাহায্যের কথা উল্লেখ করা হয়, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশাগত সাহায্য ও মালপত্র পৌঁছে দেওয়ায় ইরান যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তার প্রশংসা করা হয়। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধ শেষের পরেও ইরানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দান করতে ত্রিশক্তি সম্মত হন এবং তাঁরা ইরানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডত্ব রক্ষা করার জন্যে নিজেদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

তেহেরান সম্মেলন ছিল একটা বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই প্রথম তিন প্রধান শক্তির প্রধান নেতারা সমবেত হয়ে প্রমাণ করলেন যে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যার যৌথ সমাধান প্রচেষ্টা অত্যন্ত কার্যকরী।

সম্মেলন শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে চার্চিল ও রুজভেল্ট আরেক দফা কায়রোতে বৈঠকে মিলিত হলেন। তেহেরান সম্মেলনের ফলশ্রুতির আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গনের বিষয়ে তাঁরা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে, বাস্তব অবস্থায় নির্দিধেই

নীতি স্থির করবেন। চার্চিল তখনো পর্যন্ত তাঁর মানস পুত্র বলকান অভিযান কার্যক্রমের কথা ভুলতে পারেননি। তাই প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে কায়রোতে আরেকটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। তাতে যোগ দিলেন চার্চিল, রুজভেল্ট ও তুরস্কের রাষ্ট্রপতি ইসমেট ইনোনু। দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অভিযান চালানোর বিষয়ে তাঁরা তুরস্কের যোগদান নিয়ে আলোচনা করেন। মার্কিণ একচেটিয়া-পতিদের তুরস্কে প্রভাব ও বাণিজ্য বিস্তারের স্বার্থের দিকে নজর রেখে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তুরস্ককে প্রচুর অস্ত্র শস্ত্র পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিল।

মস্কো ও তেহেরান সম্মেলন সোভিয়েতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও প্রতি-পত্তির স্বাক্ষর বহন করে। স্বাধীনতার মহান সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সারা পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতির সমর্থন লাভ করে।

মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামেরত মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার সার্থক পরিচয় মূর্ত হয়ে ওঠে, মস্কোয় বারোই ডিসেম্বর, উনিশ শ' তেতাল্লিশে স্বাক্ষরিত সোভিয়েত-চেকোশ্লোভাক্ বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সাহায্যদান ও যুদ্ধোত্তর কালে সহযোগিতা বৃদ্ধির চুক্তিতে।

চেকোশ্লোভাকিয়ার পক্ষে রাষ্ট্রপতি বেনেসের এই চুক্তিতে স্বাক্ষরদানে বাধা সৃষ্টি করার জন্যে, বৃটিশ সরকার তাঁর "মস্কো সফরে বাধা দিতে থাকেন।"[২৮] কিন্তু তাঁদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া পরস্পরকে জার্মানী ও তার ইউরোপীয় মিত্র গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সামরিক ও অন্যান্য সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হয়। তা ছাড়া হিটলার বা অনুরূপ কোন সরকারের সঙ্গে কিম্বা জার্মানী বা তার কোন ইউরোপীয় মিত্রপক্ষের সঙ্গে, তারা পরস্পরের সম্মতি ব্যতিরেকে কোন আলাপ আলোচনা, শান্তি চুক্তি বা যুদ্ধ বিরতির চুক্তি সম্পাদন করতে অস্বীকৃত হয়।

চুক্তির তিন সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছিল :

"ষোলই মে, উনিশ শ' পঁয়ত্রিশে প্রাগে স্বাক্ষরিত চুক্তির যুদ্ধপূর্বকালীন শান্তি ও পারস্পরিক সাহায্যদান নীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে, স্বাক্ষর-কারীরা অঙ্গীকার করছেন যে, যুদ্ধোত্তর কালে যদি তাঁদের একজন, জার্মানী অথবা অন্য কোন দেশ যারা জার্মানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা অন্য কোন ভাবে তার পূর্ব মুখী অভিযান নীতির (Drang nach Osten) সঙ্গে যুক্ত হয়ে,

যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, সেই অবস্থায় অপর স্বাক্ষরকারী, এই যুদ্ধে জড়িত স্বাক্ষরকারীকে ত্বরায় তার আয়ত্তাধীন সব রকমের সামরিক ও অন্যান্য সাহায্যদান করবে।" ২৯

চুক্তিতে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপকতম ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলা হয় এবং যুদ্ধশেষে পরস্পরকে দুই দেশ সম্ভাব্য সব রকমের অর্থনৈতিক সাহায্য দান করতে স্বীকৃত হয়।

বিশ বছরের জন্যে স্বাক্ষরিত এই চুক্তি চেকোস্লোভাকিয়ার জনগণের জীবনে, তার স্বাধীন রাষ্ট্রিক সত্তা প্রতিষ্ঠায় ও সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে প্রভূত ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ঘটনা হিসাবে উপস্থিত হয়। এই চুক্তি চেকোস্লোভাকিয়ার জাতীয় অধিকার, তার জনগণের জীবনধারা ও কর্মপ্রচেষ্টাকে নির্ভরযোগ্য নিশ্চয়তাদানে সচেষ্ট হয়। জার্মাণীর ফ্যাশিস্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ও চেকোস্লোভাকিয়ার মানুষ যৌথভাবে যে রক্তক্ষয়ী অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিবিড় ও স্থায়ী বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়েছে এই চুক্তি তাকেই একটা অনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে মাত্র। ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থায়ী ও সুরক্ষিত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ এই চুক্তি, সাম্রাজ্যবাদের যে কোন পূর্বমুখী অভিযান পরিকল্পনার সামনে একটা নির্ভরযোগ্য শক্ত বাধার প্রাচীর তুলে দেয়। ফলে চুক্তিটি যেমন সোভিয়েতের মানুষের সমর্থন লাভ করে তেমনি চেকোস্লোভাকিয়াতেও তা উদ্বুদ্ধ করে দেশপ্রেমিক অভিনন্দন।

* * * *

ভল্গায় সোভিয়েত বিজয় যুদ্ধের যে মোড় ঘুরিয়ে দেয়, উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েতের গ্রীষ্মকালীন সামরিক অভিযান সেই যুদ্ধের উপর টেনে দেয় তার নিয়তি নির্দিষ্ট যবনিকা। ফ্যাশি বিরোধী মৈত্রীর স্বার্থেই সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মাণীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তার রণনৈতিক উদ্যোগ।

ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের স্বদেশের মাটি থেকে বিতাড়িত করার ব্রতে উদ্বুদ্ধ সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী, সোভিয়েতের মানুষের তথা সারা পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীনতা প্রিয় মানুষের যৌথ স্বার্থের সংরক্ষণের জন্যে চূড়ান্ত বিজয়ের পথে সমস্ত বাধা অপসারিত করতে থাকে।

১. হাওয়ার্ড ওয়াটসন অ্যামব্রুষ্টার : Treason's Peace, German Dyes and American Dupes, নিউইয়র্ক, বীচহার্ষ্ট প্রেস, ১৯৪৭
২. জে, এফ মন্টগোমারী : Hungary the Unwilling Satellite, নিউইয়র্ক, ১৯৪৭
৩. টাইমস পত্রিকা, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৪৩
৪. ম্যাটলোফ্ ও স্নেল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৯
৫. র‍্যালফ্ ইঙ্গারসোল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২
৬. Correspondence : ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭
৭. ঐ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৪-৩৫
৮. Soviet Foreign Policy : ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪০
৯. মন্টগোমারী : উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২১৫
১০. Soviet Foreign Policy, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৩
১১. ঐ, ঐ
১২. Congressional Record, ৮৯তম খণ্ড, ষষ্ঠ ভাগ, ১৯৪৩, পৃঃ ৭৭০
১৩. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫১
১৪. Soviet Foreign Policy, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪২
১৫. ঐ ঐ
১৬. বাভাগলিয়া : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬২
১৭. Soviet Foreign Policy. ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬২
১৮. প্রাভ্দা, ২রা নভেম্বর, ১৯৪৩
১৯. ইলিয়ট রুজভেল্ট : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৫৬
২০. এম্. ক্লার্ক : Calculated Risk, লণ্ডন, ১৯৫৬, পৃঃ ৫১
২১. এ. ওয়েডেমেয়ার : Wedemeyer Reports, নিউইয়র্ক, ১৯৫৮, পৃঃ ২২৮
২২. ব্রাড্লী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০১
২৩. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৪
২৪. মন্টগোমারী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৩
২৫. আর. ই. শেরউড : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৯৭
২৬. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪০১
২৭. Soviet Foreign Policy : ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৮
২৮. আর. এইচ. ব্রুস লকহার্ট : Comes the Reckoning, লণ্ডন ১৯৪৭, পৃঃ ২৭০
২৯. Soviet Foreign Policy : ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫১

পঞ্চম খণ্ড

গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সাফল্য

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ উনিশ শ' চুয়াল্লিশের আক্রমণ ধারা

উনিশ শ' চুয়াল্লিশ ইতিহাসের পাতায় সোভিয়েতের চূড়ান্ত বিজয় সাফল্যের স্বাক্ষর বহন করে ভাস্বর হয়ে থাকবে। সোভিয়েত আক্রমণের তীব্রতায় নাৎসীদের যুদ্ধযন্ত্র সেদিন বিকৃত রূপ ধারণ করেছিল। জার্মাণীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি তখন তীব্র আক্রমণের সামনে ছত্রভঙ্গ, পলায়নপর। সমগ্র সোভিয়েতভূমি শত্রু সৈন্যমুক্ত। যুদ্ধের ক্ষেত্র তখন শত্রুর নিজের দেশে সরে গেছে।

যুদ্ধের এই নোতুন পর্যায়ে সেদিন সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি সক্রিয় হয়ে উঠলো একটা অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে হিটলার জার্মাণীর সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত পরাজয় সম্ভব করে, ফ্যাশিবাদের নিপীড়ন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। তারই প্রচেষ্টায় ক্রমেই সংঘবদ্ধ হতে লাগলো ফ্যাশি বিরোধী মোর্চা, মৈত্রী। সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর নিরন্তর যুদ্ধ প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সোভিয়েতের কূটনীতি তার আন্তর্জাতিক মর্যাদাকে আরো উন্নত করে তুললো।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের সূচনায় দেখা গেল সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গন আরো বিস্তৃত অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। সেই সীমানা স্বির (Svir) নদী বরাবর অগ্রসর হয়ে, ইল্‌মেন হ্রদের কাছ দিয়ে, ভেলিকিয়ে লুকির পশ্চিম দিয়ে ভিতেবস্কের পূর্ব পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। অন্য জায়গায় তা গোমেলের পশ্চিম দিয়ে ঝিতোমির, চেরকাস্মি হয়ে জাপোরোঝিয়ে পর্যন্ত বিস্তৃত। কৃষ্ণ সাগরীয় রঞ্চলে তা ছড়িয়ে পড়েছে খেরসন্ শহর পর্যন্ত। আগের মতোই নাৎসী জার্মাণীর সমগ্র সামরিক শক্তি প্রায় দু'শ সাতান্ন ডিভিসন, যার মধ্যে ছিল দুশ' সাত ডিভিসন জার্মাণ সৈন্য ও হাঙ্গেরী, রুমেনিয়া এবং ফিনল্যাণ্ডের মোট পঞ্চাশ ডিভিসন সৈন্য,—সমবেত হয়েছে সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েতের মূল রণনৈতিক লক্ষ্য ছিল সমগ্র সোভিয়েত ভূমিকে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের থেকে মুক্ত করে, পূর্ব ইউরোপের জনগণকে দখলদার সৈন্যদের বিরুদ্ধে সাহায্য করা।

জার্মাণ সামরিক নেতৃত্বের অধীন সংরক্ষিত বাহিনী বলতে যে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই এবং তাঁরা যে এই সুদীর্ঘ যোগাযোগ ব্যবস্থা আর অক্ষুণ্ণ রাখতে অপারগ, সোভিয়েতের সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদ সে কথা জেনেই রণাঙ্গনের বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক আঘাত হানবার সিদ্ধান্ত করলেন।

জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে সোভিয়েতে সৈন্যবাহিনী লেলিনগ্রাদ ও নোভ্‌গোরোদে ব্যাপকভাবে আক্রমণ সুরু করলো। লক্ষ্য ছিল তাদের লেলিনগ্রাদের উপর শত্রুর গোলাবর্ষণ স্তব্ধ করে দিয়ে শহরটিকে অবরোধমুক্ত করা এবং সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনের উত্তরাংশে জার্মাণ সৈন্যের রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশ চূর্ণ বিচুর্ণ করে, অন্যান্য অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা। সোভিয়েতের লেলিনগ্রাদ, ভোলখোভ্‌ ও দ্বিতীয় বাল্টিক রণাঙ্গনের সৈন্যরা মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো জার্মাণ বাহিনীর নর্ভ শাখা ও কারেলীয় সংযোজক শাখার সামনে। শত্রু সৈন্যের সারি সেখানে জঙ্গলাকীর্ণ জলাভূমির মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে গভীরতায় ও সামারিক সক্রিয়তার বিচারে যথেষ্ট সুরক্ষিত ছিল।

আক্রমণ সুরু হলো চোদ্দই জনুয়ারী, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুর শক্তিশালী, সুরক্ষিত ব্যূহ ভেদ করে তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গভীরে প্রবেশ করলো। লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনের সৈন্যরা তাদের অঞ্চলে শত্রুসৈন্যকে বেষ্টন করে নির্মূল করে দিল। ভোলখোভ্‌ রণাঙ্গনের সৈন্যরা নোভ্‌গোরোদে শত্রুদের পরাজিত করলো। একুশে জানুয়ারী দেখা গেল সোভিয়েত সৈন্যরা কাপোরস্কি উপসাগর থেকে নোভোসোকোলনিকি পর্যন্ত সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করছে।

লেনিনগ্রাদ অবরোধ মুক্ত হলো। সমগ্র লেনিনগ্রাদ অঞ্চল শত্রু মুক্ত হয়ে গেল। তখন সোভিয়েত সৈন্যের নজর পড়লো সোভিয়েত এস্তোনিয়া মুক্ত করার দিকে।

সোভিয়েত সৈন্যের আক্রমণে ঘনিষ্টভাবে সহযোগিতা করে চললো পার্টিজান

দল। শত্রু সৈন্যের পিছনে সক্রিয় থেকে পার্টিজান দল জার্মাণদের রেল সংযোগ ব্যবস্থা পঙ্গু করে দিল। বোমার আঘাতে উড়িয়ে দিল তারা তিনশ'টি সেতু আর একশ' তেত্রিশটি সৈন্যবাহী ট্রেন।

জানুয়ারী মাসের শেষ থেকে উনিশ শ' চুয়াল্লিশের মার্চ মাস পর্যন্ত, ইউক্রেনের চারটি রণাঙ্গনের সৈন্যরা যৌথভাবে সামরিক অভিযান চালালো ইউক্রেনে নীপার নদীর পশ্চিম তীরে, শত্রুর ছিয়ানব্বই ডিভিসন সৈন্যের বিরুদ্ধে। এই বিরাট শত্রুসৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছিল সমগ্র সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে নিয়োজিত শতকরা সত্তরভাগ প্যানসার ডিভিসন ও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মোটর বাহিত সৈন্য ডিভিসন।

ইউক্রেনে সৈন্যবাহিনী তিনটি প্রধান অভিযান চালায়—একটি কোরসান-শেভচেঙ্কো অঞ্চলে, আরেকটি রোভ্নো-লুৎস্ক অঞ্চলে এবং তৃতীয়টি নিকোপোলক্রিভোয় রোগ্ অঞ্চলে।

কোরসান-শেভচেঙ্কো এলাকায় ইউক্রেনের প্রথম ও দ্বিতীয় বাহিনী শত্রুর নয়টি পদাতিক ও একটি প্যানসার ডিভিসন, একটি মোটর বাহিত সৈন্যদলের ব্রিগেড, বিরাট সংখ্যক গোলন্দাজ বাহিনী ও ইঞ্জিনীয়ার শাখাকে প্রথমে বেষ্ঠন করে পরে ধ্বংস করে ফেলে। নীপার নদী অঞ্চল থেকে শত্রু দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে করে যেতে বাধ্য হয়। নীপার নদী বরাবর শত্রুপক্ষের অভিযান সুরু করার পরিকল্পনা বাণচাল হয়ে যায়।

প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যরা তারপর রোভনো-লুৎস্ক এলাকায় শত্রুর এক সৈন্যদলকে পর্যুদস্ত করে তাদের সুদ (Sud) শাখাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। নিকোপোল-ক্রিভোয় রোগ্ অঞ্চলে তৃতীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনীর তৎপরতা সুরু হয় উনিশ শ' চুয়াল্লিশের জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি। তারা নিকোপোলের দক্ষিণে নীপার নদীর বাম তীরে শত্রুর পারাপারের এক প্রধান সেতুমুখ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এই সক্রিয়তার দ্বিতীয় পর্ব সুরু হয় প্রোসকুরোভো-চের্নোভৎসী, উমান এবং বেরেজনেগোভাতো-স্নেগিরিয়োভ অভিযানের মধ্য দিয়ে।

এই সক্রিয়তার সূচনায় প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর এক আক্রমণকারী অগ্রবর্তী অংশ শেপেতোভ্কা হতে রওনা হয়ে চের্নোভৎসী আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী জেভ্নিগোরদকা থেকে রওনা হয়ে প্রথমে

মোগিলিয়েভ-পোদোলস্কি ও পরে চের্নোভ্‌ৎসী আক্রমণ করে। ততোদিনে সোভিয়েত বাহিনী কার্পেথিয়ান পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হয়ে, জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাদলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। এই অঞ্চলে কামেনেস্ক-পোদোল্‌স্কে্‌র উত্তরে শত্রুপক্ষের পনের ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তাদের সকলকেই শেষ করে দেওয়া যায়নি। কার্পেথিয়ান পর্বতের সানুদেশে শত্রুকে পরাজিত করে, সোভিয়েত সেনাদল দু'শ কিলোমিটার বিস্তৃত এক রণাঙ্গনে লড়াই করতে করতে উপস্থিত হয় চেকোস্লোভাকিয়া ও রুমেনিয়ার সীমান্তে।

দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর উমান অভিযান জার্মাণ প্রতিরোধ শক্তিকে উমান-জেসি এলাকায় বিধ্বস্ত করে। শত্রু সৈন্যের অবশিষ্টাংশ প্রাণভয়ে নিষ্টার নদী পার হয়ে কার্পেথিয়ান পর্বতের সানুদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী, সোভিয়েত-রুমেনিয় সীমান্তে প্রুথ নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে, জোর করে নদী পার হয় এবং সংগ্রামকে বিস্তৃত করে দেয় রুমেনিয়ার মধ্যে। বেরেজনেগোভাতো-স্নেগিরিয়োভ অভিযানে তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী, ইঙ্গুলেত নদীর নিম্ন অববাহিকায় নাৎসী সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করে দক্ষিণ বাগ অঞ্চলে উপস্থিত হয়। শত্রুরা কোনমতে নদী পার হয়ে আত্মরক্ষা করে।

এই সমস্ত অভিযান সুরু হওয়ার পূর্বেই ইউক্রেনের পার্টিজান দল তাদের ঘাঁটি সরিয়ে নিয়ে যায় নীপার নদীর অপর তীরে, যাতে সেখানে স্থানীয় দলকে সংগঠিত করে তারা অগ্রসরমান সোভিয়েত সেনাদলকে কার্যকরী সাহায্য করতে পারে। সেখানে নিয়মিত সেনাদলের সঙ্গে একযোগে পার্টিজানরা শত্রুসৈন্যের পেছন থেকে সুবিধামতো মারাত্মক আঘাত হানতে থাকে।

নীপার অতিক্রমে করে সোভিয়েতের আক্রমণ ক্রমেই আয়তনে বিস্তৃত হতে থাকে। চোদ্দ শ' কিলোমিটার দীর্ঘ রণাঙ্গনে, পাঁচশ কিলোমিটার এলাকা পর্যন্ত ঘন সমাবেশে এগিয়ে যেতে থাকে সোভিয়েত বাহিনী। শত্রুর মোট সৈন্য ক্ষয় হয় ছেষট্টি ডিভিসনের কাছাকাছি। প্রায় সমগ্র ইউক্রেন মুক্ত হয়ে যায় এই আক্রমণের প্রচণ্ডতায়।

যখন সোভিয়েত সৈন্য রুমেনিয়া সীমান্তে উপস্থিত হয়ে সেই দেশের মধ্যে প্রবেশ করলো, তখন দোসরা এপ্রিল উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সরকার

একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানালেন যে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করে তাকে বিধ্বস্ত, পরাজিত করাই হলো তাদের লক্ষ্য। তাঁরা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে রুমেনিয়ার ভূখণ্ডের কোন অংশ অধিকার বা তার সমাজ ব্যবস্থার বলপূর্বক পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র অভিপ্রায়, সোভিয়েত সেনাদলের নেই। তাঁরা আরো বলেন যে বিশুদ্ধ সামরিক কারণে এবং শত্রুর তখনো পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার আগ্রহ দেখেই, সোভিয়েত সৈন্য সেই দেশে প্রবেশ করেছে। বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী তাদের এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে। তারা এগিয়ে যাবে ক্রমাগত পশ্চিম দিকে যতোদিন পর্যন্ত না হিটলার জার্মাণী ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হচ্ছে।

বিদেশের মাটিতে সোভিয়েত সৈন্যের প্রবেশ ছিল একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিমমুখী অগ্রগতিতে সোভিয়েত সৈন্যদলের প্রতিটি পদক্ষেপ, জনগণের কাছে উপস্থিত করলো ফ্যাশিবাদের কবল থেকে মুক্তির সম্ভবনা। তাদের সামনে খুলে গেল স্বাধীন, গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ।

এই প্রথম বিদেশের মানুষ সোভিয়েতের মানুষের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। তারা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলো সোভিয়েতের মানুষকে। কমিউনিষ্ট পার্টির ন্যায়নিষ্ঠ, প্রগতিশীল নীতি, মানুষকে ফ্যাশিস্ত দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ায় তার অকৃত্রিম প্রচেষ্টা, বিদেশের মেহনতী মানুষ এই প্রথম প্রত্যক্ষ করতে পারলো। শ্রমিক শ্রেণী ও তার অগ্রগামী অংশ কমিউনিষ্ট ও ওয়ার্কাস পার্টির নেতৃত্বে জনগণ, ফ্যাশিস্ত শাসন ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্যে তাদের সংগ্রাম তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুললো। সচেষ্ট হলো তারা তাদের স্বাধীনতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে, গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির গুণগত পরিবর্তন সাধন করে সোভিয়েত যুক্ত-রাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ট, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে। তখন জার্মাণ অধিকৃত পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে একটা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ক্রমেই দানা বেঁধে উঠ্‌তে লাগলো।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের মার্চ মাস থেকে আরম্ভ করে মে মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী কৃষ্ণ সাগরীয় নৌবহর ও আজোভ্‌ সাগরের নৌ ফ্লোটিলার সহযোগিতায়, ওডেসা ও ক্রিমিয়া শত্রুমুক্ত করলো। শেষ হলো এইবার উনিশ শ' চয়াল্লিশে সোভিয়েতের বসন্তকালীন অভিযান।

এই অভিযানে সোভিয়েত সেনাদল, জার্মাণ অধিকৃত সোভিয়েত ভূমির তিন চতুর্থাংশ মুক্ত করে, চারশ' কিলোমিটার রণাঙ্গন জুড়ে উপস্থিত হলো সোভিয়েতের সীমান্ত অঞ্চলে। তাদের সামনে তখন কর্তব্য রইলো শত্রুকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে, জার্মাণ দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে ইউরোপের মানুষকে মুক্ত করা।

সোভিয়েতের গ্রীষ্মকালীন অভিযান সুরু হলো কারেলিয়ায়। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের জুন-জুলাই মাসে, লেনিনগ্রাদ ও কারেলিয় রণাঙ্গনের সেনাদল হিটলারের ফিনদেশীয় মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনীকে ভাইবোর্গ ও স্বিরপেত্রোজা-ভোদ্স্ক অভিযানে বিধ্বস্ত করে উপস্থিত হলো সোভিয়েত-ফিনল্যাণ্ড সীমান্তে। তারপর শত্রুর পিছনে ধাওয়া করে তারা ঢুকে গেল ফিনল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে।

প্রথম বাল্টিক ও তিনটি বাইলোরুশীয় সেনাদলের বাইলোরাশিয়া আক্রমণ ছিল, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের বৃহত্তম সামরিক অভিযান।

তেইশে-চব্বিশে জুন আক্রমণ সুরু করে এই চারটি সেনাদল এক যোগে ছয়টি বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দেয়। তারপরে তারা ভিতেবস্ক ও বোব্রুইস্ক অঞ্চলে নাৎসী সৈন্যদের ঘিরে ধ্বংস করে ফেলে। তেসরা জুলাইয়ের মধ্যে তিরিশ ডিভিসন সৈন্য সমেত একটি বিরাট শত্রুদল মিনস্ক শহরের পূর্বে আটকে পড়ে। যখন সোভিয়েত সেনাদলের একাংশ প্রায় জুলাই মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শত্রু সৈন্যকে অনুসরণ করে ফিরছিল, তখন অপরাংশ সম্মুখের শত্রুকে তাড়া করে উপস্থিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের পশ্চিম সীমান্তে।

বাইলোরাশিয়া অভিযানে জার্মাণ সেনাদলের মধ্যবর্তী বাহিনী, বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত সংগ্রামে তিরিশ ডিভিসন সৈন্য হারায়। এই অভিযানে সোভিয়েত বাইলোরাশিয়া ও প্রায় সমগ্র সোভিয়েত লিথুয়ানিয়া শত্রুর কবলমুক্ত হয়। নিয়েমেনের (Neimen) উপর চাপ দিয়ে, সোভিয়েত সৈন্যরা উপস্থিত হলো জার্মাণ সীমান্তে। তেরোশ' কিলোমিটার বিস্তৃত রণাঙ্গণ জুড়ে অভিযান চলতে থাকে, যার গভীরতা ছিল সাড়েপাঁচশ' থেকে ছয়শ' কিলোমিটারেরও বেশি।

প্রথম বাইলোরুশীয় সেনাদলের আঠারোই জুলাই থেকে উনত্রিশে আগষ্ট উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, লুবলিন-ব্রেস্ত অভিযান ছিল, ব্যাপক বাইলোরাশিয়া অভিযানের অংশ বিশেষ। এই অভিযানের প্রধান আঘাত হানা হয়

কোভেলের কিছুটা পশ্চিমে, ব্রেস্ত অঞ্চলকে উত্তর ও দক্ষিণে পাশকাটিয়ে গিয়ে লুবলিন ও প্রাগা অভিমুখে। (প্রাগা হলো ভিশ্চুলা নদীর পূর্বতীরে ওয়ারস'র একটা শহরতলী বিশেষ।) একুশে জুলাই প্রথম বাইলোরুশীয় সেনাদল, সোভিয়েত-পোলিশ সীমান্তে এসে উপস্থিত হলো। তাদের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম ইউক্রেনীয় ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় সেনাদলের কয়েকটি শাখাও পোলিশ সীমান্তে এসে পৌঁছায়। বাইশে জুলাই প্রথম বাইলোরুশীয় বাহিনীর কয়েকটি শাখা পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে, চেল্‌ম (Chelm) শহর শত্রুমুক্ত করে। লুবলিন শত্রুমুক্ত হয় চব্বিশে জুলাই।

বাইলোরাশিয়া অভিযানে সোভিয়েত সেনাদল ও পার্টিজানদের যৌথ সক্রিয়তা খুবই কার্যকরী হয়েছিল। বাইলোরাশিয়ার পার্টিজানদের এক বিরাট বাহিনী, সে দেশকে নাৎসী মুক্ত করতে বিশেষ সাহায্য করে। অভিযান সুরু হওয়ার তিন দিন পূর্বে, বিশে ভোর বেলায় পার্টিজানরা চল্লিশ হাজার রেল বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। ফলে শত্রুর পিছনে রেলপথগুলি বেশ কিছুকাল অকেজো হয়ে থাকে। এতে শত্রুদের মধ্যে রীতিমতো বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। নাৎসীরা তাদের সংরক্ষিত সৈন্যদের সুবিধা মতো জায়গায় পাঠাতে ব্যর্থ হয়। তখন নাৎসীদের পিছনে সমগ্র জেলাগুলি পার্টিজানদের দখলে এসে গেছে। তাই তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন পথ দিয়ে, সোভিয়েত সেনাদলের পথ নির্দেশক হয়ে তাদের নিয়ে যায় পলায়নপর নাৎসী সৈন্যদলের পিছন থেকে আক্রমণ করার জন্যে।

বাইলোরাশিয়া অভিযানে ধৃত ও বন্দী হিটলারের জেনারেল, অফিসার ও সৈন্যদের পাহারা দিয়ে মস্কোর পথে নিয়ে যাওয়া হয়, সোভিয়েত দেশের অভ্যন্তরে। প্রখ্যাত ফরাসী প্রগতিশীল লেখক জঁা রিচার্ড ব্লোক, যিনি মস্কোর রাস্তায় তাদের কুচ্‌কাওয়াজ করে যেতে দেখেছিলেন, তিনি লেখেন:

"এই মাত্র আমি দেখলাম তাদের, সেই সাতান্ন হাজার ছয়শ' জনকে। জার্মাণ মধ্যবর্তী বাহিনীর অবশেষকে, যাদের বন্দী করা হয়েছে ভিতেব্‌স্ক, বোব্রুইস্ক ও মিনস্কে।......আমি ও আমার মতো যারা জার্মাণদের দেখেছিলাম আমাদের শহরে ঢুকে, কায়েম হয়ে বসতে, আমরা সবাই এ দৃশ্যে আনন্দ পেলাম প্রচুর।"

"আমি তাদের অপরাধ চাক্ষুষ দেখেছি তাই আজ প্রতিশোধ দেখে পরিতৃপ্ত

হলাম।······আহা আমার বন্ধুরা, এই জার্মাণ যুদ্ধবন্দীরা, যারা সাম্প্রতিক যুদ্ধে ধৃত হয়েছে, হাজারে হাজারে মস্কোর পথে ঘাটে হেঁটে চলে গেল। এত একটা বিস্ময়কর দৃশ্য, একটা অনুপ্রেরণাময় দৃশ্য। গভীর নৈঃশব্দের মধ্যে তারা আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। আমরা যেন ইতিহাসে ভাগ্য পরিবর্তনের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকে চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখলাম।"

"কিন্তু ভাগ্যের জোয়ারে এই পরিবর্তন হটাৎ, আকস্মিকভাবে ঘটেনি। এ হলো রুশদের প্রচণ্ড শক্তি, অক্লান্ত অধ্যবসায়, চমকপ্রদ দূরদৃষ্টি এবং অতুলনীয় ইচ্ছা শক্তির যোগফল।"[২]

সোভিয়েতের পরবর্তী অভিযান পরিচালিত হলো পশ্চিম ইউক্রেনের দিকে। লোভোভ্-সান্দোমির অভিযান নামে এই কার্যক্রম উনিশ শ' চুয়াল্লিশের জুলাইয়ে সুরু হয়ে শেষ হলো আগষ্টে। এতে প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনী জার্মাণদের "উত্তর ইউক্রেনীয়" সেনাদলের বিভিন্ন শাখাকে বিধ্বস্ত করে, মুক্ত করলো লোভোভ, স্তানিস্লাভ ও পেরেমিশল।

এই অভিযানে সোভিয়েত সৈন্যরা অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করে। তাদের সেই বীরত্বের একটা কাহিনী এখানে বলা যেতে পারে। লোভোভ শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে প্রথমে গিয়ে উপস্থিত হয় তেষট্টিতম ট্যাঙ্ক ব্রিগেডের, টি-চৌত্রিশ ট্যাঙ্ক "ভার্দিয়া"। ট্যাঙ্কের বেতারযন্ত্র চালক এ, পি, মারশেঙ্কো শত্রুর গুলীবর্ষণ উপেক্ষা করে, শহরের টাউনহলে লাল পতাকা উত্তোলন করলেন। ক্রমান্বয়ে ছয়দিন ধরে এই ট্যাঙ্ক শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে রইলো। ট্যাঙ্কের চালকরা এই কদিনে শতাধিক জার্মাণ অফিসার ও সৈনিকদের নিহত করে, আর ধ্বংস করে শত্রুর আটটি ট্যাঙ্ক। এই খণ্ডযুদ্ধে সোভিয়েত ট্যাঙ্কের নায়ক ও মারশেঙ্কো উভয়েই নিহত হলেন। আর তাঁদের অন্য সহকারীরা সকলেই গুরুতর রূপে আহত হলেন। তাঁদের এই অসম-সাহসিকতাপূর্ণ কাজ চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে, সেই আঘাতে ভগ্নপ্রায় ট্যাঙ্কটি লোভোভ শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি উঁচু বেদীর স্থাপন করা হয়েছে।

অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায়ে সোভিয়েত সেনাদল ভিশ্চুলা নদী পার হয়ে তার পশ্চিম তীর থেকে সান্দোমিরের কাছে এপার ওপার একটা যোগাযোগ সেতু স্থাপন করে।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েতের গ্রীষ্মকালীন অভিযান জার্মাণীর পতন

সমাসন্ন করে তোলে। ফুলার স্বীকার করেছেন যে "আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি জার্মাণ পরিস্থিতি একেবারে চরমে গিয়ে পৌঁছায়।"[৩] ইউরোপের আকাশে মুক্তির শুভ তারকা জলজল করে উঠতে থাকে।

পোল্যাণ্ডের জনগণ উচ্ছ্বসিত আনন্দে সোভিয়েত সেনাদলকে স্বাগত জানালো। তাদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে তারা কোন সাহায্য করতেই কার্পণ্য করলো না। দেশপ্রেমের একটা সার্বিক আনন্দোচ্ছাসপূর্ণ পরিবেশে পোল্যাণ্ডে সমাগত হলো একটি গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী বিপ্লবের মুহূর্ত। জনগণের ইচ্ছার প্রকাশেই পোলাণ্ডে তখন রূপায়িত হচ্ছিল একটা জনগণতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা।

সোভিয়েত সেনাদলের অভিযানে শত্রুমুক্ত চেল্‌ম শহরে ক্রাজোয়া রাদা নারোদোয়া (Krajowa Rada Narodowa), পোল্যাণ্ডের এই নোতুন জনগনতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার মুখপাত্র হিসাবে, তেইশে জুলাই, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে গঠন করলেন পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটি। তার উদ্বোধনী নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল:

"চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রাক্কালে, যখন জার্মাণ আক্রমণকারীদের চিরকালের মতো পোল্যাণ্ড থেকে বিতাড়িত করা হবে, তখন ক্রাজোয়া রাদা নারোদোয়া, জনগণকে তাদের মুক্তি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে, তাদের স্বাধীনতা ও পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রিক সত্তার পুনরুজ্জীবনের জন্যে, অস্থায়ী শাসন কর্তৃপক্ষ হিসাবে পোলিশ জাতীয় কমিটি গঠন করছে।"[৪]

জার্মাণ পরাধীনতা থেকে চূড়ান্ত মুক্তি ও দেশে জনগণতন্ত্র স্থাপন করার জন্যে পোলিশ জনসাধারণের সংগ্রামের কর্মসূচী হিসাবে এই কমিটি একটি ইশ্‌তেহার প্রকাশ করলেন।

ছাব্বিশে জুলাই, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত পররাষ্ট্র দপ্তরের একটি ঘোষণায় জানানো হয় যে, সোভিয়েত সেনাদল পোলিশ সেনাদলের সঙ্গে একযোগে পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করে জার্মাণ অধিকারের দীর্ঘকালীন যন্ত্রণা থেকে সেই দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে। বিবৃতিতে জোর দিয়ে বলা হয় যে, "শত্রু জার্মাণ সেনাদলকে বিনষ্ট করে, জার্মাণ আক্রমণকারীদের অধীনতা থেকে পোল্যাণ্ডের মানুষের মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করে

একটা স্বাধীন, শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ড" গঠনের পথ প্রশস্ত করতে সোভিয়েত সেনাদল বদ্ধপরিকর।[৫]

সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করেন যে পোল্যাণ্ডের মাটীতে সোভিয়েত সেনাদলের সামরিক সক্রিয়তাকে একটা স্বাধীন, সার্বভৌম, মিত্রপক্ষীয় দেশের মাটীতে সামরিক কার্যক্রম বলেই তাঁরা মনে করেন। তাই সেখানে নিজেদের কোন শাসন-কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করার বিন্দুমাত্র বাসনাও তাঁদের নেই, কারণ সে দায়িত্ব শুধুমাত্র পোল্যাণ্ডের জনগণের।

সোভিয়েতের ঘোষণাটি ছিল তাই পোল্যাণ্ডের জনগণের প্রতি তাদের বন্ধুত্বের স্মারক চিহ্ন। সোভিয়েত সরকার আন্তরিকভাবে পোল্যাণ্ডের জনগণকে একটি স্বাধীন শক্তিশালী, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করতে উৎসুক ছিলেন। তাই এই বিবৃতিকে পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির প্রতি সোভিয়েতের সমর্থন ও তার স্বীকৃতিদান বলা যেতে পারে। এই কমিটির সঙ্গেই একটি চুক্তি সম্পাদন করতে সিদ্ধান্ত নেন, তাঁরা যাতে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব ও পোলিশ শাসন ব্যবস্থার সম্পর্ককে সুনির্দিষ্ট করা যায়। (আটই মে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে চেকোস্লাভাকিয়ার সঙ্গেও একটা অনুরূপ চুক্তি হয়)।

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার কিন্তু লণ্ডনস্থিত স্তানিস্‌ল মিকোলাইসিজ্‌কের পলাতক সরকারকেই আরো জোরালো ভাবে সমর্থন করতে সুরু করলেন। তাই দেখা গেল যে পোল্যাণ্ডের গণফৌজ যখন মার্কিণ দেশে অস্ত্রশস্ত্রের সাহয্য পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করছে, তখন সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পোল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে পলাতক সরকারকে এক কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছেন।[৬]

মিকোলাইসিজ্‌কির পলাতক সরকারের পোলিশ জনগণের জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। তারা তা মোটেই পাত্তা দিতেন না। তাই তাঁর জাতীয় মুক্তি কমিটির কার্যক্রমকে বাতিল করে দিয়ে, পশ্চিমে যে ভূখণ্ডের উপর পোল্যাণ্ড দাবী জানিয়েছিল তাতে আপত্তি করেন।

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার সেই সময়ে পোল্যাণ্ডের ভৌগলিক আয়তনগত সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত। যেহেতু তাঁদের প্রত্যাশা ছিল যে এই পলাতক সরকারই পোল্যাণ্ডের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করবে, তাই তাঁরা পোল্যাণ্ড সীমানা সম্প্রসারণের প্রতি সমর্থন জানালেন। সমগ্র পূর্ব প্রাশিয়া পোল্যাণ্ডকে

দিয়ে দিতেও তাঁদের কোন আপত্তি ছিল না। তখন সোভিয়েত সরকার মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে কোনিসবার্গ সমেত প্রাশিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিত। চার্চিল অবশ্য স্বীকার করেছিলেন যে, "এই জার্মাণ ভূখণ্ডের উপর রাশিয়ার ঐতিহাসিক এবং অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দাবী আছে।"[৭]

কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন পোলিশ পলাতক শাসক চক্রের বাইলোরাশিয়া ও ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডের উপর অযৌক্তিক, অন্যায় দাবী সমর্থন করে যেতে লাগলো। এবং তার জন্যে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভয় দেখাতেও কসুর করলো না। প্রচার করতে লাগলো যে সোভিয়েত শক্তি পোল্যাণ্ডের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। জার্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রচেষ্টার মুক্তিকামী দিকটা তারা অস্বীকার করে গেল। প্রত্যুত্তরে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করলেন যে, "কাজ পাওয়ার পদ্ধতি হিসাবে মিত্রপক্ষের সম্পর্কের মধ্যে পারস্পরিক ভীতি প্রদর্শন কেবল বেমানান নয়, তা ক্ষতিকারকও বটে। কারণ ফল তাতে সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারে।" সঙ্গে সঙ্গে একথাও তাঁরা জানালেন যে, "চাপ সৃষ্টি করা অথবা অপপ্রচার করে দুর্নাম রটানো যদি বিনা বাধায় চলতে দেওয়া হয় তাতে আমাদের সহযোগিতার নীতির কোন লাভ হবে না।"[৮]

সোভিয়েত অভিযান আলবেনিয়ার জনগণকেও মুক্তি সংগ্রামের প্রেরণা দেয়। পঁচিশে মে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, দক্ষিণ আলবেনিয়ার ছোট্ট শহর পেরমেটে (Pirmet), ফ্যাশি বিরোধী প্রথম আলবেনিয় জাতীয় মুক্তি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলো। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে কংগ্রেসে একটা সাধারণ পরিষদ নির্বাচিত হলো। তা ছাড়া দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবও গৃহীত হলো সেখানে। আলবেনিয়ায় দখলকারী জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাদলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জনপ্রিয়তা বাড়তে লাগলো হু হু করে। এই মুক্তি আন্দোলনকে শক্তিহীন, দুর্বল করে দেওয়ার জন্যে, বৃটিশ সরকার নানা উপদেশ দিয়ে তাঁদের অনুচরদের পাঠালেন আলবেনিয়ায়, যাতে তারা প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে সংগঠিত করে দেশপ্রেমিক মানুষদের বিরুদ্ধে সশস্ত্রভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।

বলকানে মুক্তি আন্দোলনের প্রসার, ফ্যাশিস্ত জার্মানীর শক্তির কেন্দ্রগুলিতে

ভাঙ্গন ধরিয়ে দিল। ভীত ত্রস্ত জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব যুগোশ্লোভিয়ার পার্টিজানদের মূল কেন্দ্রে আঘাত করার এক পরিকল্পনা করলেন। পঁচিশে মে উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, যুগোশ্লোভিয়ার পার্টিজানদের সর্বোচ্চ সদর কার্যালয় যে শহরতলীর গুহায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সেই ড্রাভার (Dravar) শহরেই, ফিল্ড মার্শাল রোমেল ছত্রীবাহিনী নামিয়ে দিলেন। কিন্তু সময় থাকতে ছত্রীবাহিনী নামতে দেখে, পার্টিজানদলের নেতারা গুহা ছেড়ে সরে যান। একটা সোভিয়েত বিমান তাঁদের নিয়ে কুপ্রেস থেকে নিরাপদে চলে যায় আদ্রিয়াতিকের ভিস দ্বীপে।

বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী ততোদিনে আবার মিহাইলোভিকের প্রতিক্রিয়াশীল চেৎনিক আন্দোলনে মদৎ-যুগিয়ে তাকে খাড়া করে ফেলেছে। একটি বৃটিশ অফিসের মাধ্যমে মিহাইলোভিকের কাছে বিশেষ আদেশ এসে পড়লো যে জনগণের মুক্তি আন্দোলনকে চুরমার করে দিতে হবে। কারণ ওখানে সময় মতো বৃটিশ সৈন্য পৌঁছতে গেলে যাতে কোন বাধা না আসে তারই জন্যে এটা বিশেষ দরকার।[৯] বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর কর্ণেল বেইলী, মিহাইলোভিককে খোলাখুলি বলেন যে ডালামাশিয়ায় বৃটিশ সৈন্যের অবতরণের বিরুদ্ধে পাছে জনগণকে কমিউনিষ্টরা উত্তেজিত করে তোলে, তার জন্যেই সমস্ত কমিউনিষ্টদের আগের থেকেই হত্যা করতে হবে। মার্কিণ সেনাদনের কর্ণেল ম্যকড়ুয়েলও অনুরূপ উপদেশামৃত প্রচার করেন। তিনি মিহাইলোভিককে বলেছিলেন যে, "আপনাদের বর্তমান যতোই কঠোর হোক না কেন, ভবিষ্যৎটা একেবারে উজ্জ্বল। জার্মানী যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। জার্মাণদের সঙ্গে আপনাদের কি ধরণের সম্পর্ক ছিল, তা নিয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা নেই। আপনাদের যা করতেই হবে তা হলো নিজের খুঁটি আঁকড়ে থাকা। আমি তো আপনাদের সাহায্য করার জন্যেই এসেছি।"[১০]

বেনেসের অধীনে চেকোশ্লোভাকিয়ার পলাতক সরকারও অনুরূপ জনগণ বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছিলেন। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে তাঁরা চেকোশ্লোভাকিয়ার বৃটিশ সৈন্যের প্রবেশের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ যাতে তাদের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, এই আলাপ আলোচনার লক্ষ্য ছিল তাই।

॥ দুই ॥

সোভিয়েত সেনাদল যতোই জার্মানীর কাছাকাছি এগিয়ে যেতে লাগলো, ফ্যাশিস্ত শিবিরে সংকট দিনের পর দিন ততোই তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগলো। অধিকাংশ জার্মাণের মনে হতে লাগলো যে যুদ্ধে তারা হেরে গেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে নাৎসীরা দেশের মধ্যে সৃষ্টি করলো এক সন্ত্রাসের রাজত্ব। পাইকারী হারে মানুষদের ধরে হত্যা করা হলো। হিটলার জার্মানীর উচ্চস্তরের সরকারী কর্মচারীদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত একটা গোপন ফ্যাশিস্ত পত্রিকা আতঙ্কের সঙ্গে জানালো যে শ্রমিকদের মধ্যে ফ্যাশি বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠছে।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে আত্মগোপনকারী ফ্যাশি বিরোধী গোষ্ঠীর যেগুলিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার একটা হিসাব দেয় এই পত্রিকা :[১১]

জানুয়ারী : ৪২,৫৮০ ; ফেব্রুয়ারী : ৪৫,০৪৪ ; মার্চ : ৪৬,৩১২ ; এপ্রিল : ৫২,৯৩৯ ; মে : ৫৬,৮৩১ ; জুন : ৬৬,৯৯১ !

জার্মাণ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা, আর্নেষ্ট থায়েলমানকে (Ernest Thaelmann) এগারো বছরেরও বেশি সময় আটক রাখা হয়। ফ্যাশিস্তদের বিভিন্ন কয়েদখানায় তাঁর উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়, তা অবর্ণনীয়। কিন্তু জার্মাণ কমিউনিষ্টরা জানতেন যে থায়েলমান কি ধাতুতে গড়া। তাঁর ধৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা, শ্রমিক শ্রেণী ও সোভিয়েতের চূড়ান্ত বিজয় সাফল্য সম্বন্ধে অগাধ, অটুট বিশ্বাস কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয়নি। কারা প্রাচীরের অন্তরালে থাকলেও, থায়েলমানকে ফ্যাশিস্তরা ভয় করতো খুবই। তাই আতঙ্ক যখন তাদের চরমে পৌঁছলো, তখন একদিন সতেরই আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, তারা তাঁকে নিয়ে এলো বুকেনওয়াল্ডে। সেইখানে খুন করলো তারা থায়েলমানকে।

ওদিকে জার্মানীর লোকবল তখন প্রায় নিঃশেষিত। "সামগ্রিক প্রস্তুতির" জিগির তুলে, সারা দেশে সাজ সাজ রব ছড়িয়ে, তারা দেশের সমস্ত শক্ত সমর্থ মানুষকে টেনে নিয়ে গেছে রণাঙ্গনে। তাতে জনশক্তির ক্ষয়ে দেশ গেছে দুর্বল হয়ে, অথচ রণাঙ্গনে তেমন কিছু শক্তি বৃদ্ধি ঘটেনি। সৈন্যদলে ভর্তি হয়েও অনেকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছে। যে দু' লক্ষ

অ্যালসেশীয় মানুষকে প্রায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয় লড়াইয়ে, তার মধ্যে বাষট্টি হাজার দলত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষকে হয় পাঠানো হয় কন্‌সেনট্রেশন্‌ ক্যাম্পে নয়তো হত্যা করা হয়।[১২]

জার্মানীর তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলিও ততোদিনে লড়াই থেকে সরে যেতে চাইতে লাগলো। কেউ কেউ তাদের দায়িত্ব এড়াবার ফিকির খুঁজতে সুরু করে দিল। আর এই শেষোক্ত দলে প্রথমে এলো ফিনল্যাণ্ড।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি একজন প্রখ্যাত ফিনিশ নেতা ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনের প্রবক্তা পাসিকিভি (Paasikivi) ষ্টকহোমে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত এ, এম, কোল্লোন্তাইয়ের (Kollontai) সঙ্গে বেসরকারীভাবে সাক্ষাৎ করলেন। সোভিয়েত সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রদূত তাঁকে জানান যে, "বর্তমান ফিনিশ সরকারকে বিশেষভাবে বিশ্বাস করার মতো সোভিয়েত সরকারের কোন কারণ নেই, কিন্তু ফিন্‌রা যদি সত্যিই মনে করেন যে তাঁদের আর গত্যন্তর নেই, তাহলে সোভিয়েত সরকার শান্তির স্বার্থে বর্তমান ফিনিশ সরকারের সঙ্গে সামরিক সক্রিয়তা বন্ধ করার জন্যে আলোচনা করতে সম্মত আছেন।"[১৩] সোভিয়েত সরকার দাবী করলেন যে আলোচনার পূর্বে ফিনল্যাণ্ড জার্মানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করুক, জার্মাণ সৈন্যদের অন্তরীণ ও জাহাজগুলি আটক করুক। তাতে যদি প্রয়োজন হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে। তাঁরা আরো দাবী করলেন যে উনিশ শ' চল্লিশে যে সোভিয়েত-ফিন্‌ চুক্তি হয়েছিল তা এখনই চালু করতে হবে এবং সেই চুক্তিতে উল্লিখিত সর্তানুযায়ী ফিন্‌ সৈন্যদলকে চুক্তিতে নির্দিষ্ট সীমান্তে ফিরে যেতে হবে।

ফিনল্যাণ্ডের সামনে এইভাবে এসে গেল বাস্তব পরিবেশ সম্মত একটা সুযোগ, যা কাজে লাগিয়ে সে যুদ্ধের বাইরে চলে যেতে পারে এবং হিটলার জার্মানীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু ফিন্‌ শাসকশ্রেণী এখানে একটা দ্বিমুখী নীতি গ্রহণের চেষ্টা করলেন। সতেরই মার্চ, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ফিনিশ সরকার জানালেন যে তাঁরা সোভিয়েতের সর্তাবলী মানতে পারছেন না, কারণ "এই সব সর্তের তাৎপর্য ও গুরুত্ব কি সে বিষয়ে তাঁরা স্থির নিশ্চিত হতে পারছেন না।"[১৪] সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যুত্তরে জানায়

যে ধারাগুলির যথাযথ তাৎপর্য জেনে যাওয়ার জন্যে একটা ফিন্ প্রতিনিধি-দলকে মস্কোয় আসতে দিতে সোভিয়েত সরকার সম্মত আছেন।

ছাব্বিশে মার্চ, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে একটা ফিন্ প্রতিনিধিদল, পাসিকিভির নেতৃত্বে মস্কোয় এসে পৌঁছলো। সোভিয়েতের শান্তি স্থাপনের সর্তাবলী তাঁদের দিয়ে দেওয়া হলো। রাষ্ট্রদূত কোল্লোন্তাই যে সব সর্তের কথা বলেছিলেন, তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন দাবী করলো যে ফিনল্যাণ্ডের সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক তৎপরতা ও সোভিয়েত ভূখণ্ড অধিকার করার জন্যে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার দরুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর সেই ক্ষতিপূরণ করতে হবে ফিনল্যাণ্ডের জিনিসপত্র দিয়ে আগামী পাঁচ বছর ধরে। আরো বলা হলো উনিশ শ' বিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বেচ্ছায় যে পেত্সামো (পেচেঙ্গা) শহর ও পেত্সামো অঞ্চল ফিনল্যাণ্ডকে ছেড়ে দিয়েছে, তা ফিরিয়ে দিতে হবে। অবিশ্যি প্রতিদানে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে হাঙ্গো শহর ও হাঙ্গো জেলার ইজারা স্বত্ব ভোগ করছে তা ছেড়ে দেবে।

ফিন্ প্রতিনিধিদল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে সেখানে তুমুল বিতর্কের ঝড় উঠলো। জনগণ দাবী করতে লাগলো আশু যুদ্ধবিরতির। তা সত্বেও ফিন্ সরকার নাৎসীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা থাকায়, আপত্তি করলেন।

উনিশে এপ্রিল উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ফিন্ সরকার সোভিয়েতের যুদ্ধ বিরতির সর্তাবলী প্রত্যাখ্যান করলেন। উত্তরে সোভিয়েত সরকার জানালেন: "ফিন্ল্যাণ্ডের আজ রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলতে কিছুই অবশিষ্ট নেই। যে মুহূর্তে ফিন্ল্যাণ্ড জার্মাণ সৈন্যদলকে তাদের দেশে ঢুকতে দিয়েছে সেই মুহূর্ত থেকে তার স্বাধীনতার অবসান ঘটেছে। আজ তার হারানো স্বাধীনতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাটাই হলো মৌল প্রশ্ন যা সে দেশ থেকে জার্মাণ সৈন্যদের বিতাড়িত করে এবং যুদ্ধ বিরতিতে রাজী হয়ে ফিরে পেতে পারে।"[১৫]

ফিন্ল্যাণ্ডের পরাজয় স্বীকার বন্ধ করার জন্যে হিটলারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিবেনট্রপ তাড়াতাড়ি ছুটলেন হেলসিঙ্কি, বাইশে জুন, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। ফিন্ল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি রাইতির (Ryti) কাছ থেকে তিনি লিখিত প্রতিশ্রুতি পেলেন যে তাঁর দেশ জার্মাণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কোন স্বতন্ত্র যুদ্ধ বিরতির চুক্তি করবে না। অবিশ্যি সেই বাণীতে রাইতি একথাও বলেন যে জার্মাণীর প্রতি ফিন্ল্যাণ্ডের এই আনুগত্য নির্ভর করবে,

"ফিন্‌ল্যাণ্ডে রুশ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকমের সম্ভাব্য সাহায্য ফিন্‌ সেনাদলকে", জার্মাণী দিতে পারবে কিনা তার উপরে।[১৬]

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের মার্চ মাসের সুরুতে হিটলার, হাঙ্গেরীর ফ্যাশিস্ত নেতা হোরথীর কাছে দাবী জানালেন যে জার্মাণীর বিশ্বস্ত বন্ধু হিসাবে হাঙ্গেরীকে সামগ্রিক যুদ্ধ প্রস্তুতির মাধ্যমে বিরাট এক সেনাদল গঠন করে পাঠাতে হবে সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে ও যুগোশ্লোভিয়ায়। তিনি হাঙ্গেরী থেকে আরো বেশি করে কাঁচা মাল ও খাদ্য রপ্তানীর জন্যেও দাবী করলেন। কিন্তু হাঙ্গেরী সরকারের পক্ষে দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আর উপেক্ষা করে থাকা চলছিল না। তাই জার্মাণদের দাবী অনুযায়ী কাজ করতে তাঁরা সাহস করলেন না। তখন জার্মাণরা ট্রেন বোঝাই নাৎসী সৈন্য পাঠিয়ে, হাঙ্গেরীতে সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে, আরো বেশি অনুগত একটা সরকার গঠন করলো।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের এপ্রিলে, রুমেনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে যুদ্ধ বিরতির সর্তাবলী জানার জন্যে আবেদন করলো। বারোই এপ্রিল তারিখে প্রেরিত সোভিয়েত প্রত্যুত্তরে নীচের সর্তাবলী দেওয়া হয়েছিল : জার্মাণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে, জার্মাণদের বিরুদ্ধে রুশদের সঙ্গে রুমেনিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে যৌথ অভিযান চালাতে হবে, উনিশ শ' চল্লিশের সোভিয়েত-রুমেনিয়া চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত-রুমেনিয়া সীমান্ত পুনর্গঠন করতে হবে ; রুমেনিয়ার সোভিয়েত বিরোধী সামরিক তৎপরতা ও সোভিয়েত ভূখণ্ড দখলজনিত ক্ষয়ক্ষতির জন্যে খেসারৎ দিতে হবে ; যুদ্ধবন্দী ও অন্তরীণ ব্যক্তিদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে ; এবং সামরিক প্রয়োজনে রুমেনিয় ভূখণ্ডের উপর দিয়ে সোভিয়েত সেনাদলের গমনাগমনের অবাধ সুযোগ দিতে হবে। প্রতিদানে সোভিয়েত সরকার উনিশ শ' চল্লিশের ভিয়েনা রোয়েদাদ অনুযায়ী রুমেনিয়ার ট্রান্সিলভানিয়া অঞ্চল যা হাঙ্গেরীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, তা বাতিল করে সেই ভূখণ্ড রুমেনিয়াকে প্রত্যার্পণে সম্মত আছেন।[১৭]

আন্তোনেস্কু সরকার এই সর্তাবলী স্বীকার করতে গররাজী হলেন। কিন্তু তখন ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রজোটের বনিয়াদ কেঁপে উঠেছে। জার্মাণ তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধ বিরতি বিলম্বিত করার নীতি তাদের অমোঘ পরিণামকে কোন মতে তখন আর এড়িয়ে যেতে পারলো না।

॥ তিন ॥

সোভিয়েতের যে সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্য, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করছিল, যা যুদ্ধের পরিণতিকে ধীরে ধীরে স্থির নির্দিষ্ট করে দিচ্ছিল, তার মৌল ভিত্তি ছিল সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ কর্ম-প্রেরণা। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সেনাদলের শত্রুর তুলনায় অনেক বেশি অস্ত্রশস্ত্র, কামান ও জঙ্গী বিমান ছিল। সোভিয়েত অস্ত্রশস্ত্রের গুণগত মানও শত্রুর তুলনায় ছিল অনেক উন্নত ধরনের। সোভিয়েত ভূমির পিছন দিক থেকে শিল্পায়নের ব্যাপক প্রসার ক্রমেই সেনাদলের সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করে যাচ্ছিল রণাঙ্গনের দিকে।

উনিশ শ' তেতাল্লিশের আগষ্টে সোভিয়েত সরকার জার্মাণ অধিকারমুক্ত সমস্ত অঞ্চলের দ্রুত অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্যে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে সত্যমুক্ত অঞ্চলের জন্যে বিরাট অর্থনৈতিক কার্যক্রম সুরু করা হয়, যাতে তাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দীর্ঘ প্রতিকূল অবস্থার চাপে বিপর্যস্ত হয়ে না যায় চূড়ান্তভাবে।

সোভিয়েত সেনাদল ততোদিনে জার্মাণ সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছে। সোভিয়েত সেনাদল ও স্থানীয় প্রতিরোধ আন্দোলনের যৌথ সক্রিয়তায় জার্মাণীর অধিকৃত বলকান অঞ্চলের উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। বলকানের উপর নাৎসীরা আর তাদের অধিকার বজায় রাখতে পারছে না কোন মতে। অবস্থা বেগতিক দেখে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব পশ্চিম ইউরোপ থেকে অবশিষ্ট, সংগ্রামক্ষম যা কিছু ডিভিসন পাচ্ছে, সব পাঠিয়ে দিচ্ছে পূর্ব সীমান্তে। জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে মুক্তি সংগ্রাম ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে ব্যাপক ও জোরালো হয়ে উঠছে। সেদিনের সেই সামরিক পরিস্থিতি ও তার আন্তর্জাতিক ফলশ্রুতি একথা নিতান্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে, যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এককভাবে, কারো সাহায্য না নিয়ে ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর চূড়ান্ত বিপর্যয় সম্ভব করে, ইউরোপের মানুষকে হিটলারের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে পারে।

ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের এই অভ্রান্ত, চূড়ান্ত সামরিক বিজয় সাফল্য, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের রণনৈতিক তথা রাজনৈতিক সক্রিয়তায়

ভিত্তিকেও দুর্বল করে দিল। উনিশ শ' একচল্লিশের এপ্রিল-মে মাসে, জাপ সরকার উত্তর শাখালিনে, আগামী নভেম্বর মাসের মধ্যে তার আয়ত্তাধীন তৈল ও কয়লা উৎপাদনে বিশেষ ভোগদখলের অধিকার শেষ করে ফেলবে বলে লিখিত প্রতিশ্রুতি দেয়। পরে হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করায় তাঁরা সেই প্রতিশ্রুতি পালনে টালবাহানা সুরু করেন। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সরকার সেই প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপন করে দাবী করলেন যে জাপানীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা যুক্ত সম্পত্তি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং জাপানী নাগরিক ও অন্য বিদেশীরা যেন সোভিয়েত আঞ্চলিক সমুদ্রে মাছ ধরতে না যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এবারে জাপ সরকার মনোভাব অনেক নমনীয় দেখা গেল। তাঁরা সোভিয়েতের দাবী স্বীকার করে নিলেন, সেই অনুসারে তিরিশে মার্চ, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে মস্কোয় একটি সোভিয়েত-জাপ চুক্তি (Protocol) স্বাক্ষরিত হলো।

১. Soviet Foreign Policy, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬
২. জাঁ রিচার্ড ব্লোক : মস্কো রেডিয়োতে ১৯৪১-৪৪ ফরাসী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ সমীক্ষার সংকলন, প্যারী ১৯৪৯, পৃঃ ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৩
৩. ফুলার : The Second World War, পৃঃ ৩১১
৪. প্রাভ্দা, ২৬শে জুলাই, ১৯৪৪
৫. Soviet Foreign Policy, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৩
৬. র‍্যাল্‌ফ পার্কার : Conspiracy Against Peace, মস্কো, ১৯৪৯, পৃঃ ১০৬
৭. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৩
৮. ঐ, পৃঃ ২১২-১৩
৯. প্রাভ্দা, ১৪ই জুন, ১৯৪৬
১০. প্রাভ্দা, ১৬ই জুন, ১৯৪৬
১১. ফ্যাশিস্তদের পত্রিকা : Die Lage, জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪
১২, ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত একটি পত্রিকা, ১৯৫৫
১৩. Soviet Foreign Policy, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৬
১৪. ঐ, ঐ, পৃঃ ৬৯
১৫. ঐ, ঐ, পৃঃ ৭১
১৬. Helsingin Sanomat, একটি ফিন্ ভাষার পত্রিকা, ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৫
১৭. Soviet Foreign Policy, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫

পঞ্চদশ অধ্যায়

মিত্রপক্ষের ফ্রান্সে অবতরণ

দ্বিতীয় রণাঙ্গন ইউরোপে উনিশ শ' একচল্লিশে সুরু করা হোল না, উনিশ শ' বিয়াল্লিশেও নয়। এমন কি উনিশ শ' তেতাল্লিশে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল, রণক্ষেত্রে জার্মাণী তার অতর্কিত আক্রমণজনিত সমস্ত সুযোগ প্রায় হারিয়ে বসলো, তখনো দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করা হলো না। তারপরে যখন যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কে কারো মনে অনিশ্চয়তার ছাপ রইলো না, তখন সেই শেষ মুহূর্তে বৃটিশ ও মার্কিণ সৈন্য একদিন উত্তর ফ্রান্সে অবতরণ করলো। সেদিনটা ছিল ছয়ই জুন, উনিশ শ' চুয়াল্লিশ।

দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করায় এই স্বেচ্ছাকৃত বিলম্ব, ফ্যাশিস্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাতিগুলির প্রতি ছিল মার্কিণ ও বৃটিশ প্রতিক্রিয়া চক্রের জঘন্যতম অপরাধ। সেই অপরাধ তারা করেছে তাদের নিজেদের দেশেরই মানুষদের বিরুদ্ধেও বটে। দ্বিতীয় রণাঙ্গনের এই বিলম্বিত সূচনার মূল্য দিতে হয়েছে যুদ্ধমান জাতিগুলিকে বহু মানুষের প্রাণ দিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করে।

মার্কিণ শাসক মহল ইউরোপে তাঁদের সৈন্য অবতরণের বিষয়টিকে সারা বিশ্বে ক্ষমতা বিস্তারের একটা স্তর বলে মনে করতেন। সেই কারণেই চার্চিল, এমন কি উনিশ শ' চুয়াল্লিশেও, বৃটিশ একচেটিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থে ইউরোপে অভিযান পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সেই জন্যেই তিনি আগে ইটালী অভিযানের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। ইটালী অভিযান জানুয়ারী মাসে সুরু হয়ে গদাইলস্করী চালে এগোতে লাগলো। অবশেষে পাঁচই জুন, মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্য রোমে প্রবেশ করলো।

ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করাটাকে প্রায় অবসম্ভাবী করে তুললো। তখন আরো দেরী করার অর্থ হতো ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর। সোভিয়েতের জয়োল্লাসে ফ্রান্সের স্থানে

স্থানে তখন কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ছে। ফরাসী দেশ প্রেমিক মানুষরা দেখছেন, ডিভিসনের পর ডিভিসন জার্মাণ সৈন্য পূর্ব দিকে চলে যাচ্ছে। অথচ ফিরে আসছে না কেউ।

আঠারোই মে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, মরিস তোরে বেতারে একটা ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আহ্বান জানালেন। ফরাসী মানুষেরা মুক্তির জন্যে যে সংগ্রাম সুরু করলেন, তাই ধীরে ধীরে সমস্ত জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলে ব্যাপক অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করলো। সারা পৃথিবী জুড়ে সব জায়গায় প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তি প্রমাদ গুণলো এতে।

মার্কিণ ও বৃটিশ শাসক মহল যখন উত্তর ফ্রান্সে সৈন্য অবতরণের আদেশ জারী করলেন, তখন জার্মাণীকে কেন্দ্র করে তাঁরা তাঁদের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা যতোদূর সম্ভব কার্যকরী করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। ফ্যাশিবাদের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব লোপ তাঁদের মনঃপুত ছিল না। বরং তাঁরা চেয়েছিলেন সামগ্রিক বিলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে, ইউরোপের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে যতোদূর সম্ভব রক্ষা করতে। আরো যা চেয়েছিলেন তাঁরা, তা হলো পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির গণতন্ত্রী-করণ এবং অগ্রসরমান সোভিয়েত সেনাদলের ক্রমাগত পশ্চিমমুখী অভিযান বন্ধ করে দিতে। মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাই পরস্পর পাল্লা দিতে লাগলো, সমগ্র বিশ্বে ক্ষমতা বিস্তারের আগামী সংঘর্ষে কে কতোটা সুবিধা দখল করে নিতে পারে।

জেনারেল ওমার এন. ব্রাডলী, যিনি ইউরোপে এক বিরাট মার্কিণ সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব করেছেন, নর্মাণ্ডি অবতরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

"মহাদেশে অরাজকতা এড়াবার জন্যে আমাদের পক্ষে যতোদূর সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করে, চ্যানেল পার হয়ে জার্মাণী পর্যন্ত ধাওয়া করে যাওয়া অতীব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সেখানে গিয়ে তাদের সৈন্যদলকে অস্ত্র ত্যাগ করিয়ে, সেই দেশের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হাতে নিতে হবে।"[১]

অবতরণ করার পরেই আইসেনহাওয়ার ফরাসীদের আদেশ দিলেন যে দখলকারী জার্মাণদের বিরুদ্ধে সমস্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ বন্ধ করতে। ফরাসী জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে জেনারেল কোনিগও অনুরূপ আদেশ জারী করলেন। ফ্রান্সে কমিটির প্রতিনিধিদের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় তিনি বলেন :

"যেহেতু বর্তমানে অস্ত্র শস্ত্র, গোলাবারুদ সরবরাহ করা আর কোন মতেই সম্ভব নয়, তাই সমস্ত গেরিলা কার্যক্রম একেবারে যা না করলে নয়, এমন ভাবে কমিয়ে দাও। আমি আবার বলছি সক্রিয়তা কমিয়ে দাও।"[২]

আসলে যা বলা হলো তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে ফরাসী দেশপ্রেমিকরা সমস্ত প্রতিরোধ ছেড়ে দিয়ে জার্মাণ কর্তৃপক্ষের আদেশ মেনে চলুক। একে ফরাসী জনগণের প্রতি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কি বলা যায়।

পশ্চিম ইউরোপে জার্মাণীর তখন মোট ষাট ডিভিসনের বেশি সৈন্য ছিল না, তার মধ্যে অবতরণ ক্ষেত্রের কাছাকাছি অঞ্চলে জেনারেল রোমেলের অধীনে ছিল নয়টি পদাতিক ও একটি প্যানসার ডিভিসন। তাছাড়া সামরিক শক্তিতে এই জার্মাণ ডিভিসনগুলি তাদেরই অন্য সেনাদলের তুলনায় তিরিশ ভাগ কম শক্তিশালী ছিল, এবং তাদের বয়সের মাত্রাও ছিল বেশ উপরের কোঠায় আবদ্ধ। অস্ত্র শস্ত্রের যোগানও তারা পেয়েছে কম। আর নর্মাণ্ডিতে জার্মাণীর মোট জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ছিল তখন তিন শ'র কাছাকাছি। অবিশ্যি অভিযান সুরু হওয়ার পরে বিমান বাহিনীর শক্তি দ্বিগুণ করা হয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এতোদিন যারা কোন বড় রকমের যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি, এই অভিযানে ব্যাপকভাবে তারা শক্তি প্রয়োগ করলো। স্থির ছিল প্রথমেই অবতরণ করবে ছত্রিশ ডিভিসন সৈন্য। তাদের থেকে দূরে দক্ষিণ ফ্রান্সে অবতরণ করবে আরো দশ ডিভিসন। আর চল্লিশ ডিভিসন সৈন্যকে সদা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত সংরক্ষিত বাহিনী হিসাবে রাখা হবে। আইসেনহাওয়ারের বিমান বাহিনীতে ছিল পাঁচ হাজার উনপঞ্চাশটি জঙ্গী বিমান, চৌদ্দ শ' সাতষট্টিটি ভারী ধরনের বোমারু, ষোলশ পঁয়তাল্লিশটি মাঝারি ও হাল্কা ধরনের বোমারু বিমান, তেইশ শ' ষোলটি সৈন্যবাহী বিমান ও পঁচিশ শ' একানব্বইটি গ্লাইডার। বৃটিশ মার্কিণ, ক্যানাডীয়, ওলন্দাজ, নরওয়েজীয়, পোলিশ, ফরাসী ও গ্রীক, এই কটি দেশের সম্মিলিত ছয় হাজার চারশ শ' তিরাশীটি যুদ্ধ ও যাত্রীবাহী জাহাজের এক বিরাট নৌবাহিনীকে চ্যানেল পারাপারের জন্যে নিয়োগ করা হোল। এরই মধ্যে ছিল ছয়টি যুদ্ধ জাহাজ ও পঁচিশটি ক্রুইজার।

সীন নদীর খাড়িতে সেরবুর্গ থেকে লা হাব্রে পর্যন্ত সত্তর মাইল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে অবতরণ করা হবে স্থির হল। অবতরণস্থানের একদিকে রইলো কুইয়েঁভিল শহর অন্য দিকে ওরেঁ নদীর খাড়ি মুখ। উপকূলের পশ্চিম

দিকে থাকবে মার্কিণ ও পূর্বদিকে বৃটিশ সৈন্য।[৩] অবতরণের ব্যাপারটিতে একটা অর্তকিত বিস্ময়ের ভাব আনার জন্যে, বন্দরবিহীন অঞ্চলটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরে মার্কিণ ও বৃটিশ বিমাণ এই অঞ্চলের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। রেডিয়োতে এই ঘটনার বিষয়ে একেবারে নীরবতা বজায় রাখা হয়। দূর দূরান্তের বন্দর থেকে জাহাজগুলি এই নির্দিষ্ট স্থানের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। আগেই জার্মাণীর রাডার কেন্দ্রগুলি বিমান আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলা হয়। অভিযানের সদর কার্যালয়ের সঙ্গে দু'মাস ধরে বাহির্জগতের সমস্ত যোগসূত্র ছিন্ন করে দেওয়া হয়। বৃটেনের যে যে অঞ্চলে এই অভিযানের প্রস্তুতিতে সৈন্য সবাবেশ করা হয় সেখান থেকে অসামরিক সমস্ত মানুষজন সরিয়ে দেওয়া হয়।

রাতের অন্ধকারে, ছয়ই জুন রাত দেড়টায় অভিযান সুরু করা হলো। অবতরণ ক্ষেত্রের খুব কাছাকাছি জার্মাণ সপ্তম সেনাদলের দু'ডিভিসন সৈন্য ছাড়া আর কোন শত্রু সৈন্য ছিল না। প্রথমেই নাবিয়ে দেওয়া হলো তিন ডিভিসন ছত্রী বাহিনী। সকাল সাড়ে ছ'টায় আরো পাঁচ ডিভিসন সৈন্য এসে পৌঁছলো।

অভিযানে মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের আধিনায়ক অ্যাডমিরাল র‍্যামসে বলেছেন, "চ্যানেল অতিক্রম অবিশ্বাস্যভাবেই বিনা বাধায় করা গেল", অবতরণের প্রথম দিনে জার্মাণরা বার পঞ্চাশেক বিমানে হানা দেয়। স্থলে জার্মাণদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল নিতান্ত দুর্বল। ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে, জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব অনুমান করলেন যে নিশ্চয়ই এরা উপকূলেই বসে থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে জার্মাণরা রওনা হলো প্যারীর দিকে। পরে টিপ্পলস্কার্চ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "জার্মাণ সামরিক কর্তৃপক্ষ সীনের উত্তরে আরো বড়ো রকমের অবতরণের প্রত্যাশা করেছিলেন, সুতরাং যা তাঁরা দেখলেন তাতে একে একটি ভূমিকা, একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রচেষ্টা বলে মনে করেছিলেন।"[৪]

কিন্তু এ সত্ত্বেও অবতরণ কার্যক্রম তার সময়সীমাকে অতিক্রম করে সংঘটিত হয়। সমগ্র অবতরণক্ষেত্র জুড়ে যে আক্রমণমুখ রচনা করা হলো, তা শেষ করতে সাতদিন লেগে গেল। অথচ স্থির ছিল দু'দিনেই তা সম্পূর্ণ হবে। এই সাতদিনে অবতরণের পাঁচটি বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে,

প্রায় আশী কিলোমিটার দীর্ঘ এক আক্রমণমুখ রচনা করা হলো। তার গভীরতা ছিল দশ থেকে আঠারো কিলো মিটারের মধ্যে।

ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষরা যাঁরা এতোদিন আইসেনহাওয়ার ও কোনিগের আদেশ উপেক্ষা করে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা উত্তর ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিণ অবতরণে নানাভাবে কার্যকরী সাহায্য করে গেলেন। ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের নর্মাণ্ডি উপকূলের অবতরণ ক্ষেত্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে পরিচালিত ফরাসী দেশ প্রেমিক যোদ্ধারা বিয়াল্লিশটি শহর ও শতাধিক গ্রাম দখল করে নেয়। এতে মিত্রপক্ষের অবস্থান সুরক্ষিত করে নিয়ে আক্রমণের প্রস্তুতিক্ষেত্র বিস্তৃত করে দিতে সুবিধা হয়। কিছুটা ক্ষোভের সঙ্গে হলেও আইসেনহাওয়ারকে স্বীকার করতে হয়েছে যে "এই অভিযানে পার্টিজানদের অপদান অপরিমেয়। বৃটানীতে তারা ছিল সবচেয়ে সক্রিয়, কিন্তু রণাঙ্গনের সমস্ত ক্ষেত্রে অসংখ্য উপায়ে তারা আমাদের সাহায্য করেছে। তাদের কাছ থেকে এই বিরাট সাহায্য না পেলে, ফ্রান্সের মুক্তি এবং পশ্চিম ইউরোপে শত্রুর পরাজয় সম্ভব করতে আমাদের সময় লাগতো বেশি আর ক্ষয়ক্ষতি হতো আরো বেশি।"[৫]

কিন্তু এতোটা অনুকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও, ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযান এগোতে লাগলো প্রায় শম্বুক গতিতে, দৈনিক গড়ে চার কিলো মিটারের মতো। ইঙ্গ-মার্কিণ নীতি নিয়ামকরা তখনো বিরাট আকারে অভিযান চালাতে নারাজ। কারণ তাহলে জার্মাণরা সোভিয়েত অগ্রগতি আর প্রতিরোধ করতে পারবে না। ইঙ্গ-মার্কিণদের এই দীর্ঘসূত্রী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে জার্মাণ ফ্যাশিস্তরা অবাধে পশ্চিম থেকে পূর্ব রণাঙ্গণে সৈন্য পাঠাতে লাগলো।

এই অনিচ্ছা ও জার্মাণ যুদ্ধশিল্প যার অনেকখানি ছিল ইঙ্গ-মার্কিণ সম্পত্তির অন্তর্গত, এই উভয় কারণে মিত্রপক্ষের বিমান আক্রমণ জার্মাণ যুদ্ধ যন্ত্রে আঘাত না করে, শহরের নাগরিকদের উপর বোমাবর্ষণ করতে লাগলো।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে জার্মাণীর যুদ্ধোৎপাদনের পরিমাণ, উনিশ শ' বিয়াল্লিশের তুলনায় ছিল শতকরা একশ' আশীভাগ বেশি। বছরের পর বছর তার বৃদ্ধি কিভাবে হয়েছে পরের পৃষ্ঠায় পরিসংখ্যানে তা বোঝা যাবে :[৬]

	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩	১৯৪৪
রাইফেল ও কার্বাইন (হাজার হিসাবে)	১,৩৫২	১,৩৫৯	১,৩৭০	২,২৪৪	২,৫৮৬
পদাতিক বাহিনীর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র (হাজার হিসাবে)	১০১	৩২৫	৩০৭	৪৩৫	৭৮৭
মাইন ক্ষেপণাস্ত্র (হাজার হিসাবে)	৪	৪	১০	২৩	৩১
৭৫ মি. মি. কামান (হাজার হিসাবে)	৫	৭	১২	২৭	৪১
ট্যাঙ্ক ও সাঁজোয়া গাড়ী (হাজার টন হিসাবে)	৩৭	৮৩	১৪০	৩৬৯	৬২২
যুদ্ধ বিমান (হাজার হিসাবে)	১০	১১	১৫	২৫	৩৮
অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা বারুদ (হাজার টন হিসাবে)	৮৬০	৫৪০	১,২৭০	২,৫৫৮	৩,৩৫০

ইঙ্গ-মার্কিণ প্রচার বিভাগগুলি, জার্মাণীর উপর মিত্র পক্ষের বিমান আক্রমণের রণনৈতিক গুরুত্বের ব্যখ্যায় অতিশয়োক্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে লাগলো। আসলে কিন্তু যুদ্ধের পরিণতিতে এই বিমান আক্রমণের তেমন কোন বিশেষ অবদান ছিল না। যেমন ফুলার বলেছেন যে, বিমান আক্রমণের কিছু প্রভাব, যা কিছু চাপ, সব গিয়ে পড়েছিল আসামরিক মানুষের উপরে।[৭] জার্মাণ যুদ্ধশিল্প প্রায় অক্ষতই রয়ে গেল এবং সমানে উনিশ শ' চুয়াল্লিশ পর্যন্ত তাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে গেল। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের প্রথম ছয় মাসে, জার্মাণী ও জার্মাণ অধিকৃত অঞ্চলের উপর বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অধিকতর পরিমাণে বোমা বর্ষণ করা সত্বেও যুদ্ধের অন্যান্য বছরের তুলনায় অন্ততঃ জানুয়ারী উনিশ শ' তেতাল্লিশ পর্যন্ত উৎপাদনের যে হার ছিল, এখন তা বৃদ্ধি পেয়ে গেল।[৮]

ন্যুরেমবার্গের বিচার সভায় নাৎসী যুদ্ধোৎপাদন ও অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রী স্পীয় (Speer) বলেন যে, ইঙ্গ-মার্কিণ বিমান বাহিনীর আক্রমণ কৌশলের এই ধরণ দেখে হিটলারও বিস্মিত হয়েছিলেন।

কিন্তু এতো সব কথা বলা সত্বেও, স্বীকার করতেই হবে যে জার্মাণীর উপর

বিমান আক্রমণের ফলাফল ভালোই হয়েছিল। এরই জন্যে জার্মাণীর জনবলের একটা বড়ো রকমের অংশকে বিমান আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে নিয়োগ করতে হয়। এখানে প্রসঙ্গতঃ একথা বলাটাই যথেষ্ট হবে যে উনিশ শ' বিয়াল্লিশে জার্মাণীর বিমান বিধ্বংসী বাহিনীতে নিযুক্ত ছিল চার লক্ষ উনচল্লিশ হাজার সৈনিক। উনিশ শ' তেতাল্লিশে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় লক্ষ এবং উনিশ শ' চুয়াল্লিশে নয় লক্ষেরও বেশি।

প্রতিশোধস্পৃহায় জার্মানীও আকাশ থেকে নিয়ন্ত্রিত মিসাইল ব্যবহার করতে লাগলো বৃটেনের বিরুদ্ধে। তেরোই জুন, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে এই মিসাইল* ব্যবহার সুরু হয়। আর পরবর্তী আশী দিনে নাৎসীরা আট হাজার মিসাইল নিক্ষেপ করে। তাদের মধ্যে শতকরা উনত্রিশটি লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত করে। শতকরা ছেচল্লিশটি আঘাত করারপূর্বেই নীচের থেকে গুলী করে ভেঙ্গে দেওয়া হয় আর শতকরা পঁচিশটি বিপথে চলে যায়।

॥ দুই ॥

যুদ্ধে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করার সময়েও, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার একদিকে নোতুন করে সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্ত করে চললেন, অন্যদিকে ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিভ্রান্তি সৃষ্টির জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজ করতে লাগলেন।

সুইজারল্যাণ্ড থেকে মার্কিণ দেশের সেরা গুপ্তচর অ্যালান ডালেসের পরিচালনায়, মার্কিণ গুপ্তচর বিভাগ একটা বড়ো রকমের নোতুন ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে লাগলো। এর চরম লক্ষ্য ছিল হিটলার জার্মানীকে সম্পূর্ণ পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে, ফ্যাশিস্ত সেনাদলের সহায়তায় সোভিয়েত বাহিনীর পশ্চিমমুখী অগ্রগতি রোধ করা। এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে জার্মানীর সোশ্যিয়ালিষ্ট ইউনিটি পার্টির তত্ত্বগত পত্রিকা আইনহেইটে (Einheit) লেখা হয় :

"ফ্যাশিস্ত একনায়কত্বের উচ্ছেদ করে তার পরিবর্তে একটা গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম করা এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের নীতি পরিবর্তন করে একটা শান্তির নীতি চালু করার উদ্দেশ্য নিয়েও এই ষড়যন্ত্র করা

হয়নি। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জঙ্গী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থাকে চূড়ান্ত বিপর্যয়ের মুখ থেকে রক্ষা করা।"[৯]

হিটলারকে বিসর্জন দিতে ষড়যন্ত্রকারীরা প্রস্তুত ছিল। তারা হিটলারকে সরিয়ে হিটলারের নীতিকে, ফ্যাশিস্ত সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিল। এর পরে জার্মাণ নীতিতে মাত্র একটি পরিবর্তন হবে, তা হলো বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের সম্পর্ক পরিবর্তন করে আনা হবে শান্তিময় সহযোগিতা। হিটলারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সঙ্গে সঙ্গেই, আইসেনহাওয়ারের কাছে কোন প্রতিনিধি পাঠিয়ে আত্মসমর্পণের সর্তাবলী আলোচনা না করে, ত্বরায় একটা যুদ্ধ বিরতি চুক্তি করা হবে। ততোক্ষণে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন তাদের সৈন্যদল প্রস্তুত করে ফেলবে, বিমানে তাদের জার্মাণীতে নিয়ে আসার জন্যে, যাতে জার্মাণ জনগণের সম্ভাব্য বিরোধিতাকে স্তব্ধ করে দিয়ে মার্কামারা প্রতি-ক্রিয়াশীল ও জঙ্গীবাদীদের নিয়ে একটা সরকার গঠন করা যায় এবং পূর্ব সীমান্তে নোতুন করে সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রাখা যায়।

অ্যালেন ডালেস ওয়াশিংটনে খবর পাঠালেন যে এই ষড়যন্ত্রের ফলে, "জার্মাণ ভূখণ্ডের উপর পূর্বদিক থেকে আশংকা অন্তর্হিত হবে...এবং সোভিয়েত সেনা-দলের অধিকার থেকে জার্মাণীর বেশির ভাগ অংশকেই রক্ষা করে যাবে।"[১১] এই ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ছিলেন ফিল্ড মার্শাল রোমেল। তিনি বলেন যে একটা ভবিষ্যৎহীন যুদ্ধে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার চেয়ে, জার্মাণীর পক্ষে অনেক ভালো হবে সময় থাকতে যুদ্ধ শেষ করে একটা বৃটিশ ডোমিনিয়নে পরিণত হওয়া।[১২]

ষড়যন্ত্রকারীদের ধারণাই ছিল সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীকে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা আরো দুর্দম হয়ে অব্যাহত থাকবে। ডালেস বলেন: "ষড়যন্ত্রের সার কথা হলো এই যে নাৎসী বিরোধী জেনারেলরা মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্যের জার্মানী অধিকারে পথ প্রশস্ত করে, পূর্ব সীমান্তে রুশদের গতিরোধ করবে।"[১৩]

তেরোই জুলাই এক সংকেতিক বার্তায় ডালেস ওয়াশিংটনকে জানালেন যে, ষড়যন্ত্র সফল হলে, পশ্চিম দিক থেকে জার্মাণ সৈন্যরা সুশৃঙ্খল ভাবে পেছনে সরে যাবে, যাতে জার্মানীর সেরা ডিভিসনগুলিকে পাঠানো যায় পূর্ব রণাঙ্গনে।[১৪]

জার্মানীতে এটাই অবিশ্যি প্রথম ষড়যন্ত্র নয়। কিন্তু অন্যান্য বারের তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে এর সব অংশ পুরোপুরি ছকে ফেলা হয়েছিল। ডালেস লিখেছেন যে ওয়াশিংটন ও লণ্ডনকে, "ষড়যন্ত্রকারীরা কি করতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে আগের থেকেই সম্পূর্ণ ওয়াকেবহাল করে রাখা হয়েছিল।"[১৮] এই দলের প্রখ্যাত লোকদের মধ্যে ছিলেন ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী হাজ্‌লমার শাখ্‌ট ও কয়েকজন জার্মাণ শিল্পপতি ও অর্থলগ্নীকারী। শাখ্‌ট সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে ডালেসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। দেখা হলো আরো অনেক মার্কিণ ব্যাঙ্কারদের সঙ্গে। তাঁদের আলোচনা চলে জার্মানীতে ফ্যাশিস্ত একনায়কত্বের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আলোচনায় শাখ্‌ট, মার্কিণ কোটিপতিদের জানান যে সাহায্যের প্রতিদানে তিনি রূঢ় সমেত জার্মাণ শিল্প ব্যবস্থা ও অর্থনীতির একটা অংশ তাদের পুরস্কার স্বরূপ দেবেন। একদিক থেকে বলা যায় যে উনিশ শ' চব্বিশে ডাওয়েস পরিকল্পনা (Dawes Plan) রচনা কালে, জন ফষ্টার ডালেসের সঙ্গে শাখ্‌টের যে আলোচনা হয়েছিল বর্তমান আলোচনা ছিল তারই একটা ক্রমিক স্তর মাত্র।

ষড়যন্ত্রকারী দলের একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন হান্‌স গিসেভিয়াস। একজন নামকরা অফিসার ছিলেন তিনি জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগের। এই দলের আরেকজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন বৃটিশ শিল্পপতি গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, জার্মাণ শিল্পপতি কার্ল গোয়েরডেলার (Goerdeler)।

এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে বেশ কিছু জার্মাণ জেনারেল যুক্ত ছিলেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন ফিল্ড মার্শাল এরউইন ভন্ ভিট্‌জলেবেন (Witzleben) এবং জেনারেলদের মধ্যে আলেকজান্দার ফলকেনহাউসেন, লুড্‌ভিগ্‌ বেক্, এরিক হোয়েপনার, সেপ্‌ ডিয়েট্রিচ্‌ ইত্যাদি। জন কয়েক প্রাক্তন সোস্যাল ডেমোক্রট নেতা, যাঁদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতনামা হলেন উইলহেল্ম লেউসচেনার তাঁরাও এদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। "পুরাতনপন্থী" কয়েকজন জার্মাণ কূটনীতিবিদ্ যথা—কাউন্ট ভেরণার ভন্ ডের শুলেনবার্গ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত; রোমে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ও অ্যাড্‌মিরাল অ্যালফ্রেড্‌ ভন্ তিরপিৎজের জামাতা উলরিচ্‌ ভন্ হাস্‌সেল, অটো বিসমার্কের পৌত্র গট্‌ফ্রিয়েড্‌ বিসমার্ক এবং ওয়ারস' ও মাদ্রিদে প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত কাউন্ট হেলমুট ভন্ মোলট্‌কে প্রভৃতি এই দলে যোগদান করেন।

ষড়যন্ত্রকারীরা বার্লিনে এক সদর কার্যালয় স্থাপন করে, ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় কে কোন পদ অধিকার করবে তারও একটা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেয়। স্থির হয় ভিট্জলেবেন হবেন রাষ্ট্রপতি, চান্সেলারের পদ বৃটিশ আগ্রহাতিশয্যে গোয়েরডেলারের জন্যে সংরক্ষিত রাখা হলো। ভাইস চ্যান্সেলারের পদ পাবেন লেউসচেনার। হাস্সেল হবেন এই সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বেক্ যুদ্ধমন্ত্রী এবং হোয়েপ্নার সমর নায়ক পরিষদের সভাপতি।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালের মধ্যেই একথা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে সোভিয়েত ইউনিয়নের একক প্রচেষ্টায়, বাইরের কোন সাহায্য ব্যতিরেকেই হিটলার জার্মাণী বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এই পটভূমিতেই বোঝা যায় ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির নর্মাণ্ডিতে অবতরণ ও অ্যালেন ডালেসের ষড়যন্ত্রকারীদের একটা অভ্যুত্থান ঘটানোর আদেশ দেওয়ার তাৎপর্য।[১৬] ডালেসের অনুচররা ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশে যথাযথ উপদেশ পাঠিয়ে দিলেন। গিসেভিয়াস বেকের কাছে লেখেন, "সময় আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে না......আমাদের এখনই কাজ করতে হবে।" অভ্যুত্থানের দিন স্থির হলো বিশে জুলাই, উনিশ শ' চুয়াল্লিশ। সেইদিন গিসেভিয়াস ডালেসের চূড়ান্ত আদেশ ও নির্দেশ সহ বার্লিনে এসে উপস্থিত হলেন।[১৭]

হিটলারের জীবননাশের চেষ্টা করা হলো সেই দিনই। কাজের দায়িত্ব নিলেন জনৈক জার্মাণ সেনাদলের কর্ণেল, ক্লাউস ভন্ ষ্টার্ডেকেনবার্গ। হিটলারের সদর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে, হিটলারের চেয়ারের অল্প দূরেই একটা চামড়ার ব্যাগে একটি টাইম বোমা রেখে দেওয়া হলো। ঠিক যে মুহূর্তে যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে, জেনারেল হেউসিঙ্গার বলেছেন যে এখনি যদি জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হয় তাহলে "সমূহ বিপর্যয় ঘটবে", বোমাটা ফেটে গেল।[১৮] বিস্ফোরণে কয়েকজন নিহত ও আহত হলো। কিন্তু অলৌকিকভাবে হিটলার শরীরে সামান্য কিছু কাটা পোড়ার দাগ নিয়ে বেঁচে গেলেন। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হলো কিন্তু হিটলার হিংস্র ভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কিন্তু হিটলারের প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার জন্যেই, ষড়যন্ত্রটা ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থতার কারণ আরো গভীরে নিহিত ছিল। যেমন বলা যায় যে ষড়যন্ত্রকারীরা মনের দিক থেকে জার্মাণ জনগণের থেকে বহু দূরে ছিল।

জনগণের প্রতি তাদের মনোভাব ছিল শত্রুভাবাপন্ন। জনগণের মধ্যে সমর্থন ছিল না তাদের মোটেই। তাই অন্য কারো সাহায্যের উপর তারা নির্ভর করতে পারতো না। ব্যর্থতার পক্ষে এই একটি কারণই যথেষ্ট। তা ছাড়া সোভিয়েত সেনাদল যখন ক্রমেই এগিয়ে আসছিল, তখন এই ধরণের কোন ষড়যন্ত্র সফল করা ছিল প্রায় একরকম অসম্ভব। হিটলারের প্রাণনাশের চেষ্টা যখন করা হয়, তখন হিটলারের সদর কার্যালয় ছিল পূর্ব প্রাশিয়ার রাস্টেনবার্গে। সোভিয়েত সেনাদলের অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি দেখে, সদর কার্যালয় সরিয়ে আনা হলো। বিভিন্ন জায়গায় কয়েকদিন ধরে অস্থায়ী কার্য্যালয় স্থাপন করার পর, শেষপর্যন্ত তা সরিয়ে আনা হলো একেবারে চ্যান্সেলারী ভবনে। বিমান আক্রমণ ব্যাহত করার জন্যে এর ছিল সুরক্ষিত আশ্রয় কক্ষ। জার্মাণ সরকার ও সামরিক সদর কার্যালয়ের অবস্থান রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার অঙ্গীভূত বলে ঘোষণা করা হলো।

কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার পরেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকরা পিছন থেকে কলকাটি নাড়ায় ক্ষান্ত হলেন না। লণ্ডনে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত জন গিলবার্ট উইন্যান্ট বলেন যে বৃটেনের সরকারী মহলে এমন একদল লোক আছেন যাঁরা, "জার্মাণীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী ঘাঁটি, বাফার রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চান, শুধু এই বিশ্বাস থেকে যে পুনর্গঠিত, শক্তিশালী জার্মাণীর চেয়ে, কমিউনিজম্ আরো ভয়াবহ।" [১৯]

বৃটিশ সরকার তখনো পর্যন্ত তাঁদের "বলকান রণকৌশল" কার্যকরী করার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের আগষ্টে, চার্চিল ইটালী গেলেন, দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে অভিযানের প্রস্তুতি করতে। পোপ দ্বাদশ পায়াসের সঙ্গে তাঁর ইটালীর গণতন্ত্রীকরণে বাধা দিয়ে রাজতন্ত্রকে রক্ষা করার বিষয়ে নানা আলোচনা হলো। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় ক্যাথলিক চার্চের ভূমিকা কি হবে সে আলোচনাও বাদ গেল না।

স্মৃতি কথায় চার্চিল লিখেছেন যে পোপের সঙ্গে আলোচনায় তাঁদের বিষয়বস্তুর অভাব ঘটেনি আদৌ। তিনি লিখেছেন: "এরই মধ্যে যে বিষয়-বস্তু সাক্ষাৎকারের বেশির ভাগ সময় নিয়ে নেয়, সেই বিষয়টি আঠারো বছর পূর্বে, তাঁর পূর্বসূরীর সঙ্গে আলোচনাতেও প্রাধান্য লাভ করেছিল। সেটা

হলো সাম্যবাদের বিপদ। চিরকাল এই জিনিসটাকে আমি দারুণ অপছন্দ করে এসেছি, যদি আমি আবার কোনদিন মহামান্য পোপের সমক্ষে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ পাই, তাহলে আবার এই একই বিষয়ে আলোচনা করতে আমি ইতস্ততঃ করবো না।"[২০]

ভ্যাটিক্যানে পোপের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরে চার্চিল পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের বহু প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর সঙ্গে একের পর এক রোমে গোপন বৈঠকে মিলিত হলেন। সেই সব দলের মধ্যে ছিল হাঙ্গেরীর হোরথী অনুগামীরা, অষ্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌সবার্গরা, সোভিয়েত বিরোধী পোলিশ নেতা আন্দের্সের অনুচররা, বুলগেরিয়ার রাজতন্ত্রী, রুমেনিয়ার জাতীয় জারপন্থী, যুগোশ্লভিয়ার চেৎনিক, গ্রীসের ফ্যাশিবাদী রাজতন্ত্র ও আলবেনিয়ার বল অনুগামীরা (Ballists)।[২১] চার্চিল তাদের নিজের দেশে আসন্ন বৃটিশ অভিযানের প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করতে বলেন।

পোলিশ পলাতক সরকার এই জনবিরোধী কার্যক্রম একেবারে লুফে নিল, এবং মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের কাছে প্রস্তাব করলো যে এবার তারাই পোল্যাণ্ডে "রাজনৈতিক সক্রিয়তা" সুরু করবে এবং ওয়ারসে একটা অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনাও তাদের আছে।[২২] ওয়ারস' অভ্যুত্থান পরিকল্পনার চূড়ান্ত খসড়াটি মিকোলাইসিজিক ও চার্চিলের মধ্যে এক গোপন আলোচনায় স্থির করা হলো। জার্মাণ-ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিব্রত করার জন্যে এই অভ্যুত্থান করা হবে না। এটা ছিল এই কথাটা প্রমাণ করার জন্যে একটা রাজনৈতিক খেলা যে, পলাতক সরকারের এখনো পোল্যাণ্ডে যথেষ্ট প্রভাব আছে। বিকাশমান জনগণতন্ত্রী পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েত সেনাদলের বিরুদ্ধে এটা ছিল একটা মারাত্মক পরিকল্পনা। তাই পোলিশ প্রতিক্রিয়ার চক্র লণ্ডন ও ওয়াশিংটনে কূটনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে গোপন শলা পরামর্শে বসে গেল। এবং শেষ পর্যন্ত যা তারা করলো তাকে পোলিশ দেশপ্রেমিক মানুষের ব্যাপক হত্যা ও স্বেচ্ছাকৃত ভাবে ওয়ারস' ধ্বংস করে দেওয়ার মতলব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এটা নিশ্চয়ই তাদের অজানা ছিল না যে নাৎসীদের একটা বড়ো রকমের প্যানসার বাহিনী সেই অঞ্চলেই রয়েছে।

এস. এস. দলের সদস্য এবং ওয়ারস'য় হিটলারের সহকারী প্রতিনিধি,

এরিক ভন্ দেম বাক-জেলেউস্কির আত্মীয়, তাদেউসজ্ বোর-কোমোরো-উস্কিকে এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব করতে বললেন পলাতক সরকার।

অভ্যুত্থান পাকিয়ে তোলার জন্যে, পোলিশ প্রতিক্রিয়ার চক্র নিজেদের জাতীয় মুক্তির সেরা যোদ্ধা বলে জাহির করতে লাগলো। তাদের আশা ছিল এই ভাবে মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্ব লাভ করতে পারলে, সেটাকে সুযোগ মতো বানচাল করে দেওয়া যাবে। আসলে তারা যা চেয়েছিল তা হচ্ছে এই যে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্যে হলেও, ওয়ারস'য় পলাতক সরকারের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু সেই অভ্যুত্থানের ব্যর্থতাও যেন পূর্বনির্দিষ্ট ছিল।

ওয়ারস' অভ্যুত্থানের সুরু হলো পয়লা আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। সোভিয়েত বাহিনী ওয়ারস' থেকে তখনো বেশ কিছুটা দূরে আছে। তখন তাদের ভিশ্চুলা পার হতে হবে, যেখানে জার্মাণরা বেশ শক্তি সমাবেশ করেছে এবং গড়ে তুলেছে মৌচাকের মতো অসংখ্য সামরিক ঘাঁটি। সান্দোমিরের দক্ষিণে সোভিয়েত সেনাদল নদী পার হওয়ার একটা ব্যবস্থা গড়ে তুললো। সোভিয়েত সেনাদল যখন ভিশ্চুলায়, ওয়ারস'র অপর তীরে এসে উপস্থিত হলো তখন সেপ্টেম্বর মাসের চোদ্দ তারিখ হয়ে গেছে। এর মধ্যে মুক্ত করেছে তারা প্রাগা শহর, যাকে নদীর পূর্ব তীরে ওয়ারস'র একটা শহরতলী বলা যায়। কিন্তু নাৎসীরাও অবস্থা বুঝে প্রাগার সঙ্গে পোলিশ রাজধানীর যোগাযোগ সেতুটা উড়িয়ে দিয়েছে।

অভ্যুত্থান সুরু করে ক্রাজোয়ার এক সামরিক শাখা—আর্মিয়া ক্রাজোয়া যারা পলাতক সরকারের নির্দেশানুসারেই সব কাজ করতো। কিন্তু সেই দলের মধ্যেও দেশপ্রেমিক মানুষের অভাব ছিল না, যাঁরা জার্মাণ দখলদারী সৈন্যের উপর প্রতিশোধ বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাঁদের নেতাদের রাজনৈতিক মতলববাজী সম্পর্কে তাঁরা প্রায় কোন কিছুই জানতেন না। অভ্যুত্থানের মুহূর্তে কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে সংগঠিত আর্মিয়া লুদোয়া এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে।

পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটির সদস্যরা যাঁরা তখন ওয়ারস'য়ে থেকে আত্ম-গোপনকারী সংস্থাগুলিকে সংগঠিত করেছিলেন, তাঁরা এবং আর্মিয়া লুদোয়া পার্টিজান দলের নেতারা এই রকম অভ্যুত্থানের সময় তখনো আসেনি বলেই

মনে করতেন। তাঁরাই অভ্যুত্থানের সংগঠকদের পরে পোলিশ জাতির প্রকৃত স্বার্থের অবহেলা করার দোষে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু অন্য ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও, তারা এই অভ্যুত্থানে যথাসাধ্য সাহায্য করে গেলেন। আর্মিয়া লুদোয়া ও আর্মিয়া ক্রাজোয়া যৌথ সক্রিতায় সম্মত হওয়ায় ওয়ারস'য়ে একটা প্রতিরক্ষা সদর কার্যালয় স্থাপন করা হলো।

অভ্যুত্থান যখন সুরু হোল, তখন মিকোলাইসিজিক, ক্রাজোয়া রাদা নারোদোয়ার কাছে দাবী জানালেন যে পলাতক, জনপ্রিয়তাহীন পোলিশ সরকারের সদস্যদের আসন্ন পোলিশ সরকারের প্রায় সমস্ত উচ্চ পদগুলি দিতে হবে এবং পিলসুদস্কির ফ্যাশিপন্থী সংবিধান আবার চালু করতে হবে। বলা বাহুল্য তাঁর এই দাবী প্রত্যাখ্যাত হলো।

ওয়ারস'য় এই অকালে সংগঠিত ব্যর্থ অভ্যুত্থানের সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে থাকার বিষয়টি, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার কোনমতেই গোপন রাখার চেষ্টা করেননি। চার্চিলের কাছ থেকে প্রাপ্ত এক বাণীর প্রত্যুত্তরে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীপরিষদের সভাপতি বলেন :

"আজ হোক বা কদিন পরেই হোক যে ক'জন ক্ষমতালোভী লোক ওয়ারস'য়ে এই অ্যাডভেঞ্চার সংগঠিত করেছে, তাদের সম্পর্কে সত্য প্রকাশিত হবে। এই লোকগুলি, ওয়ারস'র মানুষের সরল বিশ্বাসপ্রবণতাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নিরস্ত্র মানুষদের নাৎসী কামান, বন্দুক ও বিমান আক্রমণের সামনে অসহায়ভাবে ছেড়ে দিয়েছিল। ফলে পরিণাম তার এমনই দাঁড়ালো যখন প্রতিটি দিন যা কাটতে লাগলো, তাতে পোলিশ জনগণ ওয়ারস'কে মুক্ত করার সংগ্রাম করতে পারলো না। হিটলারের অনুচররা নিষ্ঠুরভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে অসামরিক মানুষদের নির্বিচারে খুন করতে লাগলো।"[২৩]

প্রথম ক'দিনে অভ্যুত্থান বেশ সফল হয়েছিল। টিপ্পলস্কার্চ লিখেছেন :

"প্রথম দিকে এর সাফল্য রীতিমতো হতবুদ্ধিকর মনে হয়েছিল। শহরে জার্মাণদের সমস্ত সামরিক ও অসামরিক দপ্তরের সঙ্গে বহির্জগতের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অভ্যুত্থানকারীরা রেলষ্টেশনগুলি দখল করে নেয়। তাদের সঙ্গে অস্ত্র-শস্ত্রও ছিল অনেক, যেমন মাইন ক্ষেপণাস্ত্র, বিশ মিলিমিটারের বিমান বিধ্বংসী কামান ও নানা ধরণের ট্যাঙ্ক ধ্বংসী অস্ত্র। শহরের প্রধান

প্রধান সমস্ত রাস্তাই তারা অবরুদ্ধ করে ফেলে। কেবল ভিশ্চুলা নদীর উপর সেতুগুলি ছিল জার্মাণদের হাতে।"[২৪]

ওয়ারস'র নাগরিকরা একে মুক্তি সংগ্রাম মনে করে তাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে একাগ্রচিত্তে এতে অংশ গ্রহণ করলো। তাদের বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ আছে। কিন্তু শক্তির বিচারে শত্রুর তুলনায় অভ্যুত্থানকারীরা ছিল নিতান্ত দুর্বল। মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার অভ্যুত্থানে কোন রকম সাহায্য করতে ব্যর্থ হয়ে গেলেন। এই সাহায্য কত তুচ্ছ ছিল তা চার্চিলের নিজের মুখেই শোনা যাক্। তিনি এর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "চৌঠা আগষ্টের রাতে দু'টি বিমান এর উপর দিয়ে ঘুরে যায়। আর চার রাত পরে আসে আরো তিনটি বিমান।"[২৫] বিমান থেকে কিছু অস্ত্র নিচে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের বেশির ভাগ পড়ে জার্মাণ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে। ইতিমধ্যে সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্ব প্যারাশুটে করে অভ্যুত্থানকারীদের অধিকৃত অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ পাঠিয়ে দেন।

নাৎসীরা অধিবাসী সমেত এই শহরটি ধ্বংস করার জন্যে বিরাট এক সেনা-দল পাঠায়। তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই গাড়ীর সামনে পোল শিশুদের রেখে এগোতে থাকে। ট্যাঙ্কের সামনে তারা দাঁড় করিয়ে দেয় অসহায় পোল মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে। আর জার্মাণ গোলন্দাজ বাহিনী বাড়ীর পর বাড়ী, শহরের একের পর এক অঞ্চলগুলি গোলার আঘাতে ধূলিসাৎ করতে থাকে।

পলাতক পোলিশ সরকার এই অভ্যুত্থানে কোন সাহায্যই করতে পারেননি। কিন্তু মার্কিণ সরকারের কাছে এক স্মারকলিপি পাঠিয়ে তাঁরা পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া ও জমিদারতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যে আবেদন জানালেন। এই স্মারকলিপি রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের বিচার বিবেচনার জন্যে পেশ করার সময়ে, পররাষ্ট্র মন্ত্রী কর্ডেল হাল মন্তব্য করেন যে এর প্রতিটি শব্দ তিনি সমর্থন করেন।[২৬]

ভিশ্চুলার তীর পর্যন্ত সোভিয়েত সেনাদলের অগ্রগতি প্রতিকূল অবস্থার চাপ কিছুটা হাল্কা করে দিল। ষোলই সেপ্টেম্বর রাতে সোভিয়েতের বিমান বাহিনী ও গোলন্দাজদের পাহারায় পোলিস সৈন্যরা নদী পার হয়ে পশ্চিম তীরে গিয়ে উঠলো। এবং ওয়ারস'য় পৌঁছলো তারা অল্পকাল পরেই। কিন্তু তা

সত্ত্বেও তারা তাদের সক্রিয়তার সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ স্থাপন করতে পারলো না। আর্মিয়া ক্রাজোয়ার অধিনায়করা এই সেনাদলের সঙ্গে তাঁদের অধীনস্থ সৈনিকদের কোন যোগাযোগ করতে দিলেন না। তেইশে সেপ্টেম্বর পোলিশ সৈন্যদল যে সংকীর্ণ অংশে অবস্থান করছিল তা পরিত্যাগ করতে হলো। এই সময়েই পলাতক সরকার আদেশ পাঠালেন যে অভ্যুত্থানকারীরা যেন অস্ত্র ত্যাগ করে, জার্মাণদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। অভ্যুত্থানকারীদের একাংশ এই আদেশ অনুযায়ী কাজ করে এবং পরিণামে নাৎসীদের গুলির আঘাতে প্রাণ দেয়।

ওয়ারস' অভ্যুত্থানের ভুলের মাশুল পোলিশ জনগণকে প্রভূত রক্তের বিনিময়ে দিতে হয়েছে। আড়াই লক্ষ মানুষ নাৎসীদের প্রতিহিংসার বলি হয়ে প্রাণ দেয়। সংখ্যা হয়তো আরো বেশি হতো, যদি না সোভিয়েত নেতৃত্ব এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যতোদূর সম্ভব অভ্যুত্থানকারী ও ওয়ারস'র অসামরিক জনগণকে সাহায্য করতে পারতেন। সোভিয়েত ও পোল সেনাদলের যৌথ প্রচেষ্টায় সেই অবরুদ্ধ ও প্রজ্বলিত শহর থেকে পোলিশ অসামরিক নাগরিকদের অনেকে নদী পার হয়ে ভিশ্চুলার পূর্ব তীরে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন।

প্রতিক্রিয়ার বহু সযত্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সেনাদল ফ্যাশিস্ত জার্মানীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামে শরিক হলো। ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন মহাযুদ্ধের বিজয় সাফল্যকে ত্বরান্বিত করলো, যদিও ফ্যাশিস্ত জোটের মূল সংগ্রামী শক্তি সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনেই পর্যুদস্ত হয়ে যায়। মার্কিণ ও বৃটিশ সৈনিক ও অফিসাররা নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। তাই সুযোগ যখন এসে গেল, তখন সাহসের সঙ্গে তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো শত্রুর বিরুদ্ধে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন বৃদ্ধি করে, রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলকে যোগান দিয়ে গেল তাদের প্রয়োজনীয় রসদ। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মধ্যে যে রাজনৈতিক মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা রণাঙ্গনে এই তিন দেশের সাধারণ মানুষ, তাদের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে রক্ত ঝরিয়ে সুসংবদ্ধ করে দিয়ে গেল।

১. ওমার এন. ব্রাড্‌লী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৯৯

২. রেম'দ মাসিয়ে'র ফ্রান্সে মিত্রপক্ষের অবতরণ সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ প্যারী ১৯৪৫, পৃঃ ১৮

৩. Biennual Report of the Chief of Staff of the U. S. Army, June 6, 1944-May 18, 1945.

৪. টিপ্পলস্কার্চ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪১৯

৫. আইসেনহাওয়ার : Crusade in Europe, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃঃ ২৯৬

৬. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ

৭. ফুলার : The Second World War, পৃঃ ২২৮। ফুলার লিখেছেন : "This appalling slaughtering which would have disgraced Attila, was justified on the plea of military necessity."

৮. The Effaets of Strategic Bombing on the German War Economy, ৩১ অক্টোবর, ১৯৪৫, পৃঃ ৪

৯. আইনহেইট, ১২শ সংখ্যা, ১৯৪৭, পৃঃ ১১৭৩

১০. জে. হুইলার বেনেট : The Nemesis of Power, লণ্ডন, ১৯৫৫

১১. অ্যালেন ওয়েলশ্‌ ডালেস : Germany's Underground, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৭ পৃঃ ১৩৯

১২. Der Tagesspiegel, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬

১৩. ডালেস : উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৯

১৪. ঐ, পৃঃ ১৪০

১৫. ঐ, পৃঃ ১৭২-৭৩

১৬. ফেবিয়ান ভন্‌ শ্লাবেনডর্ফ : They Almost Killed Hitler, ম্যাকমিলান, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৭, পৃঃ ৩০

১৭. ঐ, ঐ,

১৮. এল, স্নাইডার : The War, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬০, পৃঃ ৩৭৬

১৯. নিউ টাইমস্‌, মস্কো, ১৯ সংখ্যা, ১৯৪৭, পৃঃ ২৬

২০. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১০৩

২১. লুই অ্যাডামিক : Dinner At The White House, হার্পার, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬, পৃঃ ১৬২

২২. কর্ডেল হাল : Memoirs, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১৬

২৩. Correspondence : ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫

২৪. টিপ্পলস্কার্চ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭

২৫. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৬

২৬. কর্ডেল হাল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৩১৭

ষোড়শ অধ্যায়

ইউরোপের মুক্তিতে সোভিয়েত বাহিনী

নাৎসী আক্রমণকারীদের উপর প্রচণ্ড, মর্মান্তিক আঘাত হেনেই সোভিয়েত সেনাদল পৃথিবীর বহু জাতির ভবিষ্যৎ জীবনের গতি প্রকৃতিকে রূপায়িত করে তুলছিল। তারই আঘাতে সুরু হলো প্রাচ্যে সূর্যোদয়ের যুগ—জাতীয় জীবনের সূর্যোদয়। উনিশ শ' চুয়াল্লিশেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা সোভিয়েত সেনা-দলের মুক্তি ব্রতের কর্মসূচী প্রায় সফল হয়ে এলো। আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত বাহিনী, সোভিয়েত মোলদাভিয়া শক্রমুক্ত করলো। তারপর জার্মাণ সেনা-দলের দক্ষিণী শাখার বিরুদ্ধে পর পর কয়েকটি তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়াকে ফ্যাশিস্ত জোট মুক্ত করে আনলো। সোভিয়েতের অগ্রগতি সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামরিক পরিস্থিতিকে বদলে দিল।

এই অবস্থায় বলকানে দুই পশ্চিমী রাষ্ট্র আমেরিকা ও বৃটেনের সৈন্য অবতরণ প্রচেষ্টা ছিল রণনৈতিক বিচারে অপ্রয়োজনীয় এবং রাজনৈতিক বিচারে ক্ষতিকর।

সোভিয়েতের জাস্সি-কিশিনেভ্ অভিযান, যা সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনের দক্ষিণতম প্রান্তে শক্তির ভারসাম্যকে উল্টে দেয়, সেটাই ছিল এই সময়ের প্রধান সামরিক তৎপরতা। জার্মাণ সৈন্যের প্রতিরোধ সেখানে, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনী, কৃষ্ণসাগরীয় নৌ-বাহিনী এবং ড্যানিয়ুব নৌ ফ্লোটিল্লার প্রচণ্ড আঘাতে একেবারে রেণু রেণু হয়ে যায়। আক্রমণের এই প্রচণ্ড বেগের উদ্দেশ্য ছিল কিশিনেভ্ অঞ্চলে শত্রুর এক বিরাট বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, যাতে হিটলারের বলকান সংরক্ষিত অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের মানুষদের জাতীয় মুক্তি দ্রুততর করা যায়।

সোভিয়েত সেনাদল আক্রমণ করে নাৎসী সেনাদলের দক্ষিণ ইউক্রেন বাহিনীকে যার মধ্যে ছিল মোট পঞ্চাশটি ডিভিসনের দুটি করে জার্মাণ ও রুমেনিয় দল। কিন্তু যুদ্ধের সেই পর্যায়ে নাৎসী বাহিনীর মনোবল তখন ভেঙ্গে গেছে।

লক্ষ্য ছিল একই সময়ে ছ'দিক থেকে একই জায়গার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানা, যাতে নাৎসীদের প্রধান সেনাদলকে একজায়গায় আটক রেখে বিনষ্ট করা যায়। তাই বিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে যেদিন অভিযান সুরু হলো সেদিন সেনাদল দুই বিপরীত দিকে ধাবমান হলো। দ্বিতীয় ইউক্রেন শাখা এগিয়ে গেল কোক্‌সানির দিকে, আর তৃতীয় শাখা গেল গালাট্‌জ-ইসমাইলের পথে। তারপর দুই দিক থেকে এসে তারা মিলিত হলো কিশিনেভের দক্ষিণ পশ্চিমে। এরই ফলে কিশিনেভ অঞ্চলে এক বিরাট শত্রু বাহিনী একেবারে আটক পড়ে গেল। উনত্রিশে আগষ্টের মধ্যে এই বেষ্টনীকৃত অঞ্চল সাফ হয়ে গেল। শেষ হলো এই অঞ্চলে অভিযানের প্রথম কৌশলগত স্তর।

আক্রমণের দ্বিতীয় স্তরে সোভিয়েত বাহিনী রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়া শত্রু মুক্ত করলো। রুমেনিয়ায় সোভিয়েত অভিযান প্রসঙ্গে টিপ্পলস্কার্চ বলেছেন : "সমস্ত রণাঙ্গনটা একটা অরাজকতার মধ্যে চাপা পড়ে গেল। শত্রু সৈন্যরা জার্মাণ সৈন্যের উপর দিয়ে সাগর তরঙ্গ যেমন সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ভাবেই ছুটে চলে গেল।"[১]

তেইশে আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে রুমেনিয় কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্যোগে সংগঠিত দেশপ্রেমিক মানুষদের কয়েকটি সশস্ত্র দল, ফ্যাশিস্ত একনায়ক, আন্তোনেস্কু, তাঁর সরকারের অন্যান্য মন্ত্রী সামরিক নেতৃবৃন্দ ও রুমেনিয়ায় কর্মরত বহু জার্মাণ ও ইটালীয়ান অফিসারদের গ্রেপ্তার করলো।

নিজের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তখন রাজা মাইকেল বৃটেনে ও মার্কিণ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, যুদ্ধ থেকে রুমেনিয়ার সহযোগিতা প্রত্যাহার করে নিলেন। কনস্তান্তিন সানাতেস্কু নামে একজন প্রতিক্রিয়াশীল জেনারেলকে তিনি সরকার গঠনের ভার দিলেন। অনেক প্রখ্যাত বুর্জোয়া রাজনীতিকদের, যেমন মনিউ, ব্রাতিয়ানু প্রভৃতি, মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হলো। দুই মন্ত্রীর নেতৃত্বে দুই বুর্জোয়া দল—ন্যাশনাল জারানিস্ট (Tsaranist) ও ন্যাশনাল লিবারল পেণ্ডুলামের মতো একজন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অন্যটি বৃটেনের দিকে ঝুঁকে রইলো। রুমেনিয়ার গণতন্ত্রী করণের পথে তারা বাধা দিতে লাগলো প্রাণপণে। জাতীয় স্বার্থের প্রতি আরেকবার বিশ্বাসঘাতকতা করে রুমেনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী শাসন ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রইলো।

পঁচিশে আগষ্ট উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করলেন যে তাঁদের রুমেনিয় ভূখণ্ডের কোন অংশ দখল অথবা তার সমাজ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন সাধন বা তার স্বাধীনতাকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করার কোন বাসনা নেই। সোভিয়েত বিবৃতিতে বলা হলো যে, "অপর পক্ষে, সোভিয়েত সরকার মনে করেন যে রুমেনিয়গণের সহায়তায় যৌথভাবে জার্মাণী ফ্যাশিস্তদের অধীনতা-মুক্ত করে তার স্বাধীন রাষ্ট্রিক সত্তা প্রতিষ্ঠিত করাটাই বেশি প্রয়োজন।"

বিবৃতিতে আরো বলা হয় যে, "জার্মাণ সেনাদলকে নিশ্চিহ্ন করতে, সোভিয়েত লালফৌজকে রুমেনীয় সেনাদল যে ভাবে সাহায্য করেছে, সেটাই রুমেনিয় ভূখণ্ডে সমস্ত রকমের সামরিক তৎপরতায় দ্রুত পরিসমাপ্তি এনেছে।" [২]

ছাব্বিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে রুমেনিয়া সরকারী ভাবে ঘোষণা করে যে গত বসন্তকালে সোভিয়েত সরকার, যুদ্ধ বিরতির যে সর্তাবলী দিয়েছিলেন, তা সে গ্রহণ করবে। নাৎসীরা হাল ছেড়ে না দিয়ে রুমেনিয়ার রাজধানী বুখারেষ্ট অবরোধ করার জন্যে বোমাবর্ষণ করতে সুরু করলো। কিন্তু দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী দ্রুত বেগে রুমেনিয়ার ভূখণ্ডের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে, তিরিশে আগষ্ট তার তৈল শিল্পের কেন্দ্র প্লোয়েস্তি দখল করে, পর দিন বুখারেষ্টে প্রবেশ করলো। তারপর সেখানেই না থেমে তারা অভিযান চালিয়ে গেল ট্রান্সিলভানিয়ার দিকে, যাতে কার্পেথিয়ান পর্বতের যে সব গিরিবর্ত্ম তখনো জার্মাণ ও হাঙ্গেরীয় সৈন্যরা রক্ষা করছিল তাদের ঘায়েল করা যায়। এরই মধ্যে তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী ড্যানিয়ুব নদী বরাবর রুমেনিয় ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে দোব্রুজা ও বুলগেরিয়ার সীমান্তে উপস্থিত হয়।

রুমেনিয়া প্রথমে যুদ্ধ ঘোষণা করলো জার্মানী ও পরে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। বারো ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করলো রুমেনিয়া, যে সৈন্যরা সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের অধীনে জার্মাণী ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে।

বারোই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে মস্কোয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পূর্ণ সমর্থনে, সোভিয়েত ইউনিয়নের মার্শাল রোদিয়ন ম্যালিনোভ্স্কি, রুমেনিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী সোভিয়েত সরকারের উদারতার স্বাক্ষর বহন করছে।

পরাজিত রুমেনিয়ার কাছে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে দাবী জানায় তা ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্র জোটের সম্পূর্ণ পরাজয় ও সোভিয়েত সেনাদলের মুক্তিব্রত উদ্‌যাপন করার পক্ষে ছিল নিতান্ত অপরিহার্য। যুদ্ধবিরতির সর্তের লক্ষ্য ছিল যে রুমেনিয়া চব্বিশে আগষ্ট ভোর চারটেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সামরিক সক্রিয়তা বন্ধ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কার্যক্রম থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, সেই রুমেনিয়া এবার সোভিয়েতের সর্বোচ্য সমর পরিষদের নেতৃত্বে, জার্মাণী ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। আঠাশে জুন, উনিশ শ' চল্লিশের সোভিয়েত রুমেনিয়া চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশের সীমান্ত নির্ধারণ করা হলো। যুদ্ধবিরতির সর্তে আরো বলা হলো যে রুমেনিয়ার ভূখণ্ডের যে অংশ হিটলার হোরথী হাঙ্গেরীকে দিয়েছিলেন, সেই উত্তর ট্রান্সিলভানিয়া আবার তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

রুমেনিয় ভূখণ্ডে জার্মাণী ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির যে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ রয়ে গেছে, রুমেনিয়া সেগুলি সোভিয়েত সর্বোচ্য সময় পরিষদের কাছে যুদ্ধ-বিজয়ের স্মারকচিহ্ন স্বরূপ দিয়ে দেবে। রুমেনিয় সৈন্য কর্তৃক সোভিয়েত ভূসম্পত্তির ক্ষতি ও সোভিয়েত ভূখণ্ড অধিকারের ক্ষতিপূরণ হিসাবে, তাকে তিরিশ কোটি ডলার দিতে হবে সোভিয়েত ইউনিয়নকে। অবিশ্যি এই অর্থ জিনিসপত্র রপ্তানী করে পরবর্তী ছয় বছরের মধ্যে দিলেই হবে। সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্রীয়, সরকারী, সমবায় বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা বা ব্যক্তিগত যে সমস্ত মূল্যবান সম্পত্তি যুদ্ধের সময়ে রুমোনিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে, সেগুলি যথাযথ অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে ফিরিয়ে দিতে রুমেনিয়া স্বীকৃত হলো। রুমেনিয় সরকার সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের সঙ্গে, সমস্ত যুদ্ধ অপরাধীদের গ্রেপ্তার, ফ্যাশিস্ত সংগঠনগুলির বিলুপ্তি সাধন এবং ভবিষ্যতে যাতে তারা আবার গড়ে উঠতে না পারে তার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বনে, সর্বতো ভাবে সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হলো। যুদ্ধবিরতির সর্তে একটি মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করার কথা বলা হলো, যার কাজ হবে এই সর্তাবলী ঠিক মতো পালিত হচ্ছে কিনা দেখা। ৩

পঁচিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ফিন্ সরকার তাঁদের সুইডেনস্থিত কূটনৈতিক প্রতিনিধির মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির আলোচনার জন্যে সোভিয়েতের

সম্মতি জানতে চাইলেন। উনত্রিশে আগষ্ট সোভিয়েত সরকার তাঁদের পূর্ব-ঘোষিত যুদ্ধবিরতির শর্তাবলী পুনরায় জানিয়ে দিলেন।

যাই হোক ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে মনোভাব, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাল্টিক অঞ্চলে অভিযান সুরু করার পরেই সুস্পষ্ট আকার ধারণ করলেন। অভিযান আরম্ভ হলো আগষ্ট উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। আগষ্টের শেষ এবং সেপ্টেম্বরের সুরুতেই জার্মাণ সেনাদলের উত্তর বাহিনীকে হটিয়ে দেওয়া হলো। তারা গিয়ে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গড়ে তুললো ফিন্ উপসাগরের দক্ষিণ উপকূল, শুদস্কোয়ি ও ভোর্তসজার্ভি হ্রদের পশ্চিম তীর বরাবর, গাউজা, মেমেল ও লিউলুপে এবং আরো দক্ষিণে ভেস্তা ও ডুবিস্‌সা নদীর পাশ দিয়ে নিয়েমেন

অবস্থা সুবিধাজনক নয় দেখে, ফিন্ সরকার এবারে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। চৌঠা সেপ্টেম্বর ভোরবেলায় তাঁরা সোভিয়েতের যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী গ্রহণ করে, যুদ্ধবিরতির আদেশ জারী করলেন।

উনিশে সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে মস্কোয়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকারের পূর্ণ সমর্থনে কর্ণেল জেনারেল এ. এ. ঝানভ, ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করলেন।

ফিনল্যাণ্ড উনিশ শ' চল্লিশের সোভিয়েত-ফিন সীমান্ত বরাবর তার সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে গেল এবং ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে জার্মাণ সৈন্যদের যে সব ঘাঁটি ছিল, সেখানে তাদের অস্ত্র পরিত্যাগে বাধ্য করা হলো। তাছাড়া জার্মাণ সৈন্যদের ফিন সরকার যুদ্ধবন্দী হিসাবে সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পণ করলেন। বারোই মার্চ, উনিশ শ' চল্লিশে স্বাক্ষরিত সোভিয়েত-ফিন্ শান্তি চুক্তি আবার চালু করা হলো।

চোদ্দই অক্টোবর, উনিশ শ' কুড়ি ও বারোই মার্চ, উনিশ শ' চল্লিশের চুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন যে পেতসামো (পেচেঙ্গা) অঞ্চল স্বেচ্ছায় ফিনল্যাণ্ডকে ছেড়ে দিয়েছিল, ফিনল্যাণ্ড এখন তা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন হাঙ্গো উপদ্বীপে তার ইজারাপ্রাপ্ত অধিকার পরিত্যাগ করলো। প্রতিদানে ফিনল্যাণ্ড একটি সোভিয়েত নৌ-ঘাঁটি নির্মাণের জন্যে, পোর্ককালা-সুদ অঞ্চলের ভূভাগ ও সন্নিহিত তীরভূমি ইজারাস্বত্বে ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হলো। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত

হলো তিরিশ কোটি ডলার, যা ফিনল্যাণ্ড উৎপাদিত দ্রব্যাদি রপ্তানী করে ছয় বছরের মধ্যে দিয়ে দেবে।[৪] অন্যান্য সর্তাবলী ছিল রুমেনিয় যুদ্ধবিরতি সর্তের অনুরূপ।

ফিনিশ যুদ্ধবিরতির সর্তাবলী আরেকবার প্রমাণ করলো অন্য দেশও জাতির অধিকার ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সোভিয়েতের শ্রদ্ধা ও উদার মনোভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিন্‌ সরকার যুদ্ধবিরতির কোন কোন সর্তাবলী পূরণ করার সময়ে তা বাণচাল করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। যেমন কোন কোন ফ্যাশি-পন্থী সংস্থা জিইয়ে রাখার জন্যে তাঁরা প্রচেষ্টা চালালেন। জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে বা সীমিত রাখতে চাইলেন তাঁরা। তাছাড়া সোভিয়েত বিরোধী অপপ্রচারে তাঁদের রুচি বেশ জোরালো দেখা যেতে লাগলো। ফিনদেশে শ্রমিক শ্রেণী ও প্রগতিশীল মানুষ প্রতিক্রিয়াশীলদের এই নীতির নিন্দা করলেন। ছয়ই ডিসেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, ফিন দেশের অধিকাংশ মানুষের কথা প্রকাশ করে পাসিকিভি বলেন:

"সন্দেহ দূর করে আমাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আমার স্থির বিশ্বাস যে ফিন দেশের মানুষের স্বার্থেই, ফিনল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র নীতি কোনমতেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী হওয়া উচিত নয়। মহান সোভিয়েত দেশের প্রতি আমাদের সমস্ত রাজনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তি হওয়া উচিত আন্তরিক বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল শান্তি, বন্ধুত্ব ও সুপ্রতিবেশী সুলভ নীতিও সম্পর্ক।"[৫]

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত সেনাদল বাল্টিক অঞ্চলে নোতুন এক অভিযান সুরু করলো। শত্রুর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে, চারশ' কিলোমিটার রণাঙ্গনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে, তারা পক্ষকালের মধ্যে সোভিয়েত এস্তোনিয়া শত্রুমুক্ত করে ফেললো। শত্রু সৈন্য পিছু হটে সরে যেতে বাধ্য হলো রিগার পঁচিশ থেকে ষাট কিলোমিটারের মধ্যে। এই অভিযানের দ্বিতীয় স্তরে সোভিয়েত সেনাদল মুক্ত করলো রিগা সমেত সমগ্র সোভিয়েত লাত্‌ভিয়া। সোভিয়েতের প্রচণ্ড চাপের ফলে জার্মাণ উত্তর বাহিনীর পঁত্রিশ ডিভিসন সৈন্যের অবশিষ্টাংশ, তুকুম ও লাইপাজার মধ্যবর্তী অঞ্চলে একেবারে সাগরের কিনারায় হটে গেল।

চব্বিশে জুলাই, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয়

পরামর্শদাতা কমিশনের কাছে, বুলগেরিয়ার আত্মসমর্পণ সর্তের একটা খসড়া পেশ করে। তাতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য কর্তৃক বুলগেরিয়া দখলের কথা বলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নামোল্লেখও সেখানে করা হয়নি।

দোসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে মুরাভিয়েভের নেতৃত্বে বুলগেরিয়ায় একটি নোতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মুরাভিয়েভ মন্ত্রিসভার দুই সদস্য, দিমিত্র গিশেভ্ ও ষ্টোয়কো মুশানভ্, ইঙ্গ-মার্কিণ ও গ্রীক-তুর্কী সেনাদল কর্তৃক বুলগেরিয়া দখলের একটা কার্যক্রমের চূড়ান্ত রূপায়ণের জন্যে কায়রোয় উপস্থিত হলেন। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি তারা বুলগেরিয়া অভিযান করে, ফ্যাশি বিরোধি গণআন্দোলন দমন করে একটা দখলদারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবে বলে। গিশেভ ও মুশানভ্ আলোচনা চালালেন কায়রোয়। তারই সঙ্গে একই সময়ে দিমিত্রি ও গেমেতো কথাবার্তা স্বরু করলেন ইস্তাম্বুলে। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সেপ্টেম্বর মাসের স্বরুতে একটা গোপন বৃটিশ সামরিক মিশন এলো বুলগেরিয়ায়। মিশনের নেতা বুলগেরীয় সরকারের মুখপাত্রের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হলেন প্লোভ্‌দিভে্। তিনি বুলগেরীয় সরকারকে জানান যে, সোভিয়েত সেনাদল যে দ্রুততার সঙ্গে বুলগেরীয় সীমান্তের দিকে এগিয়ে আসছে, তাতে তাঁরা তুরস্কের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছেন যে তুরস্কও এখনই বুলগেরীয়া প্রবেশ করবে।

বুলগেরীয় সরকার বাইরের সাহায্য ছাড়া গণআন্দোলনের প্রবল চাপ সহ্য করতে পারবেন না, বিলক্ষণ জানতেন। সেইজন্য নাৎসীদের সঙ্গে তাঁরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। পরপর কয়েকটি কূটনৈতিক লিপিতে সোভিয়েত সরকার বুলগেরীয় সরকারের এই দেশদ্রোহী স্বরূপটি তুলে ধরে. হিটলারী আক্রমণে তার ভূমিকা প্রকাশ করে দেন। সেই সব লিপিতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে বুলগেরিয়ার শাসকদের নিরপেক্ষতার বুলি আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সোভিয়েত সরকার তাই বুলগেরীয়া নীতির বিশ্লেষণে তার ভূমিকাকে, জার্মাণীর প্রত্যক্ষ সাহায্যকারী, আসলে কার্যতঃ জার্মাণীর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে বর্ণনা করেন। পাঁচই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশের এক সোভিয়েত লিপিতে দেখা যায়, বলা হয়েছে যে, "সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বুলগেরিয়ার কেবল একটা যুদ্ধাবস্থার সম্পর্ক নেই, প্রকৃত প্রস্তাবে সে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধাবস্থার সম্পর্কে

বরাবরই ছিল,......তাই সোভিয়েত ইউনিয়নও এখন থেকে বুলগেরিয়ার সম্পর্কে সেই নীতিই গ্রহণ করবে।"[৬]

আটই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত বাহিনী রুমেনিয়া থেকে এক বিরাট রণাঙ্গন মুখে বুলগেরিয়া সীমান্ত অতিক্রম করলো। বুলগেরিয়ার জনগণ, যাদের স্বাধীন রাষ্ট্রিক সত্তা আঠারো শ' সাতাত্তর আঠাত্তরের তুর্কী যুদ্ধে, রুশ সেনাদলের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সোভিয়েত বাহিনীকে মুক্তিদাতা বলে স্বাগত জানালো। তারা যথাসাধ্য সাহায্য করলো সোভিয়েত সেনাদলের জন্যে। এই সোভিয়েত-বুলগেরীয় "যুদ্ধে" কোন পক্ষের একটি সৈন্যও নিহত হলো না। জর্জি দিমিত্রভ্ তাঁর এক বক্তৃতায় বলেছিলেন "সোভিয়েত সেনাদলের বুলগেরিয়া প্রবেশ আমাদের দেশ থেকে ফ্যাশিবাদী একনায়কতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে সাহায্য করে, বুলগেরীয় জনগণের মুক্তি, তাদের জাতীয় ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছে।"[৭] দৈনিক পত্রিকা ওটেকেস্টভেনেনে ফ্রন্টে (Otechestvenen Front) বারোই সেপ্টেম্বর লেখা হয় যে, "দেশের অভ্যন্তরে একেবারে রাজধানী পর্যন্ত লাল ফৌজের যাত্রাপথে ফুলে ফুলে ভর্তি হয়েছিল।"

সোভিয়েত সেনাদলের বুলগেরিয়া প্রবেশের ফলে ইঙ্গ-মার্কিণ-তুরস্কের হস্তক্ষেপ থেকে বেঁচে গেল বুলগেরিয়ার মানুষ। বেঁচে গেল তারা ওয়ালস্ট্রীট ও সিটির একচেটিয়াপতিদের অধীনতা থেকে, যে দুর্ভাগ্য এসে গ্রাস করলো তাদের প্রতিবেশী দেশ গ্রীসকে। ভ্যাসিল কোলারোভ এ সম্পর্কে লিখেছেন :

"বীর সোভিয়েত বাহিনী বুলগেরিয়াকে শত্রুমনোভাবসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদীদের লুটের মালে পরিণত হতে দিল না, যে তারা যে যার মতো কাড়াকাড়ি করে তার ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবে। অন্যথায় বুলগেরিয়ার অদৃষ্টে গ্রীসের চেয়ে কোন ভিন্ন পরিণতি দেখা যেত না। বরং তা আরো খারাপ হতো।"[৮]

উনিশ শ' একচাল্লিশের জুন মাস থেকেই, বুলগেরীয় কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, জার্মাণ দখলদার ও তাদের দেশীয় ভৃত্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চালাচ্ছিলেন। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে সংগঠিত জাতীয়-বাহিনী একটা সুগঠিত ব্যাপক ফ্যাশি বিরোধী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। সোভিয়েত বিমান থেকে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হতো তা দিয়ে

বুলগেরিয়ার পার্টিজানরা শত্রুর বিরুদ্ধে অনেক সংঘর্ষে ব্যবহার করে অনেক ক্ষয় ক্ষতি সহ্য করতে বাধ্য করে তাদের। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের প্রথম দিকে ছিল, তেষট্টিটি বড়ো বড়ো পার্টিজান দল। জার্মাণদের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে শুধুমাত্র উনিশ শ' চুয়াল্লিশের জুন মাসেই ছয় শ' সাতাশীটি সংঘর্ষ হয় পার্টিজানদের সঙ্গে। বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার মানুষ বছরের পর বছর যে নিরন্তর সংগ্রাম চালায়, দিমিত্রভ্ বলেন তা চিরকালের জন্যে "আমাদের জনগণ ও পার্টির ইতিহাস সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে, যারা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত হাজার হাজার পার্টিজান ও তাদের অসংখ্য সাহায্যকারীদের, বর্বর ফ্যাশিস্ত দখলদার বাহিনী ও বুলগেরীয় ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রামের জন্যে চিরকাল অত্যন্ত সংগতভাবেই গর্ববোধ করবে।"[১]

নয়ই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশের ভোরবেলায় জাতীয় বাহিনীর জাতীয় কমিটি চূড়ান্ত পর্যায়ের আঘাত হানার সিদ্ধান্ত করলেন। জনগণ, পার্টিজান ও সেনাদলের প্রগতিশীল অংশের যৌথ শক্তিতে অবসান ঘটলো ফ্যাশিস্ত একনায়কত্বের, জার্মাণ অনুচরদের প্রভাব নির্মূল হয়ে গেল। দেশের শাসনভার গ্রহণ করলেন জাতীয় বাহিনীর সরকার। বুলগেরিয়ার এই সামরিক অভ্যুত্থানের প্রাণ ছিল সেই দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী কমিউনিষ্ট পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি। বুলগেরিয়ার ইতিহাসে তাঁরা সংযোজন করলেন একটা নবজাগরণের অধ্যায়।

সোভিয়েত সেনাদলের বিজয় সাফল্যমণ্ডিত অগ্রগতি, জনগণের ফ্যাশি-বিরোধী অভ্যুত্থানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। জনগণ এই অনুকূল পরিবেশের সুযোগ নিয়ে সম্পূর্ণ করলো তাদের জনগণতন্ত্রী বিপ্লব। তাদের এই সাফল্যই সমাজতন্ত্রের পথে তাদের বৈপ্লাবিক অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে।

নয়ই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশেই সোভিয়েত সেনাদল বুলগেরিয়ায় সমস্ত সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে দিল। জনগণতন্ত্রী বুলগেরীয় সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করলেন জার্মানী ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। জার্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে পাঁচলক্ষ সৈন্য সমাবেশ করলো বুলগেরিয়া। পরবর্তী প্রায় আট মাস কাল ধরে তারা লড়াই চালালো যুগোস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়ায়। অবশেষে তারা এসে পেঁছিলো অষ্ট্রিয় আল্পসের সানুদেশে। সোভিয়েত সর্বোচ্চ সামরিক

পরিষদ বুলগেরীয় সৈন্য ও অফিসারদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপ নাৎসী জঙ্গীবাদের কবল থেকে মুক্ত করে, বুলগেরীয়রা হিটলার জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয়ে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার সহযোদ্ধা হিসাবে বুলগেরিয়ার ন্যায়সঙ্গত দাবী স্বীকার করতে অস্বীকার করলেন। আটাশে সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে চার্চিল কমন্স সভায় বলেন যে, "বুলগেরীয়রা সহযোদ্ধা হিসাবে ব্যবহার প্রত্যাশা করতে পারে, কিন্তু বৃটেনের কাছ থেকে তা পেতে গেলে তাদের আরো অনেক দিন ধরে আরো অনেক স্পষ্টভাবে কাজ করে এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।"[১০]

বুলগেরিয়ার মুক্তির পরে যুদ্ধ বিরতির সর্ত নিয়ে যে আলাপ আলোচনা হয় তাতে একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, অন্যদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের মুখপাত্রদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। বুলগেরিয়া সম্পর্কে নিজেদের কার্যক্রম ব্যর্থ হওয়ায় ক্ষুব্ধ মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন কেমন করে এই চুক্তির ধারাগুলি বুলগেরিয়ার পক্ষে চরম অসুবিধা-জনক করা যায় এবং আদায় করা যায় তার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ বিরাট টাকার একটা অঙ্ক। আট থেকে দশই সেপ্টেম্বরের মধ্যে মার্কিণ বোমারু বিমান সোফিয়ার অসামরিক বাসগৃহগুলির উপর বোমা বর্ষণ করলো।

তখন মার্কিণ ও বৃটিশ চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে বুলগেরিয়ার অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পাশে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রদের প্রতিরোধের জন্যে, ক্ষতিপূরণ বিষয়ে কোন সার্বজনীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল না। যুদ্ধ বিরতির সর্তে কেবল ক্ষতিপূরণদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হোল, যার হার পরে স্থির করা হবে।[১১] এই দায় স্বীকার করে নেওয়ার সময়, বুলগেরিয়ার মানুষ একথা স্পষ্ট বুঝেছিল যে, সাম্রাজ্যবাদীরা বুলগেরিয়ার উপর ক্ষতিপূরণের এক বিরাট বোঝা চাপাতে চাইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সমর্থন করবে না। এছাড়া অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে বুলগেরিয়ার যুদ্ধ বিরতি সর্তাবলী ছিল রুমেনিয়ার অনুরূপ।

আটাশে অক্টোবর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে মস্কোয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পূর্ণ সমর্থনে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে, সোভিয়েতের মার্শাল তোলবুখিন বুলগেরিয়ার যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন।

বুলগেরিয়ার জনগণতন্ত্রী সরকার, যুদ্ধ বিরতির সমস্ত সর্তাবলী বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেছিলেন। কিন্তু মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই নোতুন বুলগেরিয়ার, প্রতি অন্যান্য জনগণতন্ত্রী দেশের মতো অত্যন্ত প্রতিকূল মনোভাব নিয়ে আচরণ করে। বুলগেরিয়ার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে তারা। তার সাধারণ নির্বাচনে নানা সর্ত আরোপ করাই ছিল এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য। কিন্তু সোভিয়েতের সমর্থনপুষ্ট হয়ে, বুলগেরিয়ার জনগণতন্ত্রী সরকার জাতীয় সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকে।

॥ দুই ॥

সোভিয়েত সেনাদল রুমেনিয়া ও বুলগেরিয়াকে মুক্ত করার পরে ট্রান্স-কার্পেথিয়ান ইউক্রেনকে মুক্ত করে চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মানুষদের সাহায্য করার জন্যে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাদলের দক্ষিণ বাহিনীকে ঘায়েল করতে আবার বিরাট আকারে অভিযান সুরু করলো। এর আরো লক্ষ্য ছিল আলবেনিয়া ও গ্রীসের সঙ্গে জার্মাণদের সমস্ত সংযোগ ছিন্ন করে, এই অঞ্চলে জার্মাণীর শেষ মিত্র দেশ হাঙ্গেরীকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া।

দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনীকে নিয়ে আক্রমণ সুরু করা হলো দক্ষিণ পশ্চিম দিকে। এদের উদ্দেশ্য ছিল জার্মাণীর হাইনরিসি বাহিনী (কুড়ি ডিভিসন), দক্ষিণ বাহিনী (ছত্রিশ ডিভিসনেরও বেশি) এবং দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনীর (ছাব্বিশ ডিভিসনের বেশি) সঙ্গে সংগ্রাম করা।

আটাশে সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশ থেকে আটাশে অক্টোবর পর্যন্ত এই অভিযানের প্রথম পর্বে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনী ট্রান্সিলভানিয়ার আল্পস্ অঞ্চল সমেত সমগ্র ট্রান্সিলভানিয়া মুক্ত করলো। এতে রণাঙ্গনের বিস্তৃতি অনেকটা কমে গেল। তারপর দেব্রেকেন দখল করে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী সোজা চললো বুদাপেস্তের দিকে। এই যুদ্ধে উনিশ শ' তেতাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়নে গঠিত রুমেনিয়ার তুদোর ভ্লাদিমিরেস্কু স্বেচ্ছাসেবক ডিভিসন, অন্য রুমেনিয় সৈন্যবাহিনীর চেয়েও, দেব্রেক্রেনের যুদ্ধে অনেক বেশি বীরত্ব প্রদর্শন করে।

তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যরা উপস্থিত হলো যুগোশ্লাভিয়ার সীমান্তে। সেখানকার জনসাধারণ তখন মুক্তির জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

পার্টিজান আন্দোলনের যথেষ্ট সক্রিয়তা থাকা সত্বেও, যুগোশ্লাভিয়ার জনগণ তখনো পর্যন্ত জার্মাণ দখলদারদের দেশ ছাড়া করতে পারেনি। প্রায় সমস্ত শহরগুলি সমেত, যুগোশ্লাভিয়ার তিন চতুর্থাংশ ভূখণ্ড তখনো ছিল নাৎসীদের দখলে।

সোভিয়েত সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদ যুগোশ্লাভ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানালেন যে তাঁদের দেশ থেকে জার্মাণ ও হাঙ্গেরীয় সেনাদল তাড়ানোর জন্যে, অস্থায়ী ভাবে সোভিয়েত সেনাদলকে যুগোশ্লাভিয়া প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোক। যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় মুক্তি কমিটি ও যুগোশ্লাভ মুক্তি ফৌজের নেতৃত্ব সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েতের অনুরোধ রক্ষা করলেন।

তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদল তুর্ণু-সেভেরিণ শহরের কাছে ড্যানিয়ুব পার হয়ে, পূর্ব সার্বিয়া পর্বতমালার পাশ দিয়ে অগ্রসর হলো। নয়ই অক্টোবরের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল মোরাভা উপত্যকায়। চোদ্দই অক্টোবর তারা আক্রমণ করলো বেলগ্রেড শহর। দক্ষিণপূর্ব যুগোশ্লাভিয়া থেকে পলায়ন-পর এক বিরাট জার্মাণ বাহিনীকে ঘেরাও করা হলো বেলগ্রেড শহরের ঠিক দক্ষিণ পূর্বে। উনিশে অক্টোবরের মধ্যে এই আটকে পড়া জার্মাণদের একটিও আর জীবিত রইলো না। পরের দিন সোভিয়েত সেনাদল, যুগোশ্লাভ পার্টিজানদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সহযোগিতায় আক্রমণ চালিয়ে, শত্রুপক্ষকে বেলগ্রেড শহরের মধ্যে বিধ্বস্ত করে দিল। মুক্ত হলো যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী। ততো দিনে বুলগেরীয় বাহিনী নিস্ শহর শত্রুমুক্ত করেছে। সোভিয়েত সেনাদল, যুগোশ্লাভিয়ার মুক্তিফৌজ ও বুলগেরিয়া বাহিনীর মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ ঐক্য ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টায়, যুগোশ্লাভিয়ার জনগণকে ফ্যাশিস্ত পরাধীনতার নাগ-পাশ হতে নিজেদের মুক্ত করতে সাহায্য করলো।

জার্মাণ ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম ক্রমেই দিন দিন বিস্তৃত হতে লাগলো। সোভিয়েতের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইউরোপের দেশে দেশে যে গণআন্দোলনের জোয়ার বইতে লাগলো তাকে প্রতিহত করার ক্ষমতা নাৎসীদের ছিল না।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে মুক্তি আন্দোলন তখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। যুদ্ধের গোড়ার দিকে ফ্যাশিস্ত জার্মাণী জোর করে একটা শ্লোভাক সৈন্যদল সংগঠিত করে তাদের লড়াই করতে পাঠায় সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে। শ্লোভাকরা

সোভিয়েতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এতো বেশি অনুচ্ছুক ছিল যে বাধ্য হয়ে জার্মাণী আগষ্ট, উনিশ শ' একচল্লিশে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু ভল্গা যুদ্ধে নাৎসীদের প্রচণ্ড ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায়, তারা বাধ্য হয়ে শ্লোভাক বাহিনীকে আবার পূর্ব রণাঙ্গনে পাঠায়।

এবার শ্লোভাক সৈনিক ও তাদের অফিসাররা রণক্ষেত্রে সীমান্ত অতিক্রম করে সোভিয়েত সেনাদল অথবা পার্টিজানদের দলে যোগ দেয়। তিরিশে অক্টোবর উনিশ শ' তেতাল্লিশে প্রথম শ্লোভাক পদাতিক ডিভিসনের সমস্ত সৈনিক তাদের সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মেলিতোপোলে সোভিয়েত সেনাদলে যোগ দেওয়ার জন্যে দলত্যাগ করে চলে যায়। ইউক্রেন ও বাইলোরাশিয়ায় শ্লোভাক সৈন্যরা দলত্যাগ করে পার্টিজান সংস্থা গঠন করে এবং সোভিয়েত পার্টিজানদের সঙ্গে একযোগে নাৎসীদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকে। শ্লোভাক সৈন্যদলের পাঁচশ'র বেশি দলত্যাগী সৈনিক বাইলোরাশিয়ার পার্টিজানদলে যোগ দেয় ; আটশ' জন যোগ দেয় ইউক্রেনে এবং একশ' পঞ্চাশ জনের বেশি চলে আসে ক্রিমিয়ায়। উদাহরণতঃ বলা যায় এই পার্টিজান দলগুলির মধ্যে শ্লোভাক ক্যাপ্টেন ইয়ান নালেপ্‌কারদল সোভিয়েত জনগণের কাছ থেকে তাদের বীরত্বের জন্যে অকুণ্ঠ অভিনন্দনলাভ করেছিল।

ইয়ান নালেপ্‌কার দলটি আঠারোই মে, উনিশ শ' তেতাল্লিশে, এ. সাবুরভের অধীনস্থ পার্টিজান সংস্থায় যোগদান করে। ষোলই নভেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশে সাবুরভের দল, সোভিয়েত সেনাদলের কোরোস্তেন ও ওভরুশ্‌ অভিযান সুগম করে তোলার জন্যে, ওভরুশ্‌ আক্রমণ করে। সেই সংগ্রামে ইয়ান নালেপ্‌কারদলটি বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে, তাদের কর্তব্য কর্ম গভীর নিষ্ঠায় সুসম্পন্ন করে। নালেপ্‌কা এই যুদ্ধে নিহত হন, তাই মৃত্যুর পরে তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আখ্যায় সম্মানিত করা হয়। তাছাড়া চেকো-শ্লোভাকিয়ার সর্বোচ্চ সামরিক সম্মানচিহ্ন, অর্ডার অব্‌ দি হোয়াইট লায়ন পদক দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। তাঁর অন্যান্য চেক সহযোগিদেরও যথাযোগ্য সামরিক সম্মানে ভূষিত করা হয়েছিল।

শ্লোভাক পার্টিজানরা জার্মাণ সেনাদলের পিছনে সক্রিয় থাকতে থাকতে নিজেদের দেশে ঢুকে পড়ে এবং স্থানীয় পার্টিজান দলের শক্তি বৃদ্ধি করে ; উনিশ শ' চুয়াল্লিশের আগষ্ট মাসের শেষে শ্লোভাকিয়ায় চল্লিশটি পার্টিজান সংস্থা

গড়ে ওঠে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে যারা স্লোভাকিয়ার এই সংগ্রামে যোগ দিতে যায় এবং স্লোভাক সৈন্যদলের দলত্যাগী বীর ও নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের পলাতক বন্দীরা, স্লোভাক পার্টিজান আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। আটই আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, ক্যাপ্টেন ইগোরোভ্ ও তাঁর বাইশ জন সাথীকে সোভিয়েত বিমান থেকে স্লোভাক অঞ্চলে নামিয়ে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে দেখা যায় ইগোরভের দলে বাইশটি জাতীয় জনসমাজের প্রায় পাঁচ হাজার পার্টিজান বীর রয়েছে—তাদের মধ্যে ছিল স্লোভাক্, চেক্, রুশ, ইউক্রেনীয়, বাইলোরুশীয়, হাঙ্গেরীয় ইত্যাদি জাতির লোকেরা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর লেফ্টেন্যান্ট-কর্ণেল কারাসিয়েভ্-স্তেপানভের পার্টিজান দল, মিনস্ক থেকে ক্রমাগত লড়তে লড়তে পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে স্লোভাকিয়ায় উপস্থিত হয়। এই দলকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালের নিত্রা পার্টিজান ব্রিগেড গড়ে ওঠে।

লণ্ডনে পলাতক স্লোভাকরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে স্লোভাক্ জনগণের এই সংগ্রামকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। ওদিকে কিন্তু লেফ্টেন্যান্ট কর্ণেল গোলিয়ানের পলাতক সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধি ও অনুচরদের অনেকেই স্লোভাক পার্টিজান আন্দোলনের সামরিক পরিষদে যোগদান করেন। লণ্ডনে প্রেরিত বিবরণীতে, গোলিয়ান লেখেন যে জার্মাণদের বিরুদ্ধে পার্টিজানদের তৎপরতা, "আমাদের কাছে একটা দারুণ বিরক্তিকর বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।" তিনি তাই সমস্ত রকমের পার্টিজান আন্দোলন নিষিদ্ধ করে একটা সরকারী আদেশ জারী করার জন্যে অনুরোধ করেন।

উনত্রিশে আগষ্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, হিটলারের সেনাদল পার্টিজানদের বিরুদ্ধে একটা শাস্তিমূলক অভিযান চালানোর জন্যে স্লোভাকিয়া আক্রমণ করে। দেশপ্রেমিক স্লোভাক্রা জবাবে একটা দেশব্যাপী অভ্যুত্থান সংগঠিত করে। ফলে কার্পেথিয়ান পার হয়ে সোভিয়েতের সামরিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার সুবিধা হয়। পরের দিন অভ্যুত্থান ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র মধ্য ও অংশত পূর্ব স্লোভাকিয়ায়, একেবারে দেশের দক্ষিণ সীমান্ত থেকে উত্তরে মালায়া তাত্রা, তাত্রার উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হয়ে লেভিস শহর পর্যন্ত। আর পূর্ব পশ্চিমে তার বিস্তৃতি ঘটে যথাক্রমে স্পিস্কা নোভা ভেস্ থেকে নিত্রা নদী ও রাইচাকা পর্যন্ত। অভ্যুত্থানকারীদের সদর কার্যালয় স্থাপন করা হয় বান্স্কা বিস্ত্রিকায়।

প্রকৃত পক্ষে অভ্যুত্থানটা ছিল মিউনিকের পর থেকে স্লোভাকিয়ার মানুষ

যে জাতীয় মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে থাকে, তারই একটা স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি। সোভিয়েতের নেতৃত্বে প্রগতিশীল মানুষরা সেদিন যে ফ্যাশিস্ত বিরোধী সংগ্রাম ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছিল, শ্লোভাকিয়ার জনগণ তারই সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে নেয়।

তার তরফ থেকেও, সোভিয়েত ইউনিয়ন, অভ্যুত্থানকারীদের যতোদূর সম্ভব সাহায্য করে যাচ্ছিল। সোভিয়েত বিমানে নিয়মিত তাদের অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর ঔষধপত্রের যোগান আসতে লাগলো। আহত, অসুস্থ এবং শিশু ও নারীদের তারা সরিয়ে নিয়ে যেত নিরাপদ অঞ্চলে। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়ন সংগঠিত চেকোশ্লোভাকিয়ার একটি ছত্রীবাহিনী ব্রিগেডকেও এনে নামিয়ে দেওয়া হয় এই অঞ্চলে।

আরো যা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, তা হলো নিকটবর্তী অঞ্চলে জার্মাণদের আক্রমণ করে তাদের দুর্বল করে, শ্লোভাকদের সাহায্য করা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আটই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদল ও চেক্ সেনাদল, পোল্যাণ্ডের ক্রোসনো শহরের উত্তরে জার্মাণদের একটা সুরক্ষিত ঘাঁটি আক্রমণ করে। ছয়ই অক্টোবর তারা এসে পৌঁছায় চেক্ সীমান্তের দুক্লা গিরিপথে। সেখানে চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তারা। সেই থেকে ছয়ই অক্টোবর দিনটি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় সেনাবাহিনী দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়।

অগ্রগামী দল কার্পেথিয়ান পার হয়ে শ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে। এরই ফলে শ্লোভাকিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে নাৎসীরা পার্টিজান ও অসামরিক জনগণকে ব্যাপক হারে খুন করার যে ফন্দী এঁটেছিল তা ব্যর্থ হয়ে যায়। শ্লোভাক্ ও চেক্ দেশপ্রেমিক মানুষরা সোভিয়েত সেনাদলকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে থাকে।

এই গণঅভ্যুত্থান শ্লোভাক্ জাতির ইতিহাসে একটা অবিস্মরণীয় অধ্যায়। চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষকে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে; এই অভ্যুত্থান জনগণতন্ত্রী চেকোশ্লোভাকিয়া প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে বিপুল ভাবে। দুক্লা অভিযান সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিচালনা করে, হিটলারতন্ত্রের বিরুদ্ধে তার মুক্তিব্রতের একটা অংশ হিসাবে। শুধু তাই নয় সোভিয়েত ও চেক্ জনগণের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে, এটা ছিল তারই একটা গৌরবময়

নিদর্শন। এই দুক্‌লা'তেই, ক্লিমেন্ট গোটওয়াল্ড বলেছিলেন, "আমরা চিরকাল সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশে থাকবো।" এই শ্লোগানের জন্ম হয়।

অভ্যুত্থান ফ্যাশিস্তদের সমস্ত কার্যক্রম তছনছ করে দেয়। জার্মাণীর একটা গুরুত্বপূর্ণ সামরিক শক্তির কেন্দ্র বিনষ্ট করে দেয় এই অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থান-কারীরা শ্লোভাকিয়ায় নাৎসীদের বাছাই করা আট ডিভিসন সৈন্যকে আটক করে পঞ্চান্ন হাজার আটশ' নাৎসী সৈনিক ও অফিসারদের অকেজো করে দেয়। বহু অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধের গাড়ী ধ্বংস হয়ে যায় তাদের হাতে।

অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ উপলব্ধি করে যে তাদের একটি নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত বন্ধু আছে, তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। ইতি-মধ্যে চেক পলাতক সরকার তার সমস্ত ছদ্মবেশ খুলে ফেলে দিয়েছে। তাই প্রকৃত জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিরুদ্ধতা করে তাঁরা বলতে থাকেন যে কার্পেথিয়ানে সোভিয়েত সেনাদলের সামরিক তৎপরতা ঘটানো অন্যায় হয়েছে। প্রতিবাদ করেন তাঁরা সোভিয়েতের কাছে।

রণাঙ্গনের দক্ষিণাংশে সোভিয়েত আক্রমণের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা হলো· উনত্রিশে অক্টোবর, উনিশ চুয়াল্লিশে। এই পর্ব স্থায়ী হয় পরের বছরের তেরোই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যরা বুদাপেস্ত আক্রমণ করে উনত্রিশে অক্টোবরে। আটই নভেম্বর তারা শহরের বহিঃসীমার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাছে এসে পড়ে। পরবর্তী কয়েকটি যুদ্ধে শত্রু সৈন্যের একাংশ হাঙ্গেরীয় রাজধানী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ড্যানিয়ুবের একটি বাঁকে আটক করে, তিরিশে ডিসেম্বরের মধ্যে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়। ছাব্বিশে ডিসেম্বর বুদাপেস্তে শত্রুপক্ষের এক লক্ষ আশী হাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণভাবে ঘেরাও করে ফেলা হয়। ফলে বুদাপেস্তকে মুক্ত করার জার্মাণ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়। বারোই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে যখন জার্মাণ সৈন্যরা বুদাপেস্তে তাদের শেষ সংগ্রাম করছে, তখন মরিয়া হয়ে তারা অবরোধ ভেঙে বাইরে আসার চেষ্টা করে। তাদের কয়েকটি দল সফল হয়ও তাতে। বেরিয়ে যায় তারা শহরের উত্তর পশ্চিমে বনভূমির দিকে। কিন্তু পরিত্রাণ আর তাদের ছিল না। সে-খানেই তাদের আবার আটক করে, শেষ করে ফেলা হয়।

একুশে ডিসেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে দেব্রেকেনে, হাঙ্গেরীর অস্থায়ী জাতীয়

সভার অধিবেশন আহুত হয়। এই সভা একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করে। জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে, এই সরকার যুদ্ধ থেকে হাঙ্গেরীকে বিযুক্ত করে নেয়। জার্মানীর শেষ অনুগত রাষ্ট্রও এবার চলে যায় সমস্ত যুদ্ধ প্রচেষ্টার বাইরে। আঠাশে ডিসেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, হাঙ্গেরী জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, ফ্যাশি বিরোধী মৈত্রীতে যোগ দেয়। সোভিয়েত সেনাদল হাঙ্গেরীতে জার্মাণ সৈন্য বাহিনী ধ্বংস করে, হাঙ্গেরীর জনগণকে রক্ষা করে চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে। পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে তারা হাঙ্গেরীর স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রিক সত্তার।

এই বিরাট যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালানোর অসম্ভব কষ্ট সহ্য করেও সোভিয়েত ইউনিয়ন, মুক্ত দেশগুলির অর্থ নৈতিক পুনর্বাসন ও তাদের জনগণের জীবন যাত্রায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে উল্লেখযোগ্য সাহায্য করেছিল। দশ হাজার টন আটা সমেত অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য, ঔষধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সম্ভার দিয়ে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে আগষ্ট সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়ন সাহায্য করে পোল্যাণ্ডের মুক্ত অঞ্চলকে। এর সবটাই খয়রাতি সাহায্য। প্রথম সোভিয়েত-পোলিশ বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদিত হয় অক্টোবরে উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। পোল্যাণ্ডের শিল্প ব্যবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন কাঁচা মাল ও জ্বালানী সরবরাহ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। বুলগেরিয়া ও রুমেনিয়াকেও অনুরূপ সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।

সোভিয়েত সরকার যুগোস্লাভিকিয়াতেও খাদ্য সাহায্য পাঠান। সোভিয়েত সাহায্যের ফলেই, শত্রু মুক্ত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই, যুগোস্লাভ মানুষদের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হয়ে যায়। সোভিয়েত সেনাদল বেলগ্রেডের কাছে, ড্যানিয়ুবের উপর নির্মাণ করে দু' কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সেতু। যাগোদিনাতে মোরাভা নদীর উপরেও একটি সেতু নির্মাণ করে দেয় তারা। তা ছাড়া ছিল আরো অন্য সাহায্য। শত্রু মুক্ত হাঙ্গেরীও সোভিয়েতের কাছ থেকে লাভ করে ব্যাপক অর্থ নৈতিক সাহায্য, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে।

হাঙ্গেরীর সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি সম্পাদিত হয় তিরিশে জানুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে মস্কোয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কে. ভরোশিলভ। পূর্ববর্তী যুদ্ধ বিরতি চুক্তিগুলির সঙ্গে এর প্রায় সর্বাংশেই মিল ছিল। চুক্তির বারো সংখ্যক ধারায় বলা হয় যে তার যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্যে,

সোভিয়েত ইউনিয়ন, চেকোশ্লোভাকিয়া ও যুগোশ্লাভিয়াকে হাঙ্গেরী ক্ষতিপূরণ দেবে তিরিশ কোটি ডলার। উৎপাদিত দ্রব্য রপ্তানী করে এই টাকা শোধ করা হবে পরবর্তী ছয় বছরে। তিরিশ কোটি ডলারের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাবে বিশ কোটি ডলার।

*　　　　*　　　　*　　　　*

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সেনাদলের বিজয় সাফল্যমণ্ডিত সামরিক অগ্রগতি, নাৎসী জোটকে ভেঙ্গে ছত্রখান করে দিল। হিটলার জার্মাণী একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেল। স্বভাবতই এই পরিস্থিতি ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরম পরিণতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তাঁবেদার দেশের সেনাদলকে কাজে লাগিয়ে যুদ্ধের সূচনায় আক্রমণকারীরা প্রচুর সুবিধা লাভ করে। যুদ্ধের গতি চলে যায় জার্মাণীর অনুকূলে। সেই সব দেশের অর্থ নৈতিক বনিয়াদকে হিটলার জার্মাণী সম্পূর্ণ ব্যবহার করে নিজের স্বার্থে।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের দ্বিতীয়ার্ধে জার্মাণীর যুদ্ধোৎপাদন কমতে থাকে। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের মে মাস থেকে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের জানুয়ারীর মধ্যে জার্মাণ শিল্প ব্যবস্থা শতকরা পনের ভাগ কলকারখানা হারায়। তা ছাড়া জার্মাণীর শিল্প শ্রমিকদের প্রতি সাতজনে একজন থেকে যায়, সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলে, পূর্ব প্রাশিয়া, ডানজিগ কিম্বা পশ্চিম প্রাশিয়া অথবা পোজনানে।[১২]

নীচের পরিসংখ্যানে জার্মাণ যুদ্ধোৎপাদনের মারাত্মক নিম্নগতির চিত্র পাওয়া যায়ঃ[১৩]

উৎপাদন

	১০০ কোটি মার্ক হিসাবে	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪২এর শতকরা হিসাবের তুলনায়
১৯৪৪		
জুলাই	২·৯৯	৩২২
আগষ্ট	২·৭৬	২৯৭
সেপ্টেম্বর	২·৮০	৩০১
অক্টোবর	২·৫৪	২৭৩
নভেম্বর	২·৪৯	২৬৮
ডিসেম্বর	২·৪৫	২৬৩

	১০০ কোটি মার্ক হিসাবে	জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪২এর শতকরা হিসাবের তুলনায়
১৯৪৫		
জানুয়ারী	২'১১	২২৭
ফেব্রুয়ারী	১'৬২	১৭৫
মার্চ	১'৩৪	১৪৫

কিন্তু তাহলেও উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের মার্চে জার্মাণীর যুদ্ধোৎপাদন, উনিশ শ' বিয়াল্লিশের তুলনায় প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বেশি ছিল। অনেক ক্ষয় ক্ষতি সহ্য করতে বাধ্য হলেও, জার্মাণীর তখনও এক প্রচণ্ড শক্তিশালী সেনাদল ছিল। তাই ইউরোপের জাতিগুলির পূর্ণ মুক্তি সম্ভব করার জন্যে তখনও প্রয়োজন ছিল হিটলারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সার্বিক যুদ্ধ প্রচেষ্টার। সোভিয়েতের জনগণ ও সেনাদল তখন সেই চরম প্রস্তুতিতে আত্মনিয়োগ করলো।

॥ তিন ॥

হিটলারের অধীনতা থেকে পশ্চিম ইউরোপের মুক্তিকে, সোভিয়েতের সামরিক সাফল্যের প্রত্যক্ষ ফল বলা যায়। জঁা ক্যাথালা বলেছেন, "প্রতিটি সৎ ফরাসী নাগরিক জানেন যে তাঁর নিজের মুক্তির জন্যে, তিনি লালফৌজের কাছে কৃতজ্ঞ।" [১৪] সোভিয়েতের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, ক্রমেই ইউরোপীয় জাতিগুলির মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়।

হিটলারের প্রধান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, পূর্ব রণাঙ্গনে তাদের আবদ্ধ করে, ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষদের মতোই, সোভিয়েত সেনাদল, ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিণ অগ্রগতিকে সাহায্য করে।

ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষেরা, মিত্রপক্ষীয় সেনাদলের সামনে থেকে জার্মাণ সৈন্যদলকে সর্বত্র অতর্কিতে আক্রমণ ও বিভ্রান্ত করে, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলের সামনের পথ বাধামুক্ত করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নর্মাণ্ডিতে ওভারলর্ড কার্যক্রমে নিযুক্ত ও দক্ষিণ ফ্রান্সে পনোরোই আগষ্টে অবতরণকারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সৈন্যবাহিনী, প্রধান প্রধান সড়ক ধরেই কেবল অগ্রসর হতে লাগলো।

ফ্রান্সের বেশির ভাগ অঞ্চলই তারা প্রায় এড়িয়ে যায়। আসলে মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকেরা কেউই ফ্রান্সের মাটিতে নাৎসী সৈন্যকে খতম করতে তেমন ব্যগ্র ছিলেন না। তাঁরা বরং ফরাসী জনগণের যে মুক্তি আন্দোলন তখন ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করছিল, তাকে সীমিত রাখার জন্যেই শত্রুপক্ষকে ব্যবহার করতে চাইছিলেন। ইঙ্গ-মার্কিণ ও জার্মাণ সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে ফরাসী দেশপ্রেমিকদের দমন করার জন্যে গোপনে কিছু শলা পরামর্শও চলেছিল। উদ্দেশ্য ছিল যৌথভাবে কোন কার্যক্রম সুরু করা যায় কিনা দেখা। মুক্তি আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার জন্যে সরকারী মার্কিণ ও বৃটিশ মহল, বেতারে সোভিয়েতের সামরিক সাফল্য কিম্বা নিজেদের অভিযান সম্পর্কিত খবরাখবর প্রচার করা বন্ধ করে দিলেন। যুদ্ধের একটা সংকটময় মুহূর্তে, আত্মগোপনকারী প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও ফ্রান্সের জনগণের কাছে, সামরিক পরিস্থিতি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য চেপে রাখার একটা সচেতন ও সযত্ন প্রচেষ্টা করা হলো।

বৃটিশ ও মার্কিণ বিমান থেকে ফরাসী শহরের শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলের উপর যুদ্ধের নামে বোমা বর্ষণ করা হতে লাগলো। সামরিক স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় এই সব বিমান আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ। মার্কিণ বিমান বহরের লক্ষ্য ছিল কিছুটা ভিন্ন। তারা ফরাসী শিল্প ব্যবস্থাকে প্রতিযোগী মনে করে, এই সুযোগে ফ্রান্সের বন্দর, বিমান নির্মাণ কারখানা ও অন্যান্য শিল্পগুলির উপর বোমা ফেলে ধ্বংস করতে লাগলো। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের শরৎকালে আমেরিকান বিমান বহর এমন এক সময়ে মার্সেই (Marseilles) শহরের শ্রমিকদের আবাসকেন্দ্রের উপর বোমাবর্ষণ করে, যখন ফরাসী পার্টিজানরা শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরত্বব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত দেখে, ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষরাও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে নিজেরাই পরিচালনা করার দায়িত্ব নেয়। অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদের যোগানের নিতান্ত ঘাটতি নিয়েও, তেমন কোন উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদ না থাকা সত্ত্বেও, তারা দখলদার জার্মাণদের মধ্যে শুধু নিজেদের সক্রিয়তা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় আতংক সৃষ্টি করে। মুক্ত করে তারা বড়ো বড়ো শহর আর একের পর এক ফরাসী ডিপার্টমেণ্ট। এদের দেখেই মরিস তোরে লিখেছিলেন : "বৃটানী থেকে আল্পস্ পর্যন্ত, পীরেনিজ্ থেকে জুরা পর্যন্ত এক বিরাট গণঅভ্যুত্থান প্রত্যক্ষ করছি আমরা। সমগ্র ডিপার্টমেণ্টগুলি

শক্রমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশ যেন অভ্যুত্থানে নেমে পড়েছে। আর কমিউনিষ্টরা আছে এই সংগ্রামের একেবারে সামনের সারিতে।"[১৫]

ফরাসী "জাতীয় বাহিনীর" সংগঠিত বিভিন্ন শাখায় অন্ততঃ পাঁচলক্ষ লোক যোগ দিয়ে দেশের মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করে। এছাড়া লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক মানুষ জাতীয় অভ্যুত্থানে কিম্বা মুক্তি আন্দোলনের কোননা কোন কাজে অংশ গ্রহণ করে। ফরাসী দেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব এই বিরাট দেশপ্রেমিক গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন কমিউনিষ্ট পার্টি।

মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ও ফ্রান্সের বহু দেশত্যাগী স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী, কমিউনিষ্টদের এই ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রতিপত্তিতে অত্যন্ত আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে ফরাসী দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয় আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার শক্তি। তারই প্রমাণ পাওয়া যায় প্যারীতে এই অভ্যুত্থানের সময় তারা কি করেছিল তার থেকে।

চোদ্দই আগষ্ট, জার্মাণ দখলদার কর্তৃপক্ষ ও সৈনিকদের বাধা বিঘ্নের সামনে টেনে আনার জন্যেই প্যারীর শ্রমিক শ্রেণী ব্যাপক গণ ধর্মঘট সুরু করে। আঠারোই আগষ্ট মরিস তোরে, জ্যাক্স দ্যুক্লো, মার্সেল কশ্যাঁ ও অন্যান্য ফরাসী কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদনপত্র, প্যারীতে বিলি হতে লাগলো। আবেদনে রাজধানীতে গণ অভ্যুত্থানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। পরদিন প্যারীর অভ্যুত্থানকারীরা নাৎসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ চালাতে সুরু করে। প্যারীর মুক্তি কমিটি, স্পেনে ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ একজন কমিউনিষ্ট কর্মিকে—রোল-তাঁগাই (Rol Tanguy)—এই আক্রমণ পরিচালনার নেতৃত্বভার দেয়। প্যারীর সর্বহারা শ্রেণীর, মেহনতী মানুষের পাশে এসে দাঁড়ায়, জার্মাণ কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে পলাতক একদল সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দী। তারাই সোভিয়েত দূতাবাস মুক্ত করে আবার উত্তোলন করে সোভিয়েত পতাকা। ফ্রেসেঁস কারাগারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্ত করে দেয় সশস্ত্র দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা।

পেতাঁ্যা, লাভাল সমেত ভিশী সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীরা জার্মাণীতে পালিয়ে যান। প্যারীর জার্মাণ সেনাদল সংখ্যায় বেশি এবং অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হলেও, অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারলো না। তাই দেখে দক্ষিণ পন্থী সোশ্যিয়ালিষ্টের নেতা ড্যানিয়েল মায়ার ও ক্যাথলিক প্রতিক্রিয়াশীল জর্জ

বিদো নাৎসীদের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। জার্মাণদের সম্পূর্ণ পরাজয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে একটা যুদ্ধবিরতি চুক্তি হোক। ফরাসী দেশপ্রেমিক যোদ্ধারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায়, মায়ার ও বিদো একদল ছদ্মবেশী পুলিশকে উপদেশ দিলেন যে তারা যেন শহরের পথে ঘাটে এই প্রাচীরপত্র সেঁটে দেয় যে যুদ্ধ বিরতি হয়ে গেছে এবং রাস্তায় রাস্তায় প্রচার করতে থাকে, "গুলী বন্ধ করো, যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হয়েছে!" এই প্রচারের ফলে যে বিভ্রান্তি ঘটলো, সেই সুযোগে শত্রুপক্ষ রাজধানী ত্যাগ করে সরে গেল।[১৬]

নাৎসীরা মায়ার ও বিদোর এই চালের পূর্ণ সুযোগ নিল। একুশে আগষ্ট নাৎসী সৈন্যের অবশিষ্টাংশকেও সরিয়ে নেওয়া হলো প্যারী থেকে। পালাবার সময় তারা চেষ্টা করলো শহরটাকে, বিশেষ করে তার সেতু, কলকারখানা ও স্মৃতি সৌধগুলি ধ্বংস করা যায় কিনা। প্যারীর জার্মাণ সেনাদলের কমাণ্ডাণ্ট জেনারেল ডিয়েট্রিশ ভন্ চোলটিট্জ্, "বার্লিন থেকে আদেশ পেয়েছিলেন যে দশই আগষ্ট যেন প্যারীরর সমস্ত কলকারখানা উড়িয়ে দেওয়া হয়।"[১৭] কিন্তু ফরাসী দেশপ্রেমিকরা নাৎসীদের এই পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়।

দেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, রসদ ও সৈন্যের যোগান আসলে জার্মাণরা আবার প্যারী দখলের চেষ্টা করে। মার্কিণ সৈন্যরা প্যারী থেকে মাত্র আশী কিলো-মিটার দূরে ছিল। মার্কিণ সামরিক নেতৃত্ব ইচ্ছা করলে প্যারীর সাহায্যার্থে সহজেই আসতে পারতেন। কিন্তু জেনারেল জর্জ এস. প্যাটনকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল অভিযানের গতি মন্থর করতে। স্মৃতিকথায় তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি প্যারী সহজেই দখল করতে পারতেন, "যদি না প্যারী দখল না করার জন্যে আমায় নির্দেশ দেওয়া হতো।"[১৮] মার্কিণ ও বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী তখন জার্মাণ নাৎসীদের পুনরায় প্যারী দখল করে, অভ্যুত্থানকারীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার সুযোগ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু প্যারীর দেশ-প্রেমিক মানুষেরা অটলভাবে প্রতিরোধ করতে লাগলো নাৎসীদের।

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার যখন দেখলেন যে জার্মাণ আক্রমণের আর তেমন ধার নেই, তখন জার্মাণ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁরা প্যারী যাওয়ার পথ দেওয়ার জন্যে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনায় জার্মাণদের প্রতিনিধিত্ব করলেন জেনারেল ভন্ চোলটিট্জ। প্যারীতে সুইডেনের কনসাল জেনারেল, রাওউল

নর্ডলিং কাজ করলেন মধ্যস্থতাকারী হিসাবে। রণাঙ্গনে মার্কিণ সদর কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে তিনি তাঁর ভাই রোলফ নর্ডলিংকে কাজে লাগালেন।[১৯] প্যারী অবরোধকারী জার্মাণ সেনাদল প্রথমে লেকলের্ক (Leclerc) পুলিশ ডিভিসনকে ফরাসী রাজধানীতে ঢুকতে দিল। এই বাহিনী ফরাসী গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলনকে দমন করার জন্যেই বিশেষভাবে সংগঠিত হয়েছিল। আর এদের প্রায় পেছনেই এসে পড়লো মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্য। আর এই সমগ্র সময় ধরে, ইঙ্গ-মার্কিণ ও জার্মাণ বোঝাপড়ার ফলে, জার্মাণ সৈন্যরা প্যারী অবরোধ করে রইলো।

জাতীয় মুক্তির জন্যে অক্লান্ত, একাগ্রচিত্ত সংগ্রাম প্রচেষ্টার জন্যে ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টি, দেশের জনগণের কাছ থেকে উত্তরোত্তর আরও বেশি সমর্থন পেতে লাগলেন। ফরাসী জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নে পার্টির অনমনীয় মনোভাব, কমিউনিষ্টদের উচ্চ আদর্শবাদী দেশপ্রেমের জ্বলন্ত প্রমাণ হয়ে রইলো। এই আদর্শ প্রমাণ করলো যে নিজদেশের জনগণের প্রতি আনুগত্য ও সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার ধারণার মধ্যে কোন বিরোধ নেই। সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে স্থ গলের লা ফ্রাঁস লিব্রে (La France Libre) পত্রিকায় লেখা হয় যে, "দেশের সমস্ত পুরানো দলগুলির মধ্যে শুধুমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টিরই সম্মান, শক্তি বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধি পায় তার সমর্থকদের সংখ্যার। কি প্রচার, কি সংগ্রাম, কি জনগণের যুদ্ধে, সর্বত্রই পুরোভাগে ছিল কমিউনিষ্ট পার্টি। উনিশ শ' একচল্লিশের পর থেকে এ কথাটা আরো বেশি সত্য হয়ে ওঠে।"

স্থ গলের নেতৃত্বে প্যারীতে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের এক অস্থায়ী সরকার গঠন করা হলো। তেইশে অক্টোবর, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সরকারীভাবে একে স্বীকৃতি দান করলো। কিন্তু তা সত্বেও এই নবগঠিত ফ্রান্সের প্রতি সোভিয়েত এবং মার্কিণ ও বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। যুদ্ধে ফ্রান্সের যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তাই দেখে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার খোলাখুলি স্পষ্ট করেই বলেন যে ফ্রান্স আবার একটা বৃহৎ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করুক, এ তাঁরা চান না।

অন্যদিকে ফ্রান্সের জাতীয় অধিকারের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই ছিল, সোভিয়েত নীতির প্রধান ভিত্তি। সোভিয়েত ইউনিয়ন ফ্রান্সের প্রকৃত স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের জন্যে, ফরাসী জনগণের যে কোন প্রচেষ্টাতেই

আন্তরিকভাবে সাহায্য করতে উদ্‌গ্রীব ছিল। ফরাসীদের বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য ও সমর্থন জানানোর সময়, সোভিয়েতের মানুষ এই বিশ্বাস করতো যে তাদের দেশ ও ফ্রান্সের স্বার্থ যুগ যুগ ধরে একই ধরনের, সমধর্মী, কারণ জার্মাণ আক্রমণের বিপদ সম্ভবনা, প্রচণ্ডতা তাদের দুই দেশের মাথার উপরই সমানভাবে এতোকাল ঝুলে ছিল। তারাই কষ্ট করেছে বেশি।

উনিশ শ' তেতাল্লিশেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ফরাসী জাতীয় মুক্তি কমিটিকে তার স্বীকৃতি জানিয়েছে। সোভিয়েত সরকারের প্রধান, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক বাণীতে তখন বলেছিলেন, "ইটালীর সঙ্গে আলোচনার জন্যে যে কমিশন গঠিত হয়েছে, তাতে ফরাসী জাতীয় কমিটির প্রতিনিধি থাকা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।"[২০]

সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রমাগত দাবীর ফলেই, জাতিসংঘের সনদ রচনার জন্যে আহুত ডামবার্টান ওক্‌স সম্মেলনে, ফরাসী প্রতিনিধি আমন্ত্রণ করা হয়। এরই ফলে বৃহৎ পঞ্চ শক্তির মধ্যে ফরাসীদের আসন পাকাপাকি হয়ে যায় এবং ফ্রান্স লাভ করে নিরাপত্তা পরিষদে একজন স্থায়ী সদস্যের অধিকার। এগারোই নভেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে আবার সোভিয়েতের দাবীর ফলেই অস্থায়ী ফরাসী সরকারকে, ইউরোপীয় পরামর্শদাতা কমিশনের চতুর্থ স্থায়ী সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তার অর্থ ছিল এই যে ফ্রান্স জার্মাণী দখলে অংশ গ্রহণ করবে এবং পরবর্তীকালে জার্মাণীর জন্যে যে নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠন করা হয়, তারও সদস্যপদ লাভ করবে।

ফরাসী দেশপ্রেমিক মানুষেরা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাবশতঃ, ঘনিষ্ঠতর সোভিয়েত ফরাসী মিত্রপক্ষীয় সম্পর্কের জন্যে দাবী জানালেন। দ্য গলের পক্ষে এই দাবী অস্বীকার করার উপায় ছিল না। পঁচিশে জুলাই, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে দ্য গল বলেছিলেন: "আমি বলতে চাই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকার দীর্ঘকাল ধরে আমাদের প্রতি যে গভীর আনুকূল্যের মনোভাব বজায় রেখে আসছেন, যে দেশের যুদ্ধকালীন ভূমিকা এতো বিরাট, শান্তির সময়ে যা আরো মহান হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়, তাই দেখে আমাদের এরকম আশা করার কারণ আছে যে সুযোগ পাওয়া মাত্রই ফ্রান্স ও রাশিয়া নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্যে সেই সম্পর্ক

গড়ে তোলার চেষ্টা করবে, যার উপরে আমি বিশ্বাস করি, ইউরোপের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও ভারসাম্য নির্ভর করবে।"[২১]

নভেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, ফ্রান্সকে বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্যদানের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত সরকার উভয় দেশের মধ্যে একটি বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে, একটি ফরাসী প্রতিনিধি দলকে মস্কোয় আমন্ত্রণ জানালেন।

জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উভয় দেশের সমস্যা সমজাতীয় হওয়ায় এবং নোতুন কোন জার্মাণ আক্রমণের সম্ভাবনা প্রতিহত করার জন্যে, সোভিয়েত সরকার ফ্রান্সের সঙ্গে একটি মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্যদান চুক্তি সম্পাদন করলেন দশই ডিসেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। হিটলার জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে, মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্যের একটি প্রতিশ্রুতি এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেই সঙ্গে একথাও বলা হয় যে, পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকে জার্মাণ আক্রমণকারীদের সঙ্গে কোন দেশই আলাপ আলোচনা করবে না। যুদ্ধোত্তর কালে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক বৃদ্ধি করার জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও এই চুক্তিতে বলা হয়েছিল। স্বাক্ষরকারীরা প্রতিশ্রুত হন যে, একে অন্যের বিরুদ্ধে কোন জোট, মোর্চা বা মৈত্রীতে যোগ দেবেন না এবং ভবিষ্যতে আবার কোন নোতুন জার্মাণ আক্রমণ ঘটলে পরস্পরকে সামরিক সাহায্য সমেত, সর্বপ্রকার সাহায্য করবেন। বিশ বছরের জন্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।[২২]

সোভিয়েত-ফরাসী চুক্তি ইউরোপে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়েছিল। দুই দেশের মৌল জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে এই চুক্তি সম্পাদিত হয় বলেই, তা ফরাসী জনগণের স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করে। তবুও ফরাসী শাসক গোষ্ঠীর এই চুক্তির সর্তাবলী ও তাৎপর্য আন্তরিকভাবে কার্যকরী করার তেমন কোন ইচ্ছাই ছিল না। যুদ্ধের পরে ফ্রান্স পশ্চিম জার্মাণীর সঙ্গে এক সামরিক মৈত্রীতে আবদ্ধ হয় এবং জার্মাণীর নোতুন করে অস্ত্রসজ্জা, জার্মাণ জঙ্গীবাদের পুনর্জন্ম ও প্রতিশোধ স্পৃহার অনুমোদন করে।

উনিশ শ' তেষট্টিতে ফরাসী শাসক চক্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির বিরুদ্ধে পশ্চিম জার্মাণীর সঙ্গে একটি সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক পদক্ষেপ করেছে। একে ফরাসী ও

পশ্চিম জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের রাজনৈতিক সামরিক আঁতাতের একটা আনুষ্ঠানিক রূপ বলা যায়, যা ইউরোপের শান্তিতে বিপদের সম্ভাবনা ঘনিয়ে তুলে, ফরাসী জনগণের মৌল জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে কাজ করবে।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের সেপ্টেম্বরে বেলজিয়ামের দেশপ্রেমিক মানুষেরা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে একটা ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটায়। নাৎসী ক্যাম্প থেকে পলাতক সোভিয়েত যুদ্ধ বন্দীরা, "দেশের জন্য" নাম দিয়ে একটি পার্টিজান দল গঠন করে, এই অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করে। বেলজিয়ামের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে এই অভ্যুত্থানের অবদান অনস্বীকার্য। উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের সুরুতে, জার্মানরা যখন আর্দেনেসে একটা সামরিক পরিবর্তনের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিল, তখন পার্টিজানরা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে প্রতিরোধ চালিয়ে, নাৎসীদের অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের প্রথম দিকে পার্টিজান আন্দোলন ধীরে ধীরে ইটালীতে দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ইটালীর পার্টিজানরা প্রতিবেশী দেশগুলির পার্টিজানদের সঙ্গে যৌথ কার্যক্রম গ্রহণের চেষ্টা করতে থাকে। সেই বছরের মে মাসে তারা ফরাসী ও শ্লোভেনেস পার্টিজানদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করে।

একত্রিশে ডিসেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, ক্রাজোয়া রাদা নারোদোয়া লুবলিনে এক অধিবেশন আহ্বান করে। সভাপতি বোলশ্ল বেইরুট তাঁর ভাষণে বলেন যে, "সোভিয়েত সাহায্য ছাড়া পোল্যাণ্ড কিছুতেই হিটলারী শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতো না।" তিনি আরো বলেন যে, পোল্যাণ্ড হিটলারী শাসনে প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল, সে আবার বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য পেয়ে গড়ে তুলেছে তার সেনাবাহিনী, ফিরে পেয়েছে তার স্বাধীনতা।[২৩] ক্রাজোয়া রাদাকে শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবিরা টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শাসন ক্ষমতা ব্যবহার করার জন্যে অনুরোধ করায়, পোলিশ জাতীয় মুক্তি কমিটিকে পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার হিসাবে রূপান্তরিত করলো। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকরা বাধা দেওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পোল্যাণ্ডের জনগণের মধ্যে কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। কারণ তারা জানতো যে তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন ও আভ্যন্তরীণ

সমস্যার নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা সোভিয়েতের শক্তির জোরেই, সমর্থনের জোরেই তারা অবাধে ব্যবহার করতে পারবে।

ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো সোভিয়েত পোলিশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক। পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে প্রথমে স্বীকৃতি জানালো সোভিয়েত ইউনিয়ন চৌঠা জানুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে এবং সঙ্গে সঙ্গেই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো।

অক্টোবর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েত সেনাদল ও তার উত্তর সাগরীয় নৌ বাহিনী আর্কটিক অঞ্চলে অভিযান চালালো। সেখানে শত্রুর ঘাঁটি ধ্বংস করে পেত্‌সামো অঞ্চলকে মুক্ত করাই ছিল এই অভিযানের লক্ষ্য। সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুর সুরক্ষিত ঘাঁটি ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলো। অবশেষে জার্মাণ বাহিনীকে পরাস্ত করে, পেত্‌সামো অঞ্চল শত্রুমুক্ত করা হলো। বাইশে অক্টোবর সোভিয়েত সেনাদল নরওয়ের সীমান্ত অতিক্রম করে। উত্তর নরওয়ের বড়ো বড়ো কয়েকটি অঞ্চল শত্রুমুক্ত করে, সোভিয়েত সেনাদল নরওয়েজীয়দের বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্য করতে লাগলো। এই যুদ্ধে জার্মানী তার কয়েকটি বিশেষ সুবিধাজনক বন্দর হারায় এবং জার্মাণ নৌবহর ব্যারেণ্ট সাগর ও নরওয়েজীয় নৌঘাঁটিগুলি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। নরওয়ের দেশপ্রেমিক মানুষেরা জার্মাণ দখলদারী শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে উনিশ শ' চুয়াল্লিশের শেষ থেকে উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের প্রথম দিকে যে সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল, সেই সুযোগ এসে গেল এইবার। জাতীয় মুক্তি সম্পূর্ণ হলো নরওয়ের।

*   *   *   *

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের ঘটনাবলী একথা প্রকট সত্য হিসাবে প্রমাণ করে দেয় যে সোভিয়েত জনগণের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাদের নীতির সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকদের কোন মিল ছিল না। এই দুই দেশ, ইউরোপের নাৎসী পরাধীনতা মুক্ত রাষ্ট্রে যেখানেই সুযোগ পেয়েছে একটা প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তার জন্যে নাৎসীদের সাহায্য নিতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। অথচ অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন জার্মাণ ফ্যাশিস্ত সেনাদলের সঙ্গে চালিয়েছে সর্বাত্মক সংগ্রাম মরণপণ করে, যা আসলে সেদিন ফ্যাশিবাদের অধীনতা থেকে, দাসত্ব থেকে ইউরোপের মুক্তির পথ প্রশস্ত করেছিল।

ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের প্রতিটি বিজয়ী পদক্ষেপ প্রমাণ করেছে তার মুক্তিকামী নীতির আন্তরিকতাকে, তুলে ধরেছে সকলের সামনে অন্য জাতির সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় অধিকারের প্রতি সোভিয়েত দেশ কতো শ্রদ্ধাশীল। সমস্ত দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতি, সোভিয়েত সেনাদল অনুভব করতো একটা গভীর সহমর্মিতা একটা আন্তরিক ঐক্যবোধ। যুদ্ধের সমগ্রকাল সোভিয়েতের সেনাদল যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছে তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেয় সমাজতন্ত্রের সুবিধা ও পুঁজিবাদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব কতো বাস্তব। তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে এর পরে সব দেশে সোভিয়েতের সম্মান ও প্রতিপত্তি এবং সাম্যবাদী ধারণার প্রসার দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে যে এর পর গণ আন্দোলন সফল হয়, তার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে সোভিয়েতের বীরত্বপূর্ণ আন্তরিক প্রচেষ্টা সমস্ত দেশের কাছে একটা প্রেরণাময় আদর্শ হয়ে রইলো।

॥ চার ॥

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েতের সামরিক তৎপরতা গ্রীসের মুক্তির একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। অক্টোবরে সোভিয়েত সেনাদল সংগ্রাম করছিল শত্রুর সঙ্গে যুগোশ্লোভিয়া ও হাঙ্গেরীতে। জার্মাণ ফ্যাশিস্ত নেতৃত্ব যথাসাধ্য সৈন্য সংগ্রহ করে তাদের পাঠিয়ে দেন দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে হাঙ্গেরীতে সামরিক বিপর্যয় রোধ করার জন্যে। সেই অবস্থায় গ্রীস দখলকারী শত্রু সৈন্যকে দ্রুত সরিয়ে আনা হয়। কারণ তা ছাড়া তখন আর গত্যন্তর ছিল না। পলায়ন-পর জার্মাণ সৈন্যের প্রতি পদক্ষেপে, গ্রীসের গণমুক্তি ফৌজ, "ইলাস" (ELAS) তাদের গতিরোধ করতে থাকে। বাধা দিতে থাকে জার্মাণদের। দীর্ঘদিন ধরে নাৎসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত থেকে ইলাস তখন বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করেছে জার্মাণ রণকৌশলের। আর তার শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট।

জার্মাণ সৈন্যের গ্রীস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই, সেখানে স্বাধীন, মুক্ত গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। ফলে রাজধানী এথেন্স সমেত গ্রীসের প্রায় বেশির ভাগ অংশই শত্রু কবল মুক্ত হয়ে গেল। কিন্তু বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতি-

ক্রিয়াশীলরা কোনমতেই একটা গণতান্ত্রিক গ্রীসের সম্ভাবনা সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। তাই আগস্ট, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে বৃটিশ সরকার এক অভিযাত্রী বাহিনী পাঠালেন গ্রীসে, সেখানে জনগণের আন্দোলন দমন করতে।[২৪]

সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে বৃটিশ সরকার গ্রীসের ফ্যাশি মনোভাব সম্পন্ন রাজতন্ত্রীদের সঙ্গে হয় দেশের বাইরে উত্তর আফ্রিকায়, নয়তো গ্রীসের মধ্যেই, যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। সেই গ্রীক রাজতন্ত্রীরাই বৃটিশ সরকারকে জানায় যে ইলাস যখন জার্মাণদের সঙ্গে দেশের উত্তর অঞ্চলে সংঘর্ষে লিপ্ত, তখন দেশের দক্ষিণ অঞ্চল সম্পূর্ণ অরক্ষিত পড়ে আছে। এই প্রতিক্রিয়াশীলদের একজন জর্জ প্যাপেনড্রেয়্, বেশ আগের থেকে চার্চিলকে একটি লিপি পাঠিয়ে গ্রীসের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্যে বৃটেনকে আমন্ত্রণ জানান।[২৫]

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের চৌঠা অক্টোবর ভোর বেলায়, বৃটিশ সৈন্য বিনা বাধায় দক্ষিণ গ্রীসে অবতরণ করে। মাস দুয়েক সময়ের মধ্যেই বৃটিশ সরকার গ্রীসেই নিজেদের অনুগত সেনাদল গঠন করে, তেসরা ডিসেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, এথেন্সে একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধিয়ে, গ্রীকদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম সুরু করেন। গ্রীসে বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল স্কোবির (Scobie) কাছে, চার্চিল চরম পন্থা অবলম্বনের জন্যে নানা উপদেশ দেন। এই রকম একটি নির্দেশনামায়, চার্চিল লিখেছিলেন: "অধিকৃত কোন শহরে স্থানীয় বিদ্রোহ দমনের জন্যে যে রকম নীতি গ্রহণ করতে হয়, তেমন কোন কাজ করতেও কোন দ্বিধা দেখাবেন না।"[২৬]

আরেকটি নির্দেশে চার্চিল লেখেন:

"এথেন্স আমাদের দখল করতে হবে এবং অধীনে রাখতে হবে। একাজ যদি বিনা রক্তপাতে করা সম্ভব হয় তাহলে তা হবে আপনার এক বিরাট কৃতিত্ব, কিন্তু তা না হলে প্রয়োজনে রক্তপাতও ঘটাতে হবে।"[২৭]

আরেক জায়গায় চার্চিল গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে, আয়ার্ল্যাণ্ডের বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আর্থার ব্যালফোরের বিখ্যাত টেলিগ্রামের ভাষা উদ্ধৃত করে বলেন: "গুলী করতে দ্বিধা করবেন না।"[২৮]

বৃটেনের গ্রীস দখল কিন্তু সমস্ত গণতান্ত্রিক দেশে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। এমন কি বৃটেনের লোকেরাও ক্ষুব্ধ, ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু পার্লামেন্টে

রক্ষণশীল ও উদার নৈতিক দল এবং শ্রমিক দলের নেতৃত্বও এই কুখ্যাত বৃটিশ নীতি সমর্থন করেন। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে শ্রমিক দলের এক কংগ্রেসে, বেভিন চার্চিলের গ্রীক নীতির সমর্থনে আবেগের সঙ্গে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, "বৃটিশ সাম্রাজ্য ভূমধ্য সাগরে তার ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি বিসর্জন দিতে পারে না।"[২৯]

গ্রীসে হস্তক্ষেপ করার সময়, বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী তাদের মার্কিণ প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও সময়ের পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ দ্বন্দ্বের এই প্রকট নির্লজ্জ রূপ থাকা সত্ত্বেও, মার্কিণ সরকার এই হস্তক্ষেপ নীতিকে স্বাগত জানান। তাঁদের আশা ছিল যে বৃটেনকে কোণঠাসা করে, কিম্বা গ্রীস থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে, তাঁরা সমস্ত পরিবেশটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

প্রায় নাৎসীদের অনুরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে, বৃটিশ হস্তক্ষেপকারীরা গ্রীসে তেত্রিশ দিন ধরে এক অত্যন্ত জঘন্য ধরনের যুদ্ধ চালায়। ব্যাপক গ্রেপ্তার, নিরস্ত্র মানুষদের হত্যা করে, ঘন ঘন বিমান থেকে বোমা ফেলে গ্রীসের গ্রাম ও শহরে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে, যুদ্ধ জাহাজ থেকে গোলাবর্ষণ করে, বৃটেন যা খুশি তাই করেছে গ্রীস দখলের জন্যে।

বারোই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে বৃটেন, ইয়েম (EAM)-কে বাধ্য করলো ভার্কিজাতে (Varkiza) একটা চুক্তি করতে। গ্রীসের মুক্তি ফৌজকে অস্ত্র পরিত্যাগ করতে হবে, এবং বৃটিশ দখলদারী সৈন্য ও তাদের অনুগত, বাধ্য রাজতন্ত্রীদের ক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে।

বৃটিশ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা আলবেনিয়া দখলের জন্যেও সচেষ্ট হয়। দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতের অগ্রগতি, সেই দেশ থেকে জার্মাণদের পালাতে বাধ্য করে। তাদের পিছু ধাওয়া করতে গিয়েই, আলবেনিয়ার গণমুক্তি ফৌজ প্রায় সমগ্র দেশটাই শত্রু মুক্ত করে ফেলে। মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী এবং তাদের স্থানীয় অনুচররা, পিছন থেকে দেশপ্রেমিক আলবেনীয়দের আঘাত করতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল আবাজ কুপি'র (Abaz Kupi) দল, জেনারেল ফিট্জরয় ম্যাকলীনের (Fitzroy MaeLean) অধীনে, দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে রীতিমতো একটা যুদ্ধ সুরু করে দেয়।

যখন এই সংঘর্ষ বেধে গেল তখন ভূমধ্য সাগরে বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক, ফিল্ড মার্শাল আলেকজাণ্ডার, আলবেনিয়ার অস্থায়ী সরকারের কাছে কড়া ভাষায় এক চরমপত্র পাঠালেন। তাঁর দাবী ছিল যে আবাজ্ কুপির বিরুদ্ধে আলবেনিয়ার গণফৌজের সমস্ত সক্রিয়তা বন্ধ করতে হবে। শক্তি সমাবেশ ঘটিয়ে আলবেনিয়ার মানুষদের আতংকিত করার জন্যে দলে দলে বৃটিশ ছত্রীবাহিনী পাঠানো হতে লাগলো আলবেনিয়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই একদল বৃটিশ সৈন্য, আলবেনিয়ার বন্দর সারান্দা দখল করে নিল।

কিন্তু দেশপ্রেমিক আলবেনিয়রা তাতেও বিচলিত হয়নি। তারা আলেকজাণ্ডারের চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে, কুপি দলের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও জোরালো তৎপরতা সুরু করলো। বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে তারা কঠোর ভাবে সারান্দা থেকে সমস্ত বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ দাবী করলো। তখন বৃটিশ সরকার ব্যাপারটা জটিল হয়ে এক গুরুতর সংঘর্ষের আশংকা করে, সেই দাবী মেনে নিলেন। উনত্রিশে নভেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশের মধ্যেই আলবেনিয়ার বীর জনগণ, সোভিয়েতের বিজয় সাফল্যের সুযোগ নিয়ে, সমগ্র দেশ শত্রুমুক্ত করে ফেললো।

মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকদের শ্যেনদৃষ্টি রুমেনিয়ার উপরেও পড়েছিল। রাজা মাইকেলের সঙ্গে যোগসাজসে তাঁরা চেষ্টা করছিলেন এখানে একটা ফ্যাশিস্ত-পন্থী অভ্যুত্থানের চক্রান্ত বিস্তার করতে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে, ছয়ই ডিসেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সানাতেস্কু'র (Sanatescu) সরকার বাতিল করে, জেনারেল রাদেস্কু'কে (Radescu) সরকার গঠন করতে দেওয়া হলো। একজন চরমপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল, এই নিকোলাই রাদেস্কু, রুমেনিয়ার সামরিক অ্যাটাশে (Attache) হিসেবে বহু বছর লণ্ডনে কাটিয়েছেন। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ছিল খুব ঘনিষ্ঠ। এখন বৃটিশ সরকার তাঁর ক্ষমতা পাওয়ার জন্যে বেশ চাপ দিতে লাগলেন।

রাদেস্কু ক্ষমতা পেয়েই কাল বিলম্ব না করে রুমেনিয়ার গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত করতে সুরু করলেন। কমিউনিষ্ট সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় দপ্তরগুলি আক্রমণ করে ভেঙ্গে দেওয়া হলো। কমিউনিষ্ট ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কাজের প্ররোচনা দেওয়া হতে লাগলো। এমন কি রাদেস্কুর নেতৃত্বে সংগঠিত ফ্যাশিপন্থী সৈন্যরা সোভিয়েত সৈনিক ও অফিসারদের উপর

হামলা করতে সুরু করলো। ফ্যাশিশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার বাসনায়, রাদেস্কু ফ্যাশিস্ত নেতাদের দিয়ে বুখারেষ্টের আশেপাশে এক বিরাট সৈন্য বাহিনী গঠন করালেন।

রুমেনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াশ্রেণী যারা ইতিপূর্বে নাৎসীদের কাছে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে ইতস্তত করেনি, তারা এবার অনুরূপ কাজ করলো মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে। ভেবেছিল তারা পাশবিক শক্তির সাহায্যে গণপ্রতিরোধকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেওয়া যাবে। মার্কিণ ও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে রাদেস্কু তাঁর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে সুরু করলেন ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে।

বুখারেষ্টের রাস্তায় সৈন্যবোঝাই লরী ও ট্যাঙ্ক আবার দেখা গেল এগারোই ফেব্রুয়ারী তারিখে। প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত তখন হত্যার জন্যে তৈরী হয়ে উঠেছে। বিশে ফেব্রুয়ারী একদল ফ্যাশিস্ত লিজিয়নের সদস্য, সংখ্যায় জন কুড়ি, বুখারেষ্টে একটা কারখানা মালাক্সা দখল করতে গেল। সারা দেশের শ্রমিক শ্রেণী এতে ক্ষুব্ধ হয়ে রাদেস্কুর পদত্যাগ ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রবর্তনের দাবী করলো। রুমেনিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশের অক্টোবরে গঠিত রুমেনীয় জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট, জনগণের দাবীকে সুগঠিত ভাবে প্রকাশ করার জন্যে বুখারেষ্ট ও অন্যান্য শহরে চব্বিশে ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে গণসমাবেশ আহ্বান করলেন।

রাদেস্কু মন্ত্রিসভার ফ্যাশিস্ত কায়দার অত্যাচারে জনগণ প্রতিবাদে মুখর প্রতিরোধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠলো। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের দাবী জানিয়ে হাজার হাজার মানুষ চব্বিশে ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে জমায়েত হলো বুখারেষ্টের কেন্দ্রীয় পার্কে। রাদেস্কু সরকার গণদাবীর জবাব দিলেন বুলেটে। রাজপ্রাসাদ ও আভ্যন্তরীণ মন্ত্রীদপ্তরের ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলী এসে পড়তে লাগলো সভার উপরে।

কিন্তু সোভিয়েত সেনাদল যুদ্ধ বিরতির চুক্তি অনুযায়ী জনগণের আইন-সঙ্গত অধিকার রক্ষার ভার নিয়েছিল। রুমেনিয়ায় সোভিয়েত সেনাদলের স্থানীয় নেতৃত্ব, সরকারকে সতর্ক করে দিলেন যে জনগণের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কাজ তাঁরা সহ্য করবেন না। জনগণের ক্রোধের বিস্ফোরণে আতংকিত রাদেস্কু বৃটিশ দূতাবাসে আশ্রয় নিলেন। মার্কিণ কূটনীতিবিদ্‌রা আরো বেশি

নিরাপত্তার জন্যে তাঁকে জাহাজে তুলে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রে। বৃটিশ ও মার্কিণ সরকার কিন্তু রুমেনিয়ায় আর সরাসরি হস্তক্ষেপ* করার ঝুঁকি নিতে চাইলেন না।

শোভাযাত্রাকারী ও সমাবেশের উপর গুলিবর্ষণ করার পরে, সারাদেশে জনগণের বিক্ষোভ ফেটে পড়লো। সমস্ত মেহনতী মানুষ অবিলম্বে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের সরকার গঠনের জন্যে দাবী জানালেন। রাদেস্কুর পরাজয় সম্পূর্ণ হলো। ছয়ই মার্চ, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে পেত্রুগ্রোজ়ার (Petru Groza) নেতৃত্বে একটি জনগণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হলো। জয়ী হলো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিপ্লব। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি এক বাণীতে এই নোতুন রুমেনীয় সরকার ঘোষণা করলেন যে দেশের কলঙ্কময় অতীতকে মুছে ফেলে, রুমেনিয়া মিত্রপক্ষের প্রতি তার দায় দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে এবং তার মহান পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে থাকবে তার চরম বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক।

*   *   *   *

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে, বৃটিশ ও মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের সামরিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে এই সমগ্র অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করলো। কিন্তু সোভিয়েত সেনাদল ফ্যাশিস্ত দাসত্ব থেকে বলকান অঞ্চলের দেশগুলিকে যথা সময়ে মুক্ত করে এমন এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে যাতে জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ সম্ভব হতে পারে। তাই দেখা যায় মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশের জনগণ তাঁদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার নিরিখে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করতে পেরে-ছিলেন।

১. টিপ্পল স্কার্চ : পূর্বোক্ত, গ্রন্থ, পৃঃ ৪৮৪
২. Soviet Foreign Policy, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৩
৩. ঐ, ঐ পৃঃ ১২৪-২৫
৪. ঐ ঐ পৃঃ ১২৯-৩০
৫. প্রাভ্দা, ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৬
৬. Soviet Foreign Policy, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১৯
৭. ঐ, ঐ

৮. Rabotnichesko Delo, ২রা এপ্রিল, ১৯৪৮

৯. প্রাভদা. ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪

১০. টাইমস্ পত্রিকা, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪

১১. Soviet Foreign Policy, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭২

১২. একটি জার্মাণ ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ

১৩. ঐ

১৪. জাঁ ক্যাথলা : মস্কোয় প্রকাশিত ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ

১৫. মরিস তোরে : একটি ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ,

১৬. France d' Abord, ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৮

১৭. Figaro, ২১শে জুলাই, ১৯৫১

১৮. জেনারেল জর্জ এস. প্যাটন : War As I knew It. বোষ্টন, ১৯৪৭, পৃঃ ১১৭

১৯. ব্রাডলী : পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮৮-৯০

২০. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫২

২১. দ্য গল : স্মৃতিকথা ১৯৪২-৪৪, পৃঃ ৫৮৬

২২. Soviet Foreign Policy, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৩-৯৫

২৩. প্রাভ্দা ১লা জানুয়ারী, ১৯৪৫

২৪. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৫২

২৫. ডি. শেভ্রিয়ের রচিত একটি ফরাসী গ্রন্থ

২৬. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ২৫২

২৭. ঐ

২৮. ঐ

২৯. ডি. শেভরিয়ে রচিত উপরোক্ত গ্রন্থ

সপ্তদশ অধ্যায়

ক্রিমিয়া সম্মেলন

একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল একটা সোনার খনির মতো। বিশেষ করে মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা দু'হাতে মুনাফা করছিল তখন। অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের জন্যে সরকারী চাহিদা আর বড়ো বড়ো বাড়ী, দুইই বাড়তে লাগলো হু হু করে। মার্কিণ সরকার নোতুন নোতুন বাড়ী তৈরীর জন্যে এই সময়ের মধ্যে বাইশ শ' কোটি ডলার ব্যয় করেছিলেন। একচেটিয়া কারবারীরা গৃহনির্মাণের সাজসরঞ্জাম, মালমশলা অত্যন্ত চড়া দরে সরকারকে বিক্রি করতে থাকে। বাড়ী তৈরীর কাজ শেষ হলেই সেখানে যন্ত্রপাতি বসিয়ে একটা আগাগোড়া নোতুন কারখানা রাষ্ট্র বেসরকারী মালিকদের ইজারা সত্বে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দিয়ে দিত। একচেটিয়া কারবারীরা নাম মাত্র টাকা ভাড়া স্বরূপ দিয়ে, এখানে যা উৎপাদন করতো, তাই আবার চড়া দরে বিক্রি করতো বাজারে। যুদ্ধ শেষে, মার্কিণ সরকার সেই সব সরকারী টাকায় তৈরী, ইজারা সত্বে বিলি করা কলকারখানা, নামমাত্র দামে সেই সব ইজারাদার একচেটিয়া-কারবারীদের কাছেই বিক্রি করে দেন।

মার্কিণ ও বৃটিশ উৎপাদনকারীরা যুদ্ধকে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কম করে, কৃষকের আয় হ্রাস করার জন্যে বিশেষভাবে কাজে লাগিয়েছে। দেশে, বিদেশে শ্রমিক শ্রেণীকে তাদের নায্য মজুরী থেকে বঞ্চিত করে, উৎপাদন বৃদ্ধির যুদ্ধ জনিত চাপকে কাজে লাগিয়ে, তারা সাধারণ মানুষকে শোষণ করে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলেছিল।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশের শেষে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার জার্মাণীর ফ্যাশিস্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আরেক দফা গোপন শলা পরামর্শ চালান। সুইডেনের রাজবংশোদ্ভুত, কাউন্ট বার্ণাডোট্ (Bernadotte), আইসেনহাওয়ারের সদর কার্যালয় আর উচ্চপদস্থ নাৎসী নেতা হিমালারের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর কাজ করেন। তাঁরা একদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, অন্যদিকে জার্মাণীর মধ্যে

একটা যুদ্ধ বিরতির সর্ত নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল নাৎসী জার্মাণীকে সমগ্র শক্তি নিয়ে অগ্রসরমান সোভিয়েত সেনাদলকে প্রতিরোধ করার একটা সুযোগ দেওয়া।

যখন এই সব আলোচনা চলছে, তখন মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার রণাঙ্গনে ক্ষনিক বিরতির আদেশ জারী করলেন। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি মিত্রপক্ষের সৈন্যরা, জার্মাণীর পশ্চিম সীমান্তে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে চুপচাপ বসে রইলো। এমন কি রণাঙ্গনে প্রথম সারির অফিসার ও সৈনিকদের অল্প দিন কয়েকের ছুটিও মঞ্জুর করা হতে লাগলো।

জার্মাণ ফ্যাশিস্ত নেতৃত্ব এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মিত্রপক্ষকে পাল্টা আক্রমণ করলেন। গুদেরিয়ান পরবর্তীকালে লিখেছিলেন যে হিটলার "এই ভাবে কিছুটা সময় হাতে পাওয়ার আশা করেছিলেন যাতে শত্রুপক্ষের সম্পূর্ণ বিজয়লাভ সম্ভব না হয়, তাহলে সেই সম্ভবনার কথা বলে তাদের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের দাবীর পরিবর্তে, সকলের সম্মতিতে একটা শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা যাবে।"[১]

এগারোই ও বারোই ডিসেম্বর জার্মাণ সেনাদলের সর্বোচ্চ নেতারা হিটলারের সদর কার্যালয়ে এক বৈঠকে মিলিত হলেন। তাঁরা আর্দেনেসে একটা অভিযান চালাবার সিদ্ধান্ত করেন।

আজকে যে সব ফ্যাশিস্ত প্রাক্তন অধিনায়করা, মার্কিন ও বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টিতে সাধু সাজতে চান, তাদের সুনজরে থাকতে চান, তাঁরা কেউই আর্দেনেস ব্যর্থতার দায়ভাগ নিতে চান না। তাঁরা এমনভাব করেন যেন এ ব্যাপারে তাঁদের কোন হাতই ছিল না। তাঁরা এটাই বোঝাতে চান যে তাঁদের সকলের অমত থাকা সত্ত্বেও হিটলার সেই মত তুচ্ছ করে, ব্যক্তিগত ভাবে নিজে এই অভিযানের আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কর্ণেল-জেনারেল জোড্‌ল এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন বলে শোনা যায়: "অ্যান্টেওয়ার্প কার্যক্রম যে একটা চরম দুঃসাহসিক পরিকল্পনা, এ ব্যাপারে আমি হিটলারের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলাম। কিন্তু আমাদের অবস্থা তখন চরমে পৌঁছেছে। সেই চরম প্রতিকূলতা কাটাতে গেলে কোন চরম অনিশ্চয়তা পূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজই করতে হবে। কেবল আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধ করে আমরা আমাদের অমোঘ নিয়তি এড়াতে পারতুম না।

বরং যুদ্ধ করে, অপেক্ষা করে পরিণতির জন্যে বসে না থেকে, হয় তো বা আমরা এখনো কিছু রক্ষা করতে পারি।"[২]

একেবারে সমস্ত বাক্‌বিতণ্ডা বাদ দিয়ে, জার্মাণীর এই সামরিক কার্যক্রমকে বিচার করলে দেখা যায়, এটা ছিল, উনিশ শ' চল্লিশে হিটলার যে অতর্কিত আক্রমণের বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই জয়লাভ করার নীতিগ্রহণ করেছিলেন, মূলতঃ তারই অনুরূপ। এর লক্ষ্য ছিল দ্রুত অভিযান চালিয়ে একেবারে উপকূলবর্তী অঞ্চলে চলে যাওয়া, তারপর ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযাত্রী বাহিনীকে তার রসদের যোগান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে ধ্বংস করে ফেলা। একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, এ যাত্রায় জার্মাণ সৈন্যরা ব্যাপক অঞ্চল বেষ্টন না করে, অল্প জায়গার মধ্যেই তাদের সব সক্রিয়তা সীমিত রাখবে। ঠিক হলো সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে চাপ দিতে হবে মনশ্‌চাউ (Manschau) ও একটেরন্যাশের (Echternach) মাঝামাঝি আর্দেনেস অঞ্চলে, যেখানে বৃটিশ ও মার্কিন সেনাদল মিলিত হচ্ছে। তারপর অভিযানের ধারা ঘুরে যাবে দিনান্ট-নামুর-লিজে (Dinat-Namur-Liege) হয়ে অ্যান্টেওয়ার্পের দিকে। অ্যান্টেওয়ার্প তখন ছিল মিত্র পক্ষের প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। জার্মাণদের প্রত্যাশা ছিল একাজে সফল হতে পারলে, তাদের রসদের ঘাট্‌তি রীতিমতো পূরণ করে নেওয়া হবে অ্যান্টেওয়ার্প থেকে। জেনারেল ভন্ রুণ্ডষ্টেডের নেতৃত্বে তিনটি সেনাদল—যার মধ্যে ছিল দশটি প্যানসার ডিভিসন, এবং চোদ্দটি পদাতিক ও মোটরবাহিত ডিভিসন, এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করবে স্থির করা হলো।

জার্মাণ পাল্টা আক্রমণ এই অঞ্চলে সুরু হলো ষোলই ডিসেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্বের কাছে এটা একটা চূড়ান্ত বিস্ময়কর ব্যাপার বলে মনে হলো। এর জন্যে ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক গুপ্তচর বিভাগকে দোষ দেওয়ার কিছুই ছিল না। এর জন্যে দায়ী ছিল ইঙ্গ-মার্কিণদের রাজনৈতিক চিন্তাধারা, যা জার্মাণীর পাল্টা আক্রমণের ক্ষমতাকে কোন মতে বিশ্বাস করতে রাজী ছিল না। সমকালীন পরিস্থিতিতে জার্মাণীর এই ভ্রান্তির জন্যে, ফুলার তার ফ্যাশিস্ত নেতৃত্বকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন যে জার্মাণী নিজের শ্রেষ্ঠস্বার্থে কাজ না করে, হঠকারিতা করে বসলো। তিনি লিখেছেন: "রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে পশ্চিম

রণাঙ্গনে কোন সামরিক তৎপরতা না রেখে, তাকে পরিত্যাগ করে, সমস্ত শক্তি রুশদের বিরুদ্ধে সমবেত করাই শ্রেষ্ঠ স্বার্থগত নীতি। তাতে সমগ্র জার্মাণী ও অষ্ট্রিয়া চলে আসতো মার্কিণ ও বৃটিশদের হাতে এবং রুশদের ক্রমবর্দ্ধমান খ্যাতিতে একটা চরম আঘাত হানা যেত।"[৩] ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্বের মিত্রপক্ষীয় উদ্দেশ্যের প্রতি এই চরম বিশ্বাসঘাতক ধারণাই আর্দেনেসে জার্মাণীর পাণ্টা আক্রমণ সফল করে তোলার প্রধানতম কারণ ছিল।

সৈন্য সংখ্যার বিচারে ইঙ্গ-মার্কিণদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য ছিল। সর্বসাকুল্যে তাদের ছিল নব্বই ডিভিসন সৈন্য, তার মধ্যে চব্বিশটি হলো আবার সাঁজোয়া ডিভিসন। জার্মাণীর তুলনায় পদাতিক বাহিনীর সংখ্যা ছিল তিনগুণ, আর ট্যাঙ্ক, গোলন্দাজ ও বিমান বহর যে কতগুণ বেশি তা সঠিক বলা শক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মাণীর আর্দেনেস অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হতে লাগলো। ইঙ্গ-মার্কিণদের রণকৌশল বুমেরাং হয়ে তাদেরই আঘাত করলো। মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে মারাত্মক গলদ ছিল তা প্রকট হয়ে উঠলো সকলের কাছে।

অভিযানের প্রথম পর্ব, জার্মাণ নেতৃত্বের পরিকল্পনা অনুযায়ী চলে। অতর্কিতে চাপ সৃষ্টি করে অগ্রগতির পথ বাধা মুক্ত করতে তাকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যরা তাড়াতাড়ি পিছু হটে গেল। তাদের উপর সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেল। ওমার ব্রাড্‌লী এরই সম্বন্ধে পরে বলেছিলেন যে আইসেনহাওয়ারের লোকজনদের মধ্যে দেখা গেল "সেই সব লক্ষণ যাকে আমরা নিজেদের মধ্যে বলে থাকি কোন কিছুতে ধাক্কা খাওয়ার পরে চরম আত্মবিশ্বাসের অভাব।"[৪]

অভিযানের দ্বিতীয় দিনে জার্মাণ সৈন্যরা ম্যালমেডি ও ভিয়েলসাম্ নগর দখল করে স্পা (Spa) শহরে প্রবেশ করলো। আক্রমণের প্রথম সপ্তাহের শেষে পশ্চিম রণাঙ্গনে প্রায় একশ কিলোমিটার দীর্ঘ একটা অঞ্চলে জার্মাণ সৈন্যরা বেষ্টনী ভেঙ্গে এগিয়ে গেল। এই ভাঙ্গনের গভীরতা ছিল প্রায় একশ' দশ কিলোমিটার। তেইশে ডিসেম্বর জার্মাণ বাহিনীর একটা অগ্রবর্তী অংশ দিনান্টের কাছে মাস (Maas) অতিক্রম করে একেবারে লিজে শহরের পশ্চিমে নদীর তীরে উপস্থিত হয়। বিভ্রান্ত হয়ে পশ্চাদাপসরণ করতে গিয়ে

ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, জ্বালানীর এক বিরাট পরিমাণ রসদ ফেলে পালিয়ে গেল।

এর পরেই ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক নেতৃত্ব ও মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের নেতৃত্বের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। জার্মানরা তাকেও কাজে লাগায়। দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে তারা। আবার হত চকিত হয়ে পড়ে নানা দেশের মানুষ তাদের সাফল্য দেখে। মিত্রপক্ষের উত্তর বাহিনী, যা ছিল প্রধানতঃ বৃটিশ, মূলতঃ মার্কিণ দক্ষিণ বাহিনীর সঙ্গে সমস্ত সংযোগ হারায়। জার্মাণ সৈন্যরা এমন একটা সুবিধাজনক স্থানে এসে পড়ে, যাতে মনে হয় বুঝিবা দ্বিতীয় ডানকার্ক আসন্ন। জার্মাণীর এই সামরিক তৎপরতা, ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযাত্রী বাহিনীর এক বিরাট অংশের সামনে হাজির করে এক চরম বিপর্যয়ের সম্ভবনা।

স্পষ্টতই সেদিন বোঝা গিয়েছিল যে শুধু নিজেদের শক্তির জোরে ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্ব জার্মাণদের এক পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে না। সেই দুর্দিনে চার্চিল, সোভিয়েত সরকারের প্রধানের কাছে আবেদন করলেন যে সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের কোথাও নোতুন এক অভিযান সুরু করে তাঁরা ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্য বাহিনীর উপর থেকে জার্মাণীর এই সামরিক চাপ হ্রাস করাতে পারেন কিনা। তখন সবেমাত্র সোভিয়েত সেনাদল তাদের বিরাট শীতকালীন অভিযানের পালা সাঙ্গ করেছে। রণাঙ্গনের আবহাওয়াও তখন অত্যন্ত খারাপ। তা সত্বেও সোভিয়েত সরকার এক তারবার্তায় পরদিন সাতই জানুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে জানালেন যে পশ্চিম রণাঙ্গনের সামরিক পরিস্থিতি সংকটাপন্ন হওয়ার জন্যে, সোভিয়েতের সর্বোচ্চ সামরিক নেতৃত্ব জরুরী প্রস্তুতি চালিয়ে, আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্বেও, এই জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয়ার্ধে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই বিরাট আকারে অভিযান সুরু করবে।[৫] কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকায়, সোভিয়েত নেতৃত্বকে আরো দ্রুততার সঙ্গে প্রস্তুতি চালিয়ে ; মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার জন্যে অগ্রসর হতে হলো। তাই দেখা গেল জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয়ার্ধের জন্যে অপেক্ষা না করে, বারোই জানুয়ারীতেই সমগ্র সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গন জুড়ে, বাল্টিক থেকে কার্পেথিয়ান পর্যন্ত সোভিয়েত সেনাদল নোতুন আক্রমণ সুরু করেছে।

পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েতের এই সময়োচিত পাল্টা আক্রমণ, পশ্চিম রণাঙ্গনে ইঙ্গ-মার্কিণ মিত্রপক্ষকে জার্মাণীর হাতে এক বড়ো রকমের সামরিক বিপর্যয়ের সম্ভবনা থেকে রক্ষা করলো। সোভিয়েতের শক্তিশালী আঘাতে হিটলার তাঁর রণকৌশল বদলে ফেলে, পশ্চিম রণাঙ্গনে শুধু আত্মরক্ষামূলক তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে, সাহায্যকারী সেনাদল পাঠাতে লাগলেন পূর্ব রণাঙ্গনে।[৬] জানুয়ারী মাস শেষ হতে না হতেই জার্মাণ নেতৃত্ব আর্দেনেস থেকে সৈন্য অপসারণ করে তাদের পূর্ববর্তী স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন। তা জেনেও ইঙ্গ-মার্কিণ কর্তৃ[illegible] ফেব্রুয়ারী মাস না আসা পর্যন্ত তাঁদের সেনাদলের রাইনের দিকে মন্থরগতি অভিযান সুরু করতে ভরসা পেলেন না।

যে সোভিয়েত অভিযান, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের মুখ থেকে উদ্ধার করে আনলো, তা এটাই প্রমাণ করে দিল যে মিত্রপক্ষীয় কর্তব্য পালনে সোভিয়েত সরকার, ইঙ্গ-মার্কিণ শাসকদের মতো স্বার্থগন্ধী বিমুখতা না দেখিয়ে, যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে থাকেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে মিত্রপক্ষের প্রতি তার প্রতিশ্রুত দায়িত্বভার, একাগ্রতা, আন্তরিকতার সঙ্গে ও স্বার্থপরতাশূন্য হয়ে পালন করেছে।

ইঙ্গ-মার্কিণ ইতিহাসবিদ্‌রা অবিশ্যি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মিত্রপক্ষের প্রতি তার কর্তব্যনিষ্টার সত্যতা গোপন করার চেষ্টা করেছেন। আর্দেনেসে জার্মাণ অভিযান বর্ণনা করতে গিয়ে অনেক কাগজ, কালি খরচ করে, তাঁরা পূর্বরণাঙ্গনে সোভিয়েতের একই কালে আক্রমণ রচনার গুরুত্ব, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলকে আর্দেনেসে নিশ্চিত বিপর্যয়ের মুখ থেকে রক্ষা করায় তার ভূমিকার বিষয়ে, তেমন কিছুই বলেননি। কেউ কেউ ব্যাপারটা একেবারে বেমালুম চেপে গেছেন। পশ্চিম জার্মাণীর ইতিহাসবিদরা ইচ্ছামূলক বিভ্রান্তির মাধ্যমে ইতিহাসের বিকৃতিকরণে পশ্চিমী সগোত্রীয়দের সহযাত্রী হয়েছেন। এ ব্যাপারে ওমার ব্রাড্‌লী আবার সকলকে হার মানিয়েছেন। তিনি উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েতের সাফল্যকে, আর্দেনেসে মিত্রপক্ষীয় সৈন্য সমাবেশের "রণকৌশল গত ফলশ্রুতি" বলে বর্ণনা করেছেন।[৭]

ইতিহাসকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করলেও, ঘটনাকে চাপা দিয়ে রাখা যায়নি। যেমন ড্যাগেন্স্ নাইহেডার (Dagens Nyheder) চব্বিশে

জানুয়ারী, উনিশ শ' পঁতাল্লিশে পূর্ব-রণাঙ্গনে সোভিয়েত আক্রমণ ও পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিণ তৎপরতার তুলনামূলক আলোচনায় লিখেছিল যে, "রুশদের এই বিরাট আক্রমণের বিদ্যুৎগতির সঙ্গে তুলনীয় সামরিক ইতিহাসে কোথাও কোন ঘটনা নেই। যুদ্ধের সূচনা পর্বে জার্মাণদের ব্লিৎসক্রীগ আক্রমণ ধারা, বর্তমানের রুশ আক্রমণধারার তুলনায়, যা অশ্রুতপূর্ব গতিতে সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে অগ্রসর হচ্ছে, নিতান্ত তুচ্ছ একটা ঘটনা।"

মার্কিণ ও বৃটিশ নেতৃবৃন্দ সোভিয়েত সেনাদল ও সোভিয়েতের জনগণকে জার্মাণীর বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রচেষ্টার জন্যে অভিনন্দিত করেছিলেন। এমনকি পশ্চিম ইউরোপে তাঁদের সৈন্যদলের অবতরণের পরেও, সোভিয়েত জার্মাণ-রণাঙ্গন যে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেকথা তাঁরা স্বীকার করেছেন। উনিশ পঁয়তাল্লিশের ফেব্রুয়ারীতে চার্চিল লিখেছিলেন:

"যে লাল ফৌজ জার্মাণ জঙ্গীবাদের উপর অমোঘ নিয়তির যবনিকা টেনে দিয়ে তার মিত্রপক্ষের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে, সেই লাল ফৌজ আজ জয়োল্লাসের মধ্যে উদ্‌যাপন করছে তার সপ্ত বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস। যে গর্ব করার মতো বিরাট সাফল্য তারা অর্জন করেছে, আমরা যারা আজ তা প্রত্যক্ষ করছি, আমাদের মতোই অনাগত কালের মানুষেরা, তাদের কাছে অকুণ্ঠ ভাবে কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করবে।"[৮] মার্কিণ দেশের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের বাণীর সঙ্গে এই অভিনন্দন একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, যখন তিনি বলেন: "লাল ফৌজ ও রাশিয়ার জনগণ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চিরস্থায়ী বিস্ময় মিশ্রিত প্রশংসা অর্জন করেছে।"[৯]

॥ দুই ॥

ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের চমকপ্রদ বিজয় সাফল্য, যুদ্ধের অবসান ত্বরান্বিত করেছিল। আর্দেনেসে জার্মাণ অভিযানের সময়, একান্ত প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সোভিয়েতের সাহায্য এবং নাৎসী অধিকৃত ইউরোপীয় দেশ গুলির জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ব্যাপক বিস্তৃতি, চৌঠা থেকে বারোই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, তিন বৃহৎ শক্তির শীর্ষ সম্মেলনের পটভূমি রচনা করলো। সম্মেলন বসলো ক্রিমিয়ায়। সম্মেলনের স্থান যে সোভিয়েত ভূমিরই কোন

এক অঞ্চলে স্থিরীকৃত হলো, তার থেকেই সোভিয়েতের ক্রমবর্দ্ধমান আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রভাবের গুরুত্ব বোঝা যায়।

ইয়াল্টায় (yalta) প্রথম যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়, তা হলো যুদ্ধলিপ্ত জার্মাণ রাষ্ট্রের সমস্যা। চূড়ান্ত বিজয়ের জন্যে যৌথ সামরিক পরিকল্পনা রচিত হলো এখানে। এর আগে ইউরোপীয় পরামর্শদাতাকমিশন পরাজিত জার্মাণীর বিভিন্ন অঞ্চলের দখলীকরণ ও বৃহত্তর বার্লিনের শাসন পরিচালনা সম্পর্কে একটা খসড়া রচনা করে। বারোই সেপ্টেম্বর উনিশ শ' চুয়াল্লিশে তা যথারীতি ইঙ্গ-সোভিয়েত-মার্কিণ স্বাক্ষরযুক্ত ও বিধিবদ্ধ হয়। ক্রিমিয়ায় সেই চুক্তি অনুমোদন করা হলো এবং ত্রিশক্তির অধিকৃত অঞ্চলের সীমানাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো।

সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে, জার্মাণী দখলীকরণে ফ্রান্সকেও আহ্বান করা হলো। তাই ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল একটা নির্দিষ্ট করে দেওয়ার বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ হয়ে রইলো। এই বিষয়ের আলোচনা বেশ কয়েক মাস ধরে চলে। অবশেষে ছাব্বিশে জুলাই, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন স্থির হয় যে উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম জার্মাণী থাকবে যথাক্রমে বৃটিশ ও মার্কিণ অধিকারে। আর পশ্চিম জার্মাণীর শাসন চালাবে ফ্রান্স।

এই আলোচনাতেও বৃটিশ ও মার্কিণ সরকার জার্মাণীর খণ্ডীকরণের বিষয়ে তাঁদের নিজের নিজের পরিকল্পনা হাজির করেন। একটা জিনিস তার মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে, তা হলো এদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য। মার্কিণ ও বৃটিশ বৃহৎ পুঁজিপাতিরা বরাবরই জার্মাণ একচেটিয়াপতিদের তাদের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এসেছে। তারা তাই এই সুযোগে জার্মাণীর অর্থনৈতিক শক্তিকে ধ্বংস করে, বিশ্ববাজারে জার্মাণ প্রতিযোগিতার বিপদ দূর করতে চেয়েছিল, যাতে সেখানে নিজের আধিপত্য বিস্তার করা যায়। কুইবেকের ইঙ্গ-মার্কিণ বৈঠকে, পনেরোই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে, চার্চিল ও রুজভেল্ট জার্মাণীর খণ্ডীকরণ বিষয়ে একটি পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করেন। এর নাম ছিল মরগ্যানথু (Morgenthau) পরিকল্পনা। এতে জার্মাণীর খণ্ডীকরণের সঙ্গে তার শিল্প ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে, কৃষিনির্ভরতার দিকে জোর দেওয়া হয়েছিল বেশি। স্বাক্ষরকারীরা রূঢ় ও সারের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ

করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মরগ্যানথু পরিকল্পনার শেষের দিকে বলা হয় যে, তার লক্ষ্য হচ্ছে "জার্মানীকে প্রধানতঃ একটি কৃষিনির্ভর ও পশুপালনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন দেশে পরিণত করা।"[১০] মরগ্যানথু পরিকল্পনায় আরো বলা হয় যে, "একটির পরিবর্তে দু'টি জার্মানী গঠিত হলে আমাদের কাজ করার সুবিধা হবে।"[১১]

একথা সকলেরই জানা ছিল যে জার্মাণ জনগণ এই খণ্ডীকরণে বাধা দেবে। মার্কিণ সহকারী পররাষ্ট্র সচিব সামনার ওয়েলস্ লিখেছেন যে, "শিগ্ গি্র অবিশ্যি জার্মাণরা এমন একটা সন্তোষজনক মাধ্যম পাবে, যাতে এই মানসিক বাধা কাটিয়ে উঠে, উপযুক্ত মুহূর্তে একীকরণের জন্যে প্রস্তুত হতে পারবে।"[১২] লণ্ডনের ইকোনমিষ্ট পত্রিকা মন্তব্য করে যে "জার্মাণ জনগণের কিছু দিনের জন্য অন্ততঃ শাস্তিমূলক ভাবে পরাধীনতা ভোগ করা উচিত এবং সেই অবস্থার প্রতিকূলতা যে যতোটা চায় বৃদ্ধি করতে পারে।"[১৩] এরই মধ্যে আমেরিকার নিউ রিপাব্লিক পত্রিকায় লেখা হয় যে, বৃটিশ ও মার্কিণ নীতি নিয়ামকদের উদ্দেশ্য হলো নাৎসী দল ও নাৎসী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা, কিন্তু জার্মাণীর শ্রেণী স্বার্থের বিন্যাসে কোন সামান্য পরিবর্তন আনা তাদের উদ্দেশ্য নয়।"[১৪]

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে গণতান্ত্রিকতার বিস্তারে আগ্রহী সোভিয়েত ইউনিয়ন যে নীতি গ্রহণ করে তার ভিত্তি ছিল জার্মাণীর জাতীয় স্বার্থ ও স্বাধীন সত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখার নীতি। ততোদিনে সোভিয়েতের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রভাব যা দাঁড়িয়ে ছিল তাতে জার্মাণীর ঐক্য ও রাষ্ট্রিক সত্তার প্রতিষ্ঠায় তার দৃঢ় মতামত কার্যকরী করা যায়। ক্রিমিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি তাই এই ধারণা থেকে গৃহীত হয় যে মিত্রপক্ষের জার্মাণী অধিকার হবে একটা সাময়িক ঘটনা মাত্র, কারণ জার্মাণীর ঐক্য বিঘ্নিত হয় তেমন কিছু করা উচিত হবে না। জার্মাণীর গণতন্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণের যে প্রস্তাব ইয়াল্টায়, ইউরোপে স্থায়ী শান্তির একমাত্র ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়, তার মৌল প্রেরণা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ক্রিমিয়া সম্মেলনে জার্মাণী দখল ও নিয়ন্ত্রণের রাজনৈতিক লক্ষ্য গুলিও গৃহীত হয়েছিল। বলা বাহুল্য এই সিদ্ধান্তের চরিত্র বিশ্লেষণে দেখা দেখা দেবে নানা মতের মধ্যে আপোষ রফা। কিন্তু তা হলেও সোভিয়েত প্রস্তাবের মৌল আদর্শের প্রতিফলন তার মধ্যে যথেষ্ট। এতে সেই সব সর্ত

আরোপ করা হয় যা জার্মাণীর পক্ষে নোতুন কোন আক্রমণাত্মক ভূমিকা সম্ভবপর করতে দেবে না। বরং জার্মাণীকে তার সমস্ত নীতি ও কার্যক্রম একটা শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। দখলীকরণের সময়ের মধ্যে জার্মাণীর ঐক্য বৃদ্ধি করার জন্যে এবং প্রতিটি, অঞ্চলে একই ধরণের নীতি কার্যকরী করার জন্যে, ক্রিমিয়া সম্মেলনে একটি কেন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণ কমিশন গঠনের কথা বলা হলো। দেশের সমস্ত অঞ্চলে সুসামঞ্জস শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্যে এই কমিশন, বার্লিনে সদর কার্যালয় স্থাপন করে কাজ করবে।

আর একথা নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকের মতো আক্রমণ করে ও সোভিয়েত ভূমির একাংশ দখল করে জার্মাণী যে ক্ষতি করেছে, তার জন্যে সে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরাজিত জার্মাণীকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের চক্রান্ত অনুযায়ী একটা অর্থনৈতিক দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করার পরিকল্পনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাধা দেয়। বরং জার্মাণীর দুর্দশায় দুঃখিত হয়ে, জার্মাণ জনগণের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্ষতিপূরণের হার স্থির করার চেষ্টা করে। সোভিয়েত সরকার প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও, জার্মাণীর ক্ষতিপূরণ বাবদ আংশিক দাবী করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

ইউরোপের জাতিগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত দেশগুলির উদ্দেশে একটি ঘোষণা পত্রের জন্যে দাবী করেন, যাতে মুক্তদেশগুলি তাদের নিজেদের পছন্দ মতো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করার স্বাধিকার পাবে এবং ফ্যাশিস্ত দাসত্ব মুক্ত হয়ে তারা ফ্যাশিবাদের বীজ যাতে সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে যায় তার জন্যে যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে পারবে বলা হয়। তা ছাড়া কোন ধরণের শাসন ব্যবস্থার অধীনে তারা বসবাস করবে তা স্থির করার ভার তারই স্বাধীন ভাবে গ্রহণ করবে এই স্বীকৃতিও দেওয়া হয়।[১৫] ইউরোপীয় দেশগুলি মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে যে সংগ্রাম সেদিন সুরু করেছিল, এই ঘোষণাপত্র তাদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করে।

পরবর্তী কালের ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘোষণাপত্রের এই বয়ানে সম্মতি জানিয়ে ছিল, তাই এর উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী কাজ করার ইচ্ছা তাদের আদৌ ছিল না। বরং

তাদের অনুসৃত নীতি এই ঘোষণাপত্র ও জাতির অধিকার প্রসঙ্গে প্রদত্ত অন্যান্য আরো অনেক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গতি হারায়। ইটালী, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড, লাক্সেমবার্গ ও গ্রীস প্রভৃতি যে সব দেশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন অধিকার করে, সেখানকার জনগণের জনগণতন্ত্রীশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার আকাঙ্খাকে তারা সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও পাশবিক শক্তির প্রয়োগে ব্যাহত করে দেয়। বলা যেতে পারে যে পশ্চিম ইউরোপের দেশ গুলিতে গণতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির সশস্ত্র হস্তক্ষেপের ফলেই ব্যাহত হয়ে যায়।

ইয়াল্টায় মার্কিণ ও বৃটিশ মুখপাত্ররা যে গ্রীসে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ নগ্ন ও নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার সমস্যা নিয়ে কোন আলোচনা করতে অস্বীকার করেন।

সম্মেলনে যে যুগোস্লোভিয়া সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়, তার সিদ্ধান্ত যুগোস্লাভ জনগণের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গৃহীত হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও পলাতক সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ যুগোস্লাভিয় অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে।

পোল্যাণ্ডের প্রশ্নটি বিবেচনা করতে অনেক সময় লেগে গেল। সম্মেলনে পোল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ ও পোলিশ সরকারের সংগঠন নিয়ে আলোচনা হয়।

একটি শক্তিশালী, স্বাধীন পোলিশ রাষ্ট্রের সমর্থক হিসাবে, সোভিয়েত সরকার বিশ্বাস করতেন যে তাকে গঠন করতে হলে ইউক্রেনীয়, বাইলোরুশিয় অথবা লিথুয়ানিয়ার ভূখণ্ড তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার কোন দরকার নেই। পোল্যাণ্ডকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার সীমান্তের পশ্চিমে সেই অঞ্চলে যা চিরকাল তার ছিল কিন্তু অন্যে জবরদখল করে নিয়েছে।

বৃটিশ ও মার্কিণ মুখপাত্ররা পোলিশ জমিদার শ্রেণীর দাবী অনুযায়ী ইউক্রেনীয় ও বাইলোরুশীয় ভূখণ্ডের উপরেই দাবী করতে থাকলেন। রুজভেল্ট তো পোল্যাণ্ডকে লোভোভ্ ও সন্নিহিত অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে প্রায় জিদ ধরলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইয়াল্টা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো যে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সোভিয়েত পোলিশ সীমান্ত তথা কথিত কার্জন লাইন বরাবর যাবে এবং কোথাও কোথাও প্রয়োজন মতো পোল্যাণ্ডের

অনুকূলে এই সীমারেখায় পাঁচ থেকে আট কিলোমিটায় পর্যন্ত বিচ্যুতি ঘটতে পারে। পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তের প্রশ্নটি অনেক বাক্ বিতণ্ডার পরেও অমীমাংসিত রয়ে গেল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন স্পষ্ট ভাবেই বললো যে তারা পোল্যাণ্ডকে পশ্চিম দিকে তার চিরকালীন ভূখণ্ডের উপর অধিকার ফিরিয়ে দিতে চায় না। কারণ সে অঞ্চলের কোন উন্নতি পোল্যাণ্ড করতে পারবে না অথচ তা প্রত্যার্পিত হলে জার্মাণী অর্থ নৈতিক দিক থেকে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ক্রিমিয়া সম্মেলন শুধু এ প্রসঙ্গে এটুকু স্বীকৃতি জানিয়েই ক্ষান্ত হলো যে, "উত্তর ও পশ্চিমে পোল্যাণ্ডের সীমানা যথেষ্ট পরিমাণে ভূখণ্ড সংযোগে বেড়ে যাবে।" তবে সেই সীমানার প্রকৃত নির্দ্ধারণ পরবর্তী কোন সময়ে করা হবে।

পোলিশ সরকারের গঠন নিয়ে একটা তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রাম হয়ে গেল সম্মেলনে। প্রথমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন পোলিশ জাতীয় সরকারের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার চেষ্টা করলো। তাদের মতে লণ্ডনে পলাতক পোলিশ সরকারই হলো পোলিশ জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি কিন্তু গণতান্ত্রিক পথে আত্মোন্নতি কামী পোলিশ জনগণের স্বার্থে, সোভিয়েতের দৃঢ়, অনমনীয় মনোভাব দেখে শেষ পর্যন্ত তাদের পিছু হঠতে হলো। তখন উত্থাপিত হলো যৌথ সরকার গঠনের প্রস্তাব। সোভিয়েত সরকার এই প্রস্তাবকে সন্তোষজনক আপোষরক্ষা মনে করে সম্মতি জানালেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিলেন যে লণ্ডনের পলাতক শাসকচক্রকে তাঁরা যৌথ সরকারের একটি পক্ষ হিসাবে মানতে রাজী নন।

ফলে মার্কিণ ও বৃটিশ মুখপাত্রদের স্তানিশ্‌ল মিকোলাইসিজিকের নেতৃত্বে একটি প্রতিক্রিয়াচক্রকে পোল্যাণ্ডে ক্ষমতাসীন করার আন্তরিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। পলাতক পোলিশ সরকারের চরম ব্যর্থতা তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। ক্রিমিয়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তে এদের কথা কোথাও উল্লেখ করা হলো না। পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী জনগণতন্ত্রী সরকারকে ভবিষ্যৎ পোলিশ সরকারের ভিত্তি বলে স্বীকার নেওয়ার সময় কেবল এইটুকু যোগ করে দেওয়া হলো যে, দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে যে সমস্ত পোলিশ নাগরিক আছে তাদের "গণতান্ত্রিক" নেতাদের নিয়ে, এই সরকারের বনিয়াদ সম্প্রসারণ করা

হবে। এই নোতুন সরকারের পরিচিতি হবে জাতীয় ঐক্যের জন্য পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এই সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সম্মত হলো।

মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকচক্র "গণতান্ত্রিক" নেতা বলতে পোল্যাণ্ডের ফ্যাশি পন্থী নেতাদের কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাঁরা পোল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে শ্রেণী স্বার্থের সম্পর্ক ও দেশের বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন, এই ধারণা নিয়ে যে কালক্রমে প্রতিক্রিয়াশীলেরাই শাসন ক্ষমতার সবটুকু হস্তগত করতে পারবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্বাস নিবদ্ধ ছিল পোল্যাণ্ডের গণতান্ত্রিক শক্তির উপর এবং তার এই স্থির ধারণা ছিল যে সরকারের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিণ অনুচরদের অনুপ্রবেশ ঘটলেও, শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক শক্তির জয়ই অনিবার্য। পরবর্তী কালের ঘটনা প্রমাণ করেছে যে পোল্যণ্ডে শ্রেণী স্বার্থের ভারসাম্য ও পারস্পারিক সম্পর্ক এবং পোলিশ গণতান্ত্রিকতার শক্তি সম্পর্কে সোভিয়েতের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল সর্বাংশে নির্ভুল।

কিন্তু জাতীয় ঐক্যের জন্য পোলিশ অস্থায়ী সরকার সম্বন্ধে ইয়ালটায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটা যতো সহজে হয়েছিল, সেটা কার্যকরী করা ততো সহজ হলো না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন এই গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করে দিতে। তাঁরা ক্রিমিয়া পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে, পোল্যাণ্ডের অস্থায়ী সরকার পুনর্গঠন করার চেষ্টা না করে, তাকে ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁদের সমস্ত প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল একটা প্রতিক্রিয়া চক্রকে সেখানে ক্ষমতাসীন করা।

ত্রিশক্তির যৌথ সিদ্ধান্তগুলি যথাযথ কার্যকরী করার জন্যে সোভিয়েত সরকার যথাসাধ্য করতে লাগলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পোল্যাণ্ডের জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করে, পোলিশ জনগণের গণতান্ত্রিক সাফল্যকে প্রসারিত করা। সোভিয়েতের এই দৃঢ় মনোভাব শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হলো। পোল্যাণ্ড সম্পর্কে ইয়ালটায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হলো।

সম্মেলনে সমস্ত মানুষের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্যে একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের বিষয়ে আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হয়। এই প্রসঙ্গ প্রথমে উনিশ শ' তেতাল্লিশের শরৎকালে, ত্রিশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের

মস্কো বৈঠক উত্থাপিত হয়েছিল। পরে উনিশ শ' চুয়াল্লিশের আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে ডামবার্টন ওক্‌স সম্মেলনেও তা আবার আলোচিত হয়।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকমহল এমন একটা যুদ্ধোত্তর 'কালীন সংস্থার কথা চিন্তা করছিলেন, যাতে নেতৃত্বভার সরাসরি তাঁদের হাতে চলে আসে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে তাঁরা একটা "আন্তর্জাতিক পুলিশ-বাহিনী" গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। চার্চিলের সঙ্গে উনিশ শে' একচল্লিশের আগষ্ট মাসের বৈঠকে, রুজভেল্‌ট বলেছিলেন যে, "এখন কিছুকাল কেটে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি লীগ অব্‌ নেশন্‌সের সাধারণ সভার মতো কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে সম্মত নন। এই সময়ের মধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনকে নিয়ে গঠিত একটা আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী কিভাবে কাজ করার সুযোগ পায়, সেটাই আগে লক্ষ্য করতে হবে।"[১৩] অন্যদিকে বৃটিশ সরকার চাইছিলেন লীগ অব্‌ নেশন্‌সের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিতে বৃটিশ প্রস্তাব ফলাও করে প্রচারও করা হয়েছিল।

সোভিয়েতের এ বিষয়ে প্রস্তাব ছিল এই যে এমন একটা নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে, যা লীগ অব নেশন্‌সের মতো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বাহন না হয়ে, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী হবে। ডামবার্টন ওক্‌সের আলাপ আলোচনায় সদস্যদের মত এই নতুন প্রতিষ্ঠানের দিকেই ঝুঁকে ছিল। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরে ডামবার্টন ওক্‌সে আলোচনা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নি। পরবর্তী সম্মেলনের জন্যে সেখানে আলোচনার সুবিধার্থে প্রস্তাবিত সংগঠনের একটি খসড়া সনদ রচনা করা হয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত, সাম্রাজ্যবাদীদের প্রথম দিকের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই প্রস্তাব গৃহীত করেছিল যে খসড়া সনদ প্রতিটি সদস্য দেশের সার্বভৌমত্ব ও পারস্পরিক সমতার নীতি স্বীকার করে নেবে এবং এটাও একটা নীতি বলে মানবে যে এই সংস্থা সদস্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। খসড়া সনদে, প্রতিষ্ঠানের সেই মৌল লক্ষ্যের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হলো যে তার প্রধান কাজ হবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। এই প্রধান কর্তব্য পালনের দায়িত্ব থাকবে নিরাপত্ত পরিষদের উপরে, যাতে থাকবেন পাঁচজন স্থায়ী সদস্য—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, চীন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও

ফ্রান্স—এবং সংস্থার অন্য সদস্যদের মধ্য থেকে দু' বছরের জন্যে নির্বাচিত আর ছয় জন অস্থায়ী সদস্যের উপরে।

নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ জন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে মতৈক্যের নীতির প্রবক্তা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কারণ এর ফলে পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষ যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমেই নিরাপত্তা পরিষদ তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব আরো সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন বৃহৎ পঞ্চশক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতৈক্যের নীতির বিরুদ্ধে কোনই গ্রহণযোগ্য যুক্তি উপস্থিত করতে পারেনি। বরং বলা যায় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টতই এই নীতিতে আগ্রহী ছিল। জাতিসংঘের বিষয়ে মার্কিণ সংস্থা, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে বলেছিল যে, জাতিসংঘের সনদ সিনেটের অনুমোদন লাভ করতে গেলে এই মতৈক্যের নীতির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ছিল।[১৭] বৃটিশ সরকারও আনুষ্ঠানিক ভাবে মতৈক্য নীতিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।[১৮] কিন্তু চেষ্টা চলতে লাগলো, একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই নীতিকে সীমিত করে রাখতে। তা হচ্ছে নিরাপত্তা পরিষদের কোন স্থায়ী সদস্যের কোন সমস্যা আলোচনা কালে এই নীতি প্রয়োগ করা যাবে না। এই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংরক্ষণ নিয়ম যদি গৃহীত হতো, তাহলে সাম্রাজ্যবাদীরা যে কোন সমস্যার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম যুক্ত করে, তাকে বিচার্য সমস্যার একটি পক্ষ হিসাবে খাড়া করে, নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে কোন সমাধানের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারতো। প্রসঙ্গতঃ নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার সংবাদ দাতা, জেমস্ বি, রেষ্টন লিখেছিলেন যে, "যদিও জার্মাণী ও জাপানের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্যে লীগ কোনদিনই তার সদস্যদের মধ্যে মতৈক্য স্থাপন করতে পারেনি, কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধের সময়ে তারা সোভিয়েত রাশিয়াকে লীগ থেকে বহিষ্কার করার সময়ে, অতি সহজেই প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়ে গেল।"[১৯] সম্মেলনে নিরাপত্তা পরিষদে ভোটদানের প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা গেল না বলে, আপাততঃ বিষয়টি স্থগিত রাখা হলো।

তারপর উঠলো প্রস্তাবিত সংস্থার সাধারণ পরিষদে ভোট সংখ্যার সমস্যা। মার্কিণ মুখপাত্র দাবী করলেন যে, যেহেতু আন্তর্জাতিক বিষয়ে তাঁর দেশের সবিশেষ গুরুত্ব আছে, সুতরাং এখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ভোট থাকা

উচিত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে প্রতিটি জাতিসংঘ সদস্য সাধারণ পরিষদে একটি মাত্র ভোটদানের অধিকারী হবে।

মতবিরোধ দেখা গেলেও যে ডামবার্টন ওক্‌স সম্মেলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তখন একথা প্রকট হয়ে ওঠে যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথে ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রী শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আরো বলা যায় যে, এখানেই প্রস্তাবিত বিশ্ব-সংস্থার বিষয়টি নিয়ে হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমস্ত আলোচনা হয়। যার ফলে পারস্পরিক সহযোগিতা ও মতৈক্যের মধ্য দিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লীগ অব্‌ নেশন্‌সের দুর্ভাগ্যের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে, বৃটিশ সংবাদ পত্রগুলি সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্যে বলে। লণ্ডনের টাইম্‌স পত্রিকা বলে যে লীগ অব্‌ নেশন্‌সের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে নিলে ভালো হয়। এই উদ্দেশে লীগের কার্যনির্বাহক সমিতির বৃটিশ সভাপতি, লর্ড লিট্‌নের একটি চিঠিও টাইম্‌সে প্রকাশিত হয়। চিঠিতে লিট্‌ন বলেন যে প্রস্তাবিত সংস্থা নতুন করে তৈরীকরার কোন দরকার নেই, করা উচিতও নয়। লীগের নাম ও সংবিধানের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে নিয়ে, লীগ সদস্যদের কাছ থেকে তার সংবিধান (Covenant) সংশোধন করার অনুমতি চেয়ে নিয়ে তাকে বর্তমানকালের উপযোগী করে নিলেই চলবে। তিনি লেখেন যে প্রস্তাবিত সংস্থার বাস্তব ভিত্তির প্রয়োজনের নিরিখে, লীগ অব নেশন্‌সকে পুনর্গঠিত করে নেওয়া উচিত। কিন্তু লীগের বিলুপ্তি তখন সমাসন্ন।

ক্রিমিয়া সম্মেলনে লীগের কথা আদৌ উত্থাপন করা হয়নি। নিরাপত্তা পরিষদের ভোটদান প্রসঙ্গে যে মতানৈক্য ডামবার্টন ওক্‌স্‌ থেকে এতোদিন পর্যন্ত বজায় ছিল, যেখানে মার্কিণ ও বৃটিশ প্রতিনিধিরা মতৈক্যের নীতি মেনে নিয়েও নানা কায়দায় নানা বিধি নিষেধ আরোপ করে তাকে সীমিত রাখতে চেয়েছিলেন, তা এখানে একটি বিকল্প প্রস্তাবের সাহায্যে বহুল পরিমাণে কমিয়ে মোটামুটি সকলের পক্ষে গ্রহণ যোগ্য করে তোলা হলো। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট। রুজভেল্টের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় এই মৌল সত্য আরেকবার প্রমাণিত হলো যে, সদিচ্ছা থাকলে মানুষ যে রকম পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করতে পারে, দেশগুলিও তার ব্যতিক্রম নয়।

নিরাপত্তা পরিষদের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্তের ভিত্তি হবে, বৃহৎ স্থায়ী পঞ্চ শক্তির মতৈক্যের নীতি। অর্থাৎ এই ধরনের কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে পাঁচজন স্থায়ী সদস্যকে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে হবে। কিন্তু সাধারণ নিয়ম কানুন সংক্রান্ত বিষয়ে মোট এগারো জন সদস্যের যে কোন সাতজনের সমর্থনে যে কোন প্রস্তাব গৃহীত হবে। শান্তিপূর্ণ মীমাংসার পথ অনুসন্ধানের সময়, কোন বিরোধের বিচার বিবেচনায় যে রাষ্ট্র এই বিরোধ জড়িত থাকবে, সে যদি নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যও হয়, তাহলে নিরাপত্তা পরিসদে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সে বিচার্য বিষয়ের উপর ভোটদান ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে না।

ক্রিমিয়াতে এটাও স্থির হলো যে উদ্দিষ্ট সংস্থার সনদের রচনা সম্পূর্ণ করার জন্যে, পঁচিশে এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে স্যানফ্রানসিস্‌কোতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হবে। আয়তনের বিরাটত্ব জনসংখ্যার প্রাচুর্য, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রচেষ্টায় তাদের ভূমিকার গুরুত্বের কথা ভেবে, ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজ তন্ত্রী সাধারণতন্ত্র ও বাইলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রকে প্রস্তাবিত সংস্থা গঠনের আলোচনায়, স্যানফ্রান্‌সিস্‌কোতে পূর্ণ সদস্য যোগ দেওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলো।

ইয়াল্টার অপ্রকাশিত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদানের প্রতিশ্রুতি। সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্য কারণের জন্যেই এই সিদ্ধান্ত তখন গোপন রেখে, এক বছর পরে এগারোই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' ছেচল্লিশে প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়েছিল যে জার্মাণীর পরাজয় ও ইউরোপে যুদ্ধ শেষের দু'থেকে তিন মাসের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করবে যদি কয়েকটি সর্ত মেনে নেওয়া হয়। যথা, মঙ্গোলীয় জনগণের সাধারণতন্ত্রের বর্তমান অবস্থা বজায় রাখতে হবে, দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দীপপুঞ্জে সোভিয়েতের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে দিতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইজারা স্বত্বে পোর্ট আর্থার ব্যবহার করবে, দারিয়েনে সোভিয়েত স্বার্থ প্রাধান্য পাবে এবং চৈনিক পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ, চীনের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা করবে সোভিয়েত ইউনিয়ন।

ইয়াল্টায় দূর প্রাচ্যের সমস্যার বিষয়ে যে চুক্তি হয়, তাতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যে এককভাবে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের শক্তিকে চূর্ণ করতে পারবে না, সে বিষয়ে তারা অত্যন্ত সচেতন ছিল। প্রাচ্য দেশীয় জনগণের স্বার্থেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্তে, সোভিয়েত ইউনিয়ন দূর প্রাচ্যের এই আক্রমণকারীকে বিধ্বস্ত করার জন্তে সাহায্য করতে অগ্রসর হয়।

যতোদিন পর্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগদানের বিষয়ে আগ্রহী ছিল, ততোদিন এই চুক্তি লণ্ডন ও ওয়াশিংটন উভয়েই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছে। সামনার ওয়েলস্ বলেছেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নকে যদি তার সাইবেরিয় প্রদেশগুলির নিরাপত্তা বিধান করার চেষ্টা করতে হয়, তাহলে রাশিয়াকে দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ফিরে পেতেই হবে।"[২০] কিন্তু যে মুহূর্তে জাপান পরাজিত হলো, সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিক্রিয়া চক্র হৈচৈ সুরু করে দিল যে ইয়াল্টার দূর প্রাচ্য সম্পর্কিত চুক্তি অচল।

যুদ্ধ ও শান্তি উভয় সময়েই জাতিতে জাতিতে ঐক্য হলো সাফল্যের চাবিকাঠি, সেই সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে ক্রিমিয়া সম্মেলন শেষ হলো। এতে যুদ্ধকালীন সময়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেনের মৈত্রীকে, ইয়াল্টায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যথার্থ প্রকাশ বলে অভিনন্দন জানিয়ে এই আশা প্রকাশ করা হয় যে, শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগামী দিনে আদর্শ ও কাজের মধ্যে সেই পবিত্র ঐক্য বজায় রাখার আন্তরিক প্রচেষ্টা এদের সরকাররা করবেন।

আশু যুদ্ধের অবসান ও যুদ্ধোত্তর কালে গণতান্ত্রিকতার সম্প্রসারণের জন্তে স্বাধীনতা প্রিয় দেশগুলি যে নিরন্তর সংগ্রাম করেছিল, তার ইতিহাসে এই সম্মেলন ও তার সিদ্ধান্তগুলি ভাস্বর হয়ে রইলো। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্তে, সোভিয়েতের প্রস্তাবের ভিত্তিতে একটা কার্যক্রমও এখানে গৃহীত হলো।

ফ্যাশি বিরোধী মোর্চার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অন্তর্বিরোধ তীব্রতর হওয়ার যে প্রত্যাশা ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর ছিল, ক্রিমিয়া সম্মেলন তাকে ধূলিসাৎ করে দিল। বরং সোভিয়েত মার্কিণ বৃটিশ ঐক্য যে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে সমস্ত বাধা, প্রতিকূলতা কাটিয়ে জয়যুক্ত হবে বলে সোভিয়েতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,

তারই স্বীকৃতি পাওয়া গেল ইয়াল্টায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষ, জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর যে স্থায়ী গণতান্ত্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা করতো, এই সম্মেলনকে সেই পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মনে করা যায়।

কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক মহলে ইয়াল্টার সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে ধারণা ছিল ভিন্নরূপ। পরবর্তীকালে চার্চিলের এক স্বীকারোক্তিতে দেখা যায় তিনি বলেছেন যে সোভিয়েতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার প্রধান কারণ ছিল এই যে বৃটেনের জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সোভিয়েত সাহায্যের প্রয়োজন আছে। তিনি লিখেছেন: "আমরা যদি রাশিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করে যেতাম, আর জার্মাণীরা আমাদের বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে দু' শ' কি তিন শ' ডিভিসন সৈন্য সমাবেশ করতো, তাহলে কি হতো?"[২১] জাতীয় স্বার্থে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হলেও, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের মনে নানারকমের ফন্দী ছিল।

তাঁরা ভেবেছিলেন যে ইউরোপে জার্মাণী ও দূরপ্রাচ্যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ আরো কিছুকাল ধরে চলবে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়বে। তাহলে ইয়াল্টা সিদ্ধান্তগুলি ভঙ্গ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন ইউরোপ ও এশিয়া পদানত করতে পারবে। সেই কথাই চার্চিল সবিস্তারে তাঁর সুবিখ্যাত ফুলটন্ বক্তৃতায়, মিসৌরীতে বলেছিলেন।

"ইয়াল্টায় যে চুক্তি করা হয়েছিল," তিনি বলেন, "যাতে আমি একজন স্বাক্ষরকারী ছিলাম, তা উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের সমগ্র গ্রীষ্ম ও শরৎ কাল ধরে এবং জার্মাণ যুদ্ধের পরেও যে দেড় বছর জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ চলবে বলে মনে করা হয়েছিল, সেই সমগ্র সময়ের জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ছিল।"[২২]

ইয়াল্টা সম্মেলনে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়নই নিষ্ঠার সঙ্গে, কোন ত্রুটীবিচ্যুতি না ঘটিয়ে, তার সমস্ত সিদ্ধান্ত গুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এসেছে। যুদ্ধশেষে, ইয়াল্টা সিদ্ধান্তগুলির পূর্ণ ও যথাযথ রূপায়ণ তাই সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম প্রধান আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

ক্রিমিয়া সম্মেলনের অল্পকাল পরেই, তার সিদ্ধান্ত অমান্য করে, বৃটিশ সামরিক নেতৃত্ব চার্চিলের নির্দেশে, সোভিয়েত সৈন্য বার্লিনে প্রবেশ করার

পূর্বেই, পূর্ব জার্মানী দিয়ে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে দ্রুত শহরে ঢুকে পড়ার জন্যে একটি ভ্রাম্যমান বিশেষ বাহিনী গঠন করলেন। চার্চিল তাঁর দলবলকে বলতেন যে "ভালুক আসার আগেই", এলবে এমন কি পারলে বার্লিনে পৌঁছানো বিশেষ দরকার।[২৩] বৃটিশ সরকার শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও, তাঁর বার্লিন দখলের পরিকল্পনা সর্ব প্রযত্নে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে ছিলেন। মার্কিণ সরকার ও তাঁদের পরিকল্পনা মতো, আইসেনহাওয়ার ও ব্রাড্‌লীকে আদেশ পাঠালেন যে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে ভ্রাম্যমাণ বাহিনী নিয়ে বার্লিন ও ড্রেসডেনে প্রবেশ করতে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সংঘাতের এটা হলো অরেকটা প্রমাণ।

॥ তিন ॥

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের গোড়ায় মার্কিণ সরকার এক আন্তঃ আমেরিকা সম্মেলন আহ্বান করলেন মেক্সিকো শহরে। (একুশে ফেব্রুয়ারী থেকে আটই মার্চ পর্যন্ত এর অধিবেশন চলে।)

মেক্সিকো শহরের সম্মেলন যুদ্ধঅপরাধীদের সম্পর্কে মস্কো পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সম্পর্কে ইয়াল্টা সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদন করে। এরই সঙ্গে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়ে, সম্মেলনে স্যান ফ্রানসিস্‌কোতে দুই আমেরিকার দেশগুলির যৌথ ভাবে কাজ করার জন্যে প্রস্তাব গৃহীত হয়। জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যাতে সেই প্রস্তাবিত সংস্থা সমস্ত সময়ে একটা যান্ত্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পায়, তার জন্যে এই প্রথম ব্যবস্থা করে রাখা হলো।

মার্কিণ চাপে পড়ে একটা চুক্তির খসড়া প্রণয়ন ও যথারীতি স্বাক্ষরিত হয়ে গেল এই সময়ে। তার নাম শ্যাপুলটেপেক চুক্তি (Chapultepec pact)। যুদ্ধ শেষে এবং যুদ্ধোত্তর কালে যে সমস্ত আক্রমণাত্মক সামরিক চুক্তি মার্কিণ নেতৃত্বে স্বাক্ষরিত হয়েছে এটি তার অন্যতম। "আত্মরক্ষার" মুখোসের আড়ালে, এই চুক্তিতে যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালের জন্যে

একটা যৌথ আন্তঃ আমেরিকা সমরনায়ক পরিষদ গঠনের কথা বলা হলো। সমস্ত স্বাক্ষরকারীরা যুদ্ধের প্রয়োজনে রণনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন দ্রব্য ও কাঁচামাল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠাতে এবং যে কোন যুদ্ধে আমেরিকা মহাদেশের সমস্ত দেশগুলি যৌথ চালনায় সবকিছু করতে স্বীকৃত হলো। এর ফলে লাতিন আমেরিকায় মার্কিণ আধিপত্য পাকাপাকি হয়ে গেল।

মার্কিণ একচেটিয়া পতিরা বরাবরই লাতিন আমেরিকার প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পদের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে আসছিল। তাদেরই স্বার্থে রচিত ক্লেটন (clayton) পরিকল্পনা শ্যাপুলটেপেক চুক্তির মাধ্যমে রূপায়িত করা হয়েছিল। দু'বছর পরে মেক্সিকোর জাতীয় বুর্জোয়ারা, এপ্রিল উনিশ শ' সাতচল্লিশে মেক্সিকো শহরে অনুষ্ঠিত, রুপায়িত শিল্প সংস্থাগুলির প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত এক বিবরণীতে নিম্নোক্ত মন্তব্য করে :

"ক্লেটন পরিকল্পনা, বিশ্বে অধিপত্য বিস্তার, প্রতিযোগিতা ও স্বাধীনতা বিনাশের পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা হলো প্রধান দেশের ভূমিকা, অন্য সব দেশকে একেবারে অনুগত, তাঁবেদার দেশের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। এই নয়া উদারনীতিবাদের একমাত্র ধ্বজাধারী হলো, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র।"[২৪]

মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তার করার জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তার ঋণ সাহায্য চুক্তির প্রক্রিয়ার এখানে সম্প্রসারিত করেছিল অনেক দেশের ক্ষেত্রে যেমন—ইরাক পয়লা মে উনিশ শ', একচল্লিশ ; ইরান, এগারোই মে উনিশ শ', একচল্লিশ ; তুরস্ক সাতাই নভেম্বর, উনিশ শ' একচল্লিশ ; মিশর এগারোই নভেম্বর উনিশ শ' একচল্লিশ ; সৌদি আরব, সাতই ডিসেম্বর উনিশ শ' বিয়াল্লিশ ও ইথিওপিয়া আঠারোই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' তেতাল্লিশ।[২৫] ঋণ সাহায্য কার্যক্রমে সবচেয়ে লাভবান হয় তুরস্ক। ক্রিমিয়া সম্মেলনের অল্পদিন পরে, বিজয়ী দেশের একটি হয়ে ম্যানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে যোগদানের আগ্রহাতিশয্যে, তুরস্ক যে জার্মাণীকে এতোকাল সাহায্য করে আসছিল, তারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। তুরস্কের শাসকদের আরো প্রত্যাশা ছিল যে মার্কিণ ও বৃটিশ সমর্থনে তাঁরা দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে বেশ বড়ো রকমের কোন ভূখণ্ড দখল করতে পারবেন। কিন্তু এগুলি আকাশ কুসুম ছাড়া আর কিছু ছিল না।

॥ চার ॥

ইয়াল্টায় যখন বৃহৎ শক্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, প্রায় সেই সময়েই লণ্ডনে ছয়ই থেকে সতেরোই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটা বিরাট প্রতিনিধি মূলক সম্মেলন ছিল এটা, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত বিভিন্ন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি যোগ দিয়েছিল। পঞ্চাশটি দেশের ছয় কোটি সদস্যের দু'শ' চার জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। আমেরিকান ফেডারেশন অব্ লেবার এই সম্মেলনে যোগ দিতে অসম্মত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি উইলিয়াম গ্রীন, যাঁর সঙ্গে একচেটিয়া কারবারীদের যোগাযোগ খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল, আমষ্টার্ডামের ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টার ন্যাশনেলের পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব করেন। অথচ এই প্রতিষ্ঠানে সুসংবদ্ধ শ্রমিকদের অল্পসংখ্যকই যোগ দিতে পেরেছিল, কারণ সোভিয়েত, লাতিন আমেরিকা ও বিভিন্ন উপনিবেশ এবং পরাধীন দেশের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি এর সদস্যপদ অর্জন করতে পারেনি। গ্রীন আরো বলেন যে ট্রেড ইউনিয়নগুলির কমিউনিষ্টবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের শরিক হওয়া উচিত, যে দাবী আসলে ছিল শ্রমিক সাধারণের প্রকৃত স্বার্থের পরিপন্থী।

লণ্ডনে এই কংগ্রেসের অধিবেশনেও, অন্যান্য মার্কিণ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার মুখপাত্র, শিল্প প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সদস্যরা আলোচনায় নানা ধরণের বাধা দিতে থাকেন। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ওয়াল্টার সাইট্রিন (Citrine) সম্মেলনে একটি সংগঠনী কমিটি স্থাপনের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এমন কি বিষয়সূচীর আলোচনাতে তাঁর আপত্তি ছিল। রুমেনিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া এবং পোল্যাণ্ডের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলির এই সম্মেলনে যোগদান করতে বলার সিদ্ধান্তেও তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। তিনি বলেন যে এই সম্মেলন একটা পরস্পর মত বিনিময় ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না এবং প্রস্তাব করেন যে আমষ্টার্ডামের ট্রেড ইউনিয়ন ইন্টার ন্যাশনালের সঙ্গে একে যুক্ত করা উচিত।

আলোচনা যতোই চলতে থাকে, ততোই দেখা গেল যে বৃটিশ প্রতিনিধিরা তাঁদের মূল দাবী থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনের কাজ সাফল্যের সঙ্গেই শেষ করা হয়। অধিকাংশ ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থা বিশেষ করে

সোভিয়েত ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে সম্মেলনে শান্তি ও গণতন্ত্রের সংগ্রামে পৃথিবীর শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংগ্রামী ঐক্যের দৃঢ় বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ইয়াল্টা সিদ্ধান্তগুলিকে অভিনন্দিত করে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া সম্মেলনের পক্ষ থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকারের কাছে আবেদন করা হয় যাতে স্যানফ্রানসিস্কোর আলোচনা সভায় বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রতিনিধিরা যোগ দিতে পারেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে সুসংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর শক্তিশালী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের গোড়াপত্তন করার মধ্য দিয়েই সম্মেলন তার ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন ভূমিকার দায়িত্ব পালন করে।

॥ পাঁচ ॥

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের বসন্তকালে চেকোশ্লোভাকিয়ার ভাগ্যে একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটলো। মধ্য ও দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলির মতোই এটা ছিল সোভিয়েতের বিরাট বিজয় সাফল্য ও জনগণের বৈপ্লবিক উদ্যোগের ফলশ্রুতি। জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের দখলদারী শাসনের সময়েই চেকোশ্লোভাকিয়ার শ্রমজীবি মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গুণগত পরিবর্তন ঘটে যায়। তারা উপলব্ধি করে পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণী কেবল মেহনতী মানুষকে শোষণ করে না, তারা দেশের চরম দুর্দিনে জনগণকে নাৎসী বর্বরতার শিকার হিসাবে ফেলে রেখে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাও করতে পারে। কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের মুক্তি সংগ্রাম কেবল জার্মাণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধেই যায়নি, তাদের সহযোগী চেক্ বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিও তা সমভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। সোভিয়েত সেনাদল ও পার্টিজানদের সংগ্রামে শত্রুমুক্ত গ্রাম ও শহরগুলিতে যে জাতীয় কমিটি গড়ে ওঠে, তাদের প্রচেষ্টায় সংগঠিত হলো একটা নোতুন বৈপ্লবিক শক্তি।

জনগণের ইচ্ছাকে মূর্ত করার প্রয়াসে, চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিষ্ট পার্টি জনগণতন্ত্রের কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। সেই কর্মসূচীতে একটা প্রতিনিধিমূলক ফ্যাশি বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গঠনের প্রস্তাব করে, বেনেসকে এতে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বেনেস কমিউনিষ্টদের প্রস্তাবে আপত্তি করেন।

অবিশ্যি তাঁর "পশ্চিমী" দৃষ্টিভঙ্গি, বৃটেন ও মার্কিণ দেশের প্রতি সহজাত আকর্ষণ ও চেকোশ্লোভাকিয়ার বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থের যথার্থ প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর আর কোন পথ ছিল না। কিন্তু একথা তিনি বিলক্ষণ বুঝতে পারলেন যে এই কর্মসূচী গ্রহণ না করলে, জনগণ তাঁকে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বভার দেবে না। তাই তিনি যেন কর্মসূচীতে সম্মত আছেন এমন ভাণ করলেন। সমস্ত পলাতক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে, তিনি ফিরে এলেন মুক্ত চেকোশ্লাভাকিয়ায়। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে দেশে ফিরে পুনরায় নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করে তিনি ধীরে ধীরে জমিদার ও পুঁজিপাতি শ্রেণীর হারানো ক্ষমতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তারপর যথারীতি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলবেন।

কোসিচে'তে এই কর্মসূচী স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, পাঁচই এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে তা প্রকাশ করা হলো। এতে জাতীয়-মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যমণ্ডিত অবসানের পথ নির্দেশ করে, জনগণতন্ত্রের মৌল নীতিগুলি উল্লিখিত হয়েছিল।

বৈদেশিক নীতির বিষয়ে বলা হয় যে চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা, সোভিয়েত-চেক মৈত্রী ও বন্ধুত্বের উপর নির্ভরশীল বলে এই সম্পর্ককে উত্তরোত্তর উন্নত করতে হবে। যেহেতু ছাব্বিশে নভেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ট্রান্সকার্পেথিয়ান ইউক্রেনের গণকমিটির প্রথম কংগ্রেস, সোভিয়েত ইউক্রেনের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার বহুদিনের গণআকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে, কোসিচে কর্মসূচীতে তাই বলা হয় যে, এই বিষয়ে "যে কোন সিদ্ধান্ত সোভিয়েত ইউক্রেনের কার্পেথিয়ান অংশের জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই গ্রহণ করা হবে এমন ভাবে যেন তা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।"[২৬]

সোভিয়েতের সাহায্যে শত্রুমুক্ত, যুগোশ্লাভিয়ার জনগণের প্রতি সোভিয়েতের বন্ধুত্বপূর্ণ ধারণা রূপায়িত হলো সোভিয়েত যুগোশ্লাভিয়া বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সাহায্যদান ও যুদ্ধোত্তরকালে সহযোগিতা সম্পর্কিত চুক্তিতে। এটি এগারোই এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে স্বাক্ষরিত হয়। চূড়ান্ত জয়লাভ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দুই স্বাক্ষরকারী দেশ যৌথভাবে যুদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে প্রতিশ্রুত হলো। তা ছাড়া পরবর্তীকালে এদের মধ্যে কোন একটি দেশ যদি জার্মাণী অথবা জার্মাণ আক্রমণের সহযোগী কোন দেশের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে অপর

স্বাক্ষরকারী আক্রান্ত দেশকে যথাসাধ্য সাহায্য দান করতে স্বীকৃত হলো। চুক্তিতে দুই দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ব্যাপক ভিত্তিতে স্থাপন করার কথা বলা হলো। বলা বাহুল্য চুক্তির সর্তাবলী উভয় দেশেই অভিনন্দিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সাহায্যদান ও যুদ্ধোত্তরকালীন সহযোগিতার চুক্তি, একুশে এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে মস্কোয় স্বাক্ষরিত হয়। এতে হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে চুড়ান্ত জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত যৌথ যুদ্ধ প্রচেষ্টা এবং যুদ্ধশেষে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার কথা বলা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ড, জার্মাণী অথবা তার কোন সহযোগী দেশের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে যৌথভাবে কাজ করতে প্রতিশ্রুত হলো। এদের মধ্যে যে কোন একটি দেশ জার্মাণী অথবা তার কোন মিত্রপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে, অপর স্বাক্ষরকারী আক্রান্ত দেশকে সামরিক ও অন্যান্য সমস্ত রকমের সাহায্যদান করবে। চুক্তিতে দুই দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক যোগাযোগ স্থাপনের কথা বলা হয়। কুড়ি বছরের জন্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

সোভিয়েত-পোলিশ চুক্তি, সোভিয়েত-পোলিশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা করলো। রুশ ও পোলিশ জনগণের ইতিহাস অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করে যে, যতোদিন রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, বিদ্বেষ ও শত্রু মনোভাব পোষণ করেছে, ততোদিন তাদের শত্রুরা সেই অবস্থাকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদ এই পারস্পরিক সম্পর্কের তিক্ততা, শত্রুতাকে কাজে লাগিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি পোল্যাণ্ডের শাসকদের শত্রুতার নীতিই, উনিশ শ' উনচল্লিশের সেপ্টেম্বরে সমূহ বিপদ ও বিপর্যয় ডেকে এনেছিল পোল্যাণ্ডের জীবনে। সোভিয়েত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে মৈত্রীর অভাবই, জার্মাণীকে সোভিয়েত ইউনিয়ন অভিমুখে এক বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ সুরু করতে প্রণোদিত করেছিল। তাই সোভিয়েত পোলিশ চুক্তি, পূর্বমুখী জার্মাণ আক্রমণাত্মক অভিযানের সামনে একটা বাধার প্রাচীর তুলে, ইউরোপের নিরাপত্তায় এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করবে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু পোল্যাণ্ডের শত্রুমুক্তিতে সাহায্য করে, পোল জন সাধারণের জীবনে ইঙ্গ-মার্কিণ হস্তক্ষেপের পথ রুদ্ধ করেনি, তার সঙ্গে

পোল্যাণ্ডের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্যে ব্যাপক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক সাহায্য ও সমর্থনও দিয়েছে। তাই সোভিয়েত পোলিশ চুক্তিকে পোল্যাণ্ডের নয়া জনগণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার স্বাধীনতা, শক্তি ও সমৃদ্ধির সহায়ক বলা যায়।

১. গুদেরিয়ান : পূর্বোক্ত গ্রন্থ ; পৃঃ ৩৪৪
২. মিল্টন শুলমান : Defeat in the West, লণ্ডন, ১৯৪৭, পৃঃ ২২৬
৩. ফুলার : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩২৪
৪. ওমার এন. ব্রাড্‌লী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭৫
৫. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪-৯৫
৬. গুদেরিয়ান : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৫৭
৭. ওমার এন. ব্রাড্‌লী : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৯৩
৮. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৫-০৬
৯. ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৭-৫৮
১০. উইলিয়াম সি. নিউম্যান : Making the Peace, 1941-45. The Diplomacy of Wartime Conferences, ওয়াশিংটন ১৯৫০, পৃঃ ৭৩
১১. হেনরী মরগ্যানথ্‌ জুনিয়ার : Germany is Our Problem, নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডন ১৯৪৫, পৃঃ ১৫৫
১২. সামনার ওয়েলস্‌ : The Time for Decision, নিউ ইয়র্ক ও লণ্ডন ১৯৪৪, পৃঃ ৩৪৯
১৩. ইকোনমিষ্ট পত্রিকা, ৩১শে মার্চ, ১৯৪৫
১৪. নিউ রিপাবলিক পত্রিকা, ১০ই জুলাই, ১৯৪৪
১৫. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
১৬. চার্লস এ. বিয়ার্ড : President Roosevelt and the Coming of the War 1941. A Study in Appearances and Realities. ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, পৃঃ ৪৭৩
১৭. মার্কিণ জাতিসংঘ সংস্থা : We, the People, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৫, পৃঃ ৩৬
১৮. A Commentary on the Charter of the United Nations, লণ্ডন ১৯৪৫ পৃঃ ১৬-১৭
১৯. নিউ ইয়র্ক টাইমস্‌, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪
২০. সামনার ওয়েলস্‌ : Where Are We Heading, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৬, পৃঃ ২৯৯
২১. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড; পৃঃ ৩৫২

২১. টাইমস্ পত্রিকা, ৬ই মার্চ, ১৯৪৬

২৩. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৩৯১

২৪. রিচার্ড এফ. বেগড্ট : Inter American Economic Relations, Problems and Prospects, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৮, পৃঃ ৫৪

২৫. American Handbook, ওয়াশিংটন, ১৯৪৫

২৬. প্রাভ্দা, ১০ই এপ্রিল, ১৯৫০

অষ্টাদশ অধ্যায়

বার্লিন অভিযান ও জার্মানীর আত্মসমর্পণ

বারোই জানুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে যখন সোভিয়েতের নতুন আক্রমণ সুরু হলো, তখন জার্মাণী আর শুধু জার্মাণী কেন বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অতি অল্প সংখ্যক মানুষই ভাবতে পেরেছিলেন যে হিটলারের জার্মাণীর অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ততোদিন পর্যন্ত জার্মাণীর মূলভূখণ্ডে কোন লড়াই হয়নি। সংখ্যার দিক থেকে জার্মাণ সৈন্য তখনও রীতিমতো শক্তিশালী। জার্মাণীর যুদ্ধোৎপাদন তখনো প্রচুর। কিন্তু তা সত্বেও চার মাস পরে সেই জার্মাণীর পরাজয় ঘটলো।

জার্মাণীর এই নিদারুণ পরাজয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল এক চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। যুদ্ধের বেশির ভাগ প্রচণ্ডতা সহ্য করতে হয়েছে তাকে এবং তারপরে সে করেছে প্রত্যাঘাত, যা ফ্যাশিস্ত রাইখের শক্তিকে বিধ্বস্ত করলো।

যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে, সোভিয়েতের ব্যাপক অভিযানে পোলিশ, চেক্, বুল-গেরীয়, রুমেনীয় সেনাদল অংশ গ্রহণ করে। ফ্যাশিবাদের পরাজয়ে তারাও তাদেদ অবদান রেখে গেল। সোভিয়েত সেনাদলের সঙ্গে পাশাপাশি, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করার সময়ে, পোলিশ, চেক্, বুলগেরীয় ও রুমেনীয় সেনাদল তাদের অসীম শৌর্য ও সামরিক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেল। সোভিয়েত সর্বোচ্চ সামরিক পরিষদের সমকালীন বিভিন্ন নির্দেশনামায় তাদের বীরত্বের, সাহসিকতার বারেবার উল্লেখ করা হয়েছে।

সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে অনতিপূর্বের পরাজয় এবং অভিযানের এই পর্যায়ে জার্মাণ সেনাদলের ব্যর্থতা, রণাঙ্গনে ও দেশের অভ্যন্তরে সকলের মনোবল ভেঙ্গে দিল।

জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব তখন দেশের সমগ্র পূর্বাঞ্চলকে একটা মৃত অঞ্চল বলে ঘোষণা করার নির্মম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। জনৈক পশ্চিম জার্মাণ ইতিহাসবিদ্, ওয়াল্টার গোরলিট্জ প্রসঙ্গতঃ লিখেছেন: "জার্মাণ সৈন্যরা যে

অঞ্চল ছেড়ে চলে আসে, তা একটা মরুভূমি হয়ে যায়। তার শিল্প কেন্দ্র, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সেতু, রেলপথের সুবিধা, বাঁধ, টেলিগ্রাফ্ ও বেতার কেন্দ্র এবং খনি, যা কিছু থাকে সব ধ্বংস করে ফেলা হয়।......ফিল্ড মার্শাল কাইটেল ও রাইখ্ শ্লেইটার বোরম্যান, যথাক্রমে জার্মাণীর সর্বোচ্চ সমর পরিষদ ও নাৎসী পার্টি কার্যালয়ের প্রধান, কঠোর এক আদেশ জারী করে বললেন যে প্রতিটি শহর শেষ সৈনিক ও শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে। অফিসার ও সৈনিকদের আদেশ পালনে ব্যর্থতার জন্যে সামরিক আদালতের ঘন ঘন অধিবেশন বসতে লাগলো। জল্লাদদের আর ফুরসৎ রইলো না। শত্রু সৈন্য সমাগত দেখে যে সব লোক প্রাণভয়ে সাদা পতাকা উড়িয়েছিল, তাদের ধরে এনে খুন করা হতে লাগলো। যে সব সৈন্য দলছাড়া হয়ে পড়েছিল রাস্তায় তাদের ফাঁসীতে লট্‌কানো হলো। সারা দেশে মৃত্যু যেন মূর্তিমান হয়ে নানা রূপ ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।”[১]

যেদিন থেকে সোভিয়েত আক্রমণ সুরু হয়, সেইদিন থেকেই পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মাণীর প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে লাগলো। আর পূর্ব সীমান্তে অবস্থা আরো চরমে পৌঁছলো। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা ভাবতে লাগলো, পুঁজি-বাদী পশ্চিমী দেশগুলির কাছে আত্মসমর্পণ করে, তারা শেষ পর্যন্ত পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে কিনা। ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ’ পঁয়তাল্লিশের শেষাশেষি, পশ্চিমে জার্মাণীর আরক্ষা ব্যবস্থার শক্ত ঘাঁটি সীগফ্রিড্ লাইন (Siegfried Line), ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যরা প্রায় কোন বাধা না পেয়েই, সহজে অতিক্রম করে গেল। আরেকটি মস্তো বাধা ছিল এধারে রাইন নদী। কিন্তু পলায়নপর জার্মাণ সৈন্যরা রাইনের সেতুগুলি ভেঙ্গে না দেওয়ায়, ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যরা সহজেই তা পার হয়ে গেল।

উনিশ শ’ পঁয়তাল্লিশের মার্চের সুরুতে, জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব জেনারেল ভোল্‌ফ্‌কে (Volff) সুইজারল্যাণ্ডে মার্কিণ ও বৃটিশ মুখপাত্রদের সঙ্গে আলোচনা সুরু করার ভার দিলেন। আলোচনায় সোভিয়েত নেতৃত্বের কোন প্রতিনিধির উপস্থিতির জন্যে, সোভিয়েত সরকার দাবী করলেন। কিন্তু মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের নেতারা, সোভিয়েতের এই আইনসঙ্গত দাবীকে কোন আমল দিতে চাইলেন না। তাঁদের মিত্রপক্ষীয় কর্তব্য, প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে তাঁরা জার্মাণীর সঙ্গে স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা করাই স্থির করলেন।

কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে বার্ন শহরে আলোচনা চললো। পক্ষকাল আলোচনা চলার পরে, ঘটনাবলী থেকে এটুকু ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, "তাঁরা জার্মাণদের সঙ্গে একটা মোটামুটি চুক্তি করে ফেলেছেন, যাতে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মাণ সেনাপতি মার্শাল কেসেলরিং (Kesselring) সমস্ত প্রতিরোধ তুলে নিয়ে, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে দেবেন এবং প্রতিদানে মার্কিণ ও বৃটিশ পক্ষ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে যুদ্ধ বিরতির সর্তাবলী যাতে জার্মাণীর পক্ষে খুব কঠোর না হয়, তা তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন।"[২]

যখন স্তালিন এই আলাপ আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে অনুরূপ একটি বাণী পাঠালেন, তখন রুজভেল্ট সরাসরি তা অস্বীকার করলেন। কিন্তু দেখা গেল উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের মার্চ মাসের শেষ থেকে, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মাণরা "নামমাত্র" যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই করলো না। বলার মতো কোন প্রতিরোধ না করেই, পশ্চিম রণাঙ্গনে অল্প সংখ্যায় নিযুক্ত জার্মাণ সৈন্য, তাদের ঘাঁটি ছেড়ে, দলে দলে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। ওদিকে সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে নাৎসীরা মরিয়া হয়ে সোভিয়েত সেনাদলের অগ্রগতি রুখতে চেষ্টা করলো।

সুতরাং একথা প্রায় নির্ভুল ভাবে বলা যায় যে, স্তালিন পরিস্থিতির একেবারে সঠিক বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি রুজভেল্টকে লেখেন: "এই মুহূর্তে আমরা দেখছি, তা হলো এই যে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মাণরা বৃটিশ ও আমেরিকানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ একরকম বন্ধ করেছে! অথচ এই একই সময়ে তারা পূর্ব রণাঙ্গনে, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু, মিত্রদেশ রাশিয়ার বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।"[৩]

সোভিয়েত সেনাদল জার্মাণীর অভ্যন্তরে যতোই প্রবেশ করতে লাগলো, জার্মাণীর যুদ্ধোৎপাদন ততোই কমে যেতে লাগলো। মার্কিণ ও বৃটিশ ইতিহাস-বিদ্‌রা দাবী করেন যে জার্মাণীতে ইঙ্গ-মার্কিণ বোমাবর্ষণের ফলে শিল্প ব্যবস্থার যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়, তার জন্যেই জার্মাণী পরাজিত হয়েছে। কিন্তু আসলে জার্মাণীর ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধোৎপাদনের হার সোভিয়েতের বিজয় সাফল্য সম্ভব করে তোলেনি বরং বিপরীতপক্ষে বলতে হয় যে সোভিয়েতের বিজয় সাফল্যই জার্মাণ যুদ্ধোৎপাদনের হারকে নীচের দিকে নামিয়ে দেয়।

এই নিম্নগতির অবিশ্যি আরো অনেক কারণ ছিল। জার্মাণী ততোদিনে

তার অধিকৃত অঞ্চল ও তাঁবেদার দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারিয়েছে। তাছাড়া জার্মাণীর অনেক প্রদেশও তার হাত ছাড়া হয়ে গেছে। পূর্বাঞ্চল থেকে শিল্প ব্যবস্থা সরিয়ে আনা হয়েছে। আর যা সরিয়ে আনা যায় নি, তা ধ্বংস করে দিয়েছে নাৎসীরা। জার্মাণ শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা গেছে কমে। বাধ্যতা-মূলক শ্রমে নিযুক্ত বিদেশী শ্রমিক ও জার্মাণ শ্রমিকদের একাংশের অন্তর্ঘাতমূলক কাজ ছড়িয়ে পড়েছে দেশে ব্যাপকভাবে। জার্মাণীতে কাঁচামাল রপ্তানীর উৎস গেছে কমে, ফলে শিল্পে কাঁচামালের যোগান আসছে না নিয়মিত। যুদ্ধ জার্মাণীর মূল ভূখণ্ডে সম্প্রসারিত হওয়ার ফলেই, তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন, অগঠিত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু জার্মাণ অর্থনীতিতে নিম্নগতি সুরু হওয়ার অনেক আগেই, সোভিয়েতের শ্রমিকশ্রেণী, ফ্যাশিস্ত সমাজ ব্যবস্থার উপর একটা অর্থনৈতিক জয়লাভ করেছিল। সোভিয়েতের শিল্প সংগঠন দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে থাকে। উনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশে সোভিয়েতে শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় সাত হাজার নয় শ' কোটি রুব্‌ল। সর্বসাকুল্যে এই সময়ের মধ্যে দেশের পূর্বাঞ্চলে বাইশ শ' পঞ্চাশটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এক লক্ষ মেশিন উৎপাদন যন্ত্র, চব্বিশটি ব্লাষ্ট ফার্নেস, একশ' আটাশটি খোলা মুখ ফার্নেস এই সময়ে চালু করা হয়।[৪] পূর্বাঞ্চলে যে সব বড়ো বড়ো কারখানা খোলা হয়, সেগুলি উনিশ শ' চুয়াল্লিশের গোড়া থেকেই উৎপাদন করতে সুরু করে। তাদের প্রত্যেকটিতে অত্যন্ত উন্নতমানের একেবারে প্রথম শ্রেণীর দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছিল। উনিশ শ' চল্লিশের তুলনায়, দেশের পূর্বাঞ্চলে উৎপাদনের গড় দাঁড়ায় উনিশ শ' চুয়াল্লিশে শতকরা একশ' আশী ভাগ বেশি। এবং যুদ্ধোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় শতকরা পাঁচশ যাট ভাগ।[৫] যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র সোভিয়েত দেশে অ্যালুমিনিয়াম শিল্পের মোট উৎপাদনের চেয়ে এই সময়ে উরাল অঞ্চলে উৎপাদন বেশি হতে লাগলো। ম্যাগ্‌নিতোগোরস্ক ইস্পাত কারখানায়, ডিসেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশে একটা বিরাট ব্লাষ্ট ফার্নেস চালু করা হয়। দ্বিতীয় আরেকটি ফার্নেস চালু করা হয় উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। প্রথমটির মতো এটাও ছিল ইউরোপের বৃহত্তম ফার্নেস-গুলির অন্যতম।

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে উরাল অঞ্চলে চুসোভোয় কারখানায় একটি বড়ো ব্লাষ্ট

ফার্নেস এবং বেস্‌মেয়ের (Bessemer) উৎপাদন কার্যক্রম চালু করা হয়। উজবেক ইস্পাত কারখানায় প্রথম খোলামুখ ফার্নেস কাজ সুরু করে এবং আলতাইয়ে একটা নোতুন ট্রাকটর নির্মাণ কেন্দ্র খোলা হয়। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে সোভিয়েতের শিল্পায়ন কর্মসূচীতে বহু কল কারখানা সংযোজিত হয়েছিল যেমন চেলিয়াবিনস্ক ইস্পাত কারখানায় নোতুন ফার্নেস, নোভো-তাগিল্‌স্ক ইস্পাত কারখানায় একটা ব্লাষ্ট ফার্নেস ও একটা কোক চুল্লী, কারাগান্দায় একটা বিরাট কয়লাখনি ; উরালে মোটর নির্মাণ কেন্দ্র, অনেকগুলি বিমান উৎপাদন কেন্দ্র, সাইবেরিয়ায় একটি ট্যাঙ্ক নির্মাণের কারখানা, কুজনেৎসে লৌহ ঘটিত শিল্প কেন্দ্র, চেলিয়াবিনস্কের পাইপ রোলিং কারখানার খোলামুখ ফার্নেস, গুবাখাব রাসায়নিক শিল্পে দুটি কয়লা চুল্লী এবং দেশের সবচেয়ে বড়ো টার্বোজেনারেটর কেন্দ্র স্থাপিত হয় চেলিয়াবিনস্ক জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে। তা ছাড়া দেশের পূর্বাঞ্চলে, কয়লা উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে দু' শ'-টি কয়লাখনি ও অন্যান্য শিল্প প্রকল্প চালু করা হয়েছিল।

আরো যা করা হয়েছিল এই সময়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মন্ত্রিসভায় একুশে আগষ্ট, উনিশ শ' তেতাল্লিশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তা হচ্ছে দেশের জার্মাণ অধিকার মুক্ত অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক পুনর্বাসন। ইয়েনাকিভোর ইস্পাত কারখানায় দু'টি পুনর্গঠিত ব্লাষ্ট ফার্নেস, ডিসেম্বর উনিশ শ' তেতাল্লিশ থেকে আবার কাজ সুরু করে। দোনেৎস্ অববাহিকায় জুইয়েভ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের টারবাইনগুলি, বাক্‌সান বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রগুলি, ক্রাসনোগোরস্কের শিল্পকেন্দ্রের প্রথম অংশ, ভোলগোগ্রাদে ক্রাসনী ওখতাইবর কারখানার ব্লুমিং মিল, দোনেৎস্ কারখানার ব্লাষ্ট ফার্নেস ও কোক চুল্লী, রুৎ-চেন্‌কোভো রাসায়নিক শিল্পের অনেকগুলি কোক চুল্লী ও রাসায়নিক বিভাগ পুনর্গঠিত হয়ে উৎপাদন করতে থাকে। তাছাড়া তাগানরোগের আন্দ্রিয়েভ কারখানার রোলিং মিল ও খোলামুখ চুল্লী, ম্যারিউপোল কারখানার অনুরূপ বিভাগগুলি, কনস্তান্তিনোভ্‌কার ফ্রুনজ কারখানার ব্লাষ্ট ফার্নেস এবং নোভো ক্রামাতোরস্ক কারখানার যন্ত্র নির্মাণ বিভাগ, উনিশ শ' চুয়াল্লিশেই পুনর্গঠিত হয়ে উৎপাদন সুরু করে। ভোলখোভোর লেনিন জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও মস্কোর কয়লা খনি অঞ্চল আবার পূর্ণোদ্যমে কাজ সুরু করে। দেশের শত্রুমুক্ত অঞ্চলে উনিশ শ' বিয়াল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে, প্রায় ছয় হাজার

শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠিত হয়।* সম্প্রতি অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে পরিবহন ব্যবস্থা ও কৃষি কাজ যথারীতি চালু করার চেষ্টা হয়।

এই অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সমস্ত পৃথিবীর কাছে, পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উপরে সমাজতন্ত্রী সমাজের সুবিধা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করলে, সোভিয়েত অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের সফলতা আরো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মার্কিণ ও বৃটিশ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃত্বের অবিবেচনা প্রসূত যথেচ্ছ নীতির জন্যেই, পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতিতে যথেষ্ট যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ধাক্কা গিয়ে লাগে। ফলে জনগণের দুঃখ-কষ্টও এতে বেড়ে যায় যথেষ্টভাবে। বিরাট বিরাট মার্কিণ ও বৃটিশ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনবাসনে বাধা দেয়, কারণ এতে তাদের মুনাফালাভের কোন সুযোগ ছিল না।

॥ দুই ॥

সোভিয়েতের উনিশ শ' চুয়াল্লিশের আক্রমণ ধারা, বারেন্তু থেকে কৃষ্ণসাগর পযন্ত সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে শত্রুর শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দেয়। তাই যখন আবার আক্রমণের প্রস্তুতি করা হলো সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে, তখন তার লক্ষ্য ছিল শেষ আঘাত হানা, একেবারে যুদ্ধের সমাপ্তি করা।

বারোই জানুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে এই শেষ অভিযান পবে সোভিয়েত সেনাদলের সঙ্গে যৌথভাবে আক্রমণ করে পোলিশ, চেক্, বুলগেরীয় ও রুমেনীয় সৈন্যবাহিনী। একটা বিরাট রণনৈতিক গুরুত্ব ও ব্যাপকতা নিয়ে একের পর এক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটা আক্রমণধারা রচনা করা হয়। তাদের প্রথমটি হলো প্রথম বাইলোরুশীয়, প্রথম ইউক্রেনীয় ও চতুর্থ ইউক্রেনীয় সেনাদলের দক্ষিণ শাখার ভিসচুলা-ওডার অভিযান। এর লক্ষ্য ছিল ছত্রিশ ডিভিসন সৈন্যের জার্মাণ 'ক' বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার একাংশ শত্রু মুক্ত করা এবং ওডার পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে বার্লিন অভিযানের পথ প্রশস্ত করা।

যুদ্ধের প্রথম দিনেই প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যরা শত্রুর প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল অঞ্চলকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়। চোদ্দই জানুয়ারী প্রথম বাইলোরুশীয় বাহিনীর সৈন্যরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সতেরোই জানুয়ারী

শত্রুর প্রতিরোধের মধ্যে ভাঙ্গন ধরিয়ে প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটার বিস্তৃত এক রণাঙ্গনে সৈন্যরা এগিয়ে যেতে থাকে। এই কার্যক্রমেই জার্মাণ 'ক' বাহিনীর প্রধান শক্তি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। ফলে অগ্রসর হওয়ার পথ বাধা মুক্ত হয়। পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারস' সেই দিনই শত্রু মুক্ত হলো। কিন্তু চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যরা প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলে যায় পশ্চিম কার্পেথিয়াকে শত্রুমুক্ত করতে।

অভিযানের দ্বিতীয় পর্বে, আঠারোই জানুয়ারী থেকে তেসরা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে, সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রু সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবন করে, একটা বিরাট রণাঙ্গন জুড়ে এসে পৌঁছয় ওডারে। কিন্তু অভিযান সেখানেই থেমে গেল না। সোভিয়েত সৈন্যরা নদীর পশ্চিম তীরেও কয়েকটি সেতুমুখ দখল করতে পারায় তারা নদী পার হয়ে সমগ্র পোল্যাণ্ডকে শত্রুমুক্ত করে ফেলে। চেকোশ্লোভাকিয়ার একটা বড়ো রকমের অংশও ততোদিনে শত্রুমুক্ত হয়ে স্বাধীন হয়ে গেছে। যুদ্ধ তখন এসে পড়েছে একেবারে ফ্যাশিস্ত জার্মাণ ভূখণ্ডে।

ওসভিসিম কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের আশ-পাশের অঞ্চল তখন সোভিয়েত সৈন্যদের দখলে। তাই জানা গেল বহু নিষ্ঠুর, নাটকীয় তথ্য, যা নাৎসীরা এতোদিন সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিল। ক্যাম্পের মজুদ ঘরে সোভিয়েত সৈন্যরা দেখে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মহিলার মাথার চুল ওজনে সাত হাজার কিলো-গ্রামেরও বেশি, যা তাদের হত্যা করার পরে কেটে জমা করা হয়েছে। খুন করা মানুষের হাড় গুঁড়িয়ে বাক্স বোঝাই করে রাখা হয়েছে সারিসারি। পোষাক ও জুতো বোঝাই এই রকম আছে আরো বহু বাক্স। আর ক্যাম্পে নিহত মানুষের দেহ থেকে খুলে নেওয়া সোনার দাঁত, চশমা ও অন্যান্য জিনিসের তো আর লেখাজোখা নেই।

ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে মাউথাউসেনে, নাৎসীরা সোভিয়েতের জেনারেল ডি. এম. কার্বিশেভকে হত্যা করে। দারুণ শীতের রাতে তাঁকে বের করে এনে খোলা জায়গায় ক্রমাগত গায়ে জল ঢালা হয়, যতোক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর দেহটা জমে বরফের একটা দণ্ডে পরিণত হয়।

কিন্তু এতো নিপীড়নের মধ্যেও বন্দীরা নাৎসীদের বর্বরতাকে উপেক্ষা করার মতো সাহস দেখাতে পেরেছিল। অসংখ্য তেমন ঘটনার একটি বলা যেতে পারে। পেনেমুণ্ডেটেনে, সোভিয়েত দেশপ্রেমিক বন্দীরা হঠাৎ একদিন বৈমানিক

এম. পি. দেভিয়াতায়েভের নেতৃত্বে একটা জার্মাণ বিমাণ দখল করে, উড়ে চলে যায় রণাঙ্গনের ওপারে, সোভিয়েত সেনাদলের মধ্যে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাইলোরুশীয় বাহিনী, ভিসচুলা-ওডার কার্যক্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত পূর্ব প্রাশিয়া অভিযানের দায়িত্ব নেয়। তারা মুখোমুখি হলো, আটত্রিশ ডিভিসন সৈন্য সহ জার্মাণ মধ্যবর্তী বাহিনীর।

তৃতীয় বাইলোরুশীয় বাহিনীর সৈন্যরা আক্রমণ সুরু করে, তেরোই জানুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে। সেই মাসের শেষাশেষি তারা কোনিগ্সবার্গ ঘেরাও করে ফেলে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় বাহিনী যারা চোদ্দই জানুয়ারী আক্রমণ সুরু করে, উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে তারা সেই মাসের শেষাশেষি এসে পৌছয় ম্যারীয়েনবার্গে। জার্মাণ মধ্যবর্তী বাহিনী এইভাবে দু' দিক থেকে আটকে পড়ে যায় পূর্ব প্রাশিয়ায়। তারপর কয়েকটি বড়ো রকমের যুদ্ধে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়।

নয়ই এপ্রিল সোভিয়েত সেনাদল কোনিগ্সবার্গ দখল করে। পঁচিশে এপ্রিলের মধ্যে নাৎসীদের জবরদস্ত ঘাঁটি পিল্লাও (Pillau) তাদের অধীনে আসায়, কোনিগ্সবার্গের উত্তরাঞ্চল এই সময়ে নাৎসী সৈন্য শূন্য হয়ে পড়ায়, সমগ্র পূর্ব প্রাশিয়া সোভিয়েত সেনাদলের দখলে চলে আসে। ফলে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বার্লিন অভিযানের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

দশই ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় বাহিনীর সৈন্যরা, সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের উত্তরাংশে একটা নোতুন অভিযান চালায়। এর নাম দেওয়া হয়েছিল পূর্ব পোমেরেনিয়ান অভিযান। পোলিশ প্রথম বাহিনী এতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এর লক্ষ্য ছিল, বার্লিন অভিযানকারী সোভিয়েতের মূল সেনাদলের দক্ষিণ পাশ থেকে যাতে কোন আঘাত না আসে তার ব্যবস্থা করা। কারণ জার্মাণরা তখন ভিশ্চুলা অঞ্চলে, পূর্ব পোমেরেনিয়া রক্ষা করার জন্যে রীতিমতো সৈন্য সমাবেশ করেছে।

প্রথম দিকে সোভিয়েত সৈন্যরা খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে লাগলো। তাই দেখে শত্রুপক্ষ আরো সৈন্য এনে শক্তি বৃদ্ধি করায়; তাদের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো বিয়াল্লিশ ডিভিসন। তাদের তখন ভিশ্চুলা থেকে ওডার ও জিদিনিয়া-ডানজিগের সুরক্ষিত অঞ্চলে নানা জায়গায় ঘাঁটি করে বসিয়ে দেওয়া হলো।

তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সোভিয়েত সৈন্যরা এসে পড়ে বাল্টিক সাগরের উপকূলে। তারা কোসজালিন শহর দখল করে, জার্মাণ ভিশ্চুলা বাহিনীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। তারপর কোলবার্গ শহরের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় তাদের বেষ্টন করে ফেলে। বেষ্টনী যতোই ছোট হয়ে আসতে থাকে, সংগ্রাম ততোই তীব্র হয়ে ওঠে। তেরোই মার্চ সোভিয়েত সেনাদল ষ্টেটিন উপসাগরের তীরে পৌঁছিয়ে, আল্টডাম শহর আক্রমণ করে। বিশে মার্চ শহরটি সোভিয়েত সৈন্যের দখলে আসে। এই সময়েই কোলবার্গ শহরও অধিকার করা হয়। কিন্তু ডান্‌জিগ্‌ জিদিনিয়ার লড়াই চলে আরো পনের দিন ধরে। সোভিয়েতের বালটিক নৌ-বহর, অগ্রসরমান সোভিয়েত সেনাদলকে প্রভূত সাহায্য করে। তাদের সক্রিয়তায় শত্রুপক্ষের একশ' একান্নটি যাত্রীবাহী জাহাজ, আটানব্বইটি যুদ্ধ ও সাহায্যকারী জাহাজ জলমগ্ন হয়।

সোভিয়েত অভিযান প্রতিহত করার জন্যে, নাৎসীরা পাল্টা আক্রমণ করার চেষ্টা করে। বিশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, জেনারেল জর্জ সি. মার্শাল সোভিয়েত সরকারকে জানান যে, মার্কিণ সামরিক গুপ্তচর বিভাগ জানতে পেরেছে যে নাৎসীরা সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনের দু'টি অঞ্চলে পাল্টা আক্রমণের তোড়জোড় করছে। একটা হলো পোমেরেনিয়া থেকে তোরাণ অভিমুখে, অন্যটি মোরাভ্‌স্কা ও স্ত্রাভা অঞ্চলে লোজের দিকে। সংবাদে আরো বলা হয় যে লোজ্‌ অভিযানে ষষ্ঠ এস. এস. প্যানসার বাহিনীকে নিয়োগ করা হয়েছে।

কিন্তু ঘটনা যা ঘটলো তার সঙ্গে এই খবরের কোন মিল রইলো না। সোভিয়েত সেনাদলের সমরনায়ক পরিষদের প্রধান, জেনারেল আন্তোনোভ্‌, এ বিষয়ে তিরিশে মার্চ, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে মার্কিণ সামরিক মিশনের নেতা, মেজর জেনারেল ডীনকে লেখেন :

"সম্ভবতঃ এটা এমন হতে পারে যে এই খবর সরবরাহকারীদের কেউ কেউ ইঙ্গ-মার্কিণ সোভিয়েত প্রধান কার্যালয়কে ধাপ্পা দিয়ে, পূর্ব রণাঙ্গনে যেখানে প্রকৃতপক্ষে জার্মাণরা পাল্টা আক্রমণ সুরু করতে চায় সেখান থেকে অন্যত্র সোভিয়েত সর্বোচ্চ সামরিক নেতৃত্বের দৃষ্টি সরাতে চেয়েছিল।"[৭]

বালাতোন হ্রদ অঞ্চলে তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদলের বিরুদ্ধে জার্মাণরা তাদের পাল্টা আক্রমণ সুরু করলো। জার্মাণ নেতৃবৃন্দ আশা করে

ছিলেন যে এই আক্রমণের ফলে বার্লিন অভিমুখে ধাবমান সোভিয়েত সেনা-দলকে অন্যত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে তাঁরা বাধ্য করবেন এবং হাঙ্গেরীর অবশিষ্ট কয়েকটি তৈল খনির উপর তাঁদের অধিকার বজায় থাকবে। তাঁদের আরো আশা ছিল যে এতে সোভিয়েত সৈন্যের দক্ষিণমুখী অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে এবং তারা নিজেদের সংঘবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করতে বাধ্য হবে। এই পাল্টা আক্রমণ সুরু করা হলো বিরাট আকারে এবং ষষ্ঠ এস. এস. প্যানসার বাহিনী পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে সরে এসে এই আক্রমণে অংশ গ্রহণ করলো।

বড়ো রকমের যুদ্ধ আরম্ভ হলো ছয়ই মার্চ, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে। দশদিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চললো। কিন্তু জার্মাণ বাহিনীর হিংস্র আক্রমণে বালাতান হ্রদ অঞ্চলে সোভিয়েত ও বুলগেরীয় বাহিনীর প্রতিরোধে এতটুকু চিড় খেল না। ষোলই মার্চ, সোভিয়েত সৈন্যরা ভিয়েনা অভিযান সুরু করলো। এর লক্ষ্য ছিল জার্মাণ দক্ষিণ বাহিনীকে ধ্বংস করে, হাঙ্গেরী, ভিয়েনা সমেত অষ্ট্রিয়ার বেশির ভাগ অংশ ও সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া শত্রুমুক্ত করা।

ভিয়েনা অভিযানে মার্শাল রোদিয়োন ম্যালিনোভ্‌স্কির নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনী, মার্শাল ফিয়োদোর তোলবুখিনের নেতৃত্বে তৃতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদল ও ড্যানিয়ুব নৌবহর যোগ দেয়। শত্রুর তীব্র প্রতিরোধ সত্ত্বেও সোভিয়েত সেনাদলের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটতে থাকে। পাঁচই এপ্রিল তারা ভিয়েনা শহরের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছয়। সাতই এপ্রিলের মধ্যেই অষ্ট্রিয়ার রাজধানীর চারদিকে সোভিয়েত সেনাদল এক ইস্পাত দৃঢ় বেষ্টনী গড়ে তোলে। তেরোই এপ্রিল ভিয়েনা শহর নাৎসী অধিকার মুক্ত হয়। সোভিয়েত সেনাদলের প্রচেষ্টায় নাৎসীদের অষ্ট্রিয়ায় স্নায়ুযুদ্ধ চালানোর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরই ফলে হাঙ্গেরী ও অষ্ট্রিয়ার পূর্বাঞ্চল শত্রুমুক্ত হয়ে যায়।

নয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সোভিয়েত সরকার ঘোষণা করলেন যে, তাঁদের অষ্ট্রিয় ভূখণ্ডের কোন অংশ দখল করা বা তার সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করার কোন ইচ্ছাই নেই। তাঁরা বরং অষ্ট্রিয়া থেকে ফ্যাশিস্তদের দখলদারী অস্তিত্বের বিলোপ সাধন করে তার গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করতে চান। অষ্ট্রিয়াবাসী এই বিবৃতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল।

পনেরোই থেকে একত্রিশে মার্চ, প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সেনাদল

মার্শাল আইভান কোনেভের নেতৃত্বে জার্মাণ মধ্যবর্তী বাহিনীর বিরুদ্ধে উচ্চ সাইলেশিয়ায় অভিযান চালায়। এই বাহিনীতে নাৎসীদের তেতাল্লিশ ডিভিসন সৈন্য ছিল। সোভিয়েত অভিযানের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় জার্মাণ বাহিনীকে ধ্বংস করে সুদেতেন অঞ্চলের সান্নুদেশে উপস্থিত হওয়া। ওপ্‌পেল্‌নের (Oppeln) দক্ষিণ পশ্চিমে শত্রুবাহিনীকে ঘেরাও করে শেষ করে ফেলা হলো। সুদেতেন অঞ্চলের সান্নুদেশে পৌঁছে গেল সোভিয়েত বাহিনী। তাদের সামনে এখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বৃহত্তম অভিযান—বার্লিন অভিযান—রণনৈতিক কার্যক্রমের পরবর্তী স্তর হিসাবে রইলো।

অভিযান সুরুর স্থান হলো ওডার অঞ্চল, জার্মাণ রাজধানী থেকে যার দূরত্ব ষাট কিলোমিটারের মতো। শত্রু সেখানে শক্তিশালী সৈন্য সমাবেশ করেছে। ওডার থেকে বার্লিন পর্যন্ত পথ, বার্লিনের সুরক্ষিত অঞ্চলের অন্তর্গত। যেখানে নাৎসীরা যতোটা সম্ভব প্রতিরোধ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গড়ে তুলেছে।

রণনৈতিক কার্যক্রম অনুযায়ী বার্লিনের দিকে অভিযান সুরু করলো প্রথম ও দ্বিতীয় বাইলোরুশীয় ও প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনী। রণাঙ্গনের বিস্তৃতি তখন প্রায় চারশ' কিলোমিটারের মতো। সোভিয়েতের আঘাত হানার শক্তি তখন তার সর্বোচ্য সীমায় পৌঁছেছে। সোভিয়েত বাহিনীর আছে একচল্লিশ হাজার ছয়শ' কামান ও মাইনক্ষেপণ অস্ত্র, ছয় হাজার তিনশ' ট্যাঙ্ক, আট হাজার চারশ' জঙ্গী বিমান ও আরো বহুতর যুদ্ধাস্ত্র। সব কিছুই শুধু জার্মাণ প্রতিরক্ষার গভীর স্তরে ফাটল ধরিয়ে বার্লিনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে।

ছয়ই এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে বার্লিন অভিযান সুরু হলো। দিনের শেষে শত্রুর প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সামান্য চিড় খেয়ে গেল। সোভিয়েত সৈন্যরা প্রতিরক্ষার দ্বিতীয় স্তরের মুখোমুখি এসে পড়লো। অভিযান সুরু করার প্রথম চার দিনের মধ্যে, প্রথম বাইলোরুশীয় বাহিনীর সৈন্যরা প্রায় সত্তর কিলোমিটার দীর্ঘ এক রণাঙ্গন জুড়ে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথ এগিয়ে গেল। প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যরা একই দিনে আক্রমণ সুরু করে, তিন দিনের দিন শত্রুর প্রতিরক্ষায় ফাটল ধরিয়ে অগ্রসর হলো। লক্ষ্য তাদের দক্ষিণ দিক থেকে শত্রুপক্ষকে ঘিরে ফেলা। মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্যরা বার্লিনে না পৌঁছনো পর্যন্ত, সোভিয়েত সেনাদলকে ওডার ও নিসে বরাবর আটকে রাখার নাৎসী পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেল।

ঠিক সেই দিনগুলিতে মার্কিণ ও বৃটিশ সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে পূর্বেকার শৈথিল্যের পরিবর্তে দেখা গেল অত্যন্ত বেশি তৎপরতা। ইঙ্গ-মার্কিণ অগ্রগতি দ্রুততর করার জন্যে জার্মাণ জেনারেলরা, পশ্চিম রণাঙ্গনের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে, প্রতিরক্ষাকে দুর্বল করে দিলেন। আর সেই সব সেনাদল পাঠানো হতে লাগলো পূর্ব রণাঙ্গনে। উত্তর সাগর থেকে সুইস্ সীমান্ত পর্যন্ত, পশ্চিম রণাঙ্গনের এই সুদীর্ঘ আটশ' কিলোমিটার বিস্তৃতির মধ্যে, হিটলার জার্মানীর সর্বসাকুল্যে সৈন্য ছিল পঁয়ত্রিশ ডিভিসন। তাও আবার তারা অস্ত্রশস্ত্রে তেমন সুসজ্জিত ও যুদ্ধক্ষম ছিল না। মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার ক্রমাগত তাঁদের সামরিক নেতৃত্বকে, যে যে অঞ্চল সোভিয়েত সৈন্য দখল করবে বলে পূর্ব নির্দিষ্ট ছিল, সেখানে ঢুকে পড়ার জন্যে তাগিদ দিতে লাগলেন। একত্রিশে মার্চ, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে চার্চিল, রুজভেল্টকে লেখেন:

"রুশদের দক্ষিণ বাহিনী যে ভিয়েনা প্রবেশ করে সমগ্র অষ্ট্রিয়া দখল করে নেবে তা সুনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে। যদি আমরা বার্লিন আমাদের দখল করার সুযোগ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের দখল করার অপেক্ষায় ফেলে রাখি, তাহলে যে ঝোঁক তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, সেই ধারণা এই দু'টি ঘটনায় আরো বদ্ধমূল হয়ে যাবে, যে যুদ্ধে যা কিছু সব তারাই একেলা করেছে।.........যদি শত্রুর প্রতিরোধ ক্ষমতা, যা আপনি স্পষ্টতঃই প্রত্যাশা করছেন এবং যে আশা পূর্ণ হতেও পারে, দুর্বল হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমরা এল্‌ব পার হয়ে পূর্ব দিকে যতোদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি না কেন? এর একটা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে।"[৮]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি ইঙ্গ-মার্কিণ শাসকরা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কি লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন, তারই একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করে। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল চূড়ান্ত জয়লাভে সোভিয়েতের অবদান যতোটা সম্ভব কম করে দিয়ে, তার আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও প্রভাব যথাসাধ্য সীমিত করা।

চার্চিলের টেলিগ্রাম যে মার্কিণ শাসক মহলের অনুমোদন লাভ করেছিল তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। চার্চিল বার্লিনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার উপরে জোর দিচ্ছিলেন। দোসরা এপ্রিল তিনি আইসেনহাওয়ারকে বলেন, "যতোদূর সম্ভব পূর্ব দিকে এগিয়ে রুশদের সঙ্গে করমর্দন করার বিষয়কে

আমি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি।"[৯] পাঁচই এপ্রিল তিনি আবার একই বিষয়ে, রুজভেল্টের কাছে এক তারবার্তা পাঠান।[১০]

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি বারোই এপ্রিল দেহত্যাগ করলে, উপরাষ্ট্রপতি হ্যারী এস. ট্রুমান, তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। বাইশে এপ্রিল সরকার পক্ষের প্রখ্যাত নেতাদের সঙ্গে এক বৈঠকে ট্রুমান সোভিয়েত মার্কিণ সম্পর্কের বিষয়টি উত্থাপন করেন। সেই প্রসঙ্গে রুজভেল্ট ও ট্রুমানের পরামর্শদাতা অ্যাডমিরাল লিহ্যই তাঁর রোজনামচায় কি লিখেছিলেন দেখা যেতে পারে:

"যে গোষ্ঠীকে ট্রুমান বৈঠকে ডেকেছিলেন, তাঁদের মতামতের সারকথা হলো এই যে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটা কঠোর মনোভাব গ্রহণের সময় এসেছে।"[১১]

মার্কিণ ইতিহাসবিদ্ ফ্লেমিং মনে করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা যুদ্ধ সুরু করার সিদ্ধান্তের উপর এই বৈঠকের একটা বড়োরকমের প্রভাব আছে। তিনি বলেছেন যে, "বৈঠকে রুজভেল্ট ও হাল দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় সোভিয়েতের সঙ্গে যে বোঝাপড়ার সম্পর্ক একটা গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন, যা শান্তিস্থাপন পর্বেও অটুট থাকতো, তা বাতিল করে দেওয়া হলো।"[১২]

মার্কিণ সরকার ও তাঁদের গুপ্তচর বিভাগ যেনতেন প্রকারে ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর গুপ্তচর সংস্থাকে নিজেদের কাজে লাগাতে চেষ্টা করলেন। আমেরিকান গুপ্তচর বিভাগের শ'খানেকেরও বেশি দলকে জার্মাণী পাঠানো হলো জার্মাণ পররাষ্ট্র দপ্তরের গোপন নথিপত্র, জার্মাণ গুপ্তচর বিভাগ, এবং গেষ্টাপোর কাগজপত্র যাতে নাৎসী দলের সদস্যদের নামের তালিকা আছে, জার্মাণ একচেটিয়াপতিদের গোপন পেটেণ্ট আছে, হস্তগত করার জন্যে। আরেকটি বিশেষ গুপ্তচর গোষ্ঠীকে পাঠানো হলো, নাম তাদের অ্যালসোস (Alsos), যারা পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কে সমস্ত গবেষণার কাগজপত্র সংগ্রহ করতে ও সংশ্লিষ্ট গবেষণাকেন্দ্র, বিজ্ঞানীদল ও কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন লোকজনদের ধরে আনতে পারবে।[১৩]

মার্কিণ ও বৃটিশ নেতৃবৃন্দ যে পরিকল্পনা সযত্নে লালন করছিলেন, সেটা জার্মাণীর ফ্যাশিস্ত নেতৃত্বের কাছে মোটেই অজানা ছিল না। বরং তাঁরা এতে সাহায্য করার জন্যে তৈরী ছিলেন। নাৎসীরা বিশ্বাস করতো যে বার্লিন যদি

ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলের দখলে যায়, তাহলে তারা জঘন্য অপরাধ করা সত্ত্বেও রেহাই পেয়ে যাবে। তারা এটাও আশা করতো যে যদি সোভিয়েত ও ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদল একই সঙ্গে বার্লিন পৌঁছয়, তাহলে তাদের মধ্যে বিরোধ বেধে যাবে, যাতে হয়তো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে যেতে পারে। যুদ্ধ ইতিহাস-বিদ্ ভেরনার পিকট স্বীকার করেছেন যে, জার্মাণ সৈন্যরা এই আশা শেষ পর্যন্ত পোষণ করেছে যে, তারা "জার্মাণী তথা সমগ্র ইউরোপের জন্যে লড়াই করছে। সেই কর্তব্য বোধ থেকেই, যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে জেনেও তারা ক্রমাগত প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাতে থাকে।"[১৪]

হিটলার "যতোক্ষণ পর্যন্ত শত্রুপক্ষে প্রত্যাশিত ভাঙ্গন না ধরছে, ততোক্ষণ যেমন করেই হোক যুদ্ধ চালাবার ইচ্ছা" পোষণ করেছেন।[১৫] মাটির নীচে প্রাক্তন সম্রাটদের চ্যান্সেলারীতে, আত্মরক্ষার জন্যে আত্মগোপনকারী ফ্যাশিস্ত নেতাদের সমক্ষে, হিটলার বারেবার কেবলই বলতেন :

"যাই হোক না কেন বলশেভিক ও অ্যাংলো স্যাক্সনদের মধ্যে যে কোনদিন যে কোন সময়ে আবার একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারে।"[১৬]

ইঙ্গ-মার্কিণ পরিকল্পনায় সাহায্য করার জন্যে, জার্মাণ সর্বোচ্চ নেতৃত্ব পশ্চিমে সমস্ত প্রতিরোধ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন, যাতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে পারে। জেনারেল ভেনকের (Wenck) দ্বাদশ বাহিনীকে, যারা আমেরিকানদের সঙ্গে লড়াই করছিল, সরিয়ে এনে পাঠিয়ে দেওয়া হলো সোভিয়েত সেনাদলের বিরুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গনে। দ্বাদশ বাহিনীর প্রতি স্থান পরিবর্তনের এই আদেশ স্বেচ্ছাকৃতভাবে গোয়েবলসের নির্দেশে কাগজে প্রকাশিত ও বেতারে প্রচারিত হলো। গোয়েবলস্ বলেন "এল্‌বের জার্মাণ সেনাদল, আমেরিকানদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।"[১৭]

স্বভাবতই কোথাও কোন বাধা না পেয়ে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যরা তখন দ্রুত এগিয়ে গেল বার্লিনের পথে। ২১শে এপ্রিল যখন সোভিয়েত সৈন্যরা বার্লিনের পথে পথে লড়াই করছে, তখন মার্কিণ সেনাদলের প্রথম ও নবম বাহিনী এসে পৌঁছেছে এল্‌বের তীরে। মার্কিণ নেতারা তখন আরো এগিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু সেনাদল ও কোন কোন অফিসারের মেজাজ দেখে তাঁরা আশংকিত হয়ে উঠলেন।

একুশে এপ্রিল, ঊনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে, উত্তর ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে প্রথম বাইলোরুশীয় বাহিনীর সৈন্যরা বার্লিনে ঢুকে পড়লো। এবং শহরের বাইরে যে প্রতিরক্ষা বেষ্টনী গঠন করা হয়েছিল, পূর্বদিকে তার খানিকটা জায়গা ভেঙে দিল। এদেরই কোন কোন দল বার্লিনকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে উত্তরে সোজা চললো পটস্‌ড্যাম ও এল্‌বের দিকে। ইতিমধ্যে প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈন্যরা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে বার্লিনে প্রবেশ করলো। বার্লিনকে কেন্দ্র করে যে বৃত্তাকার আরক্ষা বেষ্টনী গঠন করা হয়েছিল, বিশে এপ্রিল তারা এসে পড়লো তার প্রথম স্তরের কাছে। বার্লিনের দক্ষিণ পশ্চিমে একটি জার্মাণ বাহিনীকে ঘেরাও করার জন্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম চললো। সোভিয়েত সৈন্যরা তখন এল্‌বের দিকে আগ্রসর হচ্ছে। এছাড়া যে জার্মাণ দ্বাদশ বাহিনী আমেরিকানদের জন্যে পথমুক্ত করে এগিয়ে আসছিল, প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীকে তারো একটা আক্রমণ প্রতিহত করতে হলো।

পঁচিশে এপ্রিলের মধ্যে সোভিয়েত সৈন্যরা শত্রুকে বার্লিনে সম্পূর্ণ অবরোধ করে ফেললো। জার্মাণ রাজধানীর অনতিদূরে, দক্ষিণ পশ্চিমে শত্রু পক্ষের তেরো ডিভিসন সৈন্যকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলা হলো। সেইদিনেই প্রথম ইউক্রেনীয় বাহিনীর অগ্রগামী দল এল্‌ব পার হলো টোরগাউতে যেখানে আমেরিকান সেনাদলের সঙ্গে তাদের হলো প্রথম সাক্ষাৎকার। দিন কয়েক পরে এল্‌বের তীরেই রোষ্টক ও শ্‌ভেরিনে সোভিয়েত ও বৃটিশ সেনাদলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলো। ফলে জার্মাণী ও তার সেনাদল কয়েকটা টুকরো হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই, যাদের একের সঙ্গে অন্যের কোন যোগাযোগ নেই। মার্কিণ ও বৃটিশ সামরিক নেতৃত্ব বার্লিন পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন।

শত্রু সৈন্যদের বার্লিনে ঘিরে ফেলার সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের পরিকল্পনা, দারুণ সাফল্যের সঙ্গে সমাধা হলো। জার্মাণ রাজধানীর দিকে সোভিয়েত সেনাদলের এই অগ্রগতি ক্রিমিয়া সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারেই কার্যকরী করা হয়। ফলে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত নেতৃত্বের সমস্ত পরিকল্পনা, চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। তাই, বার্লিন অবরোধ শুধু একটা সামরিক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়, তার আন্তর্জাতিক তাৎপর্যও সমধিক।

মার্কিণ ও বৃটিশ নেতৃত্বের জনস্বার্থ বিরোধী, জনসমর্থনহীন পরিকল্পনা এই অভিযান ব্যর্থ করে দিল।

যুদ্ধশেষের সেই দিনগুলিতে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার নানা সূত্রে হিটলারের বড়ো বড়ো চাঁইদের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরই একটা ছিল, দোসরা নভেম্বর, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ভার্সাইয়ে, আইসেন-হাওয়ারের সদর কার্যালয়ে বার্ণাডোটের দৌত্য। আইসেনহাওয়ারের কাছ থেকে যথাযথ নির্দেশ নিয়ে, ষোলই ফেব্রুয়ারী, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে বার্ণাডোট্ বার্লিনে রিবেনট্রপ্, ক্যালটেনব্রুনার প্রভৃতিদের সঙ্গে দেখা করেন। উনিশে ফেব্রুয়ারী হিমলারের সঙ্গে বার্ণাডোটের আড়াই ঘণ্টাধরে এক আলোচনা হয়। হিমলার মার্কিণ ও বৃটিশ নেতৃত্বের বদ্ধমূল সোভিয়েত বিরোধী ধারণাকে কাজে লাগিয়ে, ইউরোপকে বলশেভিকদের হাত থেকে রক্ষা করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেন। কারণ "পূব রণাঙ্গন ভেঙ্গে পড়লেই" ইউরোপকে বলশেভিকদের হাত থেকে "রক্ষা" করার আর কোন উপায় থাকবে না। পরের বার দোসরা এপ্রিল যখন বার্ণাডোটের সঙ্গে হিমলারের আবার দেখা হয়, তখন তিনি হিটলারকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সরিয়ে দেওয়ার কথা বলেন।

হিমলারের সঙ্গে বার্ণাডোটের শেষ দেখা হয় লুবেকে, চব্বিশে এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের ভোর বেলায়। ঘরের ভিতরে দুটো মোমবাতির আলো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফ্যাশিতন্ত্রের উপরে অন্ধকার তখন জমাট বেঁধে নেমে আসছে। হিমলার বার্ণাডোটকে বলেন : "খুব সম্ভবতঃ হিটলার এতোক্ষণে মারা গেছেন। যদি তিনি এখনো না মরে থাকেন, তাহলে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই সুনিশ্চিতভাবে মারা যাবেন। বার্লিন আজ অবরুদ্ধ, এর পতনে আর মাত্র দিন কয়েক বাকী। জার্মাণীর পরাজয় আমি স্বীকার করছি। এই পরিস্থিতিতে আমি নিজেকে সব দায়িত্বভার মুক্ত বলে মনে করতে পারি। রুশ অভিযানের হাত থেকে জার্মাণীকে যতোটা সম্ভব রক্ষা করতে পারি, তা করার জন্যে আমি পশ্চিম রণাঙ্গনে আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছি, যাতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সেনাদল দ্রুত গতিতে পূর্ব দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পায়। কিন্তু কোন মতেই পূর্ব রণাঙ্গনে আমি আত্মসমর্পণ করতে পারবো না।"[১৮]

বার্ণাডোট হিমলারের প্রস্তাব ত্বরায় সুইডিস সরকারের মারফতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে পাঠিয়ে দিলেন।

পঁচিশে এপ্রিল, ট্রুম্যান, মার্শাল, লিহাই ও অন্যান্য মার্কিণ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা ফোনে হিমলারের প্রস্তাব নিয়ে চার্চিলের সঙ্গে আলোচনা করলেন।[১৯] কিন্তু কোন রকমের আপোষ রফা করার ব্যাপারে হিমলার ছিলেন একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। সেই দিনেই মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার হিমলারের প্রস্তাব সম্পর্কে সোভিয়েত সরকারকে সব কথা জানালেন। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে, "পূর্ব রণাঙ্গনে হিমলারের আত্মসমর্পণ করার অনিচ্ছাটা হলো পশ্চিমী মিত্র পক্ষ ও রাশিয়ার মধ্যে বিদ্বেষ, ভাঙন সৃষ্টি করার শেষ অপচেষ্টা মাত্র।"[২০] সোভিয়েত সরকারের প্রধান প্রত্যুত্তরে বলেন :

"সোভিয়েত রণাঙ্গন সমেত সমস্ত রণাঙ্গনে বিনা সর্তে হিমলারকে আপনার প্রস্তাব মতো আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়াকেই, আমি একমাত্র সঠিক জবাব বলে মনে করি।"[২১]

আটাশে এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে রয়টার হিমলারের প্রস্তাব সম্পর্কে একটা সরকারী বিবরণী প্রকাশ করলেন। হিটলার তাঁর ঘনিষ্ঠতম সহকারীর আচরণ সম্পর্কে এই ধরনের খবর পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে নাৎসী দল থেকে হিমলারের বহিষ্কারের আদেশ দিলেন।

তেইশে এপ্রিল হেরমান গোয়েরিং দক্ষিণ জার্মাণী থেকে রেডিয়োগ্রাম মারফৎ হিটলারকে বলেন যে, অবরুদ্ধ বার্লিনে থেকে হিটলারের সরকার যথা-যথভাবে কাজ করতে পারছে না দেখে, তিনি নিজেকে জার্মাণ রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে ঘোষণা করতে চাইছেন। হিমলারের মতো গোয়েরিংও চেয়েছিলেন আইসেনহাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে, পশ্চিম দিকে একটা যুদ্ধ বিরতির জন্যে বোঝাপড়ায় আসতে। লুফট্‌বাফের পরিষদ সভাপতি, জেনারেল কার্ল কোল্লারকে তিনি সেনাদল ও জনগণের উদ্দেশে প্রচার করার মতো একটা ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রস্তুত করতে বলেন। কোল্লারকে গোয়েরিং কি বলে-ছিলেন, সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন যে, "এই আবেদনপত্র পাঠ করে রুশরা যেন ভাবে যে আমরা যথারীতি পূর্ব ও পশ্চিমের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবো। কিন্তু আমেরিকান ও বৃটিশরা যেন বুঝতে পারে যে আমরা পশ্চিম দিকে আর যুদ্ধ চালাতে চাইছি না। এখন শুধু লড়তে চাই সোভিয়েতের সঙ্গে। আমাদের সৈন্যরা যেন বুঝতে পারে যে যুদ্ধ চলবে, কিন্তু তাদের যেন এই ধারণাও হয় যে যুদ্ধ আর শেষ হয়ে এলো বলে এবং সেই সমাপ্তি ঘটবে আমরা যে অনুকূল

পরিবেশের কথা ভাবতে পেরেছিলাম এতোদিন পর্যন্ত তার চেয়ে অনেক বেশি আনুকূল্য নিয়ে।"[২৩]

হিটলারকে যখন গোয়েরিংয়ের ইচ্ছা সম্পর্কে জানানো হলো, তিনি সঙ্গে সঙ্গে গোয়েরিংকে নাৎসী দল থেকে বহিষ্কৃত করে, গোয়েরিং, কোল্লার ও অন্যান্য-দের গ্রেপ্তার করার জন্যে আদেশ জারী করলেন।

এধারে বার্লিনকে কেন্দ্র করে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলতে লাগলো। শত্রুর তিন হাজার কামান ও মাইনক্ষেপণ অস্ত্র ও আড়াই শ' ট্যাঙ্ক সমেত দু'লক্ষ সৈন্য সেই অবরুদ্ধ শহরের মধ্যে থেকে, বার্লিনকে একটা দুর্গে পরিণত করলো। সৈন্যদের কার্যকরী নেতৃত্ব তখন হিটলারের হাতে, যদিও গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল ভিয়েডলিং (Weidling) আনুষ্ঠানিক অর্থে নেতৃত্ব কর-ছিলেন। যাতে প্রতিটি সৈন্য ও শহরের প্রতিটি নাগরিক, সোভিয়েত সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যোগ দেয় তার জন্যে নাৎসীরা একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করলো শহরের মধ্যে। চব্বিশে এপ্রিল শহরের পথ ঘাট পোষ্টারে পোষ্টারে ছেয়ে গেল। হিটলার এক আদেশনামা জারী করেছেন। যদি কেউ এমন কথা বলে যাতে জার্মাণ প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং এই ধরনের কোন মন্তব্য যদি কেউ সমর্থন করে, তাদের সকলকেই বিশ্বাসঘাতক নামে অভিহিত করা হবে। তৎক্ষণাৎ তাকে গুলী করা কিম্বা ফাঁসীতে লটকানো হবে। পোষ্টারে আরো বলা হলো যে, "যদি কেউ এই সব কাজ বার্লিনের গলিয়েটার (Gauleiter), রাইখমন্ত্রী ডঃ গোয়েবল্‌স অথবা ফুয়েরারের আদেশে ঘটছে বলে তাহলে তারও পরিণাম হবে একই রকম।"

সারা পৃথিবী বার্লিন যুদ্ধের ফলাফল রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো। নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় লেখা হলো, "যে যুদ্ধের আগুন বার্লিনে জ্বালিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তা আবার তার উৎসের কাছে ফিরে এসেছে। যে বিরাট অগ্নিকাণ্ড ইউরোপে দু' হাজার মাইল ছড়িয়ে পড়ে, সমগ্র পৃথিবীতে শেষ পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ড ঘটায়, তা এখন বার্লিনের পথে পথে সর্বত্র দাহ সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। যে গর্বিত সেনাদল একদিন এই শহর থেকে বেরিয়ে, বহু দেশ পদ-দলিত করে, হত্যা, ধর্ষণ লুটতরাজ করে বেড়িয়েছে, তাদেরই অবশেষটুকু আজ তাদেরই ভেঙ্গে পড়া রাজধানীর ইটকাঠের তলায় সমাধি লাভ করছে।"[২৪]

সাতাশে এপ্রিল যুদ্ধ শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থলে ছড়িয়ে পড়লো। শহরেরই

একটা অঞ্চলে সমস্ত শত্রু সৈন্য আটকে পড়লো, যার দৈর্ঘ্য ছিল পূর্ব পশ্চিমে মাত্র পনেরো কিলোমিটার আর প্রস্থে উত্তর থেকে দক্ষিণে দুই থেকে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে। পরের দিনে এই অঞ্চলটাও সোভিয়েত সৈন্যের চাপে তিনটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। ফলে শহরের মধ্যেও নাৎসীদের আর একটি নেতৃত্বের সুবিধা রইলো না। হিটলার বার্লিনের ভূগর্ভস্থ খালের মুখ খুলে সব জলে ভাসিয়ে দেওয়ার আদেশ দিলেন। যে হাজার হাজার নারী, শিশু, আহত, অসুস্থ, সৈনিক ও অফিসাররা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা করলেন না। এরই মধ্যে আটাশে এপ্রিল সোভিয়েত সৈন্যরা পটস্‌ড্যাম দখল করে নিল।

তিরিশে এপ্রিল বিকাল বেলায় সোভিয়েত সৈন্যরা রাইখষ্ট্যাগ প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং দখল করে নেয়। প্রাসাদের শীর্ষে বিজয় পতাকা উত্তোলন করে সোভিয়েত সৈনিক এম. এ. ইয়েগোরোভ ও এম. ভি. কান্তারিয়া। তখন হিটলারের সেই মর্মান্তিক উপলব্ধি ঘটেছে যে আর রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই। এবার সমস্ত নারকীয় অপরাধের হিসাব-নিকাশের দিন এসেছে। মাশুল দিতে হবে। বেলা সাড়ে তিনটের সময়, হিটলারের ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে গুলীর শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। রক্ষী ও অনুচররা শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে দেখলো ফুয়েরার মৃত। বোরম্যানের আদেশে তারা হিটলারের শবদেহ নিয়ে চলে রাজকীয় চ্যান্সেলারী ভবনের অঙ্গনে। হিটলারের মোটর চালক ও রক্ষী অনুচররা সারা দেহে তাঁর গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। চার্চিল লিখেছেন : "হিটলারের চিতা আর রুশদের কামানের ঘন ঘন গভীর গর্জন তৃতীয় রাইখের উপরে এক ভয়াবহ পরিণতির যবনিকা টেনে দিল।"[২৫] এর পর গোয়েবলস প্রথমে তার স্ত্রী, পরে ছেলেমেয়েদের গুলী করে নিজে আত্মহত্যা করলেন।

স্বকৃত অপরাধের বিচার এড়ানোর জন্যে হিটলারের কাপুরুষের মতো মৃত্যু বরণে লণ্ডন ও ওয়াশিংটন স্বস্তি পেল। তাদের আশংকা ছিল যে শেষ পর্যন্ত যদি সত্যিই একান্ত অনভিপ্রেত হিটলারের সেই বিচার অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে অনেক গোপন তথ্যই ফাঁস হয়ে যেতে পারে। চার্চিল স্পষ্টভাবেই সেকথা লিখেছেন, "শেষ পরিণতি সম্পর্কে আমার যা আশংকা ছিল, তার তুলনায় হিটলার যা করলেন তা আমাদের পক্ষে রীতিমতো সুবিধাজনক ছিল।...এতে

আমার কোন সন্দেহ নেই যে বেঁচে থাকলে তাঁকেও ন্যুরেমবার্গ অপরাধীদের সঙ্গেই হাজির থাকতে হতো।"[২৬]

হিমলার ও অন্যান্য ফ্যাশিস্ত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণদের গোপন শলাপরামর্শে, হিটলারের উত্তরাধিকারী অনেক আগের থেকেই স্থির হয়েছিল। মনোনীত করা হলো গ্র্যাণ্ড অ্যাডমিরাল ডোনিৎস্‌কে, যিনি রেইডারের পর নাৎসী নৌবাহিনীর নেতৃত্ব করছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে করেন যে ডোনিৎস্‌ ফ্যাশিতন্ত্রকে অন্ততঃ খানিকটা রক্ষা করতে পারবেন। ডোনিৎস তখন ছিলেন তাঁর সদর কার্যালয় শেলস্‌ভিগ্‌ হোলষ্টেইনের প্লোন শহরে। তিরিশে এপ্রিল সন্ধ্যে ছ'টা পঁয়ত্রিশে রাজকীয় চ্যান্সেলারী থেকে বোরম্যানের স্বাক্ষরিত একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হলো তাঁর কাছে। টেলিগ্রামে বলা হলো: "প্রাক্তন রাইখ্‌ মার্শাল গোয়েরিংয়ের পরিবর্তে হের গ্র্যাণ্ড-অ্যাড্‌মিরাল, ফুয়েরার আপনাকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেছেন। নিয়োগাদেশ পাঠানো হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী আপনি যথাকর্তব্য করবেন।"[২৭] মৃত হিটলারের নামে এই নিযুক্তির কথা ঘোষণা করে, হিটলারোত্তর ফ্যাশিতন্ত্রকে একটা আইনগত ভিত্তি, মর্যাদা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। ডোনিৎস্‌ যিনি হিটলারের মৃত্যুর কোন খবরই জানতেন না, রেডিয়োতে জানালেন:

"ফুয়েরার, আপনার প্রতি আমার আনুগত্য অটল আছে। বার্লিনের অবস্থা উন্নত করার জন্যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো। যদি নিয়তি আমাকে আপনার উত্তরাধিকারী হিসাবে জার্মাণ রাইখের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য করে, তাহলে জার্মাণ জনগণের বীরত্বপূর্ণ, অভাবিতপূর্ব সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আমি যুদ্ধ শেষ করবো।"[২৮]

পয়লা মে সকাল দশটা তিপান্ন মিনিটে বোরম্যানের কাছ থেকে প্লোনে দ্বিতীয় একটা রেডিয়োগ্রাম এসে পৌঁছলো। তাতে বলা হয়েছে: "ইচ্ছা এখন কার্যকরী হয়েছে।" শেলশ্‌ভিগ্‌-হোলষ্টেইন বেতার কেন্দ্র থেকে ঘোষণা করা হলো যে অ্যাড্‌মিরাল ডোনিৎসকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে, পয়লা মে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে হিটলার আত্মহত্যা করেছেন। ডোনিৎস নিজেকে জার্মাণ রাইখের ফুয়েরার ও ভেরমাখ্‌টের সর্বাধিনায়ক হিসাবে ঘোষণা করলেন। তাঁর মনোমত নাৎসীদের নিয়ে তিনি সরকার গঠন করলেন।

মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকমহল "ডোনিৎস সরকারকে" জার্মানীর প্রকৃত শাসন ক্ষমতাধিকারী হিসাবে উপস্থিত করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। ডেনমার্ক সীমান্তের কাছে ফ্লেন্সবার্গের ছোট্ট শহরে ডোনিৎস ও তাঁর দলবল নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করলো। ডোনিৎস ও বৃটিশ অধিনায়ক মন্টগোমারীর মধ্যে এক চুক্তিতে স্থির হলো যে ফ্লেনস্বার্গ অঞ্চল দখল করা হবে না। ফলে "সেই অঞ্চলের বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ ও জোড্লের বাহিনীর মধ্যে একটা সীমান্ত বোঝা-পড়া করে খাড়া করা হলো।" ডোনিৎসের প্রাক্তন সহকারী বলেছেন যে সরকারী ও ভেরমাখ্টের সদর কার্যালয় অক্ষত, অটুট অবস্থায়, কোন বাধা না পেয়ে তাদের কাজ করে যেতে লাগলো। সমস্ত অফিসার ও রক্ষী ব্যাটেলিয়নের লোকেরা যথারীতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এমনকি নয়ই মে তারিখের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ কার্যকরী হওয়ার পরেও এই অবস্থা অপরিবর্তিত থাকে কিছুকাল।[২৯]

প্রায় শ' পাঁচেক নামকরা ফ্যাশিস্ত নেতা, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ডেনিৎস, জোড্ল ও হিমলার, সমবেত হলেন ফ্লেন্সবার্গে। এই নোতুন জার্মাণ সরকারের মধ্যে ছিলেন হিটলারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী শেভেরিন ভন ক্রোসিগ্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে, সমরনায়ক পরিষদের সভাপতি হিসাবে জোড্ল, অর্থমন্ত্রী হিসাবে স্পীর, কৃষিমন্ত্রী বাকে, শ্রমমন্ত্রী শেল্ডটে, শিক্ষামন্ত্রী ষ্টুকার্ট এবং বিচারমন্ত্রী হিসাবে ক্লেম। এই সব মন্ত্রীদের কেউই একথা ভেবে লজ্জা পাননি যে তাঁদের "কর্তৃত্ব" শুধু ফ্লেন্সবার্গ শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মার্কিণ ও বৃটিশ সহযোগিতায় তাঁরা তার এলাকা বিস্তৃত করার আশা রাখতেন। ডোনিৎসের আশে পাশে যে সব নাৎসী নায়করা সেদিন ভিড় করেছিলেন, তাঁদের ভরসা ছিল বৃটিশ আশ্রয়ে থাকার জন্যে তাঁদের অসংখ্য অপরাধ সত্ত্বেও বোধহয় শাস্তি পেতে হবে না।

অনেক কষ্ট করে ডোনিৎস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে এক চুক্তি করলেন, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তখনো যুদ্ধ চালানোর মতো কর্তৃত্ব যেন তাঁর হাতে থাকে। সৈন্যদলের অফিসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেন: "পশ্চিমী শক্তিবর্গের সঙ্গে সহযোগিতা করে তাদের দখলীকৃত এলাকায় আমাদের এখন চলতে হাব, কারণ তাহাদের সঙ্গে থেকে কাজ করেই, রুশদের হাত থেকে আমরা আমাদের দেশ ফিরে পাওয়ার আশা করতে পারি।"[৩০] পয়লা মে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে জার্মাণ জনগণের উদ্দেশ্যে

প্রচারিত ডোনিৎসের বেতার-ভাষণেরও বক্তব্য ছিল তাই। ডোনিৎসের নীতি ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির একেবারে সমগোত্রীয় হয়ে গেল।

পয়লা মে রাতের অন্ধকারে বার্লিনে নাৎসী সৈন্যরা দলে দলে আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। পরদিন বার্লিনের প্রতিরক্ষা সদরদপ্তর আত্মসমর্পণ করলো। দোসরা মে বেলা তিনটের মধ্যে, বার্লিনে নাৎসী সৈন্য অস্ত্রত্যাগ করলো। সোভিয়েত সেনাদল জার্মাণীর সমর বাহিনীকে বার্লিনের মধ্যে পর্যুদস্ত করে, জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রস্থল, জার্মাণ আক্রমণাত্মক পরিকল্পনার জন্মভূমি, জার্মাণ রাজধানীর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করলো। কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে, সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত সেনাদলের এটি হলো একটা ঐতিহাসিক বিজয় সাফল্য।

জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা যে যুদ্ধের সূচনা করেছিল, বার্লিনের পতনে তার পরিসমাপ্তি ঘটলো। নাৎসী আক্রমণকারীরা লাভ করলো তাদের যথাযোগ্য শাস্তি আর সারা পৃথিবীর সমস্ত উচ্চাভিলাষী লোক, যারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, যারা পাশব শক্তির পূজারী, যারা নোতুন বিশ্বযুদ্ধের নেশায় বিভোর, তাদের কাছে বার্লিনের পতন হয়ে রইলো একটা চরম সতর্কতার হুঁশিয়ারী।

॥ তিন ॥

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের এপ্রিল ও মে মাসের গোড়ার দিকে, যখন সোভিয়েত সেনাদল ফ্যাশিস্ত ভেরমাখ্‌টের উপরে শেষ আঘাত হেনে চলেছিল, তখন জার্মাণ দখলদারী সৈন্যদের বিরুদ্ধে একটা নোতুন সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।

বারোই মার্চ, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টি, ইটালীর নাগরিকদের এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্যে আহ্বান জানান। "এই অভ্যুত্থানে শেষ যুদ্ধে সমগ্র জাতি, তার বীর, মহৎ, বিশ্বস্ত, সাহসী, উদ্যমশীল অগ্রগামী অংশ, তার শ্রমিক শ্রেণীর চারিদিকে সমবেত হবে।"[৩১] দশই এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানের নির্দেশাবলী গ্রহণ করলেন। তাতে বলা হয়েছিল "এখন কেবল মাত্র পার্টিজান যুদ্ধ নয়, একটা প্রকৃত অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও তা সুরু করার সময়

এসেছে।"[৩২] পরের দিন পার্টিজানরা জার্মাণদের আক্রমণ করলো। তারা বোরগোতারোয় একটি শক্তিশালী জার্মাণ সেনাদলকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দখল করলো। তেরোই এপ্রিল যে পথে ফ্যাশিস্ত সৈন্যরা উত্তরদিকে সরে যাচ্ছিল, তারা সেই পথের সমস্ত সংযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দিল।

শক্তিমান শ্রমিক শ্রেণীর তিনটি কেন্দ্রে—মিলান, জেনোয়া ও তুরিণে, সশস্ত্র অভ্যুত্থান সুরু করা হলো। জেনোয়াতে তিরিশ হাজারেরও বেশি জার্মাণ সৈন্য আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো।

মিলানের অবস্থা এরই অনুরূপ ছিল। মিলানের শ্রমিকশ্রেণী ফ্যাশিস্তদের একটা বড়ো রকমের ঘাঁটি চূর্ণ করে দিল। মুসোলিনী তখন এই অঞ্চলে ছিলেন। জার্মাণ সৈনিকের ছদ্মবেশে তিনি সুইস সীমান্ত অতিক্রম করে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সাতাশে এপ্রিল পার্টিজানরা একদল পলায়নপর ফ্যাশিস্তদের সঙ্গে তাঁকে ধরে ফেললো। স্বাধীন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও জাতীয় মুক্তির মিলান কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে, মুসোলিনী ও অন্য কয়েকজন ফ্যাশিস্ত নেতাকে গুলী করে হত্যা করা হলো। সারা পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল মহল মুসোলিনীর এই অগৌরবজনক পরিণতিতে দুঃখিত হলো। চার্চিল তাঁর স্মৃতিকথায় এই ফ্যাশিস্ত নেতাকে উচ্ছসিত প্রশংসা করার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো করে তিনি বলেছেন, "যাই হোক অন্ততঃ সারা পৃথিবীকে একটা ইটালীয় ন্যুরেমবার্গ দেখতে হলো না।"[৩৩] পোপ দ্বাদশ পায়াস মুসোলিনীর পরিবারের কাছে শোক প্রকাশ করে, তাদের জন্যে খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিলেন।[৩৪] পরে দ্য গ্যাসপেরীর (de gasperi) মার্কিণ অনুগামী সরকার, মুসোলিনীর বংশধরদের জন্যে একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন।

তুরিনে ইটালীয় শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যুত্থান নাৎসীদের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিরিশে এপ্রিলের মধ্যে শহরটি নাৎসীমুক্ত হয়।

উত্তর ইটালীর শহরগুলি এইভাবে একের পর এক নাৎসীমুক্ত হয়ে যাচ্ছিল। ইটালীর পার্টিজানরা যাতে পলায়নপর জার্মাণরা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাড়ী ঘর ও সংযোগ কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে যেতে না পারে, তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

করেছিল। মুক্ত অঞ্চলে জনগণের ইচ্ছানুযায়ী, জাতীয় মুক্তি কমিটি শাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

দোসরা মে'র মধ্যে সমগ্র ইটালী শত্রুমুক্ত হয়ে গেল। অবশিষ্ট, তখনো জীবিত জার্মাণ সৈন্য, ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদলের আশ্রয় প্রার্থনা করে। জেনারেল কেসেলরিং স্বীকার করেছেন যে এই বিষয় নিয়ে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্ব উনিশ শ' চুয়াল্লিশ থেকেই ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্বের সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চ ও সুইজারল্যাণ্ডের মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে ছিলেন।[৩৫]

এই যুদ্ধে ইটালীতে সর্বসাকুল্যে দু'লক্ষ ছাপান্ন হাজার পার্টিজান, এক হাজার নব্বইটি দলে বিভক্ত হয়ে অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে পাঁচশ' পঁচাত্তরটি দল গ্যারিবল্ডি ব্রিগেড নামে, কমিউনিষ্টদের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে যে সাড়ে তিন লক্ষ লোক জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগ দেয়, তার মধ্যে দু'লক্ষ দশ হাজার ছিল কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য। যুদ্ধে যে সত্তর হাজার নয়শ' তিরিশজন পার্টিজান নিহত হয়, তার মধ্যে বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশ' আটান্নজন ছিল গ্যারিবল্ডি ব্রিগেডের সদস্য।[৩৬] লুইগী লঙ্গো যথার্থই বলেছেন যে, "গণপ্রতিরোধ আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি যুদ্ধ যে ব্যাপকতা আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সাফল্য লাভ করেছিল, তার বেশির ভাগই কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি ও কার্যক্রম, তার সাধারণ সদস্য ও জনগণের সক্রিয়তার জন্যেই সম্ভব হয়েছে।"[৩৭] জার্মাণ হানাদারদের বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম করে, ইটালীয় কমিউনিষ্টরা অর্জন করেছে জনগণের বিশ্বাস আর তাদের আন্তরিক ভালোবাসা।

পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই, জাতীয় মুক্তির জন্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোভাগে থাকার ফলে, কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব দারুণ বেড়ে গেল। ফ্রান্স, ইটালী ও বেলজিয়ামে, কমিউনিষ্টরা শাসনব্যবস্থায় এর ফলশ্রুতি হিসাবে যে নেতৃত্বের ভূমিকা যথার্থই পাওয়ার যোগ্য ছিল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে তা সফল করা সম্ভব হয়নি।

ইটালীর শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসকার, রবার্তো বাত্তাগলিয়া, ইটালীর প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাসের শেষে লিখেছেন :

"অনাগত কাল ইটালীর জীবনে কি বিপর্যয় ডেকে আনবে সেকথা আলোচনার চেষ্টা না করেও বলা যায় যে, ইটালীর ভবিষ্যৎ এই প্রতিরোধ

আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত। গণশক্তির উদ্বোধন ঘটেছে দেশে, তারা মাটির গভীরে প্রবেশ করেছে। তাই ইটালীর জনগণ যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাদের স্বদেশকে ফিরে পেয়েছে, ভবিষ্যতে কোনদিন দেশী অথবা বিদেশী কোন শক্তির আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে, তাকে তারা আর হারিয়ে যেতে দেবে না।"[৩৮]

আটাশে এপ্রিল ত্রিয়েস্তের শ্রমিকরা স্থানীয় জার্মাণ সেনাদলকে আক্রমণ করে, ছ'দিনের যুদ্ধেই শহর দখল করে নিল। ত্রিয়েস্তের দিকে ধাবমান যুগোশ্লাভ গণমুক্তি ফৌজ তাদের সাহায্য করলো যথেষ্ট। কিন্তু মার্কিণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ত্রিয়েস্তের অবস্থানগত গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই দোসরা মে বৃটিশ ট্যাঙ্ক হুড়মুড় করে শহরে ঢুকে পড়লো। মার্কিণ বোমারু বিমান শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চলে বোমাবর্ষণ করতে লাগলো। এই অঞ্চলে আরো জোরদার ঘাঁটি করার জন্যে চাচিল ফিল্ড মার্শাল আলেকজাণ্ডারে কাছে, "এখানে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ, প্রচুর আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করে, ঘনঘন বিমান বাহিনীকে শহর উপর টহল দিয়ে বেড়ানোর জন্যে" সুপারিশ করে পাঠালেন।[৩৯] তাছাড়া আশেপাশে যথেষ্ট নৌ-বহরও সদাসর্বদা রাখার তাঁর ইচ্ছা ছিল। আলেকজাণ্ডার মুসোলিনীর ফ্যাশিপন্থী আইনগুলি আবার চালু করে ত্রিয়েস্তে একটা ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন।

এই সময়ের মধ্যে জার্মানীতেও কয়েকটি আন্দোলন হয়। তার মধ্যে এগারোই এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে বুকেনভাল্ডে বন্দীদের আন্দোলনই সমধিক উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত সফল হয়েছিল।

॥ চার ॥

ইঙ্গ-মার্কিণ নেতৃত্ব তাঁদের জনবিরোধী, সোভিয়েত বিরোধী নীতির অনুসরণ করতে গিয়ে, যুদ্ধক্ষম জার্মাণ বাহিনীগুলিকে, সোভিয়েত সেনাদলের প্রচণ্ড আক্রমণ ও নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে, তখন প্রায় উঠে পড়ে লেগেছিলেন। জার্মাণীতে নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলে তাদের আশ্রয় দিয়ে, তাঁরা আবার সময় সুযোগ মতো ভেরমাখ্‌টকে পুনরুজ্জীবিত করার ফিকিরে ছিলেন। •

বার্লিনের উত্তর পশ্চিমে যেসব জার্মাণ সৈন্য ছিল তারা দ্রুত শ্লেসভিগ্-হোলষ্টেইনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তাদের নেতা, ফিল্ড মার্শাল বুশ (Busch) তাড়াতাড়ি ফ্লেন্‌সবার্গে চলে এলেন। সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনের অপর একপ্রান্তে, চেকোস্লোভাকিয়ার আশে পাশে, ফিল্ডমার্শাল শোয়ের্ণারের (Schoerner) অধীনে একটি জার্মাণ বাহিনী আটকে পড়েছিল। অবশেষে তারা পার্বত্য ভূপ্রকৃতির সুযোগ নিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসে, সোভিয়েত সেনাদলের অগ্রগতিতে বাধা দিতে থাকে। ইতিমধ্যে তারা আইসেনহাওয়ারের কার্যালয়ের সঙ্গে আত্মসমর্পণের বিষয়ে কথাবার্তা সুরু করে। মধ্যবর্তী বাহিনীর প্রধান, লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল ভন্ নাটজ্‌মার (Natzmer) এই ব্যাপারে আলোচনার জন্যে ফ্রেনসবার্গে উপস্থিত হন। এসবই ঘটেছিল অ্যাডমিরাল ডোনিৎসের পরিকল্পনা ও নির্দেশমতো। পয়লা মে সৈন্যবাহিনীর প্রতি এক নির্দেশনামায় তিনি বলেন, "বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে আমি জার্মাণ ভেরমাখ্‌টের সমস্ত সংস্থার উপর চরম নিয়ামকের ক্ষমতা গ্রহণ করছি।......বলশেভিকদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে বৃটিশ ও আমেরিকানরা আমায় যতোটুকু বাধা দেবে, তাদের বিরুদ্ধে আমি কেবল সেখানেই লড়াই করতে বাধ্য হবো।"[৪১]

দোসরা মে ডোনিৎস্ সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কাছে আত্মসমর্পণ দ্রুততর করে, সোভিয়েত সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। আত্মসমর্পণ পর্ব সমাধা করতে হবে গোপনে, সোভিয়েত নেতৃত্বকে তা জানতে দেওয়া যাবে না।[৪২] পরের দিন, হামবুর্গের দক্ষিণে লুনেবার্গে মণ্টগোমারীর সদর কার্যালয়ে ফিল্ড মার্শাল ভন্ বুশের প্রতিনিধিরা এসে হাজির হলো। তাদের নেতা হয়ে এলেন অ্যাডমিরাল হান্স ভন্ ফ্রিয়েডেবার্গ। মণ্টগোমারী প্রথমে সোভিয়েত সেনাদলকে না জানিয়ে কোন কিছু করতে আপত্তি করলেন। কারণ তাঁর মতে সোভিয়েত নেতৃত্বের কাছেই বুশের আত্মসমর্পণ করা ন্যায় সঙ্গত। পরে অবিশ্যি তিনি রাজী হয়ে জানালেন যে, সমস্ত বাহিনী, দল সংস্থা বা ব্যক্তিগত ভাবে কোন সৈনিক সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের কাছে ধরা না দিয়ে, বৃটেনের অধীনে বন্দীদশা পছন্দ করবে, তিনি তাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে সম্মত আছেন।[৪৩]

মণ্টগোমারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিষয়ে ফ্রিয়েডেবার্গ, চৌঠা মে

ডোনিৎস্, ক্রোসিগ কাইটেল ও জোড্লের উপস্থিতিতে, ফ্লেনস্বার্গে এক বৈঠকে যা কিছু জ্ঞাতব্য জানালেন। তাঁকে যথাযথ কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার ক্ষমতা দিয়ে আবার পাঠানো হলো মন্টগোমারীর দপ্তরে। পাঁচই মে সকাল আটটায় বুশের আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত সর্তাবলী কার্যকরী হলো। উল্লসিত ডোনিৎস্ ও তাঁর সঙ্গী সাথীরা সেইদিনই ভেরমাখ্টের উদ্দেশে এক নোতুন আদেশ জারী করলেন। তাতে বলা হয়েছিল :

"যেহেতু পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা নিতান্ত অর্থহীন হয়ে গেছে, তাই আমরা উত্তর পশ্চিম জার্মাণী, ডেনমার্ক ও নেদারল্যাণ্ডে অস্ত্র পরিত্যাগ করছি। কিন্তু পূর্বদিকে যুদ্ধাবস্থা চলছে।"[৪৪]

চৌঠা মে'র বৈঠকে ফ্রিয়েডেবার্গকে, মন্টগোমারীর সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর, রেইম্সে গিয়ে আইসেনহাওয়ারের সদর কার্যালয়ে, মার্কিণ কর্তৃপক্ষের কাছে জার্মাণ সৈন্যের দক্ষিণাঞ্চলীয় বাহিনী গুলির আত্মসমর্পণের সর্তাবলী নিয়ে আলোচনা করতে বলা হলো। এই নোতুন চুক্তির পথ বাধামুক্ত করার জন্যে ডোনিৎস পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে, সমুদ্র ডুবো জাহাজের আক্রমণ বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। তাছাড়া অধিকৃত অঞ্চলে ফ্যাশিস্তদের ভেরেভোল্ফ (Werewolf) নামে যে গোপন সংস্থা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তাদেরও নিষিদ্ধ করে দিলেন।[৪৫]

আইসেনহাওয়ারের সদর কার্যালয়ে নায়ক পরিষদের প্রধান লেফ্টেন্যান্ট জেনারেল বেডেল স্মিথ ফ্রিয়েডবার্গের সঙ্গে দেখা করেন। সেই দিনই বার্লিন থেকে অপসারিত নাৎসীদের মিলিটারী অ্যাকাডেমীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন মার্কিণ সামরিক নেতৃত্বের পক্ষে জেনারেল প্যাটন।[৪৬]

জনানুমোদিত হবে না আশংকা করে মার্কিণ সরকার আত্মসমর্পণকারী প্রতিটি জার্মাণ দল বা সংস্থার সঙ্গে পৃথক পৃথক লিখিত চুক্তি সম্পাদন না করে সমগ্র জার্মাণ বাহিনীর আত্মসমর্পণ দাবী করলেন। বিষয়টির খুঁটিনাটি নিয়ে হোয়াইট হাউসে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান ও তাঁর পরামর্শদাতাদের মধ্যে আলোচনা শেষ করা হোল। চার্চিলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে এই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত গৃহীত হলো যে সমগ্র জার্মাণ বাহিনী যদি মার্কিণ ও বৃটিশ সেনাদলের কাছেই শুধু আত্মসমর্পণ করে, তাতে ইঙ্গ-মার্কিণদের সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীর মর্যাদায় আঘাত লাগবে।[৪৭]

ডোনিৎস্ আপত্তি করলেন। কর্ণেল জেনারেল জোডলকে রেইমসে পাঠানো হলো ফ্রিয়েডেবার্গকে সাহায্য করার জন্যে। সর্তাবলী নিয়ে তুমুল টানাটানি চললো। শেষ পর্যন্ত ডোনিৎস বুঝতে পারলেন যে সাধারণভাবে ব্যাপক একটা আত্মসমর্পণ চুক্তি হলে, ফ্যাশিস্ত সেনাদলের বেশির ভাগ অংশকেই রক্ষা করা যাবে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডোনিৎস সরকারের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। সাতই মে, রাত দেড়টায় জোডল আত্মসমর্পণ সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বাক্ষর করার জন্যে ডোনিৎসের নির্দেশ পেলেন। তৎক্ষণাৎ সমস্ত জার্মাণ সেনাদলের কাছে বেতারে এই আদেশ পাঠানো হলো যে :

"প্রাচ্য প্রতিপক্ষের মুখোমুখি সংগ্রাম রত সমস্ত রণাঙ্গণ থেকে সমস্ত সৈন্যকে যতো তাড়াতড়ি সম্ভব পশ্চিম দিকে সরিয়ে আনতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে সৈন্যদের সোভিয়েত সেনাদলের সঙ্গে লড়াই করে তাদের পথ করে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে।"[৪৮]

রেইমস্-এর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন জোড্‌ল। চুক্তিতে বলা হলো যে জার্মাণ সেনাদলের প্রধান সেনাপতি জেনারেল জোডল, ডোনিৎস সরকারের পক্ষে সমস্ত জার্মাণ সৈন্যদের মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত সৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করাবেন। রেইমস্ চুক্তির লক্ষ্য ছিল ডোনিৎস সরকারকে একটা আইনগত মর্যাদার ভিত্তি দিয়ে জার্মাণ ফ্যাশিস্ত চক্রকে রক্ষা করা। আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল এর জার্মাণীর পরাজয়ে সোভিয়েতের অবদান যতোদূর সম্ভব কম করে দেখানো। সেটা বৃটিশ ও মার্কিণ সরকারের সোভিয়েত বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে ছিল একেবারে সঙ্গতিপূর্ণ। উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে মে মাসের গোড়ার দিকে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে সোভিয়েত বিরোধী ঝোঁক দৃশ্যতঃই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চার্চিলের কাজে ও কথায় তা হয়ে উঠেছিল নিতান্ত প্রকট। রোজনামচায় তিনি লিখেছেন : "এরই মধ্যে আমার চোখে নাৎসী শত্রুর স্থান নিয়েছে সোভিয়েত শত্রুতার আশংকা।[৪৯] মন্টগোমারীর কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে তিনি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে, মজুদ করে রাখতে" নির্দেশ দিলেন যাতে "প্রয়োজন হলেই সহজে তা আবার জার্মাণ সৈন্যদের মধ্যে বিলি করা যায়।"[৫০] জার্মাণ অস্ত্রশস্ত্র প্রসঙ্গে চার্চিল আইসেন-হাওয়ারের কাছে এক তারবার্তায় বলেন যে, "এমন কি এখনই ফ্রান্স ও ইটালীতে বিশেষ করে ইটালীতে, সেগুলি প্রয়োজন হতে পারে। এই বক্তব্য থেকে

মার্কিণ বৃটিশ শাসকরা ফ্রান্স ও ইটালীতে গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে সেই সব জার্মাণ অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাদল যে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করছিলেন, এছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না।

সোভিয়েত সরকার রেইমস্-এর চুক্তি মানতে অস্বীকার করলেন। তার আরো যে একটা বড়ো কারণ ছিল, তা হলো এই যে, ক্যাসাব্ল্যাঙ্কায় ঘোষিত বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের নীতি থেকে এই চুক্তি বিচ্যুত হয়েছে। তাঁরা দাবী করলেন পরাজিত বার্লিনে সরকারীভাবে বিনাসর্তে আত্মসর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করতে হবে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের চক্রান্ত ব্যর্থ হলো। তারা বাধ্য হলো সোভিয়েতের দাবীতে সম্মত হতে।

নয়ই মে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের ভোর বেলায় বার্লিনে জার্মাণীর বিনা সর্তে আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষরিত হলো। দলিলের মুখবন্ধে লেখা হয়েছিল:

"আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারীরা জার্মাণ সর্বোচ্য পরিষদের নামে, লাল ফৌজের সর্বোচ্য পরিষদ ও সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষীয় অভিযাত্রী বাহিনীর কাছে, স্থল, জল, অন্তরীক্ষে আমাদের সমস্ত সেনাবাহিনী এবং বর্তমানে জার্মাণ সামরিক নেতৃত্বের অধীনে যে সেনাদল আছে, তাদের সকলের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হচ্ছি।"

এই দলিলে স্বাক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটলো। হিটলার জার্মানী ও তার তাঁবেদার রাষ্ট্রগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন লাভ করেছে তখন এক বিরাট, ঐতিহাসিক বিজয় সাফল্য। জার্মাণ সেনাদলকে ধ্বংস করে, সোভিয়েত সেনাবাহিনী জার্মাণ জাতিকেও হিটলারের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিল।

জার্মাণদের প্রতি ব্যবহারে, বিশেষ করে বার্লিনের নাগরিকদের প্রতি ব্যবহারে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার মুক্তিব্রতী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়নি। সোভিয়েত সরকারের নির্দেশক্রমে জার্মাণীর জনগণকে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করার দায়িত্ব নিয়ে, এ. মিকোয়ান জার্মাণীতে এলেন। সেনাদলের মজুদ খাদ্য ভাণ্ডার থেকে ষাট লক্ষ পাউণ্ড ময়দা ও অন্যান্য খাদ্যশস্য ও নানা ধরনের উৎপাদিত দ্রব্য, সোভিয়েত সরকার জার্মাণ জনগণের জন্যে মঞ্জুর করলেন। মে মাসের শেষেই বার্লিনের তিরিশ লক্ষ অধিবাসীকে রেশন

কার্ড দেওয়া হলো এবং সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ খাদ্য বণ্টনের সঙ্গে সঙ্গে, মড়ক মহামারী প্রতিষেধক নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সারা শহরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনলেন। জুন মাসের গোড়াতেই বার্লিনের ভূগর্ভস্থ অঞ্চল স্বাভাবিক হয়ে গেল, ট্রাম চলতে লাগলো, সেতুগুলির সংস্কার করা হলো। শহরে জল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতে লাগলো।

যেখানে যেখানে কমিউনিষ্টদের গোপন সংগঠনগুলি তখনো টিকে থাকতে পেরেছিল, সেখানে তারা চালাতে পেরেছিল ফ্যাশিবাদের নগ্নস্বরূপের বিরুদ্ধে প্রচার, সেখানকার জার্মাণ জনগণ সোভিয়েত সেনাদলকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই রকমই একটা জায়গা হলো আইস্লেবেন। এখানকার মানুষ সযত্নে ক্রিভোয় রোগ খনি শ্রমিকদের প্রদত্ত লাল পতাকা লুকিয়ে রেখেছিল। তারাই অগ্রগামী সোভিয়েত সেনাদলের সম্বর্ধনায় লেনিনের একটা স্মৃতি স্তম্ভ স্থাপন করে। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন :

"সারা বাজারে যেন লাল পতাকার সমুদ্র। একটা নোতুন গণতান্ত্রিক সংস্থা, শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধিমূলক সংস্থা, শহরের প্রাচীনতম সভাকক্ষে কার্যভার গ্রহণ করেছে। তার মাথার উপরে উড়ছে ক্রিভোয় রোগ খনি শ্রমিকদের প্রদত্ত পতাকা। শহরের পুরানো কমিউনিষ্ট সদস্য অটো ব্রোজোউস্কি (Otto Brozowski) অনেক যত্নে এটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। কয়েদখানায় নিয়ে গিয়ে অনেক অত্যাচার করা সত্ত্বেও এর কথা প্রকাশ করেননি ফ্যাশিস্তদের কাছে। শহরের স্কোয়ারের মধ্যে রয়েছে লেনিনের একটি মূর্তি। ফ্যাশি আমলে এবং মার্কিণ সেনাদলের অধিকারে থাকার সময়ে এটি সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। লেনিনের স্মৃতি স্তম্ভ এটাই প্রমাণ করে দিল যে ফ্যাশিতন্ত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতেও এখানে জার্মাণীর এই অঞ্চলে আলো একেবারে নিভে যায়নি। এখানে আলো জ্বলেছে আর সেই আলো হলো সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার আলো। এখানকার মানুষ প্রমাণ করে দিল যে আর্ণেষ্ট থায়েলম্যানের পার্টির পতাকা এখানে ধিকৃত হয়ে যায়নি, এরা সগৌরবে তাকে ঊর্ধ্বে ধরে রেখেছে।"[৫২]

॥ পাঁচ ॥

বার্লিনে আত্মসমর্পনের কথা শোয়েৰ্ণারের সদরকার্যালয়ে প্রথমে বিশ্বাসই করা হয়নি। মার্কিণ ও বৃটিশ সরকারের নীতি অনুসরণ করে, শোয়েৰ্ণার একটি বিবৃতি দেন। সেটি হলো:

"শত্রু বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হচ্ছে যে জার্মাণ সাম্রাজ্যের সরকার বিনাসর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। এটা কখনো সত্যি হতে পারে না। এটা স্পষ্টতই হলো শত্রুর একটা প্রচার কৌশল। তারা আমাদের সৈন্যদের প্রতিরোধ শক্তিকে ভেঙ্গে দুর্বল করে দিতে চাইছে। সরকার কেবলমাত্র পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বন্ধ করেছেন।"

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটিশ সামরিক নেতৃত্ব স্থির করলেন যে তাঁরা সৈন্য দলকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাঠিয়ে, শোয়েৰ্ণারের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবেন এবং প্রাগ দখল করার চেষ্টা করবেন। চার্চিল এ বিষয়ে জোর করতে লাগলেন। তিরিশে এপ্রিল তিনি ট্রুম্যানকে, "প্রাগ দখল করে, পশ্চিম চেকোশ্লোভাকিয়া ভূখণ্ডের যতোটা সম্ভব দখল করার কথা" বলেন।[৫৩] সাতই মে আইসেনহাওয়ারের কাছে এক তারবার্তায় তিনি প্রাগ পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন।[৫৪]

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে মে মাসের গোড়ার দিকে জেনারেল প্যাটনের সেনাদল চেকোশ্লোভকিয়ায় ঢুকে পড়ে। যে সব শহর মার্কিণ সৈন্যরা দখল করে, যেমন পজেন (Plzen), সেখানকার জাতীয় কমিটিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। যে সমস্ত চেক্ নাগরিক নাৎসী আমলে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল, তাদের মতো লোকের সাহায্যেই মার্কিণ কর্তৃপক্ষ একটা দখলদারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। পজেনে ঢোকার আগে মার্কিণ বিমান থেকে শহরের উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। এর ফলে শহরের দুই-তৃতীয়াংশ বাড়ীঘর হয় সম্পূর্ণ নয়তো রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ছয়ই মে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে মার্কিণ সামরিক নেতৃত্বের পদস্থ কর্মচারীরা, শোয়েৰ্ণারের আবাসস্থল, ভেলিশোভ্কা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন। তাঁরা শোয়েৰ্ণারের কাছ থেকে এগুলি জেনে যান যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করতে তিনি সম্মত আছেন। আপাততঃ তিনি সোভিয়েতের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন এবং পরিশেষে মার্কিণ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন।[৫৫]

স্বদেশের রাজধানী শত্রুমুক্ত করে, পলায়নপর জার্মাণ সৈন্যদের পথ রোধ করতে উৎসুক চেকোস্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিক মানুষেরা, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে, পাঁচই মে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে হিটলারী দখলদারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটায়। বৈপ্লবিক রক্ষীবাহিনীর ছোট ছোট দল এবং প্রাগ নাগরিকদের যোদ্ধদলগুলি শত্রুদের সঙ্গে লড়তে সুরু করে। সব জায়গাতেই কমিউনিষ্টরা অগ্রণী ভূমিকা নেয়। কিন্তু শোয়ের্ণারের সৈন্যদের চাপে তারা অতিষ্ট হয়ে ওঠে। চেক্ রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করে তাঁর সৈন্যরা। সেই আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে, প্রাগের দেশপ্রেমিক নাগরিকরা বেতারে জরুরী সাহায্যের জন্যে আবেদন প্রচার করেন।

যখন জার্মাণ-ফ্যাশিস্ত সৈন্যরা প্রাগ আক্রমণ করলো, তখন মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ শহর পর্যন্ত না এগিয়ে এসে, থেমে গেলেন। মার্কিণ শাসকদের লক্ষ্য ছিল যে প্রাগের দেশপ্রেমিকদের আন্দোলন হিটলারী সেনাদলের হাতেই খতম হয়ে যাক্। তারপর জার্মাণ নেতৃত্বের সঙ্গে চুক্তিমতো চেক্ রাজধানীতে ঢুকে নাৎসী সৈন্যদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করলেই হবে।

তখন চেক্ দেশপ্রেমিকদের সাহায্য করতে এসে দাঁড়ালো সোভিয়েত ইউনিয়ন।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের মে মাসের গোড়ায় শোয়ের্ণারের অধীনস্থ বাহিনীই ছিল ফ্যাশিস্ত সেনাদলের অবশিষ্ট প্রতিরোধ শক্তিক্ষম বাহিনী। নয় লক্ষ সৈন্য ও অফিসার ছিল এতে। সোভিয়েতের সর্বোচ্য সামরিক পরিষদ তাই স্থির করলেন যে বার্লিন অভিযান পরিকল্পনা সম্পূর্ণ শেষ করার আগেই এদের মুখোমুখি হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে, প্রথম, চতুর্থ ও দ্বিতীয় ইউক্রেনীয় বাহিনীর সৈনিকদের, শোয়ের্ণারের উপর প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করার জন্যে পুনর্গঠিত করা হলো। চেকোস্লোভাকিয়ার সেনাদল ছিল এই চতুর্থ ইউক্রেনীয় বাহিনীর অংশ বিশেষ। প্রাগের ঘটনাবলী সোভিয়েতের সিদ্ধান্তকে আরো দ্রুত রূপায়ণের পথে নিয়ে গেল। সোভিয়েত সেনাদল আক্রমণ শুরু করলো ছয়ই মে।

সাতই মে জার্মাণ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে ফাটল ধরিয়ে প্রথম ইউক্রেনীয়

বাহিনীর সাঁজোয়া দল দ্রুত ওর পর্বতমালা পার হয়ে, নয়ই মে' ভোর চারটায় সময় প্রাগ পৌঁছলো।

সোভিয়েতের এই দ্রুত আক্রমণ ধারা জার্মাণ ও আমেরিকানদের পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিল। পলায়নপর শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে পশ্চিমমুখী অভিযানে সোভিয়েত সেনাদল, চেকোশ্লোভাকিয়ায় মার্কিণ সৈন্যবাহিনীর কাছাকাছি এসে গেল দশই, এগারোই মে। তখন জেনারেল শোয়ের্ণারের সৈন্যরা প্রায় সমস্ত রণাঙ্গনেই আত্মসমর্পণ করছে। প্রাগ অভিযানে সোভিয়েত সেনাদল প্রায় আট লক্ষ নাৎসী সৈন্যকে বন্দী করে। শত্রু সৈন্যের ক্ষুদ্র একটি অংশ ছাড়া, পশ্চিম দিকে বেশি কেউ পালাতে পারেনি। বারোই মে, একটি বিমানে উড়ে গিয়ে, ফিল্ড মার্শাল শোয়ের্ণার স্বয়ং মার্কিণ কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

সোভিয়েতের এই তড়িৎগতি আক্রমণ প্রাগ শহরকে রক্ষা করলো ধ্বংস লীলার হাত থেকে। আর বাঁচিয়ে দিল প্রাগের বীর অভ্যুত্থানকারীদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। চেকোশ্লোভাকিয়ার মুক্তি সম্পূর্ণ হলো। আর ব্যর্থ হয়ে গেল মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাগ দখল করে, সমগ্র চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করার চক্রান্ত। সোভিয়েতের চমকপ্রদ প্রাগ অভিযান ও শোয়ের্ণারের সেনাবাহিনীর সামরিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে সংগ্রামের শেষ হয়ে গেল।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসৃত নীতির মৌল পার্থক্য, আরেকবার প্রকট হয়ে উঠলো এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। চেক্ ইতিহাসবিদ্‌রা লিখেছেন : "মার্কিণ সেনাদলের নেতৃত্ব যুদ্ধের শেষের দিকে নাৎসী জঙ্গীবাদের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে এমনই মগ্ন হয়েছিলেন যে, হিটলারী দখলদারী থেকে আমাদের শহর মুক্ত করার কোন ইচ্ছাই তাঁদের ছিল না। সে ব্যাপারে কোন আগ্রহ তাঁরা দেখাননি। বরং হিটলারী নেতৃত্বের সঙ্গে চুক্তি করে, তারই সর্তানুযায়ী তাঁরা, মোরাভিয়ার নাৎসী জল্লাদ শোয়ের্ণারকে, সদা সংগ্রামরত সোভিয়েত সেনাদলের অগ্রগতি রোধ করার জন্যে সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। শোয়ের্ণারকে তাঁরা পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করার সুযোগ দেন এবং দেখেন যাতে শোয়ের্ণার সারা দেশে যে বৈপ্লবিক আন্দোলন বিস্তারলাভ করছে তাকে দমন করতে পারেন। শুধু তাই

নয়, কে. জি. ফ্রাঙ্ক মার্কিণ কর্তৃপক্ষের কাছে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিল, সেই প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্যেও তাকে যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়। তা হলো মার্কিণীদের পক্ষে সেই জঘন্য কাজের অনুষ্ঠান করা—বন্দী কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দকে হত্যা।"[৫৬]

সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আন্তর্জাতিক কর্তব্যের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠায় কিন্তু চেকোশ্লোভাকিয়ার জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছে। সেই দায়িত্ব হলো চেকোশ্লোভাকিয়ার নাৎসী অধিকার থেকে মুক্তি।

॥ ছয় ॥

সামরিক অর্থে জার্মাণ ফ্যাশিবাদ তখন বিধ্বস্ত। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থে তাকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে, জার্মাণীর ফ্যাশিতন্ত্রের উত্তরাধিকারী ডোনিৎস্ "সরকার"-কে দূর করতে হবে। ডোনিৎসের পিছনে ইঙ্গ-মার্কিণদের যে প্রচুর সমর্থন আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনে (Allied Control Commission) পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির আচরণের মধ্যে। এই কমিশন ফ্লেন্সবার্গে তেরোই মে থেকে কাজ করতে সুরু করে। ডোনিৎস সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থক, ইতিহাসবিদ লুড্ডে নিউর‍্যাথ (Ludde-Neurath) লিখেছেন : "মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে ফ্লেন্সবার্গে স্বাগত জানানো হয়।"[৫৭]

কমিশনের বৃটিশ ও মার্কিণ সদস্যরা, সোভিয়েত সদস্য এসে পৌঁছবার পূর্বেই ডোনিৎস্ সরকারের সঙ্গে নোতুন চুক্তি করতে চাইলেন তাড়াতাড়ি। ডোনিৎস সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়ে, তাঁরা কাইটেলের বদলে জোড্লকে জার্মাণ সামরিক পরিষদের প্রধান নিযুক্ত করালেন। এই পদে অধিষ্ঠিত হয়ে জোড্ল ভেরমাখ্টের সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক নেতৃত্বের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পর্কের বিষয়গুলি সমাধা করে ফেললেন। শুধু তাই নয় মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের বৃটিশ ও মার্কিণ সদস্যরা, সরকারীভাবে যখন ডোনিৎসের সঙ্গে দেখা করলেন, তখন ডোনিৎস তাঁর তরফ থেকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তাঁর "পশ্চিমী দৃষ্টিভঙ্গি" অক্ষুণ্ণ রাখবেন।[৫৮] তিনি তাঁর অতিথিদের একথাই বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যৌথ সংগ্রাম একান্ত জরুরী। লুড্ডে-নিউর‍্যাথ বলেছেন : "নিশ্চয়ই এই কথাগুলি এই দুই জেনারেলের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।"[৫৯]

ইয়াল্টা চুক্তি ভঙ্গ করে ষোলই মে, চার্চিল সরকারীভাবে ঘোষণা করেন যে, "জার্মাণী শাসনের বোঝা বহন করার কোন ইচ্ছা বৃটেনের নেই।" অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, তিনি ডোনিৎস "সরকার"কে জার্মাণীর শাসনভার ছেড়ে দিতে চাইছিলেন।[৬০] সেইদিনেই মিত্রপক্ষীয় সদর সামরিক কার্যালয়ের একটি ঘোষণা রয়টারের মারফতে প্রচারিত হলো যে, মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে "ডোনিৎস ও অন্যান্য জার্মাণ অফিসারদের, জার্মাণ সেনাদলের খাওয়া, চিকিৎসা ও নিরস্ত্রীকরণের জন্যে নিয়োগ করা হয়েছে।"[৬১] এই ঘোষণাকে, ডোনিৎস "সরকারের" কাজগুলির একটা আইনসঙ্গত রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বলা যায়। শ্রমিক দলের ডেইলী হেরাল্ড পত্রিকা, ডোনিৎসের প্রতি ইঙ্গ-মার্কিণদের আচরণ "ক্ষতিকর" বলে মন্তব্য করে এবং এ কথাই বলার চেষ্টা করে যে এ সবের লক্ষ্য হলো জার্মাণীতে একটা কুইসলিং সরকার প্রতিষ্ঠা করা।

সতেরোই মে, মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সোভিয়েত সদস্য, ফ্লেন্সবার্গে এসে পৌঁছলে, অবস্থার গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। সোভিয়েত মুখপাত্র স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, ডোনিৎস "সরকার" ভেঙ্গে দিতে হবে। সোভিয়েতের অনমনীয় মনোভাবে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে জনমত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাছাড়া খোদ জার্মাণীতেই ডোনিৎস "সরকারের" প্রতি জনসমর্থন না থাকায়, তারা একে "অশরীরী সরকার" বলতো, ডোনিৎসের অদৃষ্টের চাকা থেমে গেল। তেইশে মে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, ডোনিৎস "সরকার" ভেঙ্গে দেওয়া হলো। এর সদস্যদের তারপর গ্রেপ্তার করা হলো যুদ্ধবন্দী হিসাবে। এদের সঙ্গেই আরো তিনশ' জন নাৎসী অফিসারদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই দলে হিমলারও ছিলেন। বন্দী অবস্থায় তিনি মন্টগোমারীর সঙ্গে দেখা করতে চান। কারণ তিনি বলেন যে তিনি ও মন্টগোমারী সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা নোতুন যুদ্ধ সুরু করার জন্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়ায় এসেছেন এবং সেই উদ্দেশে তিনি এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি এস. এস. ডিভিসন সংগঠিত করে ফেলেছেন। কিন্তু হিমলার যখন দেখলেন যে স্বকৃত অপরাধের হাত থেকে শাস্তি এড়াবার কোন সুযোগই তাঁর নেই, তখন চব্বিশে মে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করলেন।

জার্মানী আত্মসমর্পণ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার দেশ বিভাগ করে, পশ্চিম জার্মাণীতে নিজেদের ইচ্ছা মতো কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে

উদ্যোগ করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপে একটা সামরিক উদ্যোগ গ্রহণের ঘাঁটি তৈরী করে রাখা। ক্রিমিয়া সম্মেলনের চুক্তিগুলি প্রতিপালন করতে গিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মাণীর ঐক্য বজায় রাখার জন্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। জার্মাণীতে চতুঃশক্তি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছিল তারই একটা পথ।

যুদ্ধ যখন চলছিল তখনই মার্কিণ ও বৃটিশ সৈন্যরা ইয়াল্টা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জার্মাণীর যে অঞ্চল সোভিয়েত কর্তৃত্বাধীনে থাকা উচিত, সেখানে প্রবেশ করে। সোভিয়েত সরকার ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের অপসারণ দাবী করেন। জার্মাণীর ভূখণ্ডের উপরে যতোদূর সম্ভব ইঙ্গ-মার্কিণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায়, সেই প্রচেষ্টায় চার্চিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা বড়ো রকমের বিরোধের ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলেন। চৌঠা মে তিনি স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে যোগদানরত ইডেনের কাছে এক তারবার্তা পাঠিয়ে বলেন যে, "মার্কিণ সেনাদলের প্রস্তাবিত অপসারণের অর্থ হবে তিনশ' থেকে চারশ' মাইল বিস্তৃত ও পশ্চিমে একশ' কুড়ি মাইল প্রসারিত এক অঞ্চলে সোভিয়েত আধিপত্যের সম্প্রসারণ। এরকম ঘটনা যদি ঘটে তাহলে তাকে ইতিহাসের এক চরম দুঃখজনক পরিণাম বলে মনে করতে হবে।"[৬২] তিনি ইডেন ও মার্কিণ সরকারের মধ্যে তাঁর মতাবলম্বী মানুষদের এ বিষয়ে একটা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যে সক্রিয় হতে বললেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একথাও জানান যে, "এখন ইঙ্গ-মার্কিণ সেনাদল ও তাদের বিমান বাহিনী যথেষ্ট শক্তিশালী থাকতে থাকতে, যুদ্ধোত্তরকালে তাদের ভেঙ্গে দেওয়া অথবা জাপানী যুদ্ধের প্রয়োজনে কোথাও নিয়োগ করার পূর্বে, এই মুহূর্তে আর বেশী দেরী না করে, সব কিছুর একটা সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হওয়া প্রয়োজন।"[৬৩]

চার্চিলের উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে তাঁর পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্যে তিনি সৈন্যদল ব্যবহার করতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। যে সোভিয়েত ইউনিয়ন জার্মাণীর পরাজয়ে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে, যার বীরত্ব ও ত্যাগের উপর মিত্রপক্ষের বিজয় সাফল্যের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আহ্বান জানাতে পররাজ্য আক্রমণের প্রবক্তারা মোটেই ইতস্ততঃ করলো না।

পাঁচই জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতি-

নিধিরা, "জার্মাণীর পরাজয়ের পর, জার্মাণীতে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধরণতন্ত্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফরাসী সাধারণতন্ত্রের অস্থায়ী সরকারের চরম নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা গ্রহণ" সম্পর্কে একটি যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করলেন। ঘোষণাপত্রে বলা হলো যে চতুঃশক্তি, "জার্মাণ সরকার, সর্বোচ্য পরিষদ যে কোন রাজ্য, পৌর প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ সমেত সমগ্র জার্মাণীর উপরে চরম ক্ষমতা" গ্রহণ করছেন। সমগ্র জার্মাণ সেনাদলকে অস্ত্রত্যাগ করিয়ে, দেশের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধশিল্পগুলিকে এখন থেকে চতুঃশক্তির অধীনে রাখা হবে। ঘোষণাপত্রে জার্মাণী থেকে জাতিসংঘের সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও অসামরিক আটকরাখা নাগরিকদের আশু মুক্তিদান ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দেওয়ার কথা বলা হলো। প্রধান প্রধান নাৎসী নেতা ও অন্যান্য যুদ্ধ অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করার বিষয়েও ঘোষণাপত্রে জোর দেওয়া হয়। ঘোষণাপত্রের বারো সংখ্যক ধারায় বলা হয় যে, "যখন প্রয়োজন মনে করবেন, মিত্রপক্ষীয় প্রতিনিধিরা সেই হিসাবে জার্মাণীর সর্বত্র অথবা স্থান বিশেষে সামরিক শক্তি ও অসামরিক সংস্থা স্থাপন করতে পারবেন।"

এই সময়ে আরো দু'টি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। একটি হলো নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, অন্যটি বিভিন্ন শক্তির অধিকৃত এলাকায় সম্পর্কে। প্রথম চুক্তিতে বলা হয় "যে সময়ে জার্মাণী বিনা সর্তে আত্মসমর্পণের প্রয়োজন অনুযায়ী তার মৌল দায়িত্ব পালন করবে, সেই সময়ে সোভিয়েত, বৃটিশ, মার্কিণ ও ফরাসী প্রধান সেনাপতিগণ, তাঁদের নিজ নিজ অধিকৃত অঞ্চলে স্বদেশীয় সরকারের নির্দেশক্রমে চরম ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। যে সমস্ত বিষয় সমগ্রভাবে জার্মাণীর সঙ্গে জড়িত সেক্ষেত্রে তাঁরা যৌথ ভাবে এই ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। এই চারজন প্রধান সেনাপতি একত্রে, যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠন করবেন।" নিয়ন্ত্রণ পরিষদ সর্বসম্মতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কাজ করে যাবেন, যাতে প্রতিটি অধিকৃত অঞ্চলের কাজের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বজায় থাকে। যে সব বিষয় সমগ্র ভাবে জার্মাণীর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত, সেক্ষেত্রে তাঁরা সর্বসম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে কোন কাজ করতে পারবেন না। বৃহত্তর বার্লিন অঞ্চলের শাসন পরিচালনা একটি আন্তঃ মিত্রপক্ষীয় শাসন কর্তৃপক্ষের ওপর ছেড়ে দেওয়া হলো। সাধারণ ভাবে নিয়ন্ত্রণ পরিষদের অধীনে থেকে, চারজন সেনাপতি এই ক্ষমতা পরিচালনা করবেন।

অধিকৃত অঞ্চল সম্পর্কিত চুক্তিতে, সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে সীমানা নির্দেশ করে দেওয়া হলো। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখও যে এই সীমানা নির্ধারণের প্রশ্নে তাদের মধ্যে মতবিরোধের তখনও অবসান হয়নি। সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে ছিল মেকলেনবার্গ, ব্রাণ্ডেনবার্গ, স্যাক্সনী-অ্যানহল্ট, স্যাক্সনী ও থুরিঙ্গিয়া। বার্লিন সম্মেলনের পূর্বে সোভিয়েত অঞ্চলের সীমানা আরো বিস্তৃত ছিল। কিন্তু পরে এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং ঐতিহাসিক সত্যের নিরিখে, সোভিয়েত সামরিক কর্তৃপক্ষ সেই অঞ্চলগুলি তাদের আইন সঙ্গত স্লাভ গোষ্ঠীর দেশ, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও পোল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্যে ছেড়ে দেন।

বার্লিনে স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল হতে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যের অনতিবিলম্বে অপসারণের নির্দেশ দেয় এবং বার্লিন শহরকে চারটি দখলকারী অংশে বিভক্ত করার কথা বলে।

জুলাই মাসের শুরুতে সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চল থেকে ইঙ্গ-মার্কিণ সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়া হয়। আর সঙ্গে সঙ্গেই বার্লিনের বিভক্ত অঞ্চলগুলিতে তারা নিজের নির্দিষ্ট সীমানার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে। তিরিশে জুলাই, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, মিত্রপক্ষীয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা বসে বার্লিনে। বৃহত্তর বার্লিনের জন্যে আন্তঃ মিত্রপক্ষীয় শাসন কর্তৃপক্ষের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, এগারোই জুলাই।

অষ্ট্রিয়ার সমস্যা ছিল এই রকমই আরেকটি বহু বিতর্কিত ও বিরোধমূলক বিষয়। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের বহুদিনের সাধ ছিল দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপে, সরাসরি তাদের প্রভাবাধীনে একটা বড় ক্যাথলিক রাষ্ট্রগঠন করা। অন্যদিকে বৃটিশ শাসকদের লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ জার্মাণীর একাংশ ও অষ্ট্রিয়া নিয়ে একত্রে তাদের একটি ড্যানিয়ুব রাষ্ট্র সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া।

অষ্ট্রিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনগণের মৌল স্বার্থের পরিপন্থী বলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন দৃঢ়ভাবে মার্কিণ ও বৃটিশ পরিকল্পনার বিরোধিতা করে।

নয়ই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়ায় বিভিন্ন শক্তির অধিকৃত অঞ্চল ও অষ্ট্রিয় নিয়ন্ত্রণ পরিষদ সম্পর্কে তাঁদের চুক্তিটি প্রকাশ করলো। ঐক্যবদ্ধ অষ্ট্রিয় জনগণের স্বাধীন রাষ্ট্রিক

সত্তার দাবী এতে স্বীকৃত হলো। তাছাড়া অষ্ট্রিয়াকে চারটি অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত করা হলো। সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে থাকবে নিম্ন অষ্ট্রিয়া সমেত উত্তর পূর্ব অষ্ট্রিয়া, ড্যানিয়ুবের বামতীরস্থ উচ্চ অষ্ট্রীয়ার একাংশ এবং বার্গেনল্যাণ্ড। ভিয়েনা শহরকে চারটি অধিকৃত অঞ্চলে বিভক্ত করা হলো। সমগ্র অষ্ট্রিয়ার বিষয়গুলি পরিচালনা করার জন্যে একটি মিত্রপক্ষীয় কমিশন গঠন করা হলো।

গণতান্ত্রিক উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক তখন ক্রমেই সৌহার্দপূর্ণ হয়ে উঠছিল।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের জুন মাসের শেষার্ধে মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে যে আলোচনা চলে তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য অনুযায়ী এবং ট্রান্স-কার্পেথিয়ান ইউক্রেনের জনগণের ইচ্ছানুযায়ী, সেই অঞ্চলকে সোভিয়েত ইউক্রেনের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। উনত্রিশে জুন আলোচনার পরিসমাপ্তিতে এই বিষয়ে একটি সোভিয়েত-চেকোস্লোভাক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। চুক্তিতে বলা হয়েছিল যে, ট্রান্স-কার্পেথিয়ানে ইউক্রেনের "জনগণের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই দুই স্বাক্ষরকারী দেশের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের পরিণতিতে, তাদের চিরকালীন স্বদেশ ইউক্রেনের সঙ্গে এই অঞ্চলকে যুক্ত করা হবে এবং সেই অঞ্চল ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্রের অংশ হিসাবে পরিগণিত হবে।"

* * *

জার্মাণীর জাতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে এবং ইউরোপে একটা স্থায়ী গণতান্ত্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করে।

অধিকৃত অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে, তাদের সমর্থনের সঙ্গেই, সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ অধিকৃত অঞ্চলের শাসন পরিচালনা করতেন। জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও জাতীয় স্বাধীনতার ধারণাকে প্রসারিত করাই ছিল সোভিয়েতের নীতি। তাই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ জনগণের বহুগণতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেছেন এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সাধনের জন্যে ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছেন।

তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার অংশবিশেষ অধিকারও সেখানকার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রচেষ্টাকে স্থানীয় জনগণের প্রতি স্বার্থশূন্য সাহায্যের দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এতে স্থানীয় মানুষদের জাতীয় ও সামাজিক আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। যে সাহায্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অঞ্চলের মানুষকে দিয়েছে তার লক্ষ্য ছিল শান্তিকে সুরক্ষিত করে, জাতীয় জীবনের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

১. ওয়াল্টার গোরলিট্জ : Der Zweite Weltkrieg, Band II, পৃঃ ৫৪৩-৪৪
২. Correspondence, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৬
৩. ঐ
৪. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৫. ঐ
৬. ঐ
৭. Correspondence, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১১
৮. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪০৫
৯, ঐ পৃঃ ৪০৯
১০. ঐ পৃঃ ৪১০
১১. উইলিয়াম ডি. লিহাই : I Was There পৃঃ ৩৫১
১২, ডি. এফ. ফ্লেমিং : The Cold War and its Origins, 1917-1960 লণ্ডন, ১৯৬১, পৃঃ ২৩৮
১৩. গোল্ডস্মিথ : Alsos, নিউইয়র্ক, ১৯৪৭
১৪. ওয়ের্ণার পিকট রচিত একটি জার্মাণ গ্রন্থ
১৫. টিপ্পলস্কার্চ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৬৬
১৬. প্রাভ্দা, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৪৭
১৭. টিপ্পলস্কার্চ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৭৩
১৮. বার্ণাডোট : La Fin, লোজান, ১৯৪৫, পৃঃ ১০৩
১৯. লিহাই : I Was There, পৃঃ ৩৫৪
২০. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪
২১. ঐ পৃঃ ৩৩৫
২২, টাইম্স পত্রিকা, ২রা মে, ১৯৪৫
২৩. কার্ল কোলার রচিত একটি জার্মাণ গ্রন্থ

২৪. নিউইয়র্ক টাইমস, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৪৫
২৫. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৪
২৬. ঐ, ঐ, পৃঃ ৫৪৬
২৭. এইচ্. আর. ট্রেভার-রোপার : The Last Days of Hitler, নিউইয়র্ক ১৯৪৭, পৃঃ ২০৭
২৮. জোয়কিম শুালট্জের একটি জার্মাণ গ্রন্থ
২৯. লুড্ডে নিউর‍্যাথ রচিত ডোনিৎস সরকার সম্পর্কে জার্মাণ গ্রন্থ, পৃঃ ৭৫
৩০. টাইম্স পত্রিকা, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৮
৩১. ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টির একটি প্রকাশনী
৩২. রবার্তো বাত্তাগলিয়া : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৪২-৪৩
৩৩. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৬১
৩৪. প্রাভ্দা, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬
৩৫. একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৩৬. For a Lasting Peace, for a People's Democracy, ৬ই মে, ১৯৫৫
৩৭, ইটালীর কমিউনিষ্ট পার্টির একটি প্রকাশনী, ১৯৫৪
৩৮. রবার্তো বাত্তাগলিয়া : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৭৫
৩৯. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৮২-৮৩
৪০, একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৪১. জোয়কিম শুলট্জ : পূর্বোক্ত জার্মাণ গ্রন্থ
৪২. লুড্ডে নিউর‍্যাথ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৭
৪৩. ঐ পৃঃ ৬২-৬৩
৪৪. ঐ পৃঃ ১৩৭
৪৫. ঐ পৃঃ ৬৬
৪৬. নিউ টাইমস, মস্কো, ৩৯শ সংখ্যা, ১৯৫০
৪৭. লিহাই : I was There, পৃঃ ৩২৭
৪৮. শুালট্জ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ
৪৯. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৯৫
৫০, ডেইলী হেরাল্ড, ২৪শে নভেম্বর ১৯৫৪
৫১, চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৯৯
৫২. অটো ভিন্‌জারের একটি জার্মাণ ভাষায় রচিত গ্রন্থ,
৫৩. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৪২
৫৪. ঐ, ঐ, পৃঃ ৪৪২-৪৩
৫৫. ক্রাসনায়া জভেজদা, ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৩

৫৬. চেক্‌ভাষায় মার্কিণ সৈন্যের চেকোস্লোভাকিয়া দখলীকরণের বিষয়ে লিখিত গ্রন্থ

৫৭. লুডেভ নিউর‍্যাথ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৭

৫৮. ও ৫৯. ঐ ঐ পৃঃ ১০৭

৬০. টাইম্‌স পত্রিকা, ১৭ই মে, ১৯৪৫

৬১. ডেইলী হেরাল্ড, ১৭ই মে, ১৯৪৫

৬২. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৪৩৮

৬৩. ঐ ঐ পৃঃ ৫১২

উনবিংশ অধ্যায়

স্যান ফ্রানসিস্কো ও পট্‌সড্যাম সম্মেলন

পঁচিশে এপ্রিল, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে ছেচল্লিশটি দেশের প্রতিনিধিরা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর শান্তি সংগঠনের বিষয় আলোচনা করার জন্যে স্যান ফ্রানসিস্কো শহরে সমবেত হলেন। ইউরোপে যুদ্ধ তখনো সমানে চলছে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীন প্রভৃতি দেশ উদ্যোক্তা হিসাবে স্থির করেছিল যে, যে সমস্ত দেশ পয়লা জানুয়ারী উনিশ শ' বিয়াল্লিশ কিম্বা তার পরবর্তী কোন সময়ে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেছে, তাদের সকলকেই এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বহু সংখ্যক দেশকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাবে, সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আকাঙ্খা থেকে, সমর্থন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাস করতো যে এই নোতুন আন্তর্জাতিক সংস্থাটি যতোদূর সম্ভব প্রতিনিধি স্থানীয় হওয়া উচিত। সেই জন্যে স্পষ্টতঃ ফ্যাশিপন্থী শাসন ব্যবস্থা ছাড়া, সর্বাধিক সংখ্যক দেশকে সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। পশ্চিমী শাসকবর্গের, বিশেষ করে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদের অবিশ্যি অন্য ধারণা ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন এই সংস্থাটিকে আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে, যাতে এর মাধ্যমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহজেই তার বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে পারে।

এই পরিকল্পনার রূপায়ণে, পূর্বেই বলা হয়েছে, মার্কিণ সরকার উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের সুরুতে মেক্সিকো শহরে একটা সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন। লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধি দলগুলি, যাঁরা স্যান ফ্রানসিস্কো সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্রগুলির প্রায় অর্দ্ধেক সংখ্যক দেশের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এবং তার উপদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছিলেন। স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলন সুরু হওয়ার অল্পকাল পূর্বে মার্কিণ সরকার, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সরকারের সঙ্গে

যৌথভাবে, আমন্ত্রণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্যে একটা নোতুন মাপকাঠি বা লক্ষণের কথা বলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে, যে সব দেশের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই, সম্মেলনে তাদের যোগ দিতে আহ্বান করা যাবেনা।

এই সিদ্ধান্ত ছিল মঙ্গোলীয় সাধারণতন্ত্র, আলবেনিয়া ও পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে একটা বৈষম্যমূলক আচরণের নিদর্শন—একটা অত্যন্ত অন্যায় সিদ্ধান্ত। অথচ মিত্রপক্ষের সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করতে এই তিনটি দেশ সাহায্য করেছে অনেক। পোল্যাণ্ড অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে, যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেছে ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধে। স্বভাবতই পোলিশ অস্থায়ী সরকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। পোল্যাণ্ডের প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়েছিল, "পোল্যাণ্ডকে বাদ দিয়ে স্যানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলে, তা হবে একটা অন্যায়, পোল্যাণ্ডের জনগণের উপর একটা অহেতুক আঘাত। পোল্যাণ্ডের জনগণ তাদের স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করতে চায় আর সেই জন্যেই ইউরোপের শান্তি ও সভ্যতা রক্ষার মহান ব্রতে ফ্যাশিস্ত বর্বরতা ও জার্মাণীর সাম্রাজ্যলিপ্সু, আক্রমণাত্মক আকাঙ্খার বিরুদ্ধে তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।"[১]

সম্মেলনের এক প্রারম্ভিক বৈঠকে পোল্যাণ্ডকে আমন্ত্রণ জানানোর প্রশ্নটি উত্থাপিত হলো। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল, গণতান্ত্রিক পোল্যাণ্ডের আইনসঙ্গত অধিকারের জন্যে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু যেই ভোটগ্রহণের সময় এলো, অমনি মার্কিণ প্রতিনিধিদলের অনেক যত্নে গড়ে তোলা "ভোট যন্ত্র" তার কাজ করলো। সোভিয়েত প্রস্তাব ভোটে বাতিল হয়ে গেল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত সোভিয়েতের অনমণীয় মনোভাবের জন্যে, সম্মেলন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, পোল্যাণ্ডকে প্রতিষ্ঠাতৃ সদস্যদের একজন বলে গণ্য করা হবে এবং সম্মেলনের দলিলে পোল্যাণ্ডের স্বাক্ষরের জন্যে ব্যবস্থা সংরক্ষিত হবে।

মিকোলাইসিজিক সমেত প্রতিক্রিয়া চক্রের প্রতিনিধিদের সরকারের মধ্যে স্থান দেওয়ার পরে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের জুন মাসের গোড়ায়, পোলিশ সরকারকে স্বীকৃতিদান করলো। মিকোলাইসিজিক পোলিশ মন্ত্রিসভার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন।

জাতি-সংঘের কাজে অংশ-গ্রহণ করার অনুমতি চেয়ে বিশ্ব ট্রেডইউনিয়ন সম্মেলন যে অনুরোধ করে, স্যান ফ্রানসিস্‌কো সম্মেলনে তা নিয়ে আলোচনা

করা হয়। এই প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়নের জোরালো সমর্থনপুষ্ট হয়েও, মার্কিণ ও বৃটিশ প্রতিনিধিদলের আদেশে "সংখ্যাগরিষ্ঠের" ভোটে নাকচ হয়ে যায়। আরো দেখা গেল যখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিটি, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন প্রতিনিধিকে তার সভায় যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রস্তাব উত্থাপন করেছে, তখন বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধিদলের তৎপরতায় তা বাতিল হয়ে গেল।

ইউক্রেনীয় ও বাইলোরুশীয় সোভিয়েত সমাজতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র দু'টিকে প্রতিষ্ঠাতৃ সদস্য হিসাবে স্যানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয়।

কেমন করে এই নোতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা তার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে পারে, সে সম্বন্ধ সোভিয়েত প্রতিনিধিদল তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করেন। তাতে সোভিয়েতের অপরিবর্তিত শান্তি নীতির প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন সমবেত সদস্যদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, জাতি-সংঘের অস্তিত্ব নির্ভর করবে সমস্ত সদস্যদের সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক নীতির স্বীকৃতি, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বৃহৎশক্তির ঐক্যমতের নীতির যথাযথ প্রয়োগের উপরে। এই নবগঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থাকে শান্তির জন্যে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালাবার আহ্বান জানিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বলে, সারা পৃথিবীর মেহনতী মানুষের চরম স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে বিশ্বে নিরাপত্তা বজায় রাখাই হবে এর মৌল লক্ষ্য। শান্তির জন্যে সংগ্রামে আত্মতুষ্ট মনোভাব নিতান্ত বিপজ্জনক বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন সকলকে সতর্ক করে দেয়।

বুর্জোয়া আন্তর্জাতিকতাবাদী ধারণাকে কাজে লাগিয়ে, মার্কিণ প্রতিনিধি দল, জাতিসংঘ সংস্থার মাধ্যমে একটা "বিশ্ব পার্লামেন্ট" গঠনের আহ্বান জানান, যার মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলির জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কোন স্বাতন্ত্র্য-বোধক ধারণা থাকবে না। আসলে এটা ছিল জাতি-সংঘকে সমস্ত বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার একটা চাল মাত্র, যাতে বিভিন্ন জাতির অধিকার পদদলিত করে, এই সংস্থার মাধ্যমে সারা বিশ্বে মার্কিণ আধিপত্য বিস্তার করা যায়।

মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের এই প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনার বিরোধিতা করলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। পরিবর্তে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করলো যে

জাতি-সংঘ হবে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় একটা মুখ্য সংস্থা, যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় গণতান্ত্রিক নীতির মধ্যেমে তার উদ্দেশ্য রূপায়িত করবে।

তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব করে জাতি-সংঘ সনদের মৌলিক পরিবর্তনের, যাতে তার আন্তর্জাতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ-কারীরা নিজেদের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করতে না পারে। গণতন্ত্র, জাতি অধিকার ও মানবিক অধিকারগুলির রক্ষক হিসাবে জাতি-সংঘকে গড়ে তোলাই ছিল এই সংশোধনী প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য। সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাই জাতীয় স্বাধীনতা, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার্থেই সচেষ্ট হয়েছিল।

মধ্যে মধ্যে স্যানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলনে মতবিরোধ প্রায় চরমে পৌঁছে যায়, যাতে সমস্ত প্রতিনিধিদলই কোন না কোন পক্ষে জড়িয়ে পড়েন। সম্মেলনে সদস্য দেশগুলির দু' শ' বিরাশীজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন প্রায় দেড় হাজার পরামর্শদাতা, বিশেষজ্ঞ ও প্রতিনিধিদলের সচিব ও সহকারীর দল। সম্মেলনের কাজ প্রত্যক্ষ করার জন্যে উপস্থিত ছিলেন, সংবাদদাতা, বেতার ভাষ্যকার, আলোক চিত্রী, সম্মেলন সচিবালয়ের সদস্যবৃন্দ ও অসংখ্য বিচিত্র ধরনের প্রতিষ্ঠান, জাতীয়ও রাজনৈতিক সংস্থার সদস্য সমেত আরো প্রায় সাড়ে তিন হাজার মানুষ। বুর্জোয়া সংবাদপত্রসেবীরা অবিশ্যি সুরু থেকেই সম্মেলনের বিবরণী বিকৃত করে এর অনিবার্য ব্যর্থতা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে থাকেন।

ডাম বার্টন ওক্‌স ও ইয়াল্টা সম্মেলনে জাতি-সংঘ সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, স্যানফ্রানসিস্‌কোতে তার সংশোধনী, সংযোজনী বা পরিবর্তনের জন্যে প্রায় বারো শ' প্রস্তাব পেশ করা হয়। সমস্ত বিতর্ক প্রধানতঃ তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধতে থাকে; যথা, নোতুন আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতি ও উদ্দেশ্য, নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার ভূমিকা এবং আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা। এই তিনটির মধ্যে আবার নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক রীতিমতো জমে ওঠে।

জাতি-সংঘের নীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে, সোভিয়েত প্রতিনিধি দল দু'টি মৌলিক প্রস্তাব পেশ করেন; এক: জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্কের ভিত্তি হবে "পারস্পরিক সাম্য নীতির প্রতি শ্রদ্ধা ও জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার";

এবং দুই : আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিকাশ ঘটাতে হবে, "মানবিক অধিকার বিশেষ করে কর্ম ও শিক্ষার অধিকার, মানুষের মৌল স্বাধীনতায় জাতি, ভাষা, ধর্ম ও স্ত্রীপুরুষের নির্বিশেষ স্বীকৃতির মাধ্যমে।"[২]

এখানেও চললো মতবিরোধ। মার্কিণ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে যুক্ত কোন কোন দেশের প্রতিনিধিরা সাম্যনীতিতে আপত্তি তুললেন। অধিকাংশ বুর্জোয়া প্রতিনিধিরা মার্কিন ও বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে, জাতি-সংঘের সনদে কর্ম ও শিক্ষার অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে আপত্তি জানালেন। কিন্তু আপত্তি ও বিরোধিতা সত্বেও সোভিয়েতের প্রথম প্রস্তাবটি, সনদের প্রথম ধারায় দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কোন পরিবর্তন না করেই গৃহীত হলো। আর দ্বিতীয় প্রস্তাবটির কর্ম ও শিক্ষার অধিকার সম্পর্কিত অংশটুকু বাদ দিয়ে এই ধারার তৃতীয় অনুচ্ছেদে সংযুক্ত হলো। ফলে সনদের এই ধারাটি অস্পষ্ট ভাবে "মানবিক অধিকার ও জাতি, ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের মৌল স্বাধীনতার" প্রতি একটা উল্লেখ মাত্র করেই ক্ষান্ত হলো।

নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্য ও ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী সোভিয়েত ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে যথেষ্ট বলা হয়েছিল। সোভিয়েত প্রতিনিধিদল এক্ষেত্রে মাত্র দু'টি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চাইলেন। প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে, যে সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ শান্তিভঙ্গ করতে পারে, তাদের সমাধান প্রচেষ্টা শান্তিপূর্ণ উপায়ে "ন্যায়নীতি ও আন্তর্জাতিক আইনানুসারে" করতে হবে। দ্বিতীয় সংশোধনী প্রস্তাবে, নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন আঞ্চলিক চুক্তি বা সংস্থার মাধ্যমে কোন রকমের নিপীড়নমূলক কাজ করা নিষিদ্ধ বলা হয়। অবিশ্যি বর্তমান যুদ্ধের আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে, যে সব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যাদের লক্ষ্য হলো সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, সেই সব চুক্তিগুলি সনদের এই ধারার অধীনে বিচার্য হবে না।[৩]

মার্কিণ সংশোধনী প্রস্তাবগুলির লক্ষ্য ছিল নিরাপত্তা পরিষদের শক্তি খর্ব করে, সাধারণ সভার শক্তি বৃদ্ধি করা। যেখানে মার্কিণ সরকার তাঁর সযত্নে গড়ে তোলা "ভোট যন্ত্র"কে কাজে লাগাতে পারবেন। কিন্তু ক্রিমিয়া সিদ্ধান্তগুলি, যা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অংশ গ্রহণ ও সমর্থনের ভিত্তিতে

ইয়াল্টায় গৃহীত হয়েছিল, তার বিরোধিতা করা মার্কিণ সরকারের পক্ষে সম্ভব হলো না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে ইয়াল্টার প্রস্তাবগুলি নিরাপত্তা পরিষদের তাৎপর্য ও ভূমিকার বিশদ একটা ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছিল। স্বভাবতই তাই মার্কিণ সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য দেশের সাহায্যে সেই কাজ করাতে চাইলেন। কয়েকটি দেশের সমর্থনে পেরুর প্রতিনিধি, নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ শক্তিবর্গের সর্ব-সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন।

বৃহৎ ত্রিশক্তির রাষ্ট্র নেতারা ক্রিমিয়ায় এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধিদের সেই সিদ্ধান্তের বিচ্যুতি ঘটাতে কোন অনিচ্ছাই ছিল না। যাই হোক সোভিয়েত প্রতিনিধির উদ্যোগে সেই প্রচেষ্টা শেষে ব্যর্থ হয়ে গেল। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্দেশ্য ও ভোটদান পদ্ধতি সম্পর্কে, স্যানফ্রানসিস্‌কো সম্মেলনে পূর্ববর্তী ঘোষণাকেই জোরালোভাবে সমর্থন করা হলো। নিরাপত্তা পরিষদের কাজ সম্পর্কে, সোভিয়েতের দু'টি সংশোধনী প্রস্তাবই গৃহীত হয়। প্রথমটি একটু পরিবর্তিত আকারে হলেও, দ্বিতীয় প্রস্তাবটি অপরিবর্তিত ভাবে গৃহীত হয়।

আন্তর্জাতিক অছি ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা অনেকদিন চলে। সোভিয়েত মার্কিণ, বৃটিশ, ফরাসী, চীন ও আরো অনেক কয়টি দেশের প্রতিনিধিরা নানা খসড়া প্রস্তাব পেশ করলেন। সোভিয়েত প্রস্তাবে জাতি-সংঘের অছি ব্যবস্থার লক্ষ্য স্বরূপ বলা হয় যে, স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার বঞ্চিত মানুষদের সক্রিয় সহযোগিতার ভিত্তিতে, "স্বায়ত্ত-শাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যে এমনভাবে উপযুক্ত করে তোলা যাতে তারা অল্পদিনের মধ্যেই পূর্ণ স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিক মর্যাদায় উপনীত হতে পারে।"*

মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী প্রস্তাবে অছি ব্যবস্থাকে অছিভুক্ত অঞ্চলের জনগণের উপর অছির অবাধ অধিকার হিসাবে বর্ণনা করা হয়। অর্থাৎ তাঁরা "আন্তর্জাতিক অছিব্যবস্থার" নামের আড়ালে পুরাণো ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকেই কায়েম রাখতে চান। তা ছাড়া মার্কিণ প্রস্তাবে অছি অঞ্চলের পুনর্বণ্টনের কথাও বলা হয়। প্রস্তাবের এই অংশের লক্ষ্য ছিল বৃটিশ ও ফরাসীদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যে ভাগ বসানো।

সম্পূর্ণ প্রত্যাশিতভাবেই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি সোভিয়েত প্রস্তাবের

বিরোধিতা করে। কিন্তু তা করেও, তারা নিজেদের খসড়াগুলিকে সম্মেলনে গ্রহণযোগ্য করাতে পারেনি। ফলে একটা আপোষ রফা হয়ে গেল, যার পরিচয় পাওয়া যায় জাতি সংঘ সনদের ছিয়াত্তর সংখ্যক ধারার "খ" উপধারায়। এখানে বলা হয়েছে যে অছি ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হলো, "অছিযুক্ত অঞ্চলের প্রত্যেকটির বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, সেখানকার জনগণের ইচ্ছার অবাধ প্রকাশের ভিত্তিতে, যার পরিচয় প্রতিটি অছি ব্যবস্থার সর্তাবলীতে উল্লিখিত থাকবে, সেখানকার জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত মান এমনভাবে উন্নত করা, যাতে তারা ক্রমেই স্বায়ত্তশাসন অথবা পূর্ণ স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে পারে।"

এই আপোষরফার লক্ষ্যণীয় ইতিবাচক দিক হলো এই যে, অছিব্যবস্থার চরম লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতার স্বীকৃতিদান। যদিও সন্দেহ নেই এই লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে নানা বাধা সৃষ্টির সুযোগ এই ব্যাখ্যার মধ্যেই রয়ে গেল।

মোটামুটি স্যানফ্রানসিসকো সম্মেলনের ফলাফল যে অনুকূল ছিল তা বলা যেতে পারে। সোভিয়েতের প্রচেষ্টাতেই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গণতান্ত্রিক নীতিকে জাতি-সংঘের বনিয়াদ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করে রচিত জাতি সংঘের সনদ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়ার পর, ছাব্বিশে জুন, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, স্যানফ্রানসিসকো সম্মেলন শেষ হয়।

উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের শেষে জাতি-সংঘের সনদ, স্যানফ্রানসিকো সম্মেলনে যোগদানকারী সকল রাষ্ট্রই অনুমোদন করে।

॥ দুই ॥

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গণতান্ত্রিক নীতির প্রবক্তা হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুদ্ধোত্তর কালের সমস্যাগুলির যৌথ সমাধানে সচেষ্ট হয়েছিল। তাই দেখা গেল আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ পরিত্যাগ করার জন্যে মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকদের নিরলস উদ্যোগ সত্ত্বেও, সোভিয়েতের উদ্যোগে পটসড্যামে বৃহৎশক্তি-বর্গের আবার এক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো।

ততোদিন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিক্রিয়া-শীলতার ছাপ পড়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যুদ্ধ

তখন প্রায় শেষ হয় হয়। তাই মার্কিণ একচেটিয়াপতিরা সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের আগ্রহাতিশয্যে দেশের চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে এককাট্টা করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নই তাদের চরম প্রতিদ্বন্দ্বী। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের আগুনে ভস্মীভূত না হয়ে, সোভিয়েতের শক্তি যেন আরো বেড়ে গেছে। ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা এটা মোটেই প্রত্যাশা করেনি। সেই জন্তেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের দেশপ্রেমিক মানুষদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণা ও আক্রোশ যেন ফেটে পড়ছে। একচেটিয়া স্বার্থের অনুগত সেবক ট্রুম্যান শাসন ব্যবস্থা, তাই তার সমস্ত রাজনৈতিক শক্তি শানিয়ে তুলেছে সোভিয়েত ও অন্য দেশের জাতীয় মুক্তি এবং শ্রমিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে।

পটসড্যাম (Potsdam) সম্মেলনে যোগদানে সম্মত হয়ে মার্কিণ সরকার ভেবেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য স্বাধীনতা প্রিয় দেশগুলির বিরুদ্ধে তাঁরা আরেকটা আক্রমণ চালাবার সুযোগ পাবেন। বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্নকে সার্থক করার জন্যে, মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের তখন পারমাণবিক বোমার শক্তিতে প্রবল আস্থা। এই শক্তিকে তারা অন্যদেশকে ভয় দেখিয়ে, ধাপ্পা দিয়ে কাজ আদায় করার জন্যে ব্যবহার করতে চায়। প্রথম পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানোর কথা ছিল পনেরোই জুলাই নিউ মেক্সিকোর, আলমোগোরদের (Alamogordo) মরুভূমি অঞ্চলে। মার্কিণ সরকার জেদ করতে লাগলেন যে সম্মেলন সুরু হোক এ তারিখেই।

মার্কিণ পারমাণবিক পরীক্ষা সম্পর্কে, চার্চিলকে আগের থেকে কোন কিছুই জানানো হয়নি বলে, তিনি বুঝতে পারেন নি যে কেন তারা এই দিনটার উপর এতো জোর দিচ্ছে। সোভিয়েত ও মার্কিণ রাষ্ট্র নেতাদের কাছে, পয়লা জুন উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, এক বাণীতে তিনি তাঁর বিব্রত ভাব প্রকাশ করে বলেন:

"আমি পনেরোই জুনের প্রস্তাব করেছি, আবার বলছি জুন মাসের কথা, জুলাইয়ের আগের মাসের কথা, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে পয়লা, দোসরা অথবা তেসরা জুলাইয়ে আপত্তি কি?"[৫] কিন্তু যেই চার্চিল, মার্কিণ সরকারের মনোগত ইচ্ছাটি জানতে পারলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি পনেরোই জুলাই তারিখে রাজী হয়ে গেলেন।

সম্মেলন সুরু হওয়ার অল্পকাল পূর্বেই, মার্কিণ প্রতিনিধিদলের কাছে পট্সড্যামে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের খবর এসে পৌঁছলো। তারিখটা

ছিল ষোলই জুলাই, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ। সেই মুহূর্ত থেকেই রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সমেত বিশিষ্ট রাজনীতিক সমন্বিত মার্কিণ প্রতিনিধিদল, পারমাণবিক অস্ত্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রামে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে কি বিশেষ সুবিধা দান করতে পারে, সেই সত্য আবিষ্কারে মগ্ন হয়ে গেলেন। মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব বায়র্নেসের একটি উক্তি, ট্রুম্যান তাঁর স্মৃতিকথায় উদ্ধৃত করেছেন। বায়র্নেস বলেছিলেন: "এই অস্ত্রের এমন শক্তি সম্ভাবনা থাকতে পারে যে গোটা শহরকে ধ্বংস করে দিয়ে, অকল্পনীয় হারে এ প্রাণহানি ঘটাতে পারে।"

ট্রুম্যান লিখেছেন যে, তিনি বললেন যে বোমা আমাদের এমন শক্তিশালী করে তুলবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধশেষে আমরা আমাদের ইচ্ছামত সর্ত আরোপ করতে পারবো যে কোন আলোচনায়।"[৬] যুদ্ধসচিব ষ্টিমসনও বায়র্নেসের অনুরূপ মত পোষণ করতেন। পারমানবিক বোমা, তিনি বলেন, "অন্যদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নির্ণয়ে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করবে।"[৭]

ট্রুমানের অনুরোধে, ষ্টিমসন পটসড্যামে বসেই, "আমাদের মৌল সমস্যাবলী সম্পর্কে ধারণা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করে ফেললেন। তাঁর "ধারণায়" ষ্টিমসন, অনতিবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়নকে রুখবার জন্যে, পারমাণবিক বোমা ব্যবহারেরর সুপারিশ করেন, যাতে নোতুন একটা বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে যায় এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অভাবিত উপায়ে রাজনৈতিক চাপ ও ধাপ্পা সৃষ্টি করে কাজ গুছিয়ে নিতে পারে। ষ্টিমসনের প্রবন্ধের একাংশ, বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণাকে বিশেষভাবে আক্রমণ করে।

ষ্টিমসন লেখেন: দু'টি মৌলিক প্রভেদ সম্পন্ন জাতীয় ব্যবস্থার মধ্যে চিরস্থায়ী নিরাপত্তার নিশ্চয়তাযুক্ত কোন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যে গড়ে উঠতে পারে না, সেটা আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে। আপ্রাণ চেষ্টা করেও আমরা একে অন্যকে বুঝতে পারবো না।"[৮]

ষ্টিমসন আরো সুপারিশ করলেন যে পারমাণবিক "গোপন তত্ত্বের" বিনিময়ের নামে আমাদের, "রুশ নেতাদের কাছ থেকে তাদের প্রিয় রাষ্ট্র সম্পর্কে কিছু সুযোগ সুবিধা আদায় করে নিতে হবে।"[৯]

কিন্তু সোভিয়েত নেতারা আমেরিকার এই পারমাণবিক শক্তির ধাপ্পায় সত্যিই দিশেহারা হয়ে যাবে কিনা, সে বিষয়ে মার্কিণ রাজনৈতিক ও সামরিক নেতারা সুনিশ্চিত হতে পারছিলেন না। সুতরাং মনোভাব পর্যবেক্ষণ করায়

জন্যে তাঁরা স্থির করলেন যে রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান, আমেরিকার পারমাণবিক অস্ত্রের মালিকানা সম্পর্কে স্তালিনকে জানিয়ে, তাঁর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবেন। পট্‌সড্যাম সম্মেলনে ট্রুম্যান যথানির্দিষ্ট কার্যক্রম অনুযায়ী স্তালিনকে খবর দেওয়ার পরে, তাঁর মুখে নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্য করতে পারলেন না।[10] প্রতিক্রিয়া দেখে মার্কিণ নেতৃবৃন্দ মুষড়ে পড়লেন। সোভিয়েত নেতার এই শান্ত, ধীর প্রতিক্রিয়ার পিছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিপর্যস্ত করার যে কোন নীতির বিরুদ্ধে অনমনীয়, অপরাজেয় মনোভাব। আর এই মনোভাবকে শক্তিশালী করে তুলেছিল সোভিয়েতের শক্তি ও জনগণের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

এটা যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে ভয় দেখিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নকে বশ করা যাবেনা, তাতে কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন মার্কিণ প্রতিনিধিদলের মধ্যে সরাসরি সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করার প্রশ্নটা উঠে পড়লো। মার্কিণ ও বৃটিশ নেতারা রীতিমতো গভীর ভাবে একটা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। এই রকম আলোচনার কোন এক স্তরে দেখা গেল যে মার্কিণ জেনারেল এইচ্. আর্নল্ড, যিনি চরম আঘাত হানার জন্যে প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ তত্ত্বের উপর জোর দিতেন, তাঁর মতের সঙ্গে বৃটিশ এয়ার মার্শাল চার্লস পোর্টালের মতের বহু মিল আছে। আর্নল্ড নিজেই সেকথা তাঁর "গ্লোবাল মিশন" গ্রন্থে লিখেছেন :

"আমরা দু'জনেই বিশ্বাস করতাম যে আমাদের সাধারণ শত্রু হবে রাশিয়া, তাই আমাদের আলোচনা থেকে চিন্তার একটা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা গেল।" এই দুই জেনারেল শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসেন যে বিমান বাহিনীর শক্তিকে সার্থকতার সঙ্গে কাজে লাগাতে গেলে তাঁদের, "পৃথিবী ব্যাপী নানা জায়গায় এমনভাবে ঘাঁটি তৈরী করতে হবে, যাতে যে কোন লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ করার কথা বললেই আমরা সেখানে আঘাত করতে পারি।"

বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধিদলের মনে হিটলারের প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। তাই তাঁরা দুঃখ করতে থাকলেন যে হিটলার তাঁদের নিরাশ করেছেন। অ্যাডমিরল হ্যারীম্যান তো বলেই বসলেন যে হিট্‌লারের "সবচেয়ে বড়ো অপরাধ" হলো এই যে, তিনি "এশিয়ায় পূর্ব ইউরোপের দরজা খুলে দিয়েছেন"।[11] পট্‌সড্যামে আলোচনা এমন একটা স্তরে পৌঁছয় যে, "মার্কিণ সরকারের অত্যন্ত

উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের রচিত একটা স্মারকলিপি বৃটিশ ও মার্কিণ প্রতিনিধিদলের মধ্যে গোপনে প্রচারিত হতে থাকে, যার সারকথা ছিল এই যে, (পট্সড্যামে) আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীটা আগাগোড়া ভুল। কারণ আমাদের প্রকৃত স্বার্থের সংরক্ষণ করতে হলে, জার্মাণীকে দ্রুত 'সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একটা দুর্গ' হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।"[১২] অর্থাৎ ব্যাপারটা হলো এই যে জার্মাণ জঙ্গীবাদ ও প্রতিশোধস্পৃহাকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনার রূপায়ণে ব্যবহার করতে হবে।

মার্কিণ একচেটিয়া গোষ্ঠী ও তাদের সরকারে ধারণা ছিল এই যে, পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করলে, সমস্ত বিশ্বকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের কাছে মাথা নত করতে বাধা করা যাবে। মূলতঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই, মাকিণ সরকার জাপানের শান্তিপূর্ণ দুই শহরের মানুষের উপর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন।

মাকিণ রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে বিশেষজ্ঞ ও তাঁদের পরামর্শদাতারা সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জাপানী শহর বাছতে সুরু করেন। অবশেষে হিরোশিমা ও নাগাসাকিকে মনোনীত করা হয়। সরকারী বিমান আক্রমণ সমীক্ষায় বলা হয় যে, "জনবসতির ঘনত্ব ও কাজকর্মের কেন্দ্রস্থল বলে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিকে লক্ষ্য বস্তু হিসাবে মনোনীত করা হয়।"[১৩]

রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান গর্বভরে তাঁর রোজনামচায় লিখেছেন:

"কবে ও কোথায় পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হবে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আমার উপর নির্ভর করছিল।......আমি সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেললাম।... ইতিহাসে এটাই হলো সবচেয়ে বড়ো ঘটনা।"[১৪]

পট্সড্যাম সম্মেলন সুরু হয়, সতেরোই জুলাই, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, আর তার প্রথম পর্যায়ের মোট নয়টি অধিবেশনের শেষ অধিবেশন বসে পঁচিশে জুলাই। বৃটিশ পার্লামেন্টের জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল বলে, অধিবেশনে একটা বিরতির ব্যবস্থা হয়। নির্বাচনে জয়লাভ করলো শ্রমিক দল। ফলে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে আর চার্চিল এলেন না। তাঁর জায়গায় এলেন নবনিযুক্ত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী, ক্লিমেণ্ট রিচার্ড এ্যাটলী। নেতৃত্বের পরিবর্তনে বৃটিশ প্রতিনিধিদলের নীতিতে, কিম্বা সমগ্রভাবে বৃটেনের পররাষ্ট্র-নীতিতে কোন পরিবর্তনের সূচনা হলো না। এ্যাটলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও জীবনী-

কার, রয় জেন্‌কিন্‌স্‌ লিখেছেন যে, "শ্রমিক দলের নেতাদের মতোই চার্চিলের-ও ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত সহকর্মী কম ছিল।"[১৫]

বৃটেনে শ্রমিক দলের সরকার গঠন ও এ্যাটলীর বৃটিশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করার জন্যে পট্‌সড্যামে আসার পরে, আটাশে জুলাই থেকে দোসরা আগষ্ট উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের মধ্যে সম্মেলনের মাত্র চারটি অধিবেশন হয়।

তিক্ত বিতর্কের মধ্যে পটসড্যাম সম্মেলনের পরিবেশ তখন যথেষ্ট প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধিদল, সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির ন্যায় ও আইনসঙ্গত স্বার্থ বিবেচনা করার কোন আগ্রহই দেখালেন না।

সেইজন্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন সমাধানে পৌঁছবার চেষ্টাই করা গেল না। কিন্তু তা হলেও কতকগুলি বিষয়ে সম্মলনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো, কারণ মার্কিণ ও বৃটিশ প্রতিনিধিরা ভেবেছিলেন যে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করার পরে, তাঁরা সহজেই পট্‌সড্যামের সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করে দিতে পারবেন। তা ছাড়া মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকরা তখনো মনে করছিলেন যে, জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তখন পূর্বেকার সিদ্ধান্তগুলি পুনর্বিবেচনার সুযোগে অবস্থাকে অনুকূল করে নিলেই হবে।

পট্‌সড্যাম সম্মেলনে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের একটি পরিষদ গঠন করে, পরাজিত রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে শান্তিচুক্তির সম্পাদনের জন্যে কতকগুলি খসড়া-চুক্তি রচনার ভার দেওয়া হয়। যে যে শত্রু-দেশের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে যে সব দেশ যোগদান করেছে, পরাষ্ট্রমন্ত্রী পরিষদে সেই সেই দেশের মন্ত্রীরা যোগ দেবেন। এর কেবল একটি ব্যতিক্রম করা হলো ইটালীর ক্ষেত্রে। ফ্রান্স ইটলীর আত্মসমর্পণ ও যুদ্ধ বিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর না করলেও, তাকে একজন স্বাক্ষরকারী বলে ধরে নেওয়া হলো।

পট্‌সড্যাম সম্মেলনে বলা বাহুল্য জার্মাণ সমস্যাই সমস্ত আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল। মার্কিণ একচেটিয়া কারবারী ও ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত জার্মাণীর একটি খণ্ডীকরণের পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিণ প্রতিনিধি দল পট্‌সড্যামে এসে হাজির হলেন। জার্মাণীকে ভেঙ্গে তিনটি রাষ্ট্রগঠনের কথা বলা হলো। ভিয়েনাকে রাজধানী করে ব্যাভেরিয়া, ওুটেমবার্গ ও ব্যাডেন এই তিন জার্মাণ প্রদেশ এবং অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীকে নিয়ে

একটি দক্ষিণ জার্মাণ রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। বার্লিনকে রাজধানী করে একটি উত্তর জার্মাণ এবং রূঢ় ও সার অঞ্চলকে নিয়ে একটি পশ্চিম জার্মাণ রাষ্ট্র গঠন করার কথা বলা হলো।

উইলিয়াম লিহাই লিখেছেন : "রাষ্ট্রপতি বিশ্বাস করতেন যে জার্মাণীকে খণ্ডিত করে কয়েকটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে পারলে, ভবিষ্যতে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা অনেক সহজ হবে।"

লিহাই আরো বলেছেন, "এটাই ছিল রাষ্ট্রপতির মত যে রূঢ় ও সার সমেত সমগ্র রাইনল্যাণ্ডকে এই ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে আপাততঃ একটি আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা হবে যে পরবর্তী কোন সময়ে তাকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করতে হবে।"[১৬] এই নোতুন প্রস্তাব অন্য বারের চেয়ে এবারেই মার্কিণ সরকারের প্রকৃত মতলবকে প্রকট করে তুললো। বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র জার্মাণ রাষ্ট্রগুলি সহজে মার্কিণ আধিপত্যের চাপে মাথা নত করবে এবং তখন তাদের ইচ্ছা মতো প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে উস্কে দেওয়া যাবে সশস্ত্র অভিযান করতে। আর রূঢ় অঞ্চলে যে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হবে, তা আসলে হবে মার্কিণ নিয়ন্ত্রণ।

এবারেও সোভিয়েতের নিরলস প্রচেষ্টার জন্যে জার্মাণীকে খণ্ডীকরণের সমস্ত প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেল। সোভিয়েতের উদ্যোগে জার্মাণীকে একটি ঐক্যবদ্ধ, শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে পট্‌সড্যাম সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হলো। জার্মাণ জাতির স্বাধীন জাতীয় সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে তার জীবনধারাকে শান্তি ও গণতন্ত্রের নিরিখে গড়ে তোলার অধিকারকে পুনর্বার সমর্থন করা হলো।

নিয়ন্ত্রণ পর্বের সুরুতে জার্মাণীর প্রতি মিত্রপক্ষের রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক নীতি সম্পর্কে, পট্‌সড্যামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। এটাকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে, জার্মাণীকে নাৎসী ও জঙ্গীপ্রভাব মুক্ত করে, গণতান্ত্রিকতার প্রসারের একটি কর্মসূচী বলা যায়। সেই কর্মসূচীতে মিত্রপক্ষীয় দখলীকরণের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয় যে, জার্মাণীতে নিরস্ত্রী-করণের মাধ্যমে জঙ্গীপ্রভাব দূর করতে হবে, যুদ্ধোৎপাদনে ব্যবহার করা যায় এমন শিল্পগুলিকে ভেঙ্গে ফেলতে হবে, জার্মাণ জনগণকে বোঝাতে হবে যে জঙ্গীবাদ তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিয়েছে, সমস্ত নাৎসী প্রতিষ্ঠান সমেত নাৎসী

দলকে উচ্ছেদ করতে হবে, নাৎসীদের সমস্ত জঙ্গীবাদী প্রচার ও কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে, জার্মাণ রাজনৈতিক জীবনকে গড়ে তুলতে হবে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে, যাতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জার্মাণী পরে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথ গ্রহণ করে।

চুক্তিতে জার্মাণীতে অসামরিক শিল্প-ব্যবস্থা ও কৃষিকে গঠন করার কথা বলা হলো। জার্মাণীর একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও এই সময়ে নেওয়া হয়। বিভিন্ন মিত্রপক্ষীয় দখলদারী এলাকা থাকা সত্ত্বেও, অর্থনৈতিক বিষয়ে জার্মাণীকে একটি ঐক্যবদ্ধ দেশ বলে মনে করার জন্যে নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। আর জার্মাণী ক্ষতিপূরণ বাবদ কিভাবে মিত্রপক্ষের কাছে তার দায়মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করবে, তারও একটি কার্যক্রম স্থির করা হয়।

সম্মেলন যুদ্ধাপরাধীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করার আদেশ দিয়ে, মুখ্য অপরাধীদের বিচারের জন্যে একটি আন্তর্জাতিক বিচার সংস্থা গঠন করার নির্দেশ দেয়।

পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে সম্মেলনে আরেকদফা তুমুল বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পোলিশ সরকারের এক প্রতিনিধিদল এই প্রশ্নের আলোচনা করার জন্যে সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। উল্লিখিত অঞ্চলে পোল্যাণ্ডের ন্যায় ও আইনসঙ্গত দাবীর ব্যাখা প্রসঙ্গে বেইরুট ও গোমুলকা পর্যাপ্ত পরিমাণে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য, প্রমাণ ও নজীর উপস্থিত করেন। মিকোলাইসিজিক আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে পোল্যাণ্ডের জনগণের গভীর স্বার্থ জড়িয়ে আছে এই অঞ্চলের সঙ্গে। তাই পোল্যাণ্ডকে এই অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়ার দাবীর তিনি বিরোধিতা করতে পারলেন না। তাই চার্চিল যখন তাঁকে লক্ষ্য করেই বললেন যে, পোলিশ পলাতক সরকার এ সম্পর্কে কোন দিন কোন উচ্যবাচ্য করেনি, তখন তিনি একেবারে চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের মতো কাজ মনে করলেন।[১১]

যাই হোক শেষে পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তে আঞ্চলিক দাবী মিটিয়ে দেওয়া হলো। সোভিয়েতের অনমনীয় মনোভাবে পোলিশ—জার্মাণ সীমান্ত ওডার ও নিসে নদী বরাবর স্থিরীকৃত হয়ে গেল। বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী পূর্ব প্রাশিয়ার একাংশ ও কোনিগসবার্গ (বর্তমানে কা

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করা হলো। পূর্ব প্রাশিয়ার বাকী অংশ ও প্রাক্তন মুক্ত শহর ড্যানজিগের (দানস্ক্) সন্নিহিত অঞ্চল দেওয়া হলো পোল্যাণ্ডকে। তা ছাড়া বার্লিন সম্মেলন এ নির্দেশ দেয় যে পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরীতে বর্তমানে বসবাসকারী জার্মাণদের, তাদের স্বদেশে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাক্তন শ্লাভ—ভূখণ্ড যা জার্মাণ সাম্রাজ্য গঠনকারীরা অধিকার করেছিল, ফিরিয়ে দেওয়া হলো তাদের ন্যায় সঙ্গত অধিকারীর কাছে।

যুদ্ধোত্তর কালের শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টায় যে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, পট্সড্যাম সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিতে তার ছাপ রয়ে গেল সুস্পষ্ট। আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের আন্তরিক নিষ্ঠায়, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পট্সড্যামের সিদ্ধান্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেল।

ইতিমধ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতি অনুসরণ করে চলতে আরম্ভ করেছে। পট্সড্যাম কর্মসূচীতে তাদের সমর্থন কোনদিনই আনুষ্ঠানিক, নিয়মরক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তারা অনেক আগের থেকেই এমন এক নীতি গ্রহণ করেছিল, যার সঙ্গে পট্সড্যাম সিদ্ধান্তগুলির ব্যবধান ছিল দুস্তর।

* * * *

পূর্ণ বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতাময় পরিবেশে ক্রিমিয়া ও পট্সড্যাম সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার জন্যে, ষোলই আগষ্ট উনিশ শ' পয়তাল্লিশে একটি সোভিয়েত-পোলিশ সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। তথাকথিত কার্জন সীমারেখা অনুযায়ী, স্থান বিশেষে পোল্যাণ্ডের অনুকূলে পাঁচ থেকে আট কিলোমিটার পর্যন্ত বিচ্যুতি ঘটিয়ে, এই চুক্তিতে নোতুন সীমান্ত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ক্রিলোভ শহরের দক্ষিণে তিরিশ কিলো মিটার ও বাইলোভেঝ্স্কায়া পুশ্চার একাংশে সতেরো কিলোমিটার অঞ্চল পর্যন্ত পোল্যাণ্ডের অনুকূলে বিচ্যুতি ঘটিয়ে, সমগ্র ভূখণ্ড পোল্যাণ্ডকে ছেড়ে দিল। তা ছাড়া প্রাক্তন পূর্ব প্রাশিয়ার মাঝ দিয়েও একটা সীমান্ত রেখা প্রতিষ্ঠা করা হলো।

জার্মাণ অধিকারের সময় নানা ক্ষয়ক্ষতির জন্যে, ক্ষতিপূরণ বাবদ সোভিয়েত-

পোল্যাণ্ডের মধ্যে আরেকটি চুক্তি হয়। পোলিশ ভূখণ্ডে জার্মাণ সম্পত্তি এমন কি পোল্যাণ্ডের পশ্চিম সীমান্তে সন্ত হস্তান্তরিত ভূখণ্ডে জার্মাণ সম্পত্তির উপর সোভিয়েতের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতির দাবী, সোভিয়েত সরকার পোল্যাণ্ডের অনুকূলে পরিত্যাগ করেন। তা ছাড়াও জার্মাণী থেকে প্রাপ্তব্য ক্ষয়ক্ষতির খেসারতের শতকরা পনেরো ভাগ, সোভিয়েত ইউনিয়ন পোল্যাণ্ডকে দিতে সম্মত হয়।

সোভিয়েত-পোলিশ চুক্তিকে তাই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যাণ্ডের জনগণের মধ্যে নবগঠিত বন্ধুত্বের গভীর আন্তরিকতার নিদর্শন বলা যায়।

১. প্রাভ্দা, ২৭শে মার্চ, ১৯৪৫
২. মস্কোয় প্রকাশিত একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৩. ঐ
৪. ঐ
৫. Correspondence, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬২
৬. হ্যারী এস. ট্রুম্যান : Memoirs, ১ম খণ্ড, নিউ ইয়র্ক, ডবলডে, ১৯৫৫, পৃঃ ৮৭
৭. ঐ, ঐ
৮. হেনরী এল. ষ্টিমসন ও ম্যাকজর্জ বাণ্ডী : On Active Service in Peace and War, নিউইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃঃ ৬৩৯
৯. ঐ, পৃঃ ৬৪১
১০. র‍্যাল্‌ফ ই. ল্যাপ্ : The New Force. The Story of Atoms and People, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৩, পৃঃ ৪৫
১১. ওয়াল্টার মিলিস : The Forrestol Diaries, নিউ ইয়র্ক, ভাইকিং প্রেস, ১৯৫১, পৃঃ ৭৯
১২. জোশিয়া ই. ডুবোয় : The Devils Chemists, বোষ্টন, ১৯৫২, পৃঃ ৩৬১
১৩. পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট : Military and Political Consequences of Atomic Energy, লণ্ডন, ১৯৪৮, পৃঃ ১২৭
১৪. হ্যারী ট্রুম্যান : Memoirs, Year of Decision, নিউ ইয়র্ক, ১৯৫৫, পৃঃ ৪১৯,৪২১
১৫. রয় জেন্‌কিন্‌স : Mister Attlee An Interim Biography, লণ্ডন, হাইনেম্যান, ১৯৪৮, পৃঃ ২৬০
১৬. উইলিয়াম ডি. লিহাই : I was There, পৃঃ ৬৯০
১৭. ইজ্ভেস্তিয়া, ২৫শে নভেম্বর, ১৯৪৭

বিংশ অধ্যায়

জাপানের আত্মসমর্পণ : যুদ্ধের সমাপ্তি

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আক্রমণ করতে সুরু করে উনিশ শ'তেতাল্লিশে। ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্র জোটের শিরোমণি, হিটলার জার্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের বিজয় সাফল্য, তাদের অভিযানে একটা অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। কিন্তু মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার জাপানের প্রধান সামরিক শক্তির কেন্দ্রের দিকে তাঁদের অভিযান পরিচালনা করতে তেমন উৎসাহ দেখাননি। তাঁরা তাঁদের শক্তি প্রয়োগ করলেন সেই সব অঞ্চলে, যেগুলি আগে বৃটিশ, মার্কিণ ও ডাচদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল, যা যুদ্ধের সুরুতেই জাপান দখল করে নেয়। রণনৈতিক বিচারে এই সব কেন্দ্রে সামরিক অভিযান গুলিকে দ্বিতীয় স্তরের ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ইঙ্গ-মার্কিণ অভিযানের লক্ষ্য শুধু জাপানী বিতাড়নই ছিল না। এই সব অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস করাও ছিল তাদের অন্যতম লক্ষ্য।

দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে লাফিয়ে লাফিয়ে এই অভিযান পরিচালনায় ইঙ্গ-মার্কিণদের লক্ষ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন আবার জোরদার করে গড়ে তোলা। মার্কিণ লেখক ফ্রেড্ এল্ডরিজ্ লিখেছেন, "বৃটেন, চীন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে সব যুদ্ধ করে তাদের লক্ষ্য হলো অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং সাম্রাজ্য বজায় রাখা।"[১]

আমেরিকার চরম পরিকল্পনা ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে এমন সব রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করা, যাতে সেখানকার নির্ভরযোগ্য আস্তানা থেকে পূর্ব ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় সহজেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায়।

নভেম্বর, উনিশ শ'তেতাল্লিশে মার্কিণ সৈন্যরা গিলবার্ট গোষ্ঠীভুক্ত দ্বীপমালার তারাওয়া (Tarawa) ও মাকিন (Makin) দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করে। লক্ষ

তাদের মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে নিজেদের পথ প্রশস্ত করা। উনিশ শ' চুয়াল্লিশে তারা মার্শাল, ম্যারীয়ানা ও পালাউ দ্বীপপুঞ্জে আরো কয়েকটি সাহায্যকারী ঘাঁটি স্থাপন করে। জাপানীরা কোথাও জোরালো বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেনি। পরবর্তী স্তরের অভিযান পরিকল্পনায়, মার্কিণ কর্তৃপক্ষ ফিলিপাইনের দিকে নজর দিলেন। ফিলিপাইনে অবতরণ করার পরে প্রথমেই মার্কিণ কর্তৃপক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করলেন। অথচ এই নেতৃবৃন্দই ব্যাপকভাবে গেরিলা আন্দোলন সংগঠন করে জাপানীদের যুদ্ধক্ষমতাকে রীতিমতো দুর্বল করে দিয়েছিল, যার ফলে মার্কিণ অভিযানের সুবিধাও হয়েছিল অনেক।

মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের উচ্চাকাঙ্খা সফল করতে ফিলিপাইনে মার্কিণ আধিপত্যের প্রয়োজনীয়তা যে কতো বেশি তা মার্কিণ সংবাদপত্রগুলি কোনদিন রেখে ঢেকে বলার চেষ্টা করেনি। ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান (Lippman) লিখেছিলেন, "ম্যানিলাকে কেন্দ্র করে যদি দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকা যায় তাহলে যে যে অঞ্চল সেই বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হবে তা হলো জাপানের শিল্পাঞ্চল, সমগ্র কোরিয়া, চীন ভূখণ্ডের প্রধান অংশ, ফরাসী ইন্দোচীন, বৃটিশ ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এতে নিজেকে পূর্ব এশিয়া সাম্রাজ্যের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত করবে, যেখানে দিয়ে এই সমগ্র অঞ্চলের সংযোগ ব্যবস্থা পরস্পরকে ছেদ করেছে।"[২]

উনিশ শ' চুয়াল্লিশে চীনের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটলো। তার প্রধান কারণ ছিল চিয়াং কাইশেকের সম্পূর্ণ জনসমর্থনহীন শাসন ব্যবস্থা, এবং দেশের স্বার্থ ও জনগণের প্রতি কুওমিনটাং সরকারের চরম তাচ্ছিল্য। চিয়াংয়ের সমরনায়ক পরিষদের সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত জেনারেল ষ্টিলওয়েল, কুওমিনটাং শাসন ব্যবস্থাকে "দুর্নীতি, উপেক্ষা, অরাজকতা, অর্থনৈতিক সংকট, অর্থহীন কথা ও কাজ, মজুতদারী, চোরকারবার, শত্রুর সঙ্গে বেআইনী ব্যবসাগত যোগাযোগ রক্ষা"[৩] প্রভৃতি (যতো রকমের জনবিরোধী ও দেশের স্বার্থ বিরোধী কাজ হতে পারে) সমস্ত কাজের সংমিশ্রণ বলা যায়। ঠাট্টা করে ষ্টিলওয়েল, চিয়াং কাইশেককে "চিনাবাদাম" বলতেন। চিয়াং কাইশেক সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, "চিনাবাদাম কেবল নিজের আশে পাশে যা ঘটছে তাই জানে,

দেশটা এতো বড়ো যে সেই দেশ নিয়ন্ত্রণে রাখার কোন ক্ষমতাই তার নেই। সে হলো একটা একগুঁয়ে, মাথামোটা মূর্খ, অসহিষ্ণু, স্বেচ্ছাচারী, গোঁড়া; যুক্তিবোধহীন, অকৃতজ্ঞ ও লোভী প্রকৃতির লোক।"[৪] কিন্তু মার্কিণ একচেটিয়া স্বার্থের সম্প্রসারণে ঠিক এই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লোকেরই দরকার ছিল বেশি।

কুওমিনটাংয়ের চরম নির্লজ্জ লুঠ ও দুর্নীতির জন্যে, উনিশ শ' বিয়াল্লিশ এবং উনিশ শ' তেতাল্লিশে চীনের কোয়াণ্টাং, হোনান ও চেকিয়াং প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কিন্তু তারজন্যে কুওমিনটাং কর্তৃপক্ষ নিজেদের নীতির কোন পরিবর্তন করেননি। ক্ষুধার্ত মানুষ যখন সরকারী রসদ সংগ্রহে বাধা দিতে থাকে তখন গুলীর মুখে তাদের শান্ত করে দেওয়া হয়। যখন পার্শ্ববর্তী দুর্ভিক্ষ-মুক্ত অঞ্চলে এই নিরন্ন মানুষের দল সরে যেতে চায়, তখনো বন্দুকের গুলীতে তাদের থামিয়ে দেওয়া হয়। অথচ সৈন্যদের জন্যে যে রসদ সংগ্রহের অভিযান, তা সৈন্যদের কপালে জুটলো না। কুওমিনটাং সরকারের কর্মচারীরা সৈন্যদের ক্ষুধার্ত উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদহীন রেখে, তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, কখনো সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে নিজেদের পকেট বোঝাই করতে থাকে।

মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও, চিয়াংয়ের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পুরোপুরি ফ্যাশিস্ত জোটের মতো। চিয়াং মনে করতেন যে, "ঘরের কাছে শক্তিশালী রাশিয়া থাকার চেয়ে, যুদ্ধে জার্মাণীর জয়ী হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।"[৫] তাঁর সৈন্যদলে জাপানীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। কারণ মার্কিণ নেতৃত্ব তাঁকে দেশে গৃহযুদ্ধের জন্যে শক্তি সঞ্চয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এল্ডরিজ্ বলেন যে কুওমিণ্টাংয়ের নীতি ছিল, "প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আমেরিকা জয়লাভ করার পরে, দেশে কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য বিরোধী পক্ষের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে, যতদূর সম্ভব সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ করা।"[৬]

জাপানের সামরিক নেতৃত্ব চিয়াংয়ের এই মনোভাব কাজে লাগিয়ে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে চীনে একটা বিরাট সামরিক অভিযান করলেন। জাপানের লক্ষ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগরে বিজিত অঞ্চলগুলি হাত ছাড়া হয়ে গেলেও, যাতে এখানে শক্তি সঞ্চয় করে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় তারই ব্যবস্থা করা। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের গ্রীষ্মকালে জাপানী আক্রমণ তাই সুরু হলো হোনানে এবং

ক্যান্টন হ্যাঙ্কৌ রেলপথ বরাবর সমগ্র অঞ্চলে। জাপান হোনান প্রদেশ দখল করে, মধ্য চীন পর্যন্ত তার ক্ষমতা বিস্তৃত করে ফেল্‌লো।

উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত ট্রাঙ্ক রেলপথ দখল করে, জাপানীরা পিপিং থেকে কিউরেলিনের মধ্য দিয়ে কোয়াংচৌয়ান পর্যন্ত তাদের অধিকার অব্যাহত অবস্থায় বজায় রাখলো। ফলে উপকূলবর্তী অঞ্চলের দশকোটী মানুষের সঙ্গে চীনের অন্তর্দেশের সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে গেল। কুওমিনটাং সরকার খাদ্যশস্য উৎপাদন, কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের একটা বিরাট উৎসের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হারালেন। দশলক্ষেরও বেশি চীনা সৈনিক এই যুদ্ধে নিহত, আহত অথবা বন্দী হয়। কিন্তু ক্ষতি সবচেয়ে বেশি হলো এই কারণে যে বহু সৈন্য সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে, বিভ্রান্ত হয়ে হয় অস্ত্রত্যাগ করে জাপানীদের কাছ থেকে পালিয়ে গেল, কিম্বা অধিকৃত অঞ্চলে নানা জায়গায় আটকে পড়লো। আর কুওমিনটাং জেনারেলরা আগের মতোই বিনাদ্বিধায় পক্ষ ত্যাগ করে, জাপানীদের সঙ্গে ভিড়ে গেলেন।

কিন্তু চীনে জাপানের সামরিক অগ্রগতি রীতিমতো ব্যাপক হলেও, ইউরোপে সোভিয়েতের সামরিক সাফল্য, যা ফ্যাশিস্ত জোটের চূড়ান্ত পরাজয়কে ক্রমেই নিকটতর করে তুলছিল, কুওমিনটাংয়ের আত্মকেন্দ্রিক নেতৃত্বকে জাপানী জঙ্গীবাদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে দিল না। সন্দেহ নেই মার্কিণ ও বৃটিশ নেতৃত্বের আপত্তি এ ব্যাপারে চৈনিক নেতৃত্বকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা কুওমিনটাংয়ের এই অবস্থার সুযোগ নিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো। সরেজমীনে হালচাল দেখার জন্যে প্রথমে এলেন মার্কিণ উপ-রাষ্ট্রপতি হেনরী ওয়ালেস। সময়টা হলো উনিশ শ' চুয়াল্লিশের গ্রীষ্মকাল। সেই বছরেই শরৎকালে, মার্কিণ যুদ্ধোৎপাদন বোর্ডের সভাপতি, ডোনাল্ড নেলসনের নেতৃত্বে একটা মার্কিণ একচেটিয়া কারবারীদের দল, চৈনিক অর্থ-নৈতিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এলেন। চীনদেশের সম্পদ অবাধে ব্যবহার করার সুযোগ সুবিধা দিয়ে মার্কিণ একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে অনেকগুলি চুক্তির খসড়া রচিত হলো উনিশ শ' চুয়াল্লিশে। এই সব চুক্তি সম্পাদিত হয় উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের সুরুতে।

সোভিয়েত বিজয় সাফল্য যুদ্ধের গতি প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন আনে, চীনের

গণমুক্তি ফৌজ তাকে অনেকখানি কাজে লাগাতে পারে। যে সময়ে চিয়াংয়ের সৈন্যরা জাপানী আক্রমণের প্রচণ্ডতায় ক্রমাগত পিছু হটে যাচ্ছিল, সেই একই সময়ে চীনের গণমুক্তি ফৌজ। জাপানীদের বাছাই করা, সুদক্ষ সেনাদলের সঙ্গে লড়াই করেও, সাফল্য অর্জন করতে লাগলো। সমগ্র উনিশ শ' চুয়াল্লিশ ধরে, চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ, চব্বিশটি বড়ো শহর ও তেরো হাজার ছোট শহর ও গ্রাম শত্রুমুক্ত করে। ফলে উনিশ শ' চুয়াল্লিশের শেষে মুক্ত অঞ্চলের পরিমাণ দাঁড়ায় আট শ' উনষাট হাজার কিলোমিটার, যার জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল নয় কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির ক্রমবর্ধমান খ্যাতি ও প্রভাব এবং মুক্তি ফৌজের জাপানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য, চিয়াং কাইশেককে তাঁর কমিউনিষ্ট বিরোধিতার নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য করলো। মার্কিণ নেতৃত্বও তখন চিয়াংয়ের নীতিতে পরিবর্তন আনার জন্য বলছিলেন। তাঁদের মতলব ছিল জাপানী আক্রমণের ধাক্কাটা গণমুক্তি ফৌজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। কারণ এতে চীনের গণতান্ত্রিক শক্তি লড়াই করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়বে।

চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে সাম্রাজ্যবাদীদের এই চাল ধরা পড়ে গেল। উনিশ শ' চুয়াল্লিশের মে মাসের গোড়ার দিকে চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে সিয়ানে এক আলোচনায়, তাঁরা তাই প্রস্তাব করলেন যে চিয়াং গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে লড়াই বাধানোর মতলব পরিত্যাগ করুন এবং যাতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক সমস্যার সুষম সমাধান হয়, তার জন্যে একটা সংযুক্ত গণতান্ত্রিক সরকার গঠনে সম্মত হন।

কমিউনিষ্টদের প্রস্তাব জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে, তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করে। কুওমিনটাং এই দাবী এড়িয়ে গিয়ে, পাল্টা দাবী জানায় যে মুক্তাঞ্চলে জনগণের সরকার ভেঙ্গে দেওয়া হোক এবং গণমুক্তি ফৌজের সংখ্যাও কমিয়ে ফেলা হোক। স্বভাবতঃই এই অযৌক্তিক দাবী চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিল।

॥ দুই ॥

ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইনে ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক তৎপরতা, জাপানের সাধারণ অবস্থার উপর বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করেনি। তার স্থলবাহিনী মোটামুটি

অক্ষতই ছিল। জাপানের নৌবহর যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়লেও, যুদ্ধের গতি পরিবর্তনে তার দুর্বলতা মিত্রপক্ষকে তেমন কিছু আনুকূল্য করার সম্ভাবনা ছিল না। ফিলিপাইনে মার্কিণ সৈন্য অবতরণের সময়, আঞ্চলিক সমুদ্রে এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড়ো নৌযুদ্ধ হয়ে যায়। জাপানী নৌবহর অবতরণকারী মার্কিণ সৈন্যের প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত মার্কিণ নৌবহরকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে জাপানীদের প্রচণ্ড ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। তাদের চারটি যুদ্ধ জাহাজ, তিনটি বিমানবাহী জাহাজ, তিনটি হাল্কা ধরণের বিমানবাহী জাহাজ, একটি সাহায্যকারী জাহাজ, চোদ্দটি ক্রুইজার, বত্রিশটি ডেষ্ট্রয়ার ও এগারটি ডুবো জাহাজ বিনষ্ট হয়। মার্কিণ বহরের ক্ষতি হয় একটি হাল্কা বিমানবাহী জাহাজ, তিনটি সাহায্যকারী জাহাজ, ছয়টি ডেষ্ট্রয়ার, তিনটি সাহায্যকারী ডেষ্ট্রয়ার একটি যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ ও সাতটি ডুবো-জাহাজ। কিন্তু নৌযুদ্ধে জয়লাভ চূড়ান্ত বিজয় ছিল না। যদিও এর ফলে ফিলিপাইনে মার্কিণদের সামরিক কার্যক্রম জাপানীদের পক্ষ থেকে সমুদ্রে কোন বাধার সম্মুখীন না হয়ে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের এপ্রিলে সুসম্পন্ন হয়ে যায়। বৃটিশ সরকার এই অনুকূল পরিবেশে. মার্কিণদের সাহায্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়া আক্রমণ করেন। এখানেও কিন্তু মিত্রপক্ষের সামরিক তৎপরতার মৌল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ সংরক্ষণ।

জাপানী শহরগুলির উপর মার্কিণ বিমান আক্রমণ উনিশ শ' চুয়াল্লিশের শরৎকাল থেকে বাড়তে আরম্ভ করে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের বসন্তকালে প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। এই সময়ের মধ্যে ছেষট্টিটি জাপানী শহরে বিমানাক্রমণ করে এক লক্ষ টন বিস্ফোরক পদার্থ ফেলা হয়।' কিন্তু জাপানের উপর মার্কিণ বিমানাক্রমণ প্রকৃতিগত বিচারে, জার্মাণ শহরগুলির উপর ইঙ্গ-মার্কিণ বিমানাক্রমণের অনুরূপ ছিল। সামরিক লক্ষ্যবস্তু বাদ দিয়ে, ধ্বংস করা হয়, দরিদ্র জাপানীদের বসতি অঞ্চল। জাপান সরকার বলেছিলেন এই আক্রমণে বিনষ্ট হয় প্রায় বাইশ লক্ষ বাড়ীঘর, নিহত হয় দু'লক্ষ ষাট হাজার মানুষ। আর আহতের সংখ্যা ছিল চার লক্ষ বারো হাজারেরও বেশি।

সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যোগদান না করা পর্যন্ত, ইঙ্গ-মার্কিণ বিমান থেকে মাঞ্চুরিয়ার সামরিক ও শিল্পগত লক্ষ্যবস্তুর উপরে একটা বোমাও ফেলা হয়নি। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে,

সোভিয়েত সেনাদল মাঞ্চুরিয়া প্রবেশ করার পরে, মার্কিণ বিমানবহর মাঞ্চুরিয়ার সামরিক লক্ষ্য বস্তুর উপরে এলোপাথাড়ি প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করতে থাকে।

মার্কিণ সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রশান্ত মহাসাগরে শেষ অভিযান চালান পঁচিশে মার্চ, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে। ব্যাপারটা ছিল ওকিনাওয়ায় মার্কিণ সৈন্যদের অবতরণ। স্থানীয় জাপানী বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল আশী হাজারের মতো। মার্কিণ কর্তৃপক্ষ চার লক্ষ একান্ন হাজার আটশ ছেষট্টি জন সৈন্যের এক অভিযাত্রী দল ওকিনাওয়ায় পাঠালেন। যুদ্ধ চললো একুশে জুন, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত। এই তারিখের পর মার্কিণ সরকার সমস্ত সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে দেন। মার্কিণ শাসক মহলের জাপানী আক্রমণ ও ফ্যাশিবাদের মূল ঘাঁটি বিনষ্ট করার কোন ইচ্ছা ছিল না। বৃটেনের সঙ্গে একযোগে তাঁরা চেয়েছিলেন, একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে জাপানের শক্তিকে চূর্ণ করতে, যাতে দক্ষিণ সাগরেও চীনের মূল ভূখণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিণ রণকৌশলের রূপায়ণে, এই লক্ষ্যটাই চরম নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

জার্মাণীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণ, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের একটা মর্মান্তিক আঘাত হানলো। জাপানের যুদ্ধ পরিকল্পনায় ধরেই নেওয়া হয়েছিল যে ইউরোপে জার্মাণী জিতবে। এই ধারণাই ছিল জাপানের রণনৈতিক কাজের বনিয়াদ। তাছাড়া পররাজ্য আক্রমণের লক্ষ্যে জার্মাণ ও জাপানী নেতারা পরস্পরের সঙ্গে গভীর নৈকট্য অনুভব করতেন। অবিশ্যি ফ্যাশিস্ত রাষ্ট্রজোটের মধ্যে এসব সত্বেও, জার্মানীরই ছিল মুখ্য ভূমিকা। তাই জার্মানীর সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর জাপানের জয় পরাজয় বহুলাংশে নির্ভর করতো।

সুতরাং জাপানের পরাজয়ে, জার্মাণীর পরাজয় ছিল একটা মূল কারণ। জার্মাণী আত্মসমর্পণ করার পরে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ পরিকল্পনা বাণচাল হয়ে গেলেও, জাপ সরকার যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়াটাই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন।

জাপানের এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল ইঙ্গ-মার্কিণ নীতির তাৎপর্য সম্পর্কে জাপানের বিশেষ ধারণা। জাপান ভেবেছিল যে, এই নীতি যতোদিন থাকবে, ততোদিন নানা ধরণের কূটনৈতিক কলাকৌশল, সমঝোওতায় আসার সুযোগও পাওয়া যাবে। জাপ সরকার বিশ্বাস করতেন যে, দীর্ঘ দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে

গেলেও, সময় সুযোগ মতো তার সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে নোতুন কোন সোভিয়েত বিরোধী চক্রান্তে একজোট হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব হবে না।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অভিযানে জাপানী স্থল বাহিনীকে তেমন কোথাও যুদ্ধই করতে হয়নি। জাপানের স্থল বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী, সুসজ্জিত কোয়ান্টাং বাহিনী, মাঞ্চুরিয়ায় থাকার জন্যে, তার কোন ক্ষতিই হয়নি। তারা এখন যুদ্ধের জন্যে সদা প্রস্তুত।

যুদ্ধে জাপানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। খোদ জাপানে যুদ্ধোৎপাদনের পরিমাণ তখনো রীতিমতো বেশি। জাপানী সাম্রাজ্য বাদের প্রধান অর্থনৈতিক ও সামরিক বনিয়াদ মাঞ্চুরিয়ার শিল্প ব্যবস্থা ক্রমেই উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে যাচ্ছে। উনিশ শ' পঁয়ত্রিশের তুলনায় কয়লার উৎপাদন বেড়েছে শতকরা একশ' পঞ্চাশভাগ ও আকরিক লৌহের উৎপাদন শতকরা ছয় শ' ভাগ। মুকদেনে (Mukden) একের পর এক এমন ধরণের যুদ্ধ শিল্প গড়ে উঠেছে, যাদের প্রতিটির শ্রমিক নিযুক্তির পরিমাণ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। তাছাড়া আন্তং, লিয়াওইয়াং, ফুশুন প্রভৃতি শহরের যুদ্ধ শিল্প গড়ে উঠেছে। বিমাণাক্রমণের হাত থেকে শিল্পকে বাঁচানোর জন্যে, অনেক জাপানী শিল্পপতি, উনিশ শ' চুয়াল্লিশে ও পঁয়তাল্লিশে, মূল জাপানী ভূখণ্ড থেকে বহু প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত করেছে মাঞ্চুরিয়ায়। কোরিয়ায় নোতুন করে যুদ্ধ শিল্প সংগঠিত করে, জাপান তার কিছু প্রতিষ্ঠানকে সরিয়ে দিয়েছে সেখানে।

জাপানী অব্যবহৃত সম্পদের বহর দেখে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার ভেবেছিলেন যে জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ এখনো বহু মাস, হয়তো বা কয়েক বছরও চলতে পারে।

এই ধারণার ভিত্তিতে মার্কিণ সমর নায়ক পরিষদ যে অভিযান পরিকল্পনা রচনা করেন, তাতে জাপানী দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণতম স্থানে, কিউস্যু দ্বীপে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের শেষের দিকে মিত্রপক্ষের সৈন্য অবতরণ করবে স্থির করা হয়। আর টোকিয়ো ইয়াকোহামা অঞ্চলে কোনমতেই তা উনিশ শ' ছেচল্লিশের আগে করা যাবে না। আবার এরই সঙ্গে বলে রাখা হয়েছিল যে এই সব তারিখগুলি পিছিয়ে যেতে পারে। মার্কিণ যুদ্ধ দপ্তরে বিশেষজ্ঞ মহলে এটাই ছিল সবচেয়ে চালু ধারণা যে, "উনিশ শ' সাতচল্লিশ কিম্বা আটচল্লিশের আগে জাপানকে হারানো যাবে না।"[৮] মার্কিণ দেশের যুদ্ধ সম্পর্কিত তথ্যাদি দপ্তর এই স্বীকারোক্তি করে যে, "জাপানী প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার প্রচেষ্টায়,

আমরা এ পর্যন্ত কিছু আঁচড় কাটা ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছি কিনা সন্দেহ।"

সেই সময় বলা হয়েছিল জাপানের সৈন্যসংখ্যার পরিমাণ প্রায় চল্লিশলক্ষ। তা ছাড়া আছে বিশ লক্ষ মানুষ, যাদের সৈন্যদলে যে কোন সময়ে আনা যেতে পারে এবং দেশে আরো পনের লক্ষ লোক যাদের সৈন্যদলে যোগদিতে বলা যাবে।[৯]

জাপানকে যে আদৌ হারানো যেতে পারে, সে কথায় চার্চিলের স্থির বিশ্বাস ছিল না। তিনি বলেছিলেন জাপানের বিরুদ্ধে যে মার্কিণ ও বৃটিশ অভিযান পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে, "ইউরোপেও তার চেয়ে বেশি কিছু করা হয়নি এবং কতো যে বৃটিশ ও মার্কিণ জীবন ও সম্পদ এর জন্যে ব্যয় করতে হবে তার হিসাব কেউ করতে পারেনা। তেমনই একথা বলা আরো শক্ত যে জাপানের অধিকৃত অঞ্চলে এবং মূল জাপানী ভূখণ্ডে, তার প্রতিরোধ শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করতে কতো কাল সময় লাগবে।"[১০]

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাতে, মার্কিণ শাসকরা চীনদেশ দখল করে তাকে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে পরাধীন রাখার জন্যে, একটা ব্যাপক অভিযান পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন চীনের বিরুদ্ধে। ফলে চীনের জনগণের জীবনেও বিপদের আশংকা অত্যন্ত বড়ো হয়ে দেখা দেখা দিল। চীনে মার্কিণ দেশের বিশেষ প্রতিনিধিরা তারই উদ্যোগ আয়োজন পাকা করে রাখতে সুরু করলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন চীনে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত ও মার্কিণ রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত প্রতিনিধি জেনারেল প্যাট্রিক হারলী (Patrick Hurley) ও চীনে মার্কিণ সেনাদলের অধিনায়ক, জেনারেল অ্যালবার্ট সি, ওয়েডেমেয়ার (Wedemeyer)।

চীনের গণমুক্তি ফৌজ দেশটা দখল করার পথে যে একটা প্রবল অন্তরায়, সে ব্যাপারে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা যথেষ্ট সচেতন ছিল। তাই চীনের মুক্ত অঞ্চলের প্রতি শক্ত হাতে একটা কঠোর নীতি প্রয়োগ করার জন্যে, তারা চিয়াংয়ের উপর চাপ দিতে লাগলো। সেই নির্দেশানুসারে চিয়াং, চীনের মুক্ত অঞ্চল—হোনান, হুনান, চেকিয়াং, ফুকিয়েন, কোয়াণ্টাং প্রভৃতি প্রদেশ গুলিতে, মুক্তি ফৌজের অষ্টম ও চতুর্থ রুট বাহিনীর বিভিন্ন শাখা ও পার্টিজান দলগুলির বিরুদ্ধে, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের জুন মাসে ব্যাপক অভিযান সুরু

করলেন। মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে কুওমিণ্টাং সৈন্যরা, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের জুলাইয়ে শেনসু—কানসু—নিংসিয়ার মুক্ত অঞ্চলে ব্যাপক আক্রমণ সুরু করলো। একটা নোতুন গৃহযুদ্ধে চীনে দুই পক্ষের শক্তিপরীক্ষা সুরু হয়ে গেল।

গণমুক্তি ফৌজ কুওমিণ্টাংয়ের আক্রমণ প্রতিহত করে দিল। কিন্তু তাতেও চিয়াং কাইশেকের চৈতন্য হলো না। তিনি হারলীর উপদেশ ও মার্কিণদের ব্যাপক সামরিক সাহায্যে বলীয়ান হয়ে, চীনের মুক্ত অঞ্চলের বিরুদ্ধে বৃহত্তর ও ব্যপকতর আক্রমণ সুরু করার জন্যে প্রস্তুতি চালালেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ একটা নোতুন ঘটনা ঘটলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করতে অগ্রসর হলো। যে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার, জাপানের সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে, সোভিয়েত ইউনিয়নকে দুর্বল করে ফেলবেন মনে করেছিলেন, তাঁরা রীতিমতো শংকিত হয়ে উঠলেন। ইউরোপে সোভিয়েতের অভূতপূর্ব, চমকপ্রদ বিজয় সাফল্যের পরে, জাপানের সঙ্গে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের পরিকল্পনায় সন্দেহ ক্রমেই বাড়ছিল। মার্কিণ ও বৃটিশ শাসকমহল তাই জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের যুদ্ধে যোগদান, সোভিয়েত অভিযানের প্রভাব, এককথায় জাপানের পরাজয়ে সোভিয়েতের ভূমিকা থেকে সারা বিশ্বের মনোযোগ সরিয়ে, তাকে ছোট করে দেখানোর জন্যে বিশেষ উৎসুক হয়ে উঠলেন। সাটারডে রিভিয়্যু অব্ লিটারেচার পত্রিকায় পাঁচই জুন, উনিশ শ' ছেচল্লিশ সংখ্যায়' মার্কিণ বিমান সচিব, টমাস কে ফিন্‌লেটার (Finletter) লিখে ছিলেন যে, রাশিয়া যুদ্ধে যোগদান করার পূর্বে জাপানকে পরাজিত করা কিম্বা অন্ততঃ রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে জোরালো ভাবে কিছু করার পূর্বেই, জাপানকে পরাজিত করার জন্যেই পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল।

সেই জন্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে সোভিয়েতের যোগদান করার দিনেই পারমাণবিক বিস্ফোরণের দিন স্থির করেছিলেন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পারমাণবিক বোমার গবেষণায় নিযুক্ত ছিল, তাদের প্রতি সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দশই আগষ্টের কাছাকাছি কোন একটা দিন, সেই চরম দিন হিসাবে গোপনে নির্দেশিত হয়েছিল। যারা পারমাণবিক বোমার কারিগরী দিকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তঁদের বলা হয়েছিল যে কোন উপায়ে

যতো ব্যয়, দারিদ্র, ঝুঁকি, ক্ষয়ক্ষতি হোক না কেন, এই দিনের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণের সমস্ত প্রস্তুতি শেষ করতেই হবে।[১১] হিরোশিমার বোমার জন্যে সমস্ত গবেষণা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সঞ্চিত ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয়েছিল। তেমনি সমস্ত সঞ্চিত প্লুটোনিয়াম ব্যহার করা হয় নাগাসাকির বোমার জন্যে।[১২]

পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের কোন সামরিক প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। অ্যাড্মিরাল লিহাই লিখেছেন: "হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এই বর্বর অস্ত্র ব্যবহার করে, জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমাদের তেমন কোন সাহায্য হয়নি বলেই আমার ধারণা। এর কোন প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করিনা।"[১৩]

পূর্বতন কালের মার্কিণী "লম্বা লাঠির" কূটনীতির জায়গা তখন দখল করছে "পারমাণবিক কূটনীতি"। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা সারা পৃথিবীকে তাদের কথা মতো চালাবার প্রত্যাশা করছে পারমাণবিক অস্ত্রের জোরে। শান্তি গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার রক্ষক ও সমর্থক হিসাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে মর্যাদা ও প্রভাব অর্জন করেছে, মার্কিণ দেশের শাসকমহল তাকে দুর্বল করে দিতে তখন বদ্ধপরিকর। বৃটিশ পদার্থবিদ্ পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট তাই লিখেছেন "সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সামরিক সক্রিয়তার সমাপ্তি পর্ব সূচনা না করে রাশিয়ার সঙ্গে ঠাণ্ডা কূটনৈতিক যুদ্ধের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের সূচনা করেছিল।"[১৪]

তার স্বাভাবিক নীতি অনুযায়ী, মার্কিণ সরকার পারমাণবিক বোমাগুলি কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তু ধ্বংস করার জন্যে ব্যবহার করলেন না। বোমা দুটি ফেলা হলো দু'টি জনবহুল জাপানী শহরের অসামরিক জনগণের উপরে। একটি পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হলো, টোকিয়ো থেকে অপসারিত ছোট্ট জাপানী ছেলেমেয়েদের হোষ্টেলের উপরে। সেদিনটা ছিল ছয়ই আগষ্ট। এটা মোটেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার নিদর্শন বা সিদ্ধান্তের ক্রটী নয়। হোষ্টেলের বাড়ীগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্যে যে কংক্রীটের সেতু নির্মিত হয়েছিল, 'সেটাকেই' লক্ষ্যবস্তু করা হয়। এটাই প্রমাণ করে দিল আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃতির ভিত্তিতে গৃহীত প্রাথমিক সূত্র, যুদ্ধের

নিয়মকানুন ও মানবতার নীতির প্রতি মার্কিণ শাসক মহলের তাচ্ছিল্য কতোখানি।

এই ঘটনার পরে সারা পৃথিবীতে যে প্রচণ্ড অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ফেটে পড়লো তাকে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের একটা বড়ো রকমের নৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যর্থতা বলা যায়। এই ঘটনার স্বীকৃতি জানাতে গিয়ে, নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সের সামরিক বিশেষজ্ঞ হ্যানসন্‌ ডবলিউ বল্ডউইন লিখেছেন :

"পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করার জন্যে আমাদের প্রচুর মূল্য দিতে হলো আমাদের গায়ে যেন জানোয়ারের ছাপ মেরে দেওয়া হলো।"[১৫] তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই যে, অনেক লোক যারা জাপানী শহরের উপর পারমাণবিক বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে জড়িত ছিল, এখন দায়িত্ব এড়িয়ে সমস্ত বিষয়টিকে ধিক্কার দিতে লাগলো, যে অপরাধে অংশতঃ তারা নিজেরাও দায়ী ছিল। যেমন দেখা যায় অ্যাডমিরাল লিহাই লিখছেন :

"এ ব্যাপারে আমার নিজের অনুভূতি ছিল এই রকম যে এটি (পারমাণবিক বোমা) প্রথম ব্যবহার করার সময় আমরা এমন একটা নৈতিক আদর্শ গ্রহণ করতে চলেছি যা ইতিহাসের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগে বর্বর মানুষদের পক্ষে শোভন হতো বেশি। অসভ্য বর্বরদের যুদ্ধযাত্রার উপযুক্ত এই নোতুন, ভয়াবহ মারণাস্ত্রকে একালে সেই বর্বরতার সঙ্গে তুলনীয় মনে করা যায়, যার সঙ্গে খৃষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গীর আছে মৌল বিরোধ।"[১৬]

জাপানী লোকরা বলেছেন যে হিরোশিমায় খুব কম পক্ষে দু'লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং নাগাসাকিতে নিহত ও আহত মানুষের সংখ্যা দু'লক্ষের কম ছিল না কোন মতে।

যে সময়ে সোভিয়েত সরকার সেনাদলকে নোতুন রণাঙ্গনে পাঠাবার সমস্ত আয়োজন শেষ করে, জাপানীদের উপর আক্রমণ সুরু করেছেন, ঠিক সেই সময়েই মার্কিণ সরকার পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করলেন, শুধু এইটা দেখাবার জন্যে, যে জাপানের পরাজয় ঘটেছে এই নোতুন অস্ত্র ব্যবহারের জন্যে।

আসলে কিন্তু পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ কেবল সামরিক প্রয়োজন মেটাতে পারেনি, যা সামরিক বিষয়কে প্রভাবিতও করেনি।

চার্চিল লিখেছিলেন : "জাপানের নিয়তি পারমাণবিক বোমায় স্থির নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, একথা মনে করলে ভুল করা হবে।"[১৭] হ্যানসন্‌ বল্ডউইনও

অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলেছেন যে, "জাপানী জনগণ অথবা তাদের নেতৃবৃন্দ, পারমাণবিক বোমা দেখে আমরা যেমন অভিভূত হয়েছিলাম, তেমনটি হয়নি মোটেই।"[১৮]

আমেরিকার সংবাদপত্র, রেডিয়ো সংস্থা ও রাজনীতিকেরা তারস্বরে পারমাণবিক বোমার সক্রিয়তা সম্বন্ধে এমন প্রচার চলাতে লাগলো যেন পৃথিবীর মানুষ ভয়ে শিউরে ওঠে। সে দেশের চরমপন্থীরা দাবী করতে লাগলো যে পৃথিবীর সবদেশ ও জাতি মার্কিণ আদেশ ও নির্দেশ মেনে চলুক। তারা "নিখিল বিশ্ব সরকারের" পরিকল্পনা নিয়ে নানা আলাপ আলোচনা করতে লাগলো, যার প্রকৃত উদ্দেশ্য মার্কিণ আধিপত্য চরম করে তোলা।

॥ তিন ॥

জার্মাণীর পরাজয় এবং সেই কারণে জাপানের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবস্থানগত অবনতি সত্ত্বেও, জাপ সরকার একগুঁয়েমী করে তাঁদের সোভিয়েত বিরোধী নীতি অপরিবর্তিত রাখলেন। সমগ্র যুদ্ধচলাকালীন সময় ধরে, জাপান তার মিত্রদেশ জার্মাণীকে যথাসম্ভব সাহায্য করে এসেছে। তার জন্যে সোভিয়েত মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে, সোভিয়েত সেনাদলকে দেশের পূর্ব সীমান্ত রক্ষার জন্যে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য করেছে। রিবেনট্রপ এরই জন্যে টোকিয়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন যে রাশিয়া অন্ততঃ বাধ্য হয়েছে সম্ভাব্য রুশ জাপান যুদ্ধ এড়াবার জন্যে পূর্ব রাশিয়ায় সৈন্য সমাবেশ করতে।[১৯]

সোভিয়েত জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করেও, জাপান জার্মাণীকে অন্য এক দিক থেকে যথেষ্ট সাহায্য করে ছিল। উনিশ শ' একচল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশের মধ্যে জাপানেব নৌবহর, একশ আটাত্তরটি সোভিয়েত বাণিজ্য জাহাজকে আটক করে। তার মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে সে শক্তি প্রয়োগও করেছিল। তা ছাড়া ডুবো জাহাজে করে, জাপান জার্মাণীকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল পাঠায় ইউরোপে। এই ভাবেই রবার, টিন টাংষ্টেনও কুইনাইন পাঠানো হয়েছিল।

সমগ্র যুদ্ধকালীন সময় ধরে, জাপ সরকার তাঁদের সোভিয়েত ইউনিয়নে নিযুক্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের, নিজের ও জার্মাণীর স্বার্থে গুপ্তচর হিসাবে

ব্যবহার করেছিলেন। জাপানী গুপ্তচর বিভাগের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল সোভিয়েত সেনাদল ও সোভিয়েত শিল্পব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা।

তাই বলা যায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা চরম সংকটময় মুহূর্তে, যখন ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধে তার সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ, তখনই জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের নীতি, তেরোই এপ্রিল, উনিশ শ' একচল্লিশের সোভিয়েত জাপান নিরপেক্ষতার চুক্তি ভঙ্গ করে, তাদের স্বার্থ সম্প্রসারণের প্রয়াস পেয়ে ছিল। এই সব দেখে সোভিয়েত সরকার পাঁচই এপ্রিল, উনিশ শ, পঁয়তাল্লিশে এই চুক্তিকে অস্বীকার করলেন।

সময় কাটাবার জন্যে জাপ সরকার একটা জটিল কূটনৈতিক খেলা সুরু করলেন। উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশের জুলাই মাসের মাঝামাঝি, জাপান সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্যে অনুরোধ করলো। সোভিয়েত সরকার জাপানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, ইঙ্গ-মার্কিণ সরকারকে সমস্ত বিষয়টি জানিয়ে রাখলেন।

পট্সড্যামে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিনিধি দল জাপান প্রসঙ্গেও অনেক আলোচনা করেন। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপ ও এশিয়ায় গণ-আন্দোলন ক্রমেই জোরালো হয়ে উঠেছে। তারই প্রভাব দেখা যায় সম্মেলনে গৃহীত, জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে আহ্বান করার ঘোষণা-পত্রে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীনের স্বাক্ষরযুক্ত হয়ে, সেই ঘোষণাপত্র ছাব্বিশে জুলাই উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে প্রকাশিত হলো। সোভিয়েত সরকার তখন সেই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করতে পারেননি, কারণ জাপানের সঙ্গে সোভিয়েতের তখনও যুদ্ধাবস্থার সম্পর্ক আসেনি।

ঘোষণাপত্রে কাল বিলম্ব না করে জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হলো দিন কয়েকের মধ্যেই জাপ সরকার ঘোষণা করলেন যে এই ঘোষণাপত্র সম্পর্কে তাঁদের কোন মাথা ব্যাথা নেই, তাঁদের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী তাঁরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।

পটসড্যাম ঘোষণাপত্রে পরাজিত জাপানের ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক নীতি প্রয়োগ করা হবে, তা বলে দেওয়া হয়েছিল। সেই নীতিগুলি হচ্ছে নিম্নরূপ :

যারা জনগণকে প্রতারিত, বিভ্রান্ত করে জাপানকে বিশ্ববিজয়ের পথে টেনে

নিয়ে গিয়েছিলেন, দেশ থেকে তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব চিরতরে দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে ;

কায়রো ঘোষণার সর্তাবলী কার্যকরী করা হবে এবং জাপানের সার্বভৌমত্ব হোনস্থ, হোক্কাইডো, কিউসু, শিকোকু দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য ছোট দ্বীপ যাদের সম্বন্ধে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, সীমাবদ্ধ থাকবে ;

সমস্ত যুদ্ধ অপরাধীদের সমস্ত অপরাধের যথাযথ বিচার করা হবে :

জাপানের জনগণের গণতান্ত্রিক চেতনা প্রবণতা পুনরুজ্জীবিত করার পথে সমস্ত বাধা অপসারিত করতে হবে। চিন্তা, বাক্, ধর্ম ও মৌলিক মানবিক অধিকার দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ;

জাপানকে সেই সমস্ত শিল্প সংস্থা বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হবে যা তার জাতীয় অর্থনীতির ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যে প্রয়োজন, কিন্তু পুনরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনা আছে এমন কোন শিল্প রাখতে দেওয়া হবে না ;

জাপানী সেনাদলকে সম্পূর্ণভাবে অস্ত্রত্যাগ করিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেওয়া হবে ;

জাপান থেকে মিত্রপক্ষীয় সেনাদলকে, এই উদ্দেশ্যগুলি সাধিত এবং জাপানী জনগণের স্বাধীনভাবে নিজেদের ইচ্ছার ভিত্তিতে জাপানে একটি শান্তিপ্রিয়, দায়িত্বশীল সরকার গঠিত হওয়ার পরে, ফিরিয়ে আনা হবে।[২০]

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিঘোষিত গণতান্ত্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শের সঙ্গে এই কর্মসূচী মূলতঃ সঙ্গতি রক্ষা করলেও, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার আসলে তাদের শেষ পর্যন্ত মেনে চলতে কোনমতে ইচ্ছুক ছিল না। কোন কোন গোষ্ঠীর ইচ্ছার প্রকাশ দেখা গেল যুদ্ধ সচিব ষ্টিমসনের এই ঘোষণার মধ্যে যে জাপানের 'বর্তমান' রাজবংশের মাধ্যমে একটা নিয়মতান্ত্রিক 'রাজতন্ত্রকে' বজায় রাখতে হবে।

এদিকে মার্কিণ সরকার এককভাবেই জাপান দখলের সিদ্ধান্ত নিলেন। এমন কি সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করার পরেও, জাপান অধিকারের একটা যৌথ কার্যক্রমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি পাওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। যাই হোক অন্ততঃ এই ব্যাপারে একটা বোঝাপড়া হলো শেষপর্যন্ত যে কোরিয়ায় জাপানের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ কার্যকরী করার বিষয়ে সোভিয়েত ও মার্কিণ সামরিক নেতৃত্ব একত্রে কাজ করবেন। ফলে

কোরিয়ায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত অঞ্চলের মধ্যে যে অস্থায়ী সীমারেখা একটা টানা হলো তা মোটামুটি আটত্রিশ ডিগ্রী অক্ষাংশ বরাবর গেল। এই রেখার উত্তরের ভূখণ্ড রইলো সোভিয়েতের অধীনে আর দক্ষিণাংশ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে।

আটই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সোভিয়েত সরকারের পক্ষ থেকে জাপ সরকারের কাছে একটা বিবৃতি পাঠানো হয়। এতে বলা হয়ে ছিল যে, "হিটলার জার্মাণীর পরাজয় ও আত্মসমর্পণের পরে, জাপানই হলো বৃহৎ-শক্তিদের মধ্যে একমাত্র দেশ, যারা এখনো যুদ্ধ চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক।" বিবৃতিতে বলা হয় যে, সোভিয়েত সরকার, "শান্তিকে ত্বরায় প্রতিষ্ঠা করে, জনগণকে আরো অনেক দুঃখ কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারেব হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও তার লক্ষ্য যে জার্মাণী বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ না করে নিজের উপর যে ধ্বংসলীলা ও বিপদকে স্বেচ্ছায বরণ করে নিয়েছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন চায় যে জাপানী জনগণকে যেন সেই দুর্দশায় পড়তে না হয়।" এই উদ্দেশ্য নিয়ে তার মিত্রপক্ষীয কর্তব্য পালন করার জন্যে, সোভিয়েত সরকার নয়ই আগষ্ট তারিখে ঘোষণা করলেন যে এখন থেকে তাঁরা জাপানের সঙ্গে সম্পর্কে যুদ্ধবস্থা আছে বলে মনে করবেন। ক্রিমিয়া সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন কাজ করতে উদ্যোগী হলো।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিম্নলিখিত আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

জাপানী আক্রমণকারীদের নিশ্চিহ্ন করে, প্রাচ্যে যুদ্ধ ও আক্রমণের সম্ভবনা বিদূরিত করতে হবে, এশিয়ার জনগণকে জাপানের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিতে হবে; দূর প্রাচ্যে সোভিযেত ইউনিয়নের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে হবে, দূর প্রাচ্যে একটা দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করে, দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। সমস্ত জনগণের সর্বোচ্য স্বার্থের সঙ্গে এই আদর্শের সামঞ্জস্য থাকায়, সর্বত্র তা মানুষের সমর্থন লাভ করেছিল।

দশই আগষ্ট মঙ্গোলীয় সাধারণতন্ত্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এতোদিন মঙ্গোলীয় সৈন্যবা সোভিয়েত সেনাদলকে নানা ভাবে সাহায্যও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলছিল। চীনের গণমুক্তি ফৌজ ও চৈনিক পার্টিজানরাও এই একই সময়ে জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ সুরু করে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও বৃটেনের সামরিক বিশেষজ্ঞরা, সোভিয়েত ইউনিয়ন যে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ কিছু করতে পারবে বলে বিশ্বাস করতেন না। নিউইয়র্ক টাইমসে হ্যানসন বল্ডউইন লিখেছিলেন যে সোভিয়েত সেনাদলকে দূরত্ব ও অন্যান্য ধরণের যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হবে, তা সহজে দূর করা যাবে বলে মনে হয় না। দশই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, ডেইলী টেলিগ্রাফ ও মর্নিং পোষ্টের সামরিক পর্যবেক্ষক, লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ, জি, মার্টিন লেখেন যে, "রুশদের চূড়ান্ত কোন সফলতা লাভ করতে হলে ছয় মাস বা তারো বেশি সময় ধরে অভিযান চালাতে হবে।" কিন্তু সব ভবিষ্যদ্বাণীই ভুল প্রমাণিত হয়ে গেল। একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী অভিযান চালিয়ে সোভিয়েত সেনাদল কোয়ান্টাং বাহিনীকে পরাজিত করে, জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করলো।

দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত আক্রমণ সমগ্রভাবে মার্শাল ভ্যাসিলেভস্কির অধীনে পরিচালিত হলো। এতে অংশ গ্রহণ করে ট্রান্সবৈকাল বাহিনী (মার্শাল ম্যালিনোভস্কির) নেতৃত্বে, প্রথম দূরপ্রাচ্য বাহিনী (মার্শাল মেরেৎস্কোভ) দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য বাহিনীর (জেনারেল পুর্কাইয়েভ) এবং সোভিয়েত প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের কয়েকটি শাখা। সোভিয়েত সেনাদলের প্রধান লক্ষ্য ছিল মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী জাপানের প্রধান সামরিক শক্তি কোয়ান্টাং বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা। এই সেনাদলে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে মোট আটটি পদাতিক ও একটি ছত্রিবাহিনী ছিল। ট্রান্স বৈকাল বাহিনীকে দেওয়া হয়েছিল সবচেয়ে বড়ো আক্রমণ ধারা রচনা করার ভার। সবচেয়ে স্বল্পদূরত্ব অগ্রসর হয়ে তারাই প্রধান সামরিক তৎপরতা সুরু করলো, চ্যানচুং-মুকদেন অঞ্চলে। স্তেপমরু অঞ্চল ও খিনগান পর্বতমালা পার হয়ে তাদের অভিযানের পথ করে নিতে হয়েছিল। জাপানী সামরিক নেতৃত্বের কাছে এই অঞ্চল থেকে আঘাত রীতিমতো অপ্রত্যাশিত ছিল। কারণ তাঁরা ভেবেছিলেন যে খিনগান পর্বতমালা জাপানী সেনাদলের একটা স্বাভাবিক প্রতিরোধ রচনা করেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য বাহিনী গিরিন ও হারবিন অঞ্চল আক্রমণ করে জাপানী সেনাদলকে দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে এবং কোয়ান্টাং বাহিনীর কোরিয়ায় পশ্চাদপসরণের পথ বন্ধ করে দেয়। তাদের এই কৌশল কার্যকরী

করতে তারা সোভিয়েতের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের কাছে প্রভূত সাহায্য পেয়েছিল।

জার্মাণীর আত্মসমর্পণের পর, জাপানী কর্তৃপক্ষ চেষ্টা করছিলেন, দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত আক্রমণের সম্ভাব্য সময়টা জানার জন্যে। উনিশ শ' ছেচল্লিশের বসন্তকাল তাঁদের কাছে যথেষ্ট সম্ভাবনা পূর্ণ মনে হয়েছিল। স্বভাবতই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সোভিয়েত আক্রমণ তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ একটা হতচকিত করার মতো ঘটনাই ছিল।

সমগ্র রণাঙ্গন জুড়ে সোভিয়েত বাহিনী, নয়ই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে আক্রমণ সুরু করলো। সোভিয়েতের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহর, কোয়াণ্টাং বাহিনীর সমুদ্রপথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। সোভিয়েত নৌবাহিনীর বিমান বহর, উত্তর কোরিয়ায় জাপানী নৌঘাঁটির উপর বোমা বর্ষণ করতে সুরু করলো।

ছয় দিন লড়াই চলার পর সোভিয়েতের প্রথম দূর প্রাচ্য বাহিনী জাপানী প্রতিরোধ ভেঙ্গে পূর্ব মাঞ্চুরিয়া সীমান্তে শত্রু সৈন্যকে বিধ্বস্ত করে দিল। চোদ্দই আগষ্টের মধ্যে মাঞ্চুরিয়ার অভ্যন্তরে একশ' সত্তর কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে, কোয়াণ্টাং বাহিনীকে কোরিয়ার সংযোগ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ইতিমধ্যে সোভিয়েতের দ্বিতীয় দূর প্রাচ্য বাহিনী জাপানীদের স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে, ছোট খিনগান পর্বতমালা পার হয়ে প্রায় একশ' কুড়ি কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে হারবিন ও সিত্সীহারের কাছাকাছি এসে পড়ে। অন্যদিকে ট্রান্সবৈকাল বাহিনী, মঙ্গোলীয় সেনাদলের সঙ্গে এক যোগে, রণাঙ্গনের প্রধান অংশে গ্রেট খিনগান পর্বতমালা পার হয়ে অগ্রসর হতে থাকে। ছয় দিনে তারা প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। সোভিয়েত বাহিনীর রণাঙ্গনে এই ভিন্ন ভিন্ন অংশে সক্রিয়তার ফলে কোয়াণ্টাং বাহিনী নানা অংশে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

যেদিন সোভিয়েত আক্রমণ সুরু হলো, সেই দিনেই জাপানী শাসকরা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও বৃটেনের সঙ্গে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্যে চেষ্টা করতে আরম্ভ করলেন। নয়ই আগষ্ট সন্ধ্যা নাগাদ মাঞ্চুরিয়া রণাঙ্গনের খবরাখবর টোকিয়ো পৌঁছে গেল। তখন দেখা গেল যে কোয়াণ্টাং বাহিনী রীতিমতো শক্তিশালী হওয়া সত্বেও সোভিয়েত আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করার

মতো শক্তি তার নেই। দশই আগষ্ট রাত তিনটের জাপান সরকার ছাব্বিশে জুলাইয়ের ঘোষণাপত্রের সর্তাবলী মানতে রাজী আছেন জানালেন, অবিশ্যি এই ধারণা থেকে সম্রাটের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হবে না। তার সার্বভৌম ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

জাপানের বিবৃতি সেই দিনেই তার চারজন প্রতিপক্ষের কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু দেখা গেল এটা চাল ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ পট্সড্যামের সর্তাবলী মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জাপ সরকারে সেই ঘোষণার যা ছিল মূল কথা—জাপানের বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ ও জাপান থেকে প্রতিক্রিয়াশীল জঙ্গীবাদী কর্তৃত্বের অবলুপ্তিতে গররাজী মনোভাব আর চাপা রাখা গেল না। জাপ সরকার আশা করেছিলেন যে তাঁদের বিবৃতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনে সাদরে গৃহীত হবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যাখ্যাত হবে। ফলে ফ্যাশি বিরোধী মৈত্রীতে এখনই ফাটল ধরাণো যাবে।

বাস্তবিক পক্ষে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার জাপানী বিবৃতি গ্রহণ করতে যথেষ্ট ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু পট্সড্যাম ঘোষণাপত্রের সর্তাবলী পূরণ করার পক্ষে সোভিয়েতের দৃঢ় অনমনীয় মনোভাব অনেক জটিলতা এড়িয়ে যেতে সাহায্য করলো। এগারোই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীনের সরকার একযোগে জানালেন যে জাপানী বিবৃতি গ্রহণ যোগ্য নয়। জাপানকে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হলো যে তাকে বিনা সর্তে আত্ম-সমর্পণ করে পট্সড্যাম ঘোষণার সমস্ত সর্তাবলী পালন করতে হবে এবং সমস্ত লড়াই বন্ধ করে অস্ত্রত্যাগ করতে হবে।

তেরোই আগষ্ট সকালে জাপানের হাতে চতুঃশক্তির বক্তব্য গিয়ে পৌঁছলো। সারাদিন ব্যাপী মন্ত্রিসভার এক অধিবেশনে এই জবাব নিয়ে বিচার বিবেচনা করা হলো। পরদিন চোদ্দই আগষ্ট সেই আলোচনা আবার চললো। ততোক্ষণে কোয়ান্টাং বাহিনীর বিপর্যয়ের খবর টোকিয়োতে এসে গেছে। জাপ সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন সম্রাট বেতারে এক ভাষণ দিয়ে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোয়ান্টাং বাহিনীর কাছে খবর পাঠানো হলো, শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে সোভিয়েত সেনাদলকে রুখতে হবে।

চোদ্দই আগষ্ট, জাপ সরকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন যে তাঁরা পট্সড্যাম সর্তাবলী মেনে নিয়েছেন। নাৎসীদের মতোই জাপানীরা চেষ্টা করলো

মার্কিণ ও বৃটিশ শাসক মহলের সঙ্গে মোটামুটি একটি বোঝাপড়ায় আসতে, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ জোরদার করে চালিয়ে যেতে পারে।

মার্কিণ সরকার জাপানের পট্‌সড্যাম ঘোষণাপত্র মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন। জাপানের এই খবর এসে পৌঁছবার পঞ্চাশ মিনিট পরে, রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান হোয়াইট হাউসে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে এই খবরকে তিনি জাপানের বিনাসর্তে আত্ম-সমর্পণ বলে মনে করছেন এবং সেই জন্যে তিনি মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়েছেন। ট্রুমান জেনারেল ম্যাকআর্থারকে মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে, জাপানের আত্মসমর্পণ গ্রহণ ভার দিলেন।

পরদিন ম্যাকআর্থার জাপানীদের সঙ্গে আদান প্রদানের জন্যে একটা বেতার সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করলেন। ম্যাকআর্থারের ম্যানিলাস্থিত সদর কার্যালয়ে একটা জাপানী সামরিক মিশনকে আসতে বলা হলো।

সেই দিনেই ম্যাকআর্থার এক নির্দেশনামা প্রচার করে, যুদ্ধ বিরতির আদেশ জারী করলেন। মার্কিণ সামরিক নেতৃত্ব, ম্যাকআর্থারের নির্দেশনামা মস্কোস্থিত মার্কিণ সামরিক মিশনের নেতা, মেজর জেনারেল ডীনের মাধ্যমে, সোভিয়েত সামরিক নেতৃত্বের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যাকআর্থার আশা করেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নও জাপানের বিরুদ্ধে সমস্ত সামরিক তৎপরতা বন্ধ করে দেবে। কিন্তু এই জটপাকানো কূটনৈতিক চাল উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে ব্যর্থ হলো। সোভিয়েত সেনাদল তাদের সক্রিয়তা অপরিবর্তিত রাখলো।

সোভিয়েত সেনাদলের সামরিক তৎপরতা কোনমতে স্থগিত করে দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে ছিল কোয়ান্টাং বাহিনীকে সম্পূর্ণ বিপর্যয়ের মুখ থেকে রক্ষা করা। কিন্তু মার্কিণ সরকারের এটা ছাড়াও আরো সুদূর প্রসারী লক্ষ্য ছিল। তেরোই আগষ্ট মার্কিণ নৌবহরের অধিনায়ক, অ্যাডমিরাল নিমিৎস্‌ (Nimitz) "রাষ্ট্রপতি ট্রুমানের কাছ থেকে একটি নির্দেশ পেলেন যে দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানীদের প্রাক্তন ঘাঁটি পোর্ট আর্থারের কাছে দাইরেন (Dairen) বন্দর, রুশরা এসে পড়ার আগেই দখল করে নিতে হবে।"[২১] ষোলই আগষ্ট মার্কিণ ছত্রী বাহিনীকে মুকদেনের উত্তর পশ্চিমে নামিয়ে দেওয়া হলো। এ সমস্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে মার্কিণ সরকার মাঞ্চুরিয়া দখল করতে ব্যগ্র ছিলেন।

ষোলই আগষ্ট সোভিয়েত সরকার মার্কিণ সরকারের কাছে প্রস্তাব করলেন যে হোক্কাইডোর উত্তরাংশে যে জাপানী সৈন্য আছে তারা যেন সোভিয়েত সেনাদলের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবী প্রত্যাখ্যান করে, মার্কিণ সরকার প্রমাণ করলেন যে তাঁদের সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন-গত অধিকারও স্বার্থরক্ষা করার জন্যে কোন আগ্রহই নেই। এমন কি তাদের প্রতি তাঁরা শ্রদ্ধাশীলও নন।

সেই দিনই রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করলেন যে জার্মানীর মতো জাপানেও বিভিন্ন যুদ্ধমান মিত্রপক্ষের অধিকৃত অঞ্চল করতে দেওয়া হবে না। জাপান শুধু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একক দায়িত্ব হয়ে থাকবে।[২২] অথচ সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিণ সরকার, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বললেন যে তাঁদের কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে বিমান ঘাঁটি করতে দেওয়া হোক। রাষ্ট্রপতি ট্রুমান প্রসঙ্গতঃ জানিয়ে দিলেন যে তিনি কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জকে সোভিয়েতের নয়, জাপানী ভূখণ্ড বলে মনে করেন। ইয়াল্টা সিদ্ধান্তকে সরাসরি নাকচ করে দেওয়ার এটা হলো একটা প্রকট মার্কিণ প্রচেষ্টা, কারণ ইয়াল্টায় বলা হয়েছিল যে কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জকে তার আইন সঙ্গত অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মার্কিণ দাবী প্রত্যাখ্যান করে জানালো যে, অ্যালুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের যে কোন একটি বিমান ঘাঁটিকে যদি সোভিয়েত বাণিজ্য বিমান বহরের ব্যবহারের জন্যে দেওয়া হয়, তাহলে প্রতিদানে সোভিয়েত সরকার কিউরাইলের কোন একটি দ্বীপে, কোন একটি বিমান ঘাঁটি মার্কিণ বাণিজ্য বিমান বহরের ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিতে পারেন।

আরো দেখা গেল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ও উদ্যোগে, চীনে জাপানী সেনাদলের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওকামুরার সঙ্গে চিয়াং কাই-শেক আলাপ আলোচনা সুরু করেছেন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল গণমুক্তি ফৌজ ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে অভিযানে জাপানীদের অংশগ্রহণ করানো যাবে কিনা দেখা।

এর কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সত্যমুক্ত জাপানী সাম্রাজ্যবাদের অধিকার ও দাবীর স্থলাভি-ষিক্ত হতে চাইছিল। মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি সংস্থার গবেষণা পরিচালক, জেরা

মাইকেল্‌স ডীন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

"দূর প্রাচ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি রণনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অর্জন করেছে, যা আমাদের শিল্পগত ও অর্থনৈতিক সম্পদের সঙ্গে একযোগে এশিয়া ভূখণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্তা হিসাবে এমন এক সম্ভাবনার পথ খুলে দেবে যা জাপান তার সামরিক সাফল্যের শিখরে পৌঁছিয়েও কোনদিন লাভ করতে পারেনি।"[২৩]

ইউরোপের দেশগুলির উপরেও, যুদ্ধ শেষে তাদের অসংখ্য দুঃখ কষ্ট ও অসুবিধার সুযোগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জাঁকিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী হিসাবে বসার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তাই দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সর্ত ভঙ্গ করে, যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে, একুশে আগষ্ট উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করলো যে ঋণ সাহায্য চুক্তি অনুযায়ী এর পর থেকে আর কোন জিনিস-পত্র পাঠানো হবে না। এই ঘোষণার লক্ষ্য ছিল এক আঘাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বৃটেন উভয়কেই কাবু করে ফেলা। কেবল এর ব্যতিক্রম করা হলো চিয়াং কাই-শেকের জন্যে, কারণ চীনে তখন চিয়াংচক্র ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একটা নোতুন গৃহ যুদ্ধের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে।

মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত সৈন্য তখনো জাপানী সৈন্যদের পিছনে তাডা করে চলেছে তাদের কোণ ঠাসা করে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে। উত্তর কোরিয়াকে মুক্ত করার জন্যে এই সময়ে প্রথম দূরপ্রাচ্য বাহিনীর সৈন্যরা, সোভিয়েত নৌ-বহর থেকে অবতরণকারী সেনাদলের সঙ্গে সহযোগিতা করতে লাগলো। উত্তর কোরিয়ায় জাপানী নৌ ঘাঁটিগুলি দ্রুত দখল করে নিয়ে, কোয়াণ্টাং বাহিনীর প্রধান অংশকে সমস্ত যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হলো। কোরিয়ার জনসাধারণ সোভিয়েত সেনাদলকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাতে এলো। উত্তরের বনাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে কিম ইল সুং (King Il Sung)-য়ের নেতৃত্বে সংগঠিত কোরিয়ার পার্টিজান দল, জাপানী সেনাদলকে বিধ্বস্ত করে, উত্তর কোরিয়াকে মুক্ত করতে সাহায্য করলো।

ষোলই আগষ্ট জাপানীরা ভয়ঙ্করভাবে পাল্টা আক্রমণ সুরু করে। তখন সময় কাটাবার মতলবে, কোয়াণ্টাং সেনাদল, সোভিয়েতের দূর প্রাচ্যস্থিত সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে একটা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে পাঠালো। তাতে জাপানীরা কোথাও আত্মসমর্পণের উল্লেখ করেনি। দূরপ্রাচ্যে সোভিয়েতের

প্রধান সেনাপতি, মার্শাল ভ্যাসিলেভ্স্কি উত্তরে কোয়ান্টাং বাহিনীকে প্রতিরোধ বন্ধ করে, অস্ত্রত্যাগ ও সমর্পণ করার জন্যে আদেশ দেন, একমাত্র তখনই সোভিয়েত সেনাদল অস্ত্রসম্বরণ করতে পারে।

যেহেতু এমন কোন আদেশ জারী করা হলো না, তাই সোভিয়েতের সামরিক তৎপরতা চলতে থাকলো অব্যাহত। আঠারোই আগষ্ট, ইয়াল্টা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করে সোভিয়েত সেনাদল কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে অবতরণ করলো। বিশে আগষ্ট সোভিয়েত সেনাদল হারবিন্, গিরিন, চ্যানচুং ও মুকদেন প্রবেশ করলো। তিন দিন পরে তারা প্রবেশ করলো পোর্ট আর্থার ও দালনীতে (দাইরেনে)।

উনিশে আগষ্ট থেকে নিজেদের শোচনীয় অবস্থার কথা বুঝতে পেরে মাঞ্চুরিয়ার জাপানী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করতে স্বরু করে। কোয়ান্টাং বাহিনীর নেতৃত্বও এতে সম্মত হন। কিন্তু এদেরই কোন কোন দল একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যায়। মাঞ্চুরিয়া, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ শাখালিন ও কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে সামরিক তৎপরতা সম্পূর্ণ থেমে গিয়ে, তাদের শত্রুমুক্ত করতে আরো প্রায় পনেরো দিন লেগেছিল।

দূরপ্রাচ্য অভিযানে সোভিয়েত সৈন্যদলের হাতে ছয় লক্ষ যুদ্ধ বন্দী আসে।

কোয়ান্টাং বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ও মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ায় জাপানী অধিকারের বিলুপ্তি, জাপানের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দিয়ে, তাকে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য করে। তিরিশ দিনের মধ্যেই সোভিয়েত সেনাদল, জাপানী সেনাদলের প্রধান অংশ, তার বহুল প্রচারিত শক্তিধর কোয়ান্টাং বাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দেয়।

সোভিয়েত সেনাদল এইভাবে তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রক্তের স্বাক্ষরে সোভিয়েত ও চীনের জনগণের মধ্যে অক্ষয় বন্ধুত্বের সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে আসে।

সোভিয়েত অভিযানের প্রভাব মার্কিণ দেশ ও বৃটেনের উচ্চপর্যায়ের সামরিক নেতাদের কাছেও স্বীকৃতি পেয়েছে। মেজর জেনারেল ক্লেয়ার চেন্নাওলট্ (Claire Channault) নিউ ইয়র্ক টাইমসকে বলেন যে, "জাপানী যুদ্ধকে শেষ করে ফেলার ব্যাপারে সেভিয়েতের যোগদান একটা চরম গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা পারমাণবিক বোমা ব্যবহার না করলেও একই রকম ঘটতো।...সোভিয়েতের

দ্রুত অভিযান জাপানকে একেবারে চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো, যার ফলে তার আত্মসমর্পণ করার জন্যে নতজানু হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না।"[২৪]

জাপানী সমরনায়ক পরিষদের সহকারী প্রধান লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল কোয়াবে তোরাসিরো (Kawabe Torasiro), উনিশে আগষ্ট, ম্যাক্‌আর্থারের সদর কার্যালয়ে এসে হাজির হলেন। ম্যাক্‌আর্থারের দলের জনৈক কর্ণেল তাঁকে অভ্যর্থনা করে অনেক উপদেশ দেয়। কিছু কিছু তার মধ্যে ছিল জাপানে আসন্ন মার্কিণ অধিকার সম্পর্কিত। আর অন্যগুলি ছিল জাপানী সৈন্যদলকে সংরক্ষিত করার বিষয়ে, যাতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমন করার কাজে, বিশেষ করে চীনে, জাপানী সৈন্যদের ব্যবহার করা যায়। ম্যানিলা থেকে ফিরে কোয়াবে তোরাসিরো জাপ সম্রাটকে তাঁর দৌত্য সম্পর্কে একটা পূর্ণাঙ্গ বিবরণী দেন। একেবারে নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী হওয়ায়, জাপ সরকার সমস্ত নির্দেশগুলিই যথাযথ পালন করেন।

জাপানে মার্কিণ সৈন্য অবতরণ করলো আটাশে আগষ্ট। ম্যাক্‌আর্থার সঙ্গে সঙ্গেই, উনিশ শ' বিয়াল্লিশে ফিলিপাইনে যে সব জাপানী জেনারেলদের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন, সেই হোম্মা, সাজিমা ও সাইতো'র বিচার ও প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। কিন্তু জাপানী জেনারেলদের মধ্যে যাঁরা "রুশ বিশেষজ্ঞ" (রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ), তাঁদের নিজের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তার আশ্রয়ে রেখে দিলেন।

দোসরা সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে, টোকিয়ো সময় অনুযায়ী সকাল সাড়ে দশটায়, টোকিয়ো উপসাগরে মার্কিণ ক্রুইজার মিশৌরীতে জাপানের আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করা হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শে অনুপ্রাণিত সমস্ত স্বাধীনতা প্রিয় জাতির যৌথ প্রচেষ্টায় ফ্যাশিবাদ ও পররাজ্য লোলুপতার প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে সম্ভব হলো এক ঐতিহাসিক বিজয় সাফল্য।

॥ চার ॥

যুদ্ধের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে বিপরীতার্থক নীতির স্বরূপ প্রকট ভাবে অনুভূত হয়েছিল।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জাপান সম্পর্কে নীতির মধ্যে, সেই দেশের শাসক শ্রেণীর ভবিষ্যৎ কোন যুদ্ধে জাপানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার চরম লক্ষ্য ধরা পড়ে যায়। জঙ্গী মনোভাব সম্পন্ন আমেরিকানরা বিশ্বাস করতো যে রাশিয়ার সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধে একটা রক্ষণশীল জাপানই হবে তাদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু।[২৫] সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এশিয়ার দেশগুলির বিরুদ্ধে জাপানকে একটা মার্কিণ ঘাঁটি হিসাবে গড়ে তোলার ভার দেওয়া হলো ম্যাক্‌আর্থারকে। সেই জন্যেই জাপানে মার্কিণ দখলদারী শাসনের নীতি এমনভাবে রচনা করা হয়েছিল যাতে সেখানে কোন আমূল গণতান্ত্রিক সংস্কার দেশটাকে শান্তিপ্রিয়, স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করতে না পারে। এই সময়ে হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয় যে, "জাপানের চলতি শাসনব্যবস্থার কাঠামোকেই বজায় রাখা হবে।"[২৬]

আটই সেপ্টেম্বর, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে মার্কিণ সৈন্যরা দক্ষিণ কোরিয়ায় অবতরণ করলো। এই অবতরণের লক্ষ্য ছিল বিশুদ্ধ ঔপনিবেশিক, কারণ দক্ষিণ কোরিয়ার জাপানী সৈন্যরা এর অনেক আগেই অস্ত্রত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করেছে।

মাঞ্চুরিয়ায় সোভিয়েত আক্রমণ চীনের গণমুক্তি ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় পরিচালিত হয়। এগারোই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে গণমুক্তি ফৌজ, উত্তর চীনে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করতে থাকে। অষ্টম রুট বাহিনী প্রায় সমগ্র উত্তর চীনকেই মুক্তঅঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। পিকিং, তিয়েনসিন ও সিংতাওয়ের জাপানী সেনাদলকে আক্রমণ করে ঘিরে ফেলা হয়। ইতিমধ্যে চতুর্থ রুট বাহিনী মধ্য চীনের এক বিরাট অংশকে শত্রুমুক্ত করে একেবারে সাংহাই ও নানকিংয়ের কাছাকাছি এসে পড়ে। সর্বসাকুল্যে গণমুক্তি ফৌজ উত্তর ও মধ্য চীনে শতাধিক শহর শত্রুমুক্ত করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবরই চীনের জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম সমর্থন করে এসেছে। চোদ্দই আগষ্ট উনিশ শ' পয়তাল্লিশে একটি তিরিশ বছরের জন্যে সোভিয়েত-চীন বন্ধুত্ব ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। স্বাক্ষরকারীরা যুদ্ধের সময়ে পরস্পরকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলো এবং জাপানের সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে কোন আলাপ আলোচনা না করে, নোতুন কোন জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে যৌথভাবে কাজ করতে অঙ্গীকার করলো।

স্বাক্ষরকারীদের একজন যদি কোন জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হয়, তাহলে অন্যজন তাকে প্রয়োজনীয় সবরকমের সাহায্য করতে স্বীকৃত হলো।

কিন্তু চিয়াং কাই-শেক সরকারের এই চুক্তির সর্তাবলী মেনে চলার কোন আগ্রহই ছিল না। সোভিয়েত ইউনিয়নের অজ্ঞাতে তাঁরা জাপানের সঙ্গে আলোচনা চালাতে লাগলেন। জাপানী সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা এক চুক্তি স্বাক্ষর করলেন যে কোন অঞ্চলে কুওমিনটাং সৈন্য এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত তারা চীনের গণমুক্তি ফৌজকে প্রতিরোধ করবে এবং কয়েক সপ্তাহে গণমুক্তি ফৌজ যে সব শহর দখল করে নিয়েছে, সেগুলি পুনরুদ্ধারের জন্যে সামরিক তৎপরতা সুরু করবে। দেশের প্রতি এমন চরম বিশ্বাসঘাতকতা আর হয় না। কারণ চীনের জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এটা ছিল দখলদারী জাপানী সৈন্যের সঙ্গে একটা ভাগ বাঁটোয়ারার প্রচেষ্টা। চীনের রণাঙ্গনে মার্কিণ সৈন্যদলের অধিনায়ক জেনারেল ওয়েডেমেয়ার এই চুক্তিকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে, জাপানী সৈন্যদের মার্কিণ ও কুওমিণ্টাং সৈন্য না এসে পড়া পর্যন্ত অস্ত্রত্যাগ করতে নিষেধ করেন। মার্কিণ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে, "মার্কিণ বিমান ও জাহাজে করে, জাপানী সেনাদলকে অস্ত্রত্যাগ করানোর অছিলায়, কুওমিনটাং সৈন্যদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য ছিল সুবিধাজনক জায়গায় ঘাঁটি করে কমিউনিষ্টদের আক্রমণ করা।" আর এই সব কাজ করা হয়েছিল এমন এক সময়ে, যুদ্ধ যখন শেষ হয়নি।[২৭]

চীনের মুক্তাঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে একটা গৃহযুদ্ধ সুরু করে দেওয়ার জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার পকিল্পনার ফল হলো উল্টো। সারা দেশে এর ফলে এমন এক আগুন জ্বলে উঠলো যে তখন আমেরিকানদের চীন ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর অন্য পথ রইলো না।

অধ্যাপক ফ্লেমিং যথার্থই বলেছেন যে, "রাশিয়ায় উনিশ শ' আঠারোর পরে যেমন ঘটেছিল এখানেও তা আরেকবার প্রমাণিত হলো যে কমিউনিষ্ট বিপ্লবকে দমন করার জন্যে বিদেশী সৈন্য ব্যবহার করলো জনগণ হস্তক্ষেপ-কারীদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, বিপ্লবকেই সাহায্য করে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে রক্ষণশীল গোষ্ঠীকে রক্ষা করার জন্যে চেষ্টা করলাম, তাদের অবস্থাই খারাপ হলো সবচেয়ে বেশি।"[২৮] এরচেয়ে সত্যি কথা আর হয়না।

সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে মুক্তিযুদ্ধ সুরু করেছিল, সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করে। জনগণের ইচ্ছাকে মূর্ত করে প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরোই আগষ্ট, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে ইন্দোনেশিয় সাধারণতন্ত্র এবং দোসরা সেপ্টেম্বর ভিয়েতনাম সাধারণ তন্ত্রের। উপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ কোটি কোটি মানুষ, তাদের শাসকদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ালো।

* * * *

যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে, উনিশ শ' চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশে, সোভিয়েতের বীর জনগণ, ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রীর অন্তর্গত দেশগুলির জনগণের সঙ্গে একযোগে, ফাশিবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এক সাফল্যমণ্ডিত পরিসমাপ্তি ঘটালো। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিণামে এলো হিটলার জার্মাণী ও সাম্রাজ্যবাদী জাপাদের বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ।

১. ফ্রেড্ এল্ডরিজ : Wrath in Burma. The Uncensored Story of General Stilwell , নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬, পৃঃ ৩১৪
২. ওয়াল্টার লিপ্‌ম্যান : U. S. Foreign Policy. Shield of the Republic, বোষ্টন ১৯৪৩, পৃঃ ২৪
৩. জোসেফ ষ্টিলওয়েল : The Stilwell Papers, থিয়োডোর হোয়াইট সম্পাদিত, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃঃ ৩১৬
৪. ঐ, পৃঃ ২১৫
৫. ঐ, পৃঃ ১২৫
৬. ফ্রেড্ এল্ড্রিজ্ : উপরোক্ত গ্রন্থ. পৃঃ ১৪৫
৭. হ্যালেট্ অ্যাবেণ্ড : Pacific Charter. Our Destiny in Asia, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৩, পৃঃ ৫০
৮. ফ্রেড্ এল্ডরিজ্ : উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৩৬
৯. নিউ ইয়র্ক টাইমস, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪
১০. Parliamentary Debates, পঞ্চম সিরিজ, ৪১৩ খণ্ড, হাউস অব্ কমন্স, ১৯৪৫-৪৬ অধিবেশনের প্রথম খণ্ড, লণ্ডন ১৯৪৫, পৃঃ ৭৭
১১. একটি রুশ ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ
১২. র‍্যালফ্ ই ল্যাপ্ : The New Force. The Story of Atoms and People নিউ ইয়র্ক ১৯৫৩, পৃঃ ৪৭-৪৮

১৩. উইলিয়াম লিহাই : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৪১

১৪. পি. এম. এস, ব্ল্যাকেট : Military and Political Consequences of Atomic Energy, পৃঃ ১২৭

১৫. হ্যানসন বল্ডউইন : Great Mistakes of the War, লণ্ডন, ১৯৪৯, পৃঃ ৯৯

১৬. উইলিয়াম ডি. লিহাই : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৪১

১৭. চার্চিল : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৫৫৯

১৮. হ্যানসন বল্ডউইন : উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৯২

১৯. প্রাভ্দা, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮

২০. টাইমস্ পত্রিকা, ২৭শে জুলাই, ১৯৪৫

২১. ফ্রেড্রিক সি. শারম্যান : Combat Command. The American Aircraft Carriers in the Pacific War, পৃঃ ৩৭৬

২২. নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ১৭ই আগষ্ট, ১৯৪৫

২৩. ভেরা ডীন : America's Future in the Pacific, নিউ ব্রুন্সউইক্ ১৯৪৭, পৃঃ ২৩২

২৪. নিউ ইয়র্ক টাইমস্ : ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৫

২৫ মার্ক গাভ্ন : Japan Diary, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃঃ ৪২

২৬. নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫

২৭. ফ্রেড এন্ডরিজ : উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩১০

২৮. ডি. এফ. ফ্লেমিং : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫১৮০-১৮১

ফলশ্রুতি

দু'টি বিশ্বযুদ্ধে, উনিশ শ' চোদ্দ থেকে আঠারো এবং উনিশ শ' উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশে, সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনে দুঃখ কষ্টের আর অন্ত ছিল না। কোটি কোটি মানুষের প্রাণের বিনিময়ে, বিরাট ধনসম্পত্তি ও অসংখ্য সাংস্কৃতিক সম্পদের ধ্বংসস্তূপের উপরে গড়ে উঠেছিল যুদ্ধোত্তর কালের শান্তির বনিয়াদ। সেই মানুষের স্মৃতিতে যুদ্ধের ছবি ভয়াবহ একটা বিভীষিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ স্মৃতি সহজে মুছে যায় না, মুছে ফেলা যায় না।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধেছিল ভিন্নতর ঐতিহাসিক পরিবেশে। যেদিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুরু হলো, সেদিন সারাপৃথিবী জুড়ে ছিল পুঁজিবাদের একছত্র আধিপত্য। কিন্তু যেদিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুরু হলো সেদিন পৃথিবীতে পাশাপাশি রয়েছে দু'টি সমাজব্যবস্থা—পুঁজিবাদ আর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। কিন্তু তা সত্ত্বেও যুদ্ধের সূচনাটা যেন ছিল অনেকখানি এক রকম।

এই সাদৃশ্যের অনেকখানি সম্ভব হয়েছিল এই কারণের জন্যে যে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাতে মানসিক ধারণার প্রভাব পড়েছিল অনেক কম। আর এই মানসিক ধারণার ভিত্তি ছিল আধুনিক পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ। পুঁজিবাদী দেশের রাষ্ট্রনেতারা, যথা হিটলার ও মুসোলিনী, কিম্বা বৃটিশ, ফরাসী অথবা মার্কিণ মিউনিকপন্থীদের, স্বেচ্ছাচার, অভিরুচি বা মর্জির জন্যে এই যুদ্ধ ঘটেনি। তাদের কাজের পিছনে প্রেরণা যুগিয়েছে তাদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব, পুঁজিবাদের বাস্তব অবস্থা। আর একথা তো অনস্বীকার্য যে যেখানে সাম্রাজ্যবাদ আছে, সেখানেই যুদ্ধ আসবে। এই বিশ্বযুদ্ধ তাই ছিল পুঁজিবাদী বৃহৎ শক্তিবর্গের, পৃথিবীর বাজার, বিনিয়োগের ক্ষেত্র, কাঁচামালের উৎস, জনবল সংগ্রাহের কেন্দ্র, এক কথায় সারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার লড়াই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়ার অনেক পূর্ব থেকেই, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে কে কোন

পক্ষে যাবে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই সব মূল লক্ষণগুলি বেশ কিছুটা ভিন্ন ধরনের হয়ে যায়। যেমন মনে রাখতে হবে যে পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের তখন জন্ম হয়েছে। তার অস্তিত্ব অনুভূত হচ্ছে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শান্তিনীতি সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষের পথে, যুদ্ধের পথে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করছে। সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে, আসন্ন যুদ্ধের সমস্ত প্রচণ্ডতাকে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিতে, যাতে পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী দেশকে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে সারা পৃথিবীর শ্রমিক ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে বিপর্যস্ত করে, পুঁজিবাদের শক্তিকে আরো জোরদার করা যায়। তারাই জার্মাণীর ফ্যাশিবাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাকে সাহায্য করে, পররাজ্য আক্রমণের পথ তার সামনে খুলে দিয়েছে। তাই জার্মাণীর ফ্যাশিতন্ত্র-পৃথিবীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির যৌথ আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সারা পৃথিবীর সম্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মৌল কর্মসূচী তাই এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই রচনা করেছিল।

কিন্তু যেখানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদীরা, জার্মাণীর সঙ্গে একটা সমঝোওতা করে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে চেয়েছে, সেখানে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছে এই জোটের অন্যান্য সদস্যের কাছে বশ্যতা। অন্য পুঁজিবাদীদের অধীনতা পাশে আবদ্ধ করতে না পারা পর্যন্ত তার স্বস্তি ছিল না। সাম্রাজ্যবাদীদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সূত্রপাত এইখানেই, যার ফলে পুঁজিবাদী দুনিয়া নানা দলে বিভক্ত হয়ে গেল।

মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী শাসক শ্রেণীর ইচ্ছা ছিল সোভিয়েতের সঙ্গে তাদের যে সংঘাত আছে তা জার্মাণীর ঘাড়ে চাপ দিয়ে উসুল করে নেওয়া। ঠিক তেমনই জার্মাণীর সঙ্গে যেখানে সংঘাত তার সমাধান করা সোভিয়েতের উপর চাপ দিয়ে। তাই জার্মাণীকে তারা সমানে উস্কানি দিয়ে গেল সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করতে, যে যুদ্ধে তারা "তৃতীয় পক্ষ" সেজে সরে থাকবে। কিন্তু জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা চেয়েছিল যে যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তাহলে তার ষোল আনা সুযোগ তারাই নেবে। তাই তাদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ও যুদ্ধযন্ত্রকে শক্তিশালী করতে চাইলো বৃটেন ও ফ্রান্সের সাহায্যে, যাতে জার্মাণীও বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের স্বপ্ন সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে সরাসরি লাভ করতে

পারে। এই বিভিন্ন স্বার্থের বিভিন্নমুখী পরিকল্পনার পারস্পরিক সংঘাত, .যার অনিবার্য পরিণতি ছিল একটা বিশ্বব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্বকালের তীব্র রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমি রচনা করেছিল।

কিন্তু একদিকে যখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স এবং অন্য দিকে জার্মাণী ইটালী ও জাপান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাব্য রূপের স্বার্থগত পরিণতির জন্যে পরস্পর দর কষাকষি করছিল, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পৃথিবীর সমস্ত দেশের প্রগতিশীল মানুষ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে বিশ্বযুদ্ধ সমেত সমস্ত যুদ্ধের বিরুদ্ধেই তাদের প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছিল।

উনিশ শ' উনচল্লিশে জার্মাণীর পোল্যাণ্ড আক্রমণের মধ্য দিয়েই যুদ্ধ পূর্ব কালের রাজনৈতিক সংকট পরিণতি লাভ করে। এই আক্রমণের লক্ষ্য ছিল রীতিমতো ব্যাপক। পোল্যাণ্ডের পরাজয় জার্মাণী জানতো বৃটেন ও ফ্রান্সকে পূর্ব ইউরোপে তাদের একমাত্র মিত্র দেশের সঙ্গে সম্পর্ক থেকে বিচ্যুতি করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত পোল্যাণ্ডকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণে একটা ঘাঁটি, প্রস্তুতি ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে জার্মাণী।

এই পরিস্থিতিতে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো, কিন্তু তার উদ্দেশ্য জামাণীর অত্যধিক সীমানাস্ফীতি রোধ করে, সে যাতে পশ্চিমী শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কোন সামরিক তৎপরতায় লিপ্ত হতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। এক কথায় হিটলারকে সংযত রাখাই ছিল এই ঘোষণার ·উদ্দেশ্য, পোল্যাণ্ডকে রক্ষা করা নয়। কারণ পোল্যাণ্ড সম্পর্কে তাদের মাথা ব্যথা অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল যে এতে হিটলার তাঁর সামরিক কর্মসূচী বদলে, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আক্রমণে চালাবে, কারণ এইভাবেই বৃটেন ও ফ্রান্স খুব সীমিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যথেষ্ট সাফল্য লাভের আশা করেছিল।

এই জন্যে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল, তাকে বলা হতো "ভূতুড়ে যুদ্ধ," যেখানে যুদ্ধের ঘোষণা থাকলেও কোন সংঘর্ষ ঘটেনি। কারণ এর উদ্দেশ্যে ছিল পশ্চিম ইউরোপে ফ্যাশিস্ত জার্মাণীর আক্রমণ আশংকাকে, পূর্বমুখী করে দেওয়া। বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মিউনিক নীতির পিছনেও ছিল এই একই উদ্দেশ্য আর সেই জন্যেই এই "ভূতুড়ে

যুদ্ধকে" আসলে মিউনিক নীতিরই একটা বিন্যাস পর্ব বলে সুনিশ্চিত ভাবে ধারণা করা যায়।

কার্যতঃ পশ্চিমী শক্তিবর্গ আকাশের দিকে মুখ তুলে কাজ করছিলেন। তাঁদের বিচার বিবেচনার এই মারাত্মক ভুলের পরিণামে দেখা গেল বহু ইউরোপীয় দেশের অদৃষ্টে সামরিক বিপর্যয় ও জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ।

জার্মানীর প্রতিদ্বন্দ্বী পুঁজিবাদী দেশগুলির সরকারী নীতির তীব্র বিরোধিতা দেখা যেতে লাগলো সেই সব দেশের জনগণের কাছ থেকে। বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রচলিত সমস্ত সুযোগগুলির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার করে, জনগণ জার্মাণীর বিরুদ্ধে ঘোষিত যুদ্ধকে একটা সাধারণ ব্যাপক ফ্যাশি বিরোধী যুদ্ধে রূপান্তরিত করলো। পৃথিবীর বাস্তব অবস্থাও তখন এই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সারা পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের কর্মসূচীর প্রথম পর্ব যথেষ্ট সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন করে, জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করেছিল এবারে দ্বিতীয় গুরুত্ব-পূর্ণ পর্ব সুরু করার সময় সমুপস্থিত হয়েছে। সেই দ্বিতীয় পর্ব ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তাদের সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যে আনুষ্ঠানিক ভাবে পশ্চিমী শক্তিবর্গ তাদের সঙ্গে যুদ্ধরত হলেও, সোভিয়েত বিরোধী যুদ্ধে তারা দূরে সরে থাকবে না। সেই কারণেই সোভিয়েতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ সুরু করে জার্মাণ সরকার এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে এই যুদ্ধের চরম লক্ষ্য হচ্ছে "সভ্য জগৎকে বলশেভিকবাদের ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা।"[১] নেকড়ে বাঘটা যেন ভেড়ার চামড়া গায়ে জড়িয়ে এলো। সভ্যতার চিরশত্রু যারা তারাই ভাণ করতে লাগলো তার চরম রক্ষক হিসাবে।

ঐতিহাসিক পরিবর্তনের বাস্তব রীতি সম্পর্কে নিদারুণ অজ্ঞতার জন্যেই, জার্মাণ নেতৃবৃন্দ মনে করতে পেরেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পরি-স্থিতিতে সমগ্র পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু সেটাই ছিল একটা মস্ত ভুল।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ক্রুজেডের পরিকল্পনা একেবারে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়লো। সোভিয়েত ইউনিয়ন জানতো বিভিন্ন দেশের জনগণের সংগ্রামী চেতনা, তাদের আশা আকাঙ্খা আর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। তাকেই ভিত্তি করে রচিত হলো সোভিয়েতের পররাষ্ট্র নীতি

যা দুর্ধর্ষ এক ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রীর সূচনা করে, জার্মাণীর চূড়ান্ত পরাজয়ের পথ প্রশস্ত করে দিল।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক মহল, তাঁদের মনোগত ইচ্ছায় জলাঞ্জলী দিয়ে, ডাওয়েস পরিকল্পনার সুরু থেকে বিগত সতেরো বছর ধরে তাঁরা যে দেশের বিরুদ্ধে জার্মাণীকে সমরায়োজনে সুসজ্জিত করে তুলছিলেন, জার্মাণীর বিরুদ্ধে তারই সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হলেন। আজো অনেক মার্কিণ ও বৃটিশ লেখক অবাক বিস্ময়ে বলেন, কেমন করে এই অঘটন ঘটে গেল। মার্কিণ ফ্যাশিপন্থীরা বা তাদের মতো প্রতিক্রিয়াশীল ধুরন্ধররা, এর কারণ খুঁজে না পেয়ে চরমতম অবাস্তব অসম্ভব এক কাল্পনিক অভিযোগ খাড়া করে বলে যে, তদানীন্তন বৃটিশ ও মার্কিণ রাষ্ট্রনেতারা নিশ্চয়ই গোপনে কমিউনিষ্টদের সমর্থক ছিলেন।

তাই দেখা গেল জার্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন একা পড়ে যায়নি, গিয়েছে জার্মাণী ও তার মিত্রদেশগুলি। পশ্চিম জার্মাণ যুদ্ধ ইতিহাসবিদ্ হান্স-অ্যাডল্ফ জ্যাকোবসন্ সেকথা স্পষ্টই স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেছেন, "যুদ্ধ (সোভিয়েতের বিরুদ্ধে) সামরিক অর্থে সুরু হওয়ার আগেই যে রাজনৈতিক অর্থে (জার্মাণীর পক্ষে) ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, সে কথাটা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়।"[২]

যারা বাস্তবকে এতোকাল অস্বীকার করে এসেছেন, এমন বহু মানুষই আজ একথা স্বীকার করে থাকেন। কিন্তু তা করতে গিয়েও প্রতিক্রিয়ার অনুগামী ইতিহাসবিদ্‌রা একে একটা ঐতিহাসিক ব্যতিক্রম বলেই যেন পাশ কাটাতে চান। কেউ কেউ এই ব্যতিক্রম বা দুর্ঘটনাকে তদানীন্তন পুঁজিবাদী নেতৃত্বের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ফল, কেউ বা জার্মাণ নেতৃত্বের হটকারী মনোভাবকে এর কারণ স্বরূপ ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান। কারো মতে এ দু'টোই ছিল এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। সে যাই হোক, সকলেই মোটামুটি একটি বিষয়ে একমত যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, হিটলার জার্মাণী যে প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিল, সেটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। হিটলারের প্রাক্তন সেনানায়ক এবং রাজনৈতিক পরামর্শদাতারা অনেক মেহনৎ স্বীকার করে জার্মাণীর পরাজয়ের এই দুর্ঘটনাজনিত কারণগুলি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। আর তাতে তাঁদের সবচেয়ে জোরালো যুক্তি

হলো, প্রাক্তন আদর্শ পুরুষ, অ্যাডল্‌ফ হিটলারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে নির্বিচারে সব কিছুরই জন্যেই দোষী সাব্যস্ত করা।

কিন্তু সোভিয়েতের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধারম্ভের সমকালীন অনুকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি একটা নৈসর্গিক ফল নয়। কপালের জোরে তা গড়ে ওঠেনি। তেমনই জার্মাণীর কাল্পনিক ভুলভ্রান্তি বা পুঁজিবাদী নেতৃত্বের আরোপিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়েই তার ব্যাখ্যা করা যায় না। তার সত্য নিহিত ছিল ইতিহাসের অমোঘ নিয়মের মধ্যে, যাকে অস্বীকার করা, এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা, মানুষের সাধ্যাতীত।

সমকালের মৌল ঐতিহাসিক সত্য হলো পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা থেকে মানুষের সমাজতন্ত্র তথা সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণ। মহান অক্টোবর বিপ্লবের দিন থেকে তার জয়যাত্রা সুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার মরিয়া হয়ে ওঠা জঙ্গী মনোভাব একটা শনির মতো জার্মাণীর ঘাড়ে চেপে, তাকে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেছে। তার আক্রমণ ছিল তাই সমাজতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি তথা বিশ্ব সভ্যতার বিরুদ্ধে।

পৃথিবীর ফ্যাশিতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ার জঙ্গীনীতিকে পর্যুদস্ত করে, ফ্যাশি শাসনের অত্যাচার হতে মানুষকে মুক্ত করে, যুগ যুগ ধরে মানুষের সভ্যতার, সংস্কৃতির সমস্ত অবদানকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করে, সোভিয়েতের বীর জনগণ যে অসীম গৌরবের অধিকারী হতে পেরেছে সেই কৃতিত্ব হলো পৃথিবীর সর্বহারা তথা সমস্ত মানুষের প্রতি তাদের আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের সার্থক পরিচয়। জার্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থ, পৃথিবীর সব দেশের সমস্ত মানুষের, এমন কি জার্মাণ জনগণের প্রকৃত স্বার্থের সঙ্গেও, সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধের এই চূড়ান্ত লক্ষ্যই, ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রী গঠন করতে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। কারণ এই মৈত্রীর এটাই ছিল বনিয়াদ, যার ওপর নির্ভর করে এই মৈত্রীর সৌধ গড়ে ওঠে। সোভিয়েতের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন এনে, তাকে মুক্তিকামী, ফ্যাশিবিরোধী ও ন্যায় যুদ্ধে পরিণত করে।

যুদ্ধের এই মুক্তিকামী বৈশিষ্ট্যই সারা পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল মানুষকে ফ্যাশিতন্ত্র, জার্মাণ ফ্যাশিস্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে সমবেত করে। সংগ্রামরত

সৈনিককে তা দেয় প্রেরণা, তাদের সংগ্রামী চেতনাকে সঞ্জীবিত করে, নিরুদ্যম সেনাদলকে দ্বিগুণ উৎসাহে ব্রতী করায় লক্ষ্য সাধনে। আর তারই সঙ্গে নাৎসী অধিকৃত দেশগুলিতে পার্টিজান দল গঠন করে ছড়িয়ে দেয় প্রতিরোধ আন্দোলন সুরু করার ব্যাপক মনোভাব। শুধু এরই জন্যে জার্মাণ সেনাদের ও জার্মাণীর জনগণের মনোবলে যে ভাঙন ধরে তার গুরুত্বও কোন মতে কম নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নই জার্মাণী ও তার মিত্রপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মুক্তিকামী চরিত্রের সার্থক উদ্দেশ্যটি তুলে ধরে পৃথিবীর সামনে। তাই ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রীর রূপায়ণে নানা দেশের সরকার ও জনগণ সমবেত হয় তার নেতৃত্বে। ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রীতে এর ব্যতিক্রম ঘটার কোন উপায়ই ছিল না। এই মৈত্রীকে সম্ভব করে তোলা, একে কার্যকরী করার জন্যে সোভিয়েত প্রচেষ্টার মৌল লক্ষ্য ছিল ফ্যাশিবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভব করা, যাতে সারা পৃথিবীর মানুষ সমস্ত দেশে মুক্তিও স্বাধীনতার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে পারে। আর অবলুপ্ত হয় ফ্যাশিতন্ত্রের রাষ্ট্রিক পরিচিতি। শেষ হয় মানুষের যন্ত্রণার, দুঃখ কষ্টের এই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আশু পরিসমাপ্তিতে।

সেদিন কোন দেশের পক্ষেই ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের হামলা থেকে জাতীয় স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্যে এই ফ্যাশিবিরোধী মৈত্রীতে যোগ না দিয়ে উপায় ছিল না। তা সেই যোগদান অনুষ্ঠানিক বা বাস্তবিক যাই হোক না কেন।

সমাজতন্ত্রী কোন দেশের পক্ষে সশস্ত্র ফ্যাশিস্ত আক্রমণের সামনে একক ভাবে লড়াই করার সম্ভাবনা ছিল না সেদিন। তাই সোভিয়েতকেও একা লড়াই করতে হয়নি। যুদ্ধকালীন সময়ে যে সবদেশের মানুষ মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছে, সেই সংগ্রামের চরিত্র হয়ে গেছে যেমন জাতীয় ঠিক তেমনই আন্তর্জাতিক। সোভিয়েত দেশ সমেত সমস্ত স্বাধীনতা-প্রিয় সংগ্রামী দেশের প্রচেষ্টার সঙ্গে তা সেদিন একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি সেদিন পৃথিবীর মানুষের যে সমর্থন স্বতস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল বিশেষ করে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য, সেটা ছিল আন্তর্জাতিকতাবাদের যথার্থ প্রকাশ। পৃথিবীর প্রথম সমাজতন্ত্রী

রাষ্ট্র, সমস্ত দেশের বৈপ্লবিক শক্তির আদর্শ, আন্তর্জাতিক বৈপ্লবিক চেতনা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পুরোধা, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি মেহনতী মানুষের সহজাত ভালোবাসা, সমর্থনের একান্ত প্রকাশ।

ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে এই ন্যায় যুদ্ধের একটা বিরাট প্রভাব এসে পড়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের উপর। সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তিকামী আদর্শ, জার্মাণ ফ্যাশিবাদের আশংকায় ভীত ত্রস্ত, জাতীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে চরম আগ্রহী মার্কিণ ও বৃটিশ জনগণকে প্রচুর প্রেরণা যোগায়। তাই মার্কিণ ও বৃটিশ জনগণের ফ্যাশিবিরোধী সংগ্রাম, তাদের স্বদেশে ও বিদেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামকে জোরালো করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে সেই সব দেশের নীতি নিয়ামকরা অন্য কিছু করার আর সুযোগ পেলেন না। তাঁদের ব্যক্তিগত অভিরুচি ঘটনার চাপে পড়ে মাথা চাড়া দিতে পারলো না। কারণ তখন জনগণের ইচ্ছার বিরোধিতা করার মতো বিপজ্জনক আর কিছুই ছিল না। অবিশ্যি একথা স্বীকার্য যে তাঁরও নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী ফ্যাশিপন্থী জার্মাণী ও জঙ্গীবাদী জাপানের পরাজয় কামনা করছিলেন।

কিন্তু জনগণের দাবীকে মেনে নিলেও, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তাই মুখে যুদ্ধের মুক্তিব্রতী আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন কেমন করে নিজেদের শ্রেণী আধিপত্যকে জোরালো করা যায়, সংগঠিত করা যায়। যুদ্ধের এই মুক্তিব্রতী আদর্শকে রাজনৈতিক মূলধন হিসাবে ব্যবহার করার আত্যন্তিক আগ্রহ দেখে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে পুঁজিবাদের সংকট তখন কেমন বেড়ে যাচ্ছিল। সেদিন এই গলে পড়ে সমাজ ব্যবস্থার, পুঁজি-বাদের এই উদ্যোক্তাদের পক্ষে সরাসরি নিজেদের লক্ষ্যের স্বপক্ষে কোন কথা বলা সম্ভব ছিল না। তারা তাই বাধ্য হয়েছিল নিজেদের আসল উদ্দেশ্য চেপে রেখে, মুক্তি যোদ্ধার ছদ্মবেশে নিজেদের প্রকাশ করতে।

মৈত্রী সূত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসকরা এই যুদ্ধের মধ্যে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্যের যথাসাধ্য পরিপোষণ করে চললেন। সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁদের সমস্ত নীতি, চুক্তি, বোঝাপড়ার একটা গোপন দিক থাকতো, যেখানে তাঁরা সব সময়ে ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের সঙ্গে একটা আপোষ রফার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। যুদ্ধের শেষের দিকে এই ঝোঁকটা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে

জার্মানী, জাপান ও ইটালীর শক্তি খর্ব করার জন্যে যথেষ্ট উৎসুক হলেও, তাঁরা পাশাপাশি চেষ্টা করতে লাগলেন কেমন করে পরাজিত শত্রুর দেশে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে শাসন ক্ষমতায় আসীন রাখা যায়। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন কেমন করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করা যায়, আর তার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বল করে দেওয়া যায় সোভিয়েত ইউনিয়নকে।

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার বিলক্ষণ জানতেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন কেমন করে ফ্যাশিস্ত আক্রমণের প্রচণ্ডতার সামনে অবিচল থেকে তাকে প্রতিহত করতে পারে, তারই উপরে তাঁদের দেশের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। অথচ এই ধারণা থাকা সত্ত্বেও, সোভিয়েত দেশকে দুর্বল করে দেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস থেকে তাঁরা বিচ্যুত হলেন না।

বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা থেকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের রপ্তানী যে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে প্রভূত সাহায্যকারী, সে সম্বন্ধে এই সব দেশের মানুষ যথেষ্ট সচেতন ছিল। একচেটিয়া কারবারীরা জনগণের এই সহানুভূতিকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন তথা তাদের পুঁজি ও মুনাফা বৃদ্ধি করতে লাগলো। যুদ্ধের মুক্তিকামী লক্ষ্যের বাস্তব পরিবেশ ও পুঁজিবাদী দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ লক্ষ্যের মধ্যে যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সেদিন প্রকট হয়ে উঠেছিল, তারই প্রভাব এসে পড়লো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীণ নীতির উপরে। কোন কিছুই এই ঝোঁক এড়িয়ে চলতে পারলো না।

সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রদত্ত পশ্চিমী অর্থনৈতিক সাহায্যের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য ছিল। যেমন প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে চুক্তি অনুযায়ী উনিশ শ' একচল্লিশের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে যেখানে এই দুই পশ্চিমী রাষ্ট্র সোভিয়েত দেশকে বারো শ' বিমান (তার মধ্যে তিন শ'টি জঙ্গী বিমান), দেড় হাজার ট্যাঙ্ক ও পঞ্চাশটি বিমান বিধ্বংসী কামান দিতে প্রতিশ্রুত ছিল সেখানে তারা আসলে পাঠালো সাড়ে সাতশ' বিমান (যার মধ্যে জঙ্গী বিমানের সংখ্যা ছিল মাত্র পাঁচটি), এবং কুল্যে পাঁচ শ একটি ট্যাঙ্ক ও হাল্কা ধরনের বিমান বিধ্বংসী কামান।[৩]

জনৈক মার্কিণ ইতিহাসবিদ্, আইভান স্পেক্টর (Spector) স্বীকার করেছেন যে উনিশ শ' তেতাল্লিশের বসন্তকালের শেষ পর্যন্ত, "লাল ফৌজকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েতের নিজস্ব সমরোপকরণের উপরেই নির্ভর করতে

হয়েছিল।"[৪] সোভিয়েত ইউনিয়নে যুদ্ধের মধ্যে যে সব রপ্তানী করা হয় তার সমগ্র পরিমাণ সেই দেশের যুদ্ধোৎপাদনের শতকরা চার ভাগের বেশি ছিল না।[৫] গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয় সংক্রান্ত তথ্যাদি সোভিয়েত ইউনিয়নকে না দিয়ে দেওয়া হলো "সেই সব করপোরেশন ও অন্যান্য বৃহদায়তনে উৎপাদনকারী সংস্থাকে, যারা যুদ্ধের পূর্বে জার্মাণ একচেটিয়া কারবারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতো।"[৬]

মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাহায্য করেছেন বটে তবে তা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে, থেমে থেমে। আর তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করেছেন সোভিয়েতের স্বার্থকে ক্ষুণ্ন করতে, তাকে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের গভীরে ঠেলে দিয়ে দুর্বল করে ফেলতে এবং সুযোগ দিয়ে গেছেন জার্মাণীকে তার সর্বশক্তি পূর্ব রণাঙ্গনে নিয়োগ করে যাতে সে এই অবস্থার সুযোগ নিতে পারে। মিত্র পক্ষীয় প্রতিশ্রুতি পালনের ক্ষেত্রে একের পর এক অন্তর্ঘাতমূলক বাধা সৃষ্টি করে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার এই বিরোধিতার নীতিকে চালু রেখেছিলেন, যার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করায় তাঁদের ক্রমিক অনিচ্ছা।

"আমাদের মিত্রপক্ষরা দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠলেন একমাত্র তখনই" এন. এস. খ্রুশ্চভ্ বলেছেন, "যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমগ্র ধারাটির মৌল পরিবর্তন ঘটলো, যখন পশ্চিমী শক্তিবর্গের দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার আর বিলম্ব ঘটলে, একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে সোভিয়েত সেনাদল শুধু বার্লিন নয়, প্যারী পৌঁছে যেতে পারে, কারো সাহায্য না নিয়ে। সেই সময়েই সুরু হলো দ্বিতীয় রণাঙ্গনের। পশ্চিম ইউরোপের জনগণ সোভিয়েত সেনাদলের সহায়তায় যখন দখলদার জার্মাণ সৈন্যদের নিজেরাই বিধ্বস্ত করে ফেলতে পারে মনে হলো, তখনই মিত্রপক্ষ তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সুরু করার জন্যে নেমে পড়লেন।"[৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস শুধু মাত্র বীরত্ব, শৌর্য, আত্মোৎসর্গের কাহিনী নয়, শুধু মাত্র এটি কোটি কোটি মানুষের সামরিক ও অসামরিক কর্তব্যবোধের, সততা, বিবেকবোধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি পালনের কাহিনী নয়, তার সঙ্গে মিশে আছে নীচতা, অসম্মান, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাকৃত প্রতারণার, শঠতার কাহিনী।

তাই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে দোষী যারা, অপরাধী যারা, তারা

নিজেদের অপকীর্তির সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করবে। তাই সত্য গোপন করার জন্যে প্রকাশিত হয়েছে ওজনে ভারী, বিরাট "স্মৃতিচারণের", ঐতিহাসিক "তথ্যানুসন্ধানের" এবং আরো হাজার রকমের কেতাব।

এই সত্যটা তাহলে কি? এই দিক থেকে বিচার করলে, যুদ্ধের ফলশ্রুতি, পরিণামটা কি? যুদ্ধ মানুষের সামনে অভ্রান্তভাবে এই মৌল সত্যটি তুলে ধরেছে যে, সমাজ ব্যবস্থার বিপুল পার্থক্য সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশ পরস্পর সহযোগিতা করতে পারে প্রয়োজনে এবং সেটা করা উচিত। যুদ্ধ প্রমাণ করেছে যে জনগণের সহানুভূতি, সমর্থন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে বঞ্চিত করা অসম্ভব। এবং এই যুদ্ধ অভ্রান্তভাবে এটাও প্রমাণ করেছে যে ইতিহাসের অগ্রগতির বাস্তবানুগ অমোঘ নিয়মকে ব্যর্থ করার জন্যে, তার বিরুদ্ধাচারণ করা যায় না।

সে কারণেই জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে, যারা তাকে প্রেরণা যুগিয়েছিল, যারা নাৎসী আক্রমণকারীদের নানাভাবে সাহায্য করেছিল, সেই প্রতিক্রিয়ার শক্তিও সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে গেছে। যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন একটা অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়লো। তারা একসঙ্গে বিজয়ী পরাজিত পক্ষ। হিটলারের বিরুদ্ধে তারা বিজয়ী হয়েছে সত্যি, কিন্তু তাদের শাসক শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ লক্ষ্য, যে মনোভাব একদিন এই যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, তার বিচারে তারা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে।

অনেক বুর্জোয়া লেখক এই পরাজয় স্বীকার করেছেন। জনৈক মার্কিণ ইতিহাসবিদ্, কার্লটন জে. এইচ. হায়েস লিখছেন:

"পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদকে ক্ষয়িষ্ণু শক্তিতে পরিণত করতে, উনিশ শ' উনচল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চরম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। এর বিশ্বত্ব প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় অনেক বেশি যথার্থ আর সেই জন্যেই এর পরিণতি, প্রতিক্রিয়া তুলনায় বহুগুণ বেশী ব্যাপক।"[৮]

অনেক দেশ বা বহুগুণ বেশি সংখ্যক সেনাদল এতে অংশগ্রহণ করার জন্যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় এর বিশ্বজনীনতা বৃদ্ধি পায়নি। যে ব্যাপক ও গভীর সামাজিক প্রতিক্রিয়া এর ফলে সূচিত হয়, যার অনিবার্য প্রভাব এর ধারাকে এর চরম পরিণতিকে, প্রভাবিত করেছে, সে কারণেই এর বিশ্বযুদ্ধ নামের সার্থকতা বেশি। তা ছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় জনগণের সক্রিয় অবদান এর ইতিহাসে আরো অনেক ব্যাপক বলেও এর বিশ্বজনীনতার মূল্য বেড়েছে।

॥ দুই ॥

রণাঙ্গণের ব্যাপ্তি, সংঘর্ষের গভীরতা, প্রচণ্ডতাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তুলনায় এবারে অনেক বেশি হয়েছিল। প্রায় সমস্ত দেশই এতে জড়িয়ে পড়ে কোন না কোন ভাবে। এর সশস্ত্র সংগ্রামের ক্ষেত্র হয়ে যায় তিনটি মহাদেশ—ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া। এমন কি প্রশান্ত মহাসাগরের গভীর অভ্যন্তরও এর বিস্তৃতি থেকে বাদ যায় নি।

যুদ্ধ যখন শেষ হলো তখন নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে প্রায় কেউ নেই। কেবল আনুষ্ঠানিক নিরপেক্ষ ছিল আফ্‌গানিস্থান, স্পেন, পর্তুগাল, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড। কিন্তু এদেরই মধ্যে কেউ কেউ, যেমন স্পেন ও পর্তুগাল সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে ফ্যাশিস্ত জার্মাণীকে এমন ব্যাপকহারে সাহায্য করেছে, যে তাদের ফ্যাশিস্তদের সহযোদ্ধা বলাই অধিকতর সঙ্গত।

সরকারী সূত্রে পাওয়া নীচের পরিসংখ্যান থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপ্তির একটা তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। যোদ্ধবর্গের তালিকায় যে সংখ্যা দেওয়া আছে তা হলো সেই সমস্ত দেশের যোগফল যারা যুদ্ধ ঘোষণা করে এতে যোগ দিয়েছিল। আর সৈন্য সংখ্যার হিসাবে ধরা হয়েছে নিয়মিত সেনাদলের, প্রতিরোধ আন্দোলনের বীর সংগ্রামীদের এর মধ্যে ধরা হয়নি।

	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ
যোদ্ধবর্গ	৩৩	৭২
সেনাদলে যোগদানে বাধ্য সৈনিকের সংখ্যা (দশ লক্ষ হিসাবে)	৭৪	১১০
নিহত (দশ লক্ষের হিসাবে)	১০	প্রায়* ৫০
আহত পঙ্গু (ঐ)	২০	২৮
প্রত্যক্ষ সামরিক ব্যয় (দশ কোটি ডলার হিসাবে)	২০৮	১৩৫

সংঘর্ষের এই ব্যাপ্তির কারণ বহু। বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গঠনের জন্যে জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের ব্যস্ত মনোভাব কোটি কোটি মানুষের প্রতিরোধ স্পৃহাকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক তথা

রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং তাদের সহজাত অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিণতি তখন ক্রমেই বিস্তৃত হয়ে উঠছিল। কিন্তু সব চেয়ে যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো এই যে যুদ্ধাস্ত্র তার ধ্বংস ক্ষমতায় আরো সক্রিয়, ভয়াবহ হওয়ার জন্যে, যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো ব্যাপকভাবে। বহু দেশ ও তাদের জনগণ জড়িয়ে পড়লো এই বেড়াজালে। ধ্বংসের নোতুন অস্ত্র নির্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বেড়ে গেল হুহু করে। ফলে যুদ্ধ সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত না হয়ে আর পারলো না।

কোটি কোটি মানুষ যোগ দিয়েছে এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে। নোতুন করে নিয়মিত সেনাদলে টেনে আনা হয়ে এগারো কোটি মানুষকে। আর ইউরোপ ও এশিয়ার প্রতিরোধ ও পার্টিজান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে এক কোটি থেকে এক কোটি বিশ লক্ষ মানুষ। তা ছাড়া এই দাবদাহে যোগদানকারী প্রতিটি সৈনিকের প্রয়োজন মেটাতে সমরোপকরণ নির্মাণ ও অন্যান্য নানা কাজে যোগ দেয় চার অথবা পাঁচজন মানুষ। ফলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রত সৈনিকের পেছনে পরোক্ষে লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করে আরো পঞ্চাশ কোটি মানুষ।[১৩] সর্বসাকুল্যে তাই নিয়মিত সেনাদল, প্রতিরোধ ও পার্টিজান আন্দোলন এবং সৈনিকের রসদ যোগাতে, যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে জড়িয়ে পড়ে ষাট থেকে বাষট্টি কোটি লোক।

অতীতের যে কোন যুদ্ধের তুলনায় জনগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের সরকারের নীতির নিষ্ক্রিয় সমর্থক বা তার রূপায়নে পরোক্ষ অংশীদার হয়ে না থেকে, নানাভাবে সক্রিয় সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিল। সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের সজাগ, সক্রিয় ভূমিকা অন্যের চোখে না পড়ে পারে না। তাদেরই ইচ্ছার মুখর প্রকাশে মার্কিণ ও বৃটিশ সরকার ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের সঙ্গে, তাঁদের সোভিয়েত বিরোধী চুক্তিতে সব ঠিকঠাক করেও কার্যকরী করতে ব্যর্থ হলেন। জনগণই এই ফ্যাশিবিরোধী যুদ্ধকে শেষ পর্যন্ত তার পরিণতির দিকে তাঁদের টেনে নিয়ে যেতে বাধ্য করলো। জনগণের ইচ্ছারই অমোঘ প্রকাশে দেশে দেশে গড়ে উঠলো প্রতিরোধ আন্দোলন। ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশে গড়ে উঠলো জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির যথার্থ পরিবেশ। সাম্রাজ্যবাদের নীতি নিয়ামকদের ইচ্ছার, অভিরুচির চেয়ে অনেক জোরালো ভাবে বাস্তব অবস্থার চাপ সেদিনের ঘটনাবলীর গতি নিয়ন্ত্রিত করেছিল।

পৃথিবীর মূল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্যে জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলো। দাঁড়ালো এসে তারা সংগ্রামের প্রথম সারিতে, সক্রিয় হয়ে উঠলো তারা দেশের অভ্যন্তরে। তাই বলা যায় যে এই সব মানুষ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও চীনের জনগণ, শত্রু অধিকৃত অঞ্চলের মানুষ, জার্মানী, জাপান ও ইটালীর খাঁটি দেশপ্রেমিক মানুষ, যারা আত্মগোপন করে সেদিন ফ্যাশিতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল, তারা সবাই ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্রপক্ষ, তার সুহৃৎ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি প্রকৃতি ও তার পরিণতি, তার ফলশ্রুতি ও শিক্ষা সম্পর্কে কোন মূল্যায়নই যথার্থ হবে না, যদি সাধারণ মানুষের ভূমিকার যথাযথ বিচার না করা হয়। সেইজন্যেই ইতিহাসের এই বিরাটতম যুদ্ধ. শুধু সামরিক জয় পরাজয়ের কাহিনী নয়।

ফ্যাশিবিরোধী যুদ্ধের ইতিহাস হলো মূলতঃ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামরত দেশের ইতিহাস, যাতে চূড়ান্ত জয়লাভ করেছে তারাই। বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সাম্রাজ্যবাদী ছলাকলার বিরুদ্ধে চরমতম মানসিক দৃঢ়তা, অটুট সংকল্প, বীরত্ব, সাহসিকতার মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে এইখানে, স্বাধীনতাকামী দেশগুলির কঠোর সংগ্রামের কাহিনীর মধ্যে। ইতিহাসের রচনায় সাধারণ মানুষের ভূমিকা যে দিনের পর দিন ক্রমেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক হয়ে উঠ্ছে, এই যুদ্ধ সেটাই প্রমাণ করে দিল। সমকালের জীবনধারায় রাজনৈতিক সচেতনতা ও সক্রিয়তা যে ক্রমেই বেড়ে গিয়ে একটা অমোঘ রূপ নিচ্ছে, যুদ্ধের ইতিহাস তাই যেন প্রমাণ করে দিল। সাম্রাজ্যবাদের পরাজয়, গলিত সমাজ ব্যবস্থার, ক্ষয়িষ্ণু জীবনধারার বিপর্যয়, জনগণের এই ক্রমকর্দ্ধমান সচেতনতার জন্যে শুধু সামরিক অর্থেই সীমিত হয়ে রইলো না। ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশের অভ্যন্তরীণ জীবনে তা এনে দিল পরিবর্তনের এক জোয়ার।

যুদ্ধের ইতিহাসে একটা বড়ো অধ্যায় জুড়ে রচিত হবে প্রতিরোধ ও সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলনের কাহিনী। গণ-আন্দোলনের সার্থক চরিত্র নিয়ে এগুলি গড়ে ওঠে আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্যে একটা ফ্যাশিবিরোধী কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে। ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের কাছে এই ধরনের শক্তিশালী আন্দোলনের আত্মপ্রকাশ অভাবিতপূর্ব ছিল। যে সমস্ত অধিকৃত

দেশে তাই দেখা যায়, ফ্যাশিস্তরা তাদের "নোতুন সমাজ ব্যবস্থা" গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল, প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের চাপে তাদের বনিয়াদ সুরুতেই ধ্বসে পড়লো। সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম, ঘৃন্যতম, অথচ শক্তিশালী প্রকাশ, ফ্যাশিতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির শ্রেষ্ঠ প্রবক্তরা একটা তীব্র আক্রমণ ধারা রচনা করলেন।

যদিও প্রতিরোধ আন্দোলন ও সোভিয়েতের দেশপ্রেমিক মানুষদের পার্টিজান আন্দোলনের মধ্যে অনেক খানি মিল ছিল—বিশেষ করে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য যখন ছিল ফ্যাশিস্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা—তবুও সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্যে, তাদের মধ্যে গরমিলেরও অভাব ছিল না। বিভিন্ন দেশের অধিকৃত অঞ্চলগুলিতেই বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের সমস্ত সক্রিয়তা সীমিত থাকে (অবিশ্য যুদ্ধের শেষের দিকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে)। কিন্তু সোভিয়েত পার্টিজান আন্দোলন, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রধান আঘাতকারী শক্তি হিসাবে সোভিয়েত সেনাদলের সঙ্গে যৌথ ভূমিকায় বিস্তৃত হতে থাকে। বুর্জোয়া সরকারগুলির অধিকাংশ যারা দেশ থেকে দূরে সরে থেকে পলাতকের অস্তিত্ব বজায় রাখার সময়, একবাক্যে প্রায় নিয়ম মাফিক প্রতিরোধ অন্দোলন সংগঠিত করার বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁরা সময় নিয়ে অপেক্ষা করার, অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার পক্ষপাতী ছিলেন বেশি। সোভিয়েত সরকার ও কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলন, সে দেশের সাধারণ যুদ্ধপ্রচেষ্টার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যারা দখলদারী শাসন ব্যবস্থাকে সমর্থন করে চলতো, তাদের বিনষ্ট করে, যুদ্ধশেষে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। অন্যদিকে সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলন, সোভিয়েতের শক্তিকে সুগঠিত করে, জনগণের জীবনের সঙ্গে তাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল।

তাই সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলন তার সক্রিয়তা ও সাংগঠনিক চরিত্রের বিচারে ছিল সমগ্র জনগণের আন্দোলন। জনগণই ছিল এর জন্মদাতা, তারাই যুগিয়েছে একে প্রেরণা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য।

প্রতিরোধ ও সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলনের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল

খুব বেশি। ফ্যাশিস্তদের "নোতুন সমাজের" ধারণাকে চুরমার করে দিতে জনগণের ইচ্ছার জোরালো প্রকাশ হিসাবে তার মুল্য ছিল খুব বেশি।

প্রতিরোধ আন্দোলন ও সোভিয়েতের পার্টিজান আন্দোলনের আন্তর্জাতিক চরিত্রের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় তাদের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মনোভাবের মধ্যে। সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর প্রায় প্রত্যেকটিরই মানুষ যোগ দেয় পার্টিজান আন্দোলনে। আবার তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, রুমেনিয়া, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন, জার্মাণী এবং আরো নানা দেশের মানুষ। বিভিন্ন জাতির মানুষের মধ্যে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে ওঠে, তার অটল বনিয়াদ রচিত হয়েছিল তাদের নির্বিশেষ আত্মত্যাগে। যুদ্ধ যখন ক্রমেই সোভিয়েতের প্রতিবেশী ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে হটে গেল, যখন সেইগুলিই হয়ে দাঁড়ালো রণাঙ্গন, সোভিয়েতের পার্টিজানরা তখন সেখানেই চললো শত্রুর এই দুর্বিপাকের সুযোগ নিতে। যুদ্ধবন্দী হিসাবে আটক অনেক দেশপ্রেমিক সোভিয়েত নাগরিক শিবির থেকে পালিয়ে গিয়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির পার্টিজান আন্দোলনে যোগ দেয়। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও অন্যান্য দেশের পার্টিজানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা সাহায্য করতে থাকে সেই সব দেশের নাগরিকদের আক্রমণকারীদের রুখে দাঁড়াবার জন্যে। তাদের বীরত্বের কথা আন্দোলনে সহযোদ্ধা যারা, মনে রাখবে চিরকাল। আর মনে রাখবে তাদের ফ্রান্স, ইটালী, বেলজিয়াম, নরওয়ে, গ্রীস ও অন্যান্য দেশের অসংখ্য মানুষ। সোভিয়েত সেনাদলে কর্মরত নারী ও পুরুষ এবং পার্টিজান আন্দোলনের বীর যোদ্ধারা একথা ভালো ভাবেই জানতো যে তারা কেবল সোভিয়েত দেশকে বিপদ মুক্ত করার জন্যে লড়াই করছে না, লড়ছে তারা নাৎসী দাসত্ব থেকে সমস্ত মানুষের মুক্তির জন্যে।

সোভিয়েত সেনাদলের বীরত্ব তাই সমস্ত মানুষের মুক্তিকে সেদিন সম্ভব করে তুলে ছিল। কারো কাছে সেই সম্ভাবনার অর্থ ছিল নাৎসী দখলদারী শাসন থেকে মুক্তি, কারো কাছে তা ছিল শত্রু-আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি আর সমস্ত পৃথিবীর মানুষ তার মধ্যে দেখেছিল জাতীয় ও সামাজিক মুক্তির একটা অনুকূল পরিবেশের সম্ভাবনা।

সোভিয়েত সেনাদল ও পার্টিজানদের বীরত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা প্রেরণা যোগায়

মিত্রপক্ষীয় সেনাদল ও প্রতিরোধ আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের। ফ্রান্স, ইটালী ও অন্যান্য দেশের সংগ্রামী মানুষরা সোভিয়েত দেশ প্রেমিক যোদ্ধাদের স্মরণে নিজেদের দলের নামকরণ করতে থাকে।

ইদানীং প্রতিরোধ আন্দোলনের ইতিহাস রচয়িতারা বুর্জোয়াদের আন্দোলন সুরু করার কুণ্ঠাকেই আবার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে আরম্ভ করেছেন। যেহেতু প্রতিরোধ ও পার্টিজান আন্দোলন ছিল মূলতঃ একটা সাহায্যকারী প্রচেষ্টা, তাই তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন যে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে গঠিত নিয়মিত সেনাদলের সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এদের সাফল্যকে একটা নিতান্ত সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কিছু বলা যায় কিনা। আসলে এই সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়। দেশ প্রেমিক মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে তুচ্ছ প্রতিপন্ন করার সমস্ত অপচেষ্টাকে আমরা হাজার বার ধিক্কার জানাই। ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভে তাদের বিরাট অবদানের কোন মূল্যায়ণের প্রচেষ্টা না করে, একথা বলাই যথেষ্ট হবে যে পার্টিজান ও প্রতিরোধ অন্দোলন জাতীয় তথা আন্তর্জাতিক জীবনে কোটি কোটি মানুষের মনে এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেছে, যাতে মানুষ ফ্যাশিতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করতে পারে।

একথা আজ অনস্বীকার্য সত্য যে যুদ্ধের সমস্ত গতিপরিবর্তনকারী ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রণাঙ্গনে এবং তাও আবার সোভিয়েত-জার্মাণ রণাঙ্গনে।

সোভিয়েত জার্মাণ রণাঙ্গনে বেধেছিল তাই দুই শক্তির সংঘর্ষ—একদিকে তার বর্ণবৈষম্য ও মানুষ খুন করার নীতি নিয়ে ফ্যাশিবাদ আর অন্যদিকে মানুষকে দাসত্ব, নিপীড়নের হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ। হিটলারতন্ত্র ততোদিনে সেনাদলের প্রতিটি মানুষ, সৈনিক ও অফিসার, সকলের মন বিষিয়ে তুলছে তার ভয়াবহ এবং ঘৃণ্য আদর্শের কাহিনীতে। কিন্তু সোভিয়েত সৈনিক তাদের মুক্তিকামী ব্রত, তাদের মানবিকতা ও আন্তর্জাতিক ধ্যান ধারণায় অবিচল আস্থা রেখে কাজ করে গেছে। অনাগত কালের ইতিহাসে এই সংগ্রামের ফলাফল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে, যেহেতু এই পরিণতি শুধুমাত্র একটা অদৃষ্টের পরিচায়ক নয়। খ্রুশ্চেভ্ বলেছেন যে, "মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সমাজতন্ত্রের অজেয় শক্তি তার সমস্ত মহত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।"[১০] জার্মাণীর বিরুদ্ধে সোভিয়েতের জয়লাভ

অভ্রান্তভাবে প্রমাণ করলো, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উপরে সমাজতন্ত্রের অনস্বীকার্য শ্রেষ্ঠত্ব তার ঐতিহাসিক অপরাজেয় সত্তার বৈশিষ্ট্য।

সাম্যবাদের উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সোভিয়েত ভূমির প্রতি গভীর আনুগত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত সেনা ও নৌ-বাহিনীর সৈনিক ও অফিসাররা, তাদের বীরত্ব, সাহসিকতায় সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে মুগ্ধ করে ফেললো।

পয়লা জুন, উনিশ শ' ছেচল্লিশের এক খবরে দেখা যায় যে সত্তর লক্ষেরও বেশি সৈনিক, নাবিক, অফিসার, জেনারেল ও অ্যাডমিরালকে, সোভিয়েত ইউনিয়নে নানা ধরণের পদক ও উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। দশ হাজার নয়শ' বিয়াল্লিশ জন সৈনিককে এই সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর আখ্যায় ভূষিত করা হয়। সোভিয়েতের বীর সেনানীরা তাদের উপর জনগণের আস্থা, পৃথিবীর অন্য দেশের মানুষের তাদের উপর বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যদা রেখে, সসম্মানে তাদের মুক্তিব্রত উদ্‌যাপন করে।

সোভিয়েতের অভ্যন্তরে অসামরিক জনগণ সাহস ও একাগ্রতার একটা অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। যুদ্ধ পূর্ব কালে দেশের যে সমস্ত অংশে বড়ো বড়ো কল কারখানার সমাবেশ ঘটেছিল, তার বেশিরভাগ অংশই যখন শত্রুর কবলে, সেই সময়ে উৎসর্গীকৃত প্রাণ সোভিয়েত জনগণ তাদের অকুণ্ঠ পরিশ্রমে গড়ে তোলে নোতুন শিল্প ব্যবস্থা, যাতে সেনাবাহিনীকে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের যোগান দিয়ে, জার্মাণীর যুদ্ধোৎপাদনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া যায়। সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা জার্মাণ অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর যে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে, তাই পরবর্তী কালে সোভিয়েত সেনাদলের সাফল্যকে সম্ভব করে তুলেছিল। এর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল অভ্রান্তভাবে, সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

যুদ্ধ সোভিয়েতের শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে গভীর ঐক্যের শক্তি ও সমস্ত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করার অটুট মনোভাবকে স্বপ্রকাশ করে। যুদ্ধকালীন সময়ের কোন প্রতিকূলতায় তা ভেঙ্গে যায়নি। শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিরা কোন সংকটের মুখেও তাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়নি, এবং সমস্ত দুঃখকষ্ট, সংকটের সামনে বীরের মতো অবিচল থেকে, হয় রণাঙ্গনে নয়তো কলে-কারখানায় তাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করে গেছে।

দেশের প্রতি অসীম ভালোবাসা, জাগ্রত দেশপ্রেম, আদর্শগত ও রাজনৈতিক ঐক্যমত, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং সবচেয়ে যা সুস্পষ্ট সমস্ত বিদেশী হানাদারদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা—এইসবের যোগফলে সোভিয়েত দেশে দেখা দিল এক গণজাগরণ, যা ফ্যাশিস্ত আক্রমণের মুখে কেবল আত্মরক্ষা করলো না, বহুগুণ শক্তিশালী নাৎসী বাহিনীকে প্রচণ্ড আঘাতে বিধ্বস্ত করে দিল। সমগ্র যুদ্ধকালীন সময় ধরে সোভিয়েতের জনগণ অতুলনীয় শক্তি ও ঐক্যের স্বাক্ষর রেখে গেল। তার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা যুদ্ধের শত আঘাত সহ্য করেও, অভাবনীয় তেজে শেষ পর্যন্ত সাফল্য লাভ করলো।

সোভিয়েত জনগণের মনোবল ও শক্তির এই বিরাট জাগরণ, রণাঙ্গনে ও ও দেশের অভ্যন্তরে তাদের এই ব্যাপক উদ্দীপনার, সমস্ত প্রেরণা এসেছিল কমিউনিষ্ট পার্টির অক্লান্ত প্রচেষ্টা থেকে। বিজয় সাফল্যের প্রধানতম কারণই ছিল কমিউনিষ্ট নেতৃত্ব।

অন্যান্য বহু দেশের মতো নীরব না থেকে যুদ্ধের সূচনাতেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা করে। পরবর্তী কালেও সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথমে যুদ্ধোত্তর শান্তি ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি কর্মসূচী পেশ করে, যার মধ্যে গণতান্ত্রিকতার আদর্শকেই সেই শান্তির শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে একটা গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাস করেছিল যে তার মিত্র পক্ষরাও ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের দাসত্ব থেকে ইউরোপকে মুক্ত করে, শত্রুর আঘাতে খণ্ডিত, লুণ্ঠিত দেশগুলির পুনর্বাসনের কাজে সাহায্য করতে উৎসাহী হবে। সম্মত হবে তারা মুক্ত দেশগুলির জনগণকে তাদের ইচ্ছামতো শাসন ব্যবস্থা বেছে নিতে দিতে; দেখবে তারা যেন প্রতিটি ফ্যাশিস্ত অপরাধী তার কৃতকর্মের যথাযোগ্য শাস্তি পায়, যেন এমন একটা সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় যেখানে জার্মানী বা জাপানের পক্ষে নোতুন করে কোন আক্রমণ সুরু করা অসম্ভব হয়। গড়ে তুলবে তারা পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ভিত্তি। সোভিয়েতের বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজে তার রাষ্ট্রনেতাদের বক্তৃতায় এই কর্মসূচীর যে রূপায়ণ

ঘটে, সোভিয়েতের জনগণ ও সরকার সেই লক্ষ্যের দিকে একাগ্রচিত্তে অগ্রসর হওয়ার জন্তে, সংগ্রাম করতে থাকে।

॥ তিন ॥

সমগ্র যুদ্ধকালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে যে ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে তার কোন সীমা নেই। সোভিয়েতের লক্ষ লক্ষ নাগরিক স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ নির্বিশেষে হয় রণাঙ্গনে, নয়তো অধিকৃত অঞ্চলে কিম্বা নাৎসীদের শ্রম শিবিরে প্রাণ হারিয়েছে। খ্রুশ্চেভ্ বলেছেন: "হিটলার জার্মাণীর বিশ্বাসঘাতক আক্রমণে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অর্থনীতির যে বিপুল ক্ষতি হয়, তার সঙ্গে সামরিক ব্যয় ও অধিকৃত অঞ্চলে কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থার সাময়িক আয়হীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মোট প্রায় দু লক্ষ ছাপান্ন হাজার নয় শ' কোটি রুব্‌লে দাঁড়ায়। যদি এই মোট অর্থ শান্তিপূর্ণ উন্নয়নের জন্তে ব্যয় করা যেত—যদি তা ব্যয় করা যেত কল-কারখানা, রেলপথ, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বাড়ীঘর নির্মাণে, জনগণের জন্তে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে—তাহলে অনেক আগেই আমরা উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রাচুর্য লাভ করতে পারতাম।"[১১]

পৃথিবীর বৃহত্তম পুঁজিবাদী দেশও এই ক্ষতি স্বীকার করে বাঁচতো না। স্বাধীনতা খুইয়ে হয় সে তার পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বী, নয়তো পুঁজিবাদী মিত্রদেশের অধীনে চলে যেত। কিন্তু তা হয়নি সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেত্রে—তা সত্যি হতে পারতো না কোনমতে। তাই দেখা গেল যুদ্ধশেষের অল্পকাল পরেই সোভিয়েতের জনগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আরো উন্নতি, অগ্রগতি ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে সাফল্যময় অগ্রগতির পূর্বসর্ত রচনা করছে।

কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েতের জনগণ যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমস্যাবলী সমাধানে তাদের বিপুল শক্তিকে সমবেত করতে সুরু করলো। নিজেদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করে, বাইরের কারো কোন সাহায্য ছাড়াই তারা বিস্ময়কর ভাবে স্বল্পকালের মধ্যেই তাদের আরব্ধ কর্ম সমাধা করলো। মাত্র দু' বছরে সোভিয়েতের শিল্প-ব্যবস্থা যুদ্ধ পূর্ব কালের উৎপাদন সীমায় পৌঁছে যায়। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে গড়ে তোলা যুদ্ধ-বিধ্বস্ত শহরগুলি সোভিয়েতের সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির আরো বড়ো সাফল্যের পথে অগ্রসর হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, সোভিয়েত জনগণ তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এক বিরাট, ঐতিহাসিক যুগ পরিবর্তনের সূচনা করে। ব্যক্তি পূজার রীতিকে ধিক্কার দিয়ে, যার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনেক ক্ষয় ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে তার দিকে নির্দেশ করে, পার্টি জীবন, পার্টি কর্মপদ্ধতি ও সরকারের নেতৃত্বে লেলিনবাদী নীতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে এই কংগ্রেস। জনগণের সক্রিয়তা ও উদ্যোগকে বিরাট স্বীকৃতি দেয় এই কংগ্রেস। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় যুগান্তকারী সমাধানের পথ নির্ধারণ করে, পুরানো প্রগতি বিরোধী মতবাদগুলি বাতিল করে, যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের নোতুন পরিস্থিতির উপযোগী সৃজনশীল মার্কসবাদী-লেলিনবাদী তত্ত্ব উপস্থিত করে এই কংগ্রেস।

পার্টির নেতৃত্বে উনিশ শ' উনষাটের মধ্যেই সোভিয়েতের জনগণ অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিস্ময়কর পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির একবিংশতি কংগ্রেস উনিশ শ' উনষাটের সুরুতেই লক্ষ্য করেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার ইতিহাসে এক চরম উন্নতি পর্বের সূচনায় এসে পৌঁছেছে, যেখান থেকে একটা পরিপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজ গঠনের স্তর সুরু হবে।

এই পর্বের প্রধান কাজ হবে সাম্যবাদের বস্তুগত ও কারিগরী বনিয়াদ রচনা করা। মাথা পিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন অত্যন্ত উন্নত পুঁজিবাদী দেশকেও ছাড়িয়ে যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সুরু হবে একটা ঐতিহাসিক সম্ভবনাময় যুগ। মাথা পিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই দুই দেশের মধ্যে যা পার্থক্য আছে, তার ব্যবধান এরই মধ্যে দ্রুত কমতে শুরু করেছে। প্রতিযোগিতার অনেক ক্ষেত্রেই সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থান আজ শীর্ষে আর তার সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমাগত।

এই পটভূমিতে অক্টোবর উনিশ শ' একষট্টিতে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতি কংগ্রেসকে সাম্যবাদ সংগঠকদের কংগ্রেস বলা যায়। পার্টি এখানে গ্রহণ করে এক নোতুন কর্মসূচী, আধুনিক কালের কমিউনিষ্ট ইশতেহার বলা যায় যাকে। সোভিয়েত দেশের সাম্যবাদী সংগঠনের নোতুন কালের উপযোগী

দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব সন্নিবেশিত হয় তাতে। যে সাম্যবাদী সমাজের গোড়াপত্তনের কাজ সুরু হয়ে গেছে তারই ব্যাপক পরিচিতি মেলে এতে, জানতে পারা যায় কোন পথে, কেমন করে গঠিত হবে সেই আগামী দিনের স্বপ্ন। কর্মসূচীর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের সমর্থনে দেওয়া সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মাত্রা, যার রূপায়নে সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের অভিজ্ঞতা ও সোভিয়েত জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, শ্রম ও নিষ্ঠাই হলো একমাত্র ভিত্তি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হতে এপর্যন্ত, এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। তার মৌল ভিত্তি হলো জনগণের দেশপ্রেম, কমিউনিষ্ট পার্টি, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের প্রতি সুগভীর আনুগত্য। সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি, তার আভ্যন্তরীণ ঐক্য ও সংহতি আরো জোরদার হয়ে উঠেছে সোভিয়েত বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান ও কারিগরী বিভাগীয় কর্মীদের বিপুল সাফল্যে যা পৃথিবীর মানুষের মনকে ক্রমাগত টেনে আনছে সমাজতন্ত্রের দিকে। যুদ্ধশেষের অল্পকালের মধ্যেই আধুনিক বিজ্ঞান ও কলা কৌশলের ক্ষেত্রে তার অগ্রগতি যে সাফল্য অর্জন করে, তার ফলে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সোভিয়েতের নেতৃত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

পারমানবিক পদার্থবিদ্যা, ইলেক্ট্রনিক্সের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাখা ও রকেট বিজ্ঞানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। মহাকাশে অভিযানে তাই তার ভূমিকা আজ অগ্রণী। মহাকাশের পথে প্রথম পদক্ষেপ করেছে সোভিয়েতের মানুষ, এই কমিউনিষ্টরা।

বিশ্ব রাজনীতিতে যুগান্তকারী ইতিহাসের বিরাটতম ঘটনা, সেই অক্টোবর উনিশ শ' সতেরোর দিনগুলি থেকে, সমাজতন্ত্রের শক্তি একটি দেশের সীমিত পরিবেশ থেকে আজ ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিগন্তরে।

দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশ বিপ্লবের সম্ভাবনায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের অগ্রগতির ছন্দে জাগলো প্রেরণা। জমিদার ও পুঁজিপতিশ্রেণী যারা ইউরোপে জার্মানী ও এশিয়ায় জাপানের পদলেহন করতে অতিমাত্রায় ব্যগ্র ছিল, জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় যাদের কুণ্ঠা ছিল না বিন্দুমাত্র, স্বভাবতই তাদের সঙ্গে জনগণের সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেল। বহু দেশে প্রতিক্রিয়ার শক্তি, পরাজয়ী মনোভাব সম্পন্ন দল, গোষ্ঠী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। প্রতিরোধ আন্দোলন সংগঠিত হলো শুধু বিদেশী

হানাদারদের বিরুদ্ধে নয়, দেশের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধেও বটে। বুর্জোয়া ও জমিদার শ্রেণীর তথাকথিত "ঐতিহাসিক" দলগুলি একদিকে যেমন এই নোতুন পরিবেশের আঘাতে অন্তর্হিত হতে লাগলো, তাদের বিরুদ্ধে জনগণের ধিক্কার যেমন মুখর হয়ে উঠলো, সেই পরিবেশে কমিউনিষ্টরা সমস্ত প্রতিকূলতা, সংগ্রাম, সংঘর্ষের অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয়ে, নিজেদের আন্তরিকতার, বিশ্বস্ততার পরিচয়ে দাঁড়ালো এসে মানুষের সামনে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে দেশে দেশে তারাই গ্রহণ করলো জনগণের নেতৃত্বের ভূমিকা।

দেশে দেশে বিদেশী হানাদার ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যা প্রায়শই সশস্ত্র সংগ্রামে পর্যবসিত হয়েছিল, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তা আবার বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সেখানে গড়ে ওঠে দু'টি বিরোধী পক্ষ। একদিকে ছিল বিদেশী দখলদারের অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার ও বড়ো পুঁজিপতিরা, অন্যদিকে পপুলার ফ্রন্টের নেতৃত্বে সংগঠিত জনসাধারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরে, বিশেষ করে যুদ্ধশেষের পরেই, ইউরোপ ও এশিয়ার অনেক দেশে প্রকৃত গণবিপ্লবের সূচনা হয়। তাই আবার দ্রুত পরিণতি লাভ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে।

এইভাবেই আলবেনিয়া, বুলগেরিয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র, কোরীয় জনগণতন্ত্রী সাধারণতন্ত্র, পোল্যাণ্ড, রুমেনিয়া, যুগোশ্লোভিয়া এবং এদের কিছুকাল পূর্বে মঙ্গোলীয় জনগণের সাধারণতন্ত্রের মানুষ সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এই সব দেশে যতোই পরিণতির দিকে অগ্রসর হলো, ততোই বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ সংঘবদ্ধ, ঘনিষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো পরস্পরের। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, "গড়ে উঠলো একটা বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্তর, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের আদর্শের অনুগামী জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশের মৈত্রীবন্ধন, যারা নিজেদের স্বার্থ, লক্ষ্য ও আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক মৈত্রীর আদর্শে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতায় বিশ্বাসী।"[১২]

একটা বিশ্বজনীন ব্যবস্থা হিসাবে সমাজতন্ত্রের প্রসার ও উন্নতি, তার দ্রুত অগ্রগতিই সমকালের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ঘটনা। গড়ে উঠলো এক নোতুন

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যেখানে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধিতায় একটি সমাজতন্ত্রী দেশের পরিবর্তে এসেছে একটা শক্তিশালী ও ক্রমবর্দ্ধমান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগোষ্ঠী। সমকালের পৃথিবীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই দুই বিরোধী শক্তির, শিবিরের সংঘর্ষই হলো প্রধান ঘটনা।

এই দুই বিশ্বজনীন ব্যবস্থার সংঘর্ষে, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুকূলেই পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে চলেছে। স্মরণাতীত কাল ধরে মানুষের সঞ্চিত সমস্যা যা তার মনকে চিরকাল উৎপীড়িত করে এসেছে তার সমাধানের পথ আছে সমাজতন্ত্রে। মানুষের সার্বিক প্রগতির একমাত্র পথ হলো সমাজতন্ত্র। যে দিন বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা পৃথিবীর মোট শিল্পোৎপাদনের অর্দ্ধেকের বেশি উৎপাদন করে, পৃথিবীর শিল্প ব্যবস্থাপনায় নেতৃত্বের আসন দখল করবে সেদিন আজ সমাগত প্রায়।

তাদের পারস্পরিক শক্তির ভারসাম্য প্রধানতঃ নির্ভর করবে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিকাশের মান, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নিযুক্ত কর্মিদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রাপ্তব্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিস্তৃতি, বণ্টন ব্যবস্থা, নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং সর্বশেষে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই সমস্ত উপাদানের যোগফল ও তাদের আন্তর সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তির বিচারে সাম্রাজ্যবাদকে অতিক্রম করে গেছে। ফলে গড়ে উঠেছে পৃথিবীতে শক্তির এক নোতুন ভারসাম্য, যেখানে সমাজতন্ত্রের অগ্রণী ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্যে এই গুণগত পরিবর্তন এতোই প্রকট যে প্রখ্যাত পশ্চিমী নেতৃবৃন্দও তা অস্বীকার করতে পারেননি। প্রথম মার্কিণ রাষ্ট্রনেতা যিনি একথা স্বীকার করেছিলেন, তিনি হলেন জন ফষ্টার ডালেস। ডালেস বলেছেন: "পৃথিবীতে শক্তির ভারসাম্যে একটা সুনির্দিষ্ট পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং সেই পরিবর্তন ঘটেছে সোভিয়েত সাম্যবাদের অনুকূলে।"[১৩]

স্বর্গত মার্কিণ রাষ্ট্রপতি জন এফ, কেনেডি, উনিশ শ' ষাটে তাঁর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে বলেন যে, "কমিউনিষ্টদের শক্তি আমাদের চেয়ে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এখনো পাচ্ছে।"[১৪]

পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাতেও সবিশেষ পরিবর্তন ঘটে

গেছে। যেদিন সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবী শাসন করতো, ইচ্ছামতো সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বিষয়ে সমাধানের পথনির্দেশ করতো, যখন যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্নে তার স্বেচ্ছাচারী মনোভাবই হয়ে উঠতো চরম নিয়ামক, সেদিন বহুকাল গত হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য হলো হিংস্রতা, তার কোন বদল হয়নি। সামাজিক প্রগতির প্রতি তাদের ঘৃণা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা যেমন দুই বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছিল, তেমনই আবার কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পথে মানুষকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের তারা হলো সবচেয়ে শক্তিমান, ধূর্ত শত্রু। মানুষের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধে প্রবৃত্ত হতে তাদের মোটেই বাধে না। উনিশ শ' বাষট্টির অক্টোবরে ক্যারিবিয়ান সংকট হলো তারই একটা সাম্প্রতিক নমুনা। সেদিন সমস্ত পৃথিবী একটা ভয়াবহ বিপদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিনের পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম হতে সোভিয়েতের দৃঢ় অথচ পরিবর্তনশীল নীতিই পৃথিবীকে রক্ষা করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিউবার জনগণের স্থিরচিত্ত, দৃঢ় মনোভাবই সমগ্র সামাজতান্ত্রিক শিবির ও শান্তির স্বপক্ষে যারা, তাদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে সংকটকে এড়িয়ে যেতে সাহায্য করে। ক্যারিবিয়ান সমস্যার সমাধান প্রমাণ করে যে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করে তার সমস্ত পরিণাম এড়িয়ে যাওয়ার মতো শক্তি, সাম্রাজ্যবাদের আর অবশিষ্ট নেই। পৃথিবীর এই সমকালীন পরিবেশে, সাম্রাজ্যবাদের উপর সমাজ তন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কার্যকরী অবস্থায় এ ধরণের বাস্তব সুযোগ আসা সম্ভব যাতে যুদ্ধকে এড়ানো যাবে। এবং অদূর ভবিষ্যতে সেদিন আসবে যেদিন মানুষের সমাজ জীবনে বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা চিরতরে দূর করে দেওয়া যাবে।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতি কংগ্রেস তাই লক্ষ্য করেন পৃথিবীর ঘটনাবলীতে আজ নিয়ামকের ভূমিকা গ্রহণ করেছে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। মানুষের ভবিষ্যত রূপায়ণে নেকড়ের প্রবৃত্তি নিয়ে আর সাম্রাজ্যবাদ প্রভুত্ব করতে পারছে না, তার স্থান দখল করেছে সমাজতন্ত্রের শান্তি ও প্রগতির আদর্শ। সাম্রাজ্যবাদকে শক্তির এই আপেক্ষিক সম্পর্ক উপলব্ধি করতে, সমকালের পৃথিবীতে সমাজতন্ত্রের ভূমিকার গুরুত্ব বুঝতে, তাদের চিরাচরিত শক্তিবাদী নীতি পরিত্যাগ করে যুক্তিবাদী নীতি গ্রহণে বাধ্য করে, সবকিছুকেই নিজের

হুকুমৎ প্রতিষ্ঠা করার আগ্রহ পরিত্যাগ করে, আক্রমণাত্মক রাজনীতির পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ বেছে নিতে বাধ্য করার মতো বাস্তব পরিস্থিতি আজ সমুপস্থিত। দ্বাবিংশতি কংগ্রেস যথার্থই লক্ষ্য করেছেন যে সমকালীন পরিস্থিতিতে পরস্পর বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীর্ঘস্থায়ী সম্ভবনার পথ, যতোদিন না মানুষের সমাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যার একটা স্থায়ী সমাধান হচ্ছে, আজ প্রশস্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে উপনিবেশ ও পরাধীন মানুষেরা তাঁদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছেন যে সাম্রাজ্যবাদ কেবলমাত্র তার ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের শৃঙ্খল সুদৃঢ়ভাবে গড়ে তুলছে না, তার সব কাজের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমাগত মুনাফাবৃদ্ধি। তাঁরা এটাও দেখেছেন যে সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নকারীরা মুখে যতোই শক্তির দম্ভ করুক না কেন, আসলে আর তাদের ততো শক্তি নেই। যুদ্ধ বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ড প্রভৃতি মুখ্য উপনিবেশবাদী শক্তি গুলির শক্তিহীনতা ও দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলেছে। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের দাবীদার, জার্মাণ, ইটালীয় ও জাপানী উপনিবেশবাদীদের চরম বিপর্যয় ঘটিয়ে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের লুঠেরা মনোভাবের নগ্ন স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছে।

যুদ্ধকালীন সময়ে এবং যুদ্ধোত্তর কালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ঔপনিবেশিক নীতিকে সর্বদা সোভিয়েতের মুক্তি কামী নীতির প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছে। ফ্যাশিস্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েতের বিজয় সাফল্যকে সেই জন্যেই জনগণ মুক্তির আদর্শের নীতির বিজয় বলে অভিনন্দিত করেছে। সোভিয়েতের মুক্তিকামী নীতি ও আদর্শকে তাই পরাধীন দেশের মানুষ নিজেদের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি, জাতীয় আশাআকাঙ্খার বন্ধু, সমর্থক বলে মনে করেছে। এই মুক্তির আদর্শের প্রতি আনুগত্যের জন্যেই, বিভিন্ন দেশের মানুষ ফ্যাশিস্ত আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগ দিয়েছে।

চীনের দেশ প্রেমিক মানুষদের যুদ্ধকালীন সময়ে জাপানী হানাদারদের এবং যুদ্ধশেষে চিয়াং কাইশেক ও মার্কিণ হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রাম, সমস্ত পরাধীনদেশ ও উপনিবেশের মানুষদের কাছে একটা আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রতিরোধ আন্দোলন, সশস্ত্র গণসংগ্রাম জাপানী হানাদারদের বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশে দেশে বিস্তৃতি লাভ করে, এশিয়ার মানুষদের জাতীয় মুক্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল। কোরিয়া. ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ, মালয় ও ফিলিপাইনের জনগণ এরই মাঝে লাভ করে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনার শিক্ষা। সশস্ত্র অভিযানের অভিজ্ঞতা পুষ্ট হয়ে তারা তাদের উৎপীড়নকারীদের বিরুদ্ধে সেই শিক্ষা প্রয়োগ করে তাদের ক্লান্ত, অবসন্ন ও শেষে পরাজিত করার জন্যে।

আফ্রো-এশিয় জনগণের জাতীয় মুক্তি সম্ভব করে তোলার এই একটা নোতুন, অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে। উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের জনগণকে সেদিন আর আগের মতো পরাধীন রাখা সম্ভব হচ্ছিল না কোনমতে। উপনিবেশ বাদীরাও বুঝেছিল যে আগের মতো জবরদস্তি শাসন করার ক্ষমতা আর তাদের নেই। তাই যত্তোই জাতীয় মুক্তি অন্দোলনের বিস্তৃতি কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো, তখন চিরাচরিত দমননীতির আশ্রয়ে আর তাকে স্তব্ধ করে দেওয়া গেলনা। তার আরো একটা কারণ ছিল এই যে জনগণের হাতে তখন অস্ত্রশস্ত্র এসে গেছে, শাসকের শক্তির জবাব তার অস্ত্র দিয়েই দেবে।

সাম্রাজ্যবাদ বলপ্রয়োগ করে, উপনিবেশিক নীতির অনুসরণে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চেষ্টা করেছিল কোনমতে মাটী কামড়ে পড়ে থাকতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এশিয়া আফ্রিকার ঔপনিবেশিক দুনিয়ার ইতিহাসের গতিপরিবর্তনের অমোঘ নিয়ম কোন মতেই ব্যাহত করার শক্তি তার ছিল না। পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। সমকালীন পৃথিবীর প্রগতিশীল অগ্রগতিতে এই ভাঙ্গন ছিল একটা চরম বৈশিষ্টাপূর্ণ ঘটনা। সুদূর প্রসারী ঘটনাবলীর পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতে মূর্ত হয়ে উঠলো নবজাগ্রত জাতীয় সত্তার রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক স্বাধীনতালাভের নিরন্তর প্রয়াসের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ায় মরিয়া হয়ে ওঠা মনোবৃত্তির কঠোর সংগ্রাম। কিন্তু অবস্থা প্রতিকূল বুঝে যে কোন প্রকারে আধিপত্য বজায় রাখার সংকল্প নিয়ে, সাম্রাজ্য-বাদ নোতন ধরণের ঔপনিবেশিক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করলো।

সমগ্র ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ তখন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। যুদ্ধ শেষের অল্পকালের মধ্যেই দীর্ঘ দিনের স্বার্থপুষ্ট ঔপনিবেশিক

শাসন, যা এতোকাল অনেক সংকটের মুখোমুখি হয়েও সমস্ত বাধা কাটিয়ে টিকে ছিল, পঞ্চাশটি দেশের দেড় শ' কোটি মানুষের জীবন থেকে তা অপসৃত হয়ে গেল। সমাজতন্ত্রের একটা প্রচণ্ড বিশ্বজনীন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ না ঘটলে, এটা সম্ভব হতো না কোন মতে।

পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও দেখা গেল সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের সম্ভবনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমস্ত প্রগতির স্পর্শ থেকে উপনিবেশের জীবন ধারা দূরে থাকার জন্যে, বহু দেশে সূচিত হলো জাতীয় পুনরুজ্জীবন। মাত্র কিছুকাল আগেও যাদের পরিচিতি ছিল নিছক উপনিবেশ বলে, আজ সেই সব দেশেরই জনগণ বিশ্ব রাজনীতিতে একটা নোতুন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। সমকালের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তাই শুধু ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যেই সীমিত নয়। আজকেই তা হয়েছে প্রকৃত আন্তর্জাতিক। প্রাক্তন উপনিবেশ ও আধা উপনিবেশের জনগণ আজ নবজীবনের স্রষ্টা হয়ে, একটা বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে সাম্রাজ্যবাদকে নির্মূল করে, দেশে দেশে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রবক্তা হয়ে উঠেছে।

সদ্যস্বাধীন সর্বভৌম রাষ্ট্রগুলির অধিকাংশই, তাদের ঔপনিবেশিক বা আধা-ঔপনিবেশিক জীবনের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বিস্মৃত না হয়ে, গ্রহণ করেছে একটা জাতীয় নীতি, যার মৌল ভিত্তি হলো সামরিক জোট-নিরপেক্ষতা। এই অর্থে নিরপেক্ষ হলেও, যুদ্ধ বা শান্তির প্রশ্নে তারা আদৌ নিরপেক্ষ নয়। তারা আন্তরিকভাবে, দৃঢ়তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও যুদ্ধবাদী নীতির বিরোধী, শান্তি বজায় রাখার জন্যে তাদের প্রয়াসও তাই আন্তরিক ও অত্যুৎসাহী। তাই তাদের নীতির এই বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নীতিরও মিল নিতান্ত স্পষ্ট, ঘনিষ্ঠ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং অক্টোবর বিপ্লব পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের প্রথম সংকেত জানায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালে ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট তার দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণ করে। পঞ্চাশের দশকে সুরু হয়েছে সেই সংকটের তৃতীয় স্তর।

বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট হলো একটা ব্যাপক, বিস্তৃতির অবস্থা, যার মধ্যে

বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন অস্তিত্ব জড়িত আছে—তার অর্থনীতি, তার আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি, তার আদর্শের বনিয়াদ, কোন কিছুই এর আওতার বাইরে থাকতে পারে না। এই সাধারণ সংকটের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর আগের তুলনায় হয়ে উঠেছে অনেক বেশি তীব্র। সেই তীব্রতার কারণ স্বরূপ বলা যায় যে প্রধানতঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধি, ঔপনিবেশিক শাসনের ক্রমাবনতি, জনগণের প্রতি শান্তিপূর্ণ সৃজনশীল উৎপাদন নীতি গ্রহণ করার ব্যর্থতা, পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলের উপর থেকে পুঁজিবাদী কর্তৃত্বের অবসান, সাম্রাজ্যবাদী দেশে জঙ্গীমনোভাবের বিস্তার এবং একটা নোতুন বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার জন্যে তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী দেশে শাসক শ্রেণীর আদর্শের দেউলিয়াপনা, এরাই হলো দায়ী। এই সব কারণগুলির মধ্যে সবচেয়ে যার প্রাধান্য বেশি তা হলো সমাজতন্ত্রের সাফল্য, যা স্পষ্টতই প্রমাণ করে দিয়েছে উৎপাদন উপাদনের দ্রুত উন্নতি সাধনে পুঁজিবাদের ব্যর্থতা, জনগণের জীবনধারায় গুণগত পরিবর্তন আনতে তার একান্ত অক্ষমতা।

একথা প্রসঙ্গতঃ বিশেষভাবে স্মরণীয় যে পুঁজিবাদের সাধারণ সংকটের তৃতীয় স্তর কোন বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে গড়ে ওঠেনি। তা গড়ে উঠেছে এমন এক পরিবেশে যেখানে দুই পরস্পর বিরোধী সমাজ ব্যবস্থা শুধু সশস্ত্র সংঘর্ষে না গিয়ে, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত সংগ্রামের তীব্রতম স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এই সংগ্রামেও পুঁজিবাদের ব্যর্থতা ঘটেছে নিদারুণ।

এই অর্থনৈতিক সংগ্রাম, যাকে কেন্দ্র করে চলেছে শ্রেণী সংগ্রাম পৃথিবী জুড়ে, সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হয়ে উঠছে, তারই হবে চূড়ান্ত নিয়ামকের ভূমিকা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও শান্তির সপক্ষে যারা, তাদের সম্মিলিত শক্তি বারেবারেই সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বযুদ্ধ সুরু করার প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছে। আদর্শের ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় সাফল্য ঘটে গেছে যা মানুষের মনকে প্রভাবিত করছে রীতিমতো।

পুঁজিবাদের গভীর অন্তর্দ্বন্দ্বও এই একই সময়ের মধ্যে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদক শক্তি ও উৎপাদনের আপেক্ষিক সম্পর্কের মধ্যে আজ যে বিরোধ দেখা যাচ্ছে, ইতিপূর্বে তেমনটি

আর কখনো দেখা যায়নি। অস্থায়িত্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির একটা মৌল পরিচয়। বাজারের সমস্যা তার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আর এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদের আদর্শ একটা নিদারুণ সংকটের আবর্তে পড়ে গেছে। পুঁজিবাদের এই সাধারণ সংকটের বর্তমান স্তরে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ও চরম বিপর্যয়ের সামনে এসে পড়েছে।

আগেকার যে কোন অবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদী দেশগুলি যে অসম উন্নতির স্তরে বর্তমানে থাকতে বাধ্য হয়েছে, সাধারণ সংকটের সেটাও হলো আরেকটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশের উৎপাদনের হার বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ফলতঃ পুঁজিবাদী দেশগুলির শিল্পোৎপাদনে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অংশ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আর আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে প্রাক্তন যুদ্ধকালীন ফ্যাশি জোটের তিন প্রধান—জাপান, ইটালী ও পশ্চিম জার্মাণীর শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে সর্বোচ্চ হারে।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াপুঁজিবাদ, যার লক্ষণ হলো বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে জাতীয় অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ, ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিচ্ছে বহু দেশে। আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টায় সচেষ্ট। তাই এর কোন কোন শাখায় তার নিয়ন্ত্রণও সম্প্রসারিত হয়েছে। দক্ষিণ পন্থী সমাজতন্ত্রীরা এই দৃষ্টান্তে এমনই বিমোহিত যে তারা একে সমাজতান্ত্রিক লক্ষণ হিসাবে প্রচার করতে তৎপর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আসলে এতে সমাজের উপর একচেটিয়া গোষ্ঠীর কর্তৃত্ব বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই হয় না। মুনাফা বেড়ে যায় তাদের যথারীতি, জনকল্যাণের নামে সাধিত হয় একচেটিয়াপতিদের অব্যাহত কল্যাণ। মুষ্টিমেয় কিছু কোটিপতি লোক পুঁজিবাদী দেশের জাতীয় সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ইচ্ছামতো ব্যবহার করে যায়।

রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে তাই দেখা যায় একচেটিয়া কারবারীদের শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রের শক্তি, ফলে এই সম্মেলনের মাধ্যমে তাদের মুনাফার স্রোত বাধাহীন হয়ে যাবে এবং তারই পাশাপাশি চালানো যাবে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি দমননীতি, ভেঙ্গে দেওয়া যাবে জাতীয় মুক্তির জন্তে সংগ্রামকে। আর এই উদ্দেশ্য যদি সফল হয় তাহলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে আরো দীর্ঘস্থায়ী করা যাবে, সম্ভব হবে নোতুন

আক্রমণাত্মক যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি করা। বুর্জোয়া একচেটিয়া শ্রেণীর স্বার্থে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তাই আজ একটা পরিচালনা পরিষদ বলা যায়, যার কাজই হলো এর পরিপোষণ করা। সমকালীন পৃথিবীর প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আজ চলেছে অবাধে কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল মানুষের নিপীড়ণ। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকারগুলিকে ধীরে ধীরে স্থগিত করে দেওয়া হচ্ছে। আর সেকারণে মাথা চাড়া দিচ্ছে ফ্যাশিপন্থী সংগঠনগুলি।

॥ চার ॥

বিশ্বপুঁজিবাদের সংকট সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শাসকশ্রেণীর মনে জঙ্গী-ভাবকে আরো বাড়িয়ে তোলে। তারা চায় এমন এক নোতুন পৃথিবী গড়ে তুলতে যেখানে সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে পুঁজিবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তী কালের ইতিহাসের শিক্ষা হয় তারা বুঝতে পারেনি কিম্বা বুঝতে চায় না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন বিশ্বাস করতো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কেবল ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয়ের মধ্য দিয়েই শেষ হবে না, তার পরিণতিতে আসবে জাতীয় স্বাধীনতার ধারণা, মুক্তি গণতন্ত্রের সপক্ষে মানুষের বিশ্বজনীন আগ্রহের উপর, সমস্ত পৃথিবীর মানুষের উপর ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের চরম আধিপত্যের বিস্তার। এক কথায় বলতে গেলে যুদ্ধ শেষে তাদের প্রত্যাশা ছিল গাছের খাওয়ার আবার তলারও কুড়োবার।

সেই প্রত্যাশা থেকে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে মার্কিণ রাষ্ট্রনেতারা যুদ্ধশেষের বেশ কয়েকমাস আগের থেকেই সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্পর্কে ফাটল ধরাবার চেষ্টা করতে থাকেন। বলা যায় যে যেদিন থেকে নোতুন রাষ্ট্রপতি হ্যারী এস. ট্রুমান হোয়াইট হাউসে পদার্পণ করলেন, সেদিন থেকেই এই নীতি চালু করা হলো।

কংগ্রেসে প্রেরিত পরপর কয়েকটি বাণীতে রাষ্ট্রপতি ট্রুমান বিশ্বের নেতৃত্ব দখল করে পৃথিবীটাকে মার্কিণ একচেটিয়া পুঁজির কিভাবে কুক্ষিগত করা যায় তারই একটা কর্মসূচী পেশ করেছিলেন। উনিশে ডিসেম্বর, উনিশ শ' পঁয়তাল্লিশে সেনাবাহিনীর পুনর্গঠন সংক্রান্ত বাণীতে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতি

মার্কিণ বৃহৎ পুঁজির স্বার্থে শান্তির সময়েও অস্বাভাবিক বড়ো রকমের এক সেনাবাহিনী বজায় রাখার সুপারিশ করছেন। আমেরিকার পরাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য, ট্রুম্যান নির্দেশিত করেন "পৃথিবীর নেতৃত্ব"। যদিও এই জঘন্য কর্মসূচীকে, শক্তিমদমত্ত উচ্চাভিলাষকে, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে তিনি বাগাড়ম্বরে ঢেকে রাখার জন্যে "আমেরিকার জনগণ" তাদের "দায়িত্ব", তাদের "ব্রত ও কর্তব্যের বোঝা" প্রভৃতি সুনির্বাচিত শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

ট্রুম্যান বলেন: "যে বিজয় সাফল্য আমরা লাভ করেছি তা আমেরিকার জনগণের উপর বিশ্বের নেতৃত্বদানের ক্রমিক দায়িত্ব অর্পণ করেছে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি বহুলাংশে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর জাতি সমূহের মধ্যে তার নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করতে দৃঢ় সংকল্প না নয়, তার উপরে নির্ভর করবে।"[১৫]

এই চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য, প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্রগুলির গুণে বহু গুণ জোরের সঙ্গে প্রচারিত হওয়া সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় কোন সাড়া জাগাতে পারলো না। বরং সমগ্র পৃথিবী, যেহেতু মার্কিণ একচেটিয়া পুঁজির হুকুমতের কাছে মোটেই নতি স্বীকার করতে ইচ্ছুক ছিল না, তাই কঠিন নীরবতায় তা উপেক্ষা করলো। ইতিহাসের গতি তখন মার্কিণ বিশ্ব নেতৃত্বের অনুগামী ছিল না, বরং তার অমোঘ নিয়মে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের ঘটতে লাগলো ক্রমাবনতি। ইতিহাসের অগ্রগতির বাস্তব নিয়ম যে মার্কিণ একচেটিয়া গোষ্ঠীর স্বার্থগত ইচ্ছার চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তিশালী, সেই বোধ তাদের ছিল না। তাই সমস্ত পরিকল্পনা তাদের নাকের ডগায় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলেও, তারা দিবাস্বপ্নের সুখ ছাড়তে পারলো না। তাই মার্কিণ নীতির জবরদস্তি, জঙ্গীভাবকে তারা ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুললো।

যুদ্ধশেষের দিনগুলিতেই মার্কিণ সরকার ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতি স্থির করে ফেলে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এমন একটা অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, ইতিহাসে যার কোন নজীর নেই। আক্রমণাত্মক সামরিক জোটে যোগ দেওয়ার জন্যে বহুদেশের উপর সে চাপ দিতে সুরু করে। পৃথিবীর নানা দেশে গড়ে তোলে সামরিক ঘাঁটি। আজো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে ঐতিহ্যের অবশেষটুকু পৃথিবীতে বজায় রয়েছে, মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিপোষক বলে, তারা অবসান ঘটাতে নারাজ। ইউরোপে আঠারো বছর আগে (গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৬৩—অনুবাদক) যুদ্ধশেষ হওয়া সত্ত্বেও জার্মাণীর সঙ্গে এ পর্যন্ত কোন শান্তিচুক্তি সম্পাদন করা হয়নি। ফলতঃ পশ্চিম বার্লিনের পরিস্থিতি, যার এই ধরনের একটা চুক্তির সাহায্যে অনেক আগেই মীমাংসা হয়ে যেতো, তা আজো অপরিবর্তিত আছে।

ফ্যাশিবাদের পরাজয় ও হিটলারী একনায়কত্বের অবসান, জার্মাণীর গণতান্ত্রিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে। ফ্যাশিবাদের সমস্ত শক্তিকে নির্মূল করে, দেশ থেকে তার সমস্ত ঐতিহ্যের অবসান ঘটিয়ে, জনগণ জার্মণীর শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটাতে দৃঢ় সংকল্প ছিল।

কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত যে জার্মাণীর পূর্বাঞ্চলেই কেবল একটা নোতুন সমাজ গঠনের বাস্তব অবস্থা সমুপস্থিত হয়েছে। তাই যুদ্ধ যখন শেষ হলো, সুরু হলো সেখানে ফ্যাশিবাদ ও জঙ্গীবাদের অবলুপ্তির, দেশের মাটি থেকে তার অর্থনৈতিক ও সমাজিক বনিয়াদের বিধ্বস্ত করার প্রচেষ্টা।

জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র তাই জার্মাণ জনগণের শান্তিপ্রিয়, গণতান্ত্রিক অংশের প্রতিনিধি। জার্মাণীর এই গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সরকার তার সর্বশক্তি তাই নিয়োগ করেছে শান্তিকে সুরক্ষিত করার মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতীয় সমস্যার সমাধান করতে, আন্তর্জাতিক উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে। তার অস্তিত্ব বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার একটা অন্যতম নিশ্চয়তা বলা যায়।

কিন্তু পশ্চিম জার্মাণীর ক্ষেত্রে একথাগুলি প্রযোজ্য নয়। সেখানকার জনগণের গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্ক্ষা বারেবারেই মার্কিণ, বৃটিশ ও ফরাসী দখলদারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে। দখলদারী কর্তৃপক্ষরা কেবলমাত্র পরাজিত জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদকে রক্ষা করেনি, তারা চরম রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার পুনরুজ্জীবনের পথ প্রশস্ত করে, জার্মাণীর জঙ্গীবাদ, উগ্রজাতীয়তা-বোধকে প্রশ্রয় দিয়েছে, খুঁচিয়ে দিয়েছে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে। পশ্চিমী শক্তিবর্গের এই নীতিই জার্মানীর দ্বিখণ্ডীকরণের প্রধান কারণ।

জার্মানীর খণ্ডিত অবস্থার উদ্যোক্তা ছিলেন মার্কিণ, বৃটেন ও ফ্রান্সের সরকার। তাঁরাই জার্মানীর স্ব স্ব অধিকৃত অঞ্চলে স্বতন্ত্র জার্মাণ রাষ্ট্র

গঠনের সমস্ত প্রাথমিক প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, জার্মাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সধারণতন্ত্র (পশ্চিম জার্মাণ সরকার) প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত, জার্মাণ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের (পূর্ব জার্মাণ সরকার) পত্তন করা হয়নি। এইভাবেই গড়ে ওঠে দু'টি স্বতন্ত্র, স্বাধীন জার্মাণ রাষ্ট্র, যারা জন্মের মুহূর্ত থেকেই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী নীতি নিয়ে কাজ করতে থাকে।

একটা জঙ্গী, প্রতিহিংসাপরায়ণ রাষ্ট্র হিসাবে, জার্মাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের জন্ম হওয়ায়, তার শাসকমণ্ডলী নিজেদের আক্রমোণাত্মক মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থায় (N. A. T. O.) যোগদান করেছে। তার চেয়েও যা বেশি লক্ষ্যণীয় তা হলো এই যে, সেই দেশের সেনাবাহিনীই আক্রমণাত্মক লক্ষ্যসম্পন্ন অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার প্রধান সেনাদল হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই গোষ্ঠীর নীতি নির্ধারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করছে। বলা যায় জার্মাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের সরকার সমস্ত জরুরী আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানের পথে ক্রমাগত বাধা দিয়ে যাচ্ছে।

পশ্চিম জার্মাণীর পুনরস্ত্রীকরণের নীতির সঙ্গে যুদ্ধ পূর্বকালের মিউনিক নীতির বিশেষ লক্ষ্যণীয় সাদৃশ্য আছে। এই নীতিরও ভিত্তি হলো সেই সুপরিচিত ধারণা যে, পুনরস্ত্রীকরণের ফলে বলীয়ান পশ্চিম জার্মানী উত্তর অতলান্তিক জোটের সদস্য হিসাবে উপযুক্ত মুহূর্ত আসলেই, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের অনুগত সেবকের মত কাজ করবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের জঙ্গীবাদীরা তাদের বিমান বাহিনী ও রকেটগুলি পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত করে, তাদের আক্রমণাত্মক অভিসন্ধির তাগিদে লক্ষ্য বস্তুর উপরে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে চায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ অধ্যুষিত বড়ো বড়ো শহরগুলির উপরে অতর্কিতে আক্রমণ করার বর্বরোচিত পরিকল্পনা পেন্টাগণ (Pentagon) প্রস্তুত করে রেখেছে। উনিশ শ' বাষট্টির সুরুতে রাষ্ট্রপতি কেনেডি ঘোষণা করেছিলেন যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা পারমাণবিক যুদ্ধ সুরু করার উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মার্কিণ দেশের শাসক গোষ্ঠী শান্তিকামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের বিরুদ্ধে অতর্কিতে যে পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা করতে পারে, এটাকে তার একটা খোলাখুলি স্বীকৃতি বলা যায়। কিন্তু একালে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আরো উন্নত ধরনের পারমাণবিক

অস্ত্রের অধিকারী, যখন তার বহুগুণ উন্নত রকেট আছে, তখন এই কর্মসূচীর যে ঝুঁকি বেশি সেকথা বলা যায়। উন্মাদ, একগুঁয়ে লোক ছাড়া আর কেউই মনে করে না যে যুদ্ধে কেবল এক পক্ষই পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবে। তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে, হিটলার ও গোয়েবলস্ও শপথ করে বলেছিলেন যে জার্মাণীর উপরে কখনো বোমা পড়বে না। কিন্তু কয়েক বছরের ব্যবধানেই দেখা গেল বোমার আঘাতে জার্মাণীর অনেক শহর ও গ্রাম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সন্দেহ নেই যে সেদিন সামরিক তৎপরতায় দূরত্বের ব্যবধান যথেষ্ট দুস্তর ছিল। কিন্তু আজ কোন দূরত্বই, তা সে সাগর অথবা মহাসাগর যাই হোক না কেন, আক্রমণকারীকে তার কাজের প্রতিফল থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও তার অনুগামীদের আক্রমণাত্মক যুদ্ধবাদী নীতির একমাত্র লক্ষ্য হলো শান্তিকামী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধনীতি "মুক্তি সংগ্রাম" নামে অভিহিত করতেও কুণ্ঠিত হয়নি। অবিশ্যি এর মধ্যে আশ্চর্য হওয়ার মতো নোতুনত্ব কিছু নেই। সাম্রাজ্যবাদের চিরকালের পুরানো নড়বড়ে যুক্তিই হলো এই যে, তাদের একচেটিয়া গোষ্ঠির স্বার্থে তারা যে লুঠেরাদের মতো যুদ্ধ করে থাকে, তার উদ্দেশ্যই নাকি কাউকে না কাউকে "মুক্ত" করা। এই ভাবেই সাম্রাজ্যবাদীরাও এতোদিন বিভিন্ন দেশের মানুষকে তাদের স্বাধীনতা থেকে "মুক্ত" করে উপনিবেশিক দাসত্বের শিকল পরিয়ে রেখেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই এইভাবেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনকে "মুক্ত" করেছে। অবিশ্যি মাঝে মধ্যে একদেশের সাম্রাজ্যবাদীরা উপনিবেশের জনগণকে অন্য দেশের সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করেছে, মুক্ত করেছে, তবে তাদের নিজেদের তাঁবেদার করে রাখার জন্যে। এইভাবেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে জাপান, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্মদেশ ও আরো কয়েকটি দেশকে "মুক্ত" করেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে দেখা গেছে যে দুই পরস্পর বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী জোট চরম প্রবঞ্চনা করে ঘোষণা করেছিল যে তারা "মুক্তি সংগ্রামে" অবতীর্ণ হয়েছে। লেলিন তাই লিখেছিলেন : "প্রতি দেশের বুর্জোয়া শ্রেণীই মিথ্যা ঘোষণা করে "নিজেদের" জাতীয় যুদ্ধকে একটা উন্নত আদর্শের পর্যায়ে নিয়ে অন্য সকলকে

বোঝাবার চেষ্টা করে যে তারা প্রতিপক্ষকে পরাজিত করতে চায় নিজেদের সুযোগ সুবিধা, শোষণ, শাসন বিস্তারের জন্যে নয়, অন্য জাতিকে "মুক্ত" করার জন্যে। অবিশ্যি নিজেদের দেশের মানুষদের বেলায় সেই "মুক্তিটা" মুলতুবী থাকে।[১৬]

সাম্রাজ্য বিস্তারকারীদের এই চিরাচরিত নীতির মধ্যে মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা যেটুকু নোতুনত্বের ছোঁয়া আনলো তা হলো এই যে, প্রথমতঃ তারা মিথ্যা অজুহাতে শান্তির সময়েও এই যুদ্ধবাদীনীতিকে সমর্থন করার চেষ্টা করলো, যখন আসলে তারাই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া অতীতে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের প্রতিপক্ষ আরেক সাম্রাজ্য-বাদীর কবল থেকে কোন দেশকে "মুক্ত" করার বিঘোষিত নীতির আশ্রয়ে কাজ করতো, এখন সেই মরচেপড়া নড়বড়ে যুক্তিকেই খাড়া করা হলো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিরুদ্ধে। এক কথায় সমকালের সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতান্ত্রিক দেশের মানুষকে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতা থেকে "মুক্ত" করে, তাদের উপর একটা বিদেশী শাসনের বোঝা চাপিয়ে দিতে চায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে তাদের জাতীয় রাষ্ট্রীকসত্বা, অর্থনৈতিক সাফল্য ও জাতীয় সংস্কৃতির হাত থেকে "মুক্ত" করার জন্যে তারা মরিয়া হয়ে ছটপট করছে। কিন্তু আমরা তাদের প্রশ্ন করি : হিটলারও কি তাই করতে চায় নি ? জার্মাণ ফ্যাশিস্তদের প্রচারযন্ত্র কি দিন-রাত কেবল একথা বলেনি যে, জার্মাণীর ইচ্ছা হলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে মুক্ত করা ?

সোভিয়েতের জনগণ তাদের কঠোর বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝতে পেরেছে যে আক্রমণকারীদের পরিভাষায় "স্বাধীনতা" কথার মানে কি হতে পারে। সেই "স্বাধীনতার" স্বাদ পেয়েছে তারা জার্মাণ সেনাদলের হাতে। তারা জানে এই "স্বাধীনতার" অর্থ হলো মৃতের স্বাধীনতা, কবর মৃত্যু শিবিরের শান্তি, ব্যাপক হত্যা, দানবীয় হিংসা আর লুঠতরাজ, সমস্ত সাংস্কৃতিক স্মৃতি ও ঐতিহ্যের বিপর্যয়, জনগণের সম্পত্তির ধ্বংসসাধন। তাই প্রতিদানেই সোভিয়েতের জনগণও আক্রমণকারীদের সেই বাস্তব শিক্ষা দিয়েছে যে মুক্তি, গণতন্ত্র ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রকৃত প্রবক্তরা কি করতে পারে। জার্মাণ সাম্রাজ্যবাদীদের সেই শিক্ষায় যথেষ্ট মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে, উপলব্ধি করেছে তারা

এর গুরুত্ব। তাই আশা করা যায় যে অতলান্তিকের অপর পারেও সেই শিক্ষা যুদ্ধ বিশারদ্‌রা সহজে বিস্মৃত হবেনা।

মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা কেবল ঠাণ্ডা লড়াই সুরু করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা একে তাদের নীতির একেবারে বীজমন্ত্র করে তুলেছে। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে তারা এই নীতিকে, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে তার পক্ষ সমর্থন করতে।

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আদর্শগত বনিয়াদ হিসাবে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার নীতি, আদর্শের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী হানাদার চিরকালই এটাই জাহির করে যে সে নিজে একেবারে নির্দোষ, একেবারে ভেড়ার মতো নিরীহ। কেবল তার প্রতিপক্ষই নেকড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সর্বনাশ করতে চায়। কিন্তু ইতিহাস প্রমাণ করে যে এই নির্দোষীতার আত্মপ্রচার যারা করেছে তাদের হিংস্রতাই সবচেয়ে বেশি। কেউ তাদের ভয় দেখায় না, ক্ষতি করে না তারাই সকলকে ভয় দেখিয়ে অনিষ্ট করে বেড়ায়। ঠাণ্ডা লড়াই শুধু নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে করতে হচ্ছে, একথা বিশ্বাস করতে হলে কারো গোবেচারা ভালো মানুষ অর্থাৎ নির্বোধ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

পশ্চিম জার্মাণীর প্রতিক্রিয়াশীল লেখকগোষ্ঠীও এই অপপ্রচারে যোগ-দিয়েছেন ঠাণ্ডা লড়াই সমর্থন করার জন্যে। জার্মাণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতায়, তাঁরাও নিজেদের বিদ্বেষবুদ্ধি মতো ইন্ধন যুগিয়ে যাচ্ছেন। যুদ্ধবাদী নীতির ভিত্তিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে জোট বেঁধে, বন্‌ (Bonn) কোনমতেই তাদের গতকালের শত্রুদের সঙ্গে সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার সুযোগের অপব্যবহার করতে পারে না। একথা পশ্চিম জার্মাণীর প্রতিক্রিয়াশীল ইতিহাসবিদরাই প্রথমে বলেছিলেন যে, কেবল জার্মাণীই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয়নি, তার যুদ্ধোত্তর কালের বন্ধুরা, মিত্রপক্ষরা সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। পশ্চিম জার্মাণীর লেখকগোষ্ঠী, একচেটিয়া স্বার্থের প্রতি তাদের একান্ত বশম্বদ স্বভাবের জন্যে এই বাস্তব সত্যকে কাজে লাগাতে উৎসুক যে, বিগত যুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের শাসক শ্রেণী তাদের সাম্রাজ্য-বাদী লক্ষ্যকে সফল করে তুলতে পারেননি।

ইতিহাসের এক নিদারুণ বিকৃতি চালু হয়ে গেল যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন যুদ্ধে জয়লাভ করলেও, "শয়তান" বলশেভিকদের জন্যে বিজয়ের পূর্ণ ফলশ্রুতি

অর্জন করতে পারেনি, তা প্রথমে প্রচারিত হলো বিভিন্ন সংবাদ ও সাময়িক পত্রে এবং পরে পশ্চিম জার্মাণ, বৃটিশ, মার্কিণ ও ফরাসী ইতিহাসবিদ্‌দের নানা গবেষণ প্রবন্ধে। সেই জন্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন আসলে পরাজিত জার্মাণীর প্রায় সমগোত্রীয় হয়ে গেছে। ঘটনাবলীর এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যাই, যার সঙ্গে বাস্তবের কেবল যোগ নেই, পরবর্তীকালে সমস্ত পশ্চিমী ইতিহাস রচনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের বাস্তব অবস্থার চরিত্র এমনই পরিবর্তিত হয়েছিল যে মার্কিণ দেশের শাসক শ্রেণীর পক্ষে বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা কোন মতে সম্ভবপর ছিল না। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে দিল এই ধরনের দাবী কোনমতেই রূপায়িত করা সম্ভব নয়। একটা নোতুন আক্রমণ ধারা, একটা নোতুন যুদ্ধ সুরু করার জন্যে পশ্চিম জার্মাণীর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও জঙ্গীবাদকে কাজে লাগানোর মার্কিণ নীতির সঙ্গে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধপূর্বকালের পশ্চিমী শাসক-গোষ্ঠীর অনুসৃত নীতির মিল ছিল বহু, যা শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হযে তাদেরই দুর্বিপাকে ফেলে। মধ্য ইউরোপে এই যুদ্ধবাদী রাষ্ট্র ও মনোভাবের পুনরুজ্জীবন বহু দেশের চোখেই ছিল নিতান্ত আতঙ্কের বিষয়। বিশেষ করে ফ্রান্সের তো আশংকার অন্ত নেই, যে দেশ একাধিকবার এই জার্মাণ জঙ্গীবাদের শিকার হয়েছে।

এর পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক চক্র শুধুমাত্র পশ্চিম জার্মাণীর প্রতিহিংসাকাঙ্ক্ষী জঙ্গীবাদের সঙ্গেই মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি, তারা নিস্পৃহভাবে সেই দেশকে পুনরস্ত্রীকরণে সাহায্য করেছে, তার সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণে মদৎ যুগিয়েছে, যে দেশ পৃথিবীতে দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সুরু করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে মানুষেব কাছে। শুধু তাই নয় আজ এই সব রাষ্ট্রেরই উদ্যোগে পশ্চিম জার্মাণী, আক্রমণাত্মক উত্তর অতলান্তিক জোটের নেতৃত্বের আসনে জাঁকিয়ে বসেছে। উনিশ শ' তেষট্টির মে মাসে অটোযায় এই জোটের এক পরিষদীয় অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, জোটে পারমাণবিক অস্ত্র সজ্জিত যে রকেট বাহিনী গঠন করা হবে, তাতে পশ্চিম জার্মাণীর সমর পরিষদ বাণ্ডেসভের (Bundeswehr) এর জেনারেল ও অফিসারদের থাকবে অবাধ প্রবেশ অধিকার। এর চেয়ে মারাত্মক প্রস্তাব আর হয় না, কারণ অভিজ্ঞতায় অভ্রান্ত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে জার্মাণ

আক্রমণকারীরা ইউরোপে কোথাও যুদ্ধ বাধাবার সুযোগ পেলে তার অপব্যবহার করে না। উস্কানি দিয়ে যায় তারা সমানে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যে ঠাণ্ডা লড়াই সুরু করেছে, তা প্রায় আঠারো বছরের পুরাণো হয়ে গেল। কিন্তু কি পাওয়া গেল তাতে? সাম্রাজ্যবাদীদের সুবিধা হতে পারে এমন কোন পরিণতি তার আজো আসেনি। বরং অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আন্তর্জাতিক মর্যাদায় ঘাটতিই ঘটেছে ক্রমাগত। জনগণের মনে পুঁজিবাদের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি পেয়েছে ক্রমাগত। আর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও তার সহযোগীদের কপালে জুটেছে ক্রমিক ব্যর্থতা। দু'জন মার্কিণ সমাজ বিজ্ঞানী, এডমণ্ড ষ্টিলম্যান ও উইলিয়াম পাফ লিখেছেন যে, "আমাদের নীতিগুলি ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীতে আমাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। আমাদের ইউরোপীয় মিত্রশক্তিরা আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি, বিচার বিবেচনা ও ইচ্ছা শক্তির উপরে ক্রমেই সন্দিহান হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ গোলার্ধের নোতুন দেশগুলি ক্রমেই আমাদের দাবী দাওয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে পড়ছে (এখনো তারা ঘৃণা করতে সুরু করেনি)। আমাদের প্রতিপক্ষ তো ঘৃণাভরে আমাদের উপেক্ষা করে যায়। আর আমাদের নিজের মনে এসেছে একটা নিদারুণ ব্যর্থতার আত্মগ্লানি।"[১৭]

এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝা যায় যে পুঁজিবাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যারা আশংকিত, সেই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিক, শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার, সমাজ-বিজ্ঞানী, ইতিহাসবিদ ও ভাষ্যকাররা কেন ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতি পরিত্যাগ করার জন্যে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সরকারকে অনুরোধ করছেন। ডি. এফ. ফ্লেমিং লিখেছেন যে, "যেহেতু ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতির মধ্যেই পরাজয়ের সম্ভাবনা রয়ে গেছে, তাই অনেক কঠিন হলেও কমিউনিষ্ট দুনিয়ার সঙ্গে প্রতি-যোগিতামূলক সহাবস্থানের নীতিই গ্রহণ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে এমন নীতি রূপায়িত করতে যা প্রথমে সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে, পরে সমস্ত দেশ ও জনগণের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার নীতিতে রূপান্তরিত হবে।"[১৮]

এই ধরনের ঠাণ্ডা মাথার যুক্তি ও বক্তব্য প্রায়সই ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বীর পুঙ্গবদের তর্জন গর্জনের আড়ালে চাপা পড়ে যায়। তারা যে কোন ধরণের বর্বরোচিত কঠোর ও অসৎ কলাকৌশল গ্রহণ করতেও দ্বিধা করে না। এমনই একজন হলেন বৃটিশ ইতিহাসবিদ্ হিউ সীটন ওয়াট্সন। ভদ্রলোক তাঁর সহ-

যোগীদেরও ছাড়িয়ে গেছেন এক ধাপ। তাঁর মতে ঠাণ্ডা লড়াই ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে আসলে কোন পার্থক্য নেই। তিনি লিখেছেন :

"বোমার ব্যবহার না করে স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করার জন্যে পশ্চিমী সাংবাদিকরা যে নোতুন একটি নাম আবিষ্কার করেছেন—"ঠাণ্ডা লড়াই", তাকে মুখ্যতঃ পশ্চিমী শক্তিবর্গের যুদ্ধবাদী নীতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই-রকমই বহু বছর পূর্বে লেনিন, সোভিয়েত রাশিয়া ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে বোমা বারুদ ব্যবহার না করে স্থায়ী যুদ্ধের অবস্থা বজায় রাখার নীতিকে আরেকটি নামে অভিহিত করেছিলেন, সেটা হলো "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান"। অথচ একেই সোভিয়েত রাশিয়ার মুখ্যতঃ শান্তিকামী নীতি হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু সত্যি কথাটা এই যে 'ঠাণ্ডা লড়াই' ও 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' হলো একটি বিশেষ অবস্থা বোঝাবার জন্যে, দু'টি পরস্পর বিভিন্ন নাম।"[১৯]

এই প্রতিক্রিয়ার অনুগামী ইতিহাসবিদ সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক নীতি ও শান্তির নীতির মধ্যেকার পার্থক্যকে চেষ্টা করে "এড়িয়ে" গেছেন। ওয়েবষ্টারের অভিধানে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে এটি হলো, "বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কুটনীতি, অর্থনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদি নিয়ে তীব্র বিরোধ, যার মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধ বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রচুর।" একেবারে খাঁটি কথা। ঠাণ্ডা লড়াই হলো বিশ্বযুদ্ধের পথ। অন্যদিকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হলো রাষ্ট্র জীবনে যুদ্ধকে বর্জন করে শান্তিকে বজায় রাখার, সুরক্ষিত করার নীতি। আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গঠন করার মাত্র দু'টিই পথ আছে—তার একটা হলো পারমাণবিক যুদ্ধের পথ, আর অন্য পথটি হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের।

সেই জন্যেই শান্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ও প্রসার এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসক গোষ্ঠীর যুদ্ধ নীতির বিরুদ্ধে, তাই একে বলা যায় জনগণের জবাব। অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই সেজন্যে সমকালের সাম্রাজ্যবাদী হামলার সংহত প্রকাশ, উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার জন্মের অল্পকালের মধ্যেই, এপ্রিল উনিশ শ' উনপঞ্চাশে প্রথম বিশ্ব শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শান্তি আন্দোলন হলো একটা ব্যাপক গণআন্দোলন, যার মধ্যে সমাজের বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন স্তরের, এমন কি বিভিন্ন রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পন্ন লোকও আছেন। তাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় প্রধান ভিত্তি হলো এই যে শান্তির সপক্ষে

তাঁরা। পৃথিবীর মানুষকে আরেকটা পারমাণবিক যুদ্ধের বেড়াজালে ফেলে তাঁরা খুন করতে দিতে চান না। আধুনিক কালের মানসিকতার সঙ্গে তার যোগসূত্র তাই এতো বেশি। একে তাই একটি প্রতিনিধি স্থানীয় আন্দোলন বলা যায়। সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ ও যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে এ তাই গঠন করেছে মানুষের শান্তির জন্যে সম্মিলিত প্রতিরোধের সুদৃঢ় ইচ্ছাকে।

সমকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে বিশ্বশান্তি সংসদের উদ্যোগে জুলাই উনি শ' বাষট্টিতে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তির বিশ্ব সম্মেলন বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। পৃথিবীর এক শ' একুশটি দেশের দু' হাজারেরও বেশি প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক ও অতিথিদের এতো বড়ো আন্তর্জাতিক সম্মেলন ইতি-পূর্বে আর কখনো হয়নি। সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ই ছিল এই যে, প্রতিটি দেশ ও জাতির মাথার উপরে যে পারমাণবিক যুদ্ধের আশংকা আজ ঝুলে আছে তাকে দূর করা যেতে পারে। মানুষ আজ যুদ্ধের কাল থেকে স্থায়ী শান্তির যুগে উত্তরণের ক্ষমতা রাখে। সে দায়িত্ব পালন করতে তারা প্রস্তুত।

যুদ্ধ না শান্তি এটাই হলো একালের মানুষের সামনে মৌল প্রশ্ন, যার উপরে কোটি কোটি মানুষের জীবন মৃত্যু নির্ভরশীল। সাম্রাজ্যবাদই হলো আমাদের সমস্ত আশংকার বিপদের বৃহত্তম ও একমাত্র উৎস। তলে তলে তা ষড়যন্ত্র করছে, মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ অনুষ্ঠান করার জন্যে ইতিহাসে যার তুলনা নেই। সেটা হলো পারমাণবিক যুদ্ধের প্রস্তুতি। বিপরীতপক্ষে সমাজ-তন্ত্র আজ বিশ্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। শান্তির সপক্ষে এমন দ্বিধা-হীন ও শক্তিমান সমর্থক আর নেই।

সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশতি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচী সোভিয়েতের জনগণের সঠিক কর্ম প্রচেষ্টা সাম্যবাদী সমাজ গঠনের কাজে সম্পূর্ণ ভাবে নিবদ্ধ রাখতে চায়। এটা হলো সর্বতোভাবে একটা শান্তিময় প্রচেষ্টা। মানুষের চিরায়ত স্বপ্ন একটা নিখুঁত সমাজ ব্যবস্থার সংগঠন সম্ভব করতে গেলে, সোভিয়েত দেশে একটা সাম্যবাদী সমাজ গঠন করতে গেলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অপরিহার্য। সমাজতান্ত্রিক তথা সাম্যবাদী সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব করে তুলতে গেলে, সমাজের যে বাস্তব পরিবেশের আনুকূল্য অপরিহার্য, শান্তিপূর্ণ অবস্থান ছাড়া কোন মতেই তা আসতে পারে না। কারণ স্বল্পতম ঐতিহাসিক

সময়ের ব্যবধানেই তা পুঁজিবাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সমাজ-তন্ত্রকে জয়যুক্ত করতে পারে।

যুদ্ধকে চিরতরে দূর করে, পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই হলো সাম্য-বাদের ঐতিহাসিক ব্রত। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীতে তাই বলা হয়েছে:

"সোভিয়েতের কমিউনিষ্ট পার্টি মনে করেন যে তার পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য হলো সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদী সমাজ সংগঠনের জন্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং পৃথিবীর সমাজতান্ত্রিক শিবিরকে আরো উন্নতির পথে অগ্রসর করে দেওয়া, এবং তারই পাশাপাশি অন্যান্য শান্তিকামী দেশ ও জন-গণের সঙ্গে যৌথ সক্রিয়তায় বিশ্ব বিধ্বংসী যুদ্ধের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো।"[২০]

এই কর্মসূচীর মধ্যে কোথাও কোন গোপনীয়তা নেই। বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ না ঘটিয়ে, কর্মসূচীতে আগামী বিশ বছরের মধ্যে যে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের লক্ষ্য মাত্রা স্থিরীকৃত হয়েছে, তার রূপায়নের জন্যে শান্তির আবশ্যকতা কতোখানি তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। পার্টির কর্মসূচীতে আগাগোড়া তাই শান্তির একটা অনস্বীকার্য মনোভাব রয়ে গেছে। নোতুন করে, জোরের সঙ্গে, মনকে নাড়া দেওয়ার মতো করে পুনর্বার বলা হয়েছে যে সাম্যবাদ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

সাম্যবাদ ও শান্তি অবিভাজ্য, কারণ সাম্যবাদ ও শ্রম, সাম্যবাদ ও কোটি কোটি মেহনতী মানুষের সৃজনী শক্তি অবিভাজ্য। মানুষের শ্রমের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সাম্যবাদ। সাম্যবাদের ধারণায় উদ্বুদ্ধ মানুষের সৃজনী শক্তি যে অজস্র ধারায় স্বতোৎসারিত প্রচণ্ডতায় অগ্রসর হতে পারে, তা সাম্যবাদী সমাজ প্রত্যক্ষ না করলে বোঝা যায় না। মানুষের কাছে এর চেয়ে বেশি প্রাধান্য আর কেউ দাবী করতে পারে না। শান্তিপূর্ণ মাধ্যমেই সাম্যবাদ, পুঁজিবাদের উপরে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে চলেছে—তারই নিদর্শন আছে অর্থনৈতিক সংগঠনে, উৎপাদন শক্তির উন্নতিতে, জনগণের উন্নত জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মানে। তার সফলতার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার হলো শ্রম, যা মানুষের মানবিক মূল্যবোধকে বাড়িয়ে দেয়।

সমস্ত শান্তিকামী দেশ সমেত সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তি

বাস্তবতা বোধ, আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় ও প্রচেষ্টা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের অনুসৃত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের নীতির বিরোধিতা করতে বদ্ধপরিকর। আক্রমণ ও যুদ্ধের সপক্ষে যারা বিগত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার পৃথিবীকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিপর্যয়ের কিনারায়। যেহেতু তাতে যুদ্ধ বাধেনি তার জন্যে ধন্যবাদ যদি কারো প্রাপ্য হয়ে থাকে তাহলে তা পাওয়া উচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, শান্তিকামী শক্তির, যারা "যুদ্ধের কিনারা" থেকে সাম্রাজ্যবাদী হানাদারদের হটে আসতে বাধ্য করেছে।

সাম্রাজ্যবাদের মদমত্ততার বিরুদ্ধে, উন্মাদনার বিরুদ্ধে মানুষের যুক্তিবোধের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করার ঐতিহাসিক সংগ্রামে নেমেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ সংগ্রাম বড়ো কঠোর। কিন্তু মানবিকতা ও মানুষের সুখ শান্তির জন্যে সংগ্রামে, এই উচ্চ আদর্শের জন্যে সংগ্রামে, শেষ পর্যন্ত জয় হবে সমাজতন্ত্রের, সাম্যবাদের। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে:

"সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিচলভাবে এতোকাল করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও অবিচলভাবে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি অনুসরণ করে চলবে।"[২১]

উনিশ শ' তেষট্টির আগষ্টে পারমাণবিক অস্ত্রের অন্তরীক্ষে, জলের নীচে অথবা মহাকাশে পরীক্ষা নিষিদ্ধ করার মস্কো চুক্তি, শান্তির সপক্ষে যারা তাদেরই বিজয় সূচিত করে। এটা হলো যথাযথ উদ্দেশ্যের অভিমুখে একটি সঠিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যার ফলে স্থায়ী বোঝাপড়ার সম্পর্ক জাতিতে জাতিতে গড়ে ওঠার পথ প্রশস্ত হতে পারে। কিন্তু শান্তির সপক্ষে সচেষ্ট হয়ে থাকার অর্থ এই নয় যে, বাস্তবে যেখানে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যলোলুপরা ওঁতপেতে বসে আছে, তাদের ভুলে থাকা অথবা এড়িয়ে যাওয়া। আজকের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও সজাগপ্রহরা কোনমতে অস্বীকার করে চলা যায় না। সমকালীন পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণাত্মক নীতি তাদেরই বিরুদ্ধে, বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। সোভিয়েত কমিউনিষ্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেসে খ্রুশ্চভ্ বলেছিলেন: "সাম্রাজ্যবাদীরা যদি সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধি বর্জিত হয়ে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে আক্রমণ করতে চায়, যদি মানুষকে তারা এক চরম বিধ্বংসী যুদ্ধের মুখে ঠেলে

দিতে চায়, তাহলে সেটাই হবে তাদের মতো উম্মাদদের শেষ কাজ। কারণ তার পরে আর পুঁজিবাদ বলে কিছু থাকবে না।"[২২]

ইতিহাসের শিক্ষা প্রমাণ করে যে খ্রুশ্চভ্ যথার্থই বলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদ দু'টি বিশ্বযুদ্ধ সুরু করেছে, কিন্তু তার পরিণতি গেছে তাদের বিরুদ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সুসম্পন্ন হয়েছে রাশিয়ায় মহান অক্টোবর বিপ্লব। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরে ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। পুঁজিবাদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন দ্রুততর হয়ে উঠেছে। তাই একথা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্যবাদীরা যদি আরেকবার মানুষকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নামতে বাধ্য করে, তাহলে সেটাই হবে তাদের শেষ যুদ্ধ। তারপরে অনিবার্যবেগে আসবে বিপর্যয় যা এতোদিন যুদ্ধকে জন্ম দিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এটাই হলো ফলশ্রুতি, পরিণাম ও শিক্ষা। তারা প্রমাণ করে দিয়েছে বিশ্ববিজয়ের কোন সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা, তা সে যতো শক্তিমান রাষ্ট্রই রচনা করুক না কেন, তা নিতান্ত অবাস্তব ও ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। তারা প্রমাণ করেছে যে ইতিহাসের নিরিখে সমাজতন্ত্র অপরাজেয় তারা আরো প্রমাণ করে করে দিয়েছে যে সমকালের জনগণ ঐতিহাসিক উন্নতি ও প্রগতির সমস্যাবলীর সমাধান করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে।

যুদ্ধের ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে উত্তীর্ণ হয়েছে। অটলভাবে সে আজ তার অগ্রগতির পথে, পূর্ণ সাম্যবাদী সমাজ সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। কোনদিনই সে বর্তমানের মতো শক্তিমান ছিল না। আজকের মতো কোনদিনই তার এই সৃজনীশক্তি ও কর্মের উত্তম দেখা যায়নি। সাম্যবাদের অভিমুখে এর স্থির লক্ষ্য অগ্রগতি মানুষ আজ রুদ্ধশ্বাসে প্রত্যক্ষ করছে। অভিভূত হয়েছে তারা এর অভিনবত্বে, এর বৈচিত্র্যের স্বাদে। পৃথিবীর কোন শক্তিই আজ আর তাকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না, তার অগ্রগতিকে রোধ করতে পারবে না।

১. বার্লিনের মহাফেজখানার সাময়িকপত্র, ২২শে জুন, ১৯৪১

২. এইচ. এ. জ্যাকোবসেন রচিত একটি জার্মাণ গ্রন্থ

৩. একটি রুশভাষায় রচিত গ্রন্থ

৪. আই. স্পেক্টর : An Introduction to Russian History and Culture, টোরোণ্টো, নিউ ইয়র্ক ১৯৫০, পৃ ৩৫০
৫. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
৬. জেমস্ এস. অ্যালেন : World Monopoly and Peace, নিউ ইয়র্ক ১৯৪৬, পৃঃ ১১১
৭. খ্রুশ্চভ্ : World Without Arms. World Without Wars, মস্কো ১৯৬১ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮০
৮. কার্লটন হায়েস : Contemporary Europe Since 1870, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৮, পৃঃ ৭৪৮
৯. এই সংখ্যার মধ্যে আছে নাৎসীদের মৃত্যু শিবিরে নিহত ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ
১০. প্রাভ্দা, ২২শে জুন, ১৯৬১
১১. খ্রুশ্চভ্ : Forty Years of October Socialist Revolution, ১৯৫৭, পৃঃ ২২-২৩
১২. Road to Communism. Documents of the 22nd Congress of the C.P.S.U, মস্কো. পৃঃ ৪৬৪
১৩. ফষ্টার ডালেস : War or Peace, নিউ ইয়র্ক ১৯৫৭, পৃঃ ১৬৩
১৪. নিউ ইয়র্ক টাইমস্, ২৭শে আগষ্ট, ১৯৬০
১৫. Congressional Record, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫, ৯১তম খণ্ড পৃঃ ১২৩৯৮-৩৯৯
১৬. একটি রুশ ভাষায় রচিত গ্রন্থ
১৭. এডমাণ্ড ষ্টিলম্যান ও উইলিয়াম পাফ্ : New Politics. America and the End of the Post War World, নিউ ইয়র্ক ১৯৬১, পৃঃ ১২
১৮. ডি. এফ. ফ্লেমিং : The Cold War and Its Origins 1917-1960, লণ্ডন ১৯৬১, পৃঃ ১০৭৩-৭৪
১৯. হিউ সীটন ওয়াটসন : From Lenin to Khrushchov. The History of World Communism, নিউ ইয়র্ক ১৯৬০, পৃঃ ৩৮৫
২০. The Road to Communism, পৃঃ ৫০২
২১. ঐ, পৃঃ ৫০৭
২২. ঐ, পৃঃ ২৪